বে-নজীর আহমদ রচনাবলী

বে-নজীর আহ্‌মদ রচনাবলী

সংকলন ও সম্পাদনা

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

বে-নজীর আহ্‌মদ রচনাবলী

সম্পাদনা : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪১৩ / মার্চ ২০০৭

বা/এ ৪৫৪২

মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
উপপরিচালক
সংকলন উপবিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ সৈয়দুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ মহসীন

মূল্য
৪৩০.০০ টাকা মাত্র

BENAZIR AHMAD RACHANABALI [Collected Works of Benazir Ahmad] : Edited by Shabuddin Ahamad. Published by Compailation divition. Bangla Academy. First Edition March 2007. Price : Tk. 430.00 Only.

ISBN : 984-07-4551-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শান্তি ও মানবতার জন্য
উৎসর্গ-প্রাণ
মানুষদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিদ্রোহ, বিপ্লবকে বাদ দিয়ে কবি বে-নজীর আহমদের কথা কেউ কল্পনা করতে পারবে বলে মনে হয় না। সেই সঙ্গে তাঁর নামের সঙ্গে 'সন্ত্রাসী' শব্দটি জড়িত হয়ে গেছে। অবশ্য আমরা এই শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত করতে যৌক্তিকভাবে অনাগ্রহী। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান সৈনিককে আমরা মুজাহিদ বলে অভিহিত করব। তাহলে কি 'সন্ত্রাসী' শব্দের ইতিহাস জানাটা আমাদের জন্য অযৌক্তিক হবে। আমরা বে-নজীর আহমদের উপর লেখা এ. জেড. এম. শামসুল আলমের একটি লেখা থেকে জানতে পারছি যে স্বয়ং বে-নজীর আহমদ তাঁর পরিণত বয়সে 'সন্ত্রাস' সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে দ্বিধা করেছেন। শামসুল আলম লিখেছেন—

> সন্ত্রাসবাদী হিসাবে তাঁর কীর্তিগাথা লিখতে না চাওয়ার আর একটি কারণ ছিল। তিনি বলতেন, সন্ত্রাসবাদ ছিল আমাদের ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভুলতে হবে সে অধ্যায়। কোন স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মোহ সৃষ্টি করা সঙ্গত হবে না। তাঁর মতে, বিদেশী সরকার বিতাড়নের জন্যে সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেশী সরকার বদলের সর্বোত্তম পন্থা গণতন্ত্র। সন্ত্রাসবাদীদের অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে হয়, কিন্তু স্বাধীন দেশে সন্ত্রাসবাদী কার সম্পদ ধ্বংস করবে? সমস্ত সরকারী সম্পদই ত দেশের। তৎকালে সন্ত্রাসবাদীরা মনে করত সমস্ত সরকারী কর্মচারী বিদেশী শত্রুর দালাল। কিন্তু স্বাধীন দেশে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পাপতুল্য।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের বে-নজীর কিন্তু তা ছিলেন না। অনেকেই জানেন যে এদেশ থেকে ব্রিটিশ বা ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য যে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তার দ্বিতীয় পর্বের হোতা ছিলেন মুখ্যত হিন্দু সম্প্রদায়। 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' নামে এঁরা দু'টি দল সৃষ্টি করেন। এঁদের মূল মন্ত্রণাদাতা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী ঘোষকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

> অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ—কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, উপবন, পর্বত, নদী জানে—আমি স্বদেশকে 'মা' বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসে যদি একটা রাক্ষস তাঁর বক্ষরক্ত পান করতে উদ্যত হয় তাহ'লে ছেলে কি করবে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে বসবে, স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে আমোদ করতে বসবে—না মা'কে উদ্ধার করতে ছুটে যাবে?

'অগ্নিযুগের ইতিকথা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন লিখেছেন—

> শ্রীঅরবিন্দই সর্বপ্রথম তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র কানুনগোকে বিপ্লব মান্ত্রে দীক্ষা দেন।

www.pathagar.com

দুঃখের বিষয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় পর্বের লড়াইতে হিন্দুরা যে এক তরফা যুদ্ধে লিপ্ত হন এতে মুসলিম যুবকদের অংশগ্রহণ সমর্থন লাভ করেনি।

নজরুল ইসলাম 'কুহেলিকা' উপন্যাসে এই বাস্তবতার ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'কুহেলিকা'র নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লববাদীদের দলে যোগ দিলে হিন্দু-সদস্যরা তা স্বত:স্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'তাহারা প্রমত্তের (শিক্ষা সদস্যের) জাহাঙ্গীরকে 'মাতৃমন্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল।' তখন শিক্ষক প্রমত্ত "বলিল, 'দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এ মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাঙ্‌লার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না।" জাহাঙ্গীরের বন্ধু অনিমেষের মুখ দিয়ে নজরুল বলিয়েছেন—

> 'তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? — 'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গি এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লণ্ডন এবং মক্কা অধিকার করে?' —তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না।'

এটাই ছিল বে-নজীর আহমদের হিন্দু সন্ত্রাসবাদী দল ছেড়ে অন্য মুসলিম সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করার কারণ। বে-নজীর আহমদের, 'আজাদ সংঘ' করার আর একটা কারণ ছিল হিন্দু সন্ত্রাসীদের মা কালিকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণ করা। ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন তাঁর 'অগ্নিযুগের ইতিকথা'য় লিখেছেন—

> এই বাগানবাটিকাই (কলকাতার মানিকতলার মুরারীপুকুর লেন-এর বাগানবাড়ী) ছিল কলকাতার প্রধান বিপ্লব কেন্দ্র। ভূগর্ভস্থ একটি প্রকোষ্ঠে বিরাট কালিমূর্তি স্থাপিত ছিল। নবদীক্ষিত বিপ্লবীকে উক্ত কালিমূর্তির সাক্ষাতে স্বীয় দেহরক্ত ক্ষরিত করিয়া দেহরক্তের অক্ষরে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণদানের শপথ-বাক্য লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে হইত।

জনাব শামসুল আলম বে-নজীর আহমদের উপর লিখতে গিয়ে বলেছেন—

> এ শতাব্দীর সন্ত্রাসবাদ শুরু করেছিলেন আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুগণ। মুসলমানেরা বহু চেষ্টা করেও তাদের দলে জায়গা পেত না। কারণ; মা কালিকে সাক্ষী রেখে শপথ করতে হত যা মুসলমান ছেলেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কবি বে-নজীর আহমদ যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি দলে জায়গা না পেয়েই নিজেই 'আজাদ সংঘ' (আজাদ পার্টি) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন।

'চেনা-অচেনার বে-নজীর ও অন্যান্য' গ্রন্থে কবি জামালউদ্দীন মোল্লাও একই কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন—

> জগন্নাথ কলেজে থাকা অবস্থায় প্রথমে তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যুগান্তর পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু হিন্দু নেতারা শুধু তাঁকে ব্যবহার করত; কাজে-কর্মে খাটাত; বিশ্বাস করত না। যুগান্তর পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কোন সভায় কোন মুসলমান সদস্যের প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং বেণু মিয়াকেও (বে-নজীর আহমদ) এ জাতীয় কোন সভায় প্রবেশ করতে দেয়া হত না। মুসলমান যুবকদের প্রথমে নভিস হিসাবে নেয়া হত। এই বিশ্বস্ততা আরও একটু বাড়াতে পারলেই ছোটখাটো অপারেশনেও পাঠানো হত। কিন্তু অপারেশনে যাবার আগে কিছু নিয়ম পদ্ধতি মানতে হত।

জামালউদ্দীন মোল্লা লিখেছেন—

www.pathagar.com

একদিন বেণু মিয়াকেও বলা হ'ল কালিমূর্তির পায়ে কপাল ঠুকে ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শপথ নিতে। তিনি তৌহিদী মুসলমান। অতএব তিনি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসেন এবং আজাদ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৫-এ তাঁর এই পার্টি গঠিত হয় এবং বলা বাহুল্য, আজাদী আন্দোলনের সশস্ত্র এই মুজাহিদ স্বদেশী বৃটিশ দালালদের দ্বারা বেণু ডাকাত নামে চিহ্নিত হন।

ডাকাতি কিন্তু হিন্দু সন্ত্রাসীরাও করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'অগ্নিযুগের ইতিকথা'য় লিখেছেন—

এই সময় বাংলার পুলিশ বাহিনী নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত বিপ্লব দমনের নামে নানা প্রকারের অত্যাচারের সূচনা করে। চারিদিকে অনর্থ হয়রানী, যত্রতত্র তল্লাসী, পথিকদের উপর পুলিশী অত্যাচার, পুস্তক-পুস্তিকাদি বাজেয়াপ্তি, বৈপ্লবিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র অন্বেষণ ব্যাপদেশে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সম্মান ধ্বংসায়ন, গ্রাম পল্লীতে হানা দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর জোর-জুলুম ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। তাছাড়া কলিকাতা ও মফস্বল শহর সমূহে ছাপাখানা বন্ধ করা ; দেশবরেণ্য নেতৃবর্গের 'ফটোচিত্র' প্রকাশ নিষিদ্ধ করা ; গুপ্তচরের মিথ্যা রিপোর্টের উপর নির্ভর করত নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে গ্রেপ্তার করা ও তাদের অযথা হয়রান করা প্রভৃতি জবরদস্তিমূলক কার্য্যকলাপ অনবরত চলতে থাকে।

পুলিশের এবংবিধ স্বৈরাচারে বিপ্লবপন্থীরাও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহারা সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। বিপ্লবী নেতারা বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থবিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট সংগোপনে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় ভিন্ন পথ অবলম্বনে অর্থপ্রাপ্তির প্রয়াসে ব্রতী হয়। বিপ্লবীরা তখন অনন্যোপায় হইয়া ধনী মহাজনদের বাড়ীতে হানা দিতে থাকে এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লুন্ঠন করিয়া আনিয়া সেই অর্থে বিপ্লব পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১৯০৮ সনে ঢাকা অনুশীলন সমিতির যুবকরা বাহা গ্রামে ডাকাতি করে।

মনে রাখতে হবে তাদের এই কাজ ব্যক্তিস্বার্থে নয় জাতীয় স্বার্থে ব্যয়িত হয়। বিপ্লবী বে-নজীর এই আদর্শকে মুসলিম জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত করেন। এই ধরনের একটা অপারেশনের পর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা দেন (জামালউদ্দীন মোল্লা লিখিত 'চেনা-অচেনার বে-নজীর ও অন্যান্য' গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সেটি এই—

আমরা আপনাদের ভাই, বন্ধু, আপনাদের ছেলে। আমরা আপনাদের জন্য এসেছি। আপনাদের জন্যে দিনের আরাম, রাত্রির বিশ্রাম হারাম করেছি। আমাদের ব্যক্তিগত কোন লাভের জন্যে নয়।

এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেন 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে মুসলমান তরুণদের আত্মবলিদানের কারণসমূহ। তুলে ধরেন 'এ দেশী দোসর জমিদার আর নরখাদক, সুদখোর বেনিয়া সাহা সওদাগরদের অত্যাচারের অসংখ্য জ্বলজ্যান্ত কাহিনী।' তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসও তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গসংযুক্ত করণের আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। বঙ্গভঙ্গ যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলিম স্বার্থের জন্য আশীর্বাদ ছিল এদেশের হিন্দু-জমিদার ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের জন্য তা ছিল হিন্দু জনগণের স্বার্থবিরোধী।

www.pathagar.com

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে বাংলা বিভাগ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সুদূর কলকাতা থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চল শাসন তার জনগণের প্রতি সুবিচার নয় মনে করে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি দুইভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে সংযুক্ত করে গঠিত প্রদেশের নাম করা হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম। আর পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে মিলিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম রাখা হয় বাংলাদেশ।

এই বিভক্তিকরণে পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা খুশি হয়। এর কারণ এই বিভক্তির ফলে ঢাকা রাজধানী হওয়াতে এই অঞ্চলের মানুষেরা মনে করে কলকাতা নির্ভরতা কমে যাবে এবং কলকাতার আধিপত্য মুক্ত হলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা দূর হবে। কিন্তু এর বিভক্তিকরণে হিন্দু–স্বার্থে বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা ধারণা করে এর ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত হবে এবং তাদের ক্রম–বর্ধমান একাত্মতা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হবে। এতে হিন্দুরা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয় এবং প্রবলভাবে বাধা দিতে থাকে। জনাব এবি এম মাহমুদ তাঁর "বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও তৎকালীন রাজনীতি" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের মূল কারণগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করিলে এই বিরোধিতার তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হইবে। বাংলা বিভাগ সত্যই তাহাদের জন্য এক দুর্যোগের ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। নিছক ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা করিয়াই হিন্দু নেতৃবর্গ ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শীঘ্রই নতুন ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে এই অঞ্চলের এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কৃষক শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং তৎসঙ্গে নবজাগরণ দেখা দিবে। ফলে পূর্বের ন্যায় আর তাহাদিগকে পেষণ ও নিষ্পেষণ করা যাইবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক তাহারা কোনদিনই সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত মুসলমান কৃষক সকলের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগরিত হইবে—এই ভয়ে রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

তিনি আরও লিখেছেন—

> বাস্তবিক পক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে হিন্দুদের মনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার বীজ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। তখন এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমশঃ ইহা মুসলিমবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। হিন্দু নেতৃবর্গের কায়েমী স্বার্থ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধই তাহাদিগকে এত উত্তেজিত ও মারমুখো হইতে বাধ্য করিয়াছিল। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু হইতে ইহারা নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। এই সমস্ত জমিদারদের অনেকেই এই অঞ্চলের সম্পদ অপহরণ করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্যের নিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিল কলিকাতায়। এই সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের ও সুখ–সুবিধার দিকে তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হ'লে এই হিন্দু–স্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে—এই কারণে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রথম পর্বে, যারা একদা ব্রিটিশের আগমনকে আশীর্বাদ বলে মনে করেছিল, তারাই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেসের চরম

www.pathagar.com

ও নরমপন্থীদের যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয় এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তা স্তিমিত হ'য়ে যায়। একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কংগ্রেস হিন্দুদের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। যেদিন বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে ঘোষিত হয় সেদিন কংগ্রেস দেশব্যাপী শোক দিবস পালন করে। বাঙালির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখীবন্ধন' ধারণ করে, ১৬ই অক্টোবর উপবাস করে, সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সকলে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবাদ জাগানোই ছিল ঐ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আন্দোলনকারীরা চরমপন্থী নেতাদের প্ররোচনায় নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটানো। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এরা হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিপ্লব সংঘ গড়ে ওঠে। এই গুপ্ত সমিতির একটির নাম 'যুগান্তর' যেটি কলকাতায় গড়ে ওঠে, অন্যটি 'অনুশীলন সমিতি'—যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ঐতিহাসিক সত্য এই গুপ্ত বিপ্লব সংঘ মূলতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হলেও কিছু কিছু মুসলিম যুবক এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু দেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ করা এবং 'বন্দে মাতরম' গান চালু করা হলে মুসলমানদের উৎসাহে ভাটা পড়ে এবং এটা হিন্দু আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। বে-নজীর আহমদ এই সব মুসলিম যুবকদের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে বিশের দশকে। ততদিনে অবশ্য বঙ্গভঙ্গ পুনরায় অভঙ্গ বঙ্গের রূপ নিয়েছে। ১৯১৪ সনে শুরু হওয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। ভারতকে দেয়া স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে ব্রিটিশ। নতুন আকারে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। জালিয়ানওয়ালা বাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সূচিত হয়েছে। সারা ভারত লাভা উদ্গীরণ-উন্মুখ আগ্নেয় গিরির রূপ লাভ করেছে। গান্ধী, শওকত আলী, মোহাম্মদ আলীর যৌথ অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছে। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী', 'আনোয়ার' ও 'কামাল পাশা' লিখিত হয়েছে। এই সময়ে নব-বিপ্লবী বে-নজীরের আবির্ভাব।

১৯২২-এ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন বে-নজীর আহমদ এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কামনায় তিনি হিন্দু-সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লেখান। গবেষক জামালউদ্দীন মোল্লা 'চেনা-অচেনা বে-নজীর ও অন্যান্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

> পরীক্ষা পাশের পর বেণু মিয়া (বে-নজীর আহমদ) লাপাত্তা। অনেক খোঁজাখুজির পর তাঁকে কলকাতা থেকে ধরে এনে জগন্নাথ কলেজে আইএসসিতে ভর্তি করে দেয়া হল। ...জগন্নাথ কলেজে থাকা অবস্থায়ই তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 'যুগান্তর' পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু নেতারা শুধু তাঁকে ব্যবহার করত। কাজে-কর্মে খাটাত। বিশ্বাস করত না।...
>
> মুসলমান যুবকদের প্রথমে নভিস হিসাবে নেয়া হত। ফাই-ফরমাস খেটে বিশ্বস্ত হতে পারলে প্রাথমিক সদস্যপদ দেয়া হত। এই বিশ্বস্ততা আর একটু বাড়াতে পারলে ছোটখাট অপারেশনেও পাঠান হ'ত। কিন্তু অপারেশনে যাবার আগে কিছু নিয়ম পদ্ধতি মানতে হ'ত। সে নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ছিল : যে-কোন ধর্মের লোকই হোক না, কোন অপারেশনে যাবার আগে চাটগাঁর সদরঘাটের কালিমন্দিরে কালিমূর্তির পায়ে কপাল ঠুকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ নেয়া।...
>
> একদিন বেণু মিয়াকেও (বে-নজীর) বলা হ'ল কালিমূর্তির পায়ে কপাল ঠুকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে শপথ নিতে।

www.pathagar.com

মুসলিম তরুণ হিসাবে সেটা বে-নজীর আহমদ পারেন নি। পরে তিনি অনুশীলন পার্টিতে যোগদান করে একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেখানেও তিনি ইসলামবিরোধী কাণ্ডকর্ম দেখে বেরিয়ে আসেন এবং নিজস্ব পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির নাম দেয়া হয় আযাদ পার্টি। ১৯২৫-এ তিনি এই পার্টি গঠন করেন। এতে যোগ দেন মওলানা আকরম খাঁর জামাতা আবদুর রাজ্জাক (পরে ইনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন), কংগ্রেস নেতা সৈয়দ জামালউদ্দীন হাশেমী। সাহিত্য পত্রিকা 'নওরোজ' ছিল এই আযাদ পার্টির মুখপত্র। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। এই 'নওরোজ' পত্রিকাতে নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি সন্ত্রাসবাদী দলে মুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বিতর্ক বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন। পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে।

বে-নজীরের কবিতার পিছনে যেমন নজরুলের কাব্যপ্রেরণা, তাঁর বিদ্রোহের প্রেরণা আছে তেমনি আছে ভারতের পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং মুসলিম বিপ্লবীদের সংগ্রামী জীবন ও শাহাদাতের ইতিহাস। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭-এর মুসলিম মুজাহিদদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা না করলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলিমের প্রতিবাদ সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তভাবে তার একটি নকশাকে এমনিভাবে তুলে ধরা যায়—

১. ১৭৫৭-এর পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মীর কাসিমের যুদ্ধ।

২. ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহীশূরের হায়দর আলীর যুদ্ধ।

৩. ইংরেজের বিরুদ্ধে হায়দার-পুত্র টিপু সুলতানের যুদ্ধ।

৪. ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে ফকীর বিদ্রোহ।

৫. মোহনগিরির নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

৬. সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে ওহাবী আন্দোলন।

৭. তীতুমীর ওরফে মীর নিসার আলীর ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ-দালাল হিন্দু জমিদারবিরোধী আন্দোলন।

৮. ফরিদপুরের হাজী শরীয়তউল্লাহ্ এবং তৎপুত্র মোহাম্মদ মহসীন ওরফে দুদু মিঞার ফরাজী আন্দোলন।

৯. ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লব—ব্রিটিশরা যাকে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেছে।

সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয়। কিন্তু তার সুফল এই ছিল যে এর পরে উপমহাদেশ কোম্পানী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন তাঁর 'অগ্নিযুগের ইতিকথা'য় লিখেছেন—

> ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সম্পূর্ণ সার্থক না হইলেও এদেশে আনিয়াছিল এক বিরাট পরিবর্তন। সামান্য এক ব্যবসায়ী কোম্পানীর 'ডিরেক্টর বোর্ড' পরিচালিত শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া উপমহাদেশ ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক নৃপতির শাসনাধীনে আসিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে এক ঘোষণাপত্র জারী করিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। উক্ত ঘোষণাপত্রে মহারাণী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি সমব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হওয়াই

www.pathagar.com

হইল ভারতবাসীর চিত্ত-বিক্ষোভের কারণ—তারই ফলে হয় সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের অভ্যুদয়।

সন্ত্রাসী আন্দোলনকে নজরুল ইসলাম সমর্থন করেছিলেন। তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে সন্ত্রাসবাদীদের পত্রিকা বলে মনে করা হ'ত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭-এ প্রকাশিত তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। তিনি এই উপন্যাসকে দোষারোপ করেন। রবীন্দ্রনাথের ১৯৩৪-এ লেখা সন্ত্রাস-বিরোধী গল্প 'চার অধ্যায়'-এ সন্ত্রাসবাদকে 'ঈর্ষাসমন্বিত অযোগ্যতা', 'পাগলামির তাণ্ডব নৃত্য', 'কুৎসিত অক্টোপাশ জন্তু', 'রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সে'র 'অঙ্গারে আঁকা ছবি', 'নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাত' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ইংরেজের কুশাসন অত্যাচার সম্বন্ধে যারা অবহিত তারা এদেশ থেকে অহিংসমন্ত্র দিয়ে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব এটা বিশ্বাস করত না। সে-জন্যে এখানে ইংরেজ শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি এই অবিচারকে আমাদের হৃদয়-যন্ত্রণার কারণ বললে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন—

> ভারতে গণ-বিপ্লবের মূর্ত প্রকাশ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই গণ-বিপ্লবকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিলেও মূলত এই বিপ্লব শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা, পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণ প্রভৃতি সমস্তই তৎকালীন এ-দেশীয় নেতৃবর্গের মস্তিষ্কপ্রসূত। ইংরেজ শাসকবর্গ ও বনিক সমাজের শাসন শোষণ, অনাচার ব্যভিচার, দেশীয় রাজ্যগুলি অন্যায়ভাবে অধিকার, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি সমূলে ধ্বংস করার প্রয়াস ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলী ও জনগণকে যুগপৎ বিস্মিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। পাঞ্জাব, কাসি, সেতারা, নাগপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ছলে-বলে কৌশলে অধিকার করা হয়, রাজ্যচ্যুত নৃপতিবর্গের বৃত্তি বন্ধ করা হয়, অযোধ্যার পরম ধার্মিক বৃদ্ধ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌কে বিনাদোষে নির্বাসিত করা হয়। তদীয় রাজপ্রাসাদের ধন-সম্পদ, মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ সব কিছু লুণ্ঠন করিয়া আনা হয়।... এদিকে নীলকর কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচারে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইতে থাকে। বাঙালী বৌ-ঝির ইজ্জৎ সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হয়ে ওঠে।

এই অত্যাচারের ফলশ্রুতি যেমন নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের-বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণী মনসা', 'সন্ধ্যা', তেমনি বে-নজীরের 'বন্দীর-বাঁশী', 'বৈশাখী', 'জিন্দেগী' কাব্যগ্রন্থ। তবে নজরুল ইসলাম যতটা প্রত্যক্ষ, তীব্র, অনাবৃত বে-নজীর ততটা সম্মুখ সমর-সৈনিক নন। তবে সমকালীন বহু কবির বা সাহিত্যকর্মীদের শিল্পের জন্যে শিল্প মতবাদে তিনি যে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সংগ্রামী চেতনার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিলেন না—এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত তিনিই বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশ রাজত্বের একমাত্র কবি যিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ ছিলেন এবং সেই সঙ্গে কাব্যরচনা করেছেন। নজরুল ইসলামের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ; কিন্তু তিনি কোন সন্ত্রাসী দলের সদস্য ছিলেন না। এবং কোন সন্ত্রাসবাদী দল বা আযাদী পার্টি গঠন করেন নি। এ-ব্যাপারে বে-নজীর আহমদের ভূমিকা একক ও অনন্য। বিশ্বে অবশ্য মাও সেতুঙ, হো চি মিন-এর মত কিছু বিপ্লবী নেতা একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কাব্য রচনা করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে বে-নজীরের মত কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখি না যিনি মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সৈনিক হ'য়ে একটি পার্টি গঠন করে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

তাঁর আগে নজরুল ইসলাম এই ভূমিকা নিয়েছিলেন কিন্তু তা অতটা বাস্তবকর্মে নিয়োজিত থেকে নয়।

তবে বে-নজীর আহমদ যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকের মত একজন কবি-সৈনিকও ছিলেন এখন আমরা সেই কথা আলোচনা করব। বলা বাহুল্য এই কবি হিসাবে তাঁর অনন্য ভূমিকাটিও যে সামান্য বা সাধারণ ছিল না তাঁর 'বন্দীর বাঁশী', 'বৈশাখী', 'হেমন্তিকা' ও 'জিন্দেগী' এই চারটি গ্রন্থ পাঠে তা জানতে পারব।

বন্দীর বাঁশী-বৈশাখী

'বন্দীর বাঁশী' বে-নজীরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৩৩৯-এর ভাদ্র মাসে (১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে) এটি ৯১, আপার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন বে-নজীর আহমদ নিজে। মাওলানা আকরম খাঁর পুত্র মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ মোহাম্মদী প্রেসের পক্ষ থেকে ৯১, আপার সার্কুলার রোড কলকাতা থেকে বইটি মুদ্রিত হয়। বে-নজীর আহমদ বইটি উৎসর্গ করেন এ্যাডভোকেট রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা পঙ্কজিনী দেবীকে। 'দুটি কথা' নামে বইটির ভূমিকা লেখেন স্বয়ং কবি বে-নজীর আহমদ এবং এর মুখবন্ধ লিখেছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বইটিতে মোট ৬টি দীর্ঘ কবিতা স্থান পায়। (১) 'জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ' (৮ পৃষ্ঠা) ; (২) 'এ মোর পুরস্কার' (৪ পৃষ্ঠা) ; (৩) 'ঊষার আলোর রথে জাগে ওই দিগন্তের পারে' (১৬ পৃষ্ঠা) ; (৪) 'পথের বাঁশী' (৪ পৃষ্ঠা) ; (৫) 'তরুণ প্রশস্তি' (৮ পৃষ্ঠা) ; (৬) 'মানব-বন্দনা' (১৬ পৃষ্ঠা)।

প্রথম কবিতা 'জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ' অক্ষর-বৃত্ত ছন্দে লেখা হয়েছে। একই ছন্দে লেখা 'ঊষার আলোর রথে জাগে ওই দিগন্তের পারে' ও 'তরুণ-প্রশস্তি' ; স্বরবৃত্তে লেখা 'এ মোর পুরস্কার' ও 'পথের বাঁশী'। আর মাত্রাবৃত্তে রচিত 'মানব-বন্দনা'। প্রতিটি ছন্দেই কবির মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ছন্দের উপর প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের। নজরুলের প্রভাবটা একটু বেশি। নজরুলের 'পূজারিণী', 'ঝড়', 'সিন্ধু' প্রভৃতি কবিতার ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ঐ সব কবিতায়। তাঁর কবিতায় যেসব বিষয়গুলি আলোচ্য বিষয় হয়েছে সেগুলিকে তারুণ্য, স্তাবকতা, অন্যায়, বিরোধিতা, নারীর প্রতি অনুদারতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিরোধিতা, বর্ণবৈষম্য বিরোধিতা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। এক কথায় সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয়। নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ কবিকে যে বিশেষভাবে আন্দোলিত, অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল সেটা বোঝা যায়। স্বল্প কথায় বলা যায় 'বন্দীর বাঁশী' যেমন নজরুলের 'বিষের বাঁশী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তেমনি তাঁর 'সাম্যবাদী'র গণতান্ত্রিক উদারতার বাণীকে, মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার্পণের বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে অবশ্য নজরুলের ছন্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যতটা স্পষ্ট ততটা স্পষ্ট নয় চিত্রকল্পের কবি নজরুল। যদিও উপমা এ কাব্যে দুর্লভ নয়। তবে রূপক ও অতিশয়োক্তি নির্মাণে মাঝে মাঝে তাঁর কুশলতা লুকিয়ে থাকে নি। এই কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে নজরুল ইসলামের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নজরুল বলেছিলেন—

www.pathagar.com

মৃণালে কন্টকের জ্বালা সহিয়া পদ্মফুল যেমন সূর্যের স্তব করে, এ যেন তেমনি। দুর্যোগের নিবিড় নিশীথে দুঃসাহসিক যাত্রীর মুখে আনন্দ-ভৈরবীর সুর—সত্য সত্যই বিস্ময়কর।

বে-নজীরের কাব্যে বন্দীর আকুতি ; মুক্তির দিব্য বাসনা, সৌন্দর্যের অসীম ক্ষুধা যে ভাষা, যে সংযম লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোনো নবীন কবির পক্ষে বিস্ময়কর।

বলা বাহুল্য মুক্তি-ব্যাকুলতা 'বন্দীর-বাঁশী'র মূল সুর। কিন্তু তাঁর বক্তব্য শুধু কারাবন্ধন থেকে মুক্তি নয়—তারও চেয়ে বেশি কিছু। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিমদের শুধু পরাধীনতা মুক্তি নয়, তাদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা জীবনের কূপমণ্ডুকতা থেকে, উপলব্ধির সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিরও একটা ব্যাপার ছিল। বে-নজীর যখন বলেন—

অসীম ওরে অসীম
কোথায় দূরে কোথায় তুমি চলো,
গোপন তব গহন বাণী
বারেক শুধু বারেক মোরে বলো।
সীমার বাধা ভাঙবে কবে
কোথায় দূরে কোন সাগরের তীরে ;
মুক্তি-সুধা আসবে সে কি
বাঁধন-গলা তপ্ত অশ্রুনীরে?

তখন সেটা শুধু কারাবন্দি মানুষের মুক্তি কামনার চেয়ে অতিরিক্ত গভীর কিছু আমাদের দেয়। তখন তা বলে দেয় সাধারণ স্বভাব-কবির চিন্তা সীমায় তিনি খাঁচা-বন্দি নন।

নজরুল অনুসরণে সম্ভবত তিনি হিন্দু পুরাণ ব্যবহারেও দ্বিধান্বিত ছিলেন না। সে জন্যে শিব, কৃষ্ণ, রথ, বলরাম, কুরুক্ষেত্র শঙ্খ অনুসৃত প্রভৃতি পুরাণ অনুসৃত শব্দ ব্যবহারকে তিনি কুণ্ঠার কারাগারে বন্দি করেন নি। অবশ্য পরবর্তী জীবনের বে-নজীরের সঙ্গে বা পরিণত বে-নজীরের সঙ্গে এই বে-নজীরের পার্থক্য অনেক।

'বন্দীর বাঁশী'র পরবর্তী বই 'বৈশাখী'। এখানে আবেগমত্ততা বা অতিকথন অপেক্ষাকৃত কম। দীর্ঘ কবিতা লেখার প্রবণতাও কমে এসেছে। পুস্তকাকারে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫১-তে (১৯৪৪)। এর ১ম সংস্করণ ১. মৃত্যু কোথা বল, ২. আমার সাগরে জেগেছে উর্মি, ৩. তুমি দাও মোরে আশীর্বাদ, ৪. হে ভয়াল চাহি তব ভয়াল অভয়, ৫. পৃথিবী আরক্ত আজি, ৬. কঙ্কাল, ৭. চরণে বাজে জিঞ্জির, ৮. ব্ল্যাক আউট, ৯. মৃত্যুর নিশীথ শেষে, ১০. যাত্রী, ১১. পথের সুর, ১২. ঈগল, ১৩. ওপারে আলোয় শুনি গান, ১৪. জাগে বজ্র ঝঞ্ঝার বায়ু, ১৫. হে তরুণ যাত্রীদল, ১৬. রৌদ্র দগ্ধ বসুন্ধরা, ১৭. পৃথিবী শিহরে আজি, ১৮. ঝড়ের মাতন জাগল আজি এবং ১৯. বৈশাখী এই উনিশটা কবিতা ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও ৭টি কবিতা সংযুক্ত হয়। এগুলি হল ১. আজ ও কাল, ২. নূতন বৈশাখ, ৩. বেগ দাও, বেগ দাও আমার ডানায়, ৪. আজকে শুধু মেঘের স্তর, ৫. আজকে আমার মন ভোলায়, ৬. হে যুগান্ত যাত্রাপথে ও ৭. আহ্বান। কবিতাগুলো ১৩৫৩ (১৯৪৬) থেকে ১৩৬৩ (১৯৫৬) এই দশ বছরে মিল্লাত, মহাসড়ক, মোহাম্মদী, দিলরুবা, খেলাঘর ও মাহে-নও-তে ছাপা হয়। এর একটি মাত্র কবিতা বিভাগ-পূর্বকালে ১৩৫৩ (১৯৪৬)-তে 'মিল্লাতে' ছাপা হয়। উল্লেখ্য মহাকাব্য ছাড়া দীর্ঘ কবিতা লেখার প্রবণতা ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে আসে। ফেরদৌসী

মাত্র কবিতা বিভাগ-পূর্বকালে ১৩৫৩ (১৯৪৬)-তে 'মিল্লাতে' ছাপা হয়। উল্লেখ্য মহাকাব্য ছাড়া দীর্ঘ কবিতা লেখার প্রবণতা ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে আসে। ফেরদৌসী ছাড়া ফারসি যেসব কবির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছে সেই খৈয়াম, হাফিজ ও রুমী কেউ দীর্ঘ কবিতা লেখার কবি নন। বাংলায় আবেগাপ্লুত দীর্ঘ কবিতা বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এঁরা সবাই লিখেছেন। বে-নজীর আহমদ এঁদেরই অনুসরণ করে 'বন্দীর বাঁশী' লেখেন। তাঁর সমকালে এই ধরনের দীর্ঘ কবিতা লেখার প্রচলন ছিল। এমনকি ত্রিশের দশকের জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখকেও দীর্ঘ কবিতা লিখতে দেখা যায়। চল্লিশের দশকের সুভাষ, সুকান্ত, ফররুখ আহমদ প্রমুখও এর থেকে অব্যাহতি পান নি। নজরুল ইসলাম পরবর্তীকালে সঙ্গীত লিখতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারের মধ্যে কবিতাকে আবদ্ধ করেন। অবশ্য মধুসূদন দত্ত যে চতুর্দ্দশপদী কবিতার আমদানি করেন। বাংলাদেশে সেই চোদ্দপদী কবিতা নিরুল্লাসের উদাহরণ হয়ে অনেক কবিকে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই আঙ্গিককে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বে-নজীরকেও দেখা যায় 'বৈশাখী'তে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মত্ত হয়েও ঐ চতুর্দশপদীর পদে আত্মসমর্পণ করেছেন। 'রৌদ্রদগ্ধ বসুন্ধরা', 'পৃথিবী শিহরে আজি', 'পৃথিবী আরক্ত আজি' এই তিনটি চোদ্দপদী সনেট বা চতুর্দশপদী তার উদাহরণ। বেণীবন্দি বা খোঁপাবন্দি চুলের সুন্দরীর যে ভিন্ন আকর্ষণ আছে বে-নজীর সেই উপলব্ধিতে জেগেছিলেন বলে 'বৈশাখী'র উদ্দাম চলার মধ্যেও তিনি ছন্দ-সংহতির উদাহরণ রেখেছেন।

এ কাব্যেও বাংলায় প্রচলিত তিনটি ছন্দ—স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত রচনাতে বে-নজীর অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তখনও তাঁর কাব্য-শরীর থেকে রবীন্দ্র বা নজরুলছন্দের আদল সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। অস্পষ্ট ছায়ার মত ক্ষীয়মান গন্ধের মত তারা 'বৈশাখী'র পংক্তিতে পংক্তিতে সঞ্চারিত। তাই আমরা যখন পড়ি—

আমার ধরাতে জেগেছে তপ্ত বালুকা ঢেউ
মরুর শ্বাস—
সাহারা জহর সাইমুম ধূম দেখেছ কেউ
লু-এর ত্রাস !
কুটিল হাস
জেগেছে আবার বহ্নি-পাহাড়
শুষিয়া সুষমা বিন্দু লেশ
স্নেহের সিন্ধু উষার শুষ্ক, শ্যামল শস্য ভস্ম শেষ—
লোভ দাবাগ্নি বাড়ব-বহ্নি গ্রাসিয়াছে সারা বিশ্বদেশ ;

তখন ভাষার বেণীতে তাঁর বুদ্ধির বন্ধনকে নতুন বৈশিষ্ট্যের রূপে দেখতে পাই। ঐতিহ্যের স্বীকৃতি গায়ে মেখেও যে পুরাতনের নিরুজ্জ্বলতাকে উপেক্ষা করা যায় এ কবিতায় সেই স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন রেখেছেন বে-নজীর। বস্তুত এই কাব্যগ্রন্থে তিনি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারকে জোড় অশ্বের মত তাঁর কাব্যরথে সংযুক্ত করতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

[পনর]

এখানে আমরা তাঁর সেই চোখকে দেখেছি যা সমাজ ব্যাধিকে শনাক্ত করায় পারদর্শী। সুতরাং তাঁর এ-কাব্যে যেমন প্রতিবাদী কণ্ঠের বলিষ্ঠতা দেখি, রাজনীতি সচেতনতা দেখি, স্বপ্ন ও আশাবাদ দেখি তেমনি দেখি সমস্যা সমাধানের জন্য বৈপ্লবিক চেতনা, শক্তি-দর্শনের প্রতি আনুগত্য। জগৎ জুড়ে মানুষের প্রতি যে অন্যায় অবিচারের স্টীম রোলার চলছিল সেই উপেক্ষিত অবহেলিত অত্যাচারিত ও নির্যাতিতের পক্ষ নিয়ে বে-নজীরকে দেখি সংগ্রামী বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করতে যিনি সৃষ্টির জন্যে ধ্বংসকে অনিবার্য উপায় বলে মনে করেন। বৈশাখ তাঁর চোখে শুধু ধ্বংসের প্রতীক নয়, নতুন সৃষ্টির প্রতীক।

'বৈশাখী' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের আলোচনায় এই বক্তব্যসমূহ আসতে পারে। বিংশ শতাব্দীর একটি মর্মান্তিক বিষয় হল বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতির সঙ্গে অপরিমেয় মনুষ্যত্বের অপমান। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে, পররাজ্য গ্রাসের লোভের সঙ্গে শোষণ বঞ্চনার দুর্বার প্রতিযোগিতায় অসহায় মানুষের লাঞ্ছনার কাহিনী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ শুধু নয় তার শেষার্ধও এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব সাহিত্যে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, যা আমরা হুইটম্যানে পাই, শেলী, বায়রনে পাই, ইকবালে এবং বিশেষ করে নজরুল ইসলামে পাই সেই বিদ্রোহের সুর প্রতিধ্বনির রূপে বে-নজীরের 'বৈশাখে' রূপায়িত।

বে-নজীরের কাব্যের বৃহত্তর অংশ জুড়ে নজরুল প্রবলভাবে বিরাজিত—ছন্দে, বাকরীতিতে, ভাষায়, বৈপ্লবিক চেতনায়, আশাবাদিতায়, জীবন, যৌবন ও তারুণ্য বন্দনায়।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রাণশক্তিরূপে বিরাজ করছিল। নজরুলের কাছ থেকে তিনি যেমন অর্জন করেছেন শক্তির আরাধনা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি অর্জন করেছেন গতি-বন্দনা। সমাজ-সমস্যার ব্যাধিতে তিনি নাস্তিক আস্তিক্যের পার্থক্য দেখেন নি। তিনি লিখেছেন—

> অস্তিবাদী চিন্‌লো শুধু চুল পোষাক,
> নাস্তিবাদী শরীর পূজার বাজায় ঢাক
> বিভেদ কই?

যে-জন্যে লেবাছ পূজার সব বেদিকে ছেদ করতে দীপ্ত ধারাল 'ঈমান-অসি' ব্যবহার করতে চান বে-নজীর—হাতে নিতে চান 'ধ্বংস ভয়াল গুর্জ'।

প্রাচীনতার প্রতি, অবশ্যই সৃষ্টিশীল নয়, সৃষ্টিশূন্য অতীতের প্রতি কবির অশ্রদ্ধা ; নব অঙ্কুরিত জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ। তাই তিনি বলেন—

> যুগ-শতাব্দীর সঞ্চিত সব আস্তাকুঁড়
> শহীদ সেনার লহুর সোঁতে হোক না দূর !

যে বর্তমানে তিনি বাস করেছেন সে ত প্রত্যাশিত বর্তমানের মানবতা নয় সে-জন্যে কবির তা কাম্য নয়। তাই তিনি বলেন—

> আকাশ-জোড়া আজকে শুধু মেঘের স্তর
> আজকে শুধু রক্ত-লোহিত তুফান-ঝড় ;

তাঁর ধারণা মানবতার সূর্য উঠলে বা তার জয় হ'লে দৈত্যশক্তি মেঘের অবসান হবে। 'বৈশাখী'র শরীর-অন্তর জুড়ে কবির এই মনস্কামনা রূপ লাভ করেছে।

www.pathagar.com

'বৈশাখী'র কোন কোন কবিতায় ১৩৫০ (১৯৪৩)-এর দুর্ভিক্ষের ছবি আঁ যেটা সুকান্ত, ফররুখ আহমদের দুর্ভিক্ষের উপর লেখা কবিতায় আমরা দেখতে দেখি জয়নুলের রেখাচিত্রে।

জিন্দেগী

বে-নজীরের জীবিতাবস্থায় "বন্দীর বাঁশী" (১৩৩৯-১৯৩২) ও 'বৈশাখী' (১৩৫১-১৯৪৪) প্রকাশিত হয়। 'জিন্দেগী' নামে তিনি তৃতীয় একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। তিনি ৯টি পর্বে এই কাব্যকে ভাগ করেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তাঁর জীবিত কালে এটি আর প্রকাশিত হতে পারে নি। লক্ষ্য করার বিষয় যে তাঁর প্রথম দুটি কাব্যের সঙ্গে এই কাব্যের অমিল ও পার্থক্য অনেক। প্রথম যে পার্থক্যটি চোখে পড়বে সেটি এর ভাষার। 'বন্দীর-বাঁশী' ও 'বৈশাখী' ছিল তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সমৃদ্ধ। 'বন্দীর-বাঁশী'র প্রায় ষাট ভাগ শব্দ ছিল তৎসম জাত। যেখানে 'আরবী-ফারসী' শব্দের কোন চিহ্ন ছিল না প্রায়। 'বৈশাখী'ও প্রায় তেমনি। বিশেষ করে প্রথম সংস্করণের 'বৈশাখী'র ভাষার সঙ্গে 'বন্দীর-বাঁশী'র ভাষার কোন পার্থক্য নেই। সেটা ছিল মাইকেল-রবীন্দ্র-নজরুলের মিশ্রণ। কিন্তু 'জিন্দেগী'র ভাষা ঠিক বিপরীত। এখানে মাইকেল রবীন্দ্রের প্রায় অস্তিত্বই নেই। এখানে যেমন বিষয়-চিন্তায় মুসলিম সমাজ চিন্তা অগ্রাধিকার পেয়েছে তেমনি অগ্রাধিকার পেয়েছে তথাকথিত মুসলমানী বাংলা। আমি তথাকথিত মুসলমানী বাংলা বলছি এই জন্যে যে আমি মনে করি সংস্কৃত শব্দকে বাংলা শব্দ মনে করলে সমাজে ও সাহিত্যে প্রচলিত আরবি ফারসি শব্দকে বিদেশী নয় বাংলা শব্দ বলে মনে করতে হবে। "জিন্দেগী"তে বে-নজীর এক আরবি-ফারসি বহুল ভাষা ব্যবহার করেছেন সত্যেন-মোহিতলাল-নজরুল-ফররুখের মত।

"জিন্দেগী"তে বে-নজীর মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবাদী। মুসলিম জাতীয়তাবাদী, ইসলামি আদর্শ প্রচারক। তিনি প্রারম্ভ জীবনে যে মানবতাবাদী জীবনে আকৃষ্ট ছিলেন সেই সাম্যবাদী মানবতাবাদকে তিনি ইসলামি সাম্যবাদের অন্তর্গত ভেবেছিলেন। তবে "বন্দীর বাঁশী"তে তাঁর তৎসম শব্দের অতি ব্যবহার এবং পুরাণ ব্যবহার "জিন্দেগী"তে এসে প্রায় শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে অগ্রজ নজরুলকে অনুসরণ করলেও পরবর্তীকালে অনুজ ফররুখের তিনি অনুসারী হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অনেক মুসলিম চিন্তাবিদদের মত তাঁর মনে হয়েছিল বাঙালি হিন্দুর বাংলা আর বাঙালি মুসলিমের বাংলা ভিন্ন হওয়া উচিত। নবোদিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের বাংলা স্বতন্ত্র মুসলিম সাংস্কৃতিক চরিত্রের বাংলা হবে এটাই ছিল তাঁর কাম্য। এই বিশ্বাসে বা ধারণায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে আরবি ফারসি শব্দ সমন্বিত বা শব্দ মিশ্রিত ভাষা নির্মাতা হওয়ার চেষ্টা করেন তাঁর 'জিন্দেগী' কাব্যে তারই চিহ্নিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত এ-জন্যে তাঁর কাব্যের শিল্পসৌন্দর্য কতটা ব্যাহত হল সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেননি। তিনি ভেবেছিলেন বাঙালী হিন্দুরা যদি সংস্কৃত (যেটা বহিরাগত ভাষা) ভাষাকে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম দিয়ে বাঙলা করে তুলতে পারেন তবে পুঁথি সাহিত্যে, বাঙালি মুসলিম সমাজে, অহর্নিশি প্রচলিত আরবি ও ফারসি শব্দকেও বাঙলা করে তোলা সম্ভব। তবে "জিন্দেগী"তে তাঁর এই নতুন প্রচেষ্টা সাফল্য-উজ্জ্বল হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত এ-ব্যাপারে তিনি সময় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন। আর নজরুলের প্রতিভা-শক্তি এবং আরবি-ফারসি শব্দের সহজ-

www.pathagar.com

স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-শক্তি সকলের সৌভাগ্যের দীপ-শিখা হ'য়ে জ্বলে ওঠে না। নজরুলের কবিতা-প্রশংসায় মোহিতলাল যে কথাটা বলেছিলেন, 'ভাষা যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে।' বৈশাখীতে তাঁর তৎসম শব্দের বা সেই শব্দমণ্ডিত ভাষা তাঁর ভাবের রূপ-চিত্রায়নকে সাহায্য করেছিল 'জিন্দেগী'তে তা করেনি। কিন্তু কবিতার জন্য তিনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিতে চান নি। এই কাব্যগ্রন্থ পড়তে পড়তে মনে হয় সুকান্ত যেমন বলেছিলেন— 'তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট'—তেমনি বে-নজীর আহমদ বলতে পারতেন, আমি কবি সত্য তার চেয়ে বড় সত্য আমি মুসলমান। 'জিন্দেগী'তে ইসলাম তাঁর কাছে একমাত্র মুক্তির উপায়, মুক্তি-দর্শন হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য তিনি মূর্খতা সম্পৃক্ত ধর্মান্ধতাকে আমল দেন নি। স্বার্থপর, যুদ্ধবাদী মোল্লাতান্ত্রিক মৌলবাদের তিনি ধর্ম, ব্যবসায়ী হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেন নি। 'বন্দীর-বাঁশী' ও 'বৈশাখী'র বে-নজীরের 'জিন্দেগী'র কবিতে উত্তরণ বা আত্ম-অতিক্রম বলে দেয় বে-নজীর নামমাত্র স্বভাব কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সন্দীপ্ত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দায়িত্বশীল সমাজ-সচেতন কবি। তাঁর কাব্যভাবনা ও কাব্যরূপের বিবর্তন তাঁকে লাটিম-স্বভাবের কবিতে পরিণত করে নি। বরাবরই তিনি ব্যক্তি-প্রীতির উর্ধ্বে জাতীয়-প্রীতিকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর সে ভাবনা ক্রমে একটি চিহ্নিত দর্শনের প্রতি আনুগত্য দান করেছে।

হেমন্তিকা

মোট ৮৮টি কবিতা সহ 'হেমন্তিকা' নামে বে-নজীরের একটি কবিতার বই ২০০০-এ প্রকাশিত হয়েছে। কবি-পুত্র মালেক মোহাম্মদ মীনার এই বইটি আমাকে দিয়েছে। এর চারটি ফর্মা ছাপা হয়েছিল কবির জীবিত সময়ে।

'জিন্দেগী'র মত এই কাব্যগ্রন্থটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক নয়। এতে যেমন বিভাগ-পূর্বকালের কবিতা আছে তেমনি আছে বিভাগোত্তর কালের কবিতা। ১৯৪১-এ লেখা 'কে দিলো সে ডাক', 'ধরণীর কামনা কিষাণ', 'দিগঙ্গনের দিগ্বলয়ে', 'সুবর্ণ মৃগের মায়া', ১৯৪৫-এ লেখা 'নূতন চাঁদের কিশ্‌তী' পাঁচটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। বাকী কবিতাগুলি ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪-এর মধ্যে রচিত। 'হেমন্তিকা' নামে কোন কবিতা এর মধ্যে নেই। কবি এর নাম 'হেমন্তিকা' রাখার হয়ত কোন কারণ আছে। কারণ বে-নজীর আহমদের 'বন্দীর-বাঁশী', 'বৈশাখী' ও 'জিন্দেগী' কাব্যে যে মনের পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তাঁকে একজন চিন্তাশীল কবি বলে মনে হয়েছে— যিনি একই সঙ্গে সমাজ, ধর্ম, জাতি, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সচেতন। তাঁর লেখাতে তাঁর চিন্তার বিবর্তনও লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর প্রথম দিককার লেখায় তাঁকে গণতন্ত্রমনা রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট বলে মনে হলেও পরবর্তীকালে তাঁকে মনে হয়েছে হিউম্যানিস্ট ইসলামিস্ট। তাঁর 'জিন্দেগী' যেটা এই সংকলনভুক্ত তা ইসলামি চিন্তাদর্শ ও সংস্কৃতির দ্বারা আকীর্ণ। 'হেমন্তিকা'য় এই অবিমিশ্র ইসলাম ও মুসলিম প্রেমিককে দেখি না। যেখানে আছেন বিমিশ্র বে-নজীর। এখানে যেমন আছে 'নয়া তারানা', 'নয়া সয়লাব', 'নূতন দিনে', 'নূতন চাঁদে'র কিশ্‌তী'র মত ইসলামি ঐতিহ্যধর্মী কবিতা, ইকবালীয় চিন্তাধর্মী 'খুদী', 'কাফেলা' ও 'হে কাফেলা চলো'র মত কবিতা তেমনি আছে রাবীন্দ্রিক চিন্তা বলয়ের কবিতা—'পথিক', 'যাত্রী', 'মানস-মরাল', 'চির পথ', 'হে নব যাত্রীদল'-এর মত কবিতা। এ গ্রন্থে বিশেষ করে বে-নজীরের চির-চলিষ্ণু 'চির ব্যাকুল,

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসু বে-নজীরকে আমরা দেখতে পাই। যিনি সুদূরের ডাক শুনে চঞ্চল, অজানাকে জানার ব্যাকুলতায় বলাকার মত আকাশচারী। 'অন্তরালে', 'মুসাফির', 'কাফেলা', 'হে নব যাত্রীদল', 'মুখর মানস', 'পথিক', 'মানস মরাল' প্রভৃতি কবিতায় এই অজানাকে জানার যাত্রীকে আমরা দেখতে পাই। 'বন্দীর-বাঁশী' এবং 'বৈশাখী'র বিদ্রোহী ও বিপ্লবী বে-নজীর এখানে একেবারে অনুপস্থিত তাও মনে হয় না। 'অনির্বাণ শিখা'র মত' কবিতায় মানব-মুক্তি কামনায় উদ্গ্রীব আন্তর্জাতিক কবিকেও এখানে দেখা যায়। যিনি লিখেছেন—

প্রাচ্যের প্রাচীর ছাপি প্রাণ-বন্যা ওঠে উছলিয়া
বিদীর্ণ বেদন ঊষা জীর্ণ আশা ভয়ার্তের বুকে
সৃষ্টির আনন্দ-রসে রচি সিংহ-শার্দুলের হিয়া
উত্তরি শতাব্দী পথ ঝঞ্ঝাবেগে চলিছে সম্মুখে।
কৃষ্ণকায় মহাদেশ কৃষ্ণতর জনসংঘ সাথে
দুর্গম অরণ্য আর গিরি-ঘেরা মরু-দুর্গ পাড়ি
যুগান্ত দীপালী হতে ছিল বহু শতাব্দী পশ্চাতে,
অন্যের আহ্বানে সেও আজ হেরি উঠিছে শিহরি!
মেঘনা-পদ্মার বুকে আর গঙ্গা-সিন্ধুর কল্লোলে
নূতন জীবন-বন্যা ক্ষণে ক্ষণে দেয় আজ সাড়া,
দজলা ফোরাত ঘেরি উচ্ছলিত প্রাণ-উর্মি দোলে,
পিরামিড শীর্ষ ছাপি নীলনদ আজ আত্মহারা।
হোয়াংহোর পীত বুকে পীত-চর্ম ড্রাগন-সুতেরা
অহিফেন নেশা ছাড়ি কোটি কণ্ঠে তোলে জয়ধ্বনি;
সে বজ্র আরাবে কাঁপি লুপ্ত যত শৃঙ্খলের ঘেরা;
সে ডাকে সুদূর প্রাচী আজ পেলো মুক্তির শরণী।

উল্লেখ্য ১৯৪১ ও ১৯৪৫-এ লেখা পাঁচটি কবিতা বাদে ১৯৪৭-এর পরবর্তী যেসব লেখা এখানে আছে সেগুলির ছন্দ ও ভাষা 'বৈশাখী'র বে-নজীরকে মনে করিয়ে দেয়। ছন্দ ও ভাষার উপর যাঁর দখল মুমূর্ষুর ক্লান্তিতে প্রকাশ পায় নি। এখানেও অক্ষর-বৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ সমান যোগ্যতায় ব্যবহৃত। স্খলনের সংখ্যা দুর্লভ। তবে 'বৈশাখী'র উদ্দীপনা যেমন কম; উচ্ছ্বাস তেমনি সংযত। 'বন্দীর বাঁশী' ও 'বৈশাখী'তে দীর্ঘ কবিতা লেখার যে প্রবণতা সেটাও এখানে পরিণত মানসের বল্গায় সংহত।

এই সমগ্র রচনায় বে-নজীরের দু'টি কাব্য 'বন্দীর-বাঁশী' ও 'বৈশাখী' মাত্র প্রকাশিত। বাকি দু'টি কাব্যগ্রন্থের রচনা সমকালীন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘায়ু বে-নজীরও এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। প্রচার-কুণ্ঠ হওয়াতে তিনি এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন নি। সেই জন্যে পাঠকেরাও তাঁর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। এ-জন্যে বর্তমান সংকলন থেকে বে-নজীরের একটি পূর্ণ পরিচয় বাংলাদেশী ও বাঙালি সাহিত্য-পাঠকের সামনে উপভোগ্য সাহিত্য পরিচয় হিসেবে পরিবেশিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

বে-নজীর আহমদের অধিকাংশ গদ্য সাধু ভাষায় লিখিত। আমি যে কটি গদ্য লেখা বা প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পেরেছি তার একটি বাদে—মোহাম্মদীতে প্রকাশিত 'অক্রূর চন্দ্রের কাব্য সাধনা' (১৯৬০)—সব কটিই সাধু ভাষায় লিখিত। মনে হয় এই ধাঁচে লেখায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তবে তাঁর লেখায় রুচির আভিজাত্যের সঙ্গে উন্নত মানস-দৃষ্টির সংযোগ ঘটেছে। কোন হাল্‌কা বিষয় ও চিন্তায় তিনি সংক্রমিত হন নি।

বে-নজীরের কাব্যবিচারের পূর্বে তাঁর মানস রূপের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন। তাঁর সেই মানস বিবৃত আছে তাঁর স্বল্প কয়েকটি প্রবন্ধে — 'ইসলাম ও কমিউনিজম', 'মধ্য এশিয়ার নারীজাগরণ', 'ইকবাল কাব্যে স্বদেশ প্রেম', 'বিপ্লব সাধনায় কামাল', 'সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব', 'নজরুলকে যেমন দেখিয়াছি ও জানিয়াছি' এবং 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি' নামক প্রবন্ধ সমূহে।

তাঁর প্রবন্ধ পাঠেই তাঁর জ্ঞানের গভীর সীমাটা সহজে নির্ধারণ করা যায়। পুরাণ, ইতিহাস (দেশ, বিদেশ), শাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একজন সাংবাদিকের বিশেষ করে একজন কবি ও সাহিত্যিকের যে ধরনের জ্ঞানের প্রয়োজন বে-নজীরের তা ছিল 'মধ্য এশিয়ার নারীজাগরণ' ইকবাল ও নজরুলের উপর লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলিতে মনীষাধর্মী জ্ঞানের পরিচয় বিধৃত আছে। কিন্তু দুটো প্রবন্ধ তাঁর সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য-চিন্তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তার একটি ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড ঢাকা কর্তৃক ১৯৫৬-এ প্রকাশিত এস. এস. সি পরীক্ষার (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকৃত সাহিত্য সংকলনের (বাংলা সাহিত্য গদ্যাংশ ও পদ্যাংশের) ভূমিকা ও 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি' (নজরুল একাডেমী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ষা সংখ্যায় ১৯৭০-এ প্রকাশিত) এই দুই প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস জ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাসের জন্য সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানের যে সূক্ষ্ম পরিচয় দিয়েছেন এবং যে-বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে ধরা পড়েছে তাঁর যথার্থ গবেষকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। সীমাবদ্ধ স্থানের দিকে লক্ষ্য রেখেও বাংলা সাহিত্যের ও তার ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন ও পরিণতির একটি চৌকষ চিত্র নির্মাণ করে তাঁর সাহিত্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অকৃপণ-চিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেছেন—

> এই মুখবন্ধে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা ব্যাপারে ডক্টর শহীদুল্লাহ্, ডক্টর এনামুল হক, মরহুম আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুকুমার সেন, শ্রীযুত তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস প্রমুখ বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ চলিত বাংলা ভাষার বিভিন্ন শাখার ইতিহাস এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সুধীজনের প্রবন্ধাদি হইতে বিবিধ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পুস্তকের প্রবন্ধ পরিচিতি ও টিকা ইত্যাদি রচনায় বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক লিখিত সমালোচনা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধও প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট সহায়তা দান করিয়াছে। (সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত লেখক পরিচিতি, প্রবন্ধ ও কাব্য পরিচিতি, শব্দার্থ ও টিকা-টিপ্পনি এই সংকলনে গ্রন্থিত করা হল।)

বে-নজীরের 'জিন্দেগী' যার পাণ্ডুলিপি তাঁর দ্বারা প্রস্তুতকৃত—এই সংকলনে দেখলে মুসলিম ও ইসলামী চিন্তাদর্শন ও তার সংস্কৃতির রূপ-সমন্বিত নতুন সাহিত্য চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বে-নজীরকে আমরা চিনব। যিনি পাকিস্তান-পরবর্তী নব বাঙালী মুসলিম সমাজের ভাষার

www.pathagar.com

স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি উজ্জ্বল ভাবনার দিকে আমাদের চেষ্টা করেছেন। তার শিল্পসৃষ্টি ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেকের ভ্রূ-কুঞ্চিত জিজ্ঞাসা উ তার মধ্যে বিধৃত চিন্তা অনেককে নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

বে-নজীর আহমদ সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিলেও এবং প্রথম দিকে সেই মতবাদে ী হলেও তিনি যে একজন সাধারণ সন্ত্রাসবাদী সদস্য ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন সচেতন চিন্তাশীল মুজাহিদ তার পরিচয় আছে তাঁর লেখা প্রবন্ধ সমূহে। তাঁর 'ইসল ও কমিউনিজম', 'বিপ্লব সাধনায় কামাল', 'ইক্‌বাল কাব্যে স্বদেশপ্রেম', 'মধ্য এশিয়ায় নারীজাগরণ', 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি', 'সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব' ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি যে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন নেতৃত্বদানের ক্ষমতাসম্পন্ন এক চেতন সত্তা। তাঁর কাব্যগ্রন্থে তাই এক সাধারণ কবি নন, একজন দর্শন চিন্তা-সচেতন দেশ ও জাতিপ্রেমিক কবির পরিচয় ফুটে উঠেছে। মৌলিক কাব্য রচনায় তিনি হয়ত ইকবাল, নজরুল এমনকি ফররুখের সমপর্যায়ের কবি নন কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তিত গ্রহসমূহের অনুরূপ কবিদের অনেকের সমকক্ষ ত বটেনই হয়ত বা তাঁদের অনেকের চেয়ে বড়।

আজ সময় এসেছে বে-নজীর আহমদের মত কবিদের নতুন করে স্মরণ করার। বাস্তবিকই তাঁরা বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার যথার্থ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। তাঁদের সবার রচনা সংগ্রহ করে তা জাতির হাতে না তুলে দিলে তাঁদের সাহিত্য রত্নাগারের স্বরূপ জানার সৌভাগ্য তাদের হবে না এবং আত্মপরিচয়ের গৌরব লাভ করা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। সে জন্যেই আমি এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাব। এই গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী বাংলাদেশী পাঠকদের অনেক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার একটি শূন্যতা পূরণ করে জাতীয় দাবির মর্যাদা দিয়েছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রাক্তন উপপরিচালক জনাব নূরুল ইসলাম এবং বর্তমান উপপরিচালক জাহিদুর রহমান যে আন্তরিকতা নিয়ে সহযোগিতা করেছেন তা কেবল ধন্যবাদে নিঃশেষ হওয়ার মত নয়।

ঢাকা
১০.০২.২০০৭

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ
১৯৫/১/এ শান্তিবাগ,
ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বন্দীর বাঁশী	১
জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ	৭
এ মোর পুরস্কার	১১
ঊষার আলোর রথে জাগে ওই দিগন্তের পারে	১৩
পথের বাঁশী	২১
তরুণ–প্রশস্তি	২৩
মানব–বন্দনা	২৬
বৈশাখী	৩৫
মৃত্যু কোথা বল্‌	৩৯
আমার সাগরে জেগেছে ঊর্মি	৪২
তুমি দাও মোরে আশীর্বাদ	৪৫
হে ভয়াল চাহি তব ভয়াল অভয়	৪৫
পৃথিবী আরক্ত আজি	৪৭
কঙ্কাল	৪৮
চরণে বাজে জিঞ্জির	৪৯
ব্ল্যাক–আউট	৫৯
মৃত্যুর নিশীথ শেষে	৬১
যাত্রী	৬২
পথের সুর	৬৪
ঈগল	৬৬
ওপারে আলোর শুনি গান	৬৬
জাগে বজ্র ঝঞ্ঝাবায়ু	৭০
হে তরুণ যাত্রীদল	৭১
রৌদ্র–দগ্ধ বসুন্ধরা	৭২
পৃথিবী শিহরে আজি	৭২
ঝড়ের মাতন জাগ্‌ল আজি	৭৩

www.pathagar.com

বৈশাখী	৭৪
আজ ও কাল	৭৬
নূতন বৈশাখ	৭৮
বেগ দাও, বেগ দাও আমার ডানায়	৮২
আজকে শুধু মেঘের স্তর	৮৬
আজকে আমার মন ভোলায়	৯০
হে যুগান্ত যাত্রা পথ	৯১
আহ্বান	৯৫
জিন্দেগী	১০১
জিন্দেগী	১০৩
আন্দেশা	১০৩
নূতন দিনে	১০৬
যুগের আজান	১০৮
চির–পথ	১১০
মোয়াজ্জিন জাগো–জাগো	১১১
পয়গাম	১১৩
হে দিশারী	১১৪
ইয়াদগার–ই–ইকবাল	১১৫
ইকবালকে	১১৮
সিরাজী স্মরণে	১১৮
মারহাবা লিয়াকৎ	১২০
যুগের নকীব	১২১
শহীদ স্মরণে	১২৩
আকরম খাঁ স্মরণে	১২৩
নজরুলের প্রতি	১২৫
মুয়াজ্জিন কবি	১২৬
বন্ধু আজ শুনো	১২৮
সাচ্চা মোমেন বাচ্চারা জাগ	১৩০
সন্ধ্যার গান	১৩৩
ঈদুজ্জোহা	১৩৩
খুনেরা ঈদ	১৩৪
সে হলো তপ্ত শহিদী খুন	১৩৮
রক্তে আমার রং ধরেছে	১৩৮
জঙ্গী জোয়ান দল	১৩৯

www.pathagar.com

ওরে জঙ্গী জোয়ান দল	১৪১
আজকে চাহি জুল্‌ফিকার	১৪২
জুল্‌ফিকার	১৪৩
বালাকোট	১৪৪
শেরে খোদা	১৪৫
আল্‌ফে–সানী	১৪৭
সিরাজ–স্মরণে–১	১৪৯
সিরাজ স্মরণে–২	১৫১
শহীদ রাজ	১৫৩
কায়েদে আজম	১৫৪
তোমার কদম	১৫৫
ঈদের হেলাল	১৫৫
নব ঈদ–উৎসবে	১৫৭
রোজায়	১৫৮
এলো কি রমজান	১৫৯
লহুর দরিয়া জেগেছে আবার	১৬২
কোরবাণীর ঈদ	১৬৩
এলো ত্যাগের ঈদ	১৬৪
জিন্দা ঈদ	১৬৫
হামদ	১৬৬
মহানবীর আবির্ভাব	১৬৭
না'ত–১	১৬৯
না'ত–২	১৭০
না'ত–৩	১৭০
মহরম	১৭১
কারবালা নবতর	১৭২
সত্যপথের শক্ত ভিত	১৭৪
জঈফ জাহান	১৭৬
মীনার	১৭৭
ভাটার দিনে	১৮০
আল্লাহ্ তুমি দাও নাজাত	১৮১
খুনেলা আঁসু	১৮৫
রোজার দিনে	১৮৬
তোমরা ও আমরা	১৮৭

www.pathagar.com

তোমায় জিজ্ঞাসি	১৮৯
জাহান্নাম	১৯০
নও তারানা	১৯৬
বাতেনী এলেম	২০১
হেমন্তিকা	২০৭
ঊষায়	২০৯
মানুষ–মরাল	২১০
চির–পথ	২১২
হে কাফেলা চলো	২১৩
পথিক	২১৪
নূতন দিনে	২১৫
জিজ্ঞাসা	২১৭
মুখর মানস	২১৮
সুবর্ণ মৃগের মায়া	২১৯
খুদী	২২১
যাত্রী	২২২
হে নব যাত্রীদল	২২৩
কাফেলা	২২৪
মাটি আর মহাকাশ	২২৫
মুসাফির	২২৬
অন্তরালে	২২৮
নয়া তারানা	২২৯
আশঙ্কিত	২৩০
“এবার বাধিব ঘর”	২৩০
তাপ–দগ্ধ বসুন্ধরা	২৩২
হে শান্ত শীতললক্ষ্যা	২৩৪
নূতন চাঁদের কিশ্‌তী	২৩৫
নয়া সয়লাব	২৩৬
কে দিলো সে ডাক	২৩৭
অনির্বাণ শিখা	২৩৮
উদয়াস্ত	২৩৯
ধরণীর কামনা–কিষান	২৪০
দিগঙ্গনের দিগ্বলয়ে	২৪১
কামনা	২৪২

www.pathagar.com

কালের পাতা ২৪৪
শুকতারা ২৪৬
কালি কলম মন ২৪৭
মোনাজাত ২৪৮
শাওন গাঙের পানি ২৫১
ওগো জাগর-মন্ত্র-দাতা ২৫২
দুয়ার খোল রে ২৫৩
বন্ধু হুঁশিয়ার ২৫৪
কালের ইশারা ২৫৪
অমৃত সন্তান ২৫৭
হিমালয় ২৫৯
নজরুল ২৬১
বিদ্যুৎ চমকায় ২৬৩
পরিক্রমা ২৬৭
আলাপনী ২৭৬
হিন্দোল ২৭৭
বাক্য-পারাবার ২৭৯
লক্ষ্মীছাড়ার গান ২৮০
তাজাল্লী ২৮২
পদক্ষেপ ২৮৩
শ্রাবণ সন্ধ্যায় ২৮৩
বিজয় দিবস ২৮৫
বর্ষায় ২৮৬
হেমন্তে ২৮৭
হে পঞ্চম ঋতুর বলাকা ২৮৮
বহ্নি-শিখা ২৮৯
প্রদীপ্ত প্রভাতি আলো ২৮৯
রক্ত-ভেলা ২৯০
আজিকে এলোরে মুক্তি-দিন ২৯১
বিজয় দিবস ২৯২
শতদল-১ ২৯৩
শতদল-২ ২৯৪
বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা ২৯৫
এলো রে সেই ডাক ২৯৭

www.pathagar.com

নতুন আলোর যাত্রা শুরু	
লড়াই করেই জয় মিলে ভাই	
রঙধনু	
মৃত্যুর বুকে পেতে গেলো এরা জীবনের জয়-তখ	৩[illegible]
লাল পল্টনের রণ-সঙ্গীত	৩০২
গড়বি তোরা স্বর্গ নবীন	৩০৩
জিহাদ জিন্দাবাদ	৩০৩
আজিকার এই দিনে	৩০৪
মুক্তি-জোয়ার	৩০৫
প্রদীপ শিখা	৩০৬
একুশের স্মরণে	৩০৭
রক্ত-মশাল	৩০৮
মাধবী-গুঞ্জন	৩০৮
রক্তে যেদিন জাগলো জোয়ার	৩১০
নূতন দিনে সূর্য হাসে	৩১০
আগুন-জ্বালা ফাগুন দিনে	৩১১
মুক্তির দিনে	৩১২
মহামুক্তির সত্যের বাণী	৩১৩
মুক্তি-বিহঙ্গম	৩১৪
কালিয়া আঙিখর ধারা	৩১৫
ত্যাগের ঈদ	৩১৬
আলোর ইশারা	৩১৭
বাংলা সাহিত্য	৩১৯
মুখবন্ধ	৩২১
শব্দার্থ	৩৩৫
লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৩৫৯
প্রবন্ধ পরিচিতি	৩৯১
কাব্য পরিচিতি	৪৯৪
প্রবন্ধ মালা	৫৯৭
ইসলাম ও কমিউনিজম	৫৯৯
বিপ্লব সাধনায় কামাল	৬২৩
ইকবাল-কাব্যে স্বদেশপ্রেম	৬৩০
নজরুলকে যেমন দেখিয়াছি ও জানিয়াছি	৬৩৪

www.pathagar.com

নজরুল–সাহিত্যের পটভূমি	৬৪৫
সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব	৬৬২
অক্রূর চন্দ্রের কাব্য সাধনা	৬৭১
পরিশিষ্ট	৬৭৪
বে–নজীরের জীবনপঞ্জি	৬৭৫
কর্ম জীবন	৬৭৬
গ্রেফতার ও পলায়ন	৬৭৭
সাংবাদিক বেনজীর	৬৭৭
গ্রন্থ–পরিচিতি	৬৭৮
প্রকাশিত গ্রন্থ	৬৭৯
পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা	৬৭৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

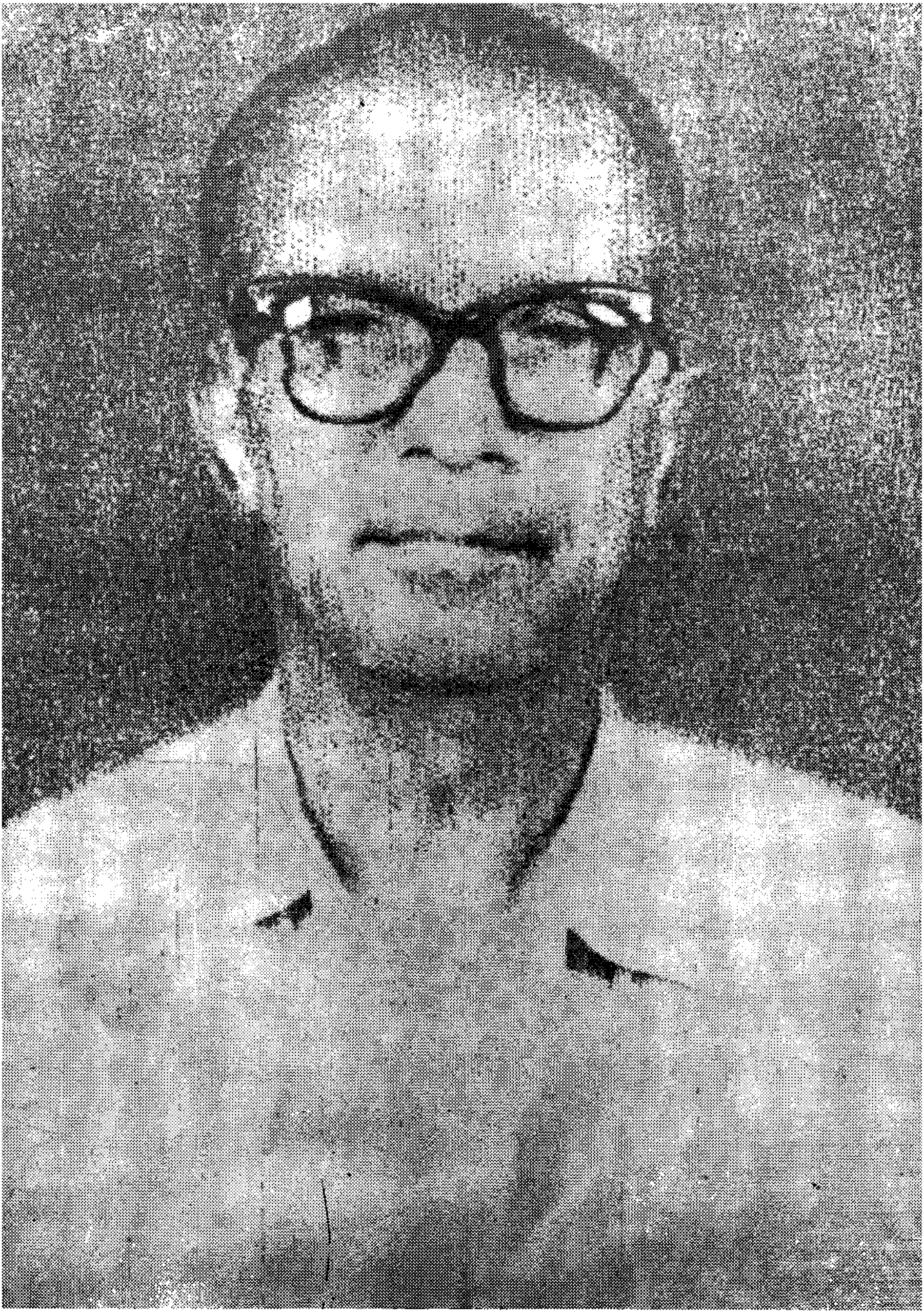

বে-নজীর আহমদ

জন্ম : ২৯শে অক্টোবর ১৯০৩ ❑ মৃত্যু : ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বন্দীর বাঁশী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাল রায় চৌধুরী এম-এ বি-এল

ও

তদীয় সহধর্ম্মিণী এবং আমার মাতৃস্বরূপা

শ্রীযুক্তা পঙ্কজিনী দেবী

—কর-কমলে—

দেব্‌তা ওগো, তোমার আলো আমার ব্যথার অন্ধকারে
জ্বাল্‌লে যেদিন কারার বুকে দীপ্ত স্নেহের রশ্মিধারে,
আঁধার-শিকল পড়্‌ল টুটি'
ঊষার আশা উঠ্‌ল ফুটি'
গাইনু সেদিন মরণ ভুলি' সেই উষসীর বন্দনারে,
আজ্‌কে দিনু অর্ঘ্য পদে সেই পূজারই গন্ধভারে।

*　　　*　　　*

জননী গো, আশীষ তব লক্ষ ধারায় পড়্‌ল ঝরি'
মোর এ ঊষর তপ্তবুকে সকল আঘাত-বেদন হরি'।
আমার ব্যথার পদ্ম-দলে
তোমার স্নেহ-অশ্রু-জলে
রচ্‌ল মধু-চক্র শত গন্ধ-আকুল পরাগ ভরি'
সুরভি-অর্ঘ্য-ভারে আজ্‌কে মা তোর চরণ স্মরি'।

স্নেহমুগ্ধ
বে-নজীর

www.pathagar.com

দু'টী কথা

"নওরোজে"র নও-প্রভাত না ফুট্‌তেই এল কাল-বোশেখির তিমির কালো ঝড়ের কেতন। হরিণ-চরা হরিৎ মাঠে—যার একদিকে জড়িয়ে আছে শ্যাম বনানীর এলায়িত কুন্তল-ভার, আর একদিক হারিয়ে গেছে দূর দিগন্তের কোলে কোলে,—যেথায় পদ্ম-ছাওয়া পল্লী-ঝিলে হংস-বলাকার নিত্য কলরোলে সন্ধ্যা-উষা মুখর হ'য়ে ওঠে—সেই মাঠেরই আলের পথে মেঠো সুরের তালে তালে ছিল যার চলার নেশা, রুদ্র ঝড়ের এক ঘূর্ণিহাওয়া তাকেই নিল উড়িয়ে মুক্ত মাঠের উদার বুক হ'তে বন্দীশালার বন্ধ-দোর পাষাণ বুকে। মুক্ত অসীম আকাশতলে মেঠো বাঁশীর শান্ত বুকে যে-সুর ছিল একান্ত সহজ, আনন্দময়,—রুদ্ধ-আগল কক্ষ-কোলে সেই সুরই হ'ল স্তব্ধ অভিমানে অশ্রু-আকুল, বন্ধন-বেদনায় মুক্তি-পাগল। "বন্দীর বাঁশী" বন্দীশালার সেই বেদন-গানের সুর-বাহক? হয়ত এ গানে ছন্দ নেই, যতি নেই—হয়ত এ শুধুই আর্ত্তনাদ; তবু বড় বেদনায়ই ব্যথিতের কণ্ঠ চিরে এ বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ জেগেছে—"বন্দীর বাঁশী" প্রকাশের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ এ কথাটীই বল্‌তে চাই।

আর একটী কথা। মুস্‌লিম-বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও সুলেখক বন্ধুবর আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন সাহেব এগুলি প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য করেছেন এবং এর দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছেন বলেই আমার মতো অনামা অসাহিত্যিকের পুস্তক—বিশেষতঃ কবিতা-পুস্তক প্রকাশের এ স্পর্দ্ধা।

আমার অগ্রজ-প্রতিম "বিদ্রোহী" কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ বইয়ের মুখ-বন্ধ লিখে দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

বে-নজীর আহ্‌মদ

www.pathagar.com

মুখ-বন্ধ

শ্রীমান বেনজীর আহ্‌মদকে আমি জানিতাম তাহাদেরি একজন রূপে—যাহারা মৃত্যুর মুঠায় জীবনের সঞ্চয় খুঁজিয়া ফেরে। এদিক দিয়া সে সত্যই মুসলিম তরুণদের মাঝে বে-নজীর ; এরূপ আর একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একদিন দেখিলাম, সে কবিতা লিখিতেছে, অগ্নিশিখা সন্ধ্যা-প্রদীপের স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মৃণালে কন্টকের জ্বালা সহিয়া পদ্মফুল যেমন সূর্য্যের স্তব করে, এ যেন তেমনি। দুর্য্যোগের নিবিড় নিশীথে দুঃসাহসিক যাত্রীর মুখে আনন্দ-ভৈরবীর সুর—সত্য সত্যই বিস্ময়কর।

অন্ধ কারার সঙ্গীহীন অবকাশ সে ভরিয়া তুলিয়াছে এই কবিতা কয়টী দিয়া। মরুভূমিতে খর্জ্জুর বৃক্ষ যেমন করিয়া রস আহরণ করে, নিষ্প্রাণ নিরানন্দ কারাগৃহে এ হয়ত তেমনি করিয়াই কাব্যরস সঞ্চয় করিয়াছে। অদ্ভুত জীবনীশক্তি যাহাদের, ইহা বোধ হয় শুধু তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব।

বে-নজীরের কাব্যে বন্দীর আকুতি, মুক্তির উদগ্র বাসনা, সৌন্দর্য্যের অসীম ক্ষুধা যে-ভাষা, যে-সংযম লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যে-কোনো নবীন কবির পক্ষে বিস্ময়কর। ত্রুটী-বিচ্যুতি যে নাই এমন কথা বলি না, তবু কাটার উর্দ্ধে যে-ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি শুধু তাহাকেই দেখিয়াছি। কাব্য-কাননে তাহার স্থান আছে। প্রথম জোয়ার যখন আসে, তখন সে কূলের বন্ধনকে স্বীকার করিতে চায় না। এই আবেগ যেদিন সংযত হইবে, ছন্দের দুই কূলকে স্বীকার করিয়া এই কবির কাব্য-স্রোত সেদিন অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বাজিয়া উঠিবে। হয়ত বা তাহার আর দেরীও নাই।

পাষাণ কারার বন্ধন-মুক্ত যে-বাণীর ধারা আপনার বেগে আপনি আসিয়া বাঙলার সমতল ভূমিতে নামিয়া পড়িয়াছে, সে-ধারা আপনার পথ আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিবে। আমি শুধু সশ্রদ্ধ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাকে নির্দেশ করিয়া গেলাম। ইতি

কলিকাতা — **নজরুল ইসলাম**

ভাদ্র, ১৩৩৯

www.pathagar.com

তিন দিকে মোর পাষাণ গাথা
একদিকে তার খানিক যায়গা খালি,
সেই ফাঁকে হায় চোখ মেলে যায়
নীল–ঢালা ওই একটু আকাশ–ফালি।
কখন হেরি আলোর মেলা
উষার রাগে হাসির ঝলক খেলে,
কখন হেরি সজল ব্যথা
আঁধার–রথে মেঘের পালক মেলে।
কখন কচি তরুর শাখা
সবুজ মোহের অবুঝ সুখে নাচে,
কখন পুনঃ জরায় ঝড়ি'
ঝড়ের চুমায় মরণ লভি' বাঁচে।
গহন–চারী পথিক–পাখী
কখন হেরি অসীম আকাশ–কোলে,
আলোর সুরায় পাগল পাখা,
দূরের নেশায় চলার তালে দোলে।
তাহার মাঝে আমায় ডাকি'
সেই পাখীরই পালক–লিপি আসে,
মুক্তি–ঘন কূজন জাগে
বন্দীশালার বন্ধ আগল–পাশে।
ডুকরে কাঁদে চিত্ত মম
বন্ধ ব্যথায় ক্ষুব্ধ তনু লুটে
অন্ধ কারার ছন্দ টুটি,
কণ্ঠ ভেদি' দীর্ণ বাণী ফুটে—
অসীম ওরে, ওরে অসীম,
কোথায় দূরে কোথায় তুমি চলো,
গোপন তব গহন বাণী
বারেক শুধু বারেক মোরে বলো।
সীমার বাঁধা ভাঙবে কবে—
কোথায় দূরে কোন্ সাগরের তীরে,
মুক্তি–সুধা আসবে সে কি
বাঁধন–গলা তপ্ত অশ্রুনীরে?
সেই ব্যথা মোর আস্‌লো কি আজ
বন্দীশালার অন্ধ পাষাণ–পুষ্টে?
বেদন–বাঁশী বাজুক তবে
মুক্তি–পাগল সেই ব্যথারই সুরে।

www.pathagar.com

জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ

হে আমার প্রাণ !
চিরযাত্রী নবীনের নব অভিযান
ডাকে তোরে পথপানে,—আয়, আয়, আয়,
শ্যামলা ধরণী-মার শ্যাম-স্নিগ্ধ মুকুলের অমল সভায়—
জরা-মৃত্যু ব্যাধি-হরা চিরদীপ্ত আলো-ঝলো সবুজের দল
পথে পথে করি' কোলাহল
ফিরে যেথা মহানন্দে বাধা-বন্ধ-হারা
বহি' শিরে আনন্দ-পশরা—
আয়, আয়, আয় সেথা—নহে দেরী, বৃথা বেলা যায় ! —
অনাদি কিশোর তুই—চিদানন্দ বিভাসিত গোকুল-কুমার
বিশ্বনাটে নটরাজ—আনন্দ ভূমার !
পুলক-চপল তোর নৃত্য-চল চরণের শ্যামচিহ্ন কম
অমলিন রেখাপাতে ভৃগু-পদ-সম
এঁকে যেতে হ'বে তোরে কাল-সিন্ধু-সলিলের অমর বেলায়
আয়, আয়, আয়—
বৃথা বেলা যায়।
সেই বাণী, সেই ডাক, সেই মহাগান
ওরে প্রাণ,
শুনো আজি, শুনো প্রাণ ভরি'—
জীবনের মহা মন্ত্র, নব উদ্বোধন
চির ঋষি-কণ্ঠ-তলে তারি নব জয়-বিঘোষণ,
শোনো আজি, রাখো স্মৃতি ভরি'
আপনার ব্যথা-দগ্ধ বেদনা পাশরি'।
নিখিল-পয়োধি-বুকে বাসনা-মন্থনে
জীবনের প্রতি পদে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
উঠিয়াছে যেই মহা তীব্র কালকূট,
বারে বারে ভরি' করপূট
যারে তুমি সুধা জ্ঞানে করিয়াছ পান—

www.pathagar.com

ওরে প্রাণ,
সেই ভ্রান্তি, সেই ভুল
সেই স্বার্থ-কামনা আকুল
ভুলে যাও। আর সেই ক্লেদ-ক্লিষ্ট পথে
বাসনা-কলুষময় মনোরথ-রথে
নাহি তুমি ফিরো কভু।
তুমি তব চির-নিত্য সত্য-সন্ধ প্রভু
নাহি ভুলো সেই কথা। হের দূরে—পাশে
অগণন তাজা প্রাণ আকুল উল্লাসে—
চির-মত্ত সদা তারা। নাহি জানে কভূ পরাজয়,
নাহি মানে বিভীষিকা ভয়,
নাহি গণে বেদনা-আঘাত,
মরণ-কুলিশ-তলে মরে যেতে যেতে এরা জাগে অকস্মাৎ—
গগন-প্রাঙ্গনে বসি'
হাসে হাসি দিগন্ত বিভাসি'
দামিনী-লতিকা ছলে
আপন কপোলে।
ব্যথা-বজ্র পানে
বিদ্রূপ-কটাক্ষ এরা অবহেলে হানে,
ধূমকেতু আনে এরা—হানে উল্কাপাত,
চিরঞ্জীব জীবনের এরা অভিজাত।
অমলিন সেই প্রাণ, অনাহত সেই মহাবাণী
অজড় অমর কণ্ঠে উঠি 'রণি রণি'
ডাকে আজি ডাকে বারেবার—
"নহে ওরে নহে দেরী আর,
ভয় নাহি, ভয় নাহি তোর—
ওঠো ওঠো মোছো আঁখি-লোর
তিমির-তমিস্রাময়ী কাল-অমানিশা আজি তব হবে অবসান।"
জীবন-বন্দনা-গাথা নব ঋক এই সাম-গান
শোনো তুমি ওরে প্রাণ,
ধরো আশা, তোলো শির, খোলো বাহু ধরণী-বিশাল—
বক্ষোপরি লহ টানি' নিখিলের সীমা-হারা মহা নাট্যশাল,
প্রতি জীব, প্রতি প্রাণ, প্রতি তৃণ-তরু,
হাস্যময়ী উৎসধারা, দুখ-দগ্ধ-মরু—
আনো তার সব আজি বক্ষপাশে টানি'—হের তারে নির্নিমেষ আঁখে

www.pathagar.com

এত মৃত্যু–ব্যথা মাঝে কোথা তার ফুলদল,
কোথা তার হাসি–উৎস থাকে ;
চির–দগ্ধ সাহারার বহ্নি–জ্বালা মাঝে
কেন জাগে পান্থ তরু, কেন স্নিগ্ধ মরুদ্যান রাজে—
কোথা হ'তে বারে বারে মরণ–তুহিন–ঘেরা ক্লান্ত শীত–শেষে
জীবন–মদিরা–ঢালা চির–মূর্ত্ত্য বসন্তের কল–হাস্য আসে—
কোথা কোন্ সুধা–সিন্ধু–তীরে
যমরাজে হানি' হেলা মহোল্লাসে ফিরে
ধরায় অমরা আনি' মরতের কে–সে দেবসূত—
জরার কুহেলী মাঝে জীবনের চপল বিদ্যুৎ
হানি' ফিরে বারেবার। পরাজয় মাঝে আনে জয়
মৃত্যু–জয়ী ধ্বজা তাঁর বারে বারে উড়ে তাই চিরশ্যাম নব কিশলয়।

ওরে প্রাণ
চিনে লহ আজি তারে—কণ্ঠ ভরি' তারি সুধাপান
করো তুমি। পূজো তারে অশ্রু–ধারে—করি তারে
ভক্তি–অর্ঘ্য দান।

হের তারে আঁখি ভরি'—প্রাণে আনি' বোঝ তার প্রাণ।—
হৃদিতলে রাখি আজি লভ তার হৃদয়–স্পন্দন,
গোপন মন্দিরে বসি' রহস্য–আড়ালে
কেমনে সে রচিছে বিরলে
মরণ–গরল ছাকি' অমরার অমর নন্দন
নিতি নিতি ধরা মাঝে। অপরূপ সেই কলা, চিরতাজা প্রাণ–রসায়ন
শিখে নাও আজি তুমি
জীবনের জন্ম–মন্ত্র—প্রাণযজ্ঞভূমি—
সবি তুমি চিনে লহ।
আজি শুধু কহ—
নহ তুমি নহ
নহ চির–ভীরু আর—নহ তুমি মৃত্যু–ভীতু রণে,
ভীত ত্রস্ত কাপুরুষ জীবনের প্রতি সন্ধি–ক্ষণে
নহ আর।
দুর্দ্দম দুর্ব্বার
প্রলয়–ঝঞ্ঝার মতো উঠিয়াছ জাগি'
জীবনের চির–চাওয়া মহা মুক্তি লাগি'।

লহি' ভালে এঁকে
নব–শশী–কলা–আঁকা চির–মত্ত পিনাকীর ললাট–ফলকে

www.pathagar.com

প্রদীপ্ত ভাস্কর সব যে-দীপ্তি ঝলকে
তারি মতো জয়-টীকা। মাখি' ভালে রুধির-চন্দন
তাহারি তাণ্ডব নাচে আজি তুমি টুটে দাও
বাধা-ভয়-ব্যথা সব শৃঙ্খল-বন্ধন
নিখিল-কারার।
ওরে আরবার
কেহ যেন পথ ভুলে তারি অন্ধকূপে
নাহি কভু ডুবে।
ওরে প্রাণ,
ওঠো আজি, পথে চলো জীবনের গাহি' জয় গান।—
হের তুমি চারিভিতে, খোলো আঁখি বিস্ময় বিমূঢ়,
বিশ্বে তব অধিকার যুগে যুগে কালে কালে অনাদি নির্বাঢ়—
আজি হ'তে বুঝি' লও। জীবনের তুমি অধিরাজ,
তব তরে নাহি আর মৃত্যু-ব্যথা শোক-ভয় পরাজয়-লাজ—
ব্যথা-দুখ গভীর সুদূর
আজি হ'তে হ'লো সবি দূর—
তব আঁধি হ'ল অবসান।
ডাকে পাখী—খোলো আঁখি, নাহি নিশা,
জাগে আলো, জাগে ঊষা,
জাগে দীপ্ত মহা বিবস্বান।
জাগো, জাগো তারি সাথে জাগো ওরে জাগো মোর প্রাণ
জ্যোতির্ম্ময় আলো তারি বিশ্বে বিশ্বে করো বিকীরণ—
গাঢ় অন্ধ অমা-শেষে দীপ-দীপ্ত দেয়ালীর হোক্ আবাহন।
মহা তীর্থ-ভূমি
হোক্ আজি তব শান্ত গেহপ্রান্ত চুমি'—
প্রাণের প্রণবধারা জাহ্লবী-যমুনা—
নিখিল-কামনা—
বহে যেথা কলনাদে, উছল আনন্দে দোলি' সাগর-সঙ্গমে,
সেই পুণ্য মহা তীর্থভূমে
অনন্ত মানব-ধারা লক্ষ পথ বাহি' আসি' নিত্য যারে চুমে—
অসীমের ঋতু-গৃহ—মিলনের পূত পীঠ-স্থান,
হে আমার প্রাণ,
সেই মহাতীর্থে আজি হোক, তব মহা মুক্তিস্নান।

www.pathagar.com

এ মোর পুরস্কার

আমার ব্যথার রঙে রাঙ্‌ল আঁজি সাঁঝের অন্ধকার,
তোমার পথে চল্‌নু ব'লে এ মোর পুরস্কার !
সবায় যখন ঊষার কোলে
অরুণ-আলোর দোলায় দোলে,
আমার তরে তখন আলো হ'ল বন্ধ-দ্বার—
নিঠুর। তবু গাইনু গীতি তোরি বন্দনার।

জানি আমি হান্‌বে কাঁটা গহন তীর্থ-পথ,
চলার পথে বজ্র হানি' ভাঙ্‌বে আমার রথ,
আস্‌বে হঠাৎ ঝঞ্ঝাবায়ু,
হয়ত আমার টুট্‌বে আয়ু
বাঁধন-কারা মরণ-জরা আস্‌বে যুগপৎ—
তবু আমি চল্‌ব পথে এ মোর অভিমত
স্বজন-জনে হয়ত বুকে হান্‌বে পদাঘাত,
আপন ভাই-এ করবে মোর-এ হৃদয়-শোণিতপাত,
শত্রু হ'বে মিত্রজনা,
সর্প গোপন্ তুলবে ফণা,
পুত্র-দারা তা'রাও মোরে ছাড়বে অকস্মাৎ,
আশার বাসা ভাঙ্‌বে আমার অকাল ঝঞ্ঝাবাত।
বন্ধুজনে সঙ্গোপনে করবে উপহাস,
বাইরে এসে মিত্রবেশে বস্‌বে আমার পাশ,
কইবে মুখে মধুর ভাষা
মরমতলে গরল-বাসা—
হৃদয়-মনে খুঁজ্‌ছে তখন আমার সর্ব্বনাশ !
জানি নিঠুর, সবি এ তোর কঠোর পরিহাস।

সঙ্গী সাথী সুহৃদ যত কোকিল বসন্তের
ছাড়বে মোরে আঁধার রাতে বাদল-নিশীথের
অন্ধ সে মোর পন্থা-কোলে
ধ্বংস ভয়াল উঠ্‌বে দুলে,
লক্ষ ভূমিকম্প ছলে অকূল অনন্তের
প্রলয়-ঢেউ-এ রচ্‌বে আমার গহন-মরণ-ঘের
সপ্তসাগর আমার পথে রচবে ব্যবধান,
সেই সাগরের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে আমার অভিযান !—

www.pathagar.com

খেয়ার তরী ঢেউ-এর দোলে
ডুব্‌বে সাঁতার পাথার কোলে,
ব্যথার কাতর অশ্রুজলে ডাক্‌বে আকুল বান—
হয়ত হ'বে সেই বানে মোর অকাল অবসান।
এক্‌লা আমি চল্‌ব পথে নাই যে কেহ সাথ্,
হয়ত তখন আস্‌বে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—
শূন্যপথে পড়্‌ব টলে,
লইবে না কেউ বক্ষে তুলে,
মুছ্‌বে না, মোর অশ্রুজলে কোমল কারো হাত—
ভর্ দুপুরে নাম্‌বে আমার গহন নিশীথ্-রাত।
জানি নিঠুর, লক্ষ ব্যথা-বিঘ্ন-অপমান
তোর সে-পথে চল্‌তে মোরে কর্‌বে বাধা দান।
যতই তুমি তাড়াও দূরে
পূজ্‌ব তোমায় মরম্-পুরে,
জীবন কিম্বা মরণ-পারে অধর-সুধা পান
কর্‌ব তোমার কর্‌ব আমি, এ মোর অভিমান।
ভাব্‌চ তুমি আঘাত হানি' কর্‌বে মোরে দূর
তাই বুঝি আজ সাজ্‌লে এমন নির্ম্মম নিঠুর !
আমার প্রেম এ নয়ত মেকী,
ভয়ের মেঘে ঢাক্‌বে সে কি ?—
জীবন-মরণ আঘাত-ঘায়ে নয় সে ব্যথাতুর
তোর আঘাত যে মোর এ-বুকে বাজায় তোরি সুর।
আমার সকল সুখের মুকুল অমল স্বাস্থ্য-বল
দুল্‌ছ সদা পাষাণ তুমি তোমার চরণ-তল,
তরুণ বুকের তপ্ত তৃষা
স্বপন-সুখের দীপ্তি-মিশা
মোর এ জীবন-ঊষার সকল আশার পরিমল
তোমার পূজার বেদীর মূলে দেইনি কি সকল ?
আজ্‌কে আমি রিক্ত হারা নাই সে কিছু আর,
বক্ষকোলে দুল্‌ছে শুধু ব্যথার অশ্রু হার।
হৃদয়-গলা শোণিত ঢালি'
ভরনু আমার পূজার ডালি—
সেই পূজা শেষ হয়নি আজো চরম সান্ত্বনার,
ব্যথার ডালি বইছি শুধু—এ মোর পুরস্কার !

www.pathagar.com

ঊষার আলোর রথে জাগে ওই দিগন্তের পারে

মহা সিন্ধু ভেদি'
দীর্ণ, করি' চূর্ণ করি' জীর্ণ-যুগ লক্ষ পূজা-বেদী
একি গান বাণী-ঘন, একি ছন্দ উন্মাদ-উন্মনা—
নাহি মানি' মানা—
দিক্‌ হ'তে দিগন্তরে সীমা-বন্ধ ঢাকি'
প্রলয়-ঝঞ্ঝার নাদে যায় ডাকি' ডাকি'—
"ওরে দীন, ওরে সর্ব্বহারা
প্রভাতের দীপ-দীপ্ত ওই শুকতারা
ব্যথার আঁধার ভেদি' জীবনের নব রশ্মি-ধারে
ঊষার আলোর রথে জাগে তোর দিগন্তের পারে।—
নাহি ভয় নাহি ভয় আর—
পশুর পাশব-বল অজ্ঞানের শত অত্যাচার
অক্ষমের বক্ষ-হানা রুধিরাক্ত ভীম খড়গ-ভার
দুখ-দুস্থ দুর্ব্বলের হৃদি-রক্তপান—
আজি তার চির-অবসান।
মদ-মত্ত অসুরের রোষ-ক্ষিপ্ত শত লক্ষ স্পর্দ্ধা-অভিমান
সত্যেরে হানিতে মৃত্যু বারেবারে স্ফীত-দম্ভ ক্রুদ্ধ অভিযান
রচি মহা কুরুক্ষেত্র নিত্য নব ধরণী-প্রাঙ্গনে,
রুধির রঙ্গনে,
পুঞ্জিত শবের দৃশ্যে আহতের আর্ত্ত হাহাকারে
পাতাল-গহন ঘোরে রুদ্ধ অন্ধকারে
মহামারী দুর্ভিক্ষ জ্বালায়
নিষ্করুণ, ক্রোধ-মত্ত নিত্য মহা সংহার-লীলায়।
যায়—সবি যায় !
আজি হ'তে মৃত্যু-ঘন অতীতের বিস্মৃতি-বেলায়—
অস্তাচল সূর্য্য-সম চিরতরে ঐ ডুবে যায়—
উদগ্র নামের শেষে, নাম-হারা কোথা কোন চির-অন্ধ-কোণে,—
কেহ নাহি জানে।
যশঃলুব্ধ লোভাতুর বিশ্বগ্রাসী কামনার বিষ দগ্ধ বাণে
বারে বারে আপনারে হেন মৃত্যু হানে।

তারি সাথে ডুবে যায় চির অস্ত-পথে
উদ্দাম ঝঞ্ঝার বেগে যারা রক্ত-রথে

www.pathagar.com

আপন বলের গর্ব্বে ফিরে নিত্য ধরাবক্ষে সঞ্চারিয়া ত্রাস
ক্ষুধিতের কাড়ি' নেয় গ্রাস
ন্যায়েরে হানিয়া পদাঘাত ; —
অন্যায়ের বেদী মূলে ল'য়ে তার চির-সাথী কলা-যন্ত্র-জাত্
দেয় পূজা নিতি,
যে তাণ্ডব পূজা-রোলে কাঁপি' কাঁপি' শিহরিছে আসমুদ্র ক্ষিতি—
আজি তারি লয় ;
নাহি আর নাহি কোন ভয়,
ওরে দীন্ ! শোন্ ঐ শোন্ তোরি জয়
যুগান্তের শঙ্খ নাদে নিস্বঃনিছে মহানন্দে সারা বিশ্বময়।—

ওঠ্ আজি তন্দ্রা ছাড়ি', বক্ষ বাঁধি উচ্চশিরে দাঁড়া,
আজ আর নহে সর্ব্ব-হারা।
আজি তুমি অধিরাজ মহাবিশ্বতলে
তব পদ-ভারে আজি কোটী পাপ-অত্যাচার-আসনিকা টলে,
তোমার মিলিত বল আজ পারে নিতে
অবহেলে সারা বিশ্ব জিতে।
তোমারি সবল বাহু, শ্রমঋদ্ধ দেহ
আপন রুধির ঢালি' তিলে তিলে গড়িয়াছে এই বিশ্ব-গেহ।

কুমারী ধরার বুকে কবে তুমি জেগেছিলে কোন্ আদি প্রাতে
নব-সৃষ্টি-ব্যথা-জাগা এই দেহ-বাহু শুধু ছিল তব সাথে।—
নাহি ছিল জন পদ, জন-স্থলী, নগরিকা, রাজারাজ্য-পাট
অনন্ত ধরণীব্যাপি' ছিল জনশূন্য এক কান্তার বিরাট,
স্বর্ণ শীর্ষ শস্য খচা শ্যামাম্বরা ধরণীর অঞ্চল বিলোল
প্রতি-উষা, সন্ধ্যা-তলে মলয় পরশ-মোহে নাহি দিত দোল,
শ্যামল প্রান্তর কোলে রাখালের প্রাণমুগ্ধ সঙ্গীত-লহরী
কাজল গোধূলী-ছায়ে নাহি বরি' নিত কভু শান্ত বিভাবরী,
নিতি সাঁঝে পল্লী-বঁধূ গৃহে গৃহে মহানন্দে সন্ধ্যাদীপ জ্বালি,
গৃহ-গামী প্রিয় আশে রহিত না কভূ চেয়ে' স্নিগ্ধ আঁখি মেলি'—
কেলি-মুগ্ধ ধেনু-বৎস উচ্চ পুচ্ছ তুলি'
দুরন্ত চলার বেগে পথ ভুলি' ভুলি'
ধেনুপালসহ কভু ধূলিপুঞ্জ-রথে
হাম্বারবে ফিরিত না পল্লীগৃহপথে।
নব শশীপানে চেয়ে' বিমুগ্ধা জননী
ডাকিত না কভু চাঁদে,—"আয় আয় আয় চাঁদ,

www.pathagar.com

দিবে চুমু আজি তোরে মোর খোকামণি,”—
ঐ চাঁদ-জ্যোৎস্না জিনি’ শিশু-মুখ-জ্যোতিঃ
আনিত না মাতৃচিতে হরষ-বিভূতি।
কচি-কণ্ঠে অকারণ কল-হাস্য-রব
ধরার বিরস মুখে ক্ষণে ক্ষণে নাহি দিত আনন্দ-বিভব।
নীরব নিদাঘ-কোলে সুবিমল ছায়া-ঘন সরসী-সলিলে
অলক-পুলকে দুলি’ নিত্য স্নান-ছলে
আসিতনা পল্লী-বধূ তন্বী মনোরমা
তটিনী-হিল্লোল-দোলে চির-নৃত্য-গরবিণী রাজহংসী সমা।
প্রদোষ-উষায় কভু বিহগ-কাকলী
বাসর-রজনী-শেষে নববধূ কিশোরীর
লাজ-রাঙা আঁখি-পাতা নাহি দিত খুলি’।
কভূ কোনো আনমনা কুমারী বালিকা
গোপন হিয়ার তলে গাঁথিতনা প্রীতি-ফুলে বরণ-মালিকা।—
নাহি ছিল কিছু কোথা প্রেম-প্রীতি-হাসি-গাথা সমাজ-বন্ধনা,
এসেছিলে বিশ্ব-পথে তুমি নব-স্রষ্টা শুধু একাকী আপনি।
ঐ হোথা নগরীর রম্য হর্ম্ম্য শত
বিলাস-মন্দির-রাজি নব-রূপ-রথ
বিজুলী আলোক-জ্বালা দীপোজ্জ্বলা রঙ্গভূমি সঙ্গীত-মুখরা
নূপুর-শিঞ্জন-তালে নৃত্য-পরা কিশোরীর লাবণ্য-পশরা
রচিতনা ইন্দ্র-পূরী বিমুগ্ধ মানস-লোকে নিত্য-নব নব-রূপ স্নিগ্ধ সুষমায়
আসিতনা, হাসিতনা কভূ কেহ এই শূন্য ধরণী বেলায়।
কল-উৎস-মুখরিত নন্দন-কানন-সম প্রসূন-বীথিকা
বসন্ত পরশে হাসি’ পরিতনা কভূ শাখে কুসুম-মালিকা।
কুবের-ঐশ্বর্য্য-ঢালা রাজ-সিংহাসন,
মণি-মুক্তা-রত্ন-খচা কিরীট-ভূষণ,
জ্যোতিঃর্ম্ময় রূপ-রাগে ঝলিতনা কভু হেথা আলো-ঝলোমলো
বিকশিয়া মদ-দৃপ্ত বিলাস-বিলোল।
নাহি কিছু ছিল কোথা, নাহি কোনো সুখ-দুখ আশা-অভিমান,
দুরন্ত প্রাণের বেগে অজানারে জিনিবারে
অনাগত কাল-পথে নিত্য অভিযান।
শুধু হিংস্র পশুদল ছিল মত্ত মহা-ধ্বংস রুধির-আহবে,
জল-স্থল অন্তরীক্ষ কাঁপিত সভয়ে সদা তারি আর্ত্ত-রবে।
এ আকাশ রবি-শশী, ওই গ্রহ-তারা
ওই দূর মহা-সিন্ধু, সীমা-অন্ত-হারা,

www.pathagar.com

পুলক-বিস্ময়-ভরে জাগাতনা কণ্ঠে কারো আকুল আরতি—
উঠিতনা সন্ধ্যা-ঊষা অনন্ত অসীম ব্যাপি' তারি সাম-স্তুতি।
ছিল মগ্ন সারা বিশ্ব শুধু ক্ষুব্ধ হাহাকার ব্যর্থ কোলাহলে,
মেগে ছিল মহা মুক্তি তাই ধরা কাঁদি' নিত্য শিশিরাশ্রু জলে।
তারি মাঝে এলে তুমি হে আদি মানব-ধাতা একান্ত একাকী
তোমারি চরণ-রাগে ধরার শ্যামল-বুকে নব-আশা-প্রসবিণী
মহাবাণী আঁকি'
আদি হিংস্র পশুদল উঠিল হুঙ্কারি' সেই নব-আগমনে,
কত যে তনয় তব বারে বারে দিলে বলি তারি অগ্র-রণে ;
দুস্তর সাগর-মরু-গহন-কান্তারে,
তোমারি সন্তানদল বারে বারে দিল প্রাণ নব সৃষ্টি তরে।
শ্বাপদ-মকর-রোষে জলে-স্থলে বারে বারে নিলে মৃত্যু চুমি',
তব সে শোনিত-রসে সরসিলে চির-প্রসূ শ্যাম শস্য-ভূমি'।
দিনে-দিনে তিলে তিলে তোমারি আহুতি
আনিয়াছে আজি এই নিখিল-প্রগতি।
হে দধীচি মহাভাগ ! কতবার হেনরূপে তব অস্থিদানে
ধরারে করেছ ধন্য কেহ নাহি জানে।
এলে তুমি ধরাপথে, গড়িলে অসীম সুখে মানবের আদিযন্ত্র হল-প্রহরণ,
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি' জীবন-ঊষার কোলে প্রথম সৃজন,—
রচিলে আদিম তব মানব-সমাজ-দেহ কানন-কুলায়ে,
বনের পশুরে আনি' বাঁধিলে স্নেহের ডোরে পর্ণ-গৃহ-ছায়ে।
কুমারী ধরার বুকে ঢেলে তুমি দিলে তব সৃজন-বেদনা,
চির-নব-শস্য-ভারে পুলকে উঠিল হাসি' শ্যাম দিগঙ্গনা।
বনানী-কান্তার নাশি' তুমি ধীরে গড়ে নিলে নব পল্লী-বাট,
তোমারি সৃজনী-হাতে হেলায় রচিলে শত নগরী বিরাট।
উত্তাল তরঙ্গে দোলি' অবহেলি' বারেবারে মরণ-বারতা,
সাগর-গহ্বরে ডুবি' আহরিলে মহোল্লাসে প্রবাল মুকুতা।
রজত-কাঞ্চন-আশে ধরার জঠরে নামি' করিলে সন্ধান,
কানন-কান্তার ভ্রমি' আনিলে হরষে খুঁজি পরশ-পাষাণ।
আসি' নিঃস্ব রিক্ত হাতে নিঃসঙ্গ ধরায়
সাজালে ধরারে তুমি লক্ষ সুষমায়।
এত সুখ, এত ভোগ—আনিলে নিখিল-বুকে এত রত্নাবলী,
আবার কখন কেঁদে হারালে সকলি।
এই নব-রূপ-দীপ্তা মোহিনী ধরণী
সাজালে যাহারে কত রূপ-রস-বর্ণ-রাগে বিচিত্র-বরণী

www.pathagar.com

সেই ধরা তোমারেই অবহেলা হেনে
জীবনের প্রতি পথে, কত যে দলিয়া গেলো সদম্ভ চরণে।
ধরার অনন্ত নব ঐশ্বর্য্য-বিলাসে
আনন্দ-হিন্দোলা আর উঠিত না দোলি' তব অন্তর-আকাশে।
আপনি যাহারে তুমি নিজ হাতে করেছিলে রাজ-অধিরাজ
ন্যায়ের শাসন-আশে, সপেছিলে করে যার মানব সমাজ,
আপন শোনিত ঢালি' যারে হেথা দিলে নব শক্তি-বীর্য্য-বল,
পঞ্জর-গ্রন্থিতে গড়ি' দিলে যারে গৃহ-দুর্গ-প্রাকার-অটল,
সেই রাজশক্তি তোমা দাসত্ব-বন্ধন-জাগা নাগ-পাশে বাঁধি',
রচিল ধরায় তব মরণ-সমাধি।
লোভ-লুব্ধ কামনার হীন স্বার্থ-যুপে
বল-অন্ধ মোহঘোর বধিল কুহক-ছলে ধরণীর রূপ-স্রষ্টা চির-আদি-ভূপে।
হারালে সকলি তুমি শত-সুখ-আশা-জাগা তব চির-জীবনের জন্ম-অধিকার,
আপনি হইলে পর আপন-সাজানো এই সুন্দর ধরার।
হ'লে হেথা হেয় হীন সবার ঘৃণিত চির অশুচি মলিন
তোমার পরশে নাকি ধরার পুলক-হাসি হ'য়ে যায় লীন ;
মহান মানব-নামে নাহি র'লে কভূ আর সম-অধিকারী,
ঐ গৃহ-পশু-সম তুমিও হইলে গৃহ-সেবক-ভিখারী।
হ'লে চাষা ছোট-লোক হীন মুটে-কুলি,
হানিল তোমারে যারা, মরিলে হায়রে চুমি' তারি পদধূলি।
ধরণীর ফুল-শস্য-সম্পদ-সম্ভার
উদয়াস্ত শ্রম দিয়া ফলালে যাহারে সদা নিত্য ভারে ভার,
বল-দৃপ্ত লোভ নিলো সবি তারি কাড়ি'
আপনি সৃজিয়া র'লে আপনি ভুখারী।
ঐ শত অভ্রভেদী শিখর-প্রাসাদ
রচিলে যাহারে কত শ্রান্তিহীন দিবাযামী করি' প্রাণপাত,—
সেই গেহ তব তরে হ'লো রুদ্ধ-দ্বার
তব লাগি' র'ল শুধু আঁধার কুটীর-কোণে ব্যথা-অন্ধকার।
আপন সুখের আশে আনিলে জীবন দানি' কাঞ্চন মানিক,
লুটিল সে ধন তব তোমারি রুধির-লুব্ধ ধনিক-বণিক।
এনেছিলে রত্নমণি আপনি শোভিবে ব'লে নিজ দেহ লুটে
সে মণি শোভিল শুধু ধনীর মুকুটে।
তব ধনে হয়ে ধনী, তব বলে রাজা
তোমারেই হানে আজি,—তুমি দীন প্রজা !
আপন রুধিরে যারে পালিলে আপনি

www.pathagar.com

হরিল সেই-সে তব রতন-বিপনি।
জ্ঞানের আলোক-ছায়ে চিনিলে যেদিন তুমি নিখিল-বিধাতা,
লুটিল চরণে তাঁরি নিমেষে অমনি তব পূজা-নত মাথা ;
রচিলে মন্দির শত আলয়-অঙ্গন ভরি' তারি পূজা তরে
ধরার মঙ্গল মাগি' দিলে সেথা পূজা-হোম আকুল-অন্তরে ;
সেই সে মন্দির তব আরতি-অর্চ্চনা-আশে সপিলে যাহারে,
তব পূজা অধিকার কুটীল বিধান ছলে সেই নিলো হরে'।
আপনা বঞ্চিয়া তুমি দিয়েছিলে তারি করে সুখ-মান তুলি'
সেই মান-ধন-বলে তব মন-জ্ঞান-ধ্যান লুটিল সকলি।
আপন ভোগের লাগি' বিধাতা-বিধান নামে রচিয়া গোপনে
ঐ শাস্ত্র-বাণী শত কপট-ভকতি-ঢাকা আচার-বন্ধনে,
হরিল বিবেক তব মহামুক্তি-আশ
প্রজ্ঞারে বধিয়া তাই হ'লে তুমি চিরতরে তারি আজ্ঞাদাস।
সে হ'লো দেবতা তব—মুকুতি-আশিষ-দাতা দ্বিজ-পুরোহিত,
সে নিবে প্রসাদ-ভোগ,—তুমি পাবে শুধু তারি চরণ-শরিৎ ;
হ'লো সে অমর ঋষি—নির্ম্মল পরম-পূত মানব মহান,
তারি তরে পুণ্য-লোক অক্ষয় স্বরগ-সুখ সম্পদ-সম্মান ;
তুমি হ'লে হীন শূদ্র—ধরার জঞ্জাল-গ্লানী পারিয়া-পঞ্চম,
অস্পৃশ্য-অশুচি-পাপী চির-অবহেলা-হানা সৃষ্টির অধম।
ঐ যে মন্দির-মঠ তোমারি স্বকরে-গড়া—মহা তীর্থ-পীঠ,
তোমার পরশ-পাপে হারাবে শুচিতা সেও—তুমি পাপকীট।
যে-দেব-পরশ-ছায়ে ধরা হ'বে শুচি
হায় রে তারেই নর করিলো অশুচি
যে-গেহে রচিলে তুমি দেব-পূজা-তরে
সেই হ'লো পরিণত দেব-কারাগারে।
বিধাতা-বোধন-আশে করিলে যাহারে তব হোম-পূজা-দাতা,
বিধাতারে দূরি' নিজে সে হ'লো বিধাতা।
আপন রুধিরে যারা রচিল ধরার এই সুষমা-মাধুরী
আধেক তাহার নর, আর আধা নারী।
নর তবু হ'ল প্রভু—নারী হ'ল দাসী
নারীর নয়ন-জলে নর খোঁজে হাসি।
বিপুলা ধরণী-বুকে ফিরে নর মধু পিয়া পুলক-হরষে,
আঁধার গৃহের কোণে আলো-বায়ু মেগে নারী কাঁপিতেছে ত্রাসে।
চির-মুক্ত নর যবে আনন্দ-সঙ্গীতে তুলে দিগঙ্গনা রাণি'
নিরুদ্ধ প্রাঙ্গণ-তলে বেদনা-বিধুরা নারী কাঁদিছে বন্দিনী।

www.pathagar.com

নারী হ'তে কাড়ি' নর ধরার প্রান্তর-মাঠ আনন্দ-উজলা
'দেবী'র ছলনে তারে পুরাঙ্গন-কোণে বাঁধি' করিল অবলা।
সে 'দেবী' বন্ধন-মোহে হারালো যখন মুক্তি-সংগ্রাম-শকতি,
গ্রাসিল হুঙ্কারি' তারে অমনি বিদূরি' নর কপাট ভকতি।
নর-রচা শাস্ত্রবাণী যাগ-যজ্ঞ-পূজা-হোম বেদ-মন্ত্র যত,
নারীরে শিখালে নাকি অনাচারে হ'বে ধরা কলুষ-আহত।
যে নারী-জঠর-কোলে জনমিল নর
সে নারী নরের কাছে হ'ল হেয়তর।
নর যদি যাচে নারী আপন বিলাস-ভোগে—নারী ভাগ্যবতী ;
বিবাহ-বাঁধন নামে নরের কামনানলে নারী সে আহুতি।
কিশোরী হারায় তার জীবন-বাসনা যত পতির চিতায়,
স্থবির পুরুষ তবু শ্মশান-বাসরে বসি'
কামনা-ভোগের আশে কিশোরীরে চায়।
বিকল-কুরূপ নর সেও চাহে রূপময়ী মনোরমা জায়া,
ভোগের অনল জ্বালি' নিতি নর দহে শত নারী অসহায়া।
নরের ভোগের ক্ষুধা নারীর মাধুরী-মধু নেয় সবি কাড়ি',
নর নহে নারী তরে—নারী তবু তারি।
নর রমে শত নারী—তবু সে-ই হ'ল শুচি চির-পূত পতি,
অসৎ নরের নারী কভু যদি ভুলে পথ—সে হ'ল অসতী।
নর নারী কেহ কভু হারালে শুচিতা,
নর সে দেবতা তবু—নারী সে পতিতা।
'নর' ইন্দ্র পেল চির-সুখ-স্বর্গ-মান,
'নারী' বলে হ'ল শুধু অহল্যা পাষাণ।
পাপ হ'ল লঘু গুরু নরনারী ভেদে,
ন্যায়ের বিধান-দাতা নিখিল-বিধাতা তাই ফিরে শুধু কেঁদে।
নিখিল ধরণীময় এত ব্যথা, এত দুঃখ, এত অপমান,
বেদনা-আঘাত-হানা আশা-হত ঐ লক্ষ নিঃস্ব দীর্ণ প্রাণ,
নিষেধ-মানার শত বাধা-বন্ধ পাপি'
উত্তাল তরঙ্গ-দোলে উঠিয়াছে দোলি' আজ মহা বিশ্ব-ব্যাপি'।
সে উর্ম্মিল মহাদোলে ধরার অন্যায়-পাপ যত অত্যাচার,
বলান্ধের বলদর্প, ক্রোধ-ক্ষিপ্ত মূঢ়তার নিঠুর সংহার,
যাবে আজি চিরতরে নিঃশেষে বিলোপি'।
টলে তারি সিংহাসন, আজি তাই ক্ষণে ক্ষণে মহা ভয়ে কাঁপি'।
হে চির-তাপস দীন। চির-সহা, চির-দহা হৃত-সর্ব্বহারা,
তোমারি অঙ্গুলি-জাগা প্রাণময় শুধু এক ইঙ্গিত ঈশারা

অবহেলে পারে নিতে সারা বিশ্ব জিনি',
শুধু যদি চিনো তুমি নিজেরে আপনি।
জাগো আজি ওঠো বীর, হে আদি নিখিল-ভূপ প্রাণ-মন্ত্র-গুরু,
আবার ধরায় তব মহোল্লাসে করো নব মহাসৃষ্টি শুরু ;
বন-পশু হ'তে তুমি যে ধরারে করেছিলে ত্রাণ নব পথে,
আবার সে ধরণীরে বাঁচাও নিঠুর লোভী নর-পশু হ'তে।
নহ তুমি হত-বল, নত-নীচ, হেয় শূদ্র, হীন ক্ষুদ্র-মনা
তোমারে বিমুগ্ধ করি' রেখেছিল মায়াবীর কুহক-ছলনা,
সে-মায়া-কুহক-ডোর আজ তুমি ফেলো ছিঁড়ে সবলে স্বকরে,
চির-মুক্তি-মহানন্দে তোলো পুনঃ মহাবাণী নিখিল-অম্বরে—
বলো ডাকি' বজ্র-ঘোষে—মহাবিশ্বে আজি হ'তে চির-মুক্ত সবে,
পদানত চিরদাস কেহ কারো হেথা আর নাহি কভু হ'বে।
মানী-হীণে ধনী-দীনে ভেদ-জাগা ঐ যত অসম-বিভেদ
আজি হ'বে চিরতরে তারি মূলোচ্ছেদ।
নাহি র'বে ছোট-বড়—কেহ ভোগী, কেহ দীন, কেহ ধনবান,
নিখিল জগতময় সকলি মানুষ হেথা—সকলই সমান।
প্রভু-দাসে আজি এক—নহে এক ধনী-মানি, আর চাষা-কুলি
একের ভোগের লাগি' শত জনে নাহি আর দিবে প্রাণ-বলি।
নাহি যবে ভেদ-ভাগ মেঘ-বায়ু-আলো-ছায়া-জল-স্থল-নভে,
ধরণীর ধন-মান পাবে সে-ও সমভাগে নিখিল মানবে।
জন্ম-ছলে কেহ নাহি হ'বে উচ্চ-নীচ,
লোভ-সৃষ্ট গোত্র-ভেদে নাহি হ'বে কেহ শূদ্র, কেহ চির-দ্বিজ।
শুধু জন্ম-গর্ব্ব-বলে কেহ কভু নাহি পা'বে সম্পদ-সম্মান,
হীন-জন্ম-পাপে শুধু লভিবেনা কেহ আর ঘৃণা-অপমান।
শূদ্র-দ্বিজে কোথা কিছু নাহি আজ ভেদ,
মানুষ রচিবে পুনঃ নব সাম্য-বেদ।
নারী আজ নহে আর নরের কামনা-কূলে শুধু সেবা-দাসী,
মানুষ মহান সে-ও—সুখ-ভোগ আশা-জাগা মুকুতি-পিয়াসী।
একাকী নরের তরে নহে এই মহা ধরা, জানে আজি নারী—
নারীর পরশ বিনা ধরার সুষমা-সুখ উঠেনা বিথারি'।
নর আঁখি—নারী হ'ল আঁখি-জ্যোতি-রূপা,
এক বিনা অন্য শুধু আঁধার-স্বরূপা।
নর দিবে শক্তি আর নারীরা মাধুরী,
দোহাতে উঠিবে ধরা ফল-পুষ্পে ভরি'।
ছোট-বড় নর-নারী ভেদ আজি নাই,
মানুষ সমান সবে—চির বন্ধু ভাই।

www.pathagar.com

পথের বাঁশী

পথিক রে কর্ যাত্রা শুরু ঐত কুলিশ ডাক্‌ছে গুরু
আর দেরী নয়, আর দেরী নয়,—যায় রে বেলা বয়ে,
উঠ্‌ছে প্রলয়-তুফান ভারী দুল্‌ছে উতল সিন্ধু-বারি,
ডুব্‌ছে তরী ঐ বুঝি তোর, রইবি তবু সয়ে?
দুর্দ্দিনে আজ নাই সে কেহ চাইছে সবায় সুখের গেহ
তুইও যদি রইবি পিছে, চল্‌বে কে রে আগে,
হিসাব-জ্ঞানী বিজ্ঞ যত খুঁজ্‌ছে লোভের পন্থা শত
বে-হিসাবী। তাইত নিখিল তোরেই আজি মাগে।
গৃহ-স্বজন-পিয়ার মায়া ভীরুর বুকে ঘনায় ছায়া
পথিক, তোরে সেই মায়া-ঘোর টুট্‌তে হ'বে আজি,
হয়ত আজের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে নাম্‌বে মরণ বক্ষঃ'পরে,
সেই মরণের পাথার ভেদি' চল্‌রে তরুণ মাঝি।
ঢেউ-দোলা ঐ অথই জলে বজ্র-ক্ষরা বহ্নি-তলে
উছল্-রাগে চল্‌রে দুলি', তোল্‌রে অভয়-পাল,
ভয়-জয়ী তোর বিজয়-গানে চল্‌বি সুখে অসীম পানে
ঢেউ-এর দোলায় দুল্‌বি যদি ধর্‌রে কসি' হাল।

আস্তে-চলার অস্তাচলে পড়্‌বি না ভাই ব্যথায় টলে
অনেক দূরে—অনেক দূরে,—জাগে অনেক পথ,
আলস-মোহের তন্দ্রা-ঘোরে রইলি সবার পিছন প'ড়ে
তাইত চাহি আজের চলায় চপল গতি-রথ।
চল্‌রে শুধু চলার ধ্যানে, চাইবি না আর পিছন পানে
উজান-বানে, জোয়ার-টানে,—সমুখ পানে চল্,
ভয়ের যত আঁধার-আঁধি বেদন-জাগা মরণ-ব্যাধি
চলার তালে, চরণতলে হেলায় ফেলে দল্।

জীবন দানি' জীবন পাওয়া সেইতো ভবে চরম চাওয়া
সাধন তোমার সেইতো শুধু নাই তো কোন আশ,
মরণ-বঁধুর অধর পি'য়া জাগ্‌ছে মরণ-হরণ প্রিয়া
অ-মরণের সুধার কূলে দুল্‌ছে মধু-হাস।

আজ হ রে সেই লক্ষ্মী-ছাড়া সব-খোয়ানো সর্ব্বহারা
বিত্ত নহে—নিত্য চাহ নিখিল-মানস-মন,
হইবে না তোর স্বজন কেহ বিশ্ব হ'বে তোমার গেহ
জগত জুড়ি' হ'বে সবায় তোমার আপন জন।

www.pathagar.com

সকল-দিয়া-নিখিল-জিনা সেই সুরে আজ বাঁধ্‌লে বীণা—
তারি ধ্যানে সুর-সাধনে হয়ত যাবে প্রাণ,
মুছবে যদি নিখিল-ব্যথা ভুল্‌তে হ'বে আপন কথা
শ্রেয় মহান পাইতে হ'লে চাই যে শ্রেয় দান।

কেউ যদি যায় নাইবা সাথে মরণ-ঘেরা তিমির-রাতে
চাইবি না তুই পিছ্‌ পানে আর, চল্‌রে একা চল্‌,
লক্ষ মুখের তিক্ত-জ্বালা বিদ্রূপেরই কাঁটার মালা
আজ হবেরে চলার পথে এই শুধু সম্বল।

আঁধার সে তোর নির্জন পথে আস্‌বে না কেউ প্রদীপ-হাতে
তোমার অধীর অপেক্ষাতে রইবে না কেউ চেয়ে,
পথের শেষে মিলন-আশে আস্‌বে না কেউ মোহন হেসে
ঝর্‌বে না কার অশ্রু-সুখের কাজল নয়ন ছেয়ে।

শুধু সন্ধ্যাতারা সাঁঝের রাতে তোমার আঁধার আঙ্গিনাতে
সজল আঁখের করুণ চাওয়ায় জ্বাল্‌বে তোমার দীপ।

শুক্‌তারা ঐ নিশার শেষে গোপন সুখের সলাজ হাসে
আঁক্‌বে তোমার কপোল-পাশে বিদায়-মধুর টিপ্‌।

নদীর চরে কাশের বনে তোমার উছল চলার গানে
ঢেউ-এর মালা জোয়ার-বানে রইবে একা জেগে,
প্রলয়-রাতের বিজ্‌লী-মেয়ে অসীম গহন গগন ছেয়ে
তোমার সুখের মাণিক জ্বালি' খেল্‌বে মেঘে মেঘে।
ঐ যে প্রাচীন অশথ-ঝুরি নাম্‌ছে নদীর দু'তীর জুড়ি'
সেই অশথের ডালে ডালে গভীর কল-ভাষে,
তোমার বাণী ঘুষ্‌বে পাখী নিশার প্রতি পহর জাগি'
সেই বাণী তোর ফির্‌বে নদীর ঢেউ-এর পাশে পাশে।

আজ সে গহন পথের পানে ঝড়ের দোলায় বজ্রগানে
বিশ্ব অসীম ক্ষণে ক্ষণে ডাক দিয়ে যায় তোরে,
ওরে পথিক ! চল্‌ রে ত্বরা সমুখে ওই অসীম ধরা
ঐত তোরে দেয় ইশারা তারি সুদূর দূরে।

ওই দূরের ঐ গহন বাণী, যুগে যুগে জাগ্‌লো জানি,
ডাক্‌লো সবে অসীম বুকে অচিন অজয় পথে,
ঘর-ভুলানো সর্ব্বনাশী বাজ্‌লরে সে পথের বাঁশী
পথিক্‌রে আজ চল্‌রে হাসি' সেই সুরেরই রথে।

www.pathagar.com

তরুণ-প্রশস্তি

হে তরুণ, হে অরুণ, হে নব সন্ন্যাসী,
অনন্ত আকাশ ঃ ব্যাপী' নিখিল বিভাষি'
জ্বেলেছ যে চিরদীপ্ত রক্ত হোম-শিখা,
তারি বহ্নি-লিখা
বিশ্ব-পথে ফিরে আজি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মর্ম্ম দ্বারে দ্বারে,
মদ-মন্দ গন্ধ তার সুর-ছন্দে খেলে দোলি' অসীম বিথারে
চির দিন, চির রাত্রি ধরি'।—
সেই স্নিগ্ধ সুরভি আহরি'
মলয় বহিছে ধীরে কুসুমে কুসুমে,
নিখিল পুলক-দত্ত তারি গন্ধ-ধূমে।

মুগ্ধ অলি গেয়ে ফিরে তারি জয়—আকুল গীতিকা,
কোরক-বীথিকা
সেই গানে খোলে আঁখি—আসে ঊষা আলো-ছন্দে চির হাস্যময়ী
অপরূপ বর্ণে গন্ধে অগণন মুনিজন-মানস-বিজয়ী।
জাগে পাখী, খোলে আঁখি, কলকণ্ঠে গাহে তার আবাহন-গীতি,
কানন-কান্তারে নিতি প্রভাতি সঙ্গীতে তারি করিছে আরতি।
এত গান, আলো প্রাণ, এত সুধা, জীবন-যৌবন,
এত হাসি গন্ধ গীতি নিত্য-নব প্রাণ-শিহরণ,
হে তরুণ, তব দীপ্ত চিত্ত-পরশনে
জাগে নিত্য মহানন্দে নিঃসীম ভুবনে।
আজি তব তরে
ধরণীর পারে পারে, কান্তারে কান্তারে,
আঁধার পাথার তলে, অচল-শিখর-শিরে, মরুভূ প্রান্তরে,
উর্ব্বশী কৌস্তভ শত, অমন্থিত সুধা কত রহিয়াছে পড়ি'—
নিখিল মন্থন করি' অনাহত আশানন্দে দিবস-সর্ব্বরী
আদি সুরাসুর-সম, হে তরুণ, আজি তোরে আহরি' আনিতে হ'বে
সকলি আবার।
সেই আশা প্রাণ-মন্ত্র দুর্জ্জয় দুর্ব্বার
জাগুক অন্তরে তব উচ্ছ্বসিত মহোল্লাসে আবেগ-আকুল,
ছাপি' দুই কূল
জীবন-তটিনী বাহি' লুটুক্ চৌদিকে
ভরি' দিকে দিকে
উষর নিখিল-প্রাণ মৃত্যু-হীন চির-তাজা নব প্রাণ-রসে।—
শ্যামল জীবন-রাগে জাগুক ধরণী পুনঃ শিহরি' হরষে।

www.pathagar.com

আজি বিশ্বতলে
গহন সংগ্রাম মাঝে বাহু–বীর্য্য–বলে
তোমারে একাকী হেথা হ'তে হ'বে জয়-দীপ্ত পূর্ণমনস্কাম।
তব তরে নহে কভূ সুখ–সুপ্তি–মোহ–জাগা বিশ্রাম–বিরাম।
অসীম নীলিমা ভেদি' শূন্য নভস্তলে
রবি–শশি–গ্রহ–তারা লক্ষ জ্যোতিঃ জ্বলে—
তরঙ্গিত বায়ু–স্তরে মূহুর্মুহু জ্যোতির্লেখ বিদ্যুতস্পন্দন
স্ফুরিছে বিদীর্ণ করি' নীলাম্বু–মেখলা–ঘেরা দিগন্ত–বন্ধন,
বিচ্ছুরি' অলক্ষ্যে নিতি অনবদ্য প্রাণ লক্ষ নির্ভর অমর।—
ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দিশি, আলোক–আঁধার–ঘন সাগর–অম্বর
সেই প্রাণ–দোলা দোলে উঠিতেছে দুলি' নিত্য চল–নৃত্য–ঘোরে—
মহা বিশ্ব বাঁধা আজি চির নৃত্য–জাগা সেই একই সূত্র-ডোরে।

তারি সে স্পন্দন–বেগে সুখ–ছন্দ–দোলে
অনন্ত জীবাণু-রেণু ভ্রান–পথ বাহি' জন্ম লভে গর্ভ–কোলে
মৃত্যুরে দলিয়া নিতি,—লহি' আঁকি' তনু–অঙ্গে অনঙ্গ–ইশারা—
শ্মশান–ক্রন্দন ছাপি' পুলক–মুখর বীণা বাজে সপ্তস্বরা।

তারি তপ্ত ধারা
পূর্ণ পাত্র করি' পান, বাসুকী পাতালে যবে হ'য়ে আত্মহারা
উন্মাদ ! জীবন–বেগে রহি' রহি' ক্ষণে ক্ষণে উঠে শিহরিয়া,
সারা বিশ্ব–হিয়া
সে কম্পন–বেগে ফাটি' বাহিরায় পৃথ্বি–বুকে অগ্নিগিরি রূপে—
অগ্নিলাভা, অগ্নি–জ্বাল বহ্নি–ধূপে।

এই চির জন্ম–ধারা প্রাণ গতি–বেগ অহরহ
সীমা হ'তে সীমান্তের গ্রহ—
হে তরুণ, তুমি আজি তারে লহ বাঁধি' লহ
সুর–ছন্দে বাঁধি তারে লাগা মহা ছন্দ মাঝে
যেথা ঐক্যতানে বাজে।

গহন–গুণ্ঠন চিরি আনো জিনি' বিশ্ব–হিয়া–রক্ত–কোকনদে,
মধুপ গুঞ্জন–রোলে ফুটুক পুনঃ সে তব চিত্ত–মনোহ্রদে।
গোপন আড়াল রচি' নিত্য নব আবরণে সৃষ্টি–নীহারিকা
রেখেছে লুকায়ে যেবা অনন্ত সৃজন–ঘন রহস্য–মণিকা,

আনো সবি কাড়ি' আজি তব সে সাধনা–জাগা জ্ঞান–মন্ত্র–বলে।
নাহি ভুলো, হে তরুণ, হ'তে হ'বে আজি তোমা

www.pathagar.com

চির রাজ–রাজেশ্বর মহা বিশ্ব–তলে

আজি বাঁধো মন,
হে নবীন, হে মোহন ভুবন–তপন,
জীবন–জনম তব নহে নহে নহে কভু অলস–স্বপন,
আছে অর্থ, আছে প্রয়োজন—
ওই তব চিত্ততলে নব সৃষ্টি–সুখ–জাগা সৃজন–বেদন
আছে জাগি' অনির্ব্বাণ চিরদীপ্ত রবি–সব কোটী বর্ষ ধরি'—
আদি স্রষ্টা অসমাপ্ত রেখে গেলো যেই সৃষ্টি মহা বিশ্ব ভরি'
তাহারে পূর্ণতা দিতে। কল্প–কোলে যুগে–যুগে নব স্রষ্টা রূপে
ধরারে গড়িলে তুমি নবরূপে বারে বারে আপন–স্বরূপে।

নাহি লয় তব তরে, নাহি দুঃখ, নাহি ব্যথা ভীরুতা ক্রন্দন,
আছে শুধু সৃজন–স্পন্দন—
ধরণীর ব্যথা–দগ্ধ চির–তীব্র কালকূট—বেদনা–গরল
কাম–গন্ধা বাসনা তরল
নীলকণ্ঠসম আজি নিঃশেষে করিয়া পান তব কণ্ঠ–তলে,
চিন্ময়ে আনিতে হ'বে এই চির মৃত্যু–জাগা মৃণ্ময় ভূতলে।

আজি অবহেলে
নাহি ভুলো স্বরূপ আপনা।
তব তরে, হে তরুণ, নহে শুধু ভোগ–ক্ষুধা, নহে শুধু কামি বাসনা।—
কাঁদো কাঁদো গীতি–গানে আদি রস–মোহ–ঘন–কোম...
আধো–আধো–বাঁধো–বোলে প্রণয়–পীরিতি মাগি' আকুল আকুতি—
তরুণতা নহে নহে, নহে কভু যৌবন–ব্যঞ্জনা
এ যে শুধু হীনতা–গঞ্জনা।—
নাহি পূজা–অর্ঘ্য তাহে, নাহি কোন প্রেমের গৌরব—
প্রেম চাহে শৌর্য্য–বল, প্রেম চাহে ত্যাগের সৌরভ।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এই চির মহা সত্য জানো শুধু জানো,
ভিক্ষা পাত্রে রত্ন মিলে—মোহ–রচা এই ভ্রান্তি নাহি নাহি মানো।
হে তরুণ, প্রেম হ'ল শক্তি তব, শক্তি হ'ল প্রেম,
কভূ সে যে লৌহ–সম, কভূ দীপ্ত হেন।

হোথা বিশ্ব ভরি'
নিরাশা–আঁধার–ঘেরা কত ব্যর্থ হাহাকার উঠিছে গুমরি ;—
জরার মুমূর্ষু বাণী, ভয়–জীর্ণ বার্দ্ধক্যের শত লক্ষ মানা,
অগ্রপথে বারে বারে নিষেধ বিধান শত বাধা–বিঘ্ন–হানা

www.pathagar.com

জ্ঞান-অন্ধ কাপুরুষ নাহি যার চিত্ত-প্রাণ অন্তর আঁধার,
আছে শুধু 'নেতি' 'নেতি' মস্তক-বিকার,
আতঙ্কিত ভয়-ব্যাধি, হরণ-মরণ-মোহ, নিত্য বিভীষিকা
বিবেকেরে বধি' যার নিভায়ে দিয়াছে দীপ্ত চিত্ত-দীপ-শিখা,
হে তরুণ, আজি তারে তোমার চরণতলে দীর্ণ চূর্ণ করি'
তব প্রাণ-সুধা-রসে ধরণীর প্রাণ-পাত্র তুলো তুমি ভরি'।

বীর্য্য-হীন ভীরু বুকে লুপ্ত-তেজ ব্যথিতের ভয়াতঙ্ক মাঝে
তোমার অভয়বাণী-মহাশঙ্খ বাজে
যেন আজি বারে বারে—জীবন-উদ্বেল-বেলা উদাত্ত সঙ্গীতে।—
ভরি' অলক্ষিতে
নিখিল-ধরার শত সঙ্কুচিত ক্ষীণ-কায়া শীর্ণ প্রাণ-ধারা
জীবন-মদিরা-স্রোতে,—ফেনোচ্ছ্বলা নৃত্যময়ী গিরি ঝর্ণা-পারা।

আজি অন্ধকারা
বেগ-বজ্রে টুটি পুনঃ জাগুক নিখিল-বুকে বাধা-বন্ধ-হারা
প্রাণের উদ্দাম গতি, অরূপ ভঙ্গিমা
ধরার বিশীর্ণ মুখে আবার জাগুক দীপ্ত রুধির-রঙ্গিমা।

আকুল হরষে
আজি পুনঃ হে তরুণ, তব সে সরস চির-অমর পরশে
জাগাও ভূলোক-বুকে দ্যুলোক-আলোক জাগা অসীম বাসনা—
তোমার মানস-রথ চলুক অলকা ভেদি' নাহি মানি মানা
অজয়েরে করি জয়, অজানারে জিনি'—
আবার বাজুক তব বিজয় কিঙ্কিণী।

আজি দিকে দিকে
সীমা হ'তে সীমান্তরে দূর অনিমিখে
হোক্ তব জয়-গতি, হে তরুণ, অরুণ-সারথি
বিশ্ব-জয়ী। বিশ্ব-ধরা তব পদ-অরবিন্দে জানাক্ প্রণতি

মানব-বন্দনা

বিরাট অসীম এই মহাধরা সৃষ্টি এ সুমহান
সবারই উপরে জাগে চিরদিন মানুষের সম্মান।

মনি-কাঞ্চন-রত্ন-প্রবাল ধন-সম্পদ যত
রয়েছে তাহারা চিরদিন ধরি' মানুষেরই পদানত।

www.pathagar.com

মানুষই আনিল এত ধন মান নিজ হাতে আহরিয়া
পারো কি আনিতে একটী মানুষ নিখিল–বিত্ত দিয়া?
রাজার রাজ্য–অর্থ–প্রতাপ, কুবেরের শত ধন
যম–রাজ হ'তে পারে কি রাখিতে তাদেরে সে কিছুখন?
মৃত্যুর কথা ছেড়ে দাও, শুধু ক্ষুদ্র যে ব্যাধি–রোগ,
তারি হাত হ'তে বাঁচিল কি কভূ ধন দিয়া কোন লোক?
তবু সেই ধন পুঞ্জিত করি' ধনীর দর্প দেখ
দীনেরে হানি' সে কহিছে আবার—এ তোরি ললাট–লেখ।
ধন–শৃঙ্খলে বাধি' সে করিল মানুষেরে হীন দাস
ধন–বলে আজ আনে সে কাড়িয়া দীনের মুখে গ্রাস।
দুখীর বিত্ত কাড়ি' নিয়ে ধনী কহে তারে ছোট–লোক—
অপমান–হানা এত ব্যথা শোকে কোথা বলো রাখি দুখ।

ধন–ধনিকের এমনই জুলুম চলিছে বিশ্ব জুড়ি'
দীনের রক্ত শোষি' শোষি' শুধু ফুলিছে ধনীর ভূড়ি।
ধনহীন জন নিখিলে কোথাও পায়না দাঁড়াতে ভূমি
ধনীর বিশাল বিলাস–প্রাসাদ উঠিছে গগন চুমি'।
ভূমি–হারা ঐ ক্ষুধিত যাহারা , ভূমিরই অতলে পশি'
ক্ষুধার বেদনা–মোচন আশায় আনে ধন রাশি রাশি।
তারাই হ'লরে চির–ধন–হারা অভাগা শ্রমিক কুলি
তারি ধন লুটি' হ'য়ে মানী–ধনী চলিছ তারেই দলি'।
এত বেশী আনে পারেনা জুড়াতে তবু সে জঠর–জ্বালা—
সে ধন লুটিয়া লাগাও তোমারি রত্ন–আধারে তালা।
সেই পুঞ্জিত ধনের গর্ব্বে ধরারে কুহিছ সরা—
দীনেরে হানিয়া জমা'লে যাহা সে বাঁচাবে মৃত্যু–জ্বরা।
বিশ্ব–বিজয়ী মেসোডন–পতি সেও গেল খালি হাত
লুণ্ঠিত কোটী রত্ন–বিভব যায়নি কিছুই সাথ।
সমাধি–শ্মশানে নাহি ভেদ কোথা ধনী–দীনে একাসন
সেথায় দিবেনা কনিকা শান্তি তব সে বিত্ত–ধন।

তবু সেই ধন–সম্পদ–লোভে হানিছ দুখীরে সদা
অন্ধ। তুমি কি দেখনা সমুখে উদ্যত বজ্র–গদা?

কালের চক্র ঘুরিছে শনৈঃ শন্ শন্ দিনমান,
আজ আছে যারা উপর নেমিতে কাল তার নীচে ধান।
ছিল যারা কাল রাজ–অধিরাজ, আজ তার দীন–সাজ
বণিক–ভিখারী–কাল ছিল যারা আর সে–ই মহারাজ।

www.pathagar.com

মহাকাল-বুকে চলিছে চির এ জীবনের পরিহাস,—
চির ভোগ কেহ পারেনা করিতে গ্রাসিয়া দুখীর গ্রাস।

অপমান হানি' দাওনি যাহারে মানুষের অধিকার,
কালের গতিতে তারি অপমান ভোগো নিজে বারেবার।
ধন ছিল তব, গেল চলি' ধন ; ছিলে মানী, হ'লে দীন—
আজ দেখো বুঝে ধন-হারা হ'লে মানুষ হয়না হীন।
ধন-সম্পদ নহে চিরতরে, শুধু সে জোয়ার-জল,
থির তাহা কভু রহিবেনা কোথা, কাঁপে শুধু টলমল।
ধরার আকাশে আলো-ছায়া সম—ধনহীন ধনবান,
সবারি উপরে জাগে চির রবি—মানবতা মহীয়ান।

হোথায় যাহারা পালিছে ধরণী, চির মূক্ নাহি ভাষা—
যাদের শ্রমেরই ফসলে রয়েছে বড়রা আরামে খাসা ;
আপন বুকের দরদে যাহারা ভিজায়ে মাটির বুকে
ফলানো সেথায় সোণার ফসল নিতুই অসীম সুখে ;
পরশে যাহার হরষে ধরণী পরিছে ফুলের মালা,
ফল-সম্ভারে ভরিল যাহারা নিখিল ধরার ডালা ;
যার স্বেদ-সুধা করিল ধরারে চির-যৌবন দান
—তাই যে ধরার সৃজন-লীলার নাহি কভু অবসান—
সেই তা'রা হ'ল হীন ছোট জাত—তাহারা শূদ্র-চাষা।
কোথা দেখিয়াছ হেন অবিচার, এমন সর্ব্বনাশা।
মাটির মালিক নহে তারা কভু চষে যারা মাটি আজ,
খেটে খেটে সদা মরে তারা শুধু ভুগি' নিতি ব্যথা-লাজ।
মাটিরে মুক্তি দিল ঐ চাষা আপন সৃজনী হাতে
সেই সে ভূমির স্বামীর মুকুট শোভিল রাজার মাথে।
জমি সাথে যার নাহি যোগ সে-ই হ'ল যদি জমিদার
ধন-ধনীকের নহে তবে কি এ বাটোয়ারা বখ্‌রার ?

আজ তুমি বড়, মদ ভরে করো চাষারে অসম্মান
ন্যায়ের বিধানে তব হ'তে তবু নহে সে কি মহীয়ান ?
তুমি হ'লে বড়, নিতি নিতি হেথা পর গ্রাস কাড়ি' ছলে,
আপন শোনিত বিলায়ে সে হের, নিখিলেরে সদা পালে
তুমি যবে কাড়ো হীন লোভ-আশে তৃষিতের তৃষা-জল
হোথা সে তখন ক্ষুধিতের লাগি' ক্ষরে স্বেদ-পরিমল।
সেই চাষা যদি হ'ল ছোট লোক তবে কে সে বড় আর
পর-ধন হরি' হ'ল যেই ধনী মান হ'বে শুধু তার ?

www.pathagar.com

শুন ধনী-মানী। চাষা হওয়া কভূ নহে হীন অপমান
চাষা নামে আছে জড়িত বিপুল খ্যাতি-মান-অবদান।
আদি পিতা তব আদিম, 'আদম' ছিল আদি চাষা সেই,
তারি সন্তান তোমারো শোনিতে চাষা-ছাপ কোথা নেই?
'জনক' মহান ছিল যে ত্রেতায় মিথিলার অধিরাজ
সে-ও যদি চাষা নাহি হ'ত, ধরা হেরিত না 'সীতা' আজ।
দ্বাপরে আসিল চাষা-অবতার হলধর 'বলরাম'
রহিল কি তবু আজো নীচ হীন সেই মহা চাষা নাম?
রাজায় চাষায় নাহি ছোট-বড়—মানুষ সকলি এক
আজ যেই চাষা, সে-ই কাল রাজা, নাহি কোনো ভেদ্ রেখ।

হেরিনু হোথায় মন্দির-কোলে দেবতার বিগ্রহ
সেথা নাকি, দ্বিজ-পুরোহিত বিনা পারে না পশিতে কেহ।
বর্ণ-অভেদে ছু'লে সে দেবতা তাঁর নাকি অপমান।
নিখিল যদি না পরশে চরণ,—কোথা তার সম্মান?
শূদ্র বলিয়া দুরিছ মানুষে, পাষাণ দেবতা লাগি'
আসল দেবতা ফিরিছে কাঁদিয়া মানুষেরই পূজা মাগি'।

করো যারে হেলা হীন নীচ ব'লে আছে সে যে চিরদিন,
দেবতা-বিগ্রহ ছিল আগে কত, আজ তার নাহি চিন।
সেই তারি লাগি' হানিছ মানুষে শাশ্বত সত্য যারা
হায় লোভী দ্বিজ-পুরুত তব এ বিধান চমৎকারা।
দেখিনু সেদিন রাজপথ পাশে হিঁদু মুসলিম মিলি'
পশু আক্রোশে একে আরে হানি' করিতেছে নরবলি।
শুধানু সকলে, কি গুরু কারণে এ ঘোর পাশব লীলা—
কহিল সরোষে মুসলিম যুবা—"দেখনা বজ্র-শিলা
হানিছে 'বেদিনে' সঙ্গীত-রবে খোদার পরম ঘরে—
দেখাল অদূরে মস্‌জিদ এক রয়েছে পথের পরে—
সেই মসজিদ পাশে যদি আজ 'বেদিনে'র বাঁশী বাজে
কেমনে তবে সে রহিবে খোদার ইজ্জত ধরা মাঝে?
আজ সে 'বেদিনে' 'কাতল' করিলে অতুল পুণ্য লাভ
তাই যে সাচ্চা 'মোমেন'-বাচ্চা দিল এ জেহাদে ঝাঁপ।"

কহিনু কাতরে, "শোন ভাই মোর, মানুষে হানিয়া হেন
বাড়াবে কেমনে আল্লার মান বুঝিতে পারি না যেন।
কহ দেখি ভাই তুমি যে নিত্য পঞ্চ নামাজ পড়ো
কহে কভু সেকি সঙ্গীত-পাপে মানুষে কাতল করো?
অথবা ইহা কি বিবেকের বাণী বল দেখি মোরে আজ।"

www.pathagar.com

কহে সে, "বুঝিনা নামাজ-বিবেক দেখে শুধু করি কাজ ;
'দ্বিনে'র ঝাণ্ডা আজো বয় যারা ঐ যে মোল্লাসাব—
'সওয়াবে'র বানে আজো যারা ক'রে দুনিয়া সে সয়লাম,
জিজ্ঞাসো তাঁরে পাইবে সকল 'দ্বিনে'র তত্ত্ব-মূল
টুটিবে নিমেষে তোমার যত সে মিথ্যা-ভ্রান্তি-ভুল।"
অমনি সে 'পাক্ জনাবে' আসিয়া কহি জোর-কর-পুটে—
"জ্বালিবে কি তব 'এলেমের'ই নূর আমার এ তিমির টুটে ?
জাহান-বিরাজি নহে কি আল্লা—একি শুধু মিছে ছল
রাজে নাকি তিনি প্রতি অনুমাঝে প্রতিদিন প্রতিপল ?
তবে সে কেমনে হ'বে আজি শুধু মস্‌জিদ বাসা তাঁর
মন্দির-মঠ-গির্জ্জার বুকে রহিবেনা কোথা আর।
অপমান তার হয় যদি আজ শুধু ঢোল-বাঁশী সুরে
ঝঞ্ঝা-বজ্রে বাজে যবে সুর—যান তিনি কোন্ পুরে ?
মসজিদ হ'ল তোমারি সৃষ্টি—খোদার সৃজন নর
সেই নরে হানি' মসজিদ রাখো—সওয়াব এ কেমনতর ?"

শুনি' মোর কথা কহে সে গরজি—"থাম্ বেটা কম্‌বখ্‌ত্
আল্লার 'দ্বিনে' করিস্ 'সওয়াল' এতো বড়ো হুজ্জত !
পাক্ মসজিদ লাগি' যদি নহে—মুস্‌লিম কেন আর
'দ্বিনে'র লাগি' সে 'বেদিনে' হানিবে—এইত বেহেশ্‌ত তার।
অপমান আজ করিলি 'দ্বিনে'রে—সে যে মহা গুণা ঘোর
সেই 'গুণা'-ভারে আজি হ'তে হ'ল 'বিবি' যে তালাক তোর।"

কহিনু হাসিয়া, "নাহি ডর মোর, কি দেখাও মোরে ভয়
তোমারি মত সে মোল্লারা মিলি' 'দ্বিনে'রে করিছ লয়।
ধর্ম্ম-বেপারী সাজিছো, ধারোনা ধর্ম্মের কোন ধার,
অজ্ঞ-জনারে ঠকায়ে সাধিছো আপন স্বার্থ-ভার।
ভিতরে নাহি সে এলেমের কণা, বাহিরে জুব্বা-দাড়ী
ভাবিছো সাধুর এ ধ্বজা ধরি' খাবে নিখিল-বিত্ত কাড়ি'।
শিখিলেনা জ্ঞান, তোতা-সম শুধু শিখিলে কলেমা চার
জাননা জীবনে কখনো কোন সে আছে কিনা মানে তার।
পড়ো সে কোরানে দয়ারই মহিমা, ক্ষমার গরিমা কত
পর-হিতে প্রাণ দানেরই পূণ্য—এমনি সে বাণী শত।
বাহিরে আসিয়া সাজিছো অমনি কসাই ঘাতক ঘোর,
ধন্য তোমার এ 'দ্বিনের'ই তারিফ—ধন্য চাতুরী-ডোর।

হেরিছি হোথায় আরব-রসুলে—মহানবী, মহামতি
অতুল ধনিকা খোদেজারে লভি হ'ল যিনি ধন-পতি।
দুখীরে বিলায়ে সে ধন তিনি গো র'ল কত উপবাস,

www.pathagar.com

তাঁরি নাকি তুমি কায়েমী নায়েব—লহ কাড়ি' পর-গ্রাস।
দেখেছি মদিনা-মসজিদে তিনি আপন বস্ত্র পাতি'
বিদেশী 'বে-দীনে' বসায়ে সকাশে কাটিছে দিবস-রাতি।
সেই সে 'বে-দীনে' আসিলে এদিনে শুধু মসজিদ-পাশে
আপন বস্ত্রে রচিছ তুমি যে তাহারি মরণ-ফাঁসে।
ভুলিয়াছ তুমি নবীরে তোমার, মানোনা বিবেক-বাণী
'দীনে'র নামেতে 'দীনে'রে হানিয়া টানিছ স্বার্থ-ঘানি।"

চলিনু তখন কাঁদিয়া অদূরে হিন্দু ভাই এরই পাশ,
শুধানু কাতরে, "কহত আমারে কেন এ সর্ব্বনাশ।
কিসের কারণে হেন হীন রণে নিতেছো নিতেছো প্রাণ,
হেথায় ক্ষণিক থামালে বাদ্য দেবতা কি মরে যান?
মানুষের প্রাণ নহে কি মহান পূজা-সঙ্গীত হ'তে
তাহারেই তুমি ধূলি-মুঠি সম ফেলিছ আজিকে পথে।"
কহিলেন তিনি, "বুঝিবে কি তুমি দেব-ব্রাহ্মণ-মান,
পূজা-অর্চ্চনা রোধে যদি কেহ, তবু নাহি নিব প্রাণ?
তাই হের মম গুরু সে পরম মহান স্বামীজি আজ
তরা'তে ভাবতে ঘোর পাপ হ'তে ধরেছে রক্ত-সাজ।"
'গুরু'-পদ-পাশে আসিয়া তরাসে কহিলাম, "মহারাজ,
জ্ঞান-হীন জনে হেন বৃথা হেনে' কিবা বলো হ'বে কাজ;
মানব-শোনিতে ভাসালে মেদিনী, দেবতার নাহি মান,
পথ-হারা তরে শত ব্যথাভারে দেবতারই কাঁদে প্রাণ।
ধর্ম্ম অভেদে প্রেম-ডোরে বেঁধে মিল সবে বুকে বুক,
হেরিবে তখনি জগত-জননী লভে সে কি মহাসুখ।
যে আজি নিঠুর মহাপাপী ঘোর, করো তারে প্রেমদান,
তোমারি প্রাণের মহান পরশে করো তারে প্রাণবান।
তুমি হ'লে ত্যাগী তাই তব লাগি' আজি এ কঠিন কাজ,
শুন মহামতি করি পদে নতি, ধর মম কথা আজ।"

কহিলেন তিনি, "হে জ্ঞান-বিহীন, করো ধীরে অবধান,
আর্য্য যবনে, দ্বিজে দেব-হীনে, আছে বহু ব্যবধান।
দেবতা-পূজারী যদি ভুলে' পথ, যায় করা তা'রে ক্ষমা,
দেব-অরি যারা তা'রেও জড়াবো হেসে বুকে বঁধু সমা?
যুগ যুগ ধরি' এরা দেব' পরে করি' শত অনাচার,
নাশিল অযুত মন্দির-মঠ-বিগ্রহ-পীঠ-দ্বার।
দেব-ভূমি এই ভারতবর্ষ আজো সে ম্লেচ্ছ-পাপে,
গো-মাতার পূত রুধিরে ভাসিয়া শিহরি' শিহরি' কাঁপে।

www.pathagar.com

আজি সে অসুরে দিতে হ'বে দূরি', নহে বধি' কর শেষ,
ভারত-মুক্তি চাহ যদি আজি নাহি রাখো পাপ-লেশ।"

শুনি' বাণী তারি উঠিনু শিহরি' কহি কাঁদি', "মহারাজ,
ধর্ম্মের নামে তুমি যে হানিছ ধর্ম্মেরই শিরে বাজ।
এই ভারতের ঋষি-মানবের নহে কভু হেন বাণী,
বধিয়া মানবে দেবতারে আজি মান দিতে হ'বে আনি'।
ধর্ম্ম-বিভেদ আছে বলে কেহ অমানুষ নাহি হয়,
দেব-দ্বিজে শুধু পূজেনা বলিয়া করিবে কি তা'রে লয়?
হেথায় একদা উঠেছিল গাহি মহাঋষি মহাগান—
'নিখিল-মানব সে যে গো মহান অমৃত-সন্তান'।
হেথায় জাগিল 'জীব-ভগবান'—এ মহা শঙ্খ-নাদ,
'নর-নারায়ণ'—হেথারই বাণী গো অমর এ তত্ত্ববাদ।
বুদ্ধ একদা মহা-অহিংসা ধর্ম্মের বাণী তাঁর
উচ্চারি' এরি বক্ষে ঘুচাল নিখিলের দুখভার।
কবীর-নানক গাহি' গেল হেথা কতনা মিলন-গান,
আজো ভারতের আকাশে বাতাসে কেঁদে ফিরে তারি তান।
প্রেমের নিমাই হেথাই আনিল প্রেমের বন্যা-ঢল,
লভিল জীবন কতনা পাপীগো পি'য়ে তারি সুধা-জল।
সেই প্রেম-ভূমি ভারতেরই বুকে মানুষের হানি' প্রাণ,
ভাবিতেছ বুঝি বাড়াবে দেবতা-মন্দির-সম্মান।
হায় সন্ন্যাসী পাপীরে বিনাশি' পাপ নাহি হবে লয়,
পাপেরে বিনাশো দেখিবে সকলে নিষ্পাপ ধরাময়।
আজ তুমি শুধু হিংসা-অনলে বাড়া'তেছ মহাপাপ,
ভারতে আজো গো এত ব্যথা শুধু লভি' তারি অভিশাপ।
দেশ-সন্তান সবি ভাই ভাই,—সে ভাইয়েরে বধি' হায়,
বাড়িবে শুধু যে মায়েরই বাঁধন—কিবা ফল হবে তায়?
ধর্ম্ম-বিরোধে মানুষেরে হানি' লহ শুধু পাপ-ছাপ,
মন্দির-মঠ-দেবতা কাহারো নাহি তাহে কোন লাভ।"

চলিনু তখন কাঁদি পথে পথে, "হায় হায় একি খেদ,
মোল্লা-পুরুতে শিষ্য-'মুরিদে' নাহি দেখি কোন ভেদ।
ধর্ম্মের ছলে নাশিছে ইহারা অবহেলে কোটী প্রাণ,
ভাবেনা ধর্ম্ম পারেনা করিতে একটী জীবনও দান।
মসজিদ-মঠ-গির্জ্জার ওই ইট পাথরেরই লাগি'
মানুষে হানিয়া উল্লাসে আজি হাসিছে ধর্ম্ম-দাগী।

www.pathagar.com

মানুষই গড়িল মসজিদ-মঠ—গড়েনি মানুষ তা'রা,
ভুলে গেছে আজি এ মহাসত্য ধর্ম্মের পাণ্ডারা।
ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিছে যাহারা জানেনা ধর্ম্ম কি,
আজ যিনি মহা হিন্দু তারেই মুসলিম কাল দেখি।
কাল যিনি ছিল মুসলিম খাঁটী, আজ তিনি খৃষ্টান,
ধর্ম্মের নদে বহিছে এমনই জোয়ার ভাটার টান।
বিকি-কিনি হেন চলিছে ধর্ম্মে কিন্তু বলত ভাই,
তুমি যে মানুষ—এই তব নাম, বেচিবে সে কোন ঠাঁই?
সত্যে তথ্যে হেথাই প্রভেদ—সত্য সে চির এক,
তথ্য হ'ল সে বহুরূপী সম, নীতি ধরে নব ভেক্।
মানুষ তুমিগো—এই তব নাম—জানো এ সত্য সার,
ধর্ম্ম-বিভেদ শুধু সে তথ্য—সবি মায়া ফাঁকি তার।
মানুষের তরে ধর্ম্ম, মানুষ ধর্ম্মের তরে নয়,
ঘোষিতে হবেরে এ মহাসত্য আজ সারা ধরাময়।

হেরি আজি ওই পশ্চিম করে' পুরবেরে অপমান,
পশ্চিম নাকি বীর মহামনা, পূরব সে হীন-প্রাণ।
লুণ্ঠিত হত নিখিল প্রাচ্য প্রতীচির হাতে আজ,
হারালো সেযেগো ছিল তার যত সম্পদ রাজ-সাজ
যুগ যুগ ধরি' র'ল বৃটেনিকা রোমকের পদতল
সেই সে বৃটেন হেলায় জিনিল আজ সারা ধরাতল।
শুন সবে আজি হীনবল হ'লে মানবতা নাহি যায়,
আজ যে স্তিমিত মলিন-কম্প্র, কাল তারি জ্যোতিঃ ভায়
আজ শুনি জ্ঞান-সভ্যতা-হীন প্রাচ্য এ মহাদেশ,
প্রতীচির আজি সে দীন শিষ্য যাচে জ্ঞান উপদেশ।
সেই সে প্রতীচি ছিল যবে হায় পশু সম বনচর,
প্রাচ্য-গগনে ফুটিল তখন জ্ঞান-জ্যোতিঃ ভাস্বর।
হেরো আজি পুনঃ প্রতীচি দীপ্ত—প্রাচ্য অন্ধকার,
জ্ঞানের জগতে চিরদিন কারো নাহি একা অধিকার।
প্রাচীর খৃষ্ট ঘুচাল যাদের অজ্ঞান-মোহ-ভার,
সেই তা'রা আজি মোহ নাশি' ফিরে প্রাচ্যের দ্বারে দ্বার।
জ্ঞান-হীন ব'লে মানবেরে তাই নাহি দিও ব্যথা দুখ,
হয়ত তারাই আনিবে জ্ঞানের অনাগত মহা যুগ।

নিখিল মানব শ্বেত নাহি সব—এও হ'ল অপরাধ,
শ্বেতকায় তাই লুটে আজি যত কৃষ্ণের সুখ-সাধ।

www.pathagar.com

পূব-পশ্চিমে চাহ আজি যেথা অশ্বেতের হেরো দুখ,
সারা ধরাময় শ্বেতের দম্ভ চলে দলি' তারি বুক।
আফ্রিকা আদি অথবা নবীন মার্কিন মহাদেশ,
নিগ্রো-কাফ্রি কোথা নাহি পেল সম্মান-কণা লেশ।
কৃষ্ণ বলিয়া যারে তুমি আজি কর হীন অপমান,
রুধির তাহারো নহেত কৃষ্ণ—বহে সে-ও একই প্রাণ।
ভারত-সূর্য্য কৃষ্ণ-গোপাল ছিল গো কৃষ্ণ-কায়,
হাবসী-বেলাল ছিল যে গো আদি মোয়াজ্জিন মদিনায়।
সেই অশ্বেতেরে কহিলে হীন সে সত্যেরই অপমান,
কৃষ্ণ ও শ্বেত হ'ল দোহে এক মানুষেরই সন্তান।

হোথা হের ধরা জাতীয়তা ছলে রচে নিতি শত ভেদ,
দেশে দেশে তাহে বাঁধিল বিরোধ হ'ল কত নরমেধ।
তারি-পাপ-লোভে এক দেশ আজি আর দেশ করে জয়,
একের লাগিয়া কত দেশে পূত স্বাধীনতা হ'ল লয়।

ভুলিছে মানব জাতীয়তা-মোহে মানবতা মহাদান,
জাতিতে জাতিতে হানাহানি শুধু একে আরে হানে প্রাণ।
দেশ-জাতি নহে চরম সত্য—নাহি রহে চিরদিন,
আজ তব দেশ ভারতবর্ষ, হ'তে পারে কাল চীন।
চীনে-পারসীকে ভারতে-আরবে নাহি যার ভেদাভেদ,
প্রতীচি-প্রাচ্যে রচিলনা যে গো কভু ভেদ-বিচ্ছেদ;
ধর্ম্মে-বর্ণে-দেশে-কালে যার নাহি কোন সীমা-রেখ্
ধরাব্যাপী রাজে সে মহাসত্য—মানবতা মহাএক।

কবির বাণী সে কহি আজি পুনঃ "শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

www.pathagar.com

বৈশাখী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পথের সাথী বন্ধুরা মোর
গোরের গহন বুকে—
ঝড়ের সাথে লড়াই শেষে
ঘুমাও সেথায় সুখে,
সেথা কি আজ আন্‌তে পারি
তীব্র একটুখানি
আজের দিনের তুফান-জ্বালা
সৃজন-প্রলয়-বাণী?

www.pathagar.com

দুটি কথা

আজ থেকে প্রায় আঠারো বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১৩৫১ সালের পৌষ মাসে ১০৬–এ, সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে এ পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি ছিলাম তার প্রকাশক আর মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ তনয় মরহুম মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ ছিলেন এর মুদ্রাকর। পুস্তকটি মুদ্রিত হয় মোহাম্মদী প্রেস, ৮৬–এ, সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে। কিন্তু কবিতাগুলির রচনাকাল তারও বহু পূর্ব্বে। মাসিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর বিশেষ সংখ্যা, দৈনিক আজাদের রবিবাসরীয় সংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যা এবং চতুরঙ্গ, সওগাত প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় এ কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। আজ সুদীর্ঘ দিন পরে সেগুলির প্রকাশনার সন-তারিখ মনে নাই। উপরে উল্লেখিত ১৩৫১ সালের পৌষ মাসে এসব বিচ্ছিন্ন কবিতা প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশের কাল, রচনা–কাল নহে। এ কবিতাগুলি হল এ পুস্তকে প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "মৃত্যু কোথা বল" থেকে "বৈশাখী" শীর্ষক ঊনিশটি কবিতা। পরবর্তী "আজ ও কাল" থেকে "আহ্বান" শীর্ষক সাতটি কবিতা অন্যান্য সময় রচিত ও বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত। সেগুলি কখন কোথায় প্রকাশিত হয়েছে সূচীপত্রে কবিতাগুলির পাশে–পাশে তা উল্লেখ করা হল। এ রীতি অনুসরণের কারণ, কবিতাগুলির রচনা–কাল নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে যদি কখনো কবি মানসের বিকাশ–ধারা অনুসরণের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বে-নজীর আহ্মদ

www.pathagar.com

মৃত্যু কোথা বল্

আমি আছি, বিশ্ব আছে, রক্তে রক্তে মুক্তি নাচে—
মৃত্যু কোথা বল্?
যৌবন, তোর মৌ-বনে দেখ্ মৃত্যু-জয়ী চিত্ত-সুধা
ঝরছে অবিরল।
কোথায় অন্ধকার?—
লক্ষ প্রাণের দীপ্ত শিখায় দীপান্বিতার দীপ্তি ঝলে
অন্ধকারার ভাঙ্‌ছে বন্ধ দ্বার—
কোথায় অন্ধকার?—
রাত্রি নাহি যাত্রীরা চল্ ঐত ঊষার উদয়াচল
তীর্থ পথের হান্‌চে দিশা তোর,
আমার প্রাণের সূর্য-শশী নিদ্রাকাতর চক্ষে পশি'
এবার তোমার ভাঙবে আঁধি-ঘোর।
চলো চলো বিশ্ব চলো, শঙ্কা-কাতর নিঃস্ব চলো,
চলো ধরার শিষ্য-গুরু যত,
আজকে আমি পথ দেখাব স্বর্গ-পাতাল-সিন্ধু-নভ
মোর এ চলায় কাঁপছে অবিরত।
আমার দ্রুত চলার শ্বাসে ঘূর্ণী-কেতন ঝঞ্ঝা আসে
বজ্র নাচে আকাশ কোলে কোলে,
আমার আঁখির অগ্নি-শিখা তীব্র-দ্যোতি বহ্নি-লিখা
বিজ্‌লি-রাগে আঁধার বুকে দোলে।
অগ্নি-গিরি-গর্ভলীনা সর্বগ্রাসী লাভা সম
বক্ষে আমার বহ্নি-তরল নাচে,
রক্ত-স্রোতে ধ্বনি তারি গর্জি' ফিরে রাত্রি দিবা
ওঙ্কারে তার আত্মা অমর বাঁচে।
বিশ্ব-প্রাণের তন্ত্রী যত আমার প্রাণের অন্দ্রে গাঁথা,
কণ্ঠে আমার মন্ত্র বোধন বাজে,
স্বর্গ শোনো, মর্ত শোনো, মানব শোনো, দানব শোনো,
বাঁচব আমি বিশ্ব-নিখিল মাঝে।
অমর আমি, অজর আমি, শক্তি আমি সত্যকামী—
নিত্য আছি থাকব চির ভবে,
পেয়ে আমার স্পর্শধারা সূর্য-তারা তন্দ্রাহারা
জাগছে চির রাত্রি-দিবা নভে।
শোন্‌রে মানব দল!

www.pathagar.com

আমি আছি, বিশ্ব আছে, রক্তে রক্তে মুক্তি নাচে—
মৃত্যু কোথা বল্‌?

সিন্ধু বুকে ঊর্মি দোলে সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী-তলে
তূর্য বাজে ঘোর,
আমার বুকের কলধ্বনি সিন্ধুবুকে উঠ্‌ছে রণি'
অমর মন্ত্র মোর—
বন্দনা মোর গায়,

সপ্ত সাগর নিত্য জাগি এমনি মুখর মন্ত্র-রোলে
অর্ঘ্য পূজা ঢাল্‌ছে মোর এ পায়।
বন্দনা মোর গায়—
মকর তিমি সিন্ধু-তাজি কণ্ঠে হ্রেষা উঠ্‌ছে বাজি
ঢেউএর তালে চল্‌ছে ছুটোছুটি
শ্রান্ত ঘোটক ফেনিল মুখে লুটায় যেবা তেমনি দুখে
ক্লান্ত কাতর পড়চে তটে লুটি,
সেই ফেনা যে পুষ্প সম পুঞ্জে পুঞ্জে নিত্য মম
চরণ-ছোঁয়ার একটু পরশ লাগি'
মালার মত সাগর-কূলে অর্ঘ্য সাজায় পূজার ফুলে
মুগ্ধ আশায় নিত্য রহে জাগি'।

আমার প্রেমের আবেশ-সুখে আবেগ ঘন উথ্‌লে বুকে
সেই আবেগে বিশ্ব-নিখিল কাঁপে
সেই আবেগের উচ্ছাস-র'গে চাঁদের চুমায় সিন্ধু জাগে
বর্ষা-জোয়ার সপ্ত সরিৎ ছাপে,
সেই আবেগের দহন-তাপে লক্ষ চিতা-বহ্নিসম
অম্বু-বুকে অগ্নি-বাড়ব জ্বলে,
গলায় শিলা তপ্ত স্রোতে ব্যাপ্ত করি সাগর মেরু
দগ্ধ অনল জ্বালায় তুহিন-তলে।

মোর সুখেরই হর্ষ-মরা মুক্তি-আকুল অশ্রুধারা
শুক্তি বুকে মুক্তারূপে জাগে—
রত্নাকরের রত্নে সাজি' আমার বিলাস হর্ম্যরাজি
নিত্য জ্বলে দীপ্ত অমল রাগে।

প্রবাল-মণি আমার লাগি' সিন্ধু ভেদি উঠ্‌ছে জাগি'
নীলের বুকে কুঞ্জ শ্যামল রচি'—
আমার আঁখির বিন্দু জলে এমনি শত সিন্ধু দোলে

www.pathagar.com

নীলাঞ্জনে বিশ্ব-নিখিল খচি'।
শোনরে মানব দল !
আমি আছি, বিশ্ব আছে, রক্তে রক্তে মুক্তি নাচে—
মৃত্যু কোথা বল্?

অগ্নি-ক্ষরা দগ্ধ মরু শব্দহারা ক্ষুব্ধ রোষে
নিত্য ফেলে শ্বাস,
মোর রোষেরি রৌদ্র-জ্বালা রুদ্র মরুর বক্ষ-ঢালা
মৃত্যু-হানা ত্রাস—
ক্ষিপ্ত নিশিদিন।
ঘূর্ণি লু-এর চৌদোলাতে চৌদিকে তার মত্ত গতি,
রুদ্ধদাহে ক্রুদ্ধ মায়াহীন—
ক্ষিপ্ত নিশিদিন।
তীব্র বিষের অভ্রজালে সাইমুমেরি ঝঞ্ঝা চলে
বিশ্ববাসীর নিঃশ্বাসেরে রোধি'
এমনি বিষের বহ্নি-ঢালা আমার বুকের হিংসা জ্বালা
উগ্র সুখে নিত্য আমি শোধি'।
উষ্ট্রপাখী গড়ুর-মিতা রক্ত-পাগল সিংহ-চিতা
এই মরুরি বক্ষ চিরে ফিরে—
হিংস্র এরা ধ্বংস-রোষা তৃষ্ণা আমার বিশ্ব-শোষা
নিত্য মিটায় তপ্ত শোণিত-নীরে।

রক্ত-ঝরা বর্শা-করে বল্গাহারা অশ্ব' পরে
দিক্‌দিগন্ত চিহ্ন যেথা হারা,
বদ্দু সেনা অট্টহাসে দিক্‌হারা সে মরুর পাশে
নিত্য উধাও মত্ত তুফান পারা।
মোর বুকেরই উদ্দামতা বেদূঈনের বক্ষে নাচে,
চক্ষে জ্বলে রক্ত-লালিম আভা,
অগ্নি-গোবির বিঘ্ন ভয়াল মোর রোষেরই বহ্নি-রাগে
নিত্য মেলায় তীক্ষ্ণ অনল-থাবা।
সদ্য ফোটা পুষ্প-খচা শস্প-শ্যামল ফুল বাগিচা
পদ্ম-আকুল স্নিগ্ধ সরোবরে—
মরীচিকার স্বপ্ন রচি' এই মরুরি বক্ষ খচি'
মোর মায়ারই মুগ্ধ লীলা ভরে।
এমনি ছঁলার ছদ্ম জালে লুব্ধ লোভী মূর্খ দলে
তৃষ্ণা-তাপে নিত্য আমি নাশি—

www.pathagar.com

রুক্ষ আমি রক্ত-পানি, সৃষ্টি আশে মৃত্যু হানি—
ওষ্ঠে বাজাই সত্য-জীয়ন-বাঁশী।
শোন্‌রে মানব দল !
আমি আছি, বিশ্ব আছে, রক্তে রক্তে মুক্তি নাচে—
মৃত্যু কোথা বল্‌ !

আমার সাগরে জেগেছে ঊর্মি

আমার সাগরে জেগেছে ঊর্মি শোণিত রেখ্‌
ফেনিল লাল—
আমার নিখিলে জাগিছে তুফান প্রলয়-বেগ
টাল্‌ মাটাল্‌।
অটল হাল
সবল বাহুর রাহুর কবলে ধরিবে কে আজ ভাবনাহীন—
কে জমাবে পাড়ি ঊর্মি পাশরি' কে দেখাবে তীর পথের চিন্‌
মরণেরে দলি' কে বাজাবে নব-জীবন-জাগর বাঁশরী-বীণ্‌
প্রাণ-মাতাল !
উজান পাল
কে বাঁধিবে আজ সিন্ধু তরীতে, রুধিবে অন্ধ ঢেউ-এর তাল্‌
ভবন-মোহের ভূবন ভুলিয়া ছিঁড়িবে ভয়ের স্বপ্নজাল—
কোথা সেই নর-সিংহ পাল
ভয়-ভয়াল !—
আমার সাগরে জেগেছে ঊর্মি ফেনিল লাল
জেগেছে তুফান টাল মাটাল্‌।

আমার গগনে জমিছে নিশীথ নিকষ মেঘ—
হাঁকিছে বাজ—
বিজুলী জ্বালার দীঘল ভয়াল বহ্নি-লেখ্‌
ঝলসে আজ ; —
প্রলয় রাজ

ঝড়-তুরঙ্গে বিভোল ভঙ্গে ছুটিছে উধাও দিক্‌বিদিক্‌—
রোষের রুদ্র রৌদ্র-ঝিলিকে ঝলকে অক্ষি অগ্নি-শিখ্‌
হ্রেষার তীব্র তীক্ষ্ণ আরাবে জপিছে মন্ত্র মৃত্যু-ঋক্‌।—
করুণা লাজ
নাহিরে আজ—

www.pathagar.com

চাহে না শান্তি চাহে না কান্তি—চাহে যে রক্ত–লোহিত তাজ—
চাহে না সৃষ্টি সোহাগ–বৃষ্টি—চাহিছে শুধু সে ধ্বংস সাজ—
আজিকে আর নাহি রে কাজ
বিশ্ব মাঝ।—
আমার গগনে ডাকিছে পবন, হাঁকিছে বাজ—
বিজুলী ভয়াল ঝলসে আজ।

আমার ধরাতে জেগেছে তপ্ত বালুকা ঢেউ
মরুর শ্বাস—
সাহারা–জহর সাইমুম্ ধূম দেখেছ কেউ
লু–এর ত্রাস !
কুটিল–হাস
জেগেছে আবার বহ্নি–পাহাড় শুষিয়া সুষমা–বিন্দু–লেশ্
স্নেহের সিন্ধু উষর শুষ্ক, শ্যামল শস্য ভস্মশেষ—
লোভ–দাবাগ্নি বাড়ব–বহ্নি গ্রাসিয়াছে সারা বিশ্বদেশ ;—
সর্বনাশ—
ধ্বংস গ্রাস
ঘেরিয়াছে মোর ধরণী শ্যামল ঘেরিয়াছে মোর সর্বপাশ
জ্বালিয়াছে মধু–মনের মুকুল, দলিয়াছে মোর ফুলের চাষ—

নাহিরে ফল–ফসল আশ—
সুরভি–বাস।
আমার ধরাতে জেগেছে তপ্ত মরুর শ্বাস—
সাহারা–জহর লু–এর ত্রাস।

আমার কাননে রণেনা কূজন মহোৎসব
কলোচ্ছল—
আমার আননে স্বনেনা কোমল গানের স্তব
সুর উতল।—
নিষাদ দল
পেতেছে হেথায় বনবীথি ছায় সবুজ মায়ার মৃত্যু–ফাঁদ
মানেনা ভীরুর ব্যর্থ–বেদনা চিনেছে শূরের স্বার্থ–সাধ—
বন্দীরা হেথা বন্দনা তোলে ত্রাস–শঙ্কিত আর্তনাদ !
বিশ্বতল
বীরের বল্
যুগে যুগে হেরি নিতেছে কাড়িয়া চরণে চূর্ণি অশ্রু জল—

www.pathagar.com

লভিছে বিজয় হেথা নির্ভয় শার্দূল-চিতা ঋক্ষ দল
রক্ত লোহিত আঁখি-উজল—
কামনানল।—
আমার কাননে রণেনা কূজন কলোচ্ছল—
স্বনেনা কোমল সুর উতল।

আমার মনের নভ-দিগন্তে ঈগল-বাজ
মেলিছে পাখ্—

কালো অঞ্জনে কাল্ বৈশাখী পরেছে সাজ—
দিতেছে ডাক।
ঘূর্ণি-পাক
আনিছে উড়ায়ে পথ-লুণ্ঠিত শত কণ্টক ধূলিরধূম,
দিয়াছে ফুরায়ে পিয়ার হিয়ার আবেশ মায়ার অবশ ঘুম,
গিয়াছে ঝরায়ে দখিনা-মলয়ে-সোহাগআকুল ফুলের চুম্
কমল আঁখ।
ঝড়ের শাঁখ
সৃজন নহে—ধ্বংসের গানে হয়েছে আজিকে মুখর বাক্,
সিন্ধু-সুনীলে শ্বেত-ভেলা সম উড়িছে ছিন্ন বলাকা ঝাঁক—
বাজিছে আর্ত কণ্ঠ লাখ্—
ভয়-অবাক।
আমার মনের ঈগল-বাজ মেলিছে পাখ্
কাল্ বৈশাখী দিয়াছে ডাক।
আমার হিয়ার গহন গুহায় তবুও কোন্
ধ্যানী সে কয় ঃ
পাশব বলের আসব-মত্ত শোন্ রে শোন্—
নহে এ নয়।
জ্যোতির্ময়
আছে সে নিত্য চরম সত্য অমর তত্ত্ব পরম পথ,
আছে সে উর্ধ্ব সাধনা-শুদ্ধ মহামানবতা-তীর্থ রথ,
আছে সে শান্তি করুণা কান্তি চির প্রেমময় ভবিষ্যৎ—
আছে রে জয়,
নাহি রে ভয়—
প্রলয়-অনুজ দানব-দনুজ লোভ-রাক্ষস হবে রে লয়—
অত্যাচারীর হত্যালীলার আছে সমাপ্তি সুনিশ্চয়।
পরম আত্মা জাগে অভয়—

www.pathagar.com

আত্মময়,
আমার হিয়ার ধ্যানী সে কয় ঃ
পাশব বল্ নহে রে নয়।

তুমি দাও মোরে আশীর্বাদ

হে রুদ্র তপন-বহ্নি, তুমি দাও মোরে আশীর্বাদ,
আমার নিখিল ভরি' দাও ঢালি' বৈশাখীর জ্বালা,
শুষ্ক হোক, ভস্ম হোক প্রেম-অশ্রু বসন্তের মালা,
লুপ্ত হোক কামনার ব্যথা-তপ্ত যত স্বপ্ন সাধ।
হে বন্ধু, সহে না আর সুখ-সুপ্তি শৃঙ্খলের বাঁধ,
ধরারে ঘিরিছে আজ শোণিতাক্ত মূঢ় মৃত্যু-শালা,
মানুষ মরিছে সেথা লোভ-বহ্নি দহনে নিরালা
আকাশে আকাশে শুনি তারি ক্ষুব্ধ স্তব্ধ আর্তনাদ।

আমার অশান্ত মনে বিদ্রোহের ধূমাগ্নি অবাধ
রচিছে প্রলয় শিখা অগ্নি গিরি বহ্নি-লাভা-ঢালা,
তবুও মাগিব পুণ্য—জ্বালিব না নরক উতালা?
স্বর্গের কামনা নাহি—ক্ষমিও আমার অপরাধ,
শান্তিরে চাহি না আর, আমি আজ ধ্বংসের নিষাদ—
হে রুদ্র তপন-বহ্নি, তুমি দাও মোরে আশীর্বাদ।

হে ভয়াল! চাহি তব ভয়াল অভয়

মৃত্যুময় অবসাদ ক্লান্তি-ঘন নিরাশা আঁধার
নিশীথ শর্বরী সম ঘিরিয়াছে মোর চারি ধার।
ঊর্ধ্বে শূন্য মহাব্যোম রন্ধ্র-হারা কৃষ্ণ যবনিকা,
নাহি বিন্দু জ্যোতির্লেখা, নাহি চন্দ্র তারকা-দীপিকা;
শুধু ঘন কাজলিমা পুঞ্জীভূত তমিস্রা-বিথার—
বাক্যহীন মৌন স্তবে দোলে যেন স্তব্ধ পারাবার।
পদতলে পৃথ্বী টলে মহা কম্পে ক্ষুব্ধ টলমল্
তারি রচা রন্ধ্র পথে উদগারিছে তপ্ত বিষ-জল;
দক্ষিণে অতল-গর্ভ সুগভীর গহ্বর ভয়াল
শানিত কণ্টক-বনে নাচে বামে লক্ষ ফণী কাল,
পশ্চাতে শ্বসিছে শুধু অগ্নি-মরু প্রতপ্ত হুতাশ
সম্মুখে রুধিয়া আঁখি অদ্রি ভীম স্পর্শে মহাকাশ।

www.pathagar.com

নাহি আলো পন্থা নাহি বাধা বন্ধ রুদ্ধ চারিধার,
নাহি চিহ্ন সীমা কোথা, স্বর্গ-মর্ত লুপ্ত একাকার !

চিত্তের দুর্দম বেগ সে-ও ভুলি দুর্জয় সাধনা
মন্ত্র মুগ্ধ ফণী যেন ভুলে গেছে আপনি আপনা—
বক্ষের স্পন্দন-গতি রক্তে রক্তে অশান্ত-নর্তন
স্তব্ধ সবি। বিশ্ব মোর হারায়েছে গতি আবর্তন।
শুধু যেন মৃত্যু-মায়া উগ্র রোষে মহাসৃষ্টি পানে
রুক্ষ তীক্ষ্ন নির্নিমেষ বিষ-ক্ষরা দৃষ্টি ক্রুর হানে।

এমনি যুগান্ত কত রহিলাম চিত্রার্পিত সম
জন্ম-মৃত্যু-দ্বন্দ্ব মাঝে ভয়াবিষ্ট—ভুলি' পন্থা মম।

অকস্মাৎ দূরে—
কাহার গম্ভীর বাণী মেঘ-মন্দ্র-সুরে
উঠিল নির্দোষি' ঘন। স্তরে স্তরে সপ্ত পৃথ্বীতল
সে ওঙ্কার-বাণী-রবে মুহুর্মুহু শিহরি' উতল
জাগিল সম্বিতে কাঁপি। আচম্বিতে মেলি' আর্ত আঁখি
হেরিণু পিঙ্গল ঘন জটাজালে মহাবিশ্ব ঢাকি'—
মহাকাল ভৈরবের একি নৃত্য তাণ্ডব-বিলাস
সুপ্ত করি' স্থিতি-লয় জন্ম-মৃত্যু সর্ব ভীতি-ত্রাস
আকুলি উঠিছে দুলি'। সপ্ত সিন্ধু-অম্বর ধরণী
বজ্র-ঘন মহা-গানে ক্ষণে ক্ষণে উঠে শুধু রণি'।
গম্ভীর ডমরু-ধ্বনি নিরন্তর বাজে তালে তালে
তারি নৃত্য-দোলে-দোলে—স্বর্গ-মর্ত-আসিন্ধু পাতালে
প্রলয়-বিপ্লব নাচে। বাধা-অদ্রি পথ-বিঘ্ন যত
সে মহা-প্রলয় মাঝে সিন্ধু বুকে বিন্দুধারা মত
মুহূর্তে বিলয় লভে। নভে নভে নিরন্ধ্র আঁধার
প্রদীপ্ত বজ্রাগ্নি তেজে বাষ্প সম ছিন্ন বারম্বার।
শুধু উগ্র ভয়ঙ্কর নৃত্য-রত ভয়াল ভৈরব
রহি' রহি' ধ্বংস-বুকে রচে যেন নব সৃষ্টি-স্তব।
স্তব্ধ অকস্মাৎ
বিধ্বংস বিপ্লব যত বজ্র-বহ্নি-পাত।

নিঃশব্দ-শূন্যতা শুধু রাজে একা মহা বিশ্বব্যাপি—
অতনু চেতনা সে-ও প্রাণ-বেগে নাহি উঠে কাঁপি'।
নাহি আলো-অন্ধকার, শুধু যেন নীলাভ নীলিমা
নীরবে ঘেরিয়া আছে ধ্যান-মগ্ন মহা বিশ্ব সীমা।

www.pathagar.com

পুনঃ কবে জানি
সদ্যজাত শিশু-কণ্ঠে শুনিলাম মোর কণ্ঠ-বাণী।
বিস্মিত নয়ন মেলি' হেরি রাজে লীলা-পদ্ম করে
স্মিতাননা বিশ্ব-রমা স্মিত হাসে নব বিশ্ব পরে।
উদয়-অচল-শিরে নব সূর্য জাগে পুনঃ হাসি'।
নব ধরা উঠে জাগি নবাঙ্কুর প্রাণ-স্রোতে ভাসি' !

হে ভয়াল ! হে ভয়াল ! হে ভীম ভৈরব !
যুক্ত-করে বারম্বার লক্ষ কণ্ঠে গাহি তব স্তব।
নির্বীর্য মরণ-ভীতি-অথর্বের দীন আর্ত-ধ্বনি
ক্লীব ক্লিষ্ট মৃত্যু-মুখী জরাজীর্ণ স্থবিরা ধরণী
তোমার চরণ-ঘায়ে প্রলয়ের তাণ্ডব-লীলায়
নিঃশেষে বিলুপ্তি লভি' বারে বারে নব জন্ম পায়।
মুমূর্ষু ধরণী নিতি লভি' তব ভয়ঙ্করী দান
মৃত্যুর মশান মাঝে অমৃতের পেয়েছে সন্ধান।

বিত্ত নহে, নহে সুখ, তৃপ্তিময় সুধা-শান্তি নয়
হে ভয়াল ! চাহি শুধু তব সেই ভয়াল অভয়।

পৃথিবী আরক্ত আজি

পৃথিবী আরক্ত আজি লোভ-তপ্ত শোণিত পরশে
ধ্বংসের দানব যত প্রতীচী প্রাচ্যেরে ঘিরি' ঘিরি'
উল্লাসে উঠিছে মাতি, মৃত্যুর চলিছে ক্রুর খেলা—
আর্তনাদ অট্টহাসি খনে খনে শুধু কানে পশে ;
হিংসার উন্মাদ রোষে করুণা-বন্ধন গেছে ছিঁড়ি'
বিশ্বের অঙ্গনে বুঝি ঘনায়েছে চির অস্তবেলা।
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব জাগে অন্ধকার কামনা-পাতালে
তারি বহ্নি পৃথ্বী' পরে প্রলয়ের রক্তশিখা জ্বালে।
ভোগের পুঞ্জিত স্তূপে বঞ্চিতের নিত্য ক্ষুধা দাহ
লোভের সংঘাতরূপে ধ্বংসের দাবাগ্নি রচে যবে
তখনি নিখিল' পরে নামে পুনঃ মুক্তির প্রবাহ
নিপিষ্ট মানব জাগে আনন্দপুলক কলরবে।
বিশ্বের চলার পথে চলিতেছে নিত্য এই খেলা,
নবতর সৃষ্টি লাগি' চাহি নব ধ্বংস-মৃত্যু-মেলা।

www.pathagar.com

কঙ্কাল

কঙ্কাল-কঙ্কণ পরি আজ ফেরে বুভূক্ষা-পিশাচী,
বক্র ক্রুর অট্টহাসে গেহে গেহে যায় নাচি নাচি—
তারি ক্রুদ্ধ ঘূর্ণিপাকে পথে পথে লুটে লক্ষ শব,
স্রষ্টার সৃষ্টির বুকে আজ বুঝি মৃত্যুর উৎসব !

মানুষ ফিরিছে কাঁদি অন্ধকারে ভিক্ষা যাচি যাচি,
বিবর্ণ বিবশ তনু, তবু আশা আরো র'বে বাঁচি—
চারিদিকে জাগে ঘিরি সীমাহীন চির-সর্বনাশ,
মুক্তি নাই জানে, তবু অক্ষমের শেষ ব্যর্থ আশ
মেলে বাহু, তৃণ ধরি উত্তরিবে সিন্ধু-পারাবার !
সেই ছিন্ন ভগ্ন আশা তার
মৃত্যুরো বেদনা হতে করুণায় আরো যে করুণ !
তবু হায়, 'খনে 'খনে মানুষের আশার অরুণ
দিগন্তে মেলিয়া পাখা চায় হ'তে অনন্তে উধাও—
বারে বারে ডোবে স্বপ্ন-নাও,
মুছে যায় অস্তপথে আঁধারের কৃষ্ণ ছায়াতলে
তপ্ত অশ্রুজলে।

তারি তাপ-বাষ্প দাহে নীলাম্বরে ওঠে অগ্নি-ঝড়—
শ্মশান-মরুভূচারী মশানের রুদ্র অনুচর
জ্বালে হেথা অন্তরীক্ষে শ্যামলিম প্রান্তরে পাথারে
ছায়া-স্নিগ্ধ মুগ্ধ বনে নীলাঞ্জনা শান্ত সিন্ধুপারে

ধ্বংসের বাড়ব-বহ্নি দাবদাহ তৃষ্ণা-ক্ষুধা-জ্বালা
দুঃসহ দুর্ভিক্ষ-ব্যথা মৃত্যু-নীল নরকাগ্নি ঢালা—
ক্রুর ক্ষমাহীন।
তোমার অঙ্গনে আজি এলো সেই সর্বনাশা দিন—
একমুঠি অন্ন লাগি' সুত-কন্যা ভুলিছে জননী,
দেহেরে করেছে পণ্য কত সতী নারী অভাগিনী।
মানুষ পরিছে গলে নিজ হাতে নিজ মৃত্যু-ফাঁস—
নাহি মানে শাস্ত্রবাণী, নাহি আর নরকের ত্রাস ;
পথের কুক্কুর সনে আজ তার অন্ন কাড়াকাড়ি—
হানিছে তাহারে নিত্য রক্ত-আঁখি মত্ত মহামারী।
তার লাগি কহ—

www.pathagar.com

কেমনে জাগিবে আজি উৎসবের আনন্দ আবহ।
কঙ্কাল–কঙ্কণ—
তাহার নিখিল ঘেরি আঁকে শুধু বজ্র–শিখাঙ্কন।

এই ক্ষুব্ধ ধরণীর পথে—
মুমূর্ষুর বক্ষ, দলি' ঐশ্বর্যের স্বর্ণচূড় রথে
আজিও চলেছে তব ক্ষান্তহীন যাত্রা অহরহ—
তোমার দম্ভের দাহে কত নিঃস্ব ব্যথিতেরে দহ
জানিতে চাহ না তা–ও। উন্নতির স্বর্ণ–সিংহদ্বার
চঞ্চল বিলাস মোহে ভুলালো তোমারে বারম্বার—
তোমার লোভের নেশা করিয়াছে তোমারে পাষাণ,
ভুলিয়াছ মানুষের প্রাণ—

ক্ষুধিতের অন্ন কাড়ি রচিয়াছ ঐশ্বর্য–সঞ্চয়,
ভাবিছ করিবে তুমি সেই বিত্তে চির স্বর্গ ক্রয় ; —
ভুল, বন্ধু, ভুল !
বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে জানো নাকি পুণ্যের মুকুল
মুহূর্তে ঝরিয়া যায়—রহে শুধু মৃত ভস্ম–রাশ
সেথা নাহি জাগে বন্ধু, নন্দনের আনন্দ–সুবাস।

উৎসবের লুব্ধ আয়োজন,
আজি সবি ব্যর্থ হেথা যদি নাহি নিঃস্ব আর্তজন
জীবন–আনন্দ–রসে উঠে উচ্ছলিয়া—
লক্ষ চিত্ত হিয়া
তৃপ্তির সুরভিঘন শান্তি–সুধা পিয়া।

চরণে বাজে জিঞ্জির

চরণে বাজে জিঞ্জির
রিণ্–ঝিণ্ রিণ্–ঝিণ্ রিণ্–ঝিণ্।
ক্ষত–জর্জর মর্ম–হিয়ার
কুহরে কুহরে কাৎরায়
ব্যথা–কৃষ্ণ রক্ত–অশ্রুর নিঃশব্দ ফল ;
তবু আনতে হয় ম্লান মুখে
মিথ্যা হাসির শুষ্ক ঝলক—
মরা দিনের শেষ আলোর মতো
ক্লান্ত করুণ—

www.pathagar.com

মৃত মৎস্যের অক্ষির মতো
ফ্যাকাসে-পাণ্ডুর।
বক্ষ-গহ্বরে গুম্‌রে-মরা আর্ত হাহাকার
কণ্ঠ-নালী চিরে আসতে চায় বাইরে—
দাঁতে দাঁত চেপে করতে হয় তাকে রোধ,
আর দু-ঠোঁট ফাঁক করে
হাসির অভিনয়ে
জানাতে হয় ঃ সুখেই আছি ;
চরণে বাজে জিঞ্জির—
রিন্‌-ঝিণ্‌ রিণ্‌-ঝিণ্‌ রিণ্‌ ঝিণ্‌—

সীমাহীন আকাশ, দিগন্ত-চারী বাতাস
আর বিশ্ব-ডোবা আলোর প্লাবন—
তারো মাঝে আছে অন্ধকার কারা-দুর্গ ;
মানুষ সেখানে মানুষ নয়—
নাম তার বন্দী, কয়েদী—
সে গায় গান—
প্রভুর বন্দনা গান।
উদ্যত দণ্ডের কৃষ্ণ ছায়া-তলে
আনত তার শির।
নিষ্প্রভ আঁখি আর পাণ্ডুর আননে
ক্ষণিকের দ্যুতি-ঝলক দেয় দোলা—
প্রভুর তুষ্টি সাধনের ব্যর্থ-প্রয়াস,
অনুগ্রহের উচ্ছিষ্ট-লাভের আশায়
পথ-কুক্কুরের লাঙ্গুল-সঞ্চালন—
জানিয়ে দেওয়া ঃ 'এতেই সুখী' ;
চরণে বাজে জিঞ্জির—
রিন্‌-ঝিণ্‌ রিণ্‌-ঝিণ্‌ রিণ্‌ ঝিণ্‌—

নীল আকাশে ওড়ে পাখী—
স্তব্ধ দুপুরের বুক চিরে ভেসে আসে
শঙ্খচিলের যাত্রা-পথের উল্লাস-গীতি—
বাঁশীর সুরের মতো তীক্ষ্ণ-মধুর।
বুকের রক্ত-সায়রে জাগে ঢেউ—
স্মৃতির অতল গহনে দোলা দিয়ে যায়
কত ছবি—কত কথা, কত কাহিনী,

www.pathagar.com

সন্ধ্যা-উষার কত মুখর উৎসব,
নিশীথের হাসি-কান্নার কত অশ্রু,
অবাধ আর গোপন-শান্ত আর উতল।
প্রিয়ার মধু পরশন
শিশু পুত্রের আধো আধো বোল্—
বন্ধু-সাথীদের অকারণ হাসি-উল্লাস,
কত দুঃসাহসিক কল্পনা-বিরচন—
সম্পদে বিপদে, দুঃখে সুখে
কত গভীর অতল নিবিড়তা
স্বপ্নের ছায়াচিত্র চলে ভেসে,
স্তব্ধ দুপুর কেমন জানি হয়ে উঠে উদাস—
আবার শূন্য আকাশে ডেকে যায় শঙ্খচিল
চি-ঈ-ই-ঈ
বিশ্বের মর্ম-বাণীর গোপন সঙ্কেত—
ইঙ্গিত-মুখর, তীক্ষ্ণ আর মধুর।
চরণে বাজে জিঞ্জির—
রিন্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্ ঝিণ্—

কালো পাষাণ-পাঁচিলের ওপাশে
উন্নত-শির দেবদারু আর শিরিষ গাছের শিরে শিরে
পথিক পবন শুরু করে দেয় নাচের মাতন—
সুদূরের বন্ধন-হারা ছন্দ তালে
লীলা-চঞ্চল তার চরণ-ক্ষেপন ;
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে জ্বলে উঠে
লাল ফুলের রক্ত আগুন—

যেন স্বজন-বঞ্চিত বন্দীদের
দীর্ণ হিয়ার
শোণিত-ছোপানো জমাট অশ্রু।
ফটকের লৌহ-দণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দেয়—
দিশাহারা বিবাগী পথ—
কোন্ অজানা রহস্য-লোকের সন্ধানে
লতিয়ে চলেছে শহরের বুক বেয়ে—
এভিনিউ আর এঁদো গলি—পার্ক আর বস্তি পেরিয়ে
ছায়া-ঢাকা গাঁয়ের কোল ছেপে

www.pathagar.com

সবুজ মাঠের আল ধরে,
পল্লী-বধূদের ভরা ঘটের
উছ্‌লে-পড়া জলে নেয়ে,
হাট্‌-ফেরা পথিকের পায়ে পায়ে,
ময়না-ঝিলের পাশ-ঘেঁসে
পথ-ভোলা রাখালের
সন্ধ্যা-বাঁশীর সুরে সুরে উদাস হয়ে—
কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে—
কে জানে?
হঠাৎ সম্বিৎ আসে ফিরে—
আসন্ন সন্ধ্যায় ঘণ্টা পড়ে—ঢং-ঢং ঢং ঢং,
স্বপ্ন-বিভোর মনের রাশ টেনে
কাতার বেঁধে দাঁড়াতে হয় জোড়া জোড়া—
গণনা চলে ঃ দু, চার, ছ', আট—
যেন সারিবদ্ধ গরু-ভেড়ার পাল,

গোয়ালে পোরার আগে গণে' নেওয়া।
তবু জানাতে হয় কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা—
আন্তরিক না হোক মৌখিক ঃ
সরকার সালাম;
চরণে বাজে জিঞ্জির—
রিণ্‌-ঝিণ্‌ রিণ্‌-ঝিণ্‌ রিণ্‌ ঝিণ্‌—

ঐশ্বর্যময়ী মহানগরী—
প্রাসাদে প্রাসাদে আকীর্ণ তার বুক।
রাজপথের দু'পাশ ঘিরে পণ্য-বিপণী—
সম্পদ আর শোভা
রূপ আর রঙে ঝল্‌মল্‌।
আনন্দ আর সঙ্গীতে মুখর
চিত্রশালার আসনে-আসনে
মুগ্ধ নর-নারীর নয়ানে-বয়ানে
আবেগ আর আবেশ—
আহ্লাদ আর উল্লাস
বন্যার মতো অবাধ উচ্ছল।
রাতের বুক চিরে জাগে রূপের ইন্দ্রপুরী
প্রাসাদের চূড়ে চূড়ে—

www.pathagar.com

রাজপথের তীরে তীরে—
হঠাৎ জ্বলে উঠে
বিজলী-আলোর লক্ষ ফুলঝুরি—
দীপালির নিত্য উৎসব।

ব্যাঙ্কে আর বণিক-গেহে
পুঞ্জীভূত বিত্তের অগাধ সঞ্চার।
উদ্বৃত্তি আর অপরিমেয়তায়
সুদের অঙ্ক নেমেছে সর্ব-নিম্নে
সম্বৎসরে সোয়া তঙ্কা।
হোটেল আর রেস্তোরাঁ
চর্ব্য আর চোষ্য, লেহ্য আর পেয়
নানা আহার্যের চলেছে অঢেল স্রোত
স্বাদে আর গন্ধে
বাতাস হয়েছে ভরপুর—
ফারপো আর পেলেটী
চ্যাঙ্গোয়া আর ক্যাসানোভা—
রূপে আর রসে
হয়ে উঠেছে ফেনিলোচ্ছল—
অজস্রতা আর অপচয়ে গর্ব-মুখর।
তবু এখানে ফেরে অগণ্য ক্ষুধিত মানব—
বুভুক্ষু আর সর্বহারা—
অন্নহীন আর পথের কাঙাল।
একটী কড়ির জন্য
পথে পথে বেড়ায় এরা হাত পেতে।
ছিন্ন বস্ত্রে শীত-গ্রীষ্ম দূরের কথা
আব্রুও যে বাঁচে না—
পেটে নাই অন্ন—
বস্ত্রের কথা কে ভাবে।
পথ-কুক্কুরের সনে,

ডাষ্টবিনে জমে এদের ভিড়—
পচা ভাত আর গলিত রুটির
ছিন্ন টুকরার জন্য
কুকুরে আর মানুষে লাগে কাড়াকাড়ি।
চরণে বাজে জিঞ্জির—

www.pathagar.com

রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্ ঝিণ্—

ঘিঞ্জি বস্তির অন্ধকার বুকে,
সেঁত সেঁতে
আলো-বায়ুহীন নোংরা-কুটীর গেহে
মৃৎ-গুহাশায়ী কুকুর-শাবকের মতো
ঘেঁসাঘেঁসি গুটিগুটি শুয়ে
কাটে এদের রাত।
ভাগ্যে অনেকের জোটে না তা-ও
ভগবানের মুক্ত আকাশ
তারি নীচে তাদের নিত্য বাস—
রোদে-বৃষ্টিতে, শীতে বর্ষায়।
ভগবানের জীব কিনা!
ফুটপাতের বালাখানা—
ছিন্ন কন্থা আর ছেঁড়া চট্
সেই সুখ-শয্যায়—
কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে
কাটে তাদের মাঘের রাত—
উত্তুরে হাওয়ার হু-হু সঙ্গীত
দু'পাটি দাঁতের ঠক্-ঠক্ ঐকতানে
দিয়ে যায় সুরের সঙ্গত।
শ্রাবণ-রজনীর ঝঞ্ঝা ধারায়—
রাজপথের সেই রাজ-শয্যা
কর্দম জলে যায় ভেসে—
ছুটে যায় এরা পাশের শূন্য দাওয়ায় ;
দারোয়ানজী হেঁকে উঠেন মধু কণ্ঠে ঃ
নিক্‌লো শুয়ার।
লাঙ্গুল গুটিয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে
চাইতে হয় ক্ষমাঃ
'বাবুজী মাফী চাই।'
চরণে বাজে জিঞ্জির
রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্—
তারপর—
জীর্ণ জীবনে একদিন নামে
ক্লান্তি-কাতর চরম জরা—
গলিত ক্ষত আর আতপ্ত জ্বর।

www.pathagar.com

নিঃশেষিত–বল বিকল দেহ লুটিয়ে পড়ে
হাসপাতালের দ্বার–প্রান্তে—
এক ফোঁটা ওষুধ আর একটুখানি পথ্যের শেষ আশায় :
কিন্তু খোলে না আর সে দ্বার—
তাই হয়ত স্বর্গেটি দ্বার খুলে'
ভগবান নিজেই নিয়ে যান তাদের ডেকে।
সকল রোগের মহা–মহৌষধ
মৃত্যু–সুধা আকণ্ঠ পান করে
জীব–জীবনের সকল জ্বালা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে
অক্ষয় আরোগ্য–লোকেই হয়তবা এরা চলে যায়।
কিন্তু এই ধরার আরোগ্য–শালা ?
মেডিক্যাল কলেজ আর মিট্‌ফোর্ড—
ক্যাম্বেল আর চিত্তরঞ্জন—
সেখানেও এরা চায় প্রবেশাধিকার ?
মূর্খদের বোঝা উচিত
এ যে বড়লোকদের জন্যই তৈরী,
স্বর্গ যেমন রিজার্ভ দেবতাদের জন্য ;
ছোটলোকদের
ঔদ্ধত্যের সীমা চাইতো !
চরণে বাজে জিঞ্জির
রিণ্‌–ঝিণ্‌ রিণ্‌–ঝিণ্‌ রিণ্‌–ঝিণ্‌।

হেমন্তের মাঠে মাঠে
ফলেছে আজ সোনার ফসল—
অপর্যাপ্ত–প্রচুর।
দিগন্তের সীমা ছুঁয়ে—
আকাশ আর মাটির সেথায় হয়েছে আলিঙ্গন—
আঁখির দিঠি হারিয়েছে যেথায় পথের দিশা—
তরঙ্গিত সাগর–বুকের মতো
সেখান অবধি ঢেউ খেলে যায়—

সোনালী ধানের হিল্লোল বিথার।
হরিতে হলুদে সেখানে দোলে
আলো–ছায়ার মায়া–লীলা—
যেন গৌরী কিশোরীর কালো চুলে ঘেরা
হাসি–মাখা আনন–জ্যোতি।

www.pathagar.com

কিষাণ-কণ্ঠে আবার জাগে সুরের ঢেউ—
আশার আর আনন্দের, তৃপ্তির আর শান্তির।
ধান-কাটার চলে সমারোহ—
নবান্নের নব উৎসব।
আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় আটি ধানের পুঞ্জ
গেহে গেহে ছড়িয়ে দেয়—
খুশীর হিরণ-কিরণ।
গোলা-ভরা সোনার ধানে
ভরে ওঠে কিষাণের বুক।
অকস্মাৎ নীল আকাশে দেখা দেয় কালো মেঘ—
বজ্র-গর্ভ, নিঠুর-নির্দয়।
ভরা গোলা শূন্যতায় ওঠে হাহাকার করে—
মহাজন আর জমিদার—
নায়েব আর গোমস্তা—
পাইক আর পেয়াদা—
পঙ্গপালের মতো নিমেষে নিঃশেষ করে দেয়
কিষাণের সম্বৎসরের
শ্রম-সঞ্চিত সোনার ফসল।
কত আশা আর আকাঙ্খা—
কত কামনা আর কল্পনা,

সিঞ্চিত-চিত্ত-রসে-ফলানো সে-ফসলের সনে
নাড়ির মতো থাকে জড়িয়ে ;
লোভের নিঠুর দস্যুতায়—
সে নাড়ি যখন হয় ছিন্ন—
অব্যক্ত ক্রন্দন জাগে বুকের কূলে কূলে—
প্রতিকারহীন ক্ষুব্ধতায়,
অসহায় ব্যর্থ।
চরণে বাজে জিঞ্জির
রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্—

আজ এসেছে ঈদ—
পুণ্যের উৎসব—
রোজার ত্যাগ-সাধনায়
ভাস্বর দীপ্ত—
কিন্তু সত্যি কি তাই?

www.pathagar.com

শেষ রজনীর পূর্ণ উদর—
সন্ধ্যা-আঁধার না ঘনাতেই
শরবত আর শির্ণী, আঙ্গুর আর আঞ্জিরে
মহাজনের নৌকার মতো
হয়ে উঠে বোঝাই।
মধ্যাহ্নের অনাহার
চক্রবৃদ্ধি হারে হয় শোধ।
তারি নাম ত্যাগ সাধনা ?
কে জানে !

কিন্তু
চিরন্তন যাদের রোজা,
শরবত-শির্ণী-ইফ্‌তার-ওয়ালা রোজা নয়
নিত্য দিনের উপবাস
অনাহার আর অর্ধাহার,
কঙ্কালসার দেহ—চলৎশক্তিহীন চরণ
অসহায় অক্ষম।
রোগে আর শোকে, অপমানে আর লাঞ্ছনায়
অজ্ঞানে আর অন্ধকারে
চির জর্জর যাদের জীবন—
পশুর জীবন,
অরণ্যচারী মুক্ত-স্বাধীন পশু-জীবন নয়,
গৃহ-তাড়িত পথ-কুক্কুরের হীনতাময় প্রাণ-ধারণ।
ওগো পুণ্যবান ?
বলে দেবে,
রোজার তাদের শেষ করে ?
কবে আসবে তাদের ঈদ—
পুণ্যময়, প্রাণময়, আলোময় ঈদ—
সম্মানে আর সম্পদে, সম্ভোগে আর স্বাস্থ্যে
আশায় আর আনন্দে
উচ্ছল ফেনিল !
চরণে বাজে জিঞ্জির
রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্—

ভুলেছি আমরা ঈদ—
ভোজনোৎসব হয়েছে আজ ঈদোৎসব !

www.pathagar.com

ত্যাগ নাই,
তবু আছে পুণ্য ভোগের কামনা।
নাই সাধনা, তবু চাই সিদ্ধি।
দানবের আঘাতে ক্ষুব্ধ মানবতা
প্রতিকার আশে
কেঁদে যায় আজ দ্বারে দ্বারে—
নির্বিকার উপেক্ষায়
সরে যাই আমরা।
ব্যর্থ বিলাস আর লুব্ধ কামনায়
চিত্ত আমাদের বিকৃত, বিবশ।
বক্ষে নাই বল, বাহুতে নাই শক্তি,
অন্তরে নাই বীর্যবান অকুণ্ঠ করুণা—
বিশ্ব-মানবের প্রতি
প্রেমময় আর প্রীতিময়
সিন্ধু-গহীন অতলান্ত করুণা—
নির্যাতিত নিষ্পেষিত আর শোষিতের প্রতি
নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেওয়া
আকাশ-উদার, বিশ্ব-বিশাল করুণা।
ধনিক বেণের লাভ-লোকসান হিসেব-করা
প্রেম করুণার অভিনয় নয়,
বেহিসাবী, বেপরোয়া, মমতাময় করুণা।
চরণে বাজে জিঞ্জির—
রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্—

আজ তাইতো আমরা লাঞ্ছিত জাত।
দাসের আবার উৎসব কি?
গোলামের আবার ঈদ কোথায়?
কোথায় আজ জেহাদ—
সত্য-জেহাদ?—
অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে
আত্মাহুতিময় সংগ্রামের
বজ্র-কঠোর সাধনা?
কোথায় সে—
আত্মত্যাগের পূর্ণ পেয়ালা
নিঃশেষে-পান-করা মুক্তি-শহীদের
লহু-রাঙ্গা লেবাছ?
ত্যাগ নাই,
তবু চাই ভোগ—

www.pathagar.com

চিত্ত আমাদের
হীনতায় হয়েছে ক্ষুদ্র।
অন্তরে নাই ক্ষোভ—
আছে বাহিরের শূন্য বিক্ষোভ ;
মর্মে নাই বেদনার হোমাগ্নি দহন—
আছে শুধু ঈর্ষার চিতা-দাহ ;
বক্ষে নাহি হিংসার হিংস্র দাবাগ্নি—
নব সৃষ্টির আনন্দে
প্রলয়ের মতো নিষ্ঠুর
মৃত্যুর মতো অনিবার,
শুধু আছে বিদ্বেষের কুৎসা বিষ—

শান্তির ছদ্ম আবরণে
ঘৃণ্য ভীরুতার অঞ্চল তলে
আত্ম-গোপনের ব্যর্থ প্রয়াস—
আর পশ্চাৎ হইতে
পৃষ্ঠে ছোরা হানার
হীন আয়োজন।
ওগো বন্ধু—
যেখানে সৃজনোচ্ছল ধ্বংস নেই
সেখানে নবাঙ্কুরের সৃষ্টি কিসের ?
যেথায় মৃত্যু মহান শহিদী নেই
সেথায় মুক্তি-মুখর জীবন কিসের ?
ত্যাগ নাই—
কিসের ভোগ !
রোজা কোথায় যে
ঈদ খোঁজো ?
ওগো পুণ্যবান,
জবাব দাও—জবাব দাও।
চরণে বাজে জিঞ্জির—
রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্ রিণ্-ঝিণ্।

ব্ল্যাক-আউট

মুমূর্ষু ধরায় নেমেছে আজ
নিরাশা-কৃষ্ণ মরণ অন্ধকার।

www.pathagar.com

মহানগরীর বুকে বুকে দোলে
সমাধি-শ্মশানের ভীতি-বিহ্বলতা ;
ফুট্‌পাথের পাশে পাশে দেউটীর মালা
অন্ধকারের আবরণে ঢেকেছে মুখ ;
বজ্রাহত সদ্য-মৃতের মতো লাইট-পোষ্টের সুদীর্ঘ লাইন।
আলোহীন মৃত আঁখি মেলি'
পথে পথে রয়েছে দাঁড়িয়ে—
অন্ধকার রজনীর আর্ত বিভীষিকা।
যেন মুণ্ডহীন কবন্ধের সারি।

*   *   *

বণিক সভ্যতার প্রদীপ্ত আলো
লোভ সংঘাতের প্রলয় ঝড়ে
আজ স্তিমিয়মান—নিভন্ত।

*   *   *

বণিক সভ্যতার ধাঁধাঁলো আলো
অগণ্য বঞ্চিত মানুষের মেদ-মাংসে
প্রজ্বলিত দাবাগ্নি-শিখা
পৃথিবী জুড়ে রচেছিল লোভের হোম-কুণ্ড

সে আলোয় এনেছিল খুশির দীপ্তি
কত জনের মুখে ?
বন্ধু গো শুধায়োনা প্রশ্ন।
"নিরো"-দের বাঁশীর বুকে
দীপক-রাগিণী সৃষ্টির জন্য
চাই রোমের অগ্নি-লীলা।

*   *   *

"নিরো" রা বারে বারে ফিরে আসে—
পৃথিবী জোড়া অগ্নি-লীলা না হ'লে
তাদের বাঁশী বাজে কেমন করে ?
কিন্তু রোমের শেষ আছে,
পৃথিবীরও কি শেষ নাই ?
সমিধ-ভার ফুরিয়ে এল
তাই কি আজ ব্ল্যাক-আউট ?
আর কত কাল—কত কাল !

www.pathagar.com

মৃত্যুর নিশীথ শেষে

হে মানুষ, শোন পাতি' কান—
প্রলয় প্লাবন হানি' দিকে দিকে গরজে বিষাণ।
বিদীর্ণ শবের স্তূপে রচি নিতি মশানের মায়া,
গলিত রুধির-ধারা প্লাবিতেছে ধরণীর কায়া;
আর্তের বিলাপ-ধ্বনি, আহতের ব্যথা-আর্তনাদ
রক্তের ফিনিকি ধারে ভাঙ্গিতেছে জীবনের বাঁধ;
বর্ষিত বহ্নির তলে আজি কোটী তৃষাহত সেনা
আপন শোণিত পিয়া শোধিতেছে জীবনের দেনা।

*   *   *

চীনের পাংশুল বুকে মৃত্যুর আরক্ত রেখা আঁকি'
যে-প্রলয় বন্যাধারা সুদূর জর্ডন-তীর ঢাকি'
হয়েছে উত্তাল—
ভয়াল ভৈরব সম যেন ক্রুদ্ধ মত্ত মহাকাল,—
সে বিপ্লব-উর্মি আজি কুটিল বঞ্চনা-ঘন ভাঙ্গি শত মানা
প্রাচ্যের প্রাচীর ছাপি' পশ্চিম দুয়ারে দিলো হানা।
ব্যথা-কৃষ্ণ ইথোপিয়া ঢেলেছিল যে রুধির লাল,
পশ্চিমের শ্বেতপটে সে-ই আজি তরঙ্গ উত্তাল
তুলিয়াছে ফুসি' ফুসি—মেলিয়াছে কোটী বিষ-ফণা,
তাহারি দংশন-রোষে নিরীহ নিষ্পাপ নর-নারী কতজনা
দেয় নিতি প্রাণ—
সাগর অম্বর ছাপি' রহি রহি রণে তারি
মৃত্যু-ম্লান আর্ত ব্যথা-তান—
হে মানুষ শোন পাতি' কাণ।

হে মানুষ শোন পাতি' কাণ—
আসিছে নিখিল ঘেরি' ধ্বংসের কল্লোল-ঘন বান
যুগ যুগ ধরি' হেথা যত ব্যথা, যত আঁখি-জল
অসহায় ব্যথা-ক্ষোভে করিয়াছে কাঁদি অবিরত,
প্রবলের পদাঘাতে দুর্বলের শীর্ণ বক্ষ' পরে
অন্যায় আঘাত যত হ'ল আঁকা আরক্ত আখরে,
বক্ষের পঞ্জর তলে যত তাপ যত অপমান
গোপনে সঞ্চিত হ'ল নাহি পেল সান্ত্বনা-সন্ধান,
সে অসহ ব্যথাদাহ চীৎকারিয়া দেহতনু ফাটি'
পড়িতে চাহিল লুটে, তবু যারে রাখিয়াছে আঁটি'

www.pathagar.com

বুকের গহন গেহ, যত আঁখি ব্যথা–বাষ্পহীন
মরুর দহন নিয়া উদাস দিঠির তলে র'ল চির–লীন,
সবলের রোষ লাল, শাসনের নাগপাশ ভার
মূক করি রাখিয়াছে যত ব্যথা যত হাহাকার,
ক্ষুধিতেরা যত দু'খে ফিরিয়াছে কাঁদি পথে পথে
সারমেয় সনে মিশি কুড়ায়েছে পথ পাশ হ'তে
ভোগীর ভোগের শেষ—যত দু'খ যত অপমান
সহিয়াছে নিতি তাঁরা রাখিবারে শুধু তনুপ্রাণ,—
অসহায়া নারী যত অমলিন তনুমন নিয়া
করুণা–কুলায় মাগি' পথে পথে ফিরেছে কাঁদিয়া,
পুণ্যের প্রেমের অর্ঘ্য বহিয়াছে বুকে নিশিদিন,—

কেহ তারে চাহিল না—উপবাসে হ'ল তনু ক্ষীণ,
হাহাকারে কাঁদি শেষে আঁখিজলে ঢালি' চিত–সুধা
দেহ–পণ্য বিনিময়ে মিটায়েছে জঠরের ক্ষুধা—
যুগ যুগ ধরি হেন যত পাপ–তাপ হ'ল জমা
আজি তারা জাগিয়াছে, আজি আর নাহি নাহি ক্ষমা।
তাহারি বেদনা–নীরে আজি এল প্রলয়ের বান—
হে মানুষ শোন পাতি' কাণ।

শোন পাতি' কাণ
তবু যেন কোথা বাজে জীবনের নব বাণী–গান।
যুগজীর্ণ অতীতের জরা–হত যত সঞ্চয়ন,
নবীনের সমাগমে আজি বুঝি আসিল পতন ;
জাগিছে নতুন ধরা জীবনের নব জ্যোতিঃ–জ্বালা
প্রসব বেদনা তারি আজি করে নিখিল উতালা—
নাহি নাহি ভয়—
মৃত্যুর নিশীথ–শেষে জীবনের জয় সুনিশ্চয়,
ধ্বংসের অঙ্গনে রণে সৃষ্টির আনন্দ–ঘন গান,
হে মানুষ শোন পাতি' কাণ।

যাত্রী

খোলো খোলো আঁখি—
সুদীর্ঘ শতাব্দী আগে রুধিরাক্ত ফোরাতের তীরে

www.pathagar.com

ঘুমায়ে পড়েছ যারা অবগাহি' তপ্ত বক্ষ-নীরে
তোমাদেরে ডাকি'—
আজিকে কাঁদিছে তারা, ওগো বন্ধু, খোলো খোলো আঁখি।

আমার এজিদ-সেনা ঘিরিয়াছে ধরণীর সীমা
ভয়াল বিমান-রথে ঢাকিয়াছে নভের নীলিমা
তাহারি নিঠুরাঘাতে ব্যথা-আর্ত নরনারী যত
জননী হৃদয়-লীনা কম-কান্ত শিশু লক্ষ শত
নিত্য অবিরত—
ধ্বংসের দহন-কোলে ভস্মসম হতেছে বিলয় ;
বিশ্ববুকে কাঁদে শুধু পুঞ্জীভূত ক্ষুব্ধ ব্যথা-ভয়।
বিহ্বল মানব আজি মুক্তিবাহী পন্থা গেছে ভুলি'—
তবু যেন চিত্তমূলে সুপ্তি টুটি উঠিছে আকুলি'
তব সেই বাণী
ফোরাত তরঙ্গ-তানে আজো যাহা বাজে মোরা জানি।

সে বাণী কহিছে ডাকিঃ হে মানুষ, শঙ্কা নাহি নাহি,
মিথ্যার ডঙ্কার ধ্বনি হোক আজি যত দর্প-বাহী
সত্যের শক্তির ঘায়ে কালি তার অমোঘ বিনাশ,
ক্ষণিক দম্ভের দাহ ক্ষণিকেই হবে ব্যর্থ-আশ।

প্রশান্ত কালের স্রোত চলিয়াছে অসীমের পানে—
অকস্মাৎ তারি মাঝে মরু-ঝঞ্ঝা কেহ যদি হানে,
হে যাত্রী, নাহিক ভয়—সম্মুখে প্রভাত আছে জাগি'
রাত্রির তিমির তলে অভিসার করে তব লাগি'
ঊষার অরুণ আলো সুদূর উদয়াচল পথে—
আবার কেতন দোলে ঝঞ্ঝাহত তব তীর্থ-রথে।

হে যাত্রী, ভুলনা কভু, জ্যোতির্ময় দ্যুতি যদি চাহ
প্রদীপ আধার সম নিতে হবে বহ্নির প্রদাহ—
ঊষার উদয় লাগি' তিমিরা রজনী আসে নিতি
সোনালী শস্যের আশে শ্রাবণের বন্যা বহে ক্ষিতি—
ধ্বংসের দানব যদি নামিয়াছে তব বিশ্বে আজি
সৃজন বাঁশরী নব অচিরে উঠিবে পুনঃ বাজি—
নাহি নাহি ভয়—
জরার ভ্রূকুটি দলি' নব-জাত শিশু লভে জয়।

শুনিলাম বাণী তব চির নব প্রাণ-জ্যোতি-ভরা,

www.pathagar.com

তবু যেন রহি' রহি' মহাতঙ্কে শিহরিছে ধরা—
তোমরা যাহার লাগি' অকুণ্ঠিতে দিলে প্রাণ বলি
নিঃশেষে নিজেরে দানি' মৃত্যুহীন পথে গেলে চলি—
সে-সত্য-ন্যায়ের পথে আতঙ্কের স্থান কভু নাহি
বিপুল বিশ্বাস-বাহী দ্বিধাহীন বীর্য সেথা চাহি।
করুণ মার্সিয়া গাহি' আজি যারা পথে পথে ফিরে
হাহাকারে কাঁদে শুধু ছলনার ছদ্ম আঁখিনীরে—
তাহারা তোমারি নামে তোমারে করিছে উপহাস—
তুমিতো চাহনি' অশ্রু—চাহিয়াছ রুধির উচ্ছ্বাস।
অশ্রুর তরল স্রোতে অন্যায়ের নিকষ কালিমা।
কভু বন্ধু নাহি ঘুচে—সেথা চাহি শোণিত লালিমা।
তোমার রুধির-পূত মৃত্যু-জয়ী মুক্তি-বাণী নিয়া
হে শহিদ, তন্দ্রা টুটি' ওঠ তুমি আবার জাগিয়া—
সুদীর্ঘ শতাব্দী কত সুষুপ্তি শয়নে আছ পড়ি'
জাগর-মুহূর্ত মহা আজি পুনঃ আসিল উত্তরি'—
আর নাহি বাকী
সময় বহিয়া যায়, ওগো বন্ধু, খোলো খোলো আঁখি।

পথের সুর

দূর দিগন্ত, অসীম গগন সীমানাহীন,
উদার বক্ষ, চির স্পন্দিত আলোকময়—
বলাকা-পক্ষ এঁকেছে সেথায় পথের চিন,
ওরে ও যাত্রী—সম্মুখে চলো, নাহিক ভয়।

বন্ধন-মায়া নীড়ের অন্ধ মোহের টান
চির বিলুপ্ত নিঃশেষে লয় হোক্ সে আজ—
নভ-বিহঙ্গ গাহিছে সুদূর পথের গান,
দেরী নয় আর, আছে সম্মুখে অনেক কাজ।

পশ্চাৎ সে যে গলিত পঙ্ক, মৃতের স্তূপ,
সম্মুখে হাসে শ্যামল শস্য, তৃণের দল
অতীত বহিছে সমাধি-শ্মশান-ধ্বংস-রূপ
বহে ভবিষ্য-শিশু শশাঙ্ক প্রাণোচ্ছ্বল।

www.pathagar.com

নহে এ পৃথ্বী শুধুই রুক্ষ মরুভূ-মাঠ—
শোননা বন্ধু নীলাম্বু-ঘেরা দ্বীপের ডাক ?
শ্যাম হিল্লোলে দুলিছে নিত্য পল্লী বাট
নদী-সৈকতে শোননা ডাকিছে চক্রবাক ?

শোষণ-শুষ্ক জীর্ণ অতীত কালের শব
মরুভূ-স্তব্ধ ঊষর পাংশু বালুকাময়—
তাহারে উতরি' দোলে ভবিষ্য মহোৎসব,
চলে অনন্ত প্রাণচঞ্চল জীবন জয়।

উদয় শৈলে ঝাপটিছে পাখা চক্রবাল
আলোরা ছুটিছে ইঙ্গিতে তারি দিক্-বিদিক্—
সপ্ত-অশ্ব-বাহিত তপন রক্ত-লাল
ছুটিছে উধাও শিথিল বল্‌গা অগ্নি-শিখ্।

বন্ধুরা চলো সম্মুখে বাহি' চিত্ত-রথ,
মরু-পর্বত চলোরে লঙ্ঘি শঙ্কাহীন—
এখনো রয়েছে দূর-দুস্তর তীর্থ পথ,
এখনো রয়েছে আলো-অঙ্কিত দীর্ঘ দিন।

সুখ-বিশ্রাম, শ্রান্তি-হরণ, নিশীথ রাত,
সুপ্তি-স্বপন, তৃপ্তি বিলাস এখনো নয়—
এখনো আসিবে অশনি-ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা-বাত
এখনো আসিবে বেদনা-শঙ্কা মরণ-ভয়।

অস্ত-অচলে ধূসর মলিন সন্ধ্যা রাগ
নামেনি এখনো,—থামেনি লক্ষ কূজন গান,
গোধূলি-বধূর জাগেনি এখনো কপোলে ফাগ
কিশোর রাখাল তোলেনি এখনো বংশী তান।

নব কিশোরীর সরম-বিভাস অফুট হাস—
নীল নভাঙ্কে প্রথম উদিত সোনালী চাঁদ,
বিছায়ে জ্যোৎস্না-কোমল আলোর কুসুম রাশ
এখনো পাতেনি সুখ-বিহ্বল গেহের ফাঁদ।

বন্ধুরা চলো টুটি' বন্ধন মোহের বাঁধ—
জীবন-তীর্থ আছে যে এখনো অনেক দূর,
আছে অপূর্ণ এখনো অনেক স্বপন-সাধ,
দূর দিগন্তে ডাকিছে শোকনা পথের সুর !

www.pathagar.com

ঈগল

সম্মুখে নিশীথ রাত্রি দোলামত্ত বৈশাখীর কালো ঝঞ্ঝা-হানা
অসীম দিগন্ত যাত্রী উদ্দাম ঈগল কোথা' মেলো মেলো ডানা।
সম্মুখে প্রলয় নাচে উন্মাদ উল্লাস রোলে বাধাবন্ধ হারা
সম্মুখে বিস্তারি আছে নীলিম নিঃসীম নভ গ্রহ-সূর্য তারা।
সম্মুখে শৃঙ্খল টুটা কাম-মুক্ত কামনার শত কল্প-মেলা,
সম্মুখে অন্তর-লুটা নব বিশ্ব রচনার চির স্বপ্ন খেলা।
সম্মুখে প্রান্তর বাহী জীবন-প্রবাহ দোলে প্রাণ-দীপ্তি-ক্ষরা,
সম্মুখে চিত্তেরে চাহি মুক্তির মানসী ডাকে—"এসো এসো ত্বরা"
সম্মুখে ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির শ্যামল শিশু আয়ু-সমুজ্জ্বলা,
সম্মুখে নিশীথে জাগে উষার রঙীন রেখা আলো-ঝলমলা।
সম্মুখে দুর্গম পথে জীবন-তীর্থের দিশা রহিয়াছে আঁকা
সম্মুখে দুর্যোগরাতি-আঁধার-ব্যর্থতা শেষে জাগে চন্দ্র রাকা—
নাহি মানি মানা—
দুর্দম ঈগল ওরে ! সে চির সম্মুখে পানে মেলো মেলো ডানা।

ও পারে আলোর শুনি গান

বর্ষ অবসান !
এ পারে আঁধারে বসি' ওপারে আলোর শুনি গান।
মৃত বর্ষ লুটে হেথা চৈত্র-শেষ-নিশীথ-তিমিরে,
নবজাত বর্ষ জাগে হেথা দীপ্ত প্রভাতের তীরে
জীবন পাতায় রচি' সুদীর্ঘ স্মৃতির ইতিহাস।
কত আশা, কত স্বপ্ন, কত ব্যর্থ-কামনা বিলাস
আর-নাহি-ফিরে-আসা অতীতের সমাধির বুকে
গোপনে লুকায়ে রাখি'—অনাগত নব স্বপ্ন সুখে
মৃত্যুহীন প্রাণধারা চলিয়াছে সম্মুখের পানে,
দিন হ'তে রাত্রি তীরে, রাত্রি শেষে দিনের সন্ধানে
বিরাম বিরতিহীন—তবু তার যাত্রা নাহি শেষ
বর্ষ আসে, বর্ষ যায়, জন্ম-মৃত্যু অনন্ত অশেষ
চক্রসম ঘুরে শুধু ; নিত্য তার মহা আবর্তন
পাণ্ডুর বিলয় বুকে রচে শ্যাম সৃষ্টির স্বপন।
বর্ষ অবসান !
সন্ধ্যার তারকা জানি আনে শুকতারার আহ্বান ;

নূতন বরষ আসে, পুরাতন বর্ষ অবসান।

অতীত মিলায়ে যায়—অতীতের শত কান্নাহাসি
কালের স্রোতের পথে অজানায় কোথা যায় ভাসি'
নাম-হারা পুষ্পসম—শিশু-রচা যেন খেলা-তরী,
সাঙ্গ হ'লে খেলা তার যায় তারে অমনি বিসরি'।

ক্ষণ আগে যেই বাণী-ব্যথা-স্বপ্ন, যেই ভালবাসা
অন্তরে জাগিয়েছিল তৃপ্তিহীন অনন্ত পিয়াসা
অশ্রান্ত কালের স্রোতে গেলো সেযে অতীতে ভাসিয়া
প্রতি পল মুহূর্তের অবারিত মুক্ত দ্বার দিয়া
বিস্মৃতির শূন্য বুকে। পলে পলে শত অনুরাগে
যে-ব্যথা-আনন্দ শিখা অনির্বাণ ছিল ক্ষণ আগে
মর্মের প্রদীপ' পরে এখনো তাহারি আলো জ্বলে ;
তবু জানি এ নহে সে-ক্ষণ সনে সেও গেছে চলে।
মুহূর্তের ব্যথা-সুখ মুহূর্তে মুহূর্তে হয় লয়,
অণুতে অণুতে তব পলে পলে ঘটিছে প্রলয়।
নহিলে রহিত বন্ধু আনন্দ বেদনা অমলিন
প্রদীপ্ত সবিতা সম তেজ-তীব্র দীর্ঘ চিরদিন।

আজের আনন্দ-সুখ ভুলে যাও আগামী প্রভাতে—
স্বজন-বিয়োগ-অশ্রু মুছে গেছে কবে আঁখি-পাতে।
যে-হবি জ্বেলেছে বন্ধু এই পলে আলোক উজ্জ্বল
পল-শেষে সেও গেছে বাষ্প হয়ে মিশে শূন্যতল।
মুহূর্ত পরের আলো নহে, নহে পূর্ব আলো-শিখা
প্রতি আলো-পুষ্প জ্বলি' নিভে আসে আলোর মালিকা।
যে-হিয়া স্পন্দনে তব জেগেছিল তরঙ্গ চঞ্চল
আনন্দ-বেদনা রাগে মেলেছিল শত লক্ষ দল—
প্রতি অনুভূতি সনে প্রতি পলে যায় সেযে ঝরি'
পশ্চাৎ অতীতে মিশি মুহূর্তে মুহূর্তে যায় সরি'—
সম্মুখ পথের পরে ক্ষীণ হয়ে আসে ঢেউ-দোলা
তারপর দিনে দিনে যায় থেমে সে-দোলা হিন্দোলা।
তব সে কামনা আশা—সে তখন শুধু ভস্ম-ছাই,
প্রতি দোলা শেষে হায় সেযে আর নাই কোথা নাই।

* * *

তুমি শুধু চলিয়াছ জন্ম হতে জন্মান্তরে বাহি'

www.pathagar.com

মুহূর্তের পাখে-পাখে—শুধু সে সম্মুখ পানে চাহি'
রূপ হ'তে রূপান্তরে, মৃত্যু হ'তে মৃত্যুতে উত্তরি'—
অনন্ত সৃজন আশে মৃত্যু-স্রোতে বাহি' সৃষ্টি তরী।
নিগূঢ় রহস্য শোনো ঃ মৃত্যু যে জন্মেরি জন্মদাতা,
মৃত্যু ছাড়া জন্ম নাহি—তুমি সেই মৃত্যুরি বিধাতা।
তোমার নাহিক শেষ—মৃত্যু জয়ী ভবিষ্যের পথে
চলেছে তোমার গতি শ্রান্তিহীন তব যাত্রা-রথে

....

ঋতুতে ঋতুতে সে যে রূপে-বর্ণে করে কত কেলি ঃ
কুঁড়ি ফোটে, পুষ্প হাসে, নবাঙ্কুর জাগে মাঠে মাঠে
শস্যের কুন্তল দোলে দিক্-হারা দিগন্ত ললাটে,
প্লাবন-উচ্ছল নদী তরঙ্গে তরঙ্গে যায় দুলি'—
শরৎ-শশাঙ্ক হাসে গগন-গুণ্ঠন তার খুলি'
দখিনা-মলয় দোলে চৈতালী নিশীথ উঠে জাগি'
মদির বিহ্বল সুখে ধরণী শিহরে কার লাগি ;
আবার লেলিহ বহ্নি রুদ্রের পিঙ্গল জটাজাল
লুটায় ধরায়—কাল বৈশাখীর তাণ্ডব ভয়াল
উন্মাদ আনন্দে জাগে,—বজ্র-বাঁশী বাজে বিশ্ব ভরি'
চকিত-চমকে দোলে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ-বল্লরী,
তাপ-ক্লিষ্টা ধরণীর সঞ্চয়িত অশ্রু-ব্যথা ভার
বর্ষার বর্ষণ-রাগে রচে সুর করুণ মল্লার।
তুমি নিত্য চলিয়াছ সেই চির মহাকাল সাথী
অশ্রু-নীরে কভু ভাসি, কভু সে আনন্দ-রসে মাতি'
বরষে বরষে লভি' নবরূপ নব অবদান,
বর্ষ অবসান,
আবার নূতন দিনে চলে তব নূতন সন্ধান।

সীমাহীন কোন্ পথে চলেছে তোমার অভিযান,
তোমারে আকুল করি দূর-শ্রুত কোন্ মহাগান
সুদূরে নিতেছে ডাকি—কোন্ সে ভোলার খেলেনায়
ভুলানো তোমারে, চির শিশু সম দলি' দুই পায়
বাধার বন্ধন যত—জন্ম-মৃত্যু, যৌবন-কৈশোর—
গর্ভ হ'তে গর্ভ পথে কোথা চলে জন্ম-জন্ম ভোর
কেহ নাহি জানে হেথা—তুমিও জাননা কোথা যাও
কেন যে চলিছ নিতি—সেথা দূরে কি যে তুমি চাও

www.pathagar.com

অজানা তোমারো চির–তবু কোন্ মায়াবীর খেলা
দিলোনা তোমারে কভু রহ ডুবি নিঃসঙ্গ একেলা
অন্তর গহন গেহে কালের স্রোতেরে পরিহরি ;
তাই হেরি নিত্য তব অণুর মঞ্জুষা উঠে ভরি'•
সহস্র কর্মের দোলে,—কালের গতির বেগে কাঁপি'
রক্তে রক্তে জাগে ঢেউ, কণাতে কণাতে ওঠে ছাপি'
ফেনিল তরঙ্গ বেগ—আবর্তিত লক্ষ পরমাণু
মুহূর্তে মুহূর্তে রচে নবরূপ—কেহ নহে স্থানু

এ মহা বিশ্বের বুকে—রূপান্তর ঘটে পলে পলে—
কুঁড়ি টুটি' পুষ্প হাসে, পুষ্প টুটি' লক্ষ ফল ফলে।•
শৈশবের গতি আনে বার্ধক্যের পলিত পতাকা—
তারপর কাল–পথে সমাধির বক্ষে রহো ঢাকা ;
সেথাও বিরতি নাহি—মৃত নহে ধূসর মৃত্তিকা
জ্বলিছে সেথায় নিত্য অনির্বাণ প্রাণ–বহ্নি শিখা।
সেথা সে মাটীর রসে মিশে রচো ফল–শস্য–ভার
তাহারি সুধায় বাঁচে জীব–বিশ্ব জীবন–সংসার।
চলিছে সৃজন খেলা এমনি সে চির অবিশ্রাম
দিন–রাত্রি বর্ষ–মাস—নাহি তার গতির বিরাম।
আজি' শেষে আশে 'কাল'—আসে পুন প্রভাতের গান—
বর্ষ অবসান
আবার বরষ আসে—আসে তার নিত্য অভিযান।

মহাকাল চলিয়াছে নাহি কোনো বিশ্রান্তি বিক্ষেপ,
প্রতি বর্ষ শুধু তার গতি–পথে প্রতি পদক্ষেপ—
অনাদি অতীত বুকে করে কোন্ ধূসর প্রভাতে
ঘুম–জাগা শিশু সম কুণ্ঠার কুণ্ঠিত পদ–পাতে
যাত্রা শুরু করেছিল কোন্ দূর অনন্তের পানে
কোন্ সে সাগর নীলা—কোন্ সে গহন স্রোত–টানে—
আজো সে জানেনা জানি—শুধু তার অস্ফুট গুঞ্জন
ঘুম ঘোরে শুনেছিল ঘুম–ভাঙ্গা কাকলী–কূজন।
ঊষাহীন বিভাবরী জ্যোতিষ্ক বিহীন নভাঙ্গন
অকস্মাৎ সেই গানে জীবন–চঞ্চল শিহরণ

লভিল আনন্দে কাঁপি—নভে নভে জাগিল তপন
তারার প্রদীপমালা, গ্রহ–চন্দ্র লক্ষ অগণন—

www.pathagar.com

ধূম্র জ্যোতি নীহারিকা ভ্রূণ-বিশ্ব আনন্দ চঞ্চল
প্রাণের শিখায় কাঁপি' মেলিল সৃজন-শতদল।
সে লীলা-কমল-বুকে লক্ষ লক্ষ পৃথিবী নবীন
নিত্যদিন জন্ম লভে, পুন লয় লভে নিত্যদিন।
সৃজন-রহস্য-মায়া সেই আদি প্রথম প্রভাতে
আপন রহস্যে ডুবি চলিয়াছে মহাকাল সাথে
অনন্ত অজানা পথে বর্ষ পরে বর্ষ অতিক্রমি'
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে বিস্মৃতির মৃত-বর্ষ-মমী।

জাগে বজ্র ঝঞ্ঝাবায়ু

তরুণ জীবন-পথে নবারুণ আলোশিখা বাহি'
আসিয়াছ যারা—
হে বন্ধু, তাদের লাগি' আজি শান্ত নীল নভ নাহি
জাগে অন্ধকারা,
জাগে বজ্র ঝঞ্ঝাবায়ু জাগে কৃষ্ণ মেঘের বিথার,
সর্ব দিশি ঢাকি'—
দিকে দিকে জাগে শুধু ব্যথা-ক্ষুব্ধ তপ্ত হাহাকার
রক্ত শিখা আঁকি'।
প্রাচ্যের প্রাচীর হ'তে প্রতীচীর সিন্ধু-সীমা ছাপি'
রুধির প্লাবন,
উদ্বেল তরঙ্গ-দোলে দোলিতেছে রুদ্ধ রোষে কাঁপি—
বিশ্ব-নিমগন।
সে-ধ্বংস-প্রলয় বুকে স্বপ্ন-মুগ্ধ, হে বন্ধু কিশোর,
মুক্তি কোথা তব—
রুদ্রের তাণ্ডবে যদি নাহি ভাঙ্গো শত বন্ধডোর
মিথ্যা নব নব ;
ভোগের কুহক মোহ দাসত্বের সোনার শৃঙ্খল
নাহি যদি টুটি
নির্মম আঘাতে নাশো বঞ্চকের লক্ষ মায়াছল—
রহ তবে লুটি'
মিথ্যার চরণ তলে। রচিওনা মুক্তি মন্ত্র-বাণী
স্বপ্নের বিলাস,
ত্যাগের তীর্থের তীরে সত্য আছে—শূন্য বাকা হানি'
বৃথা মুক্তি-আশ।

www.pathagar.com

নব সৃষ্টি লাগি'—
ত্যাগের তাপস যারা ধ্বংসের উল্লাসে উঠে জাগি' !

বিজীর্ণ ভিত্তির' পরে গৌরবের সুউচ্চ শিখর
ব্যর্থ সে রচনা—
ঝঞ্ঝার প্রথম ঘায়ে লুণ্ঠিবে সে ধরণীর' পর
আনিবে বঞ্চনা।
জরার গলিত গর্ভে নবজন্ম সৃষ্টির সঞ্চার—
চির মিথ্যা আশা ;
বিশ্বের রহস্য শোনো ঃ মৃত্যু শুধু জনমের দ্বার
—সৃজন-পিয়াসা।
অতীতের মোহ ভুলি মৃত্তিতলে দাও আজি ঢাকা
পুতিগন্ধ শব—
কণ্ঠ ভরি করো পান জীবনের বজ্র-দীপ্তি-আঁকা
যৌবন-আসব।
হে বন্ধু কিশোর !
তিমির-তমিশ্রাতলে দেখিছনা আসিতেছে
বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝার সাথে অনাগত ভোর।

হে তরুণ যাত্রীদল

তিমির তোরণ টুটি উদয়-শিখর-শিরে শিরে
জ্যোতির্ময় অরুণ-স্বপন—
হে তরুণ যাত্রীদল দিগন্তের দূর তীর্থ-তীরে
তোমাদেরে দিলো আমন্ত্রণ।
সম্মুখে প্রসারি আছে সীমাহারা নভাঙ্গন-রেখা
চরণে লুণ্ঠিছে রবি-কর—
অন্তর-অম্বরে আজো ওরে যাত্রী দেয়নি কি দেখা
মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গ অমর ?
দিক্ হতে দিগন্তরে নিশিদিন ঝঞ্ঝার উচ্ছ্বাসে
বাজে যেই বজ্র-বহ্নি শাঁখ
সিন্ধুর তরঙ্গ ঘেরি শঙ্কাহরা বাড়বাগ্নি হাসে,
শোননি কি আজো তার ডাক ?
পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপি' ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা নাচে
নাচে রুদ্র মৃত্যু-ভয়ঙ্কর—

www.pathagar.com

তারি মাঝে ওগো বন্ধু বজ্র-গড়া চিত্ত যার আছে
জয় তারি-নাহি নাহি ডর
তোমরা রোধিবে বন্ধু যৌবনের লৌহ-দূর্গ গড়ি
ভারতের পূর্ব সিংহদ্বার—
সে বীর্য-দুর্জয়-বাহু দিক্ আজি মহানন্দে ভরি
মুক্তি মন্ত্রে বিশ্ব-বারম্বার।

রৌদ্র দগ্ধ বসুন্ধরা

রৌদ্র-দগ্ধ বসুন্ধরা আজ গাহে মৃত্যুর বন্দনা
তারি দীর্ঘ তপ্ত শ্বাসে শীর্ণ শুষ্ক তৃণশস্প যত
লঘু-পক্ষ শ্যামাঙ্কুর ভূমিগর্ভে বেদনা-প্রহত—
থেমে গেছে বুঝি তার প্রাণোচ্ছল আনন্দ-স্পন্দনা,
তরুশীর্ষ অকম্পিত-শাখে শাখে দোয়েলা চন্দনা
সৃষ্টির মুখর কণ্ঠ—সেও আর্ত স্তব্ধ বাণী হারা—
'খনে খনে বালি-বহ্নি বহে আনে ধ্বংসের ইশারা,
রৌদ্র-দগ্ধ বসুন্ধরা আজ গাহে মৃত্যুর বন্দনা।

কে জানে কোথায় দূরে তুষারার্দ্র হিম-অদ্রি-শিরে
এ বহ্নি-শোষিত বাষ্প বিন্দু বিন্দু হতেছে সঞ্চিত
অকস্মাৎ বাঁধ ভাঙি এই তীব্র নরকাগ্নি তীরে
হয়ত কল্লোলে নামি যত আর্ত আনন্দ-বঞ্চিত
সবারে সিঞ্চিত করি জীবনের স্পন্দিত আসবে
ধরারে ভাসায়ে দিবে নবঘন মেঘ-মন্দ্র-রবে।

পৃথিবী শিহরে আজি

পৃথিবী শিহরে আজি বজ্রগর্ভ মেঘের আরাবে,
উত্তরের মেরু-ঝঞ্ঝা তারি সাথে রচিছে প্রলয়,
ধ্বংসের জিঘাংসা-ঘন চির রুদ্র আশীর্বাদ নাবে—
সৃজন উল্লাস আশে দৃপ্ত কণ্ঠে গাহি তারি জয়।

পৃথিবী মাগিছে আজি প্রাণদীপ্ত নবাঙ্কুর মেলা,
শতাব্দির ক্লেদভার আর সে যে পারেনা বহিতে—
পুঞ্জিত অন্যায় ব্যথা খেলিতেছে ছলনার খেলা,
তাহারে বিদূরি' ধরা মুক্তির নিঃশ্বাস চাহে নিতে।

www.pathagar.com

পৃথিবী শুনিছে আজি নবশ্রুত জীবন-সঙ্গীত,
নূতন যাত্রীরা আসে—পদধ্বনি বাজিতেছে কাণে,
ভাঙ্গিছে তাহারা যত অন্যায়ের কারা-বেদী-ভিত্
সুন্দর সৃজন সুখে অথর্বক্লীবেরে তা'রা হানে—
জীবন-বসন্তে পুন জাগিবে সে জানে গানে গানে
তাহারি আনন্দে আজি বরিছে হেলায় মৃত্যু-শীত।

ঝড়ের মাতন জাগ্‌ল আজি

ঝড়ের মাতন জাগ্‌ল আজি জীবন-কূলে -কূলে
ওগো মাঝি, পালটী তুলি দাও না তরী খুলে—
দূরের পথে বাজলো বাঁশী,
দুলছে, নভে প্রলয়-হাসি,
বাঁধনকারা মরণ-ফাঁসী, যাওনা আজি ভুলে—
ঝড়ের দোলা আস্‌ল আজি জীবন-কূলে কূলে।

সিন্ধু-শকুন মেলছে পাখা অকূল পথ পানে
উর্মি-উতল সিন্ধু নাচে তাহার গানে গানে,
তারি আঁখির বিজলী-রেখা
কৃষ্ণ মেঘে খেল্‌ছে একা—
বজ্র বাজে নিত্য তারি কণ্ঠ-গীতি তানে
সিন্ধু-শকুন মেলছে পাখা সুদূর পথ পানে।

বহ্নি বাড়ব রক্ত-শিখা তুহিন বুকে জ্বলে—
মৃত্যু-পাগল মকর তিনি চলছে দলে দলে,
মুক্তি রণে জীবন যাচি
নিত্য তা'রা রয় যে বাঁচি,
চরণ হানি' মরণ তারা আনছে পদতলে
বহ্নি-বাড়ব-রক্ত-শিখা—তুহিন-বুকে জ্বলে।

স্তব্ধ গোরের শান্তি টুটি' জীবন ওঠে জাগি
বন্দী-গেহে বান্দা হাঁকে মুক্তি-পথ লাগি'—
শিকল-টুটা ঝঞ্ঝনাতে
অগ্নি নাচে বক্ষপাতে—
শাস্ত্র নহে—শস্ত্র আজি লইতে হ'বে মাগি'—
স্তব্ধ গোরের শান্তি টুটি' জীবন ওঠে জাগি।

www.pathagar.com

শুষ্ক মরুর শূন্য বুকে লু'এর হাওয়া নাচে,
চক্রবালের যাত্রী তারি তীব্র জ্বালা যাচে—
বিঘ্ন–ভরা পন্থা মাঝে
মুক্তি–পূত তীর্থ রাজে,
বুঝ্‌চে সেযে মৃত্যু–বিষে সত্য জীবন আছে—
শুষ্ক মরুর শূন্য বুকে লু'এর হাওয়া নাচে।

মুকের মুখে জাগ্‌ছে নব বহ্নি–জ্বালা ভাষা,
মৃত্যু–অসার দাসের বুকে বিশ্বজয়ী আশা—
সুপ্তি–ঘেরা রাত্রি টুটি
রক্ত ঊষা উঠ্‌ছে ফুটি—
জরার শেষে বীর্যে–গড়া আস্‌ছে সর্বনাশা
মুকের মুখে জাগ্‌ছে নব বহ্নি ভরা ভাষা।

বৈশাখী

আয় বৈশাখী, কাল-বৈশাখী !
তোর, ঝড়ের দোলায় উড়িয়ে দে সব ধূলার জটায় জগৎ ঢাকি'।
ছড়িয়ে দে' তোর মেঘের চিকুর ঐ আকাশের কোণে কোণে,
গুড়ু গুড়ু বজ্র বিতান বাজাও যেন নিখিল কোণে
সিন্ধু–শরিৎ–কানন গিরি
ধূম্র–মেঘে আসুক ঘিরি'—
আকাশ–ধরার বাঁধন ছিঁড়ি প্রলয় নাদে যাওরে ডাকি'
নটরাজের নাচন–দোলায় আয় নেচে আয় কাল–বৈশাখী।

ধূসর তোমার ধূম্র জটা ধূমকেতুর ঐ পুচ্ছ সম
দীর্ণ করি' জীর্ণ ধরা ঘুরাও বেগে উগ্রতম,
ঘূর্ণী ঝড়ের ঘূর্ণা তালে
উড়াও ভয়ের উর্ণ–জালে
চূর্ণ করো পূর্ণকালে মৃত্যু–ভীরু–শান্তি মম,
রুদ্র দেবের চক্র চাহি—চাইনা দেবী কান্ত কম !

পুরাতনের শীর্ণ পাতা জীর্ণ যাহা পড়ুক ঝরি'
মৃত্যু–মলিন পান্থ যারা পন্থা ছাড়ি' যাকনা সরি'।
ধ্বংস বাউল যাকরে নাচি'
বাঁচার যাহা রইবে বাঁচি,

www.pathagar.com

মুমূর্ষুরা মরণ যাচি' চরণ তলে থাক্‌না পড়ি।,
আবার ধরা নবীন প্রাণের নবাঙ্কুরে উঠুক ভরি'।
নির্ভাবনার গর্বে যারা সুনিশ্চয়ের প্রহর গোণে
সর্বনাশের কৃষ্ণ ধ্বজা উড়াও তাদের আকাশ কোণে;
আকস্মিকের বজ্র হানি
ডুবাও বিলাস-শান্তিবাণী
তন্দ্রাহারা মন্দ্র রবে ঝড়ের বাণী যাওরে হাকি'—
পিনাকীর ঐ পিনাক রবে আয় নেচে আয় কাল-বৈশাখী।
দিক-বিদিকে চালাও আবার ঝঞ্ঝা-তাজী সর্বনাশী
রক্ত-ফেনিল ওষ্ঠে জাগাও বজ্রভরা তরিৎ হাসি
তীক্ষ্ণ তারি হ্রেষা ধ্বনি
বিশ্ব মথি' উঠুক রণি'
মিথ্যা ভয়ের লক্ষ ফণী সেই আরাবে যাকরে ভাসি'—
নতুন ধরায় নতুন গানের বাজুক ঘন মুক্তি-বাঁশী।

মূর্খ যারা সুপ্তি ঘুমে শান্তি-ঘন জীবন জানে
তোমার বাণী বজ্রসম গর্জি উঠুক তাদের কানে।
আধমরারা উঠুক জাগি'
নয়ত নিত্য দিনের লাগি'
যাক্‌রে চরম মরণ মাগি' কালের বিলয় সিন্ধু পানে—

জীবন্তেরা জাগরে শুধু মৃত্যু-জয়ী মন্ত্রগানে।
শান্ত নদীর প্রান্ত বাহি বাইলো যারা ভগ্ন তরী
ঢেউ-দোলারি নৃত্যে মাতো সেই-ভীরুতা মগ্ন করি' !
হিন্দোলাতে দোলাও বারি,
নও জোয়াঁরা জমাক্ পাড়ি,
বৃদ্ধ-ভীরু শঙ্কা স্মরি আর্ত ভয়ে যাক্‌রে সরি'—
বীর্যবানের চিত্ত জাগুক দৃপ্ত গানে কণ্ঠ ভরি।

হিম্-তুহিনের স্পর্শমোহে স্তব্ধ জমাট সিন্ধু-ধারা,
নৃত্য-উতল ছন্দে তব আবার কর মত্ত-পারা ;
জাগাও উছল উর্মিমালা,
শীর্ষে বাড়বাগ্নি জ্বালা,
ভাঙ্গো বাঁধার রঙ্গশালা—বন্ধ স্রোতে অন্ধ কারা,
মুক্তবাঁধন মত্ত বারি দুলুক আবার আত্মহারা।
পুঞ্জীভূত ব্যর্থ ব্যথা বর্ষ ভরি' জম্‌ল যাহা
ভগ্ন আশার নগ্ন হুতাশ, ছিন্ন প্রাণের আর্ত হা-হা,

www.pathagar.com

বিঘ্ন-বেদন-কান্না যত
তীব্রগতি বাজের মত
তীক্ষ্ণ ছোঁয়ে নিক্‌না কেড়ে ক্ষিপ্র তোমার ঝঞ্ঝা-পাখী,
লক্ষ-ঈগল-পক্ষ-পালে আয় উড়ে আয় কাল্‌-বৈশাখী !

কাল্‌-বৈশাখী ! কাল-বৈশাখী ! বন্ধু, আনো মিলন-রাখী !
বৈশাখে আজ যাত্রা শুরু বর্ষশেষের অনেক বাকী,
দীর্ঘ পথের প্রান্ত-দেশে
মিল্‌ব মোরা আবার হেসে
লক্ষ প্রাণের বক্ষে এসে, পূর্ণ জীবন দেখবো চাখি'—
সেই সে অমর সৃষ্টি-আশে ধ্বংস-নাচে বিশ্ব ঢাকি
যাত্রা-সাথী বন্ধু আমার ! আয় নেচে আয়, কাল-বৈশাখী !

আজ ও কাল

শুক্‌নো হাড়ে চট্‌কে যাওয়া গোস্ত
শীর্ণ শিরায় নাইকো লহু লেশ—
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো দোস্ত
জীর্ণ জাহান হোকনা পুড়ে শেষ।

দেখ্‌ছো পানি—সাগর ভরা পানি,
তৃষ্ণা-তাপে তপ্ত তবু হিয়া—
পাইনা তাহার বিন্দু কণাখানি
তৃপ্ত হবো কণ্ঠ ভরি পিয়া ;
শুকাও তারে বহ্নি-দোজখ্‌ হানি
কি কাজ তোমার এমন সিন্ধু দিয়া।

বিত্ত আছে বিশ্ব-ভরা শুনি
শষ্য-ফুলে পৃথি ভারানত
নিত্য তবু খাস্তা তবিল গুণি,
রিক্ত দেখি আমার খামার যত ;
সত্য বটে লক্ষ জমিন বুনি
শূন্য তবু গোলা অবিরত।

শহর-জোড়া এই যে প্রাসাদ পুরী
শীর্ষ-চূড়ায় আকাশ আলো ঘেরা,
আমরা তবু কাদায় পথে ঘুরি

www.pathagar.com

বর্ষা–ঝড়ে নাইকো কোনো ডেরা ;
মৃত্যু এলে লুটাই রাহা জুড়ি
গোশ্বা–তবু প্রাসাদ–বাসিন্দারা।

শুকনো হাড়ে চট্‌কে যাওয়া গোস্ত্
শীর্ণ–শিরায় নাইকো লহু লেশ
আগুনজ্বালো, আগুন জ্বালো দোস্ত্
জীর্ণ জাহান হোকনা পুড়ে শেষ।

পণ্য–দোকান বসন–বাসে ঠাশা
ওর্ণা–শাড়ীর নাইকো সীমা যেনো,
বস্ত্র বিনা মরণ সর্বনাশা
লক্ষ নারী বর্‌ছে তব্ কেনো
অর্থ কি তার—কোন্ দুখের এ ভাষা
কেউ তুলেছো প্রশ্ন কভু হেনো !

ধানের পাহাড় তোমার আড়ং ছেয়ে
শুমার নাহি খাদ্য কত জমা,
ধুক্‌ছে ভুখে আমার ছোট্ট মেয়ে
অন্ন বিনা লুটছে প্রিয়তমা,
তারি পরে সুখের বন্যা বেয়ে
চল্‌ছো তুমি—তারো চাহো ক্ষমা !

তোমার গৃহের ইটের রাঙা লালী
রূপের বাহার খুলছে জানি শত,
আমার বুকের রক্ত তাজা ঢালি

রং যে তাহার তৈরি অবিরত—
সেথায় তোমার চাঁদনী রাত খালি
আমার হেথায় রোশনী অস্তগত।

শুক্‌নো হাড়ে চট্‌কে যাওয়া গোস্ত
শীর্ণ শিরায়–নাইকো লহু লেশ—
আগুন–জ্বালো, আগুন জ্বালো দোস্ত,
জীর্ণ জাহান হোব্‌না পুড়ে শেষ।

মস্ত ছালার বীর সেনানী তুমি,
জঙ্গ হতে রও যোজন তফাৎ দূরে—
আমরা লড়ি আকড়ে রণ–ভূমি

www.pathagar.com

কামান রুখি জখ্‌মি সিনা জুড়ে,
আমরা তবু চরণ তোমার চুমি
যোদ্ধা বটে—তুমি-ই বিশ্ব-পুরে।

আজাদ হবে দুস্থ গোলাম জাতি,
তারি লাগি আমরা পরি ফাঁসী
তোমরা তখন কাটাও মউজ রাতি
দুষ্‌মনেরি তক্‌মা ভালবাসি !
তোমরা তবু নেতৃপদের পাতি
আপনা দেশে আমরা পরবাসী।
চলছে উজান তোমার জয়ের ঢেউ
পোষ্‌-মানা এ চোস্ত—পোষাকী দেশে,
হায়রে কপাল—আমরা শুধু ফেউ
রক্ত-চটা জীর্ণ লেবাছ-বেশে।

হয়ত তবু আসবে কভূ কেউ,
দাদ্‌ নেবে এর অট্টহাসি হেসে।

শুক্‌নো হাড়ে চট্‌কে যাওয়া-গোস্ত্‌
শীর্ণ শিরায় নাইকো লহু লেশ
আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো, দোস্ত্‌,
জীর্ণ জাহান হোক্‌না পুড়ে শেষ।

নূতন বৈশাখ

আজ শুনি প্রভাতের ডাক—
রাত্রির তিমির শেষে মনের মৈনাক
আশার আকাশ পথে মেলিতেছে পাখ
মুক্তির হাওয়ায়—
দূর হতে দূরান্তরে ভেসে যেতে চায়
শরৎ মেঘের মত হাল্‌কা ভেলায়
নভ-নীলিমায় ; —
তারারা যেথায় নাচে, যে-পথে সূর্যের গতিবেগ
যেথায় অসীমে দোলে অন্তহীন নীহারিকা-মেঘ,
নিতানব সৃজন-আবেগ—
যেথায় অতনু লোকে লীলায়িত বাণী-হীন গান

www.pathagar.com

আলোর বীণায় বাজে যেথা নিত্য আনন্দ অম্লান
সেথা হতে আজ
জ্যোতির তীর্থের পথে এলো কি আহ্বান;
হে চিত্ত আমার,
খোলো খোলো দ্বার,
তোমারে ফিরিছে খুঁজি সে যে বারম্বার—
মুহূর্তে-মুহূর্তে-জাগা তার ছন্দ সৃজনের সুর
বাসনা বিধুর,
তোমার অন্তর ঘিরে তৃষ্ণা সুমধুর
দিলো কি জাগায়ে?

নূতন সৃষ্টির তৃষা—দিগন্ত নূতন
নূতন কল্পনা-আশা, নব উদ্বোধন,
নব নৃত্য সুর—
যে-সুরে সবিতা জাগে অন্ধকার পাথার সাঁতারি
যে-সুরে শশাঙ্ক লেখা নভাঙ্গনে নিত্য দেয় পাড়ি,
যে-সুরে কুঁড়ির বুকে মধুগন্ধা পুষ্প ওঠে হাসি
যে-সুরে কাজল মেঘে ওঠে দীপ্ত বিদ্যুৎ বিকাশি
সে-সুরে দিলো কি আজি ডাক?—
নূতন বৈশাখ?
গত-আয়ু বৎসরের ছিন্ন নীড় ছাড়ি
যেথা সারি সারি
আধো-জাগা দিগন্তের আলোছায়া মেলা
করিতেছে খেলা
নব উষা-অঙ্গনের রঙিন আভায়; —
তারি রাঙা ছায়
ঘুম-ভাঙ্গা বিহঙ্গের কণ্ঠ-মূর্চ্ছনায়
ওই শোনো প্রভাতের ডাক—
হে চিত্ত আমার,
খোলো খোলো দ্বার—
এলো যে বৈশাখ।

নূতন বৈশাখ
উধাও অজানা পথে মেলিয়াছে পাখ;—
মনের অঙ্গন ভরি ঘন ঘূর্ণিপাক
সৃষ্টি-শিহরণ
আজ দোলে নিত্য অনুক্ষণ

www.pathagar.com

আশায় চঞ্চল—
ক্ষয়ে-যাওয়া নিশিথের ঝরা ফুলদল
আজ সেথা নিশ্চিহ্ন বিলীন—
রাত্রির তিমির শেষে আলো-দীপ্ত দিন
রচিতেছে স্বপ্নের মালিকা,
শত লক্ষ জীবনের নবাঙ্কুর-শিখা
জ্বালে সেথা প্রাণের দীপালি,—
বহু ব্যর্থ বাসনার বন্ধ্যা মরু-বালি
সে পরশে উঠিতেছে জাগি
নূতন খর্জুর-বীথি, নবশ্যাম উদ্যানের লাগি
উষর বালুকা-বুকে।—
সেথা চুপে-চুপে
দীর্ঘ যুগ-যুগান্তের বদ্ধ অন্ধকূপে
জাগিতেছে প্রাণের জোয়ার
ছিন্ন করি দিগন্তের স্তব্ধ অন্ধকার
আসিছে প্লাবন
আলোকের, জীবনের
মুক্তির স্বপন
আজ হোক সুন্দর সফল ;
তোমার গতির লাগি অন্তরীক্ষ-তল
খুলিয়াছে দ্বার—
হে চিত্ত আমার
যাত্রা করো ....
সহে না যে দেরী—
অনড়ের অচলের শৃঙ্খলিত বেড়ি
ছিন্ন করো ছিন্ন করো আজ—
সম্মুখে ঝাঁপায়ে পড় যেন ক্ষিপ্র বাজ
সুলক্ষ্য সন্ধানী
কণ্ঠে শুধু উচ্চারিত হোক মুক্তি-বাণী
অমর আত্মার—
রূপ হতে রূপান্তরে তোমার যাত্রার
তিক্ত যত বাধার বিদ্বেষ
হোক সব শেষ।
হে চিত্ত আমার,
খোল খোল দ্বার—

www.pathagar.com

ওই শোনো প্রভাতের ডাক,
এলো যে বৈশাখ।

নূতন বৈশাখ
নূতন যাত্রার পথে মেলিয়াছে পাখ—
ঝঞ্ঝার গম্ভীর সুরে তার–বজ্র–বাক্
ডাকিছে সবারে ঃ
হে যাত্রী, কে যাবে দূর নীল সিন্ধু–পারে
জ্যোতিষ্কের জ্যোতির পাথারে,
কাননের কান্তারের ছায়া পথে–পথে
আশা আর আনন্দের নবঘন–রথে—
এসো এসো ত্বরা,—

সেথা তনু–মন
মিথ্যার মৃত্যুর পায়ে আত্মসমর্পণ
করিবে না আর
সেথায় ধ্বনিবে শুধু সৃষ্টি–বন্দনার
স্তব–মন্ত্র গাথা—
যে সুরে রচিল বিশ্ব বিশ্বের বিধাতা
তারি সুর লয়।—
সেথায় তোমার লাগি নিঃশঙ্ক অভয়
রহিছে জাগিয়া—
তারে আজ অন্তরের সর্ব–সত্তা দিয়া
লবে না বরিয়া?
হে চিত্ত আমার,
খোল খোল দ্বার—
তোমার পথের পরে পলাতক বসন্তের মধুর পরশ
প্রাণোচ্ছল শ্যাম সুধা–রস
রেখে গেছে স্তরে স্তরে মৃত্যু–জয়ী মৃত্তিকার বুকে
ভূলোকে–দ্যুলোকে
সারা বিশ্ব ভরি ;—
তারি যে আনন্দ–ভরা বন্দনা–বাঁশরী
ধরণীর দ্বারে দ্বারে আনিল আহ্বান
সদ্যোজাত জীবনের গান—
সে–গানে দিল যে সাড়া মাঠে মাঠে নবাঙ্কুর দল
সে–গানে দিলো যে সাড়া উচ্ছলিত অরণ্য–অঞ্চল

www.pathagar.com

সে-গানে দিলো যে সাড়া মঞ্জরিত আম্র-কুঞ্জ-তল
গন্ধ-ঝলোমল—

সে গীতি সঙ্গীত-সুরে চির আত্মহারা
দিলো দিলো সারা
ঝঞ্ঝার মঞ্জির পায়ে নব মেঘ-ধারা,
ডুবালো সাহারা ;—
তারি শ্যামচ্ছায়
তৃষা-তৃপ্ত মাটির ধরায়
তরুণ তরুরা নব মেলিতেছে শাখ
যেন দূর দিগন্তের চিত্রপটে আঁকা
ছায়া-শান্ত নভাঙ্গনে বিধুনিত শাখা
সন্ধ্যার বলাকা ; —
হে চিত্ত আমার,
খোলো খোলো দ্বার—
সে-নব যাত্রার পথে যাত্রী বলাকার
হও তুমি সাথী—
স্থানুর বন্ধনে বাঁধা অন্ধকার রাতি
হয়ে যাক্ শেষ—
নামুক অন্তর-লোকে মুক্তির আবেশ।
হে চিত্ত বলাকা
তোমার পথের রেখা দিগন্তে-দিগন্তে আছে আঁকা,
খুলে দাও পাখ—
ওই শোন প্রভাতের ডাক,
এলো যে বৈশাখ।

বেগ দাও, বেগ দাও, আমার ডানায়

ঝড়ের দুরন্ত গতি
বেগ হানে আমার ডানায়—
হে-মোর মুহূর্তগুলি,
মৃত-আলো ফ্যাকাশে দিনের
স্তূপিত শবেরা যেথা ছেয়ে আছে কানায় কানায়
নভের সীমানা—
ভাঙি তারি মানা

www.pathagar.com

উধাও পথের পানে সীমাহীন স্তব্ধ অজানায়
নিঃসীম নক্ষত্রলোকে ছায়াপথ ছায়ায় ছায়ায়
আমারে উড়ায়ে নাও, আমারে ভাসায়ে নাও
পোড়ায়ে ফুরায়ে দাও মোর যত দ্বিধার ভীরুতা।
জুড়ায়ে দিও না শুধু অচেনারে চেনার লাগিয়া
তীব্র মোর অশান্ত ব্যথারে—
অতৃপ্তির দাহ-সিন্ধু পারে
নিস্পলক নেত্র মেলি কত দীর্ঘ শর্বরী জাগিয়া
যে-ব্যথা অমৃত বিষ তিলে তিলে করেছি সঞ্চয়
প্রশান্তির সান্ত্বনার মোহে
নির্বোধের আনন্দের মিথ্যা সমারোহে
করোনা করোনা তারে লয়।
তার লাগি অক্ষয় অভয়
কঠিন কর্মের পথে মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা দুঃসহ
রচিতেছে নিত্য অহরহ
যেথায় ফাঁসির মঞ্চে, মশানের যূপ-কাষ্ঠ কোলে
সকলের খড়গ ঘায়ে অক্ষমের বক্ষ-বরা
রুধির কল্লোলে
সর্ব যুগে যুগে।

*　　*　　*

তারি নৃত্য-দোলে
আমারে দুলায়ে দাও, আমারে ভুলায়ে দাও—
দাও তারি ভাষা,
দীর্ণ হোক, চূর্ণ হোক যত শান্তি-স্বপনের
মোহ সর্বনাশা।
বিত্তের পিপাসা
সম্ভোগের সোহাগের আনন্দের আশা
দূর হোক—দূর হোক, দূর হোক সবি—
মিথ্যা ছায়া-ছবি।
আজ শুধু ব্যথা-দগ্ধ চিত্তের চিতায়
বহ্নির ভয়াল শিখা উঠুক উদ্ভাসী
শতাব্দির দাসত্বের অপমান লাঞ্ছনার অন্ধকার নাশি
ভীরুতার, মূঢ়তার অসম্মান রাশি
সে তীব্র রক্তিম-শিখা বহ্নির-বিভায়
যেন চির লুপ্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

*　　　*　　　*

আমার ডানায়
হে ঝঞ্ঝা–সারথি !
গতি দাও, বেগ দাও, দাও বজ্র–বল,
সঞ্চরি ফিরিতে পারি যেন বিশ্বতল

দুরন্ত নির্ভয়ে—
চিরন্তন অজানারে জানার বিজয়ে
মোর অভিযান
দুর্লক্ষ্য লক্ষ্যের পথে মৃত্যুরে বিস্মরি
মহাকাল গতি–চিহ্ন ধরি
যেতে যেন পারে
সর্ব বিঘ্ন বাধারে উত্তরি।
আমার গতিরে যেন না পারে রুধিতে
সীমার মানায়—
হে ঝঞ্ঝা–সারথি !
বেগ দাও, বেগ দাও, আমার ডানায়।

আমার যাত্রার গতি আজ হোক অবাধ অসীম—
কোথায় গিরির শৃঙ্গে, মেরু–পথে তুষারের হিম,
কোথায় গোবির বুকে, সাহারায় মরু ভূর জ্বালা,
গহন অরণ্যবুকে ; দ্বীপে দ্বীপে কোথায় নিরালা
বিষ–তীক্ষ্ণ কন্টকের মালা
দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্গম দীর্ঘ বাধা–অদ্রি যত
আমার গতির পথে হতেছে সঞ্চিত ;
তাদের সবারে
হে ঝঞ্ঝা–সারথি !
নিঃশঙ্কে ডাকিয়া আনো মোর গেহ–দ্বারে।
পুঞ্জিত আঘাত
নির্মেঘ কুলিশ সম অতি অকস্মাৎ
আমার নির্বেগ বুকে আজ তুমি হানো

নির্মম কঠোর—
নিরঙ্কুশ কুশলের মিথ্যা মোহ ঘোর
দূর হোক্ সব।—
মোর রিক্ত জীবনের
হে মুহূর্তগুলি
আজ আনো ধ্বংসের আসব

www.pathagar.com

পূর্ণ করি যুগল অঞ্জলি।
ঢেলে দাও তীব্র কালকূট—
নির্লিপ্তির নিস্তরঙ্গ অন্তর-অঙ্গনে।
মুক্ত হোক্ শৃঙ্খলিত বদ্ধ করপুট
সংগ্রামের রুধির রঙ্গনে—
তারি তপ্ত অগ্নি জ্বালা রক্ত-রাঙা নীরে
মৃত্যু আর জীবনের তীরে,
আমারে রাঙায়ে নাও—আর দেরী নয়—
নাহি আর সয়।
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, ভঙ্গুর দেহের
ভয়াতঙ্ক হতে—
ছিন্ন করো বন্ধন গেহের।—
নির্ভয়ের চির তীর্থ-পথে।

নির্জীব স্বস্তির মোহ, কুব্জপিঠ জীবন যাত্রার
নিবীর্যের—নিস্তেজের
পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে
ভয়ে ভয়ে মরে-যাওয়া মৃত্যুর মাত্রার
আজ হোক্ শেষ।

মুক্তির নিমেষ
আসুক জীবনে নামি প্রভাতের আলোকের মত
নিত্য অবিরত।
ভীরুতার জড়তার সর্বচিহ্ন লেশ
আজ হোক শেষ।
তারি জ্যোতিচ্ছায়ায়।—

আমার ডানায়
পালকে পালকে আজ উঠুক বিকশি,
বিদ্যুতের অসি।
মুহূর্তে নিঃশেষ হোক, পরাজয়-পরাভব
নিরাশা-নিঃশ্বাস
বক্ষের পঞ্জর ভরি দুর্জয় বিশ্বাস
উঠুক সঞ্চরি
জীবনের মোহ মুক্ত তরি
অকূলে ভাসায়ে দাও ছিন্ন করি কূলের মায়ায়
চিত্ত যেথা চায়—
হে ঝঞ্ঝা-সারথি !
গতি দাও, গতি দাও, আমার ডানায়।

www.pathagar.com

আজকে শুধু মেঘের স্তব

সুর্মা-আঁকা আঁখির চেরাগ চাইনা আজ,
ডাকছে মোরে ঝড়ের ঝামেল্ বাজ্ আওয়াজ।
ঝঞ্ঝা পাগল টুট্‌লো আগল
বাজায় বগল উল্লাসে—
লাগছে আগুন চৈতি-ফাগুন
আমার মনের কুল্ পাশে—
ছন্নছাড়া বন্দী মনের বন্দীজনের
রক্ত-উতল সন্ত্রাসে—
আমার মনের কুল্ পাশে।
সন্যাসী আজ বনলো শিকার বন্য মনের কন্দরে,
পূণ্যরা সব পণ্য তামাম সৈন্য-ঘেরাও বন্দরে
যৌবনেরা যৌন-মেলার স্তন্য-বহুল অন্দরে
আজকে বাঁধা জিঞ্জিরে—
প্রেমের নহে—ভোগ-লালসার পিঞ্জিরে

বন্দী ত্ররা।—
বনলো ভেড়া
সিংহেরা সব জাত ভুলি—
রুদ্র-বাহু বজ্র-মুঠি ছিঁড়বে যে ভাই বাঘের টুটি
সে-ও যে বুলায় রং তুলি।
পায়ের নখে—ঠোঁট্ ভুরুতে,
তাই শুরুতে
গড়তে হবে জাত নূতন।—

আজকে শুধু মেঘের স্তব
যার দেহ-মন
বজ্রসম কঠিন আবার
শক্ত সুঠাম
সমুন্নত—
ভাঙে তবু হয় না নত,
অসির মত।

সুর্মা-আঁকা আখির চেরাগ চাইনা আজ
ডাকছে মোরে ঝড়ের কামেল বাজ্ আওয়াজ।
ধর্ম আজি কর্মকারের চর্মে-গড়া হাফর-শাল,

www.pathagar.com

লাখ্ হাতুড়ির নিত্য ঘা–এ প্রাণ লবেজান ফাপর হাল—
স্বর্গ–নরক এক পাশে রাখ্—জান্ সামাল !
দাও ছেড়ে মা কেন্দে বাঁচি
পাগ্লা গারদ—এ মোর রাঁচি
বৃদ্ধ নারদ—তপ্ত পারদ,
গাড়ছে হেথায় আস্তানা তার—
বেজায় বাহার—
গুম্ফ–দাঁড়ির গির্জা গাড়ীর
তিলক–টিকির পয়সা সিকির
অঢেল ফিকির !
বজ্রাহত আমরা যত–সংসারী সব
রূপ–রুপেয়ার এমনি আসব
পণ্য পাশব
আর কোথা নাই।
তাইতো হেথাই
ঝগড়া–ঝাটির লাঠা–লাঠির চল্ছে খেলা
সন্ধ্যা সকাল নিত্য বেলা।
ধর্ম মা–টীর উভয় পাটির
দাঁতের গোড়া
আপন নোড়া
আহ্লাদে আজ ভাঙ্গচে বসি।
আচ্ছা কসি'
চাবুক চালাও তাদের পিঠে,
চিট্ করে দাও পিট্রি পিটে—
ঠাণ্ডা–মিঠে
বাক্যতে আজ চলবেনা কাজ
রুদ্র–ভয়াল শূদ্ররা আয়
রক্ত ভেলায়
বন্যা স্রোতের উর্মি বেয়ে
আয়রে ছেয়ে
পাহাড় পাথার সব একাকার
যুগ যুগান্তের আবর্জনা
ছল্–ছল্না
যাক্না ধূয়ে
ঈস্রাফিলের একটি ফুঁয়ে।

www.pathagar.com

সুর্মা আঁকা আঁখির চেরাগ চাইনা আজ
ডাকছে মোরে ঝড়ের ঝামেল বাজ-আওয়াজ।
সভ্যরা আজ নব্য ধ্যানের গব্য জ্ঞানের
মূর্ত নট—

হর-হামেশা চল্‌ছে বদল পেশার পট্।
বিন্দু জলের নাইকো মুরদ দিত্য কেনে সিন্ধু ঘট
হায় কপট্—ধূর্ত শঠ,
কয় শতাব্দীর শাস্তি যে তোর আজ জমা
উষ্ট্র পাখীর অন্ধ নীতির নাই ক্ষমা
হাস্তি-হামির ভূত-পরস্তি জীবন ভর
করলিরে তুই—ঘুরলি মায়ার তেপান্তর।
তত্ত্ব-জ্ঞান সে রইলো শিকোয়
ঝুলছে জীবন শূন্য পর—
নাই খবর।
অস্তি গেলো তোর জ্বালাতে ভণ্ড ঠগের আস্তানায়
নাস্তি লভে মস্ত বিজয় সব জাগায়
নয় কোথায়?
মোমেন সবাই ভাই বেয়াদর—কোরান কয়,
তোমরা মানো সব কিছু যে কোরান নয়।
খোদার দেওয়া এই যে উদার দ্বিনের ছাপ
টুট্‌লো তারে গর্ব-নিঠুর কার সে পাপ।
* * *
তোমরা বনো শরীফ-জাদা উন্নাসিক
আতরাফেরা রয় সমাজের তলার দিক
তারাই তবু জুঝছে জেহাদ প্রাণ-অধিক
দিক্‌বিদিক্।
তোমরা শরীফ—আজকে আদিম সরিসৃপ,
কবর তলের ফসিল্ শুধু—শুষ্ক ধূ-ধূ

নিভলো কবে কালের কোলে জীবন-দীপ
আজকে শুধু ভাগ্যে জোটে জুঠ্ তারিফ ;
আজকে তবু আক্‌ড়ে আছো সমাজ-তাজ
আজকে তবু লুট্‌ছো লোকের ভোগ নেয়াজ
নাই তো লাজ।
লাঞ্ছিতেরো দ্বিনের হাতে মিল্‌তো মান

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র সে-ও স্পর্শে হতো বীর মহান
হস্তে তোমার মোমেন বনে হীন্ রজীল
জঙ্গী হারায় স্পর্শে তোমার সাহস দীল্।
এই তফাৎ
দ্বিন হলো সে দিনের আলো
সেথায় তুমি অন্ধরাত
এই তফাৎ।
এই নিশিথের কৃষ্ণ ছায়
আমরা বলো যাই কোথায়?
এক ছাড়া ঐ দিক্ ভোলানো দিক্‌দারীর ঐ
ঝঞ্ঝা-নায়।

সুর্মা আঁকা আঁখির চেরাগ চাইনা আজ
ডাকছে মোরে ঝড়ের ঝামেল বাজ আওয়াজ।

আজ নহেরে সৃষ্টি-কথা-বৃষ্টি ধরায়
ধ্বংস আন্
আজ আছে কার বুকের পাটা—আয়রে যুবক
আয় জোয়ান।

চলবে না আজ খোদার নামে মুর্গি-পোলাও
মোছাম্মান।
আজ চাহি প্রাণ।
আজকে যে চাই খোদার নামে নেছার জান্
আজকে যে চাই বিত্ত-বিলোপ দেদার দান।
মুর্দা দীল আর জিন্দা দেহের নিছক স্তব
আজকে হেথায় হোক নীরব।
লেবাছ্-পূজার সব বেদী
দীপ্ত-ধারাল ইমান-অসি যাক্ ছেদি।
আস্তি-বাদী চিন্‌লো শুধু চুল-পোষাক,
নাস্তি-বাদী শরীর পূজার বাজায় ঢাক
বিভেদ কই?
তাইতো আজি ধ্বংস-ভয়াল গুর্জ লই।
যুগ-শতাব্দীর সঞ্চিত সব আস্তাকুড়
শহীদ সেনার লহুর সোতে হোক্‌না দূর
আকাশ-জোড়া আজকে শুধু মেঘের স্তর,

www.pathagar.com

আজকে শুধু রক্ত-লোহিত তুফান ঝড়,—
ভাইরা তারে আজকে ছাফা ছফেদ কর,
সূর্য নূতন আব্‌ছে তখন আকাশ গায়
জাগবে-নূতন নূর-বিভায়।
সুর্মা-আঁকা আঁখির চেরাগ চাই না আজ
ডাকছে মোরে ঝড়ের ঝামেল বাজ আওয়াজ।

আজকে আমার মন ভোলায়

দুল্‌বো আজি ঝড় দোলায়—
ঘূর্ণী-কেতন কাল্‌ বোশেখী আজকে আমার মন ভোলায়।
ঘর-কোণের ঐ অন্ধকার,
ভয়-ভীতুদের বন্ধ দ্বার
নৃত্য-পাগল দম্‌কা হাওয়ায় কর্‌বো হেলায় ধূলিস্মাৎ—
ছিচঁ-কাঁদুনে শংকিতদের শীর্ণ শিরে বজ্র-পাত
হান্‌বো হেসে অকস্মাৎ—
আন্‌বো প্রলয়-নিকষ রাত।
দোয়েল-শ্যামা-চন্দনার
ঐ মিষ্টি-চাটু বন্দনার
ছন্দ-নাচন কণ্ঠ-কূজন কর্‌বো আজি সব নীরব ;
চক্রবালের বক্র জালে পক্ষ মেলি ঈগল সব
গাইবে শুধু ঝড়ের স্তব
ঢাল্‌বে আগুন-সুর-আসব।
তারি শিখায় আগ্‌ লেগে যাক ঘর-কোনুদের ঘর-গোলায়
দুল্‌বো আজি ঝড় দোলায়।

স্বস্তি ঘেরা শান্তি-নীড়ে হস্তি-পোষা বিত্ত-ধন
আজ ছেয়েছে বিলাস-ভোগে যাদের সারা চিত্ত-মন,
অনুক্ষণ—
চায় তারা খোশ ফাগুন,
চায় না দুখের খুন আগুন—
ভুলছে তারা ফাগুন বুকে রয় লুকায়ে বজ্র তূণ
তীর নতুন।
আয় বৈশাখী ঝঞ্ঝা ঝড়
মোর সাথে আজ পাঞ্জা ধর—

www.pathagar.com

হান্‌বো মোরা কড়াক্কর
বাজ প্রখর ;—

হাসবো ঝড়ের হা হাহ্ হা,
ঘূর্ণী নাচে ফেল্‌বো পা,
তা থৈ—তা থৈ—তা থৈ থা।—
ঐ সুখ-সেবীদের সুখ-সোহাগ
দুল্‌বো মোরা পার তলায়
ভাজ্‌বো নিদাঘ-রোদ-খোলায়।

দুল্‌বো আজি ঝড় দোলায়
ঘূর্ণী-কেতন কাল্-বোশেখী আজকে আমার
মন ভোলায়।

হে যুগান্ত যাত্রা-পথ

হে যুগান্ত যাত্রা-পথ
তোমার শপথ
মোরে দাও ডাক,
আমার আকাশে জ্বালো বজ্রের বৈশাখ,
দিক্-চিহ্ন-বহ্নি-হীন কালো রাত্রি শেষে
তিমির-সরাই ছাড়ি চির-যাত্রীবেশে
সূর্য-মুসাফির
আলোর ঊষার তীরে যেথা করে ভীড়—
আশায় অধীর,
সে আরক্ত নব মুক্তি-ভোরে
হে যুগান্ত যাত্রা-পথ
তোমার শপথ
দাও ডাক্ মোরে।
মুক্ত করো মুক্ত করো যে বন্ধন-ডোরে
সংসারের কামনার নিত্য ধাঁ-ধাঁ—ঘোরে
রহিয়াছি বাঁধা ;
ক্ষুদ্র-স্বার্থ কামনার শুধু তিক্ত কাঁদা
আর তো সহেনা,—
তোমার মুক্তির বাণী কেউ কি কহে না

www.pathagar.com

সংসারের তীরে—
দিশাহীন পাথারের তরী কোথা ভিড়ে
কোন দূর-দূরান্তের কূল-হারা নীরে
উড়িছে সে শুভ্র পালে—পালে,

স্থিরলক্ষ্য অকম্পিত তার তীক্ষ্ণ হালে
মহাকাল সিন্ধুবুকে জাগায় কল্লোল—
তরঙ্গে তরঙ্গে তোলা নিত্য কলরোল,—
চলিছে সে হাসি
পুঞ্জ-পুঞ্জ ফেন শীর্ষে ভাসি,—
তাহার ঠিকানা
কেউ কি জানেনা?—
যেপথে গতির স্রোতে নাহি কোনো মানা
যে-পথে হারিয়ে গেছে দিগন্ত-সীমানা,
যে-পথে ঈগল শিশু মেলিয়াছে ডানা
ভুলি গিরি-গেহ,
জানেনা কি কেহ
দিক্-হীন দিশা তার পথ-লীন গতি
নাহি যেথা শ্রান্তি শ্রম মুহূর্ত বিরতি,
শুধু পথ, শুধু-বেগ চলা আর চলা
গতির ঘর্ষণে শুধু অনির্বাণ জ্বলা—
জ্যোতির্ময় আলোকের ফলা;—
অনিমেষ অপলক মেলি তীক্ষ্ণ আঁখি
সিন্ধু নভ ঢাকি
অসীমেরে অজানারে লয় যে চিনিয়া—
যে লয় জিনিয়া
রোমাঞ্চিত কলেবরে সারা চিত্ত দিয়া;
সে আজ কোথায়?
রুদ্ধ বেগ মর্ম মোর আজ তারে চায়;—
দৃষ্টির অতীত লোকে চির সঙ্গোপণে
ধ্যানের স্বপনে—
জ্ঞানের দুর্গম গেহে আজো আছে যারা,
যাদের ঘেরিয়া নিত্য দিতেছে পাহারা
অনাগত কাল্—
যে-পথে রয়েছে পাতা আলেয়ার জাল
ভুলাতে সবারে—

www.pathagar.com

সে অমূর্ত রহস্যের পারে
সকল বাঁধারে দলি যে নিবে আমারে—
আজ তারে খুঁজি—
সে যাত্রা-পাথেয়-ভরা চিরন্তন পুঁজি
তুমি মোরে করো সমর্পণ—
মৃত্যুহীন মুক্তির স্বপন,—
হে যুগান্ত যাত্রা-পথ
তোমার শপথ
তব সেই চির তীর্থ ক্রোড়ে
ডাক্ দাও, ডাক দাও মোরে।

*   *   *

এলো কি সে ডাক?
মর্মের গহন হতে কে উঠে কুহরি
মোর বিশ্ব ভরি—
উল্লাসে অধীর তবু ধীর শান্ত বাক্;
বিশ্বাসের আশ্বাসের বাণী
একান্তে কহে সে আমি জানি,
এখানেই নয় তোর শেষ
এখনো রয়েছে বহু দেশ

অনেক বন্দর
অনেক অচেনা নদী—সিন্ধু খেলা-ঘর
আরক্ত প্রবালে গড়া দ্বীপ-দ্বীপান্তর
তোমার নোঙ্গর—
এখনো ফেলনি সেথা,
তার শত নির্জন সৈকতে
তোমার চরণে-আঁকা নিত্য নব পথে
এখনো হয়নি রচা যাত্রা-ইতিহাস—
মানুষের চিত্ত ইতিহাস—
দুর্জয় সাধনা আর দৃপ্ত অভিলাষ
বিশ্ব বিজয়ের;
মেরু আর মরু-ভূর মৃত্যুর ভয়ের
নিত্য উপহাস
করিছে সে যেথা
দুর্বার চরণে দলি সর্ব দুঃখ-ব্যথা

www.pathagar.com

সর্ব–সর্বনাশ,
ধ্বংসের শিখরে যেথা নিজ কণ্ঠ–ফাঁস
পড়ে নিজ গলে
আপনি লয় সে টানি নিজ বক্ষ তলে
বহ্নি–গিরি জ্বালা।
কোথায় নির্জনে বসি গোপনে নিরালা
সে দুরন্ত শক্তির সঞ্চার—
কোথা হতে তার
অফুরন্ত এত প্রাণ–ভার
জাগে বারম্বার ;—

কোথায় লুকায়ে থাকে
কোন্ সে গিরির গর্ভে—কোন্ সিন্ধু বাঁকে,
কোন্ পথে কোথা কোন্ খানে
তারি যে সন্ধানে,
চলেছে মানব দল সর্ব যুগে সর্ব দেশে দেশে
জ্ঞানের তপস্যা লাগি সর্বত্যাগী সন্যাসীর বেশে
মৃত্যুরে দেখেছে চাখি মৃত্যুহীন অমৃতের লাগি,
নূতন ঊষার আশে অতন্দ্র রজনী রহে জাগি,
সীমার সীমান্ত খুঁজি উড়িছে সে অন্তরীক্ষ–ভালে
ঢুরিছে পাতালে ;—
সে–পথ রয়েছে বহু বাকি,
সে তোমারে নিত্য যায় ডাকি—
ঝড়ের বৈশাখী।

*　　*　　*

ধরায় এ চির মর্মবাণী
আমার দুয়ারে গেলো হানি
তীব্র করাঘাত—
আমার তন্দ্রার মোহ অতি অকস্মাৎ
আজ গেছে টুটি—
চলমান জীবনের পথ–প্রান্তে লুটি
চিত্ত তাই কহে ঃ
স্রোতহীন সান্ত্বনার পঙ্ক আর নহে—
উদ্দাম তরঙ্গে যেথা বাড়বাগ্নি দহে
সেথা মোর স্থান—

www.pathagar.com

হে যুগান্ত যাত্রা—পথ
তোমার শপথ,
কর মোরে দান—
উদ্বেল সে জীবনের স্রোতের সন্ধান
মোরে কর দান—
হে যুগান্ত যাত্রা-পথ,
তোমার শপথ।

আহ্বান

হে ঘুমন্ত, জাগো জাগো
রাত্রির তিমির হলো শেষ,
মুছে ফেলো মুছে ফেলো তন্দ্রার আবেশ
নয়নের অন্তরের সর্ব ক্লান্ত-ক্লেশ
আতঙ্কের লেশ—
হে ঘুমন্ত, জাগো জাগো
রাত্রির তিমির হলো শেষ।
দিবসের আলোকের গান
তোমার জীবন-পথে আনিলো আহ্বান
চঞ্চল কর্মের আর দীর্ঘ সংগ্রামের
দক্ষিণ বামের
নিত্য নব দ্বন্দ্ব কোলাহল।
উর্মিল সাগর সম তব বক্ষতল.
ঘূর্ণি-ঘন তীব্র আলোড়ন
করুক সৃজন
বিশ্বের প্রাঙ্গণে—
নূতন মুক্তির বাণী মৃত্যু-জয়ী গানে
সুপ্তি-লীন লক্ষ লক্ষ প্রাণে
জাগাক অতৃপ্ত আশা মুক্তির চেতনা ;—
বিস্ফূরিত তারি বহ্নি-কণা
করুক আলোর ব্যাপ্ত দাবাগ্নি রচনা

প্রদীপ্ত ভাস্বর—
নিশিথের সু-সুপ্তির ঘর
অরণ্য-প্রান্তর

www.pathagar.com

সে-আলোকে উঠুক উদ্ভাসি
জীবনের প্রান্তে প্রান্তে নব মুক্তি-বাঁশী
বাজুক উল্লাসি
উদাত্ত উদার
মুক্তি-বন্দনার
স্পন্দন-স্ফুলিঙ্গ রাগে উদ্দাম অশেষ
প্রলয়ের বেশ—
হে ঘুমন্ত জাগো জাগো
রাত্রির তিমির হলো শেষ।

সুপ্তি নহে আর,
অন্ধকার পান্থশালা খুলিয়াছে দ্বার
প্রভাতী তারার—
যাত্রা করো শুরু,
তুমি চির যাত্রী মুসাফির—
তোমার জীবন সে যে দুর্বার গতির।
তীর্থ হতে নব তীর্থ-তীর
আবর্ত্ত-অধীর
উত্তাল বন্যার মতো যাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
পশ্চাতের নীড়-বাধা বন্ধনেরে থুয়ে—
নূতন পথের বাঁকে নিত্য যাত্রা নব
এই ভাগ্য তব।

পথে পথে লক্ষ পরিচয়
চির মুক্তিময়
তোমার অন্তর-লোকে আনুক দুর্জয়
দুর্দম সাহস—
শৌর্যের শক্তির তেজে সারা বিশ্ব বশ
হোক অনায়াসে।
যেথায় তমিস্রা নাশি নব সূর্য হাসে।
স্থান লহ্ সেথা।
সংগ্রামের সংঘর্ষের যত তিক্ত ব্যথা
তোমার শৌর্যেরে শুধু করিবে প্রখর
শাণিত কৃপাণ সম তীব্র তীক্ষ্ণতর
দৃপ্ত ভয়ঙ্কর

*   *   *

www.pathagar.com

আঘাতে আঘাতে তব শক্তি হবে লয়—
কে তোমারে কয়?
সে ভীরুরে হানো পদাঘাত ;—
যে-জীবন লভেছে সংঘাত
যে জীবন জানে কৃষ্ণরাত
যে-জীবনে নিত্য বজ্রপাত
সে জীবন অনন্ত অক্ষয়
সুধা উৎসময়—
নাহি তার জরামৃত্যু—নাহি তার লয় ;
সতো হোক ব্যর্থ অপচয়
সৃষ্টির নূতন তীরে অলক্ষ সঞ্চয়
ততো তার হয়।

হে ঘুমন্ত, জাগো জাগো
লহ তার পূর্ণ পরিচয় ;
সেই দীপ্ত অমৃতের স্বাদ
তোমার জীবনে হোক পর্যাপ্ত অবাধ ;
সত্য হোক সাধ।

*　　*　　*

এই দ্বন্দ্ব খেলা
চিরন্তন জীবনের ভাঙ্গা-গড়া মেলা
মৃত্যুর সিন্ধুর বুকে সৃজনের ভেলা
ভাসাইছে প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে।
তাহারি ইঙ্গিত-লেখা বিশ্বের প্রাঙ্গণে
রহিয়াছে আঁকা—
সে-পথে চলিছে নিত্য সৃষ্টির বলাকা
কামনা, বিবাগী—
অতন্দ্র নয়ন তার রহিয়াছে জাগি
মহাকাল-সিন্ধুতীরে চির অনির্বাণ ;—
জানে সে সন্ধান
ধরণীর নিত্য নব লক্ষ লক্ষ প্রাণ
কোথা হতে আসে আর কোন্ তীর্থস্থান
খুঁজিতেছে সর্বকাল ধরি—
সৃষ্টির আবর্তে দুলি দিবস-শর্বরী
চলিয়াছে কোন্ লক্ষ্য পানে,
কোন্ গূঢ় অন্তর্লীন সিন্ধু-স্রোত টানে

www.pathagar.com

সে কথা সে জানে।
সে রহস্যময়
করিতেছে নিত্য অভিনয় ;
সে চির নির্বাক তবু সপ্ত সুরলয়
কণ্ঠে তার নিত্য রণে—
উন্মাদ উল্লাস জাগা ঝঞ্ঝার স্বননে
বজ্রের গর্জনে,
লক্ষ ঊর্মী-বিলুণ্ঠিত সিন্ধুর ক্রন্দনে
অগ্নিগিরি নিঃশ্বসিত বহ্নির স্পন্দনে
তারি সুর বাজে ;—
দিবারাত্রি সঞ্চারের নৈঃশব্দের মাঝে
চির দ্রুত ধাবমান বিশ্ব-আবর্তনে
পুষ্প প্রস্ফুটনে,
মৃত্তিক বিদীর্ণ করি অঙ্কুর উদগমে
তারি সে নিঃশব্দ বাণী নিত্য হেথা ভ্রমে
অলক্ষ্য গোপনে।
পৃথিবী চিনে না তারে
শুধু ধ্যানী স্বাপ্নিকের মনে
বিশ্ব-লীন আত্ম-ভোলা ক্ষণে
সে চরণ-চিহ্ন-রেখা অতি সন্তর্পণে
এঁকে যায় পথ
ক্ষীণ ইসারায়
অস্ফুট আভায়
ইঙ্গিতে আভাসে—
সে মহামুহূর্ত যবে স্মিত হাস্যে আসে
জীবনের তীর্থ-পথ-পাশে
সে জীবন পুষ্পিত সফল—
যুগান্ত সঞ্চিত যত ব্যর্থ-কোলাহল
লাঞ্ছনার তিক্ত আঁখি -জল
সব হয় লয়—
প্রাণের দিগন্ত ঘেরি অনন্ত অভয়
মেলে তার প্রশান্তি পাথার—
তার লাগি সৃষ্টি-লয় সর্ব একাকার
তার লাগি দৈন্য-দুঃখ নাহি কিছু আর
হয়ে গেছে সে তখন পার

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসার, সন্দেহের দ্বন্দ্ব পারাবার।
জন্ম-মৃত্যু ?—
সে তো শুধু সৃজনের দুই মুক্তদ্বার ঃ
প্রভাত গোধূলী—
সৃষ্টির রহস্য তারে রাখিয়াছে খুলি
সে দ্বার পারায়ে দ্রুত তাই বারম্বার
যাওয়া আর আসা
ক্ষণে ক্ষণে কাঁদা আর ক্ষণে ক্ষণে হাসা,
রূপ হতে রূপান্তরে ভাসা।

*　　*　　*

হে ঘুমন্ত, জাগো জাগো—
এই সৃষ্টি—এই স্বপ্ন-আশা
মৃত্যুহীন জীবনের প্রাণ-মন্ত্র-ভাষা
অন্তরে রচুক তব অনন্ত পিপাসা

সৃষ্টি অর্চনার—
লুপ্ত হোক ভবিষ্যের স্তব্ধ অন্ধকার
শঙ্কা অজানার ;
হে ঘুমন্ত, জাগো জাগো
আনো তব প্রভাতের আলোর সম্ভার
উদ্ভাসিয়া সপ্ত সিন্ধু-পার
নিত্য বারম্বার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিন্দেগী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিন্দেগী

জিন্দা-জোয়ান জঙ্গ-জেহাদী আয় রে আলোর জিন্দেগী,
কৃষ্ণ-কালো রাত্রি-শেষে রাঙা ঊষার সূর্য-তেজ
চক্রবালের শুভ্র ভালে নাচাক বহ্নি-লাল শিখী
জ্যোতির পেখম দিক ছড়ায়ে—আনুক নয়া রঙ আমেজ।
পথ-ভোলা সব রাতের জীব
দিক তাদেরে পথের দিশা—রোশনী-জ্বালা প্রাণ-প্রদীপ।

সেই দীপেরই আলোর ঝারি জীবন-জোড়া আন্দেরী
এক নিমেষে নিক রে শুষে—মুলুক আশার উৎস-মুখ
মুক্তি-কাবার পন্থা বাহি অন্তবিহীন দিক্ ঘেরি
আশুক শত তীর্থ নকীব সুদূর সফর সমুৎসুক।
লাখ বেদনায় শঙ্কাহীন
জয়-বিজয়ী নও মুজাহিদ জয় করে নিক্ খাক্-জমিন।

নিত্যকালের চিত্ত জাগা অনড় খুদির সত্তা আজ
মৃত্যু দলি আর্ত ধরায় জিন্দা করুক কবর-গাহ্,
বিজ্‌লী-চমক তীক্ষ্ণ অসির রক্ত-খেলার বাজ-আওয়াজ
রাঙা লেবাস-অঙ্গে আনুক হাজার শহীদ শাহিন-শাহ।
জঙ্গ-জমিনে জমুক ভীড়,
সেই খুনেরি সিন্ধু কূলে জাগবে রে তোর মুক্তি-তীর।

ঈশান ঝড়ের বিষাণ ঝরা ঝঞ্ঝা পাগল ঘূর্ণি-বেগ
জাতির জীবন-মর্ম-মূলে জাগায় যখন ধ্বংস-ত্রাস,
শক্তি-মাতাল সেই দানবের কাত্‌লে আমের রক্ত-মেঘ
সিনার হাড়ে বজ্র গড়ি করলো যারা লয় বিনাশ
মর্তে তাদের নাই রে কূল,
মৃত্যুজয়ী জিন্দেগীরে আমার লাগি হোক্ কবুল।

আন্দেশা

আলোর জিন্দেগী লাগি ভাঙো দ্বার জিন্দানখানার
হে জিন্দা জোয়ান—
তোমার মঞ্জিল রোধি জাগিয়াছে যে-বাধা বিন্ধার
করো তারে চূর্ণ-খান্‌খান্।
তোমারি বাজুর তেজে মুছে গেছে কেস্‌রা-কায়সার

www.pathagar.com

ইরান-তুরান—
নূতন জামানা জ্যোতি রচিয়াছ তুমি বারবার,
মূর্ত আলীশান।
হাজার জালেমী কওম বারে-বারে তুলিয়াছে শির,
বারেবারে গড়িয়াছে দল,
তোমারে বাঁধিবে বলি রচিয়াছে গোলামী জিঞ্জির—
হয়নি সফল।
লাখোবার দিলো হানা নিত্য নব হালাকু-চেঙ্গিজ
তোমার খিমায়,
অগণ্য নাসারা সেনা ছড়ায়েছে মউতের বীজ
ব্যর্থ বাসনায়।
হে জিন্দা জোয়ান,
তোমারে করেছে নিত্য নব জন্মদান—
তোমার ঈমান।
তোমার অরাতি যারা আজ তারা ধরি ছদ্মবেশ
এলো গেহে তব—
তোমারো বেদনা হতে কণ্ঠে তার দরদের রেশ
সদ্য নবনব।
বন্ধু, আজ হুঁশিয়ার আসিয়াছে দ্বারে সর্বনাশ,
ধূর্ত মুনাফেক—
শত্রুর খঞ্জর হতে তীক্ষ্ণ তার ষড়যন্ত্র-ফাঁস,
ছলনা আবেগ।
তবু নাই তব লাগি বিলুপ্তির মউতের ডর
সর্ব চিহ্নহীন—
তুমি শুধু রহ জাগি নিশীথের প্রতিটি প্রহর,
আছে তব প্রভাত রঙীন।
জীগর- জাগানো তব ভয়হারা জীবনের জোশ
আজিও অম্লান—
ঝুঠার জঠরে শুধু আজ জ্বালো জাহান্নাম-বোষ,
কহরের দান।
হে জিন্দা জোয়ান,
নাহি ভয়—নাহি ভয়,
তব লাগি আছে চির জাগ্রত-নয়ান
আল্লা মহীয়ান।
তোমার চৌদিক ঘেরি ফিরে যারা তুঙ্গ-উচ্চশির,

www.pathagar.com

জালিমের দল—
শক্তির দেমাকে ভাবে হবে প্রভু নিখিল পৃথ্বির—
সে আশা নিষ্ফল।
ধুলির মুঠির সম যত তার দর্প-আড়ম্বর
হবে ধুলিসাৎ—
ছলার খেলেনা দিয়া বাঁধিয়াছে বালুকার ঘর।
আতঙ্ক-বিস্বাদ।
তুমি শুধু ওঠো জাগি হানো তারে তীব্র পদাঘাত,
নির্মম কঠোর—
নিমেষে হবে সে শেষ ক্ষণিক ফানুস সম স্মৃতি অকস্মাৎ
ফেলি ব্যর্থ-লোর।
ক্ষণিকের এরা জীব—জীবনের নহে নহে কেহ—
মিথ্যার খোয়াব—
আমারে করিয়া হত্যা নিত্য এরা পূজে মৃত দেহ
বিশ্ব অভিশাপ।
যখনি হানিবে তারে আতঙ্কের তীক্ষ্ণধার কুশ
হারাবে সে হুঁশ।
তোমার কদম যাচে আজ সারা দিগন্ত জাহান,
সাগর অম্বর।
সে দান পৃথিবী মাগে—পৃথিবীর বড় প্রয়োজন,
বড় ব্যথাতুর—
তোমার দীলের দানে যে বেদনা নিত্য অনুক্ষণ
জিন্দেগী করিবে না দূর?
আল্লার কোরান তব, তোমার শক্তির কোথা শেষ,
অনন্ত অপার—
তোমার রয়েছে জানি জেহাদের খুন্-রাঙা বেশ
শাহাদৎ-যার
সত্যের বাহন তুমি—শোনো বন্ধু—তোমারি জাহান,
তুমি অধীশ্বর—
তুমি শুধু বহ বুকে জ্যোতিঃ-জ্বালা আল্লার ফরমান,
অর্পিত অন্তর।
হে জিন্দা জোয়ান।
তখন হেরিবে হেথা তোমারি নয়ান
টুটিছে নিখিল বিশ্ব তব পদ পর—
তুমি অধীশ্বর,
তোমার চরণ তলে কাঁপে থর্ থর্
কোহ্কাফ্-শিখর।

www.pathagar.com

নূতন দিনে

ঊষা কি জেগেছে? জেগেছে জোহরা সেতারার আঁখি আলো?
ওরে ঘুমন্ত! তোমারো দেউলে প্রাণ-জ্যোতি জ্বালো জ্বালো!
পূবের তোরণে লালিমা রেখায় আগে কার রূপ-শিখা—
ঊষসী কি পুনঃ জ্যোতি-গড়া তার মেলিয়াছে অনামিকা?
আকাশ-সায়রে জেগেছে জোয়ার আলো ঢেউ-এ দুলি দুলি—
নিশি গেছে চলি শিশিরে কাঁদিয়া ফুল-বুকে ফুলি' ফুলি'।
নূতনের আশা সমীরে-সমীরে বন-পথে দিছে দোলা—
ঘাসের মুকুটে হাসে আলো-করা আঁধারের ব্যথা-ভোলা।
বেদনা-বিবশ মুকের আননে আশা-ভরা ভাষা জাগে—
তিমির-স্তব্ধ বিহগ-ভুবনে কূজনের দোলা লাগে।
জাগে প্রাণ-হিন্দোলা—
বন্দী কাফেলা আজ পুনঃ চলো মঞ্জিল দ্বার খোলা।

মোয়াজ্জিন কই? জাগাও জাহান আজানের আহ্‌বানে,
সুবে-সাদেকের আলো-সয়লাবে দোলা দাও প্রাণে-প্রাণে।
দোলা দাও আজ ঘুমের অতলে—সেথা যারা আছে শুয়ে,
জীবিত-মৃতেরা—চেতনা তাদের যাও তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
শুনিনি আমরা বেলালের ডাক কত যুগ—গেছি ভুলে,
নব তৌহিদ আজানে আবার জাহানের কূলে কূলে,
তারি জয়-বাণী ফুকারি ফুকারি চলো চির উল্লাসে;
আবার আন রে জ্যোতির জোয়ার জীবনের পাশে-পাশে।
আজ মনে পড়ে সে সুর-মাধুরী হাজার বছর আগে
কাফ্রি দাসের কণ্ঠে উছলি ঝরেছিল সুধা-রাগে।
প্রথম যেদিন বাজিল আজান মদিনার মস্‌জিদে,—
সে ধ্বনি রণিল ঝঞ্ঝার বেগে দিকে-দিকে চারি ভিতে।
হেরেছি আমরা তারি শিহরণ জাগে নভ নীলে-নীলে—
জাগে তার দোলা সিন্ধু সুদূরে কত পথ-মঞ্জিলে।
আজ পুনঃ দুনিয়াতে—
হে নব বেলাল! তারি আলোড়ন আনো নব সম্পাতে।
মরু-মদিনায় জন্ম লভেছি—মরু-ঝঞ্ঝার মত।
আমাদের তাই গতি দুর্বার দুর্দম অবিরত।
ঊষার আজানে ঘুমের খিমায় দেই মোরা আজ জ্বালি—
রচি মোরা নব পথের নিশানা কলিজার খুন্ ঢালি।
আরবী তাজীর বল্গাবিহীন অবারিত গতি-বেগে

www.pathagar.com

আমাদের জয়–অভিযান চলে চির নির–উদ্বেগে।
আমরা চলেছি দুনিয়ার বুকে মুক্তির স্রোত–ধারা,
দিক–দেশ–লীন সিন্ধুর মতো বন্ধন–বাধা–হারা।
মরু–বালুকার তাঞ্জামে আর দরিয়ার দোল্‌নাতে
আমাদের আয়ু বেড়ে বেড়ে যায় দিশাহারা দিনরাতে।
তারি নয়া আহবানে—
হে নব সালার ! ডাক দেও সবে জীবনের জয়গানে।

কতদিন গেলো—ভুলে গেছি সব—কেনো মোরা আসিয়াছি,
মৃত্যু–বিহীন মরণে রে এতো কেনো ভালো বাসিয়াছি।
শাহাদাৎ–সুধা কণ্ঠ ভরিয়া পান করি বারেবারে,
বারে–বারে কেনো বিদায় নিয়েছি দুনিয়ার দরবারে।
জীবনেরে মোরা বিলায়ে দিয়েছি একদা সে খেলা–ছলে,
বারে–বারে তাই লুটেছে জীবন আমাদের এ পদতলে।
প্রাণের রাজ্যে বাদশা যে–জন সে–ই প্রাণ দিতে পারে,
তাই নত শিরে নিখিল দুনিয়া কুর্ণিশ করে তারে।
নিহত রাতের রাঙা খুনে জাগে রাঙা রাগ ঊষা–ভালে—
শহীদের লহু জাতির জীগরে জীবনের আলো জ্বালে।
এসো এসো ভয়–হারা—
দেখিবে চরণে লুটিছে আবার দুনিয়ার বান্দারা।
আল্লার ধরা, আল্লারি লাগি আমরা চেয়েছি যবে,
দুনিয়ার বুকে চলেছি তখন বিজয়ের উৎসবে।
দূর দিগন্ত সীমা নাহি ছিল—সব ছিল আমাদেরি,
বিশ্ব–জাহানে চলেছি ফুকারি জীবনের জয়–ভেরী।
দূর পশ্চিমে জবল–তারেক পিরেনিজ গিরি–চূড়া,
আমাদেরি বীর–পদ–ভারে কাঁপি হয়ে গেছে গুঁড়া–গুঁড়া।
চির দুরন্ত তুরানী–তাতার–উজ্‌বেগ–আফগানী,
লুণ্ঠিত শিরে নিয়েছে জীবনে আমাদেরি পথ মানি।
নভ–উন্নত তুষার–ধবল হিমালয়–চূড়া–শিরে,
মোর তক্‌বির ধ্বনির লহরী যুগে যুগে আছে ঘিরে—
সুদূর প্রাচ্য দ্বীপের পুঞ্জে সিন্ধুর কল্লোলে—
প্রাণ–স্পন্দিত শান্তি শীতল আমাদেরি বাণী দোলে।
আল্লারে লহ খুঁজে—
আল্লার ধরা ছেয়ে যাবে ফের আল্লারি গম্বুজে।

ঊষা কি জেগেছে? জেগেছে জোহরা সেতারার আঁখি আলো?

www.pathagar.com

ওরে ঘুমন্ত জাগো জাগো ত্বরা আজাদির জ্যোতি জ্বালো।
কাবার দেউলে ঐ শোনো নব হেজাজের বাঁশী বাজে—
জাগে বাণী তারি সুরে সুরে কাঁপি অম্বর-পাখোয়াজে।
জাগে হিয়া হিন্দোলা—
মুক্তি-কাফেলা আজ চলো চলো মঞ্জিল দ্বার খোলা।

যুগের আজান

ব্যথা-রাতি শেষে ফজরের আলো জাগিছে কি চারিভিতে?
যুগের আজান রণে যেন শুনি বেদনার মস্‌জিদে?

সুবে সাদেকের সফেদ নূরের ঝিলিমিলি দ্বার খুলি,
গোলাবী গুলের শিরীন অধরে দেয় নাই বুলবুলি
তখনো প্রথম শরম-পরশ—তারি মধু লাজ সুখে
পূবালী আকাশ ডালিমের লালী মাখে নাই সারা মুখে।
নিশার নেকাবে রহিয়াছে ঢাকা ঊষসীর চারু আঁখি,
জাগর সহেলা তখনো গাহেনি ডালে-ডালে কল পাখী।
দূরে-দূরে হেরি ছায়া-ছায়া কালো কারা যেন ঘুরে ফিরে,
শুনি যেন আজি ডাকিছে কাহারা কোন্ দূর আলো তীরে।
জাগে মনে ভয় ভীরু সংশয়—শুম্ শাম্ সারা হিয়া,
নিশীথ রাতের সিয়া বিষে ভরা ছলনার সুরা পিয়া
আসিল কি ফের জালেমী কুফর দজ্জাল ফেরাউনী?
তারি কুহকের কোহকাফ-ক্ষরা মায়াবাণী মোরা শুনি?
সহসা মুয়াজ্জিন—
কহিল ফুকারী : মায়া নহে নহে—আসিছে সত্য দিন।
ছায়া নহে ওরা দিনের খাদেম—মোজাহেদ বীর সেনা,
নিদালির মোহ টুটিয়াছে আজি শোধ দিবে তারি দেনা;
পথ-মঞ্জিলে সফরের শুরু-কলিজার খুনে-খুনে
নয়া জামানার জোয়ানী খোয়াব বুকে-বুকে যাবে বুনে।
এশার জমাতে হয়নি শামেল তাই যে তাহাজ্জৎ
আজিকে আঘাতে ঘুচাল তাহার নিদভরা বদ বখত।
বেহুঁশ গাফেল কাফেলা যে দিন আরামের সুরা পিয়া
হারাম করিল জাহানের রাহা, হেরেমেরে র'ল নিয়া—

www.pathagar.com

খায়েসী বিধির আয়েশে ডুবিয়া গজলে ও গানে মজি
বিবি আর কবি বেবাক মজালো কামনারে শুধু ভজি।
খোদেরো ভজিয়া খোদারে হারালো ধন লাগি দ্বীন ভুলি,
দুনিয়া ও দ্বীন হারালো সকলি—তাই আজি কাঁধে ঝুলি।

নিশার আঁধারে নিশাচর খুনী চুপে চুপে এলো যবে,
সেদিন আমরা ভুলেছি আজান মৃত্যুর উৎসবে।
শুনেছি কবে যে ফজর-আজান সিন্ধুর তীরে-তীরে—
তরণ কাসেম পরালো যে দিন হিন্দের খালি শিরে
ইজ্জত-তাজ ইসলামী তেজে ঝলমল জ্যোতি-জ্বালা,
রাহে-লিল্লাহে শহীদের লহু সেই দিনে হতো ঢালা।
থানেশ্বরে নব হুঙ্কারে জোহর আজান-ধ্বনি
বিজয়-ঝাণ্ডা উড়ায়ে ভারতে উঠেছিল ফের রণি।
আসর আজান রণে ছিলো ভাই সিক্রীর রণভূমে
লুণ্ঠিল যেথা ইসলাম-অরি চিরতরে পদ চুমে।
পুনঃ মগরেবে রণিলো আজান পানিপথে শেষবারে।
তখনো বিজলী উঠিত চমকি তার খোলা তরবারে।
তারপরে হায় এশার আজান বাংলার বুকে যবে
ফরিয়াদ করি উঠিলো ফুকারি মৃত্যুর ব্যথা-রবে
মোমেনরা সবে গিয়াছে তখন মুক্তির লহু ভুলি
কমিনের মতো নিদালীতে শুধু 'বহু' নিয়া কোলাকুলি।
সেই নিঁদ-মোহে হারালো সে তার তখত্ তাজ সবি হায়
মোজাহেদ সেনা আজাদী ভুলিল—জিঞ্জির বাঁধা পায়।

সহসা নিশীথ শেষে—
হেরিছি আবার জাগিছে কাহারা জেহাদের নব বেশে।
আসিলো কি ফের নব হায়দর খয়বরী বীর সেনা?
ঘোরীর বাহিনী? খিলজির সাথী? সবি যেন চেনা-চেনা।
দ্বীনের আজান রণিছে আবার বিশ্বের দিকে-দিকে—
তারি ধ্বনি জাগে হিন্দের বুকে—জিন্দারা নিলো শিখে।
নব উল্লাসে জঙ্গী জোয়ান বীর সেনা ফের চলে
নব বাদশাহী নিবে আজ জিনে সব বাধা পায়ে দলে।
তারি জয়-উৎসবে—
কিষাণ-মজুর বাদশাহ্ ফকির মিলিয়াছে আজ সবে।

www.pathagar.com

চির-পথ

মরুভূর বুকে নয়া ওয়েসিস জাগিলো আজ,
দিছে হাতছানি তারি মঞ্জিল-পথের-বাঁক—
রাত হলো শেষ—মিনারে-মিনারে শোনো আওয়াজ
শোনো রাহাগীর ঘুম-জাগা উট পাখীর ডাক।

চারিদিকে শুধু রূপালী সফেদ বালু-সাগর ;
সীমা নাই তার দূর দিগন্তে যে দিক চাও,
তারি মাঝে জাগে খেজুর কুঞ্জ—সবুজ চর,
মেলি বাহু তার—নীলা আসমান যেথা উধাও।

হাজারো বছর পুরানো লুয়েরা ঘুমায় আজ,
সাইমুম হেথা ভুলে গেছে তার ঝঞ্ঝা-নাচ
কালো-ধূম-হানা বিষের তুফান প্রলয় বাজ—
আজ সবে হেথা ঝিমায় নিরবে রুদ্ধশ্বাস।

আবে-জম্ জম্ নূতন করিয়া জাগিছে ভাই
ঊষর মরুর গোপন বুকের আঁসু সজল,
বেদুঈন বালা পেয়েছে খুঁজিয়া নতুন ঠাঁই—
তাহারি পরশে ঘাসের কুঁড়িরা মেলিছে দল।

অজানা দেশের কত না কাফেলা সন্ধ্যা-সাঁঝ
এখানে ফেলিছে মুসাফের তাঁবু খেজুর ছায়,
রাতের আকাশে ছড়ানো হাজার তারা নিলাজ,
রয় হেথা চেয়ে মরু-কুমারীর এলানো গায়।

কহরজাদীরা রেখেছে বাঁধিয়া তোমার মন
মাটির প্রেমের শহদ সুরায় তুমি বিভোর,
তবু শোনো ঐ ডাকিছে তোমারে পথ-পবন
ডাকিছে তোমারে গতি বেগ-ভরা ঝড়ের শোর।

ফুরায়েছে রাত—ছিঁড়ে ফেলো আজ ঘুম-শিকল,
আঁধারের নয়—আজ খোঁজো নয়া ঊষার পথ—
বাঁধন-মোহের যত সে বাধারে করো বিকল
অচেনা দূরের হবে তুমি সাথী-লও শপথ।

নয়া ওয়েসিস—নতুন দ্বীপেরা তোমারে চায়
তোমার কাফেলা কিস্তি-বহর চালাও ফের,
দিক-সীমা-হীন সাগর-মরুর উধাও ছায়
খুঁজে নেও আজ সন্ধান তব চির-পথের।

www.pathagar.com

মোয়াজ্জিন জাগো-জাগো

নিরাশা-তিমির-রাতি হয়ে এলো সারা
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো—
আকাশে দিয়াছে দেখা জোহরা-সেতারা
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো।
নিদালী এখনো কারো—টুটিলো না বুঝি,
ঘুমে অচেতন—
মোমেনেরা অন্ধকারে মরিতেছে খুঁজি
মহা শুভক্ষণ।
এশার নামাজ শেষে আরাম-শয্যায়
শুয়েছিল যারা—
দিতে হবে ভাবি মনে মরিছে লজ্জায়
কাজার কাফারা।
কাবার পথের যাত্রী বিদেশী কাফেলা
খীমার গুহায়
এখনো রয়েছে শুয়ে, হয়ে এলো বেলা
নাহি জাগে হায়।
মরুর পাথার-বুকে দিতে হবে পাড়ি
আগে না জাগিলে—
পিয়াসে ফাটিবে ছাতি খুঁজি মায়া-বারি
মরীচিকা নীলে।
মোয়াজ্জিন ! মোয়াজ্জিন !
তোমার আজান বাণী নাহি যদি জাগে
মিনারে-মিনারে—
এমনি গাফেল শত লুটাবে বিপাকে—
মরণের দ্বারে।
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো—
নিরাশা-তিমির-রাত্রি হয়ে এলো সারা
আকাশে দিয়াছে দেখা জোহরা-সেতারা
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো।

জালিমে-জালিমে আজ বাঁধিয়াছে জঙ্গ,
ধ্বংস-কেয়ামত—
সবল দজ্জাল এরে ভাবে খেলা-সঙ্—
তারি জয়-পথ।

www.pathagar.com

খোদারে উড়ায়ে দিয়ে মাটির তণুর
গাহে এরা স্তব—
জানে না আসিছে মৃত্যু অদৃশ্য অণুর
বজ্র-স্তব্ধ রব।
ফেরোয়াঁ মরেছে ডুবে, গিয়াছে শাদ্দাদ—
আল্লার অরাতি,
বিধ্বংস সমুদ জাতি, লুপ্ত আজি আদ্—
—সেথা চির রাতি।
আজের পাশব-বলী জালেমেরা ভাবে
চিরজীবী তারা—
বুঝিতে চাহে না কভু তারাও যে যাবে
—দেখেনা ইশারা।
নিঃস্বের জীগর-শোষা সঞ্চিত শোণিত
লক্ষ মুখ দিয়া
পড়িতেছে ঝরে আজ, ভেঙে গেছে ভিত,
চূর্ণ তনু হিয়া।
তবুও দেখে না যারা আল্লার ইনসাফ
বিধাতার হাত,—
দিয়েছে তাদের হিয়া গোমরাহী-পাপ—
মানে না নাজাত।

মোয়াজ্জিন ! মোয়াজ্জিন !
চিত্তের মিনারে তুমি দাও পুনর্বার—
সত্যের আজান—
হয়ত খুলিবে—শত চির বন্ধ দ্বার
—গাহি বিভু গান।

মোয়াজ্জিন জাগো জাগো—
নিরাশা-তিমির রাত্রি হয়ে এলো সারা—
আকাশে গিয়াছে দেখা জোহরা-সেতারা
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো।

ঊষার আলোর আগে তিমির নিবিড়
ঘনায় ভুবনে—
তেমনি নেমেছে আঁধি ঘেরি বিশ্ব-তীর
আজি সর্বমনে।
বিশ্বাসী বন্ধুরা শোনো—ভয় নাহি নাহি,

www.pathagar.com

ঈমানের নূর,
অন্তরে-অন্তরে জ্বালো পুণ্য দ্যুতিবাহী—
দ্বিধা হবে দূর।
আল্লার অস্তির জ্যোতি ভাস্বর নির্মল
প্রেম-সুধাময়—
তোমার হৃদয়-পদ্মে মেলিবে সে দল—
লুপ্ত হবে ভয়।
কাবার ধ্বংসের লাগি বিপুল-বাহিনী
এসেছিল যবে
সে-দিনো তোমার জয় দিয়েছিল যিনি
আছে তিনি ভবে।
“ফাত্‌হুম্‌ মুবীন” পুনঃ তব পথ চাহি
রয়েছে তাকায়ে—
আল্লার সত্যের রাহে অগ্রপথ-বাহী—
চলো দৃঢ় পায়ে।

মোয়াজ্জিন ! মোয়াজ্জিন !
রাতের তিমির কালো হতেছে সফেদ
আলোক-রঙিন,
করুক আঁধার-নিদ তীর সম ভেদ
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো—
নিরাশা তিমির রাত্রি হয়ে এলো সারা
আকাশে দিয়াছে দেখা জোহরা-সেতারা
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো।

পয়গাম

আমরা ভুলিয়া গেছি সোনালী দিনেরে,
ভুলে গেছি নিজেদের নাম।
হে দিশারী ! আমাদের কাবাঘর ঘিরে
আনো আজ মুক্তির পয়গাম।

অনেক শৃঙ্খলে ঘেরা আমাদের পথ
দোয়া আর ফতোয়ার চাপে।
ঝুটা ত্যাগ বিলাসের ইবলিসী রথ,
শুধু যেন টানে নীচু ধাপে।

www.pathagar.com

জানি না তো কার অভিশাপে।
আমরা পেয়েছি শুনি আজাদী জদিদ
গেছে নাকি গোলামী জিঞ্জির।
তবু আজ কোন ক্রুর জালিমের জিদ
রেখেছে আনত করি আমাদের শির
আজো আঁখে ঝরে অশ্রুনীর।

হে নবীন দিনের দিশারী।
নিঃশেষিয়া ঢালি আপনারে
জীগরের তাজা রক্তধারে
সত্যের মুক্তির লাগি আজ দিব দাম।
আমরা জমাব পাড়ি যুগ সিন্ধু পারে,
তুমি দাও তাহারি পয়গাম।

হে দিশারী

রাত্রির কাফনে ঢাকা, দিনের সুরুজ
আঁধারের কবরে শয়ান
জীবন–কিতাব–ময় শত শত জুজ
জুড়ে আছে মর্সিয়া বয়ান ;
জিন্দেগী জিন্দানখানা যেনো।
এই তিক্ত পেরেশানী কোনো,
কোনো সুবেহ্ সাদেকের আলোর ইশারা
আমার দীলের কূলে নাহি আনে সাড়া
জোয়ানী জোশের
নূরানী মশাল জ্বলি নিভে কেনো ফের
কোন্ সে পাপের
চলিছে এ জের—
শুধাল না কেহ এ সওয়াল ;
তাই নাজেহাল
আজাদী সেনারা—
হলো ধ্বংস—হলো রাজ্যহারা।
তাই তো পলাশী আর বালাকোট কূলে
মুক্তির কোশেশ যত ডুবিলো সমূলে।
দিশাহারা এমনি সে দিনে

www.pathagar.com

হে দিশারী।
তুমি নিলে চিনে
পথের সন্ধান।
ঐক্য আর শৃঙ্খলার দান,
শৃঙ্খল টুটার নব গান
উঠিল গাহিয়া।
সে পথ বাহিয়া
অগণিত মোজাহেদ সেনা
আসিলো ছুটিয়া
ভীতি আর বন্ধন টুটিয়া
শুধিবে যে দেনা
অতীত ভুলের।
স্বর্ণ–যুগ–স্মৃতিভরা অর্ণব কূলের
লাগিলো বাতাস
গোঁড়ামী নিগড়ে বাঁধা চির রুদ্ধশ্বাস
পেলো মুক্তি ফের।
তোমার উক্তির যুক্তি যত নিন্দুকের
মিথ্যার বেশাত
মুহূর্তে করিয়া দিলো চূর্ণ ধূলিসাৎ।
সেই তব মুক্তির পয়গাম—
দীলের ফলকে আজ পুনঃ আঁকিলাম।

ইয়াদগার–ই–ইক্‌বাল

ডুবিয়া গিয়াছে আলো আফতার কোহ্‌কাফ্‌ গিরিপারে,
চেরাগের জ্যোতি হারায়েছে দ্যুতি নিভু–নিভু বারেবারে।
নিশীথিনী রাত শুধু জুলমাত মুছে গেছে দিক দিশা,
লাখো রাহাগীর ফেলি আঁসুনীর কলিজার খুন মিশা,
খুঁজিতেছে ফের মুসতাকিমের চিরচেনা পথরেখা—
হাকিকী ইমাম নাহি নামধাম নাহি মেলে কার দেখা,
হিন্দের বুকে দিনের ঝাণ্ডা তুলেছিল যারা আসি,
জিন্দেগী শেষে সেদিন তাহারা কবরের গুহা বাসি।

www.pathagar.com

তবু তারি মাঝে জিন্দা দীলের সন্ধানে ছিল যারা—
হীন দুশমনী হিংসা-অনলে তারাও সর্বহারা।
জিন্দান গাহে-গাহে—
আন্দামানের অন্ধ আগারে জ্বলে তারা ব্যথা-দাহে।

বান্দারা যারা বন্দনা গাহি ছিল তব পদতলে—
তারাও সেদিন হানিছে তোমারে লাঞ্ছনা শত ছলে।
তবু আশা-ভাষা বাসনা-পিয়াসা ঈমান আমল যত
দ্বীনি-তাহজীব তমদ্দুনের ধারা সে অব্যাহত—
তাহারে ভ্রান্ত বিচ্যুত করি কুফরী অন্ধকারে
তোমারে চালাবে অচ্ছুতসম চাহে সে বারম্বারে।
অষ্টপ্রহর জীবন-বাসর কাঁসর ঘন্টা রবে,
বাসনা তাহার রবে গুলজার তারি পূজা উৎসবে।
শুনিতেছ গান শুনো না আজান চির-তৌহিদ বাণী
মুছে গেছে কেনো কলেমা কালাম সত্যের সন্ধানী।
সহসা মিনার চূড়ে—
রণে পুনঃ শুনি তকবির ধ্বনি রহি রহি কাছে দূরে।

জিনি যুগকাল কবি ইক্‌বাল হলে তুমি অবশেষে
ছলনা ধাঁধার কুফরী আঁধার মুছে দিয়ে নিঃশেষে।
ইসমে আজম সুধা জম্‌জম্ আবার উথলি উঠি—
তোমার কলম নির্ঝর বাহি পড়িল ধরায় লুটি।
আবে হায়াতের অমর স্রোতের প্রাণজাগা কল্লোলে
সিন্ধু যমুনা জাহ্নবী ধোয়া হিন্দের কোলে-কোলে,
দ্বীনি জিন্দেগী উঠে ফের জাগি আজানের সুরে সুরে
যত সে গায়ের ইসলামী জের সব ভাগে দূরে দূরে।
জাগে আলবেদা বাতেল আকিদা যার সব ধুয়ে মুছে
নব ঈদগাহে মিলে এক রাহে সফেদে ও আবলুসে
সাম্যের মহাগানে—
নয়া মহাজাতি মুক্তি সারথী জাগিলো পাকিস্তানে।
তোমার 'বাঙ্গে দারা'র ছন্দে সুর-চন্দনা শত
কওমী ওতনী প্রেমের নৃত্য নাচে যেন অবিরত।
উচ্চ কণ্ঠ মালিকা-লগ্ন ঘন্টার তালে-তালে,
তোমার স্বপ্ন দোলে মানুষের চিত্তের ডালে ডালে,
নতুন 'পয়ামে মাশরিক' গীতি আবার আমরা শুনি—
প্রাচ্যের বাণী আলো সন্ধানী উঠে যেনো গুঞ্জনি।

www.pathagar.com

জড়বাদী ওই নব-পশ্চিম আত্মারে ভুলি ভুলি—
ধ্বংসদূতের পদতলে শুধু সত্যের দেয় তুলি।
মৃত্যুবিজয়ী অমর সত্তা রূহানী জগৎ জুড়ি,
রবে চির দিন আলো অমলিন জ্যোতি-নূর বিচ্ছুরি।
তোমার কণ্ঠতলে—
যুগ-যুগ শেষে আশা-আশ্লেষে তারি বাণী পুনঃ জ্বলে।

'আসরারে খুদি' 'রমুজে বেখুদি' আগু পিছু দুই ছায়া—
তোমার দিলের মুকুরে পেয়েছে অপরূপ রূপ কায়া।
অপরের লাগি রহি কভু জাগি আপন স্বার্থ দলি—
আপন স্বার্থে কভুবা পরেরে দেই যে জলাঞ্জলি।
খুদি-বেখুদির এই দুই তীর জীবন সিন্ধু-কূলে
তন্-মন্ আর দিবা-নিশি সম উঠে নিতি দুলে দুলে।
মখলুকাতের বাতেনী বাতের এই গূঢ় পথ পানে—
তোমার রূহানী নূরের মশাল বারে বারে মোরে টানে।
কুফরী যুগের আলেয়ার আলো ভুলায়ে পথের দিশা—
সত্যের জ্যোতি নিভায়ে আনে যে ধ্বংসের চির নিশা।
সেদিন তোমার বাণী—
সুবে সাদেকের মুক্তি পথের আলো আশা দিল আনি।

'শেকোয়া'র সাথে 'জোয়াবে শেকোয়া' পর পর গাঁথি-গাঁথি
রচিয়াছ তুমি অরূপ মালিকা ঈমানের চির-সাথী,
গাঢ় অভিমান—বেদনার গান তারি বুকে আছে আঁকা—
সে-বেদনা রাশি সবশেষে নাশি জাগিয়াছে চাঁদ রাকা।
ব্যথিত হিয়ার খুলি দুই দ্বার চাওয়া আর-পাওয়া পথে—
দেখায়েছ প্রভু ভোলেনি তো কভু নবীজীর উম্মতে।
'জাবিদ নামা'র 'বালে-জিবরীলে' মহাকাল-পথ-রেখা
আঁকিয়া গিয়াছ কল্পনা রাগে যেনো সবি চির-দেখা।
জীবরাইলের পাখায় পাখায় স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরি—
দেখিয়াছ তুমি কেমনে ফুটিছে সৃষ্টির মঞ্জরী।
তৌহিদী রোশনীতে—
জ্বালায়ে গিয়াছ দ্বীনের মশাল জাহানের চারিভিতে।

তুমি নাই তবু তুমি চিরজীবি-মর্দে-মোমিন যাঁরা
সবে জানি জানি আল্লারি বাণী তাঁরা যে মৃত্যুহারা।

www.pathagar.com

ইক্‌বালকে

রুমী এবং গাজ্জালী—
জ্ঞানের যে দুই শাহান্‌শাহা—আসন তাঁদের রয় খালি,
কন্টক এবং বিয়াবানে ঘিরলো তাঁদের তাজমহল—
গায়ের এলেম শায়ের লোকের করলো দখল মন্‌-মগজ
হাফেজ সাদীর গুল বাগানে রুশ-জাদারা দেয় টহল
কোরান কালাম কেউ মানি না সার করেছি নামের হজ্ব।
খোদার নামে কোরবানী জান দেবার কারো নাই গরজ
দ্বিনের নামে বেদ্বিন সম নিত্য বাধাই লাখ ফেসাদ—
নফল কাজে বহেস্‌ করি সাফ্‌ ভুলে যাই খাস্‌ ফরজ,
মোমিন জীবন যপছি তবু মোমিন বনার স্বপ্ন-সাধ।

এমনি দিনে আসলে তুমি নও জামানার নও রুমী
গায়ের পাখীর গজল-গানে ভরলে দ্বীনি কুল মুলুক—
আসার সময় আসছিলে কি গাজ্জালিরো হাত চুমি—
ফালসাফা আর শায়েরীতে ঘুচলো দেশের আঁধার দুখ।
নওল আশে নওল শ্বাসে উঠলো নাচি লাশের বুক—
খুদীর যাদুর একটি ফুঁয়ে খেল্‌লে তুমি ভেল্কি-খেল্‌—
কোরান-কূপে লুকিয়ে ছিলো আব্‌হায়াতের উৎস মুখ,
জ্ঞান-কাঠিতে খুললে তাও, ঝরলো তাহার জল অঢেল।
বাঁচলো জাতি কবর-শায়ী ধরলো যবে তোমার রাহ্‌—
সালাম লহ-সালাম লহ-নওজামানার শাহান্‌শাহ্‌।

সিরাজী স্মরণে

আজ শুধু মনে পড়ে—
তখ্‌ত্‌ আর তাজ খসিলো যেদিন পলাশীর প্রান্তরে
ধ্বসিল আজাদী, ফিরিয়াছি কাঁদি, বাংলার ঘরে ঘরে,
কাত্‌লে আমের চলেছে মিছিল গাদ্দারী খঞ্জরে
শিরাজ কাসেম দিতেছে শিরের শিরোপা খাঞ্চা ভরে
বিদেশীর পদতলে—
বিহ্বল ভীত বক্ষ ভেসেছে খুনঝরা আঁসুজলে।

বন্দী-আহত শেরেরে সেদিন শিবাদল অনায়াসে
পদাঘাত হানে শ্মশানে-মশানে উদ্বেল উল্লাসে।

www.pathagar.com

দুনিয়ারী যত ধন-দৌলত সবি তার লয়ে লুটি,
কেমনে তাহার রূহানি কুয়ৎ—তা-ও দেয়া যায় টুটি
ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা তারি চলিলো সংগোপনে—
পরদেশী দেশী দুশমন যত জুটি বাঁধে একাসনে।
তারি ফলে তাঁর ভুলি ইতিহাস—ভুলি তেজ যোশ্ যত
শেরের বাচ্চা মেঘ সনে মিশি খায় ঘাস অবিরত।
শিবা হেরি ভয়ে কাঁপে—
দিবা দুপুরেই ডোবে তার রবি—কেবা জানে কার পাপে।
যেন কানে শুনি জাগে গর্জন কাৎরানী-ব্যথা ছাপি
ভূমিকম্পের কম্পনে যেনো সারা দেশ উঠে কাঁপি।
হুঙ্কারে তার উঠিলো উথলি বিস্মৃত যত কথা,
দীল্-দিলরুবা তুলিল গমকি তারি সুর-মত্ততা।
সিংহ-শাবক চিনিলো নিজেরে—মেঘ নহে সে ত কভু,
বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধি সে যে—দাস নহে, সে-ও প্রভু।
গোলামী গেলাফে ঢেকে রেখে তাকে কাফনের ছায়া-তলে
চেয়েছিলো যারা নাশিবে তাহারে ছলনার কৌশলে,
মুছে দেবে তার নাকের নিশানা সারা হিন্দ বুক হতে—
গণিল প্রমাদ সাধিয়াছে বাদ—কে-সে আসি কোন্ পথে

ইবলিস যায় ভুলি
মিথ্যারি বুকে হয় উত্থিত সত্যের অঙ্গুলি
আসিলে নকিব তুমি
ব্যথা সাহারায় ঝরালে আবার বাণী বাণীময় মৌসুমী।
তুর্কী তোরণে উঠেছিলো রণে জীবনের সেই গীতি
সারা ইসলামী জাহানে জাহানে যেই আশা-সস্মিতি
সুবে সাদেকের আলোকের মতো উঠেছিলো পুনঃ হাসি.
তারি নব নূরে তব দেশ তুমি তুলিলে যে উদ্ভাসি
এলো আফগানী, এলো আনোয়ার আলী ভাই এলো যবে
তাঁহাদের সাথে দ্বীনের ঝাণ্ডা তুমিত যগৌ রবে
উড়ালে ওতলে তব—
কাফনের বুকে জাগিলো আবার স্পন্দন নব নব
জাগিলো পাকিস্তান—
অর্জনে তার নহে তো ক্ষুদ্র তোমারো মহান দান।

www.pathagar.com

মারহাবা লিয়াকৎ

মারহাবা লিয়াকৎ !
মৃত্যু পারায়ে লভিলে জিন্দা জিন্দেগী শাহাদৎ।

তোমার দীলের আন্দেশা ছিল জাভা হতে হিস্পান
আরব-আজম ইরান-তুরান-পাক-চীন-আফগান,
যেথা আছে যত আখেরী নবীর উম্মত খানদান—
আল্লার আহ্বান
আবার তাঁদের মিনারে তুলুক ঐক্যের মহাগান।

তোমার দীলের আরমান ছিল ইসলামী হুকুমত—
জাহান জুড়িয়া আনুক দ্বীনের নব শাম শওকৎ,
আনুক আবার দুনিয়ার বুকে ইনসাফ ইজ্জত—
হিকমত হিম্মত্
জাগাক জীগরে জোশের আগুন তারি সাথে যুগপত।

তোমার দ্বীলের আর্জু যে ছিল মুসলিম মুর্তোবা
ঘোষুক আবার জাহানে জাদিদ্ বোগদাদ কর্দোভা,
আবার জ্বালুক জ্ঞানের মশাল মর্তের মনলোভা,
দীল্-চশ্প্ দিলরোবা—
মাটির বক্ষে জানাক আবার স্বর্গের শান শোভা।

তোমার দ্বীলের ইরাদা আছিল ইশ্য়াতে ইসলাম
কুল্ মখলুকে ঘোষুক আবার আল্লার খাস নাম,
আবার নামুক দুনিয়ার বুকে শান্তির শাবনাম,
সত্যের ইলহাম—
মন-মসজিদে রণুক নিগূঢ়ে হর্দম ভোর শাম।

তোমার কোশেশ পৌছেনি শেষে মকসেদ মঞ্জিল
এমনি সময় নিষাদ নিদয় দুশমন বুজদিল
তোমার ওষ্ঠে তুলে দিলো হায় মৃত্যুর বিষনীল।
তবু জানি এক তিল—
হয়নি বিলয় তব নির্ভয় আত্মা যে অনাবিল।
দেহের মাটি যে লুটে নেয়া যায়—আত্মাতো অক্ষয়,
সত্য সাধনা কলবী কালাম কভু তার নাহি লয়,
তোমার আয়াস রুহানী রহম্—বিশ্বাস দুর্জয়
অর্জিবে মহাজয়—

www.pathagar.com

ঐ হেরো তব সারা মিল্লাত জাগিতেছে ধরাময়।
মারহাবা লিয়াকত !
মৃত্যু পারায়ে লভিলে জিন্দা জিন্দেগী শাহাদত।

যুগের নকীব

তিমির রাত্রি-সিয়া আসমান—সেতারারা গেছে নিভে,
ঝঞ্ঝা তুফান লহর দরিয়া চারিদিকে শুধু নাচে—
পাতাল ফুঁড়িয়া পিশাচেরা হাসি আজ বুঝি মুছে দিবে
হারা-সংবিৎ জাতির চেতনা তখনো যা বেঁচে আছে।
হিন্দের বুক ছেয়ে—
জিন্দারা লুটে জিন্দান গাহে বান্দার লাথি খেয়ে।

আজাদী জঙ্গে শহীদ সিপাহী বীরের রক্ত তাজা
দেশের হাজারো যোজন জুড়িয়া তখনো যায় নি মুছে—
তখনো আকাশে জ্বলিছে রুদ্র জালেমী রৌদ্র ঝাঁঝাঁ,
জানে না কেহ এ গোলামী বেদনা এখন যাবে যে ঘুচে।
নিরাশা অন্ধকারে—
দিশাহারা জাতি ডুবিতেছে ধীরে অশ্রুর পারাবারে।

বাংলার নীলা গঙ্গার কূলে পলাশীর প্রান্তরে
যত বিশ্বাসঘাতকেরা মিলি ডুবালো মুক্তিরবি—
অত্যাচারের জের চলে তাই এখানেই ঘরে ঘরে,
শাসকের জাতি সেদিন এখানে শোষণের ছায়াছবি।
অনাদরে অপমানে—
কোটি মজলুম হাহাকারে লুটে কোটি গৃহ প্রাঙ্গণে।

এমনি নিবিড় ব্যথার আঁধারে সহসা পূবালী নভে
সুবে সাদেকের উম্মিদ বহি জাগিল জোহরা তারা—
মিনারে মিনারে জাগর আজান জাগিল কূজন রবে,
নিদালী বেহুঁশ মানুষের দেহে শিহরে জীবন সাড়া।
দেখিল তাহারা চাহি—
যুগের নকীব এল মসজিদে হৃদি-মিম্বর বাহি।
নব জামানার নব রাহাগীর তোমার আজান রবে
বন্দীশালার পাষাণ প্রাচীর পড়িল লুটায়ে ভূমে—
চির-মঞ্জিল মুকসেদ পথে যাত্রার উৎসবে

www.pathagar.com

নূতন কাফেলা চলে আরবার তোমার কদম চুমে।
যেদিন হেথায় এলে—
বন্ধন টুটি মুক্তিপাখীরা নভে পুন পাখা মেলে।

জাতির নকীব সিয়াসী ইমাম, তোমার প্রাণের সাড়া
বাংলার সীমা উত্তরি চলে হিন্দের দ্বারে দ্বারে—
সারা মুসলিম জাহান সে ডাকে হলো যে আত্মহারা,
সপ্ত-সিন্ধু-মেখলা বিশ্ব নাম স্মরে বারেবারে।
সীমার বাঁধন টুটি—
জীবন-মৃত্যু পারায়ে তুমি যে চির দিন আছ ফুটি

ধানের বাংলা-গানের বাংলা—নদীর বাংলা দেশে—
অজগর-অহি-কেউটে-কুমীর-শার্দুল-রাজ যত
এক সাথে হেথা আছে চিরকাল—একসাথে চলে—মেশে,
কোমলে-কঠোরে রুদ্রে-মধুরে খেলা হেথা অবিরত।
বাঙালী যে তুমি খাটি—
তোমার মাঝারে লভেছে স্বরূপ বাংলার নদী মাটি।
চির-নির্ভয় সেবায় কর্মে তোমার তুলনা তুমি
হাতেমের দীল—শেরের কুয়ৎ—হিম্মৎ সীমা-হারা—
নজিরবিহীন তব এ বিভবে ধন্য জন্ম-ভূমি,
হে শেরে-বাংলা ! শৌর্যে-সাহসে রচে গেছে নব-ধারা।
আত্ম-বিলয়ী দানে—
বারেবারে তুমি জাগায়েছ আশা হুতাশীর হত প্রাণে।

ধনীর দুলাল ! ধন সঞ্চয়ে অসীম ক্ষমতা রাখি,
জীবনে কখনো পড়িলে না বাঁধা মনি-কাঞ্চন-লোভে—
লাখো গরীবের অশ্রু-ঝালরে আপন অভাব ঢাকি,
নিঃস্বের লাগি প্রতি নিঃশ্বাসে কাঁদিয়াছ ব্যথা-ক্ষোভে।
দীনেরে বক্ষে লয়ে—
অত্যাচারীর শক্তির সাথে যুঝিয়াছ নির্ভয়ে।

সফেদ-কৃষ্ণ স্বদেশী-বিদেশী জালিমের পদতলে
নিপীড়িত কোটি মানুষের লাগি মুক্তি জেহাদে নামি—
জ্ঞানের মশাল জ্বালি দেশ-জুড়ি দূর গ্রাম-অঞ্চলে,
দীর্ঘ সমরে জিনিয়া আজাদী হয়েছ সফলকামী।
হে অমর বীর গাজী !
তোমার জেহাদী আবার উঠুক দিকে দিকে পুন বাজি।

www.pathagar.com

শহীদ স্মরণে

অন্ধকারের অন্ধ-কূপে জীবন ছিল রুদ্ধ বেগ,
ভূতুম পেঁচার দূত-চেলারা ভূত-দেখানো চিৎকারে—
ভয় দেখায়ে দুর্বলেরে হানত শিরে বজ্র মেঘ,
চল্‌তো পেষণ শোষণ শাসন—দেশের বুকে চারধারে।

দেশ-বিদেশী রক্তপায়ী ডাণ্ডাধারী পাণ্ডারা—
দু'হাত ভরি লুটতো লোভের রক্তে-গড়া বিত্ত-ধন,
স্বর্ণ-সরস মাটির মানুষ বল্‌লো দুখী সব-হারা—
অত্যাচারীর পায়েই শেষে করলো আত্মা-সমর্পণ।

দীর্ঘ টানা দুই শতাব্দী বক্ষ-বাহী দাসত্বের
স্তব্ধ বুকে জাগতো তবু কখন কভু প্রাণ-চেতন,
লক্ষ লোকের অক্ষি-ক্ষরা অশ্রু-বাড়ব-বহ্নি জের
চাইতো আবার গড়তে নূতন রক্ত-তাজা মুক্তিপণ।

হয়নি সফল—ফল তবু তার যায়নি মুছে ব্যর্থতায়,
প্রাত-প্রভাতী আঁধার শেষে ঊষা যেমন দেয় দেখা—
নিত্য গতির চক্রে যেমন রাত্রি এবং দিবস ভায়,
চেতন জাতির বিজয়-গাথা তেমনি আবার হয় লেখা।

সেই চেতনা আনলো যারা—আনলো গতি স্তব্ধ পায়
সেই দলেরি অগ্রপথিক—জানত সেরা অগ্রদূত—
ধ্বংস-ভীতির মৃত্যু-ভয়ে টললে না তো আশঙ্কায়—
মুক্তিবাণীর ডঙ্কা-রবে হাঁকলে তুমি সিংহ-সূত।

মুক্তি নামের সাধন পথে করলো যারা শাহাদৎ
অমর তারা—সমর-জয়ী নিত্য কালের জয়-পথিক—
পথ-ভোলানো অন্ধ রাতে তারাই দেখায় মুক্তি-পথ,
শহীদ তুমি সত্য শহীদ জাতির নেতা প্রাণ-অধিক।

আকরম খাঁ স্মরণে

নিশীথ রাত্রি, সিয়া আসমান ফেরুপাল ফেরে ডাকি,
গোরের উদাস বুক জুড়ে কোথা জীবনের নাই সাড়া—
আলেয়ার আলো জ্বলে-নিভে শুধু মাঠে মাঠে থাকি থাকি,
ভয়াল রাতের বিভীষিকা-কোলে নাচে প্রেত-আত্মারা,
সেদিনের দিনগুলি—

www.pathagar.com

কালের চক্রে হারায়েছে দিশা-পথ যেন গেছে ভুলি।
একদা যাহারা পূজিত তোমারে পদতলে মাথা গুঁজি
শত হিংসা-আক্রোশে তারা সাপসম ওঠে ফুঁসি—
তোমার ধ্বংসপন্থা তারাই আগ্রহে নিলো খুঁজি,
নতুন প্রভুর বন্দনা বাহী স্তবে স্তবে তারে তুষি।
লাঞ্ছনা অপমানে—
হাজার জুলুমে সেদিন তুমি যে হারা-হুঁশ মনে প্রাণে।

তোমার লহুর তৌহিদী তেজ জেহাদের যোশ জ্বালা
রাখি বহু দিন সতেজ তোমারে হেজাজের প্রাণ-স্রোতে
সেদিন ভুলেছ বিলাশে ডুবিয়া ত্যাগ-পুত গুলে-লালা,
ভুলেছ জ্বালাতে পথের প্রদীপ শহীদের খুন-জ্যোতে।
পথ দিশা গেলো মুছে—
ত্যাগ নাই তবু ভোগ চেয়ে চেয়ে বৃথা কাঁদা আফসুসে।

তারি মাঝে জাগি জেহাদী সিপাহী-ওহাবী ও ফকিরেরা
হিন্দ-বাংলার গিরি প্রান্তরে জীগরের খুন ঢালি,
চেয়েছিল জানি নিঃশেষে মুছি গোলামির আন্ধেরা
জীবনের দামে দিয়ে যাবে ফের আজাদীর দীপ জ্বালি,
হল না সফল তাঁরা—
দিয়ে গেলো তবু পথের ইশারা—নবতর প্রাণ-সাড়া

সেই পথ বাহী চলিল যাহারা মুকসেদ মঞ্জিলে,
শত জিন্দান-বন্ধন-ঘেরা জিঞ্জির টুটি টুটি—
খালেস নিয়তে মুক্তিরে তারা চেয়েছিল মন-দীলে,
বাধার অদ্রি গেছে লঙ্ঘিয়া পড়ে নাই পথে লুটে।
তাঁহাদেরি সাথে তুমি—
করেছ মুক্ত আজাদ আপন জাতি ও জন্মভূমি।

ঘরে ও বাহিরে লাখো দুষমন শোষণে পেষণে নিতি
তব কওমের জানী ও রূহানী জিন্দেগী পায়ে দলি—
সেদিন যখন চলে বে-দেরেগ—সহসা সে ভয় ভীতি
নিঃশেষে মুছি অভয় কণ্ঠ উঠেছিল উচ্ছলি।
সে নব জাগর ধ্বনি—
তোমার কণ্ঠে প্রাণ-উচ্ছাসে উঠেছিল গুঞ্জনি।
তোমার দিনের মহাসাম্যের সুউদার মানবতা
তোমারি মায়ের ভাষার আসরে আঁকিয়াছ বারে বারে—

www.pathagar.com

তারি জ্যোতি-রাগে অজ্ঞানতার ঘুচিয়াছে অন্ধতা,
ঘুচেছে মিথ্যা বাতেল আকিদা সত্যের সম্ভারে।
ঘরে ঘরে দেশে দেশে—
তব ইলমের রোশনী জ্বালিছে পুণ্যের আশ্লেষে।

নজরুলের প্রতি

সুরত জামাল জোহরা-সেতারা রাতের আঁধার টুটি
সুবে সাদেকের উদয় ললাটে ওঠেনি তখনো ফুটি।
ঊষার সফেদ গম্মুজ ঘেরা আলোর মিনার শিরে
খোশ এলহান মুয়াজ্জিনেরা সুমধুর গম্ভীরে
তখনো ঘোষেনি দিনের দাওয়াত আজানের আহ্বানে
নীল আসমানী খিলানে খিলানে দিক হতে দিক পানে।
কওমেরে ভুলি নওমের কোলে আমরা তখন সবে
হয়েছি দাখেল আকেল হারায়ে গোমরাহী উৎসবে।

কে জানি সহসা যেনো
কহিল ডাকিয়া জিন্দারা জাগো মিছে ঘুম আর কেনো?

মাশরেকি এই সুদূর মুলুকে মোশরেকি বেদায়াতে
আমাদের যত কওল কালাম সবি বুঝি এক সাথে
যেতেছিল ডুবে অতি নিশ্চুপে ঘণ্টা কাঁসর রোলে—
ভূত-খানা চোঁয়া জবানী শরাব পিয়া পিয়া তারি কোলে
আমরা সেদিন লুপ্ত চেতন পড়িতেছিলাম ঢলি,
এমনি সময় কাহার অভয় বাণী তোলে চঞ্চলি
লাখো সে মুর্দা দীলেরে আবার মর্দের মহা হাঁকে;
নফল ভুলিয়া জাগিলাম মোরা নকীবের নব ডাকে।
ঘণ্টা কাঁসর যত—

দফ-জামানার দরাজ আওয়াজে ফের হলো প্রতিহত।
নয়া সাবায়া মুয়াল্লাকা রচি সেদিন কাবার দ্বারে
নব ইমরুল কায়েসেরা আজি নাহি আসে বারে বারে
উকাজ আর জুল মাজাজ মেলায় কাবিল কবিরা মিলি
রচিছে না আর নতুন করিয়া কবিতার অঞ্জলি
বেদুইন আর মরুপথে তার বসিয়া উষ্ট্র পিঠে
গাহিয়া ফেরে না কাসিদা করুণ আঙ্গুর কড়া মিঠে।
ইরান মুলুক বিরান বলিয়া সেদিন গেছে যে ভুলি
গুলাবের বাগে ছিল তার যত গজলের বুলবুলি।—

www.pathagar.com

মুয়াজ্জিন কবি

নিশীথ রাতের কালো বিভীষিকা—ঝঞ্ঝা উতলা বুকে
সহসা সেদিন ফেটে পড়ে বুঝি দুঃসহ ব্যথা দুখে।
ইস্রাফিলের প্রলয় শিঙ্গা উঠি কি ওষ্ঠ পাতে
মরা জিন্দেগী তুলিলো কাঁপায়ে তারি সুর-সংঘাতে ?
হিন্দের তাজ গিয়াছে সেদিন সিন্ধু অতলে ডুবি—
হাজারো লহরে-ধোয়া দেহে তার নাই আর খোশ-খুবী ;
ইরান মুলুক হয়েছে বিরান—শিরাজের বুলবুলি
যত তার মধু-গজল-গীতিকা বিলকুল গেছে ভুলি,
আরব আজম চৌদিকে ফোসে মাগরেবী আজদাহা—
আল্লার কাবা তাবার মানসে এলো যেন আবরাহা ;
মিসর সুদান পাষাণ-পেষণে গোলামীর ঋণ শোধে,
দূর মরক্কো সিংহ শিশুরা ধুঁকে মরে-মরু-রোদে
শের-সেতানী-মাহদী
শূচররা জীগরের খুন ঢালে
তখনো রেখেছে রঙ্গিন করি সাহারার মরু-বালি ;
তাতার তুরানী তুর্কী বীরেরা আছিলো জিন্দা যারা,
সহসা আজাদী হারায়ে তারাও হল সম্বিত-হারা।
এমনি তিমির রাতে—
কে যেন হাঁকিলো ঊষার আজান মসজিদ মিনারাতে।

বাংলার কোটি কুটিরে কুটিরে মূর্ছিত নর-নারী
শত বরষের তন্দ্রার শেষে নব-প্রাণ সঞ্চারী
আজানের সেই সুরের পরশে চকিতে নয়ন মেলি
হেরিলো ঊষসী পরিতেছে পুনঃ রক্ত সাহানা চেলী।
আখেরি রাতের তিমির পারায়ে কখন জোহরা তারা
রয়েছে তাকায়ে প্রভাতের পানে পলক নিমেষ-হারা।
সুবে সাদেকের সেহেলিরা কবে রাতের বোর্কা খুলি
নিঁদ জাগা লাখো পাখীর গজলে উঠিতেছে উচ্ছলি।
এমনি নয়ালী আলোর পেয়ালা জীবনের কাওসারে
লাখো মুর্দার গুর্দার গেহে আনে প্রাণ বারে বারে।
সেই চির পথ বেয়ে—
বন্দী রকেরা সিন্ধুর ডাকে মেলে পাখ নভ ছেয়ে।

হেরিলাম পুনঃ খালিদ-তারিক আবার কবর ফুঁড়ে

www.pathagar.com

এলো যেনো ফিরে আমাদেরি মাঝে শত যুগ উত্তরি।
রীফের সিংহ উঠিল গরজি মরু–গিরি–শিরে শিরে,
জাগে জগলুল আগুনের ফুল কোহেরার তীরে তীরে।
ক্ষণ পরাজয় ভুলি জাগে ফের তুর্কী বীরেরা যত,
মার খেয়ে জাগে লুব্ধ জালিম শকুনীরা উদ্ধত।
দামাল কামাল দেখালো আবার—ঈমানের যোশ–জ্বলে
গেহ–কোণে নয়—জঙ্গ–ময়দানে আর অসি–ছায়া তলে।
মোমেন সাচ্চা—শেরের বাচ্চা—শহীদের লাল বেশে
মৃত্যুরে বরি মৃত্যু–জয়ের উল্লাসে উঠে হেসে।
মউতেরে এরা ফউত করিয়া মাতে জঙ্গ–মৌতাতে—
এক হাতে ধরে গাজীর ঝাণ্ডা—শাহাদাৎ আর হাতে।
আবে–হায়াতের বাণী—
এমনি কত না শুনালে হে কবি—সত্যের সন্ধানী।

তব ওয়াতন জিন্দান গাহে বন্দী মানব যত—
তোমার 'অগ্নি–বীণা'র পরশে শিহরিয়া অবিরত
শৃঙ্খল কারা টুটে পদাঘাতে আর নাহি ভয় ভীতি,
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে যায় তারা জীবনের জয়গীতি।
তোমার 'বিষের বাঁশী'র আবেশে কেউটেরা মরে ফুঁসে
বিষহারা যত ঢোঁড়ারা তখন মাথা কোটে আফসোসে।
নিঃস্বেরা যেথা বিশ্বের পথে হয়েছে সর্বহারা—
তাহাদেরো লাগি তব চিতে জাগে ব্যথার ফল্গুধারা।
মুটে ও মজুর কামার কুমার, তাঁতী আর জেলে চাষী—
তাদের বেদনা বাঁধিয়াছে বাসা তোমার বক্ষে আসি।
অসহায়া আর অবলা নারীরা আর যত লাঞ্ছিতা—
তোমার হৃদয়ে জ্বালায়েছে জানি অসহ দুখের চিতা।
হে কবি মানব দরদী—
হাসির আড়ালে রেখেছ লুকায়ে ব্যথার অথৈ নদী।

সৈনিক কবি মুজাহেদ সেনা, গজলের বুলবুলি।
আজ কি তোমার চারণ–বীণার সব বাণী গেছ ভুলি?
কোণ বেদনার পাষাণ পরশ তব গীতি নিল কেড়ে—
আমাদেরি মাঝে রয়ে তবু তুমি আমাদেরে গেছো ছেড়ে।
ললাটের বুঝি লিখা—
প্রদীপ রয়েছে—সলতে অটুট—নাই শুধু আলো–শিখা।

www.pathagar.com

বন্ধু আজ শুনো

অনেক ঈদের খুশী অনেক উৎসব
সাইমুম সাহারা ঘেরা
আমাদের ধরণীতে
হয়ে গেছে শব—
হয়েছে কঙ্কাল—
উষার উম্মিদহীন তমিস্রার জাল—
সেথায় ছড়ানো।
শত কষ্ট-অক্টোপাশ-বাহুতে জড়ানো
এই জিন্দেগানী—
সেথা শুধু রক্ত-পেষা ঘানি
চলেছে দিবস-রাত্রি বিরাম-বিহীন।
আমাদের দিন
দেখেনি সুখের সূর্য যুগ-যুগ ধরে—
তোমাদের লোভ-বহ্নি-শিখায় সন্তরি
নিত্য মোরা মরি
পতঙ্গের মতো ;
তবু সে সতত
তোমাদের পিছু পিছু ছুটি—
পদাঘাত খেয়ে তবু পদতলে লুটি,
সে তো শুধু সধর্ম বোধের
নিঃশেষিত জের।
ঠকায়েছো ঢের
মানুষেরে নহে শুধু
খোদ্ সে খোদারে
অজ্ঞানের অশিক্ষার চির অন্ধকারে
রাখি জনতারে।
ধর্মের মর্মেরে আর চির সত্য ঢাকি
রচি মিথ্যা ফাঁকি
কত লক্ষ অলিক কাহিনী,—
স্বার্থে কেবা তোমাদের দূতের বাহিনী—
পাঠায়েছ আমাদের দ্বারে,
শুকায়েছ মৃত্যু পরপারে
আমাদের লাগি নাকি নিত্য রহিয়াছে

আল্লার আনন্দময় আরশেরি কাছে
হুরপরী বেহেশতী আরাম ;
পূর্ণ–মনস্কাম।
আর এই বেহুদা আনার
মিথ্যাময়ী আন্ধা দুনিয়ার
জমিদারী খাস—
জ্যোতিদীপ্ত সপ্ত–তল সুবর্ণ–আবাস
আমাদেরি ভালাইয়ের লাগি
দিবা রাত্রি জাগি
তোমরা বহিছ শিরে বহু কষ্ট সহি।
বন্ধু আজ শোনো স্পষ্ট কহি—
শোনো যত বকধার্মিকেরা ;
আজ আর গড্ডলিকা ভেড়া
নহি মোরা কেহ,
আমাদের সারা চিত্ত দেহ
আজ সচেতন।
শুনিয়াছি মুক্তি আবাহন
নূতন যুগের ;
তাই কহি ফের ;
এখনো রয়েছে আশা জাগিবে ইনসাফ
নিঃশেষিত হবে হেথা
অন্যায় আর অত্যাচার পাপ—
জুলুমের শোষণের লক্ষ অভিশাপ
সব হবে শেষ—
মজলুম দুনিয়াময় মুক্তির কোশেশ
হবেই সফল।
সে শাসক, হে শোষক, জালিমের দল !
সে আশারে করো না নির্মূল।
তোমাদের পুঞ্জিভূত রক্তমাখা ভুল
করো সংশোধন।
আত্মসমর্পণ,
ন্যায় আর মুক্তি–ঝাণ্ডা তলে
করো দলে দলে।
দেখিছো না তব পদতলে
আজ নাই মাটি।

www.pathagar.com

মন্ত্রপূত তব যত ষড়যন্ত্র ঘাঁটি
সব গেছে ফাটি—
চূর্ণ-খান্‌-খান্‌।
আল্লার ফরমান
আজ এলো ফের—
যত সব স্বার্থ—বন্ধনের
শেষ করো জের।
আজ আত্মশুদ্ধির আহবান—
বনের পশুরে নহে—
মনের পশুরে
লোভের অসুরে
করো বন্ধু করো কোরবান।

সাচ্চা মোমেন বাচ্চারা জাগ

জঙ্গ এ জেহাদ, জোর জোয়ানী জাদিদ জোশ্‌
নামায় হেরার লহর নূরের নজর খোশ।
খোদার খামার খাল্‌ক্‌ খালেদ খাদেম তোর,
জমিন জাহান জেহান চাহি—জমুক জোর।
নয়ন-লোর
দেয় না আমান—যুগ-জামানা চশম-খোর।
তামাম তারীখ—তালিম কহে তাহার বাত
ভুলের ভেলায় ভাসছো বৃথা ভূতের সাথ
লাৎ-মানাৎ—তামস-রাত
তারার চেরাগ চুর কত্তে না অকস্মাৎ।
হাসিন হাসির হাশিশ-নেশায় নাই হায়াৎ
জুলফিকারের জ্বালা—কিল্লার বজ্র-পাত
আনে প্রভাত
আনে আফতাব আলো-আন্দেশা খুবসুরাত
তেলেছমাত।

*   *   *

জঙ্গ এ জেহাদ, জোর জোয়ানী জাদিদ জোশ্‌
নামায় হেরার লহর নূরের নজর খোশ।
লক্ষ ছিনার লোহিত লালিম লহুর তেজ
জাগায় জীবন অসৎ জলুছ জ্যোতির সেজ।
জ্বালায় জালাল জোশের জোয়ার জিন্দেগীর,
তামাম জাহান জুতায় যে তার লুটায় শির।

www.pathagar.com

অজর তাহার ধ্বজার ফকর ফজর–শাম
হাজার আলোয় ছড়ায় আলম—ভর তামাম্।
হাজার বরষ তাহার পরশ—মালিক ছায়
ভাষায় সুরুজ নিখিল বুরুজ নূর ছটায়
আঁধার রাতের বাধার পাহাড় ঝঞ্ঝাবাত
এক লহমায় স্পর্শে তাহার যায় নিপাত।
ভুবন বিপুল শাহেনশাহীর বাহুর বল্
সবায় সাকার কাবার শেরের খাবার তল
যায় অতল
জমাট যেথায় জাহান্নামের জহর জল।
জলদি চল—
ন্যায়ের ফুকার বাজলো আবার অনর্গল
আজ হবে ঝুট সব কাতল।
জিন্দাদল–জঙ্গীদল,
জলদি চল—জলদি চল।
কম–জোরীর আর নাই খামোশ্
আজ আঁখে চাই
আতশ জ্বালা—আগুন ঢালা
দহন–রোশ
নাই আপোষ,
জিন্দাদল্—জলদি চল—জলদি চল্।

*　　*　　*

জঙ্গ এ জেহাদ, জোর জোয়ানী–জাদিদ জোশ্
নামায় হেরার লহর নূরের নজর খোশ।
শহীদ বীরের শহদ সুরার কাতরা ভর
ভয়–কাতরের বুক হতে ভাই ভাগায় ডর।
মুর্দারেরো মর্মে জাগায় মুক্তি বেগ
বুজদেলের ঐ হস্তে ঝলায় তীক্ষ্ণ তেগ।
মরণ যে জন—মাড়ায় সদাই পায়ের তল,
অমর জীবন তার লাগি ভাই হয় সফল
মানুষ যেথায় মোহের মায়া নাচায় লেশ,
মউৎ সেথায় ফউৎ ফেরার ফতুর শেষ।—
নিরুদ্দেশ
ভাবনা জয়ের ভুলকি ব্যথায় ভয় অশেষ।

*　　*　　*

www.pathagar.com

ভয় জয়ী সব জয় করে নেয় জালেম দেশ—
ন্যায় নীতির ঐ নছিব—নামার নও কোশেশ।
সেইখানে ফের সাজায় শাহীন নূতন বেশ
নও রাজেশ।
নও জোয়ানীর নকীব নায়েব নওশাদল—
নও জীবনের ফলায় ফুলেল নও ফসল।
জঙ্গ—জিয়ানো আরবী তাজীর খুরের ঝাঁঝ
সেইখানে পায় শের—ঝুঁকানো তাজিম তাজ,
সেইখানে নেয় কায়েম করি আদেল রাজ,
নাই খেরাজ বে আন্দাজ
নাইকো সেথায় উজির নাজির জুলুমবাজ ;
সেইখানে তাই সবার শহীদ সেনার সাজ
সেইখানে ভাই জঙ্গী নারার জোর আওয়াজ
সকাল-সাঁঝ

* * *

জঙ্গ এ জেহাদ, জোর জোয়ানী জাদিদ জোশ
নামায় হেরার লহর নূরের নজর খোশ।
কুল কবিলার কাবেল যত কাজের লোক
লাখ-কাফেলার কাতার বন্দী কায়েম হোক্
কোহ্-কাফের ঐ কাতল্-গাহের কোণার পর
খর-শোরার সব দাজ্জালেরে খতম কর।
ভর দুনিয়ায় জাগুক এদের মাতম স্বর
দিন-দুপুর
বনলো হারাম হস্তে এদের হালাল-হক
নেয় না এরা পাক—কালামের এক ছবক—
ভোগ- লালসায় মাগায় শুধু তাক চমক—
জসৎভর—নিরন্তর
ইশক-ইমানে লাগাও তারে এক ধমক
কাঁদবে তাহার জাহান জমিন সাত তবক
এক লহমায় লুটবে তাহার রূপ-গমক
ঠাট—ঠমক।
হস্তে তোমার লাখ হাতিয়ার নাইবা থাক
হায়দরী সেই বদর জয়ী হাঁকার হাঁক
দেখবে তখন লাখ হালাকু সব হালাক।
খোদার বাক ঃ

www.pathagar.com

হইবে আবার না-পাক জাহান পুণ্য পাক।
আসছে ডাক—
জাগ মোজাহেদ লক্ষ-লাখ—
নও জোয়ানরা জাগ বেবাক,
জাগ রে তামাম জাহান-খাক্
সাচ্চা মোমেন বাচ্চারা জাগ্—
জাগরে জাগ—
জাগ-বেবাক

* * *

জঙ্গ এ জেহাদ, জোর জোয়ানী-জাদিদ জোশ্
নামায় হেরার লহর নূরের নজর খোশ।

সন্ধ্যার গান

আগুন-দহন দিনের শেষে নামিল শীতল সন্ধ্যা
এবার আমার মনের বনে ফুটিবে রজনীগন্ধা।
ব্যাকুল হাওয়ার বেদনা আশা
রাতের নিথরে পাবে যে ভাষা
রচিবে আমার কাঁদন হাসা কবিতা-শিথিল ছন্দা।।
তিমির তটিনী নটিনী নাচে
বহিবে ভূলোক ব্যাপিয়া
উতল তাহার ঢেউয়ের দোলা
দুলিবে দ্যুলোক ছাপিয়া।
আমার প্রাণের সাগরবেলা
আনিবে ডাকি সে ঢেউয়ের মেলা
তারি বুকে নামি করিবে খেলা
মলয় মধুর মন্দা।
আগুন দহন দিনের শেষে নামিল শীতল সন্ধ্যা।।

ঈদুজ্জোহা

আজ এ খুশীর খোশবু-গুলে দীল-বাগিচায় জ্বলছে নূর।
চল মুসাফির ঐতো বাজে নও-জোয়ানীর শহদ্ সুর।
আর সাহারার কহর-জ্বালা

www.pathagar.com

করবে না রে দীল উতালা—
আবহায়াতের আয়েশ-ঢালা বইছে নহর লহর দূর॥
আর মারওয়া-সাফার পথে
মা হাজেরা রইবে না রে,
জম্‌জমেরই কাওসারী ঢল
জাহান-জোড়া নামলো ধারে।
ইবরাহীমের প্রেম-উজালা জেকের-পূত জীগর-দীল
দানলো যেথা খোদার নামে আপনা বেটা ইসমাইল
আব্‌-হারা সে কাবার কূলে
রক্ত আবের রোশনি-ফুলে
আজ শাহানা উঠুক দুলে খুন-সোরাহি ঢাল্ উপুড়।
আজ এ খুশীর খোশবু-গুলে দীল-বাগিচায় জ্বলছে নূর।

খুনেরা ঈদ

এলো কোরবানী খুনেরা ঈদ
এখনো ভাঙেনি গাফেলী নিঁদ?

জাহান জুড়িয়া কাতল গাহ্
দিকে দিকে রণে মাতম আহ্
রঙ্গিলা বাস বাহ্‌রে বাহ্
ময়ূর সম পরেছ খুব
চার পাশে তব দেখেছ কি চেয়ে
কঙ্কালময় শবের স্তুপ?
তবু কথা কও? খামোশ্ চুপ!

এসেছে তোমার ঈদোৎসব?
খানা ও লেবাসে তাহারি স্তব
জানায়েছ বুঝি আজিকে ভাই?
এ যে কোরবানী দানের দিন,
যত শহীদান মুসলেমিন,
চাহিতেছে আজি তাহারি চিন
সে কথা তোমার মনে কি নাই?

শহীদির রাহে দিলো যে জান
তাহারি রাঙা খুন-ছোপান

www.pathagar.com

আজিকে চাহি রে লাল পিরান,
নহে নহে ঐ ময়ূরী ঢং
উৎসব আজি—নহে এ ঝুট,
জঙ্গী জমিনে চালাও লুট—
রংরুট চাহি চাহি না সং।

এলো কোরবানী খুনেরা ঈদ
এখনো ভাঙেনি গাফেলী নিঁদ ?
আজ ঢালিবে তোমরা রুধির লাল
হানি ভেড়া আর গরুর পাল !
মোজাহেদ জাত— হায় কপাল !
ভুলি গেছো নিজ জিগর লউ ?
তেগ হাতিয়ার ফেলে দিয়ে সাফ্
সাজিয়াছ আজ জানানা-বউ ?

তবু মাগিছো মানের মহুয়া-মউ ?
পশু হানি মিলে পশুরই মান
মান চাই যদি দাও না জান্
ধন-জন সব দে কোরবান
তবে তো আসিবে জয়-ইজ্জত—

শুনো দোস্ত মোর সাচ্চা বাত
পায়নি সম্মান কোনো সে জাত
বাহি নকরির গোলামী পথ
হয়ত তঙ্কা মিলিবে ঢের,
শির রবে জানি—রবে না শের,
যুগ যুগ ধরি তাহারি জের,
চলিবে বহি সে দাস জোয়াল,
বহ্নু দরিয়ার উতলা বেগ্
ঝিমাবে আলসে ভুলি আবেগ—
নীল-সিয়া হবে—রবে না লাল।

এলো কোরবানী খুনেরা ঈদ
এখনো টুটেনি গাফেলী নিঁদ ?

মনে পড়ে নবী ইব্রাহিম
শঙ্কা বিপদে না হয়ে হিম
দিলো কোরবানী প্রাণ-প্রতিম

www.pathagar.com

আপন তনয় ইসমাইল।
আল্লার রাহে কি দেবে কে?
এলো পুন ডাক তাহারি যে
নবীরই মতন দিবি তো দে
উপাড়ি বুকের কলিজা দীল—
জ্বালায়ে প্রাণের আতশী জ্বিল—
বাজাক শিঙ্গা ইস্রাফিল।

চাহে না আল্লা হেলার দান—
গরু-ভেড়া আর ছাগের প্রাণ—
মিসকিন নহে মাগিবে ভিখ—
সকলের চেয়ে পেয়ারা চিজ—
সাধ-সাধনার স্বপন নিজ,
কামনা সুখের গোপন বীজ,
পারে যদি কেউ তবে সে দিক।
কোরবানী শুধু খেলা যে নয়
চলে না হেথায় ছলনা ভয়
খুদিরে চির করিলে লয়
খোদারে তবেই মিলিবে ঠিক।

শুনো 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর
আজিও হাজেরা মায়ের স্বর
কাঁদিয়া ফিরিছে আকুলতর
মাগিয়া শিশুর পিয়াসা জল।
আজি যে তাহারি স্মরণ দিন
শোধিতে হবে সে বেদনা-ঋণ,
মউজ-মাতাল আয়েশী-বীণ
আজিকে হেলায় চরণে দল;
আজ ব্যথার জেহাদে চল রে চল—
ওরে বীর গাজী কাফেলা-দল।

নয়ন মেলিয়া নিখিলে চা,
দেখিবি হাজারো হাজেরা মা
পিয়াসায় ভুখে ধুঁকিছে আহ—
দেখিবারে তারে কেহ যে নাই;
তবুও জালিম দানব সব

www.pathagar.com

করিছে ভোগেরই মহোৎসব—
দুখীরে শোষিয়া করিছে শব
কাড়িছে তাহার মরণ ঠাঁই।
চির সে ব্যথীর ব্যথারে নাশ
করো করো আনি হাসিন হাস
ঈদ হবে ঈদ তবেই আজ,
জুলুম ও জালিমে না করি ভয়
প্রাণে রে মাগিয়া প্রাণ–বিলয়—
করোরে তবেই আসিবে জয়
চরণে তোমারো লুটিবে তাজ।

এলো কোরবানী খুনেরা ঈদ
এখনো টুটেনি গাফেলী নিঁদ?

শুন শুন আজ বাজিছে ফের
নব রণভেরী ইসলামের,
মুজাহিদ সেনা—বাহিনী ঢের
করিছে আবার কুচকাওয়াজ,
নব খয়বর—ফিলিস্তিন
আনিলো ফিরায়ে জেহাদী দিন,
আজো ইসলাম হয়নি ক্ষীণ
হাঁক সে দ্বীনের হাঁক আওয়াজ,
ত্রাস–কম্পিত জুলুম রাজ!

শুনো আসমানে ডাকিছে বাজ
জালিমের শিরে কাঁপিছে তাজ
সারা মুসলিম ধরণী আজ
জাগিছে শিহরি প্রাণোন্মুখ—
জাগিছে নয়ালা আল ফারুক
খুন-খোশরোজ খুনী এ দিন
বীরের এ ঈদ ভাবনাহীন
আসিলো আবার জাগিছে দ্বীন—
ঘুচায়ে ধরার বেদনা দুখ।

এলো কোরবানী খুনেরা ঈদ
এখনো ভাঙেনি গাফেলী নিঁদ?

www.pathagar.com

সে হলো তপ্ত শহিদী খুন্

ওড়ে আসমানে ঝড়ের ঝাণ্ডা—মাটির বক্ষে বাষ্প-ধূম,
ফুঁসিছে ভয়াল অগ্নি-গিরিরা—সাগরে বাড়ব-বহ্নি-ঢেউ—
ওরে ও গাফিল্ ভীরু তংদীল্ এখনো কি তোর ভাঙেনি ঘুম,
সময়ে যদি না জাগে রে চেতনা—রহে না মূর্ত মর্তে কেউ।
কত জাতি হেথা হারালো চিন্
ধরার ধুলায় গেছে মিশে তারা নিঃশেষে হয়ে লয়-বিলীন।

চির চরণ-পিষ্ট যাহারা—দেখেছি তারাও বিশ্বে চায়—
শান্-শওকাত্ মান-ইজ্জত-বিজয়ীর পথ—উচ্চ শির,
কেবা কবে কোথা শুনিয়াছ বলো—বীরের শিরোপা ভীরুরা পায়—
ঢালে না যাহারা জীগরের খুন্—ঢালে শুধু লোনা আঁখির নীর।
ফেরুপাল লাগি নয় জগৎ—
মালিকানা খাঁটি চাও যদি তার—দাও তবে লহু-দস্তখত।

ঝুঁঠা আজাদীর মিঠা বুলী শুনি—যদি খুঁজে ফেরো আরাম ঘুম
বন্ধু গো শুনো—তব তরে তবে—হবে সম্মান হারাম-সাফ—
ইজ্জত শুধু তারি লাগি যারা বিনিময়ে দেয় মরণ-চুম,
এখানে বন্ধু নাহি মায়া দয়া—হেথা নাহি কোন রেয়াৎ-সাফ্।
আছে শুধু এক মন্ত্র-গুণ—
সে হলো আত্মত্যাগের সরণী—সে হলো তপ্ত শহিদী খুন।

রক্তে আমার রং ধরেছে

রক্তে আমার রং ধরেছে জঙ্গ-জেহাদের খুন-জোশে,
শুকনা নদীর বক্ষে আবার আসছে ছুটি বন্যা-ঢেউ—
জং-ধরা সব তেজ-তলোয়ার উঠছে নেচে খাপ-কোষে,
সুপ্তি-সুখের অন্ধ-কূপে বন্ধ রবে চায় না কেউ।

মৃত্যু বরি মৃত্যুজয়ের বিশ্ব-জয়ী হিম্মতে
বক্ষ-সিনা পূর্ণ আমার—নিত্য আমার লক্ষ্য পথ ;
কিনবো আমি সত্য আমার তপ্ত লহুর কিস্মতে,
সস্তাদামে খাস্তা লোভের চাই না ঝুটা মহব্বত।

শহীদ-গাজী ইমাম আমার— আমরা তাঁরি মুকতাদী,
জঙ্গ জেহাদী ময়দানই যে নিত্য আমার জায়নামাজ—

www.pathagar.com

আল্লাহ্ নামের জয় আরাবে আমরা সদা সুর সাধি,
আল্লাহুরই শানের লাগি নিত্য লুটাই শির ও তাজ।

উষ্ট্র ভেড়ার হত্য নহে আত্মাহুতির কোরবানী
মখলুকাতের মুক্তি মাগি আমার লাগি রোজ ফরজ—
আল্লাহ্-নবীর গজল গীতি রাত্রিদিবা মোর বাণী
স্বার্থ সুনাম বিত্ত তরে নাই রে আমার নাই গরজ।

মাটির ঢেলা মাটির বুকে জীবন শেষে যায় মিশে,
জীবন সে নয় স্বপন সে তো মিথ্যা মায়ার দুঃস্বপন,
আপনি জ্বলি যে জন নিতি ছড়ায় আলো দিক-দিশে,
আঁধার বুকে মুক্তি-আলোর চিরন্তনী সেই তপন।

জেহাদ সেতো শহদ-সুধা ধন্য তাহার জিন্দেগী,
যে-জন তারি বিন্দু পিয়া মরণ সিন্ধু লয় শোষি—
মরণ আহা মরণ সে নয়, স্মরণ লোকের সেই বেদী
নিত্য কালের বক্ষে জাগে লক্ষ বীরের মন তোষি।

যুগান্তরের সুপ্তি শেষে আনলো বুঝি নও ঊষা—
রাত্রি শেষে মিনার চূড়ে জাগলো জ্যোতির ফের আজান ;
দিক-রেখারা পরছে আবার জং-জেহাদী লাল ভূষা—
মোমিন তোরে ডাক দিলো কি খুন-শাহানা আলোর বাণ ?

রক্তে আমার রং ধরেছে জঙ্গ-জেহাদী খুন-জোশে—
শুকনা নদীর বক্ষে আবার আসছে ছুটে বন্যা-ঢেউ,
জং-ধরা সব তেগ-তলোয়ার উঠছে নেচে খাপ-কোষে—
সুপ্তি সুখের অন্ধ-কূপে বন্ধ রবে চায় না কেউ।

জঙ্গী জোয়ান দল

রাঙা-ঊষা ডাক দিয়েছে, জঙ্গী, জোয়ান দল
মৃত্যু-নিঁদের অন্তে আবার জোর্ কদমে চল্ !
রক্ত-সাগর উঠছে দুলে জাগছে কলকল—
　　　দুলছে উলমল্,
তোরি চলার পায়ের ঘায়ে কাঁপছে ধরাতল
　　　জোর কদমে চল্
　　　জঙ্গী জোয়ান দল।

www.pathagar.com

আকাশ–কোলে বিজলী–দোলে বজ্র ছাড়ে হাঁক
ঝঞ্ঝা–তুফান নিত্য উতল ঘূর্ণি–পাগল রাতে,
আগল–ভাঙা মুক্তি–বাঁশীর শুনছ নাকি ডাক—
শুকনা হাড়ি বহ্নি জ্বালি দেখাও তেলেসমাত।

কণ্ঠে আবার জাগছে নারা আল্লাহু আকবার,
হস্ত–বাহুর শক্ত–মুঠে চমকে তলোয়ার—
জুলুম–শাহীর বন্দীশালা ভাঙ রে বারম্বার,
ভয় কোথা রে আর?
দেখ না চেয়ে জালিম ভয়ে ফেলছে আঁখিজল—
জোর কদমে চল
জঙ্গী জোয়ান দল।
অত্যাচারীর হত্যা–জুলুম চলছে জগৎময়,
আমরা তাহার বক্ষে কসি হানবো পদাঘাত—
অন্ধকারের বন্ধ–দ্বারে আনবো আলোর জয়
সিনার খুনে জ্বালবো বাতি ভাঙবো ভয়ের রাত।

জিন্দা মোরা সিন্ধু–শোষা তিয়াস–জাগা বুক
এক নিমেষে শুষবো মোরা বিশ্ব–ডোবা দুখ—
নিঃস্ব–দুখী রইবে চেয়ে আনন্দ উন্মুখ—
চিত্ত–ভরা সুখ,
শিকল টুটার ঝঞ্ঝনাতে উল্লাসে বিহ্বল।
জোর কদমে চল্।
জঙ্গী–জোয়ান দল॥

দেখ না চেয়ে সামনে যে তোর আল্লারি দরবার
তোর হাতে তার কুঞ্জি–কাঠি আয় রে ছুটে আয়—
মৃত্যুজয়ী শাহাদাতের রঙ্গিলা কাওসার,
চৌদিকে আজ মউজ তুলি যায় রে বয়ে যায়।

শহীদ গাজী যে নামে হোক মর্ত আখেরাত
তোরি নামের গাইবে গজল করবে আঁসু পাত,
লক্ষ লোকের বক্ষ ভরি জাগবে মোনাজাত
চাহি মাগফেরাত—
অমর জীবন সত্য যে তোর নিত্য অবিরল
জোর কদমে চল—
জঙ্গী জোয়ান দল।

www.pathagar.com

ওরে জঙ্গী জোয়ান দল

ওরে জঙ্গী জোয়ান দল,
লেফট–রাইট লেফট—জোরছে তোরা চল।

ময়দানে ভারী জমিছে ভীড়
জমিছে হাজারো জিন্দাবীর,
উন্নত করি উচ্চ শির
মিলেছে সবাই এক সামিল,

ছোটবড় আজ নাহি রে ভেদ্,
ভুলেছে সকলে বেদনা খেদ্,
ঝরিছে আননে খুশীর স্বেদ
কোলাকুলি করে দিলারা দীল্।

মিলন–মিঠা এ খোশালী দিন—
জাগিছে জীবন ভাবনাহীন,
বাজায়ে আজান—উতলা বীণ
ডাকিছে তোরে সে জমাত গাহ,

সহিছে না আর সহে না দের্
কাটিল জমানা বেহুদা ঢের্,
নিঁদ গাফিলতি ফেলিয়া ফের
সম্মুখ পথে চালাও পা।

ওরে জঙ্গী জোয়ান দল—
লেফট–রাইট লেফট—জোরছে চল।

এ নহে শুধুই নামাজি ঈদ,
ঘুচাবে এ তোর ঘুমেলা নিঁদ্,
জাগাবে জোশের জেয়াদা জিদ্
খুনেলা আগুন জ্বালাবে জোর,

ভুখের বহ্নি—রোজা সে নয়,
যদি না নাশে সে মউত–ভয়,
যদি না ভীরুতা করে সে লয়
পয়জারে পিশি মোহের ঘোর।

জাগে ইসলাম জেহাদী দ্বিন
জীগর রক্তে আঁকিয়া চিন্—
চলিছে উধাও মুক্ত জীন
যেন সে আরবী ঘোড় সওয়ার,

www.pathagar.com

আল্লার রাহে কে দিবে জান—
হাঁকিয়া চলিছে তাহারি তান,
জিন্দারা জাগো জিয়ারা প্রাণ,
জিন্দানখানার ভাঙিয়া দ্বার।

ওরে জঙ্গী জোয়ান দল—
লেফট-রাইট লেফট—জোরছে চল।

আজি ময়দানে চাহিয়া দেখ,
লাখো মুসলিম নিরুদ্বেগ,
মিছিলে মিলন মফিলে এক—
বাঁধিছে জমা'তে এক নিয়ত,

লুটে সেজদায় একই সে সাথ
একই সে সামিলে তুলিছে হাত,
পড়িছে একই সে দরূদ না'ত,
একই মোনাজাত, একই সে পথ।

এযে নবতর কুচকাওয়াজ
বীর বাচ্চারা শিখে নে আজ—
আসমানে ফের বাজছে বাজ
খুন-কেয়ামৎ নহে সে দূর,

হুঁশিয়ার দ্বিন সেনারা সব,
আসিছে রক্ত মহোৎসব
ভয় কিরে হাঁক আল্লাহ্ রব
ইমানের তাজা অগ্নি-সুর।

ওরে জঙ্গী জোয়ান দল—
লেফট রাইট লেফট জোরছে চল—জোরছে চল॥

আজকে চাহি জুল্‌ফিকার

আবার চাহি জুলফিকার।
আবার চাহি শক্তি-কুয়ৎ খোদার শের ঐ মূর্তজার।

আজকে বহে বিশ্বজুড়ি নিঃস্ব জনের বক্ষ খুন
আজকে দহে বহ্নি-শিখা নীরোর রোমের লক্ষ-গুণ
আয় রে তবু অগ্নি-ক্ষরা তীক্ষ্ন তীরের পূর্ণতুন

www.pathagar.com

আজকে তোমার নির্বিকার !
তাই তো বহু ব্যর্থ দুখে আবার চাহি জুল্‌ফিকার।

খায়বারেরি দুর্গ-মূলে হাইদরী সেই বজ্র-হাঁক
পড়ল শুনি এহুদ-জাতি বে-হদ ভয়ে চরণ-তল
একনিমেষে লৌহ-কপাট লুপ্ত লোপাট ভগ্ন ফাঁক,
ভাগল অরি আরব ছাড়ি ত্রস্ত বেহুঁশ রিক্ত বল।

সেই ইহুদী রদ্দী-রদী আজকে নিছে অতীত-শোধ
নয় কো শুধু কেনান একা নিচ্ছে কেড়ে আরব খোদ ;
হায় রে মুমিন কমিন সম ভুলছ তোমার আত্মবোধ
তাই তো নামে কহর ভার—
অনেক শোকে অনেক ক্ষোভে আবার চাহি জুলফিকার।

এহুদ জাতি নয়কো একা দোসর তাহার আর এক জাত
তোমার পায়ে রইলো লুটি যারা বহুত শও বছর—
সেই তারা আজ তোমার উপর সাহস করে তুলছে হাত
হর লড়ায়ে মার খেয়েও ভুলছে আবার মারের ডর।

শৌর্য মহান পূর্ব দিনের আবার যদি জাগলো সাধ
দলতে হবে চরণতলে শান্তি সুখের মিথ্যা-ফাঁদ
একটি শুধু পন্থা তাহার সে হল খাস খুন-জেহাদ
নাই কো তাহার অন্য দ্বার—
অন্য কিছু যাহাই কহো সবই ঝুটা ফক্কিকার।
চাই না ফাঁকা বাক্যবুলী আজকে চাহি জুলফিকার
আজকে চাহি শক্তিকুওৎ খোদার শের ঐ মূর্তজার

জুলফিকার

যুগ-সঞ্চিত মিথ্যারে নাশি ঝলসিছে পুনঃ তীক্ষ্ণধার
মোনাফেক-ত্রাস, ভণ্ড-নাশন চির-দুর্জয় জুলফিকার।

সত্যের নামে আত্ম-পূজারে করিয়াছে যারা মোক্ষ-জ্ঞান,
ধর্মেরে বেচি স্বর্ণ-জমানো করিল যাহারা নিত্য ধ্যান
অশ্রু-সলিলে শ্মশ্রু ভিজায়ে দীনের লাগিয়া কাঁদিয়া রোজ
লুটিছে যাহারা স্ফুর্তিতে নিতি পোলাও-কালিয়া-কোর্ম্মা-ভোজ
দানের পুণ্য ফজিলত গাহি যারা হন সদা পঞ্চমুখ—

www.pathagar.com

অপরে চাহিলে অমনি যাহার আধ কড়ি লাগি ফাটিছে বুক,
বজ্জাতি আর গুণ্ডামি যার মূলধন হল বিশ্বপর
রিয়া-মোনাফেকী সওদা বেচিয়া তঙ্কা দেদারে ভরিছে ঘর,

হুঁশিয়ার হও বন্ধুরা যত, খামোশ বিড়াল-তাপস সব
বঞ্চনা টুটি জাগিছে আবার হাঁক হায়দরী বজ্ররব।

যুগ সঞ্চিত মিথ্যারে নাশি ঝলসিছে পুনঃ তীক্ষ্ণধার
মোনাফেক-ত্রাস, ভণ্ড-নাশন চির-দুর্জয় জুলফিকার।

জঙ্গে ওহুদ খয়বর-রণ আজো চলিতেছে নিত্যদিন
লাখো কমবখত মোশরেক মিলি শোধিছে পাপের রক্ত-ঋণ
ফেরেব কুহক দাগাবাজি দিয়া রচিত যাদের বর্ম-ঢাল,
সত্যের সনে লড়িবে তাহারা দুর্দ্দম বলে কত সে কাল?

জানি আজি তারা ইনসাফ নামে চালায়েছে লাখো অত্যাচার
অসহায় যত জালিমের হাতে দেরেগবিহীন খেতেছে মার।
অন্যায় আজি ন্যায়েরে দলিয়া সাজিয়াছে নব ধর্ম-বীর
দণ্ড তাহার দম্ভোলী রূপে চূর্ণিছে খাঁটি বীরের শির

তবু জানি মোরা জুলুম-কেল্লা যতই শক্ত হোক না আজ
তারি বুকে নিতি হতেছে সৃষ্টি তারি তরে ভীম মৃত্যু-বাজ।

যুগ-সঞ্চিত মিথ্যারে নাশি ঝলসিছে পুনঃ তীক্ষ্ণধার
মোনাফেক ত্রাস, ভণ্ড-নাশন চির-দুর্জয় জুলফিকার।

বালাকোট

লহুর দরিয়া উত্তরি মিলে মোকসেদ মঞ্জিল,
রাহে নাজাতের শাহিন-শাহেরা চিনে সোজা এই পথ
লোনা আঁসু-নীরে কিশতি ভাসায়ে যত সব বুঝদীল,
নিতে চাহে জিনি দুনিয়া ও দ্বীন এক সাথে যুগপত।
মওকার মোন্তেক—
জাহানের বুকে রটায়েছে যত ধোঁকাবাজ মুনাফেক।

জেহাদে-জঙ্গে ঝরিবে না কভু ফোটাভর তাজা খুন,
দুনিয়ার সেরা পুণ্য পশরা—নাই সেই শাহাদৎ—
দীলের গহরে ইলাহী যোশের নাহি জ্বলে প্রেমাগুন,

www.pathagar.com

তবুও ভাবিছ নিখিল জগৎ দিবে আসি নাকে খৎ—
ভয়ে চুমি তব পদ ! !
হায়রে জাহেল ! আছে আছে হেথা বেকুফিরো সীমাহদ।

বাইজী-মুখর গানের আসর—খেমটার শত তাল,
শিরাজী-শরাব-পিচ্ছিল পথে খনে খনে টলে পাও—
পতনের কোন অতলে ডুবেছ জানা নাই তারো হাল,
তবুও তোমরা লাজ-ভয় ভুলি বাদশাহী তাজ চাও।
লাথ খেয়ে বার-বার—
হলে কুপোকাৎ—তবু জানো তুমি হওনিতো হুঁশিয়ার।

হাজারো আমান করেছিলে দান যারে তুমি গতকাল,
সেই সে নিমকহারামেরা আজ নেয় তারি প্রতিশোধ
তব পদ চুমি আনত আভূমি ছিল যার নও ভাল,
তারি পদতলে লুটো আঁখি-জলে—নাই তারো লাজবোধ।
মর্যাদা সম্মান—
খোয়ায়েছ সব, বেহুঁশ-নীরব, বনিয়াছ হায়োয়ান।

প্রতি কারবালা অন্তেই আসে জিন্দিগী নবতর,
শহীদী খুনের সয়লাবে ভাসে আজাদীর নয়া নাও—
জেহাদের যোশ নিঃশেষে নাশে জীবনের ভয়-ডর
মৃত্যুরে পিশে ফেলো পদতলে মুক্তিরে যারা চাও
চিরজীবী এই ডাক—
শুনিল না যারা রবে সদা তারা পদাহত নির্বাক।

শেরে খোদা

শেরে খোদা আজ ভুলি শমসের
তব নামে রচি শের—
গাজীরে ভুলিয়া গজলে মেতেছি,
আফসোস নসিবের।

ভুলেছি আমরা হায়দরী হাঁক
ভুলেছি বাজুর তেজ—
কুকুরের মত লাথি খেয়ে তবু
সোহাগে দুলাই লেজ,
মনে নাই ঘিন—বনে গেছি সব
হীনতার মহাফেজ,

www.pathagar.com

আমরা যেন রে জুলমাত রাতি—
আলো নাই আছে সেজ।
রংগীন রংরেজ—
রামধনু রচি—পারি না রচিতে
বজ্রের আগতেজ !

জুলফিকারের জ্যোতি নাহি জ্বলে
আমাদের খুনে আর,
মুর্দারা হেথা মুজাহিদ বনে
মানা নাহি শুনে কার।
ঈমানের তীর আজ নাই জানি
জীগরের তুনে তার,
লড়ায়ের নামে ঘরে বসি তাই
ভয়ে কাঁপে খুনেরার,
আজ হায় জেরবার
দীন ইসলামী দুনিয়া তামাম
তারি ফলে ফেরবার।

হিন্দের শত হিন্দারা আজো
কলিজার খুন চায়,
হামজারে হানি গোলামেরা হোথা
জ্বালেমীর গুণ-গায়।
ওহুদের ঐ জঙ্গ-ময়দানে
আজ বলো কোন যায় ?
তাহাদের লাগি শাহাদৎ মাগি
অস্ত্রের ঝঞ্ঝায়
মৃত্যুর পঞ্জায়
কে লড়িবে জোর মর্দেরা কহো
আজ কার মন চায়।

দ্বীনের পহেলা কেবলার বুকে
আজ ঝোলে তরবার—
আমার ওতন রবে কিনা মোর
তারো চলে দরবার !
আলী হায়দর ! যারা সে "বদর"
খাইবার-ঘর-দ্বার
তোমার দাপটে ফেলে গেলো ছাড়ি !
চাহি মাফ হর বার
নাই তেজ লড়বার !

www.pathagar.com

আজ তারা ফের তোমার দেশের
হুকমত বরদার—
সের্গানা সর্দার।

মোহাজের আজ শংকিত ভীত,
নিশ্চুপ শামশুম—
নামিয়াছে যেন তাদেরে ঘেরিয়া
মৃত্যুর শেষ ঘুম।
মক্কা বিজয় ভুলে গেছে তারা
ভুলে গেছে শাম-রুম,
প্রতি নিশ্বাসে বুকে নাহি ভাসে
খুন-জাগা আগধুম,
রক্তের কুঙ্কুম—
জেহাদের মাঠে পেশানিতে তার
আজ নাহি দেয় চুম—
রক্তের কুঙ্কুম।

শেরে খোদা আজ তোমারে জানাই
আমাদের ফরিয়াদ
শেরের বাচ্চা ফেরু বনে গেছে
গেছে ভুলে লহু স্বাদ।
ভুলে গেছে তার জোয়ানী জাদিদ
শহীদীর সুধা সাধ,
ভুলে গেছে তার জঙ্গী জাহান
তশবীর জয়-নাদ—
ঝাণ্ডার নয়া চাঁদ।
জিন্দারা আজ বান্দারে সেবে
জিন্দেগী বরবাদ।
শেরে খোদা আজ তোমারে জানাই
আমাদের ফরিয়াদ।

আল্‌ফে-সানী

দেখেছে দুনিয়া এখানে অনেক জালেমের বাদশাহী
দেখেছে অনেক নমরূদ আর ফেরাউন-শাদ্দাদ
দেখেছে অনেক কুফরী কুয়ৎ বেদায়াৎ -গোমরাহী—
খোদারে ভুলিয়া খোদেরেই খোদা বানানোর বৃথা সাধ।
আজ তারা কেহ নাই—

www.pathagar.com

ধূলির গর্ভে গেছে মিলে মিশে—হয়ে গেছে ধূলি ছাই।

খোদার আদম গন্দম-খাওয়া আদমেরই লীলাভূমি,
হেথা হেরি দম কদম চলিছে অপরূপ কত খেলা—
কেহবা খুঁজিছে খনিকের খুশী—বেদ্বীনের পদ চুমি,
ইমানেরে খুঁজি কেহবা করিছি আমানেরে অবহেলা।
আসে যেবা দিবা-রাতি—
আলো-আঁধারের পুণ্য-পাপের জ্বলে-নিভে শত বাতি।

এই যে দু-ধারী দুনিয়াদারীর তলোয়ার চলে নিতি,
তারি মাঝে যারা বাতেনের ভুলি আদেলেরে নেয় বাছি—
তারাই তো আনে ন্যায়ের শাসনে আল্লার সারা ক্ষিতি,
মখলুকাতের সেরা আশরাফ—তারাই তো রহে বাঁচি।
নিয়তের হেরফেরে—
সেই হুকমত—শান-শওকত তাদেরেও যায় ছেড়ে।

হাজার হিজরী সালের প্রথমে হিন্দের বুক পুড়ি
এসেছিল নামি কুফরী কালাম ধর্ম্মের মিছা ছলে—
শাহী ওমানের ধূমের মউজে পুঞ্জিত বাহাদুরী
লাখো মানুষের আকিদা-ইমান যেতে ছিল পায়ে দলে।
সেই মহা দুর্দিনে—
তুমি এনেছিলে সত্যের সাড়া মানুষের মনোবীণে।

জুলুম শাহীর শত ভয় তুমি দ্বীনের ঝাণ্ডা তুলি—
সিংহ শেরের গর্জনে তুমি দাঁড়ালে বেদ্বীনী রুমী।
জিন্দান গাহে হয়েছ বন্দী—তোমার চরণ ধূলি
পরশে সেথাও জেগেছে কিরণ-তাসাউফ-উন্মুখী।
জাগায়েছ দলে-দলে—
সেদিন যাহারা আছিল বন্দী মিথ্যার শৃঙ্খলে।

কত আকবর কত জাঁহাগীর মাটিতে গিয়াছে মিশি—
দ্বীন-ই-ইলাহীর ফাসেকী তরিকা ভুলে সবে গেছে কবে,
দ্বীন-ই-ইসলামী নূরের ঝাণ্ডা আজো জাগে দিশি-দিশি—
তুমি আছ বাঁচি লাখো হৃদয়ের স্মরণিকা-উৎসবে।
হে বীর মুজাদ্দেদ—
জোশের আগুনে জাগাও আবার যত হিয়া নির্বেদ।

দেখেছি আমরা বাহাই বাহিনী, খারিজী ও মোতাজেলা,
আজ তারা সবে ডুবে গেছে কোথা কেহ হেথা নাহি জানে—

www.pathagar.com

দেখিয়াছি মোরা আসিয়াছে বহু গোমরাহী সেলসেলা,
তারাও গিয়াছে নিঃশেষে ভাসি জেহাদের লহু-বানে।
খুন চাই আগ-দাহী—
ইমানের কথা শুনিয়াছি বহু—আমাদেরে আজ চাহি।

আবার এসেছে জাহেলী যুগের বেদাতির আজদাহা—
পাক হিন্দের গহরে গহরে শিকারের সন্ধানে,
ইমানের কাবা ধ্বংসের আশে হলো নব আবরাহা—
তবুও গাফেল আজো মোরা তার প্রতিরোধ অভিযানে।
কোথায় আলফে-সানি—
মুর্দারে ফের শুনাবে না তুমি জীবনের নব বাণী?

সিরাজ-স্মরণে-১

সিরাজ! সিরাজ! আর কত ঘুম? নিশীথের নাই শেষ?
যুগের অঙ্কে সুবে-সাদেকের দেখিছ না আলো রেশ?
গোর-মঞ্জিলে বিশ্রাম-সুখ আর চাহ কতকাল?
জেহাদী ঝাণ্ডা দেখনি কি ওড়ে আসমান লহু লাল?
শহীদী লেবাস খুনেলা কাফন আজ সব চাহে ফের,
বুজদেল ভীরু ফেরুপাল সেও ফের চাহে হবে শের,
ঊষার জামাতে ভীড় করে ফের ফৌজ তারি অগণন,
যুগ-জামানার সিপাহসালার ওঠো ওঠো নাই ক্ষণ।
দম্ভোলী আজ চাই—
ঐ-রণে শোনো রণ-সঙ্গীত হুঙ্কার বাঁজখাই।

সিরাজ! সিরাজ! তবু আছ পড়ে? ধিক্কার নাই লাজ?
তাজ গেছে জানি তেজ ছিল তব তা-ও চলে যাবে আজ?
জঙ্গীরা এলো জঙ্গ-ময়দানে নিশা গেলো—এলো ভোর—
তবু তুমি নাই—হেরি তব পথ সুম-সাম যেন গোর।
সিরাজ! সিরাজ! তুমি নাকি চির হয়ে গেছ লয়-নাশ।
জিন্দা শহীদ মরিয়াছে কভু? হা হা শুনে পায় হাস।
দুশমন শুধু শির নেয় কাড়ি—শের নাহি হয় লয়—
মুক্তি-সাধক চিরজীবী সে যে যুগে যুগে তার জয়।

www.pathagar.com

বন্দনা গাহ তার—
মুর্দা-ই শুধু মৃত্যুরে চিনে—বীর চিনে তরবার।
সিরাজ ! সিরাজ ! শোননি মাতম বন্দিনী জননীর?
কারা-মন্দিরে হের উৎসারে আজো তারি আঁখি-নীর—
রাঢ়-রণ-ভূমি ডাকে পুনঃ শোনো—গাফলতি আর নয়,
হন্তা-ঘাতক জল্লাদ যত আজো ফেরে দেশময়।
সিরাজ ! সিরাজ ! ভুলে গেছ আজ গিরিয়ার প্রান্তর?
ভুলে গেছ সেই বর্গী-মারাঠা পণ্ডিত ভাস্কর?
খুন-পিচকারী উৎসর হোলী উন্মাদ জঙ্গ-যোশ—

সিরাজ ! সিরাজ ! ভুলে গেছ সেও? নাই আঁখে আগ-বোষ?
কব্জিতে নাই জোর?
থাক থাক তবে—ফের লহ তুমি অন্তিম শেষ-গোর।

সিরাজ ! সিরাজ ! না না আছে আজো—আছে তব হিম্মত—
আছে বীর বাহু দরাজ পেশানী আছে নব জয় পথ।
জানি আজি কার কিম্মত কত, জানি কার কত বল—
এস নির্ভীক ! নিঃশেষে নাশো মায়াবীর যত ছল।
'টানা'র দুর্গে পিঠটান দিলো যত ভীরু ফেরু পাল—
দর্পিত-বল-উদ্ধত রোষে আজ তারি আঁখি লাল।
জাহ্নবী-কূলে সিন্ধু-শকুনী আজ রচে নব নীড়—
গিরি বুকে কাঁদে বন্দী ঈগল, লুণ্ঠিত নত শির।
আফসোস বদ-বখত—
জিন্দারা যত কুর্নিশ নত, বান্দারা পায় তখত।

সিরাজ ! সিরাজ ! ভুলি নাই মোরা পলাশীর ময়দান—
যেথায় হিন্দু-মুসলিম মিলি দিলো জান কোরবান।
সেথা বাংলার ডুবে গেলো রবি, এলো নামি কালো রাত,
জিগরের লহু দুই ভায়ে যেথা ঢেলেছিল এক সাথ—
বাংলার সেই তীর্থ মহান, মিলনের পূত ঠাঁই—
সিরাজ ! সিরাজ ! আজ দেখে যাও—সেথা শুধু ওড়ে ছাই।
লহুর বাঁধনে বেঁধেছিল রাখী, আজ তাহা খান খান
ভায়ের রক্তে অবগাহি ভাই গাহে আজি জয় গান,
শেঠ-উমিচাঁদ, জাফর-মীরণ আজো করে কোলাহল—

লাঞ্ছিত দেশ লুণ্ঠিত দেহে ফেলে শুধু আঁখিজল।
মৃত্যুর তাণ্ডব!
সিরাজ! সিরাজ! আর কত সয় এই দাহ খাণ্ডব?

সিরাজ! সিরাজ! আর দেরি নয়—দিন শুধু বয়ে যায়।
ঊষার মিনারে শোননি আজান—ডাকিতেছে আয় আয়।
নিশীথ পারায়ে ন'য়ালা জোয়ান মোজাহেদ সেনা ঢের
ফজর জামাতে কাতারে কাতারে মিলিয়াছে হেরো-ফের।
আমীর ইমাম! এসো-এসো ত্বরা, শূন্য যে মিম্বর—
ইসমে আজম-জীবনের বাণী—আজ পড়ো নবতর।
সুবেহ উম্মিদ বীর বাদশাহ! দুর্মদ মোজাহেদ।
এসো-এসো তুমি লুপ্ত বিলয় হোক আজ সব খেদ।
উন্নত হোক শির—
ঐ রণে শোনো নব রণ-বাণী আল্লাহু তকবির।

সিরাজ-স্মরণে-২

নারঙ্গি বনে লেগেছে আগুন—এসেছে গোবির আগুনে ঝড়,
সবজা ধানের ঢেউ-খেলা মাঠে আজ শুধু কাঁদে শুকনো খড়,
এলো এ হিংসা দোজখী হলকা হালাকুর মতো খুন বেহুঁশ,
এলো-এ পেরিয়ে হিমালয়-চীন-এলো এ উতরি হিন্দুকুশ
কত বাদশাহী তখত-তাউস।
এরি ঝাপটায় হলো বরবাদ ব্যথিত বিশ্ব চুপ-খামুশ।
বুকে বুকে জ্বালি বহ্নি-তুষ।

শুনি তারি মানা আনারের দানা—সেও হলো বুঝি শুষ্ক কাঠ
আমের মুকুল সেও গেলো ঝরে ধ্বংসের দ্বারে নাই কপাট।
সাদা ডানা মেলা পালের কিস্তি উড়াতো যাহারা পানির পর,
চলিত যাহারা হেলায় দলিয়া দরিয়ার ঢেউ তুফান ঝড়,
বাঁধিয়া মিলনে বাহির ঘর—
দেশ-দেশান্তে ধন-দৌলত বহিত যাদের লাখ বহর,
তাদেরো বক্ষে বিঁধিতেছে হেরি ধ্বংসের শিলা—শেল কহর,
আজ পানি নাহি দরিয়ায় শুধু দুলিছে অশ্রু খুন-জহর।

www.pathagar.com

তাই কি রিক্ত আজি মাঠ ঘাট রিক্ত সে আজি মায়ের বুক,
রিক্ত সে আজি গৃহ গোলা যত সীমাহীন দেশ মায়ের দুখ।
তরমুজ খেতে ফল নাহি আজ, সরিষার ফুলে জমেনা মৌ,
বাতাবী লেবুর ফুলে মালা গাঁথি গাহে না সহেলা কিষাণ-বৌ।
বাংলাদেশ—
সোনার ভাণ্ড হারায়েছে তার—আজ কাঁদে মাগি অন্নলেশ ;
সিরাজ ! সিরাজ ! তবুও ঘুমাবে—কে বাঁচাবে দেশ তুমিও নাই—
জননী তোমারে ডাকিছে কাঁদিয়া—"আয় ফিরে আয়, তোরে যে চাই।"
বন্ধু-ভাই—
দেশের মুক্তি মাগিছে শক্তি তুমি নাহি এলে কোথা সে পাই।
কিষাণ বালার সাথে যেইখানে সবজাপরীরা মিলাতো হাত
চির বসন্ত ছিল যেই দেশে—সেথা নামিয়াছে মেরুর রাত।
লুপ্ত ডিঙ্গা মধুকরে যেথা সওদা করিত সওদাগর,
চাষীরা যেথায় নব হেমন্তে সোনার ফসলে ভরিত ঘর,
জমিত যেথায় রজনী ভর,
বাদশাজাদির রূপকথা কত কথার পরেতে কথার স্তর
কত না মাঠের গানের স্বর—
আজ সেইখানে যত খোশখুবী গোবির বাতাসে হয়েছে লয়,
ফিরে সেথা শুধু প্রেত-কঙ্কাল ভীতি-ক্রন্দন অশ্রুময়।
ইসরা ফলের দূতেরা উলসে—ঘরে ঘরে ফিরে আজরাইল,
ক্ষুধায় অবশ নারী শিশু যত মরণে ধুঁকিছে বেদনা নীল।
মানব-দরদী দরাজ দীল
নাহি নাহি কোথা শুধু ফিরে হেথা যত শব-ভুক শকুনী-চিল
চির মানবতা করুণা-মমতা নাহি নাহি কোথা কণিকা তিল।

দুশমন হেথা ঘুষ দিয়ে বশ মানায়েছে যত খোশ লীডার ;
পোষমানা যত পশুর মতন শুধু লেজনাড়া কাজ যে তার।
জোশ যার রোশ ভরা যারা বীর আছে যার ভাই খুনির হাত—
তার লাগি নাই হেথা কোন ঠাঁই—তার লাগি লেখা বদবরাত :
কই সে বীর—
যার বাজু বুকে ফিরে সদা সুখে লাখো জোয়ানের শোনিত-নীর—
সিরাজ তুমিই সেই চিরবীর ঢালো পুনঃ তব শহীদী খুন,
বুকে বুকে ফের উঠুক জ্বলিয়া আজাদীর নব তাজা আগুন।
বন্ধু-ভাই !
ভুলি ঘুম-জরা জাগো-জাগো ত্বরা—হাঁকিছে শিঙ্গা—'সময় নাই'।

www.pathagar.com

শহীদ রাজ

আকাশ জুড়িয়া রক্ত-অশ্রু ঝরিছে আজ
হাহাকার ভরা মাতম জাগিছে জাহান-ময়
জালিমের রোষে লুটিছে ধুলায় হাজারো তাজ
সিরাজ ! তোমার এখনো জাগার সময় নয় ?

আজাদী হারায়ে ধুঁকিছে ধরণী ধ্বংস-লীন
কত যে নগর-নগরী হয়েছে ভস্ম-স্তূপ—
মানুষ ফিরিছে বন-বনান্তে রিক্ত-বীর,
এলো কি আবার আদিম যুগের বন্য রূপ ?

যুগ-যুগান্ত সাধনা লব্ধ স্বপন-সাধ
নিমেষে আজিকে লুটায়ে পড়িছে পথের পর—
লোভের দম্ভ রচিয়া চলিছে মরণ ফাঁদ,
লালসা-বহ্নি ঘিরিছে আশার সোনার ঘর।

তবুও এখনো রয়েছে দীপ্ত রশ্মি ক্ষীণ
এখনো রয়েছে নব দীপালীর আশার রেশ—
নিখিল উজলি আনিবে না পুনঃ মুক্তি-দিন ?
জাগো জাগো তুমি আজাদী মাগিছে তোমার দেশ

সিরাজ তুমি যে আলোর দীপিকা—রক্তরাগ,
অস্ত অচলে যে রঙ মাখায়ে গিয়াছো হায়—
নিশীথ পারায়ে সে-ই যে রচিবে ঊষার-ফাগ,
উদয়-শিখরে আবার জ্বলিবে অরুণাভায়।

সিরাজ তব সে জ্যোতির শরণী মাগিছে দেশ,
তোমারি অমর প্রাণের শিখায় চিনিবে পথ—
জিঞ্জির টুটি আবার চাহে সে ঝঞ্ঝা-বেশ,
আবার মাগে সে মুক্তি-উতল বিজয়-রথ।

গোরের আঁধারে গিয়াছে আবরি বনানী মাঠ,
শবে আর শবে ছেয়ে গেছে যেন সকল দিক—
এখনো জপিবে শমন স্মরণ মরণ-পাঠ—
কণ্ঠে ফুকারি তুলিবে না নব জীবন-ক ?
শহীদ রাজ !
লাখো মুজাহিদ তব পথ চাহি জাগিছে আজ।

www.pathagar.com

কায়েদে আজম

সূর্যের শিখা আঁধার উদয় পথে আজ দিলো দেখা
মঞ্জিল-রাহী ! নাজাত রাহেতে ফের আঁকো পদরেখা।
ঘুমের নেশা নিমেষে মুছিয়া দাও—খোলো আলো-আঁখি,
জোরালো কদম ফেলি সম্মুখে এগিয়ে যাও, পথ বহু বাকি।
মুক্তির মঞ্জিল-পথে সেদিন সহসা তুমি গিয়েছিলে থামি,
দ্বীনের নূরাণী আলো অকাল আঁধারে ঢাকি—
রাত এলো নাকি।
সেদিন ইমাম ভুল ইমান হারালে তাই হলে পথহারা,
যুগের ইমাম আজি কায়েদে আজম তব দিতেছে ইশারা,
আর নহে দেরী—
যাত্রীরা এগিয়ে যাও, শুন না বাজিছে নয়া জামানার ভেরী ?

তোমার শিরের তাজ, আজাদী ময়ূর তখত জানি সবি ফানা।
আজমে যাবার পথে যেটুকু আছিল বাকি দ্বিনের নিশানা
নয়া জাহান জুড়ি তোমার অরিরা আজি হয়েছে উতলা—
দ্বিনের বিলোপ আশে আকুল খুঁজিছে তারা যত মিছে ছলা।
আসাব কাহাব সম তবুও রহিবে ঘুমে জেহাদী সেনারা—
জীগরে শুকায়ে গেছে শহীদী শরাব তাজা রাঙা লহুধারা ?
উজ্বালা দীলের খোয়াব যত সবি গেলে ভুলি ?
জাগো রে আজি, হেরিবে নিখিল চুমে তব পদধুলি।
ভয় নাহি নাহি—
এসেছ নব খালেদ কায়েদে আজম তব জয় ঝাণ্ডা-বাহী।

গোরের আঁধার বুকে তোমরা ঘুমায়ে ছিলে, মরনি তো তবু—
মরণ তাহারি শুধু অমর আত্মার বাণী মানেনি যে কভু।
তোমরা আল্লার সেনা, মৃত্যুরে করিবে জয় শাহাদৎ পিয়া
বিজয় আনিবে জিনি বাধার বিঘ্নের যত অদ্রি উল্লঙ্ঘিয়া।
তোমরা আনিবে জিনি আজাদী আঞ্জাম নব রুধির পাথারে।
তোমরা বীরের জাতি ভীরুর ছলনা যেথা নহে তব লাগি
শৌর্যের পরশে তব জিন্দারা উঠুক পুন সারা বিশ্বে জাগি।
জিন্দেগী নবতর—
সত্যের সাম্যের নূরে আজিকে কায়েম হোক সারা পৃথ্বি পর।

গোরের পঞ্জর ভেদি প্রাণের অঙ্কুর নব মেলিয়াছে শাখা
মুক্তির বিহঙ্গ ওরে ! কাবার দিগন্ত পথে মেল-তোর পাখা।

www.pathagar.com

তোমার কদম

কবরের বক্ষ চিরি জিন্দেগী নবীন
যে জাগালো হেথা
রাত্রির তিমির ঘেরা শংকা গমগীন
শত লক্ষ ব্যথা,
দাসত্বের ধূলি
জাতির পেশানী হতে যে নিয়াছে মুছি
বুলায়ে পরশ স্নেহ চির শুভ শুচি
যার বজ্র দাপে গেলো অকস্মাৎ ঘুচি
জিন্দান-শৃঙ্খল,
সারা বিশ্বতল
তকবির-বন্দনা রবে উচ্ছল-উতল,
হলো যার গানে,
প্রাণ-দীপ্ত উদাত্ত আজানে—
বিশ্বময় মিনারে—মিনারে
নভে নভে সপ্ত সিন্ধু-পারে,
বেলালের নব প্রতিধ্বনি
জাগালেন যিনি
তাঁরে মোরা চিনি
চির মুক্ত-চেতা—
হে প্রবুদ্ধ নেতা
সে যে তুমি—সে যে তুমি,
তব সৃষ্ট এই মোর মুক্তি জন্মভূমি
তোমারে স্মরিছে আজ
সারা চিত্ত ভরি
শির নত করি।
কায়েদে আজম !
আমাদের অশ্রু শবনম
চুমে আজ তোমার কদম।

ঈদের হেলাল

ঈদের হেলাল আজি জ্বালিয়াছে নব আশা নূর
আবার বেলাল হেথা ধ্বনিবে কি আজানের সুর ?

www.pathagar.com

জীবন জোয়ার রসে জীগরে-জীগরে জ্বালি জোশ
বিজয় খোয়াবে ঘেরা আজাদী-জেহাদ-বাণী খোশ
সে-নব আজান-রবে জাহানে-জাহানে আজি ফের
উথলি উঠিবে বুঝি আর বুঝি নাহি নাহি দের
নিদালী-শয়ন ত্যজি গাজীরা ধরিবে তরবার—
জালেমী রোষের দাহ—দলিতের আঁখিজল-ধার
লহুর মউজে ভাসি হবে ধুয়ে পুত মহীয়ান—
দীনের দুনিয়া পরে আবার জাগিবে কলগান।
ঈদের হেলাল—
তাহারি খুশির বাণে রাঙিল কি দিগন্তের ভাল?

শ্যামলা ধরণী বুকে আজি শুধু ব্যথা আঁধিয়ার
হাসির দ্বীপেরে ঘেরি দুলিতেছে আঁসুর পাথার।
খোদার-করুণা-দ ানে আছে ভরা নিখিল জাহান
ঋতুতে-ঋতুতে আসে মাঠে-মাঠে ফসলের বান—
তটিনী-তড়াগে দোলে বরষার কল-কল-জল
তরুতে-তরুতে ফলে মধুভরা শত সুধা-ফল
তবু যেথা ক্ষুধা-দাহে ধুঁকিতেছে কোটি অসহায়—
এত ধন—তবু তারা তার কণা ধুলি নাহি পায়,
তোমরা মউজে মাতো—খানাপিনা চলে দিবারাতি
তাহারা মাগিছে কাঁদি দ্বারে-দ্বারে এক মুঠা ভাত।
ঈদের হেলাল—
তাহারি বেদনা রাগে রাঙিল কি দিগন্তের ভাল?

তোমরা আতর মাখি পরো আজি কত না বসন
বেদনা কাতর কাঁদে—নাহি কিছু আবরে যে তন ;
তোমরা কাতার বাঁধি জমায়েত ঈদের জমাত—
ভিখারী আতুর কাঁদে—পথে তব মেলি দুটি হাত ;
তোমরা খুশীতে মাতি মিলিতেছ রাখি বুকে বুকে—
তাহারা তফাতে থাকি রহে চাহি-নাহি আশা সুখ।
তোমরা ফরাশে বসি গরাসে খোশালী খানা খাও
তাহারা পথের বুকে গিলে শুধু অশ্রুর পোলাও।
তবুও হেথায় নাকি বাজিতেছে মিলনের গান—
ও মিছে ছলনা ভুলি জাগিবে সে কবে তাজা প্রাণ।

www.pathagar.com

ঈদের হেলাল—
খুশীর রঙিন রাগ রাঙিবে কি দিগন্তের ভাল?

নব ঈদ-উৎসবে

খুলি নভ ঝিলিমিলি—
ধরণীর পানে চাহে আজি বুঝি যত হুরপরী মিলি,
তাহাদেরি বাঁকা আঁখির ঝিলিক বাঁকা চাঁদরূপ ধরি
গগন-সাগরে ভাসিয়াছে যেন রূপালিয়া আলো-তরী।
তাহাদেরি মিঠা হাসির লহর অশ্রুত কলরবে
ধরণীতে আনে খুশীর লহর—মাতে সব উৎসবে।
হেথাও মাটির শ্যমলিমা বুকে যত হুরী খোশখুবী
হাসি-সয়লাব-খুশীর সায়রে উল্লাসে গেছে ডুবি—
জড়োয়া জেওর ওড়না-শাড়িতে সাজায়েছে বর তনু
সুর্ম্মা-কাজলে হরিণ-নয়ানে আঁকিয়াছে রাম-ধনু।
তাদের খুশীর সওগাতে আজি গেহতল গেছে ভরি—
কোর্ম্মা-পোলাও-কোপ্তা-কাবাব ফির্ণীর তস্‌তরি।
কিসের এ খোশালী ভাই—
ঈদুল-ফিতর আনিল তাই কি খুশীর এ রোশনাই?

আজি ধনি-দীনে ভেদাভেদ নাহি মিলে সবে বুকে বুকে
ঈদগাহে-গাহে চলে কোলাকুলি হাসি ঝরে লাখো মুখে,
দীনের অভাব শত অনটন আজি সবি গেছে ঘুচে
দরদী দীলের কোমল পরশ ব্যথা-আঁসু দিছে মুছে,
বেদনা আকুল ধরণীর বুকে এই পুত দিন তরে
স্বরগের চির শান্তি সজল কওসর সুধা ঝরে।
কত ব্যথা তাপ অকরুণ পাপ হিংসার দাহ-জ্বালা
মানুষের বুকে গোপনে লুকায়ে নিশিদিন আছে ঢালা।
সেই ব্যথা পাপ রোজা হুতাশনে নিঃশেষে গেছে জ্বলি
মুমিনের হিয়া তাই আজি হেন উঠিয়াছে উজ্জ্বলি।
নিখিল জুড়িয়া আজ হেরি চলে পশুসম হানাহানি,
তারি মাঝে ঈদ আনুক আজিকে মিলনের মহাবাণী—
দুনিয়ার বুকে তরে—
মাতিবে নিখিল জনগণ মিলি নব ঈদ-উৎসবে।

www.pathagar.com

রোজায়

বন্ধু তোমরা রমজানে আজি খুশী মশগুল সবে,
আসিল নাকি সে পুণ্য পশরা নিয়া,
নেকী বান্দারা সওগাত নাকি মিলিবে মর্ত ভবে,
ইলাহী-প্রেমের শরাব-তহুরা পিয়া।
আমি বন্ধু গো হেরিছি হেথায় গুনাহী বান্দা যত,
জগৎ জুড়িয়া তারাই লক্ষ কোটি,
আজিকে তারাই তৃষ্ণা-ক্ষুধায় নিত্য দ্বন্দ্বরত,
দ্রাক্ষা-শরাবে চেতনা হারায়ে পড়িছে পঙ্কে লুটি।

বন্ধু গো তবু কহ—ইবলিস বন্দী লানতী বাসে ;
সোয়াব-ধন্য পুণ্য এ·মাহ্ ভরা—
গোরের রুহুরা আজাব হইতে মুক্তি লভিয়া হাসে,
স্তব-গুঞ্জনে ভরিয়া বিশ্ব ধরা !

হেথায় বন্ধু ঘরের 'বন্দ'রা ক্ষুধার আজাবে কাঁদি
হেরিছি পুণ্য করিছে পুণ্য রাশি—
নর-ইবলিস লোভ-জিঞ্জিরে রাখিছে সবারে বাঁধি।
ধরণী জুড়িয়া হাবিয়া রচিয়া চলে উল্লাসে হাসি।

তবু নাকি আজ ইফতার আগে প্রতিটি লহমা তরে,
রহিলে ভিন্ন খাদ্য পাওয়ারই আশে—
আমল নামাটি সোয়াব জোয়ারে চকিতে উঠে যে ভরে,
ক্ষুধার দৈন্য লুকায় ক্ষুণ্ণ ত্রাসে।

আমি যে হেথায় হেরেছি নিত্য দুমুঠা অন্ন লাগি
হেন উৎসুক চিত্তে রয়েছে চাহি
কত না লক্ষ আর্ত-দুঃখী কাঁদিছে ভিক্ষা মাগি
কহ তো বন্ধু তাদের লাগিয়া পুণ্য কিছু কি নাহি ?

বন্ধু গো আজি দৌলত-ধনী মৌলুদে দেয় ঢালি
দেদার তঙ্কা—নামের ডঙ্কা বাজে !
সপ্ততি গুণ মিলিবে কৌড়ি দিলেই একটি খালি
হাশর ভয়ও রহিবে কিছুই না যে।

সে ধনী হেরেছি বাকিটা বরষ কিছুই নাহিক দিয়া
দুখীর বিত্ত নিতেছে নিত্য লুটি ;
তাহার লাগিয়া বেহেশত যদি যে জন নিঃস্ব দিয়া

www.pathagar.com

তাহার তরে কি স্বরগেরো সেরা উঠিবে কিছু সে জুটি ;

বন্ধু গো, হেন দুনিয়া জুড়িয়া চলিছে ছলনা শুধু,
দ্বীনের নামেতে চলিছে আত্মরতি ;
প্রেম-কওসর গিয়াছে উবিয়া—জ্বলিছে মরুভূ ধূ-ধূ
ইমানবিহীন কামনা অযুত করিছে লোভেরে নতি।

আজিকে চাহি যে দ্বীনেরই সাধক ফারুক সমান খাঁটি,
চাহি গো যে আবুবকর সমান ত্যাগী ;
দরাজ সিনায় আলীরই মতন—বিনয়ী যেন গো মাটি,
তবে তো রোজা সে হইবে সফল—রোজা যে তাহারি লাগি।

এলো কি রমজান ?

এলো কি আবার দুনিয়ার বুকে পুণ্যের নওরোজ—
গরীব বান্দা বরষ ভরিয়া করিছে যাহার খোঁজ ?
খুঁজেছি তাহারে দূর পল্লীর মেটে মসজিদ-কোলে
যেথায় মাটির স্তিমিত প্রদীপ এশার আজানে দোলে ;
খুঁজেছি তাহারে জামে-মসজিদে, শাহী শান-শওকতে
দ্বীনের গরব জ্যোতিরাগে যেথা জ্বলিছে নগর-পথে ;
খুঁজেছি তাহারে আলেমের গেহে মওলানা-দহলিজে,
মিলার মহলে ওয়াজ মহফিলে খুঁজিয়াছি কতবার
মারাঠি দেশের খুঁজি দ্বারে-দ্বারে মিলিল না খোঁজ তার।
সত্যিই এলো ভাই—
এতদিন পরে সেই রমজান—এত করে যারে চাই ?

দেখেছি বরষে মাসভরি ওহে বান্দারা উপবাস,
তাহারি পরশে হবে নাকি যত সঞ্চিত পাপ নাশ।
মাহে রমজান শুনিয়াছি নিতি সোয়াব ও পুণ্যময়—
এই পাক মাহে অনশন দাহে সব গুনাহ্ হবে লয়।
দ্বীন ক্ষুধাতুর বক্ষে যাহার ক্রন্দন হাহাকার,
ক্ষুধার দহনে কম্পিত দেহ আঁখে নামে আঁধিয়ার,
তারো তরে নাকি রোজার ফরজ নিষ্কৃতি নাই নাই—
মুমিনের দলে নহিলে বল না কেমনে সে পাবে ঠাই ?
হেথা মৌলানা ইফতার খুলি আদুরী শরবতে
ত্যাগে উপবাসে নেয় সে কেমনে রাহে নাজাতের পথে
তাহারি বয়ান হেসে কয়ে যান ; খোশবু পানের খিলি

www.pathagar.com

হয়ত তখন করিছে মধুর রসের সওদা বিলি
মরমি তাহার কণ্ঠ অধর। তারি কি আয়েশ সুখে
শিরিন ইরানী বয়েত ও গজল খই সম ফোটে মুখে
হোথায় ভিখারী চির রোজাদার বিরস বয়ানে কাঁপি
নসিহত বাণী শুনিয়া চলিছে দিবস-রজনী ব্যাপি—
রোজার পুণ্যে শূন্য উদর তবু নাহি ভরে তার,
চোখের জলের শরবত পিয়া তার নিতি ইফতার।
হেথা উৎসব ভোজ—
হোথায় ভুখারী এক মুঠা ভাত পথে পথে করে খোঁজ।

কে বলে ইহাতে রোজা রমাজান—এ যে বৃথা উপবাস
দানের পুণ্যে দীন-জন-মুখে—কোথায় তৃপ্তি হাস?
করুণার আবে-কওসর কোথা ধরণীর কোলে কোলে,
কোথায় দুখীর বেদনা-কিস্তি সুখ-সয়লাবে দোলে?
কহরের জ্বালা না যদি নিভিল রহম-নহর নামি
কে তবে ইহারে বলিবে পুণ্য শান্তি-সোয়াব-কামী?
দীনের দৈন্য ঘুচিল না যদি—দুখীর অশ্রু-জল
না যদি মিলায় হাসির আভায় কোথায় পুণ্য বল?
রোজা সে তো শুধু উপবাস নহে—ক্ষুধিতের ব্যথা-শোক
সমবেদনার পরশ দোয়ায় নিখিল মানস-লোক
মুছে দেবে হেথা তাহারি লাগিয়া রোজার সাধনা চাই
তবেই জাহানে জাগিবে শান্তি মিলনের মহা ঠাঁই।
ধরা যদি রহে ক্লেদ-পঙ্কিল পাপভারে ব্যথাতুর,
আশা-লীন বুকে না যদি বাজিল আশার পুলক সুর—
ভোগীর লাগিয়া সীমাহীন ভোগ ভুখারীর শুধু ভুখ,
এক পাশে জমা বিলাশ আয়েস, আর পাশে শুধু দুখ
এই যদি তবে—কোথায় পুণ্য, কোথায় রোজা-ফজিলত
দ্বীনের নামেতে চলিয়াছে এযে মুকরমী লায়নৎ।
রমজান কোথা তোর—
এযে পুণ্যের মরীচিকা শুধু ছলনার মায়া ঘোর।

খোদার ওয়াদা দুনিয়া ও দ্বীন মুসলিম পাবে সব,
তবে কেন আজ মিসকিন তোরা—কেনো ক্রন্দন-রব?
আজো আছে তোর কোরান মজিদ, সেই কাবা আজো রাজে,
মিনারে-মিনারে আজো পাঁচবার আজানের বাণী বাজে,
আবে-জমজম নাহি শুকায়েছে আজিও মক্কা বুকে

www.pathagar.com

আরফাতে আজো বরষে–বরষে হজের পুণ্য সুখে
লক্ষ মানব মিছিলে আসিয়া। কমতি তো কিছু নাই—
তবে কেনো তোর বাগে গুলশানে আজ শুধু ওড়ে ছাই।
তখতে তাউস গিয়াছে ধ্বসিয়া দরবার–ই–আম–খাস
সবি গেছে সেথা আজ শুধু হেরি অতীতের মৃত লাশ
ফিরিতেছি কাঁদি করুণায় ভরা এক ফোঁটা আসুঁ চাহি
কে তারে আজিকে দিবে সে শান্তি কোথা সে মুক্তি–রাহী?
হেথা বাংলার নীল আসমানে ধানভরা মাঠে–মাঠে
কাঁদিয়া ফিরিছে সিরাজের রুহ্ তারি ব্যথা নাহি আঁটে।
ধরা বুকে বুঝি তাই নিতি হেরি সয়লাব জল–ছলে
কাঁদিছে ধরণী বুকফাটা তার ব্যথাগলা আসু–জলে।
মুমিনের লাগি ছিল যদি হেথা ইজ্জত সুখ–সাধ—
তোরাও মুমিন তবে কেনো হেন হলি আজ বরবাদ?
সত্য করিয়া বল
খোদা আর তোরা দোঁহাকার মাঝে কোন্ জনা ঝুটা খল?

ওরে বেয়াকুফ বেহুঁশ গাফেল, মুসলিম কোথা আজ?
আচকান আর শ্মশ্রু দরাজ–শিরো পরে টুপি–তাজ
পরিয়া ভাবিছ হয়েছ মুমিন মুসলিম দ্বীনদার;
শোন ইসলাম গোলামের নহে—দ্বীন এযে জিন্দার।
জেহাদের জোশ ভুলেছ তোমরা হারায়েছ খুনজোশী—
পয়জার খেয়ে হলে পয়মাল—তবু বেঁচে আছ খুশী,
দ্বীনের বেদনা বুকে নাহি তোলে উন্মাদ ঢেউ দোলা
শহীদী নেশায় চোখ নাহি ঝলে যেন অসি খাপ খোলা
গাজীর অটল মুক্তি কসম আজ নাহি খাও কেহ—
আজাদীর পাক আগ নাহি জ্বলে ঘিরি তব খাক–দেহ;
ভুলেছ মরুর অসীম আকাশ বন্ধন সীমাহারা,
মরু–বেদুঈন হারায়েছ তব সাইমুম গতিধারা—
হয়েছ স্থবির নত নির্জীব তাবিজ–ও–তসবি লয়ে
দুনিয়ারে ভুলি ভাবিতেছ বুঝি দ্বীনদার যাবে হয়ে,
শুন কহি পুনঃ ইসলাম ভীরু নিঃস্বের দ্বীন নহে—
এক আঁখে তার জেহাদী আগুন আর আঁখে জল বহে;
দজলা–ফোরাত মিলিয়াছে হেথা আগ–জ্বালা মরু সনে
আজান–ও–জেহাদ হুঙ্কার ধ্বনি এক সাথে হেথা রণে;
রমজান তারি সাধনার মাস জীবন–ও–মৃত্যু বাহী
বন্ধু গো শুধু উপবাস নহে আজ সেই রোজা চাহি।

www.pathagar.com

খোদা নাহি ঝুট কয়—
আজো মোজাহেদ চির জিন্দারা বিশ্বকে করে জয়

সতেরো মুমিন নিয়েছিলো জিনে বাংলার রাজ-তখত
পাঁচ কোটি আজ রয়েছ তোমরা তবু নাকে দাও খত।
নির্বোধ ফেরুদল—
সিংহের নামে পরিচয় দিতে আঁখে নাহি আসে জল।

লহুর দরিয়া জেগেছে আবার

লহু-দরিয়ায় জেগেছে আবার নিখিল ডুবানো উতলা ঢেউ
ওরে বে-খবর আজো ঘুমঘোরে শব-সম পড়ে রহে কি কেউ?
এলো সয়লাব কাঁপিছে কিশতি, ছিঁড়ে যায় বুঝি নোঙর-বাঁধ,
নয়া জামানার 'নূহ' রে ভুলিয়া মরণ-খেলার জেগেছে সাধ।
সারা মাগরেবী মুলুকে-মুলুকে নব কারবালা হেরিছে তাই
খুনেরা মউজ চলিছে ডুবায়ে গিরি ময়দান সকল ঠাঁই।
মাশরেক জুড়ি মোশরেক যত লোভ-লালসার দানব-দল,
ন্যায়েরে হানিয়া ক্রুর উল্লাসে ঢালিছে দেদার লহুর ঢল।
নীল দরিয়ার নীলা পানি আর সাহারার শ্বেত বালুকা রাশ,
খুন-লালে-লাল হয়ে গেছে আজ—ছেয়ে আছে সেথা মরণ-ত্রাস।
দুনিয়া জুড়িয়া খুনিয়ারা যত খুন-খোশরোজে মেতেছে আজ,
তারি মাঝে নামে তাহাদেরি শিরে তাহাদের রচা মরণ বাজ।
এমন করিয়া মিথ্যারে দলি চির-সত্যের জাগে আওয়াজ,
গোমরাহ লাগি জাগে যে গোলামী—তাজা-দীল লাগি আজাদী তাজ,
নূতন দিন—
জাহানের বুকে আসিছে আবার—বাজিবে আবার দীপক বীণ।

ওরে ভয় নাই—ভয় নাই আর—ফুঁসিছে যদিও প্রলয়-রোষ,
জালেমী জুলুম না জাগিলে হেথা জাগে না যে কভু জোয়ানী জোশ
যত পাপ তাপ—তত ইনসাফ—দুনিয়ার চির নীতি যে এই,
প্রতি কারবালা দ্বীনেরে জিন্দা করিছে ভুলো না সত্য সেই।
খুনেতেই হয় কুয়ৎ পয়দা—চোখের পানিতে কভু রে নয়,
ওরে বুজদিল দিল্লাগী ছাড়, আন লহু-স্রোত—কিসের ভয়?
দুনিয়ার সারা আসমান জমি,—সৃষ্টির পানে চাহিয়া দেখ,
জীবন-মৃত্যু করে জড়াজড়ি—হায়াত-মউৎ সেথা যে এক।
সেথা আছে জানি চৈতি-চাঁদিনী—সেথা জাগে ফের ঝঞ্ঝাবাত,

www.pathagar.com

সেথা বহে মধু দখিনা মলয়—সেথাই গরজে বজ্রপাত।
সেথা দোলে জল-কল-কল্লোল সৃষ্টি-ধ্বংসী বন্যা-ধার
তারি পলি পেয়ে,জাগিছে সেথায় শ্যাম শস্যের অর্ঘভার।
জীবনেরো বুকে জাগিছে তেমনি ধ্বংস-সৃষ্টি একই সে সাথ,
ধ্বংস রচিছে সৃষ্টি নবীন—সৃষ্টি আনে যে মরণ-রাত।
দুনিয়া ভর—
লহু-সয়লাবে ডুবিয়া আবার জাগুক জীবন নতুনতর।

আজ এলো ফের দুনিয়ায় সেই সৃষ্টি-জাগানো খুনেরা ঈদ,
ওরে বে-খবর জেগে ওঠ সবে ভেঙে দে রে তোর গাফেলী-নিঁদ।
মরণেরে আজ টুটি চেপে ধর-প্রাণদানি কর জীবন-জয়
জিন্দাই শুধু জান দিতে পারে, মুর্দ্দার তরে নাহি যে লয়।
নিখিল লোক—
লাখো কোরবানী পরশে আজিকে চির-সুন্দর সত্য হোক।

কোরবানীর ঈদ

এবার এসেছে কোরবানী ঈদ আজাদীর আহবান,
এখনো কি তব ভাঙিবে না নিঁদ, হে বন্দী দাসের দল—
পশেনিকি কানে রূহানী-মন্ত্র সাফা-মারওয়ার গান,
আজো কি বক্ষে রাখিবে লুকায়ে ভণ্ডামী মিছে ছল?
হে বন্দী শোনো, সন্ধানী অরি তোমার দীলের গেহে
খুঁজিতেছে পথ,—ছলনা-শপথ আজ তার সম্বল
ইমানের ডোর কোথা কমজোর কওমের সারা দেহে
তারি সন্ধানে জমি-আসমানে ফিরিতেছে অবিরল।

তোমার ভগ্ন কুটিরের সাথে ফেরেবের ফেলি জাল
জুলমী জোব্বা গায়ে দিয়ে ফেরে মোকরম শয়তান—
মুখে উঠে রনি ঈমানের ধ্বনি—জীবনে যে কোন কাল
আমলের হায় চিহ্ন কোথায় নাহি রাখে সন্ধান।

হে বন্দী শোনো, আজো আছে দোনো জাহানের রাহা পথ
তোমার লাগিয়া মুক্ত আজাদ,—ঈমানেরে ধর জোর—
কওলেরে করো সাচ্চা কালাম—যেন দৃঢ় পর্বত—
তখনি জাগিবে জোহরা-সেতারা নিশিশেষে নব ভোর।
আল্লার বাণী পাক কোরআন—মিথ্যার নাহি ঠাঁই,

www.pathagar.com

মৃত্যুর ভয়, ভীতি পরাজয় পরোয়া যে নাহি তার
তারি বাণী বাহী হতে যদি চাও তেমনি গুর্দ্দা চাই,
জোশ তক্‌বীর ফানাফিল্লাহ্—দুর্জয় হাতিয়ার।

দোদেল বান্দা মুনাফিক যত—করো তারে চুরমার—
সাচ্চা নিয়তে বাড়াও কদম-সদমায় নাহি ভয়—
কুফরীর সাথে জঙ্গ সে সহজ, মোনাফেকি হুঁশিয়ার,
শাহাদাৎ যার নিত্য কামনা—জয় তার নিশ্চয়।

এলো ত্যাগের ঈদ

বরষ ভরা ভোগের শেষে
এলো ত্যাগের ঈদ ;
জীবন দিয়ে জীবন লাভের
জাগলো রে উম্মিদ।

জন্ম-মৃত্যু নিত্য খেলা
বিশ্ব জগতের,
জন্ম হলো যাত্রা শুরু
মৃত্যু তারি জের।
সত্য লাগি জীবন দেয়া
মৃত্যু সেত নয় ;
ভয়ের দেশে ভয় বিনাশী
সেই তো বরাভয়।
মৃত্যুজয়ী সেই তো জীবন
অমর মহত্বের।
হিম্মতি সব উম্মতেরা
কোথায় নবীজীর
আল্লা ছাড়া সবার কাছে
উচ্চ যাহার শির ;
চক্ষে যাহার বহ্নি জ্বলে
অত্যাচারী লাগি
দুঃখী তরে ঝরছে যাহার
অশ্রু অনুরাগী
সেই তো খাঁটি সাচ্চা সোনা
সেই তো সাচ্চা বীর।

মৌ-লোভিদের দৌলতে কি

www.pathagar.com

লৌহ হলো দীল
সেখানে নাই দয়া-মায়ার
একটি কণা তিল ;
সেথায় শুধু লোভের কৃমি
করছে কিলিবিল—
সেথায় চলে লাভের খেলা
বেহায়া বে-দীল।

মওলা-রাহী মৌলভীরা
আয় রে তোরা ভাই
নিজের তাজা খুন-লহুতে
জ্বালবে যে রোশনাই
ব্যথার আঁধার মুছবে যে জন
ভাঙবে দুখের নিঁদ।

আজকে বুঝি তাদের তরে
আসলো রে উম্মিদ
রাতের শেষে সূর্যসম
আনন্দ তৌহিদ
এলো ত্যাগের ঈদ।

জিন্দা ঈদ

জাহানে-জাহানে রচিছে আবার খবর খোশ—
দ্বীনের লাগিয়া কে দিবে জীবন—আছে কি জোশ?
জালিমেরা আজো হাঁকিছে জুলুম চতুর্দিক
চলে অহরহ বেদনা সহি অগ্নি-শিখ
তবুও তোমরা রয়েছ বসিয়া ভীরুরা, ধিক!
জীগরে নাহি কি আগুন-রোষ?
আজো তলোয়ার রুদ্ধ-কোষ?
মারোআর পথে আজিও কাঁদিছে হাজেরা মা,
নিখিল দুনিয়া হয়েছে নিঠুর কাতল-গাহ—
হাজারো শিশুরা ধুঁকিছে ক্ষুধায়—কোথা সে দুধ?
শীর্ণা মায়েরা লুটায় ভূমিতে পের না ক্ষুদ—
তবুও ধনীরা দীনেরে কাড়িয়া লুটিছে সুদ—
চলিছে ন্যায়ের বিচার বাহ্।
আর ভণ্ডামী—সহে না, আহ্।

www.pathagar.com

মজলুম ধরা ইনসাফ মাগে তুলিয়া হাত,
ব্যাথার দরিয়া শোনিত অশ্রু করিছে পাত—
তাহারে বুঝি সে জাগিছে মাতাল মউজ-বান,
দিকে দিকে রণে তারি যে ধ্বংস প্রলয়-গান,
লোভের জঙ্গে লুটিছে আজিকে হাজারো জান—
নামিছে মরণ-নিশীথ রাত—
কোথা সে নূরানী জীবন-নাত।

মৃত্যুর বুকে জাগাতে হবে যে জোশের জিদ—
হাসিছে আবার নয়া জামানার স্বপন-বিদ—
ধরার দুয়ারে রণিতেছে শুন তাহারি ডাক,
কোরবান চাহি, চাহি জান-মাল পুণ্য পাক—
এসো দ্বীনদার মোজাজেদ বীর জঙ্গী লাখ—
ছাড়ো গাফলতি, ভাঙোরে নিঁদ—
আজিকে তারি যে জিন্দা ঈদ।

হামদ

আল্লাহ্ আমায় নিত্য চালাও তোমার সহজ-সরল রাহে—
আমার নবীর কণ্ঠ যেথা তোমার নামের গজল গাহে।
যেথায় রাখ মিনার চূড়ে—
আজান-ঝরা বীণার সুরে
তোমার প্রেমের পীযুষ ঝরে রাত্রি-দিবা বরষ-মাহে।
আল্লাহ্ আমায় নিত্য চালাও তোমার সহজ-সরল রাহে।

তোমার মধু নামের গানে—
ওগো প্রভু নিখিল স্বামী—
খুশীর জোয়ার আমার প্রাণে
যায় না যেন কখন থামি।

তোমার ক্ষমার পাথার কোলে—আমার যত ভুলের ব্যথা,
পলক-পলে রওগো তুলে ওগো দয়ার ফুলেল চেতা,
যখন জ্বলি দহন দুখে,
তখন যেন মহান সুখে
তোমার সে দান আমার বুকে তোমার মধুর পরশ চাহে।
আল্লাহ্ আমায় নিত্য চালাও তোমার সহজ-সরল রাহে।

www.pathagar.com

মহানবীর আবির্ভাব

সেদিন জাহানে জাহেলী যুগের জুলমাৎ সিয়াকালো
নেমেছে নিশীথ, শর্বরী সম দিকে-দিকে দেশে-দেশে
নেমেছে নিবিড় আঁধার-সারথী আলেয়ারা জমকালো
ছলনা-আলোয় মানুষ জাতিরে ভুলায়েছে নিঃশেষে।
তৌহিদ-মহাবাণী
বিস্মৃতি তলে চলেছে সেদিন জীবনের জের টানি।

নবীজী মুসার তরিকা বিসরি সেদিনের ইহুদীরা,
ঘোষিল-তারাই মানবের সেরা—হীন হেয় আর সবে,
ন্যায় সাম্যের নিরিখের মাপে অধিকার চুল-চিরা
স্বপন চারির খেয়ালী পোলাও—নাহি চলে কভু ভবে।
বিধির বিধান মতে
তারাই একাকী খোদার পেয়ারা দুনিয়া ও আখেরাতে।
ইসায়ী দিনের অনুরাগী যারা—তারাও যে চুপে-চুপে—
কালের প্রবাহে গেলো পথ ভুলে—ভুলি বাণী তৌহিদী
মানুষ নবীরে পূজিল তাহারা খোদারি তনয় রূপে,
যাজকেরা মিলি রচিল খোয়ালী নবতর সংবিধি।
মহাত্যাগী ঈসা নবী—
লোভী পুরোহিতবাদীরা তাঁহার মুছে দিল সেই ছবি।

ইরান মুলুক বিরান সেদিন নাহি কোন দব্‌দবা—
সাইরাস আর জামশেদ-দারা—অতীতের নাম শুধু,
নাই সেথা যার আশা অরুণিমা গৌরব-সম্ভবা—
বিধাতারে ভুলি বহ্নি-পূজার জ্বলে সেথা শিখা ধূ-ধূ।
অতীতের ধুলি বুকে
কত বিজয়ের কাহিনী করুণ কেঁদে মরে ধুঁকে-ধুঁকে।

শত রোমাঞ্চ-জাগানো রোমের চিরজয়ী সেনানীরা—
ভুলে গেছে খুন-পিচকারি খেলা বিলাসের ভোগে মাতি,
কাম-কাঞ্চন-মোহ-গুঞ্জনে শ্লথ শিরা উপশিরা ;
স্তিমিত সেদিন মহতী তাহার সভ্যতা জ্ঞান-ভাতি।
সত্যের সন্ধানে—
মুক্তি পাগল সাধকেরা নহে উন্মুখ প্রাণ দানে।

শির্ক-কুফরীর মোহিনী কুহক দেয় শুধু হাতছানি

www.pathagar.com

সত্যের বাণী সভয়ে লুকায় নীরবতা গুহা-তলে,
নগ্নপাপের তাণ্ডবে হয় শালীনতা কোরবানী—
কত ব্যভিচার বঞ্চনা চলে শুচিতারে পায়ে দলে।
তীর্থের তীরে তীরে—
পুণ্যেরে বৃথা খুঁজিয়া বেড়ায় ভক্তেরা আঁখিনীরে।

এমনি গহন আঁধারে যেদিন ঘিরিল বসুন্ধরা—
সত্যের নামে মিথ্যা—বেসাতি চলিতেছে সবখানে,
মহা মানবতা উঠিল কাঁদিয়া চাহি জ্যোতি ব্যথা-হরা,
চাহিল ভ্রান্তি যাক ধুয়ে মুছে শান্তির আলোছায়ে।
জাগিল নিখিল সাড়া
নূরের ঝলকে উঠিল ঝলসি সব ব্যথা আঁধিয়ারা।

সেদিন বিশ্বে ব্যথা নিঃসীম জমেছিল যেথা ত্রাস—
সেই আরবের মরু-মক্কার হেরা-গিরি-গুহা বুকে,
ঐশী আলোর বিপুল বিভায় জ্ঞান-শিখা উঠে হেসে—
উঠে বিকশিয়া পরম সত্য বিশ্বের সম্মুখে।
এলে তুমি নূর নবী—
তোমারি দীলের দর্পণে জাগে সৃষ্টির গূঢ় ছবি।

বর্ণ-গোত্র-দেশ-জাতি-গড়া ভেদের বাঁধন টুটি—
মহা মানবতাবাণীর মন্ত্রে জাগালে বিশ্ব সারা—
বিত্ত-রক্ত-রচিত দম্ভ পড়িল মাটিতে লুটি—
চির সাম্যের পরশে জাগিল মূর্ছিত আত্মারা।
নিখিল মানুষ জাতি—
হে নবী তোমার আলো-ইঙ্গিতে পার হলো কাল রাতি।
দেবতার পুজা—পাথরের পুজা আর শত পুজা ভারে
মানুষের শির গিয়াছিল ডুবি চরণেরো ধুলি-তলে,
হে নবী তোমার মুক্তি-বীণার প্রাণজাগা ঝংকারে,
জাগিল ভয়ের শৃঙ্খলে টুটি মানুষেরা দলে-দলে।
নভ-উঁচু শির তুলি
দাঁড়ালো মানুষ আবার জগতে অপমান ব্যথা ভুলি।

জানিল মানুষ সে নহে কাহারো পদানত দাস কভু,
সে যে আশরাফ সৃষ্টির সেরা, রাজে ধরা তারি তরে,
সেওয়া আল্লাহ্ বিশ্ব নিখিলে কেহ নহে তার প্রভু,
শুধু তারি লাগি নভ অম্বরে গ্রহ-তারা সঞ্চরে।

www.pathagar.com

তাহারি চরণ পাতে—
সৃজনে লীলা হলো বিকশিতে নিখিল মখলুকাতে।

মহামানবের মহামুক্তির এই যে পরম বাণী—
হে নবী মহান, সে যে তব দান, জানে ধরা জানে সবে,
দেবাসুর যত মানুষেরি দাস, নহে প্রভু তাও জানি,
নহে নতশির মানুষেরা কভু কারো কাছে ক্ষিতি-নভে।
সুখে-দুখে-উৎসবে—
শুধু আল্লারি কাছে সে আনত বন্দনা-গীতি রবে।

চির এ নাজাত পয়গাম-বাহী হে মহা আখেরী নবী,
এসেছিলে তুমি দুনিয়া জাহানে এমনি পুণ্য দিনে,
তারি আনন্দে নিখিল কুঞ্জ উঠেছিল পল্লবি,
উঠেছিল রণি দরূদ-লহরী বিশ্বের মনো বীণে—
গাহি তব মহানাম
মধু-সুধাময় গীতি-কল্লোলে উল্লাসে অবিরাম
রণেছিল সেই নাম—
সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম।

নাত-১

আজানে সালাম লহ নবী মোহাম্মদ—
দুনিয়া জাহান জপে এ নাম শহদ ;
প্রভাতে জাগিয়া পাখী
এ নামে উঠিছে ডাকি—
এ নামে আসেক সাকি
প্রেম গদগদ।

তোমরা গাহিছে তব
দরূদ নয়ালা তব
কত যে তাহার কব
তারিফ বেহদ।

গাহিছে বাতাস নিতি
তোমারি মধুর গীতি
তোমারি আশেকে তিতি
বহে নদী-নদ।

www.pathagar.com

নবীজী নবীজী বলি
দিবস উঠিছে জ্বলি
রজনী শিশিরে ডলি
চুমে তব পদ।
হাজারো সালাম লহ নবী মোহাম্মদ।

নাত-২

মন রে তুমি নিত্য জপ ইয়া মুহাম্মদ সাল্লেল্লাহ্
এই নামেতে লুকিয়ে কত শান্তি সালাম আছে আহ।

এই নামে তোর কলব্ কলি—
নূরের আলোয় উঠবে জ্বলি—
ঘুচবে পথের আঁধার গলি
পাইবি খুঁজে নূতন রাহ্।
ছয় মোকামে শুনবি তবে
হর দমেতে কি নাম জপে—
হইবি তখন উভয় ভবে
খোদ খোদারি খয়ের খাহ।

ওরে মোমিন চিনরে ঘাটি
রাখবি যদি ইমান খাঁটি—
মিনার পরে ধর না আঁটি
মোস্তফারই কদম-গাহ্।
ভয় কি রে তোর ওরে কবি
আছেন তিনি রহম-রবি
আরশ পাশে আছেন নবী
দু'জাহানের শাহান শাহ্।
মন রে তুমি নিত্য জপো ইয়া মুহাম্মদ সাল্লেল্লাহ্।

নাত-৩

আমার মন-মদিনার বক্ষ জুড়ি শেষ নবীর ঐ চরণধূলি
রইল আঁকা—তাই-ত হেথায় নূরের মউজ উঠছে দুলি
আঁধার পাপের যতই মায়া
ক্ষণিক মোহের রচুক ছায়া

নবী নামের মধুর সুরে সকল বাঁধন যায় যে খুলি।

জীবন-মরুর বাঁকে-বাঁকে অনেক লোভের মোহন মেলা,
মরীচিকার স্বপন রচি রূপের আলোয় করছে খেলা—
নিঠুর তাহার বাঁধন-ফাঁদে
মানুষ যখন ব্যথায় কাঁদে—
নবী নামের পিযুষ পিয়া যায় সে তখন বেদন ভুলি॥

সরল পথে চলার ক্ষণে হঠাৎ যদি তুফান নামে
অত্যাচারীর কুলিশ হাঁকে কুটিল রোষে ডাইনে-বামে—
সেই আঁধারের ভয়াল বুকে
অমর আশার অভয় সুখে
নূর-নবীরি নামের জ্যোতি দেয় বুলায়ে আলোর তুলি,
মন-মদিনার বক্ষে আঁকা শেষ নবীর ঐ চরণ-ধূলি।

মহরম

দূর আরবের মরু-কারবালা ক্রন্দন-গলা ফোরাত-তীর
রক্ত নিঝরে হলো রঙ্গিন সত্যেরে দানি আপন শির,
মার্সিয়া কাঁদে আজো স্মরি তারে-হায় হোসেন ! গায়, হায় হোসেন !
কণ্ঠ ঠেলিয়া উঠিছে ধরার তাই যে উছল অশ্রু-ফেন।
তারি ক্রন্দনে আসমান-জমি আঁসু-টলমল নয়নে চায়,
লক্ষ বুকের হাহাকার জাগে—হায় হোসেন ? আজ হায় কোথায় !

মহরম সেই বেদনার স্মৃতি—নিখিল জাহান স্মরিছে আজ—
মানুষ কেমনে মানুষেরই লাগি নির্ভয়ে পরে মৃত্যু-তাজ ;
নিত্যেরে স্মরি, সত্যেরে স্মরি কেমনে মানুষ সর্ব সুখ
হেলায় ত্যজিয়া ব্যথার-বজ্র উল্লাসে লয় পাতিয়া বুক !

মান চাহে শুধু প্রাণ নাহি চাহে, চাহে না বিত্ত, চাহে না ধন,
মুক্তা নহে রে মুক্তির লাগি কেমনে করে সে সর্বপণ !
অত্যাচারীর দণ্ডেরে নহে—ন্যায়দণ্ডেরে করে সে ভয়—
মহরম সেই অমর-অভয় ব্যথা-গরিমার গাহিছে জয়।

কারবালা শুধু নহে সে আরবে নিখিল জুড়িয়া রাজে সে আজ !
জালিম এজিদ জুলুম আনিছে ব্যথিতের বুকে হানিয়া বাজ।
এস বীর এস, শহীদ হোসেন ! যেথায় রহ না সুদূর ঠাঁই—
মজলুম ধরা চাহিছে তোমায়—চাই বীর সূত, শহীদ চাই।

www.pathagar.com

কারবালা নবতর

তেরোশ বরষ পর—
মহরম আজ এলো ফের লয়ে
কারবালা নবতর।

সেদিন ধরায় এসেছিলো নয়া
হুকমতে ইসলামী—
জিন্দা আজাদ জিন্দেগী মাগি
নিখিল মুক্তি-কামী,
জাহান-জুড়িয়া বাড়ালো কদম
নব সে কাবার পথে—
চাহিলো নাজাত চির-রাত-ঘেরা
জিন্দান-খানা হতে।
চাহিলো নাজাত জাত-পাত-রচা
বর্ণ-বাঁধন টুটি
উতরি পঙ্ক পঙ্কজ সম
উঠিবে তাহারা ফুটি।
মরুচারী মূঢ় মূর্চ্ছিত আর
লাঞ্ছিত যেথা যত
নব তকবির-সঙ্গীতে করি
নতশির উদ্যত
করেছিল সবে তারি সে ছন্দে
নূতন যাত্রা শুরু
নূতন আশার নব উচ্ছ্বাসে
বক্ষ সে দুরু-দুরু।

সহসা সেদিন, হায় !
নূতন হেলাল ডুবে গেলো বুঝি
কালো সে কারবালায়।
তেরশ বছর পার হয়ে ফের
আমাদের আছমানে—
নূতন আশার নব বাঁকা চাঁদ
জীবনের জ্যোতি আনে।
মানুষ আমরা সবাই হেথায়
বাদশাহ-নফর কেহ
নাই হেথা ভাই।— এক জাতি মোরা

www.pathagar.com

এক প্রাণ এক দেহ।
লুণ্ঠিত জন–জীবনের কূলে
নব প্রাণ–কল্লোলে,
আবে–হায়াতের ধারারা আবার
নাচে নব ঢেউ দোলে।
আমরা আবার দেখেছি খোয়াব—
হেলালী ঝাণ্ডা শত
জীবন–কলেমা কালাম বহিয়া
চলিয়াছে অবিরত—
মুক্তি–পিয়াসী সারা এ ধরার
মঞ্জিলে মঞ্জিলে,
রচি মসজিদ নহে শুধু ভুঁয়ে,
মানুষের দীলে–দীলে।
সেথায় আবার পড়িছে নামাজ
নিখিল মানব মিলি—
ইখোয়ানী আর প্রেম–শরবত
সেথা সদা হয় বিলি।
তারি মাঝে বারবার—
আমাদের নব উদিত চাঁদে রে
ঘিরে ধরে আঁধিয়ার।
তবু মোরা জানি আল্লার বাণী
আজো হেথা পূর্ণতা
লভে নাই ভাই—এখনো সে বলা—
আছে বাকী বহু কথা।
দুনিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে আজ
সবলের রাহাজানি—
তারে না দলিয়া হবে না নীরব
আল্লার মহাবাণী।
রয়েছে ধরায় পূত যে শোনিত
সীমারের খঞ্জরে
তারি সয়লাবে ডুবিবে এজিদ—
আছি জাগি তারি তরে।

নাহি নাহি সংশয়
প্রতি কারবালা শেষে ইসলাম
নব সে জন্ম লয়

www.pathagar.com

সত্য পথের শক্ত ভিত

ঘনিয়ে এলো জীবনপথে গোরের গহন সন্ধ্যা রাত
বন্ধু গো তাই কইতে চাহি তিক্ত দুটি সাচ্চা বাত্।
বিদায় বেলায় ডাক দিয়ে যাই শুনবে না কেউ
শুনবে কেউ,—
তীরের পরশ পায় কি সকল ব্যাকুল চিতের আকুল ঢেউ?

তবুও জাগে ঝড় তুফান
সেই সুরে কেউ ভয়েই কাঁপে কেউ বা গাহে বজ্রগান।
আজকে তোমার স্মরণ লোকে মরণ-ভয়াল জং-জেহাদ,
দিচ্ছে উঁকি—বয়সে ঝুঁকি—কার আছে সেই শক্তি সাধ।
দ্বিনের জোশে খুন নাচে কও তো রাখি বক্ষে হাত
নয়তো শুধু মুখেই মোমিন দেবতা তোমার লাত-মানাত।
ভণ্ড ভীরু দিন অতীত
আজকে চাহি চিত্ত মনে সত্য পথের শক্ত ভিত।

চৌদ্দ জনে চিনলো যাদের মস্ত বিশাল রাজ্যভার—
জান-বাঁচানোর পন্থা যাদের পলায়নের পাছ দুয়ার;
সেই বীরেরা শির তুলি আজ দেখায় তোমার রক্ত আঁখ,
সিংহ বধের সাধ জেগেছে শিবার দলের হায় বিপাক।
মার খেয়েও বারম্বার—
নাই হায়া যার ওষুধ তাহার মারের উপর শক্তমার।

খয়বরে বীর আলীর হাতে হয় যাহারা শেষ সাবাড়—
সেই সে এহুদ দিচ্ছে তোমায় হাড়গুড়ানো বেহুদ্ মার।
দশ লাখে আজ দশ কোটিরে দলছে হেলায় পায়ের তল—
তোমরা তবু বান্দা মোমিন খেলবে কতো মিথ্যা ছল!
যে জন মানে পাক-কোরান—
ফাসেক-কাফের হাজার জনা নয় সে কভু তার সমান।

পয়লা তব কেবলা শরীফ—সেই বায়তুল মোকাদ্দাস
তোমার নবী মেরাজপথে গেলেন প্রথম যাহার পাশ;
তোমার মহান ওমর ফারুক করলো যারে হেলায় জয়
হইলো বিনা রক্তপাতে মালিক যাহার সর্বময়,
সেই যে তোমার ফিলিস্তিন—
যেথায় মজিদ আক্‌সা বুকে জ্বললো আগুন ঐ সেদিন।

www.pathagar.com

ভূত-পূজারী মুসরেকিন সূদ-পূজারী এহুদ জাত
তোমার উপর করছে যে আজ হিংস্র ভয়াল অক্ষি-পাত
ভাবছো কভু কারণ কি তার কোথায় তাহার আসল মুল ?
আদত ছাড়ি বেদাত পূজার সর্বনাশা তোমার ভুল—
আনলো নাকি দুখ তোমার
খোদার নিতি সয় না কভু ভ্রান্তপথের মিথ্যাচার।

দ্বীনের নামে খাস বে-দ্বীনীর করছ তুমি বদ নকল—
মুনাফেকির মৌ-তাতে আজ মিলছে খাসা নগদ ফল।
ভুলছো তুমি তোমার নিজের তাহজীব এবং তমদ্দুন—
তোমার মগজ-রন্ধ্র পথে শূন্যবাদের ঘুরছে খুন।
হায় রে জাতির নসিব দোষ—
অস্তিবাদের সৈন্যরা আজ নাস্তি মনে চায় আপোষ।

মানলো যারা-মানবজীবন মহান মহৎ চিরন্তন—
মানলো যারা-স্রষ্টা আছেন বিশ্বজুড়ি সর্বক্ষণ ;
তারাই শুধু করতে পারে সত্য পথে আত্মদান,
তারাই শুধু করতে পারে শাহাদতের শহদ পান।
সেই তাহারা আজকে কই—
মহৎ কিছু যায় না পাওয়া মহৎ প্রাণের অর্ঘ্য বই।

পক্ষী-পশুর জীবন জানি সৃষ্টিলোকে নিত্য নয়—
তেমনি যারা ভাবছে জীবন হেথায় হবে লুপ্ত লয়,—
সেই সে ক্ষণিক পাশববাদের আসব যারা করলো পান,
হায় রে শেষে তাহার কাছেই করলে তুমি আত্মদান।
হায় রে নসিব—হায় কপাল !
ভাবছো তবু বিজয় আসি করবে তোমায় ইস্তেকবাল ?
জিন্দেগী নয় মিথ্যাবাদের ফন্দি-ফিকির দিন দুয়ের
মানবজীবন চলছে টেনে কালের স্রোতের নিত্য জের ;
সেই জীবনে তোমার নবীর সবার সেরা মুক্তি পথ—
শক্ত পায়ে চলবে বাহি—আজকে তাহার লও শপথ।
সামনে ভয়াল ধ্বংস-ভয়—
সেই ভয়ে রে চূর্ণ করি আনতে হবে পূর্ণ জয়।

ধন নহে রে জন নহে রে আজকে খাঁটি চাই ঈমান—
বিশ্বে সে তো নিঃস্ব নহে যে পেলো সেই খোদার দান ;
তোমার নবীর যাত্রা-দিনে কেউ কি ছিলো তাঁহার সাথে—
ঈমান জোশের দৌলতেতেই করেন তিনি জগৎ মাৎ।
আজকে চাহি সেই ঈমান—
তবেই পাবে জাহান জুড়ি মুমিন যারা নূতন প্রাণ।

www.pathagar.com

জঈফ জাহান

জঈফ জাহান, জখমী জীগর, জালেম যুগ—
জাহেল জমাত, জহর-জমাট কুল্‌মুলুক।
জরিন জবান, জামাল জীবন, জিন্দা দীল—
নূর নিশানা নজর দরাজ—নাইকো তিল।
সোয়াব-সিফত সালাম-সালাত সবর-সুখ—
আদব-আদাব, আর্জু-আয়েশ—পূর্ণ বুক—
লুপ্ত সব—
খোদার নয় গো—চলছে খুদীর খালেস্ স্তব।

মুমিন মানুষ বনছে কমিন আজ হেথায়—
পাচার লুটায় লানৎ লাজে লাখ ব্যথায়।
ঝাঁজরা জীগর রন্ধ্রে ঝরে দুখীর খুন—
চৈন-চেতনা চিড় খেয়ে যায় চতুর্গুণ।
স্বার্থ-সুখের স্বর্গ-সেবায় সবাই চুর—
দুই দুনিয়ার দীল-দিওয়ানা দীপক সুর,
জঙ্গ-জেহাদী—জান্-বাজীর খুন সমুদ্দুর—
চায় না কেউ—
শের নহি কেউ বলছি সবাই সুরার ফেউ।
জঙ্গী-জীবন ঝিমায় হেথায় এ যুগময়—
শহীদ-শহদ সুর-পিয়াসী কেউ তো নয় ;
খুন-খারাবীর ধুম-ঝামেলা হেথায় রোজ—
ফরজ কাজের গরজ-গমির নাইকো খোঁজ।
সেয়ান সবাই—সিয়াম-সবর চায় না কেউ
তাই কি হেথায় তং-তাবারীর উঠলো ঢেউ?
নয় শরিয়ৎ—সুদ-শরারৎ আমরা চাই—
জিন্দেগী-ভর ঝড়-ঝামেলা আসলো তাই,
আসলো ঈমান আমান ভোলা এশার ঘুম
জায়নামাজের জায়গা জুড়ি মরণ-চুম।
তাহার ফল—
চপল খোয়াব—নফল সোয়াব সব বিফল।

হাজার সোয়াল জুড়ছে জোয়াল কাঁধের পর—
সংদীলী আর ছল্-ছলনার আজ ফখর।
বিমান ছোঁয়া ঈমান অটল নাই হেথায়—

www.pathagar.com

মন-মাতানো মুনাফেকির মোহের ছায়—
মউজ চায়—
আজ সবায়।
নমরূদেরা নরক-নারের ছড়ায় বিষ—
ভর দুনিয়ার দোজখ-দ্বারে দুখের শীষ
লুলুপ লোভের লহর লীলায় অহর্নিশ
ফুঁসছে তাই
রোজ কেয়ামৎ ওৎ পেতে কি আসছে ভাই?

ইবলিসেরা বনছে নকল ঈমানদার—
খুলছে যতো বেঈমানী আর বদীর দ্বার—
নাই বিচার—
নফসিয়াতের নাদান নফর আমরা সব—
হায়োয়ানী হায় তুলছে হেথায় দেহের স্তব;
দীল-রূহানীর রহম-রেয়াজ নাই হেথায়।
ধুঁকছে গরীব খোর গরুরীর গঞ্জনায়
মজলুমেরা মৃত্যু-শীতল মুক্তি চায়—
আজ ধরায়।
ইনসানেরা চায় ইনসাফী এখতিয়ার—
বইতে যে আজ পারছে না আর জুলুম-ভার—
নির্বিকার।
সেই আজাবের গজব হতে চাও নাজাত
কুফর-কালো কওল হতে রঙ তফাৎ।
ঈমান ছাড়া-আমান নাহি—নাই আর পথ
চির তৌহিদ-শান্তি-সালাম—লও শপথ।
জঈফ জাহান—জখমী জীগর জালেম যুগ
জাহেল জমাত—জহর জমায় কুলমুলুক।

মীনার

আবার আকাশে বাতাসে বাতাসে
নূতন আজান শুনব কি?
আবার দীলের নভ-নীরে ভাই
নতুন খোয়াব বুনব কি?
নব নওরোজ আসিবে আবার

www.pathagar.com

তারি দিন-ক্ষণ গুনব কি?
বেলালী আজান শুনব কি?
সিনার তাকত হারায়েছি তাই
তখতের লোভে খুঁজি দীনার,
ওয়াক্তি নামাজ ভুলে গেছি ভাই
জান্নাত লোভে তুলি মীনার।

মন-মসজিদে তালা দেয়া আজ
তেলাওয়াৎ করি ঝুটা কালাম,
কালোয়াতী সুরে ভাঁজি মোরা শুধু
কলা-বতী গীতি ফজর-শাম।

লেবাসে-লেহাজে যদিও আমরা
আজো কেহ কেহ মোত্তাকীন,
রোজ কেয়ামত হাশর বিচারে
অনেকেরি সাফ নাই একীন—
তবু নাকি মোরা মুসলেমীন॥

রূহানী জোশের রহম চোয়ানো
আঁসুনীরে ভেজা খোদার নাম—
অনেক আগেই সে পাঠ করেছি
পাঁঠা সংগীত শোধ তামাম।
স্বর্গ-নরক চলেছি কোথায় কোন দেশে কোন গেহে—
আজ বলে দেবে কারা?

ইমামেরা আজ লোভের কিমামে
নেশা-চুর হুঁশ-হারা।
খণ্ড প্রলয় জাগে চৌদিকে
তবু ভণ্ডামী মুনাফেকী
রাজ্য জুড়িয়া রাজগী চালায়
রাজারা সবাই আজ মেকী।

ন্যায়-ইনসাফ সালেহী-সুলুক
মুলুক জুড়িয়া সাফ খতম
রিশওয়াৎ আজ রচে কিসমত
তারি নাম জপি দম-কদম।
কারো চেয়ে মোরা কিসেতে কম?

www.pathagar.com

আবার আকাশে বাতাসে-বাতাসে
নূতন আজান শুনব কি?
আবার দীনের নভ-নীলে ভাই
নূতন খোয়াব বুনব কি?

মক্কা-মদিনা নাম বেচি-কিনি
প্যারি-লন্ডনে করি বসত
দীন-ইলাহী তো কেতাবের কথা—
খেতাবেতে খাঁটি পেয়েছি পথ।

সব্জা নিশানে করেছি কব্জা
জ্ঞানী-নাবালক মন সবার,
সেই ঝাণ্ডার ঠাণ্ডা ছায়ায়
অন্ডা-নীতি সে চমৎকার!

আরামে আমরা মেতেছি চালায়ে
নাহি প্রতিবাদ শব্দটুক—
ভুলিতে পারি না ভাই রে কভু সে
ডাণ্ডা-কোমল পরশ-সুখ।
কিসের দুখ!
স্বর্গ-নরক চলেছি কোথায় কোন দেশে কোন গেহে—
আজ বলে দেবে কারা?
ইমামেরা আজ লোভের কিমামে নেশা-চুর হুঁশ-হারা।

তবুও তোমরা চির পাগলেরা—
খুঁজিছ যাহারা হেরার নূর
সেরা শাহাদৎ—শহদ সুধাতে
রাজী আছো হতে মাতাল-চুর?
সে জয় নহে তো অনেক দূর—
খোলা তলোয়ার বর্শা ধারাল
দ্রুত ধাবমান অশ্ব-খুর—
বালু-উত্তাল মরু সুবিশাল
উটের কাফেলা, খেজুর-বন—
আজ নাহি ভাই প্রয়োজন কিছু,
ঠিক কর শুধু আপন মন॥

আখেরী জামানা মানিবে না মানা
কথা ফানুসের ফুস-নীতির।

www.pathagar.com

যুগে-যুগে-জমা ব্যথা-জুলুমের
আজ সে হেথায় জমেছে ভীড়।
জীগর-গলানো লহু-আঁসু আজ
নয়া সয়লাবে ধরা ভাসাক,
আবার ঝরুক মোমেনী মনের
আবে-জমজম পুণ্য পাক।
চাহি না হারাম-খোবীর খবিস
কালো-বাজারী লাখ দীনার
হালালী রুজীর রক্তে গড়ানো
শক্ত হাড্ডি চাহি সিনার,
শহীদী লহুর সুর্খিতে আর
সেই হাড়ে আজ গড়ো মীনার।
তারি চূড়া হতে আজানে-আজানে
কাঁপুক সপ্ত সিন্ধু-পার—
হাঁকোরে আল্লাহু-আকবার॥

আবার আকাশে বাতাসে বাতাসে
নূতন আওয়াজ শুনব কি
আবার দীলের নভ-নীলে ভাই
নূতন খোয়াব বুনব কি?

ভাটার দিনে

বন্ধ্যা ভাটার চরা মাটি ভরা অথই সিন্ধু-চকে
মাঝি রে কিস্তি বাঁধা বুঝি পড়ে কদমের চুম্বকে।

কবে যে সেদিন জোয়ারের ডাকে অম্বুধি কূলে-কূলে
উজালী জলের বন্যা-পাগল উঠেছিল ফুলে-ফুলে
মাতাল প্রাণের আবেগে সে তার গতি-পথ ভুলে-ভুলে
কূল-ডোবা কল্লোলে—
মরু সাহারার বালীর পাহাড়ে দুলে ছিল ঢেউ-দোলে।
জোয়ারের জল গেছে যে সরিয়া আজ শুধু বালিয়ারী
লু-এর হাওয়ায় কেঁদে-কেঁদে যায় শত ব্যথা-আহাজারী
দিনের সূর্য ঢেকে দেয় সেথা সাইমুম-আন্ধারী,
মঞ্জিল গেছে মুছে—

www.pathagar.com

মরুর উটেরা সেও ভুলি পথ ধুঁকে সেথা আফসুসে।
সে কাহিনী আজ স্মৃতির চিত্রে আবছায়া শুধু ভাসে,
কত না যুগের অশ্রু–রুধির মিশে গেছে ইতিহাসে,
ডহংসা–কাতর প্রেতের অট্ট হাসি শুধু কানে আসে
নিশীথ সুপ্তি ঘোরে—
লক্ষ শহীদ কাতরায় শুনি সে হাসি ভগ্ন গোরে।

শুনেছি আমরা রাহের তিমির পার হয়ে গেছি কবে,
জাগে নাকি ধরা ঊষার লালিম আলোকের উৎসবে
হায় রে ঊষায় হেরি শুধু আজ লালী মেঘ সারা নভে—
ঝঞ্ঝার ইঙ্গিতে—
নব আশা নহে শঙ্কা ঘনায় আমাদের সারা চিতে।

ভগ্ন কদম ফুরায়েছে দম, বল নাই মন–দেহে
আমান সে গেছে ঈমানো টলিছে, মন দোলে সন্দেহে—
স্বর্গ–নরক চলেছি কোথায় কোন দেশে কোন গেহে
আজ বল দেবে কারা?
ইমামেরা আজ কিমামের লোভে নেশাচুর হুঁশহারা।

জিন্দারা মোরা বান্দা বনেছি জিন্দানখানা জুড়ি,
জানি না তো কিছু জানি শুধু ঝরে খুনলালী ফুল–ঝুরি
আমাদের হত জিন্দেগী ঘিরে দিন কাটে গোর খুঁড়ি;
স্বর্গের সন্ধানে—
স্রোতের স্বপ্ন হারায়েছি মোরা ভাটার শোষণ টানে।

মাঝির কিস্তি টাল খায় বুঝি—হাল ধরো জোর হাতে
আসিবে জোয়ার আশা আছে আজো চর–পড়া দরিয়াতে—
হয়তো সাহারা শ্যাম হবে ফের ওয়েসিস–ঝর্ণাতে;
বিশ্বের কূলে–কূলে—
হয়তো আবার আসিবে বন্যা কল্লোলে দুলে–দুলে।

আল্লাহ্ তুমি দাও নাজাত

নও জামানার যাত্রী মোরা—
খুঁজছি দিনের লাখ তালিম—
কই সিরাতুল মুস্তাকিম?
কই কোরানের অগ্নি–বাণী,

www.pathagar.com

কই শাহাদৎ-কদরদানী,
কই জেহাদী জোশ-জোয়ানী
সব হিয়া যে তুষার হিম !
চাই সিরাতুল মুস্তাকিম !

ঊষার আশায় রাত জেগেছি—
আগ-জ্বালোয়া কই ফজর ?
ঘোর জাহেলী জুলমাতে যে,
রুখছে আজো আঁখ-নজর।
আজ হেরিছি বিশ্ব-ভর—
সব রাতই হায় রূপজীবীনী—
কই সালাতী শব-কদর ?

যুগ-শতাব্দী পার হয়ে যায়—
কই সে আলীর জুলফিকার ?
কুফর কালো দুষমনী যে—
এক লহমায় দেয় সাবাড়।

জঙ্গে বদর ময়দানে ভাই
কোরবানীর কই রংখেলা
আল্লা নামের সিংহনাদে
কই জাগে আজ জ্বেলজ্বেলা ?

তৌহিদী সে কই রে কুয়ৎ
কই সে বাজু-বক্ষপাট—
দুর্গ হতে নেয় যে ছিঁড়ে
লৌহ গড়া জোড় কপাট।

আজকে শুধু কথার নাট
আজকে শুধু মিথ্যা ঠাট—
আমলবিহীন ইমানদারীর
চলছে বেচা-কেনার হাট।

আজকে শুধু দৃষ্টি-নাশা
বৃষ্টি-ভাসা বজ্র-পাত,
আমান কেহ পায় না তাতে—
ঈমান শুধু হয় নিপাত—
নিত্য দিবা—নিত্য রাত।

www.pathagar.com

জিল্লতির এই কিল্লা হতে
আল্লা তুমি দাও নাজাত।
মৃত্যুজয়ী হিম্মতি সব
উম্মতেরা কই নবীর—
খোদার নামে ঢালতো যারা—
অশ্রু নহে-রক্ত-নীর।
আজকে সেরা কই সে বীর?
সাচ্চা জোয়ান মর্দমীর—
বিশ্বে যাদের নাই নজীর—
লক্ষ লোভের বক্ষ দলি—
রইত যারা উচ্চ শির—
আজ লুকালো কই সে বীর?
হায় রে বেদন দুর্গতির—
ঐক্য রশি ছিন্ন করি—
ভুললো তারা তীর্থ-তীর।
হাজার ভাগে ভাগ হলো রে
দ্বীন কওমের এক শিবির।
স্বর্গ-লোভের উস্কানিতে—
দলাদলির জমলো ভিড়—
বিষ-নিবিড়—
ভেদ-নীতির।
দের হলো না দীর্ঘ দিনের—
ফললো ফসল গোস্তাখির;
সস্তা লাভের খাস্তা পথে
আনলো বরাত পস্তানির—
ছন্নছাড়া মস্তানির।
এই পথ-হারানো গোমরাহীর
শেষ হয়ে যাক অন্ধরাত—
সত্য-নূরের এক ঝলকে
এক নিমেষে অকস্মাৎ—
আল্লাহ্ তুমি দাও নাজাত।

সবক নিছি আজকে মোরা
মুনাফেকির মন্তেকে—

www.pathagar.com

সরল পথও এক নিমেষে
যেথায় এসে যায় বেঁকে—
বিদায় দিছি ঈমানদারীর
সকল নীতি মন থেকে।
মুমিন নামের গর্ব করি
কমিন মোরা নই সে-কে ?
কাবার সাথে লাত-মানাতের
দীলের কোলে দেই রেখে,
লাভের লোভে মিথ্যাচারীর
জয়-ধ্বনি যাই হেঁকে—
ধন দেখে—
সবক নিছি আজকে মোরা—
মুনাফেকির মুস্তেকে।

নাস্তিকতার যৌক্তিকতার
তর্কজালের জ্বালছি ধূপ—
ভাবছি তবু স্রষ্টা আজো
চিনছে না মোর খাস স্বরূপ।
খোদার নহে—আপনা পথে
এমনি যখন খুঁড়ছি কূপ—
সাবের তিনি—দীর্ঘ দিবস
রহেন বসে নীরব চুপ।
ধ্বংস-নীতির সংশোধনে
এমনি তিনি দেন সময়—
পাপ-কুফরের শেষ সীমাতে
আনেন শুধু প্রলয়-লয়।

আজ হুঁশিয়ার মাখলুকাত
সেদিন বুঝি নাই তফাৎ
জহর-নিঠুর কহর রোষের
জুলমাতী সেই তেলেসমাৎ—
নামার আগে অকস্মাৎ
খুঁজছি নূরের রশ্মিপাত—
খুঁজছি আলোর নও প্রভাত—
মুনাজাতে তুলছি হাত—
আল্লাহ্ তুমি দাও নাজাত।

www.pathagar.com

খুনেলা আঁসু

অনেক কেঁদেছি অনেক সেধেছি—
বুকে জমা বহু বেদনা-তাপ—
যদি করে থাকি কোনো কিছু ভুল—
বন্ধু আমারে করিও মাফ।

আমার নবীর—আমার হাদীস
শুনিয়াছি বহু কালাম-কৌল—
তাঁরি নায়েবীর দাবীদার যারা—
তাঁর পথ-সাথে তাদের তৌল
করেছি যখনি—হেরেছি সভয়ে
জমি-আসমান ফারাক-ভেদ—
মতে-পথে আর ঈমানে-আমলে
তার নামে আছে বেবাহা ছেদ।
পারিনি সহিতে সে-চোট আঘাত—
ভেঙেছে ব্যথায় আঁসুর বাঁধ—
কণ্ঠ ঠেলিয়া উঠেছে তখন
জীগর-বিদারী আর্তনাদ।

আমার কওমী সিয়াসী নেতারা
দেশের দরদে আঁসুর ঢল—
দেখেছি ঢেলেছে সভা-মহফিলে—
আমরা সে-ঢলে হয়েছি তল।
ওজারতি আর কালো তেজারতি—
আমাদেরই ভোটে মিলেছে যেই—
তাহাদের সেই নয়া জান্নাতে—
ধারে-পাশে কেহ আমরা নেই।
ভাতে-মরা যত আমরা পেয়েছি—
সোনা নহে-লোনা আঁখির জল
আমাদেরই খুনে উঠেছে তাদের
খুন-লালী কুঠি সাত-মহল।
অনেক কেঁদেছি—অনেক সেধেছি—
বুকে জমা বহু বেদনা তাপ—
যদি করে থাকি কোনো কিছু ভুল
বন্ধু আমারে করিও মাফ।

www.pathagar.com

রোজার দিনে

আজকে আমার রোজার মাহে ভোজের খোঁজে দিন কাটে—
সোয়াব লাভের খোয়াব দেখি রোজ-রোজানা আঁখ ভরি—
বছর জুড়ি রিক্ত-ভুড়ি লুটছে যারা পথ-ঘাটে—
শূন্য পেটের পুণ্য হাটে পণ্য যাদের এক কড়ি,
ধিক মাখানো উঞ্ছ ভিখে কাটলো যাদের জিন্দেগী—
অর্ধ-মুঠি ক্ষুদ বা রুটি তাও জোটে না হর দিনে,
নিত্য রোজা রাখছে তারা—ভাবছি মনে তাই দেখি—
স্বর্গ-লোকের অর্ঘ্য বুঝি হেলায় তারাই নেয় কিনে।
হায় রে আমার এই ফাঁকি—
ধোঁকাবাজীর ধূর্ত খেলা রাখবো কতো আর ঢাকি।

বছর ভরি করছি চুরি—তেজারতির খোশ নামে—
হালাল রুজির দালাল সাজি লুটছি নাফা চৌগুনা,
তঙ্কা দামের লঙ্কা বেচি চার রুপেয়া সের দামে—
লাভের দাহে লাখ ভুখারে করছি আমি রোজ ভুনা।
উচ্চ পদের পুচ্ছ পরা দেশ-সমাজে সের্গেনা—
আমার দাপে বিশ্ব কাঁপে—মোর কলমের এক টানে,
এক নিমেষে বিন আয়াসে রাজ্য-রাণী যায় কেনা—
বখরা আধা দিলেই হলো শুধু আমার সম্মানে।
সেই আমারি গৌরবে—
দেশ ভরে যার দশটি টাকার সাখাওতির সৌরভে।

পেট ফাটানো সেহরী এবং রং-রসালো ইফতারী
ফজর-শামে নজর মেলে ভক্তজনার দৌলতে—
লম্বা দাড়ির দণ্ড-ধারী তবু আমার মুখ ভারী,
নাই যদিও রোজার বালাই—হাজার জনার চোখ হতে।
রোজ লুকায়ে লাঞ্চ খাওয়া সে কতই ফেসাদ লাঞ্ছনা—
খোশনামীরো দাম আছে তো—যদিও দেশের মূর্খরা
নব্য ধরার সভ্য নীতির খোঁজ রাখে না এক কথা—
তবুও তাদের মিথ্যা সাধের সামনে কেন দেই ধরা।
সাজতেই হবে মোত্তাকী
যেয়ছা দেশের তেয়ছা নীতি—রোজ সেখানে দাও ফাঁকি।

কওমী নেতার স্তুতির গীতি কান করেছে ঝাল-পালা—
অমুক তিনি তমুক ত্যাগে নিত্য দিয়ে প্রাণ লুটি,

www.pathagar.com

আনলো বলে দুখীর লাগি রাজ্য রাজের জয়-মালা—
যদিও তাহার নাই নিশানা। স্বর্ণগড়া রাজ-কুঠি
পর্ণ-বিহীন সেই নেতারি এরই মাঝে যায় মিলি—
ভাগ্য গুণের শ্লাঘ্য কপাল—জোর বরাতের ভোজ বাজী
এটাই শুধু কারণ ইহার। লাগবে তোমার দাঁত-খিলি—
গণতন্ত্রের জয়গাহি
চলছি আমি মনের সুখে শেষ জীবনের পথ বাহি।

পীর-পীরানা দ্বীনের হাদি গুনার ব্যাধি-দোষ খাতা
এলাজ লাগি রহেন জানি জনম ভরি দিন রাতে,
ওয়াজ তাহার খোদার তোয়াজ আর রসুলের গুণ-গাঁথা
নিত্য বহায় অশ্রুধারা লক্ষ লোকের আঁখ পাতে।
দানের গানে মুখর তিনি সদকা-জাকাত দাও নিতি
কাৎরা সমান ফেতরা সে-ও দিতেই হবে নাই ক্ষমা—
খয়রাতি আর সাখাওতীর গাহেন তিনি জয় গীতি ;
দুখীর হাতে তেমন টাকা স্বয়ং কি না দেন জমা—
আল্লামালুম—নাই জানা
আমলবিহীন আলীম-হাদী আজকে কি তাই হয় ফানা?

আসলো আবার সিয়াম রোজা—আসবে খুশীর ঈদ তারো—
কক্ষ-ভরা দৌলতে যার লক্ষ বুকের লউ-মাখা—
সেই ভোজারা রোজার নামে নাম কিনিছে রোজ আরো,
ঈদ তাদেরি ক্ষুৎ-পিপাসীর হৃদ-পিষানো বিষ-আঁকা
চিত্ত-দেহ জ্বলছে দাহে—ধুঁকছে দুখের রৌরবে।
হায় রে আমার দেশের দশের সকল স্তরের যুগ-নেতা—
তোমরা যখন ভাসছো সুখে আতর-গোলাব সৌরভে,
নিঃস্ব-দুখীর কেমনে কাটে নিত্য দুখের দিন হেথা—
ভাবছো কভু?—কও দেখি—
খোদার রাজে রয়না স্থায়ী মিথ্যা সোয়াব যশ মেকি।

তোমরা ও আমরা

আজাদী ঝাণ্ডা তোমরা আকাশে ওড়ালে বুঝি
আমরা হেরেছি উড়িছে আকাশে ঝাঞ্ঝা-কেতু।
তোমরা বলিছ জাতির মুক্তি আনিছ যুঝি
আমরা ডরাই পোল সেরাতির এলো কি সেতু?

www.pathagar.com

তোমরা বানাও হাজার প্রাসাদ জমাও পুঁজি
আমরা ভেবেছি ব্যাপক ক্ষুধার এ খাঁটি হেতু।

বিদেশী জাহাজে তোমরা আনিলে পণ্য বহু,
কহিলে এবার ভরিবে মুলুক ধান্য-ধানে।
অমনি চেলারা গাহে জয় তব মুহুর্মুহু
হেথায় জাতির খাজাঞ্চিখানা প্রমাদ গণে
এরি ফলে জমে তোমার শিরায় বহুর লহু
আমরা লুটি যে মরণের কোলে লক্ষ জনে।

আমরা ফলাই সোনার কমল সবুজ মাঠে—
অবুঝ ক্ষুধায় তবু মরে মোর কন্যা-ছেলে,
তোমার গোলায় মোর সে ফসল নাহি যে আঁটে—
তারি দাবি করি আমরা আজি কি মরছি জেলে।
তোমাদের আজ আনাগোনা চলে ধনের হাটে—
আমরা আজিকে বেঁচে যাই ক্ষুদ্র-কণাটি পেলে।
তোমরা চলেছ তীর্থ-হজ্জে মক্কা-পথে
লাখো তঙ্কায় পুণ্য-ডঙ্কা বাজায়ে জোরে—
আমরা হেথায় উপষে উপষে যক্ষা-রথে
আখেরি বিত্ত কুড়ায়ে নিত্য চলেছি গোরে।
আমাদের আজ বাঁচোয়া নাহি রে অক্কা হতে—
তোমাদের আজ নতুন জন্ম তীর্থ-দোরে।

তোমরা আজিকে উজীর-নাজির শক্তিশালী
আমরা সবাই চাষা-ভুষা—নাই বুদ্ধি ঘটে,—
তোমাদের সবি আমাদের লাগি—কহিছ খালি ;
হালাক করিয়া হালাকুরা আজ দাতাই বটে।
আমাদেরি ভোটে—তোমাদের আজ সোনার থালি
তবু আমাদেরি নাদান বলিয়া কুৎসা রটে।

হাজার-ও-এক রজনীর শাহ-জাদারা শোনো ;—
রাতের মওজ ফুরালো বুঝি বা নাই সে দেরী—
আগাম দিনের আয়েশী আরাম যতই গোনা
নব-মানবতা-জাগানো ঊষার বাজিছে ভেরী—
যুগের জোয়ার শুনিবে না তব বাহানা কোনো
আমাদেরি আজ টুটিছে বুঝিবা চরণ-বেড়ী।

www.pathagar.com

তোমায় জিজ্ঞাসি

আজাদীর খুশীর খবর,
শুনি প্রতি বছরের পর
আসে নাকি আমাদের দেশে—
আনন্দ–আবেশে।

আমরাও কাতারে–কাতারে
সে–দিনের খুশির পাথারে
ছিন্নমুল পানার মতন
ভেসে ভেসে যাই।
পথ হতে ও পথে বেড়াই
মুছি আঁখি–জল,
আগুন–তরল,—
তোমার আদেশে
শূন্যোদর শত ছিন্ন বেশে।

হে সিয়াসি ঝাণ্ডা বরদার,
তবু তব তখত–তরবার
আনে নীতো জিনি
ক্ষুধার আহার
আমাদের লাগি—
মোরা আজ পথে–পথে মাগি
ভিক্ষার তণ্ডুল ;—
হয়েছে ভণ্ডুল
আমাদের যত সাধ–আশা—
প্রাণের গহরে–গড়া
বেদনার ভাষা
তা–ও আজ মানা।
লাঞ্ছনারো আছে তো সীমানা ?
হে সিয়াসী ঝাণ্ডা বরদার,
আছে বেলা—হও হুঁশিয়ার।

শোনো মোর দেশের প্রভুরা,
পিয়া উগ্র ক্ষমতার সুরা
আমাদের গেছ সাফ ভুলি—
সকরুণ ক্ষীণ কণ্ঠ তুলি
যত মোরা কাঁদি—

তেতো জমে অপমান-আঁধি
আমাদের চিদাকাশ জুড়ি।
তোমাদের পিছু পিছু ঘুরি
আজো মোরা তবু—
শোনো ওগো প্রভু
আর দেরী নাই—
প্রলয় দিনের,
তাই গেয়ে যাই—
লক্ষ-পক্ষ সর্বহারা সম্পদ-হীনের
শেষের গীতিকা—
ছন্দে-ছন্দে জ্বালি বহ্নি-শিখা,—
শোনো-শোনো প্রভু—
আজ কার পাপে—
কার লুব্ধ তিক্ত অভিশাপে— ?
আমাদের সোনালী ফসল
আশা-ঝলোমল
সোনার তরণীসহ গেলো আজ ডুবি
কোন ক্রুদ্ধ লোভী—
শান্তির সাগর বুকে
বাড়বাগ্নি জ্বালে ?
প্রভু আজ তোমারে জিজ্ঞাসি—
সে-আজাদী আনে আজ
তব ওষ্ঠে হাসি—
সে কি শুধু যাবে রচি
মোর কণ্ঠে-ফাঁসি—
উপেক্ষার—বুভুক্ষার
লাঞ্ছনার রাশি।
প্রভু আজ তোমায় জিজ্ঞাসি।

জাহান্নাম

ঘায় রে হায়—
চৌদিকে আজ বেড়া আগুন
বলনা রে ভাই যাই কোথায়।

অন্তরেতে তুষের জ্বালা

www.pathagar.com

বুকের ব্যথা স্তব্ধ মূক্
জুলুমেরে কইলে জুলুম
ওপর আলা হন বিমুখ,
এক নিমেষে ফর্সা যত
জিন্দেগানীর স্বপ্ন সুখ।
চোখ খুলিয়া দেখছো তো?
কইছি আমি সাচ্চা বাৎ
কথায় কাজে নাই তফাৎ
শ'য়ের মাঝে একশত—
চোখ খুলিয়া দেখছো তো।

তুচ্ছরে ভাই উচ্চ কহ,
নইলে আছে ভাগ্যে দুখ—
কর্তারা সব ধরবে তখন
বিন কসুরে লক্ষ চুক—

এমনি আজব দেশ মুলুক।
হায় রে হায়—
আর তো না রে যায় সহা—
জাহান জোড়া জাহান্নামে
কারে-ই-বা তা যায় কহা।

যাহার ঘরে শূন্য উনুন
তাহার লাগি নাই কিছু—
যে-জন আছে পিছ্ কাতারে
জনম-ভরা রয় পিছু,
যে পড়েছে পায়ের তলে
ধুলার সাথে রয় নিচু—
এই তো রীত—
হায় রে আমার রক্তে-নাওয়া
স্বাধীনতার মুক্তি-ভিত।

এক মহলার মালিক যারা
সাত মাসে তার সাত তলা
কোত্থেকে ধন আসলো যে তার
সে কথা কি যায় বলা?
পূজারী আজ পূজার ঘরে
নির্বিবাদে খায় কলা।

www.pathagar.com

হায় রে হায়—
লুটের বেলা নাই বিভেদ
কেতাব কিংবা পড়ুক বেদ
রং কালো কি রং ধলা—
শ্মশ্রু-টিকি সেইখানে ভাই
কোলাকুলি এক গলা
মাসতুতো সব ভাইরা মিলি
সেথায় করে এক সলা।

হায় রে হায়—
কারে বা আর যায় কহা!
জাহান-জোড়া জাহান্নামে
আর তো নারে যায় সহা।

ঘর হারাদের ঘরের হদিস
খুঁজবে হেথা কোন পাগল—
পাতাল-পুরীর পাতকুয়াতে
ছিন্ন কাঁথার শয্যা-তল।
তাদের লাগি রয় পাতা—
আরে সে সব নয় যা-তা।
ড্রেন-পচানো খোশ-বু-এ আর
কাদার রঙে রঙ্ উজল—
সে কি সহজ ভাগ্য ফল?

দেশের নেতা খান সাহেবের
সাতটি বাড়ী সাত মহল—
হর কোঠাতে বিজলী বাতি
হর কোঠাতে পানির কল।
একটি শুধু সাহেব-জাদা,
একলা পেলো মহল আধা,
চলা ফেরার তং তবু—
কও তো সহা যায় কভু
কষ্ট এতো জনম ভর?

ছোট লোকের নাইকো ঘর?
যাহার পর—
ঝড়-বাদলে শির পাতে—

ক্ষণিক তরে দিন-রাতে !
তার আর তুমি করবে কি—
                    কও দেখি—
নিছক এ তার বদ আজল !
যায় কি মোছা কপাল-ফল
খাছ কেতাবে বয়ান আছে—
                    আমার কাছে,
যে-জন মানে নসিব লেখা
পরকালে সে-ই সফল।

হায় গো নেতা মস্ত বীর—
তোমার কাছে দস্তগীর !
খুব শিখালে বিশ্ব-প্রেম,—
ত্যাগ-সাধনা চমৎকার !
এমন ত্যাগে অমত কার ?

                    হায় রে হায়—
আর তো নারে যায় সহা—
জাহান-জোড়া জাহান্নামে
আর কারে বা যায় কহা।

করলো যিনি জীবন ভরি
জাতির লাগি জান নেছার—
আজ যদি বা গোপন-পথে
হয়ে-ই থাকে বিত্ত তার—
এমন তাতে যায় কি আসে
কাল বাজারে মাল বেচার—
মেহনতেরো দাম আছে তো
গোপন খালে জল-সেঁচার ?

বুঝবে না কেউ হুনর কত—
কাচ্চা মাথার বাচ্চা যত—
                    লক্ষ শত—
দ্বীনের নামে লোভ-ঢেঁকিতে
তাদের নরম দীল ছেঁচার—
বেকুফরা সব রাখছে তবু
মুখটি করি চিল পেঁচার।

www.pathagar.com

নাদান দলের কাণ্ড দেখো
সেই তারে দেয় নিত্য গাল
ঈর্ষা-বিষে দগ্ধ কিনা—
তাই তো মুখে তিক্ত ঝাল।
তারি সাথে উঠছে হেঁকে
ছোট লোকের সব দালাল—
ভুখার লাগি বিত্ত নেতার
আজ নাকি সব সাফ হালাল।
হায় রে হায়—
শেষ জমানা কলির কাল
আসলো কিনা দেখছি তাই,
মান্য জনের বদ কপাল।
হায় রে হায়—
আর তো নারে যায় সহা—
জাহান-জোড়া জাহান্নামে
কারে বা আর যায় কহা।

ভাইজানেরা জানের মালিক—
মানের কথা দাও ছাড়ি—
খোশ যদি চাও খোশামোদের
দীল-দরিয়ায় দাও পাড়ি—
উঠছে রে তাই ঝড় ভারী—
খুব হুঁশিয়ার নইলে যাবে
জরুর সাথে ঘর-বাড়ী—
তালাক নামার তালপাতা আর
আইন কানুনের তরবারী
এক লহমায় ধরবে তুলি
আছেন যত দরবারী—
উচ্চ কুলে পয়দায়েশ,
লইছে লুটি কায়দা বেশ—
বাইরে তারা সাফ কামানো,
পেটের ভিতর চাপ দাড়ী—
মর্ত-লোকের পাপহারী।
মটকা ভুঁড়ি লাড্ডু শিরে
বোটকা এলেম রয় যে ঘিরে—

www.pathagar.com

পুঁচকে ছোড়া নয়তো রে ভাই,
জ্ঞান গরীমার ভাণ্ডারী—
বুঝলে কিনা—দ্বীন দুনিয়ার
তারাই হলেন কাণ্ডারী—
হায় রে হায়—
কারেই-বা তা যায় কহা,
জাহান-জোড়া জাহান্নামে
আর তো না রে যায় সহা।

ঘাসুর যত ঘাস কাটুয়া
খাসমহলের চর পথে—
চৌধুরী বনে চৌরাতে সব
ভাসুর বৌ-এর বরকতে—
অমনি ওঠে একটি লাফে
শরাফতির পর্বতে।
নাইকো খানা দৌলতানা
এমন যত খান্দানী—
ঘরখানা নাই রইছে তবু
চিলুমচি আর পান-দানী—
সেই ঘরানা সাহেবজাদী,
চাঁদীর শিরীন শরবতে
চৌধুরী সাব আনেন কিনে
শাদীর নামে ঘর-পথে—
অমনি যত গোষ্টি জাত,
খাইতো সাথে পান্তাভাত—
শানকি কিম্বা কলার পাত—
পাততো বসি এক সাথে
দিন রাতে—
দেশ-গাঁয়ের সেই খেশ-কুটুম
আত্মীয় লোক এগানা
হপ্তা নাকি পার হতে সব
বনলো রজীল্ বেগানা—
বললো যে পর-পর হতে।
নইলে যে আর মান থাকে না
শরাফতির স্বর্গতে—

বর্ণ জাতির বর্গতে।
হায় রে হায়—
জাহান-জোড়া জাহান্নামে
বল্ না রে ভাই যাই কোথায়।

নও তারানা

হায় গো আমার পীরজাদা—
আজকে যাব মাল-জাহাজে
যদিও বেচি ঝাল-আদা।

আজাদ দেশে বাধ-বাধনের
আজ নাকি আর নাই বাধা—
বুক বেঁধেছি সেই সাহসে—
কাণ্ড দেখে সবাই হাসে,
ঠোঁটের পাশে—
ভুল হলো কি কও দাদা !
দাও না সবায় কইতে মোরে
বিজ্ঞ কিম্বা সাফ্ গাধা—
আজকে তবু মাল-জাহাজে
বেচতে যাব ঝাল-আদা।

মাফ করিও গোস্তাখি,
কও তো হুজুর কও দেখি—
এই দুনিয়া তোমার লাভের
বড় বাজার পোস্তাকি।
মাফ করিও গোস্তাখি

ভক্ত তোমার সুহৃদ যারা,
খাস পেয়ারা মুরিদ যারা,
যশের যারা উৎস-ধারা,
সবাই দেখি—
ভাগ্য-দেবীর পুত্র যেন
বিত্ত-ভারে রাশ-ভারী—
কেউ বা জরীন পাগড়ী পরা
কেউ বা সেরেফ টাই-ধারী—

www.pathagar.com

কেউ বা হলেন সাফ-কামানো—
কেউ বা রাখেন সাঁই দাড়ী—
মেহদী-রাগে রং-বেরং,
জবরজং—
বেগম কারো একটি শুধু
কারো লাগি চাই চারি—
কেউবা করেন নিত্য-নূতন
প্রেমের পথে পাইচারি।
কেসেম তাদের থাক না যত—
এক ব্যাপারে নাই তফাৎ—
করছে তারা সবাই লাভের
ভাগ্য-জুয়ার কিস্তিমাৎ।

চাকরে কেহ মস্তবড়—
উচ্চপদে অধিষ্ঠান,
খোশামুদির খোশ-বু তেলে
মিলছে বহু বিত্ত-মান।

কাল বাজারে মাল বেচে কেউ
মস্ত-মশহুর সওদাগর—
হর-হামেশা করেন তিনি
হালাল রুজির জোর ফখর।

চাঁদার খাতায় বিত্ত গড়া
কেউবা নামী দেশ-মিতা
ত্যাগের নামে জোরগলাতে
লম্বা ঝাড়েন বক্তৃতা।

সেই তারা—
হায় গো আমার পীরজাদা
তোমার মহল খাশ্ কুঠিতে
আগ কাতারে রয় খাড়া।
ভাগ্য-খোলা সেরেফ সেতো
জুয়ার ছকে দান ফেলা—
ধর্ম-জুয়ার আড্ডাতে কি
জুয়াড়ীদের তাই মেলা?

নজর এবং নেয়াজ মোটা

www.pathagar.com

পায়ের কাছে পেশ করি—
কেউ বা চাহে হুর-পরীদের
কেউ বা ধরার ধন-কড়ি—
কেউ বা চাহে,
হরেক মাহে—
ঘুষ নহে সে-উপরি কিছু
মুঠা-মুঠা হাত ভরি।
হাজার কয়েক পায় নেহাৎ—
কিম্বা পাঁচে পাঁচশো মিলে
রেস খেলাতে অকস্মাৎ—
কিম্বা যদি পার হওয়া যায়
ওজারতির পুল সেরাত—
খোশ বরাত।
তুরান্ত-তোলো খোদার কাছে
মুনাজাতের মুক্ত হাত।

নসিবগুণে ঝড় তুফানে
বনের পথে বক মরে—
অমনি তোমার কেরামতির
চমক জাগে লাখ ঘরে।

দুখের দাহে দগ্ধ-হিয়া
করছে যারা অশ্রুপাত
তোমার দয়ার দরবারেতে
জায়গা তাদের দূর তফাৎ।

আল্লা যারে দেয় না—তারা
চুপ রহো—মৎ যাস্তি বাত—
হুজুর কহো—রইছে মানা
খোদার কাছে হস্তপাত।

মাফ করিও গোস্তাখি—
কওত হুজুর কও দেখি,
যে-দুনিয়ায় দুখির লাগি
নিত্য বেদন রইছে জাগি—
সেথায় শুধু তোমার তরে
স্বর্গ হতে পড়ছে ঝরে—

www.pathagar.com

আতর গোলাব খোশবু ভরা
ইরান–গুলের বুস্তা কি ?
মাফ করিও গোস্তাখি।

আজকে চোখে নাই শরম—
ঘায় গো আমার পীর–জাদা,
সত্যটি আজ পাই পরম—
আজকে চোখে নাই শরম।
কও তো হুজুর কও দেখি—
আজের দিনে সবার লাগি
দীল–জিয়ানো ধর্ম কি ?
জিন্দেগানীর মর্ম কি ?
কও তো দেখি ঠিক কিনা
রূপে এবং রূপেয়াতে
দ্বীন দুনিয়া যায় কিনা।
কথাটি যে ঠিক খাঁটি
তোমায় দেখেই যায় চিনা—
তাই কি না ?
তাইতো তোমার খানকাতে আর
হেরেম প্রাসাদ–অঙ্গনে
বইছে খুবি রূপের জোয়ার
খুনির খুশি রঙ্গনে।
গরীবরা নয়—শরীফ ঘরের
উঁচা দরের—
আনছে নব অঙ্গনা সব
হাজার রঙে রঙ্গিলা—
কেউ বা আনে মস্ত পায়ে
কেউ বা নাচের ভঙ্গীলা,
কেউ কুমারী কেউ বা নয়া
নও জোয়ানী বেগম সাব—
পড়ছে যেন পেয়ালা ছাপি
আঙুর গলা লাল শরাব—
কণ্ঠে বাজে মিষ্টি সুরের
সারেঙ্গী আর বীণ–রবাব।

www.pathagar.com

হায় যেন—
চাঁদনী রাতের জ্যোৎস্না-গড়া
তন্দ্রা-জড়া মধুর খাব—
খোশ-বু-উতল গুল গোলাব।
নও-জামানার বেগম সাব।

বাড়ীর বুকে পর্দা কড়া—
দ্বীনের শরা—
সাধ্য কি তার পাও দেখা।
চাও একা?
ময়দানে কি শা-বাগে যাও
কিম্বা নতুন বাজারে—
দেখবে সেথা বেগম কত
হাস্য এবং লাস্য-রত
ঘোমটা খোলা
বক্ষ তোলা—
একলা মাতায় হাজারে—
খেলার মাঠে—রেস্তোরাঁতে—
রেস-গ্যালারী মার্কারে—
একলা মাতায় হাজারে।

পরীর মতো রূপের বাহার—
জরীর শাড়ী—ঢেউ-তোলা,
তুলছে তাহার শরীর ঘিরি
রসাল রূপের হিন্দোলা;
তারে কি আর জায় ভোলা?
ফাগুন রাতের ফুল-দোলাতে
মনের কূলে দেয় দোলা।
সেই তারা—
সুখের ডালে নীড় বাঁধা;
কও গো আমার পীরজাদা—
তোমার গোপন হুজরাতে যায়
কোন বাতেনী মুজরাতে—
কোন ঝামেলা গুজরাতে,
এই রাতে?
পর-কালের পায় না মাগি,
একলা জাগি—

www.pathagar.com

সুরত জামাল নওল পীরের
ধরতে বুঝি পাও–হাতে ?
শিখতে বুঝি জ্ঞান–কথা—
তত্ত্ব–লোকের নিগূঢ় বাণী ?
খোদার নামে প্রেম–হতা।

আস্তে যখন পাওটি টিপে
হাতটি বুঝি খুব নরম ?
ঠোঁটটি বুঝি লাল–গরম ?

আজকে চোখে নাই শরম—
হায় গো আমার পীরজাদা—
রূপের পায়ে ;
উপড়ে তারে আনবে টানি
সবল আমার হস্ত–খানি—
দেখবো আঁধা রয়কি সেথা
লক্ষ নটীর অশ্রু–পাত—
কইছি তোমায় সাচ্চা বাৎ।

ঘায় গো আমার পীরজাদা—
আজকে এলাম মাল–জাহাজে
যদি বেচি ঝাল–আদা
ভুল হলো কি ?—কও দাদা।
দাওনা সবাই কইতে মোরে
বিজ্ঞ কিম্বা সাফ গাধা।
আজকে তবু মাল–জাহাজে—
বেচতে এলাম ঝাল–আদা।

বাতেনী এলেম

আঁধার রাত্রির যাত্রী আজো চোখে দ্বিধার কুয়াশা
রাত নাকি হলো শেষ—তবু মনে আলেয়ার ভাষা
এখনো দিতেছে উঁকি,
এখনো মনের কোণে নিরাশা দু–মুখী
তোলে তার মাথা।

www.pathagar.com

তোমরা উপরে বসি ভাগ্যের বিধাতা
হাসো মিটি-মিটি—
এখানে নিতেছে কাড়ি মোর মাটি-ভীটা
তোমার চরেরা,
আইন আর কানুনের উঁচা-উঁচা বেড়া,
যাদের সুযোগ আর সুবিধার লাগি
ঘুমহীন কতো নিশি জাগি
তোমরা বানালে—
তারি বেড়াজালে
আমাদের রাখিছো ঘেরিয়া
মিঠা-মিঠা ছলনার স্তোক-বাণী দিয়া
যুগ-যুগ ধরি।
রোগ আর উপবাসে যত মোরা মরি
ততো নাকি বেশী
স্বয়ং বিধাতা নিজে হবে প্রতিবেশী
আমাদের সনে
সদাই উঠিতে চায় জানুর পাহাড়ে,
রেশমী বনাতে গড়া চোগাখানি কালো
সোনালী বুটির কাজে "খুবী" জাগে ভালো
ছ-হাত লেজুড় জোড়া সবুজ পাগড়ী
মাটীর টীবির তীরে যেন উঁচা গিরি ;
সে সবে মিলিয়া
বনেদী রুচির চাম ছিলিয়া-ছিলিয়া
আজ যে মুখে নাই বাধা,
হানবো আঘাত শেষ চরম
সত্যটি আজ চাই পরম—
আজকে চোখে নাই শরম।

কওনা হুজুর কওনা গো—
এই কি তোমার রাহে নাজাত ?
এই সেরাতুল মুস্তাকিম ?
খোদার নামে জোচ্চুরিতে
দীল করেছ পাষাণ হীম ?

আর দেরী নয়—দিন ফুরালো
আসছে এবার রাত্রি কালো—

www.pathagar.com

আপনা রচা জাহান্নামে
হও না এবার রওনা গো !
সামনা হতে যাও ভাগো।

আর সহে না ভণ্ডামী—
উশুল কড়া-গণ্ডাকি
হইবে না?
এই ভেবেছ অন্তরে?
ওই দেখ না হাওয়ায়-হাওয়ায়
তোমার মউৎ সন্তরে।
যাইবে কই?
আকাশ হতে পাতাল জোড়া
গড়ছি মোরা পেশীর মই—
যাইবে কই?
গড়ছি এবার জীগর পেশা
অশ্রু-মেশা—
আচ্ছা খাশা লহুর দই—
ভাবছি বুকে পরম সুখে
ক্ষুধায় ভুলে
কলজে-জোড়া খুনের খই;
নাও খেয়ে আজ এই খানা
যাইবে কই?
কওতো দোস্ত—
জনম ভরা আমার ঘরে
খাইলে কত পোলাও-গোশত—
আজকে বুঝি ভাবছো মনে—
সঙ্গোপনে—
সুযোগ বুঝে পড়বে সরে
নাও নিয়ে মোর এই দাওয়াৎ;
হায় গো দোস্ত—
কইছি তোমায় সাচ্চা বাৎ—
বিনা মেঘের বজ্র সম
আচম্বিতে অকস্মাৎ—
পড়বো মোরা তোমার শিরে—
নখের ডগায় আনবো ছিঁড়ে

www.pathagar.com

আস্তে-ধীরে
আমাদেরি রক্তে জমাট
চওড়া তোমার বক্ষ-পাত—
কইছি তোমায় সাচ্চা বাৎ।

দেখবো চাহি কলজেখানা
তিক্ত কিম্বা মিষ্টিপানা—
জহর দানা।

*   *   *

ধরবো চাপি তোমার টুটি
দেখবো কেমন উঠছে ফুটি
নয়ন দুটি—
কুটিল কামের কৃষ্ণ ছায়া
ঘুরত যাহা ডাইনে বাঁয়ে
গোপন নায়ে—
রচিবে লেবাস কিনা আমাদের লাগি—
সে কথা ভাবিয়া সদা রহি রাত জাগি।
অথবা সহসা—সে নহে দুরাশা,
স্বর্গের দর্জির রাজা লইবে কাড়িয়া—
ভরম ছাড়িয়া
বিশাল গাউনখানি সাদা ধব্-ধবে্—
বিনয়ে গৌরবে
পড়েছে লুটায়ে নীচে টাখ্‌লু অবধি—
যেন রে বহিয়া যায় প্রেমগলা নদী—
তনুরে ঘেরিয়া।
তারেও বেড়িয়া
ক্রুসের লকেটখানি রবে বুকে ঝুলি
বিরহ-নিশ্বাস—বায়ে খনে খনে দুলি।

*   *   *

অথবা রাধিকা আর কানু-নাম ছাপা—
প্রমাণ সাইজে যাহা তিন হাত মাপা
নামাবলীখানি,
আমরা সেথায় দিব সর্ব অঙ্গে টানি
সলাজে-সহাসে,
সারাটা ললাটে আর ঋজু নাসা পাশে

www.pathagar.com

রবে আরো আঁকা
অগোনা তিলক লেখা সোজা আর বাঁকা।

কিছু নাই জানা—
তাই তো মনের মাঝে জাগিছে দোটানা
কোন পথ ধরি—
সময় থাকিতে ভাই নিতে হবে ভরি
পুণ্যের থলেতে !
নহিলে স্বর্গের দ্বারে মুক হবে থেতো—
মিলিবে না জা'গা
মরিয়া শেষের কালে পাবো নাকি দাগা—
বেকুফ এমনি
আমারে পেয়েছো বুঝি ? ধর্মের বিপনি
আনাচে-কানাচে পথে যেথা সারি-সারি
লয়ে টিকি-দাড়ি
অথবা সফেদ কালো—
ক্রুশ রকমারী
রহিয়াছে খাড়া—
স্বর্গের সিঁড়ির ছাড়-পত্র দেয় যারা
তাহারা থাকিতে
বুদ্ধির ফাঁকিতে
তোমার রিজার্ভ করা স্বর্গাসনখানি
দিব ফেলে টানি ?

*　　*　　*

বহু ভাবি ভাবি
মগজী তেজের চোটে খেয়ে খেয়ে খাবি
অতি অবশেষে
বাহির করেছি ভাই কোন বাস-বেশে
দিবো যে লাগায়ে তাক সারা স্বর্গাদেশে
অকস্মাৎ এসে।
ভাবিয়াছি মনে—
তোমারে কহিছি ভাই অতি সে গোপনে—
ভাবিয়াছি মনে ;
সকল জাতের বেশ-ভুষা জারি-জুরি
রাঁধিব ওমদা নয়া পোষাকী খিচুড়ি

www.pathagar.com

রহিবে টিকিটি জুড়ি নেড়ামাথা আধা
ডগাটি রহিবে তার রিং করি বাঁধা
দাড়ীর ঝাড়েতে দিব হেনাপাতা বাটা
গোঁফটি রাখিব সাতে ছোট করি ছাটা,
আর
কদ হবে নাটা,
তাহারে ঘেরিয়া রবে চোগাখা আটা
থোড়া থোড়া ফাটা
তাহারো উপরে দিব বন নামাবাটা
গলাতে ঝুলায়ে নেব ক্রুসের মাদুলী—
সিকি কি আধুলি
খবর করিয়া নিব তিলক ললাট
পাজামা দেখিয়া নিব কেবা তা আটে
পুণের এ হাটে
আমার সহিতে।

* * *

কহিতে কহিতে
এলো জোশ মনে
কি কথা কহিতে যাইয়া কি কহি এখনে
ঠিক নাই কিছু—
শেষে কি তোমরা সবে মোরা পিছু পিছু
চলিবে স্বর্গের লাগি জরু–গরু।
অতএব—
বাতেনী এলেমে মোর ভরি দুই জেব
দেই গাঙ পাড়ি—
তোমাদেরে ছাড়ি।

www.pathagar.com

হেমন্তিকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঊষায়

রাত্রি ভোর—শুনেছি আহ্বান
শুনিতেছি দিবসের ডাক—
পাখার ঝাপটে কাঁপে সীমান্ত নিশার তরু-শাখা।
জমাট মুহূর্তগুলি ঘুমন্ত তিমির তলে যেথা হলো ক্ষয়,
ঊষার আলোর ফলা উদয় তোরণ ভেদি সেথা জ্যোতির্ময়
আনিলো যে আশা
জাগর জীবনময়ী মুখরিত ভাষা
কাকলি-কূজন
কানন কান্তার আর নব পুষ্প-বন
সে-গীতি আলোক-সুরে হলো যে চঞ্চল
মেলি বৃন্তদল—
শ্যামল পাতায়-গড়া লুলিত অঞ্চল
দুলায়ে দুলায়ে।
নভ-পটে মায়া-তুলি সহসা বুলায়ে
মাধুরী রঞ্জন রাগে আঁখিরে ভুলায়ে
লাজ-রাঙা উর্বষীর সিঁথির সিঁদুর—
পূর্বাশার ক্ষণ স্বর্গ-পুর
করিল রঙিন
রাত্রির আঁধার-পটে এই দীপ্ত দিন
আঁকিলো কে কবি?
হৃদয়-মাধুরী-ঢালা ধ্যান-মুগ্ধ ছবি—
এ কোন শিল্পীর—
কোন্ গীতি কবিতার নব ছান্দসীর
এই নব সুর
ঊষার উদয়-লগ্ন করিল বিধূর—
হৃদয়-আনন্দ-গলা রূপ-ছন্দ দিয়া;
জানি না সে কথা—
তবু মোর রূপ-সুধা-পিপাসিত হিয়া
সেই চির-সুন্দরের বাণী-হীন গানে—
একা আন্‌মনে
দিগন্তে দিগন্তে ঘুরি ফিরিছে সন্ধানে
কোথা মেলে তারে;
কোন্ দূরে কল্প লোকে—কোন্ সিন্ধু পারে।
পায়নি সে খুঁজি—
যে-ঐশ্বর্য অন্তরের পুঁজি

www.pathagar.com

মিলিবে না তারে কভু নভ-সিন্ধু-অঙ্গনে-অঙ্গনে
সে যে গুপ্ত তব সুপ্ত মনে।
হে অশান্ত চিত্ত মোর
ছিন্ন করো বন্ধ আঁখি-ডোর—
অমনি তাহারে
তব পর্ণ কুটীরের ব্যথা-দীর্ণ দ্বারে
দেখিবে সে জানি
রয়েছে তৃষিত তব অন্তরের লাগি
দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
তোমারি মর্মের গূঢ় মণিকা-কোঠায়
সুন্দরের আনন্দের ঐশ্বর্য্য সম্ভার
আসে বারম্বার।
লও তারে চিনি—
অন্তর-অম্বর ছাপি রূপ-মন্দাকিনী
নামিবে তখনি।
আসে যদি উষার আহবান
তোমারি প্রেমের সুরে রচা গীতি-গান
দিও তারে দান।

মানুষ মরাল

আষাঢ়-কালো মেঘের মাদল ঐ দিলে রে ডাক—
আমার-মনের মরাল রে ভাই আজ মেলেছে পাখ্।
দখিন সাগর আজকে উচাটন—
কোন্ বিরহির আঁখির মায়া কাড়লো রে তার মন ;
কোন্ পিতমের কায়ার ছায়া হিয়ার মুকুর পর
সজল ব্যথার কাজল রাগে কাঁপছে থরোথর,
ঝুরছে ঝরোঝর।
তারি বুঝি কান্না কলরোল
মৌসুমি ঐ হাওয়ায়-হাওয়ায় আজ খেতেছে দোল
উতল উতরোল!
সেই দোলাতে বোল্ পেল কি সদ্য মুখর-বাক
ঐ শঙ্খ নদীর শাঁখ—
শুনেছি তার ডাক।
আমার-মনের মরাল রে ভাই মেলেছে তাই পাখ্॥
অশ্রু-জলের মানস-সরোবর
কোন্ অচলের আঁচল-কোথা বাঁধলো রে তার ঘর—

www.pathagar.com

নিথর চরাচর
হাজার ব্যথার তুহীন–ভারে জমাট তাহার জল,
অথই দুখে পায়নি খুঁজে তল ;
যুগ–যুগান্ত রইল ডুবে মৌন তপস্যায়
ধবল–শিখর গৌরী–গিরির ছায়—
আজকে বুঝি নীলার নিমন্ত্রণ
নীলাঞ্জনা মেঘের–পাখে,
বজ্র–হাঁকে—
বাজ–বিজুলী চপল আঁখে,
নীরব তারো স্তব্ধ বুকে আনলো আলোড়ন—
আনলো–পাগল ভগ্ন–আগল মুক্তি–জাগরণ
মৃত্যু–জয়ের পণ,
আনলো নূতন জীবন–সাড়া প্রাণের গুঞ্জরণ—
সৃষ্টি আবাহন ;
অথই পেলো তল—
জাগলো চরা বক্ষে তারি যে–ছিল অতল।
জাগলো নূতন পাঁক,
রক্ত–কমল মেল্লো ফুলের আঁখ ;
শুনেছি তার ডাক—
আমার–মনের মরাল আজ মেলেছে ভাই পাখ্।
আজ টুটেছে পাগলা–ঝোরার দ্বার—
তুহীন–গলা বন্যাজলে আজ ভেঙেছে পাড়—
ঐ গঙ্গা–যমুনার ;
মোর চিত্ত–মোহনার ;
অন্ধকারের বন্ধ ঘরে ছন্দহারা জল
সিন্ধু–বুকের ডাক শুনি কি আজ হলো উচ্ছল—
নৃত্য–টলোমল ?
গো–মুখীর ঐ লক্ষ মুখে নামলো কি রে ঢল—
করবে জগৎ তল ?
আন্দন–চঞ্চল !
মাতাল–চিতে পাতাল–ধরা আজ হলো উন্মুখ—
দেখবে সে যে আপন চোখে আকাশ–নীলের মুখ ;
আর নহে রে সুপ্তি–মোহের সুখ ;
আর নহে রে বন্দী–শালার দুখ,
আজকে সে যে ভাঙবে শিকল–পাশ—
দলবে পায়ে ধ্বংস–ভয়াল সকল সর্বনাশ ;
ভাঙবে হেসে সকল বাধার ব্যথার দুর্বিপাক—
মানবে না আর মিথ্যা–ফাঁকির ফাঁক—

www.pathagar.com

তার—শূন্য-উদর হাঁক।
শুনেছি তার ডাক—
আমার মনের মরাল রে ভাই মেলেছে আজ পাখ্।।
নভাঙ্গনে ঝড়ো হাওয়ার পাল—
কাদায়-ঘেরা নদীর কোলে ঢেউ-দোলা উত্তাল,
আজ, ভাঙলো তরীর হাল :—
নোঙর-ভাঙা নৌকা ঘিরে নৃত্যে মাতে আজ
ঘূর্ণি-পাগল ঝঞ্ঝা-উতল বাজ।
মুক্তি-মদির মত্ত জলের মাদল-পাখোয়াজ—
বক্র স্রোতের চক্র রচি গর্জে ঘোর আওয়াজ,—
নেইকো কোন লাজ ;—
আজকে তাহার উলঙ্গিনী মাতঙ্গিনী সাজ,
নেইকো কোন লাজ ;
স্তব্ধ অচল-আয়তনের মুক্তি-অভিষেক—
বজ্র-ঝড়ে আজ পেয়েছে বেগ,
আকাশ-গাঙে বেড়ায় উড়ে, বল্গা-হারা মেঘ—
তীব্র-গতি-বেগ ;
তারি ঝঞ্ঝা-রথ
দেখায় সুদূর দিগন্তরের নিরুদ্দেশের পথ—
দোলায় বনের শাখ,
ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয়, অচিন নদীর বাঁক ;
শুনেছি তার ডাক—
আমার-মানস-মরাল ও ভাই মেলেছে আজ পাখ।

চির পথ

মরুভূর বুকে নয়া ওয়েসিস জাগিল আজ
দিছে হাত ছানি তারি মঞ্জিল পথের বাঁক ;
রাত হলো শেষ—মিনারে মিনারে শোনো আওয়াজ
শোনো রাহাগীর ঘুম-জাগা উট পাখীর ডাক।

চারিদিকে শুধু রূপালী সফেদ বালু-সাগর
সীমা নাই তার দূর দিগন্তে যেদিক চাও
তারি মাঝে জাগে খেজুর-কুঞ্জ সবুজ চর
মেলি বাহু তার নীলা আসমান যেথা উধাও।
জারো বছর পুরানো লুয়েরা ঘুমায় আজ—
ম হেথা ভুলে গেছে তার ঝঞ্ঝা নাচ,
-ধুম-ফণা বিষের তুফান প্রলয়-বাজ

www.pathagar.com

আজ সবে হেথা ঝিমায় নীরবে রুদ্ধশাস।

আবে-জম্‌জম্‌ নূতন করিয়া জাগিছে ভাই
ঊষর মরুর গোপন বুকের আঁসু সজল—
বেদুঈন বালা পেয়েছে খুঁজিয়া নূতন ঠাঁই
তাহারি পরশে বাসের কুঁড়িরা মেলিছে দল।

অজানা দেশের কতনা কাফেলা সন্ধ্যা-সাঁঝ
এখানে ফেলেছে মুসাফের-তাঁবু খেজুর-ছায়,
রাতের আকাশে ছড়ানো হাজার তারা নিলাজ
রয় হেথা চেয়ে মরু-কুমারীর এলানো গায়।

শহর-জাদীরা রেখেছে বাঁধিয়া তোমার মন
মাটির প্রেমের শহদ সুরায় তুমি বিভোর,
তবু শোনো ঐ ডাকিছে তোমারে পথ-পবন
ডাকিছে তোমারে গতিবেগ ভরা ঝড়ের শোর।
ফুরায়েছে রাত—ছিঁড়ে ফেলো আজ ঘুম-শিকল,
আঁধারের নয়—আজ খোঁজো নয়া ঊষার পথ—
বাঁধন মোহের যত সে বাধারে করো বিকল,
অচেনা দূরের হবে তুমি সাথী—লও শপথ।

নয়া ওয়েসিস—নূতন দ্বীপেরা তোমারে চায়,
তোমার কাফেলা কিশতি বহর চালাও ফের—
দিক-সীমাহীন সাগর মরুর উধাও ছায়
খুঁজে নেও আজ সন্ধান তব চির পথের।

হে কাফেলা চলো

দীঘল পথের এখনো যে বাকী, কাফেলা চলো—
শেষ মঞ্জেল এখনো দিঠিতে দেয়নি ধরা,
পেছনে যে আছে ভুলে যাও আজ কি তার হলো,
আগামী দিনের গহনে বাড়াও চরণ ত্বরা।

আজিকার দিন বেদনা-তীক্ষ্ণ কাঁটায় ভরা
পথে পথে তার লাখো ভুল-ছাওয়া পিছল কাদা—
এখানে রয়েছে কঠোর ক্লান্তি মৃত্যু-জরা,
পদে পদে হেথা রয়েছে লুকায়ে অজানা বাধা।
জীবন নহে তো শুধুই সুরেলা কণ্ঠ-সাধা
এখানে অনেক কাঁদন-ঝরানো বেদনা জাগে—
এখানে অনেক ভগ্ন বুকের ভুলের ধাঁধা,—
প্রাণের বদলে এখানে অনেকে মরণ মাগে।

www.pathagar.com

এখানে নিত্য জটিল লোভের জটলা লাগে,
কুটিল স্বার্থে এখানে দানবী জঠর জ্বালা—
এখানে অর্বাচিনের জ্যাঠামী সবার আগে,
জ্যেষ্ঠরা পায় এখানে জ্যৈষ্ঠ-দহন-মালা।

বিজয়ের শেষে বিজয়ীরও হেথা মৃত্যু-পালা,
উদয় ঊষার ওপারে অস্ত গোধূলী নামে—
শত গৌরব সৌরভ হেথা বিলয়-ঢালা
পতনোত্থান এখানে নিত্য ডাইনে-বামে।

তবু তো আমরা মাগিছি জীবন উচ্চ দামে—
ক্ষণিকার বুকে চির অনন্ত দিবে কি ধরা?
নব প্রভাতের দেখি যে স্বপন নিশীথ-বামে,
নব-জাতকেরা নেয় কি জিনিয়া মৃত্যু-জরা?
ফাগুন ফুরালে এখনো তো নামে আগুন-খরা
মাধবী ধরণী সাজে যে তখন বিধবা বেশে,
ফুলরাণী কেহ হয় না সেদিন স্বয়ম্বরা—
কমল তড়াগে মরালেরা কেহ চলে না ভেসে।

জীবন-মৃত্যু ভাটা আর স্রোত এখানে এসে
দিবস-রাত্রি আলো-আঁধারের চিত্র-ছায়ে,
অনাদি অসীম কাল-বারিধির বক্ষে মেশে—
চির গতিময় বিশ্বলোকের সৃজন নায়ে।

হে কাফেলা, চলো চির এ স্রোতের উতলা বায়ে,
রাতের নেকাব গিয়াছে সরিয়া ঊষা যে ডাকে—
উদয়-পথের এলো নবারুণ গোপন পায়ে,
সুদূর তোমারে হাতছানি দেয় অচেনা বাঁকে।

পথিক

অনেক তমসা পারায়ে এসেছি এখানে আজ,
এখন তিমির প্রাক্-প্রাভাতিক নিবিড়তর—
ওরে হিয়া মোর, হারায়ো না দিশা পথের মাঝ,
জাগিতেছে ঊষা আঁধার বিদারি গগন-পর।
শোন নহে নহে তোমার সূর্য বিনশ্বর,
চির-প্রদীপ্ত আলোর শিখা সে বিশ্বময়—
হতেছে বিলয় নিরাশা-নিকষ ঝঞ্ঝা ঝড়,
হেরো দিগন্তে জাগে ভাস্বর চির-অভয়।

উদয়ের বুকে নীল-লোহিতের সমন্বয়—
এ নহে মৃত্যু-হত্যা-ক্ষরিত রুধির পাত,
লাখো শহীদের শাহানা ঈদের গাহি বিজয়
এ যে আসিতেছে নব জীবনের রাঙা প্রভাত।

বহু বেদনার কন্টক ঘেরা সর্প-রাত
অজানা-গোপন বিষ-দংশন দিবে না আর,
হীন বিশ্বাস-ঘাতকেরা আসি অকস্মাৎ
হানিবে না আর নিঠুর মৃত্যু বারম্বার।

মুক্ত আলোর অবাধ পথের তোরণ-দ্বার
খুলে গেছে আজ চক্রবালের বাঁকা রেখায়
টুটিয়াছে যত বন্দীশালার শিকল-ভার,
আবার আশার অরুণ-বিভাস ভুবনে ভায়।

এখন তোমার যাত্রা যে শুরু পূর্বাশায়,
এখন অভয়ে সম্মুখ পানে বাড়াও পদ—
এখন জীবন-তীর্থ তোমারে ডাকে সেথায়—
যেথা উল্লাসে নাচে বক্ষের রক্ত-হ্রদ।
এখন নহ তো মিথ্যাচারের বশম্বদ,
অত্যাচারীর ক্রুদ্ধ-ভয়াল রক্ত-আঁখ
এখন তোমার উধাও কামনা করে না রদ্,
তবুও তুমি কি শোন না ঊষার আলোর ডাক?

এখনও চিত্তচরে কি আশার চক্রবাক
তোলে না কুজন মুখরিত করি চক্রবাল—
এখানে অথই নভের নীলে কি মেলে না পাখ—
অজানা পথের পাথারে পাথারে তুলিয়া পাল

নূতন ঊষার আশার সবিতা কামনা-লাল—
শেষের তিমির পারায়ে জাগিছে নভের পর—
ওরে হিয়া মোর দলিয়া দ্বিধার ঊর্ণা-জাল
হও সম্মুখে সম্মুখ-পথে—অগ্রসর।

নূতন দিনে

ঊষা কি জেগেছে? জেগেছে জোহরা সেতারার আঁখি-আলো?
ওরে ঘুমন্ত! তোমারো দেউলে প্রাণ-জ্যোতি জ্বালো জ্বালো।
পূবের তোরণে লালিমা রেখায় জাগে কার রূপ-শিখা—
ঊষসী কি পুনঃ জ্যোতি-গড়া তার মেলিয়াছে অনামিকা?

www.pathagar.com

আকাশ–সায়রে জেগেছে জোয়ার আলো–ঢেউএ দুলি দুলি—
নিশি গেছে চলি শিশিরে কাঁদিয়া ফুল–বুকে ফুলি' ফুলি'।
নূতনের আশা সমীরে সমীরে বন–পথে দিছে দোলা—
ঘাসের মুকুটে হাসে আলো–কণা আঁধারের ব্যথা ভোলা।
বেদনা–বিবশ মূকের আননে আশা–ভরা ভাষা জাগে—
তিমির স্তব্ধ বিহগ ভুবনে কূজনের দোলা লাগে।
জাগে প্রাণ হিন্দোলা—
বন্দী কাফেলা আজ পুনঃ চলো মঞ্জিল দ্বার খোলা।

মোয়াজিন কই—জাগাও জাহান আজানের আহ্‌বানে,
সুবে সাদেকের আলো–সয়লাবে দোলা দাও প্রাণে প্রাণে।
দোলা দাও আজ ঘুমের অতলে—সেথা যারা আছে শুয়ে,
জীবিত–মৃতেরা-চেতনা তাদের যাও তুমি ছুঁয়ে–ছুঁয়ে।
শুনিনি আমরা বেলালের ডাক কত যুগ, গেছি ভুলে,
নব তৌহিদ আজানে আবার জাহানের কূলে–কূলে
তারি জয়বাণী ফুকারি ফুকারি চলো চির উল্লাসে
আবার আনো রে জ্যোতির জোয়ার জীবনের পাশে–পাশে।
আজ মনে পড়ে সে–সুর–মাধুরী–হাজার বছর আগে
কাফ্রি দাসের কণ্ঠে উছলি ঝরেছিল সুধা রাগে
প্রথম যেদিন প্রথম আজান মদিনার মসজিদে—
সে ধ্বনি বাজিল ঝঞ্ঝার বেগে দিকে দিকে চারি ভিতে।
হেরেছি আমরা ভারি শিহরণ জাগে নভ নীলে–নীলে—
জাগে তার দোলা সিন্ধু সুদূরে কত পথ–মঞ্জিলে।
আজ পুনঃ দুনিয়াতে—
হে নব বেলাল। তারি আলোড়ন আনো নব সংঘাতে।
মরু–মদিনার জন্ম লভেছি–মরু ঝঞ্ঝার মত ;
আমাদের তাই গতি দুর্বার দুর্দম অবিরত।
উষার আজানে ঘুমের খিমায় দেই মোরা আগ জ্বালি—
রচি মোরা নব পথের নিশানা কলিজার খুন ঢালি
আরবী–তাজির বল্গাবিহীন অবারিত গতি বেগে
আমাদের জয় অভিযান চলে চিরনির উদ্বেগে।
আমরা চলেছি দুনিয়ার বুকে মুক্তির স্রোত–ধারা,
দিক্‌–দেশ–লীন সিন্ধুর মতো বন্ধন–বাধা–হারা।
মরু–বালুকার তাঞ্জামে আর দরিয়ার দোলনাতে
আমাদের আয়ু বেড়ে বেড়ে যায় দিশাহারা দিনরাতে।
তারি নয়া আহ্‌বানে—
হে নব সালার। ডাক দাও সবে জীবনের জয়গানে।
কতদিন গেলো ভুলে গেছি সব কেনো মোরা আসিয়াছি,

www.pathagar.com

মৃত্যু-বিহীন মরণে রে এতো কেনো ভাল-বাসিয়াছি।
শাহাদৎ-সুধা কণ্ঠ ভরিয়া পান করি বারেবারে,
বারেবারে কেন বিদায় নিয়েছি দুনিয়ার দরবারে।
জীবনেরে মোরা বিলায়ে দিয়েছি একদা সে খেলাছলে,
বারেবারে তাই লুটেছে জীবন আমাদের এ পদতলে।
প্রাণের রাজ্যে বাদশা যে-জন সে-ই প্রাণ দিতে পারে,
তাই নতশিরে নিখিল দুনিয়া কুর্ণিশ করে তারে।
নিহত রাতের রাঙা-খুনে জাগে রাঙারাগ ঊষা-ভালে—
শহীদের লহু জাতির জীগরে জীবনের আলো জ্বালে।
এসো এসো ভয়-হারা।
দেখিবে চরণে লুটছে আবার দুনিয়ার বান্দারা।
আল্লার এ-ধরা আল্লারি লাগি আমরা চেয়েছি যবে,
দুনিয়ার বুকে চলেছি তখন বিজয়ের উৎসবে।
দূর-দিগন্ত সীমা নাহি ছিল—সব ছিল আমাদেরি,
বিশ্ব জাহানে চলেছি ফুকারী জীবনের জয়-ভেরী।
দূর পশ্চিমে জব্‌ল তারেক-পিরেনিজ্‌ গিরি-চূড়া,
আমাদেরি বীর-পদ-ভরে কাঁপি হয়ে গেছে গুঁড়া গুঁড়া।
চির-দুরন্ত তুরাণী তাতার উজ্‌বেগ্‌ আফগানী,
লুণ্ঠিত শিরে নিয়েছে জীবনে আমাদেরি পথ মানি।
নভ-উন্নত তুষার ধবল হিমালয় শিরে-শিরে,
মোর তক্‌বির-ধ্বনির লহরী যুগে-যুগে আছে ঘিরে—
সুদূর প্রাচ্য দ্বীপের পুঞ্জে সিন্ধুর কল্লোলে—
প্রাণ-স্পন্দিত শান্তি-শীতল আমাদেরি বাণী দোলে।
আল্লারে লহ খুঁজে—
আল্লার ধরা ছেয়ে যাবে ফের আল্লারি গম্বুজে।

ঊষা কি জেগেছে—জেগেছে জোহরা সেতারার আঁখি-আলো—
ওরে ঘুমন্ত—জাগো জাগো ত্বরা আজাদির জ্যোতি জ্বালো।
কাবার দেউলে ঐ শোন নব হেজাজের বাঁশী বাজে—
জাগে বাণী তারি সুরে-সুরে কাঁপি অম্বর পাখোয়াজে—
জাগে হিয়া-হিন্দোলা—
মুক্তি-কাফেলা আজ চলো চলো—মঞ্জিল দ্বার খোলা।

জিজ্ঞাসা

আমার মনের স্বপ্ন-শিশু আনমনে আজ করছে খেলা—
ভৈরবীতে ঘুম ভাঙে তার গায় পূরবী সন্ধ্যাবেলা ;
হাজার পাখীর কণ্ঠে যখন বৈতালিকী নিত্য জাগে

www.pathagar.com

শান্ত ঊষার কপোল-কোলে ভায় লালিমা অরুণ রাগে ;
আবার যখন মধ্য দিনে স্তব্ধ বনের উদাস শাখে
তপ্ত দুপুর শিউরে উঠে শঙ্খ চিল আর ঘুঘুর ডাকে
স্বয়ম্বরা সাঁঝের বধূ যখন পরি রক্তচেলী,
সবার শেষে অস্তাচলে আস্তে নামে চরণ ফেলি—
তেমনি খনে আমার মনের দিক-ভোলানো কল্পলোকে
লক্ষ কথা পক্ষ মেলে প্রশ্ন ভরা স্বপ্ন চোখে :—
এই যে নিতি রাত্রি-দিবা সন্ধ্যা-ঊষার খেলায় মাতি
মহা কালের কণ্ঠ কোলে বর্ষ-মালা চলছে গাঁথি,
জন্ম-মরণ যুগ্ম পথে কৃষ্ণ-শ্বেতের চিহ্ন আঁকি
অশ্রু-হাসির সিন্ধু বুকে নৃত্যে মাতে ঊর্মিপাখী
কোথায় তাহার যাত্রা শুরু আর হবে তার অন্ত কবে
জয়-পরাজয় প্রান্তে কি সব মিলবে মিলন-মহোৎসবে ?
দৃষ্টি জ্ঞানের অন্তরালে সৃষ্টি-প্রলয়-অক্ষ খেলা
খেলছে যিনি চিত্ত সুখে ক্ষান্তি-হারা নিত্য বেলা
আমরা কেন সেই খেলারি পুণ্য পাপের পণ্য হয়ে
স্বর্গ-নরক পন্থা বাহি মর্ত সরিৎ চলছি বয়ে ?

প্রশ্ন তারে যতোই করো ক'ন না কথা একটি তিনি
অজ্ঞতার এই অন্ধকারে কেমনে তারে লইব চিনি ?

মুখর মানস

আমার মনের মুখে খৈ ফোটে দিবারাত্র কত না কথার,
সে কথার ইতিহাস কেবা আর রাখে লিখে খাতার পাতায়—
তবু তার রস-কোষে সুগোপনে জমা মধু আমারে মাতায়
দুখের নিবিড় রাতে আশার মলয়া আনি জীবন-লতার।

চোখের অর্ঘে পানি যখন হৃদয়ে রচে পাথার ব্যথার—
বেচৈন হিয়ার কূলে মরণের বিভীষিকা দেয় শুধু দোলা,
বিশের ফেনিল খেলা শোনিতের কোলে-কোলে হয় উতরোলা ;
সেদিন এ খৈ-এ রচা কথার তরণী করে মোরে পারাপার—
সমুখে চলার পথে দিনে-দিনে-জমা মোর আঁসু-পারাবার।

এই যে কথার মালা মনের অতলে জাগে রোধি সব দ্বার—
কত যে স্বপন আর অপূরিত কামনার কত নীলা ফেনা,
দুখের-আতপ-তাপে মুরছিত মরমের কত ঝরা হেনা,—
কে কবে ধরার বুকে সকরুণ আঁখি মেলে রাখে খোঁজ তার—
বুকের গহন-শায়ী চোখের আড়ালে-ঢাকা মূক বেদনার।

www.pathagar.com

মরীচিকা মোহ-ময়ী অপরূপ মায়া কত আসি বার বার
সে গোপন মন-মুখে রচে নিতি কত রূপ-কথার কাহিনী—
অথবা জ্বালায়ে তোলে অসহায় চিতে রোষ অনল দাহিনী—
জানি সে সকলি মিছে—তবু সে প্রলেপ রচে চপল আশার,
অসহ দুখের বোঝা ক্ষণিক-লহমা তবু করে লঘু-ভার।
তিমিরা রজনী-কোলে মেঘের নিকষে জাগে জ্যোতি চপলার,
সে জ্যোতি পলক-চারী তবু সে কখনো নহে আঁখির ছলনা—
তাহার বিভাস জুড়ি রয়েছে পরম-খাঁটি আলোকের কণা,
সে কথা সকল যুগে সকলেই দেশে দেশে করেছে স্বীকার—
আমার মনের সুখে তাহারি রশন আনে বাণী খরধার।

নিরালা মনের বনে যখন দোসর সাথী কেহ নাহি আর,
হিয়ার আনন খুলি কথা কই আর শুনি একা অবিরাম—
আমারে চেনার লাগি বারে বারে আমি শুধু জপি নিজ নাম,
সে নামে বিলীন হয় চারিপাশে ঘিরে-আসা নিরাশা আধার ;
আবার সমুখে চলি চরণে চরণে টুটি প্রাচীর আধার।

সে চলার পথে-পথে আবার নিষেধ আসে হাজারো ধাঁধার।
তখন আবার আমি বুকের জানালা খুলি' মনেরে শুধাই,
চকিত ইশারা হানি সে মোরে শিখায়ে দেয়—কোন্ পথে যাই
তীরের নিশানা মিলে—দেই না বিপথে নামি অকূলে সাঁতার—
জীবনে এমনি কত পার হয়ে চলিয়াছি পথের পাথার।

যখন রণেনা আর মনের বীণার সেই মুখরিত তার
তখনো সে মূক নহে—স্বপনের খেলা নিয়া জেগে সে ঘুমায়—
গভীর অতলে ডুবি চুপি-চুপি কথা কয় অবচেতনায় ;
সে হলো কথার ক্ষেতে ফসল ফলানো আশে মসুম বুনার—
ফসল কাটার গীতি সে নহে সরব সুরে সময় শোনার ;
রণেনা রণেনা যবে মনের বীণার মোর মুখরিত তার।

সুবর্ণ মৃগের মায়া

সুবর্ণ মৃগের মায়া আর কত ভুলাবে তোমারে
মাটির বনানী-বুকে কাঁদে মৃগ আঁখি-অভিরাম—
স্বর্গের দেবতা লাগি বৃথা বন্ধু, ভাসো অশ্রু-ধারে
মর্তের মানব-শিশু হেথা আর্ত ব্যর্থ-মনস্কাম।
ঊর্ধ্বের গগন-ছায়া মায়া-ময় যত নীলা হোক
শুধু সে মায়া-ই বন্ধু—কায়া নহে নীলিমা-সত্তার,

www.pathagar.com

আঁখির বিভ্রমে জাগে শূন্য পথে রূপের আলোক,
চিত্তের বিভ্রমে কত জাগে মায়া—কোথা অন্ত তার।
জোছনা-পিয়াসী কবি হেরে চাঁদে পুঞ্জ পুঞ্জ রূপ,
রচে সে বন্দনা-গীতি হেরি নব উদয়-সবিতা,
আমরা মাটির শিশু জানি চন্দ্র দগ্ধ শিলাস্তূপ—
সূর্য সে বহ্নির গোলা—নহে স্নিগ্ধ কোমল কবিতা।

পুণ্যের পণ্যের আশে স্বর্গের দুয়ারে দাও হানা—
কেহ সে জানে না হেথা স্বর্গ আছে কোথা কোন্ ঠাই,
শূন্যময় স্বপ্নলোকে মেলি' মুগ্ধ কল্পনার ডানা
তবুও ভাবিছ মনে স্বর্গ বুঝি পাই এই পাই।

বারম্বার আস ফিরে বহি শুধু ব্যর্থতার দাহ,
কাম্যেরে পাওনি বলে কামনার বহ্নি জ্বলে বুকে—
তৃষ্ণারে জাগালে বন্ধু চিনিলে না অম্বুর প্রবাহ,
চিত্তের সত্যেরে ভুলি' মরিয়াছ দূর-স্বপ্ন-সুখে।

মাটির মর্ত্যের পানে একবার চাও ফিরে চাও—
স্বপন-কামনা তব দেখো হেথা পাও খুঁজে কিনা,
সরিৎ-বনানী-ঘেরা ভুবনেরে ভুলি কোথা যাও—
স্বর্গ হেথাই আছে—শোননাকি নির্ঝরের বীণা?
মাটির শিশুরা হেথা শত কাজে করে নিতি খেলা,
বুকে বুকে কত আশা কত প্রীতি কত যে স্বপন—
অশ্রুর সজল স্রোতে ভাসায়ে হাসির শত ভেলা
ঘাসির অন্তরে এরা করে পুন অশ্রুর বপন।

ঊষার উদয় হেরি উঠে এরা পুলকে উছলি
স্বপন-স্বর্গ রচে কৈশোরের কল্পনার বনে—
যৌবন-মধ্যাহ্নে যবে উঠে রবি বহ্নি-তেজে জ্বলি
কঠোর বাস্তব রূঢ় ভাঙে তার স্বপ্ন 'খনে খনে।'

সাঁঝের কাজল ছায়া নামে শেষে পশ্চিমের তীরে
আশার সবিতা তার চিরতরে ডোবে অস্তাচলে—
অতৃপ্ত কামনা যত সমাধির স্তব্ধ হিয়া চিরে
তিমির রজনী ঘেরি' আলেয়ার বুকে বুকে জ্বলে।

তাদের বেদনা-ব্যথা জীবনের যত হত আশা
হে বন্ধু দেখতো তুমি স্নেহ-করে পারোনি মুছাতে—
দুর্বলে রে দাও বল, মুক মুখে দাও দেখি ভাষা,
সুবর্ণ মৃগেরে ছাড়ি' ফেরো পুন বন-মৃগ সাথে।

www.pathagar.com

তাঁদের হতাশা টুটি' ম্লান মুখে আনো নব হাসি
ভীতির বেদনা নাশি' নিশীথের আঁখে দাও নিঁদ—
তখনি শুনিবে হেথা বাজিয়াছে সুন্দরের বাঁশী—
সেদিন মিলিবে স্বর্গ—সেদিন আসিবে তব ঈদ।

খুদী

জ্যোৎস্না–উজল ঝিল্–ভরা জল, ঝিল্লিতান ;
জাগায় জোয়ার ঝর্ণা–উছল ফুল বিতান।
নিদ্রা–নিবিড় নীরব–নিথর নিশীথ রাত,
খুললো মনের শিবির–দুয়ার অকস্মাৎ।

খুললো খুশীর খিলান–দেওয়া তোরণ সব,
দেখছি স্বপন : ভরল ভুবন প্রাণ–আসব।
দেখছি স্বপন : বিশ্ব–ভুবন আমার স্তর,
গাইছে গহন গহন–সীমায় ধ্যান–নীরব।

গাইছে বিরাট বিপুল নদীর জল–বিথার,
জল–তরঙ্গে তাল তুলি বয় দু'তীর তার।
বনের বীণায় বুলবুলি গায় আমার নাম
গায় কিশলয়, দখিণ মলয়, নাই বিরাগ ;
খুশীর ঢল—
খুলছে আমার খেয়াল–খেলায় রূপ–তরল।

এই যে জগৎ জমকালো রূপ—জ্যোতির্ময়,
সন্ধ্যা সকাল গন্ধ–মাতাল সমীর বয় ;
ঊর্ধ্বে উধাও উচ্চ উদার নভাঙ্গন,
পৃথ্বি পথের পার্শ্বে হাজার হরিৎ বন ;

নিম্নে নিবিড় ঊর্মি–উছল নীল সাগর,
বক্ষে বিরাট বিপুল গিরির পাষাণ স্তর।
সূর্য–কিরণ ছড়ায় হিরণ নিরন্তর
চন্দ্র–তারার হার দোলে যার কণ্ঠ পর ;
এই যে জগৎ মূর্ত মহৎ চিরন্তন ;
নিত্য সবায় মোর নামেরই স্তব–মগন।
আমার মন
সৃষ্টি–লীলায় করলো হেথায় সব সৃজন।
আত্মা আমার ব্যাপ্ত ব্যাপক বিশ্বময়
মর্মে আমার সত্তা ভূমার মূর্তি লয়।

www.pathagar.com

ঐ যে উষায় শষ্প-শীষে বিন্দু-জল,
বিম্বিত তার বক্ষে বিশাল বিশ্ব-তল

গোষ্পদের ঐ শীর্ণ বুকে সপ্তাকাশ,
দেখছে আপন বিপুল কায়া বর্ষমাস।
রয় দাবাগ্নি বহ্নি-কণায় সুপ্ত-লীন,
জীর্ণ হিয়ার অঙ্কুরে রয় প্রাণ নিলীন,

"খুদী"-ই শুধু জিন্দা রয়—
আর সকলি মায়ার মতো
অন্ধকারের গর্ভে-লয়।

যাত্রী

জীবনে এসেছে জোয়ারের ডাক
নোঙর লও তুলি,
হে মাঝি ভাসাও জাহাজ আবার
ঢেউ-দোলে দুলি দুলি।
বিশাল দুনিয়া অজানা মুলুক
তোমারে ইশারা হানে
কত দ্বীপ জাগে তোমারি আশায়
দরিয়ার মাঝখানে ;

অথই অতলে প্রবালেরা দেয়
লাখো জান কোরবানী—
নূতন দ্বীপের ভিত গড়ে এরা
সৃষ্টির সন্ধানী।

তাদের ঘিরিয়া তোমারি আশায়
পাগল তিমিরা নাচে,
মাতাল মউজ লুটে যে সেথায়
অজগর উচ্ছ্বাসে।

নিমক-জহর নীল-সিয়া পানি
কূল নাহি কোন খানে,
নজর উতরি মিশে গেছে দূর
আবছায়া আসমানে।

জোয়ানী জাদিদ তাজা হিম্মত
সেইখানে দেয় পাড়ি—
জীবন-জিয়ানো কলেমা-কালাম

www.pathagar.com

সেথা তারা করে জারি।
মউত সেথায় করে কুর্নিশ
জীবনের পদতলে—
হায়াতেরে ছাপি আবে-হায়াতের
সুধা সেথা উচ্ছলে।

*　　*　　*

জীবনে এসেছে জোয়ারের ডাক
নোঙ্গর লও তুলি,
হে মাঝি জাহাজ ভাসাও আবার
ঢেউ-দোলে দুলি দুলি।

পুরানা ধরার বুড়া বন্দরে
বহুকাল বসি বসি,
অচেনা দূরের দুরাশা-স্বপন
আজ বুঝি যায় খসি।

নব অভিমানে জাহাজ জয়ের
জয়-টিকা তব ভালে—
তারে বুঝি আজ ঢাকিছে মাটির
কালি-ঢালা ধুলি জালে।

দরাজ দরিয়া ঠাঁই-হীন পানি
সেথা নাই আবিলতা,
সেথা সীমা-ঘেরা মাটির ঢেলার
নাই সীমাবদ্ধতা।

সৃষ্টি তো শুধু সীমারে টুটিয়া
বে-হিসাব বয়ে যাওয়া
নিজেরে গুঁড়ায়ে ছড়ায়ে দেয়ার
আবেগের ঝড়ো হাওয়া।
হে মাঝি আবার ভাসাও জাহাজ
সেই ঝড়ে পাল তুলি—
তোমার দিশারী দূর দিগন্ত
ডাকে মেলি অঙ্গুলি।

হে নব যাত্রীদল

আকাশে থেমেছে ঝঞ্ঝার গুরু গুরু—
নূতন দিনের প্রভাত আলাকে যাত্রা করে হে শুরু
হে নব যাত্রীদল !

www.pathagar.com

তিমির রাত্রি পারায়ে এসেছ বিক্ষত পদতল,
তবুও আজিকে নাহি অবসর বিরাম-নিদালী-সুখ—
চির-বঞ্চিত মানবেরা হেথা চঞ্চল উন্মুখ
মুক্তির সুধা পি'বে আকণ্ঠ তীর্থ-কাবার তীরে ;
যুগ-যুগ ধরি সিঞ্চিত যত বেদনা-অশ্রুনীরে
গোমুখী-গুঞ্জিত জাহ্নবী সম ধুয়ে মুছে নিবে আজ
জাতির বক্ষে সঞ্চিত যত লাঞ্ছনা-ব্যথা-লাজ—
ধুয়ে নিবে আজ ক্ষুধিত-জনের ক্ষুধার অশ্রুনীর
অসহায় যত রুগ্ন দুখীর অকাল মৃত্যু ভীড়,
ধুয়ে নিবে আজ লক্ষ মনের অজ্ঞান মূর্খতা
ভায়ে-ভায়ে-গড়া দ্বন্দ্ব-দুখের বেদনার আকুলতা,
ধুয়ে নিবে আজ ক্ষুদ্র মনের হীনতা ঈর্ষা দ্বেষ
সরল-দগ্ধ বিদ্বেষ-জ্বালা অশুভ চিহ্ন লেশ।
আনিবে সেথায়
নব সাধনায়
প্রাচীন এ জাতির পাঁজরে-পাঁজরে নব যৌবন-বল,
নূতন যুগের স্বপ্নের-ধ্যানে জীবন সমুজ্জ্বল।
হে নব যাত্রীদল—
আকাশে থেমেছে ঝঞ্ঝার গুরু-গুরু
নূতন দিনের প্রভাত আলোকে যাত্রা কর হে শুরু।

কাফেলা

নূতন দিনের পথে—হে চির কাফেলা
যাত্রা তবে হবে পুন শুরু ?
রাতের তিমির-গাঢ় বজ্র-ঘন ক্রূর মেঘ-মেলা
এখনো যে ডাকে গুরু-গুরু।

প্রভাত এসেছে জানি, অরুণ রয়েছে তবু ঢাকা
ব্যথা-বাষ্প তলে—
দিগন্ত নীলিমা চিরি চির-মুক্ত মনের বলাকা
নভাঙ্গনে আজো নাহি চলে।
কোথায় ঝড়ের মুখে—কোন্ মরু-ঘূর্ণির ঝাপটে
ভেঙে গেছে ডানা,
কে জানে আহত দেহে কোন দূর রক্ত নভ-পটে
খুঁজিতেছে পথের সীমানা।
আলোর দূতেরা চির ত্যাগ-দীপ্ত যে-জ্যোতি-ঝলকে
রচিয়াছে সৃষ্টি নব নব,

www.pathagar.com

লোভের রাহুরা সেথা রচিতেছে পলকে পলকে
ধ্বংস অভিনব।

শুধু মৃত্যু, শুধু ব্যথা, শুধু অশ্রু–বন্যার প্লাবনে
ভাসে বিশ্ব–ধরা—
শুধু আজ আত্ম–রতি, শুধুই লুণ্ঠন প্রতিক্ষণে
শুধু লুব্ধ স্বার্থের পশরা।
তারি মাঝে হে কাফেলা তব যাত্রা হবে পুন শুরু ?
পথ আছে বাকি ?

বন্ধু তবে চলো চলো—স্তব্ধ হোক বক্ষ–দুরু–দুরু,
হোক সাথী বজ্রের বৈশাখী—
মৃত্যুরে পারায়ে জাগে যে জীবন নিত্য থাকি থাকি,
বন্ধু আজ চলো চলো,
তারি জয় দীপ্তকণ্ঠে হাঁকি।

মাটি আর মহাকাশ

কেন সে জানি না ভাই আজ এই জীবনের গোধূলি বেলায়
মন মোর বারম্বার ফেলে–আসা পথ পানে ফিরে ফিরে চায়।
তরঙ্গিত খরধার কালের প্রবাহ বুকে উচ্ছলিত না'য়—
শ্রান্তিহীন চলিয়াছি দ্বি–স্রোতা স্রোতের টানে জোয়ার–ভাটায়।
কখনো ভেবেছি মনে জীবনের চির–চাওয়া মহাতীর্থ পানে
বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছি অনন্তের সন্ধানে সন্ধানে।
কভু বা হয়েছে মনে, লালসা–আবর্ত–ঘোরে স্বার্থের বিবরে
আকণ্ঠ ডুবিয়া গেছি—গেছি সত্য–পথ হতে দূরে বহু সরে।
আজ এই বেলাশেষে দীর্ঘ জমা–খরচের প্রান্তে দেখা যায়—
যেথায় লভেছি জন্ম জীবনের বেলাশেষে মৃত্যুও সেথায়।

অনেক স্বপন ভাই—রঙিন স্বপন এই নভে ছিল আঁকা,
অনেক চাঁদিনী রাতি ছিল সেথা জাগি আর ছিল চন্দ্ররাকা।
এ আকাশ ছিল ভাই শত দীপ্ত নীহারিকা ছায়া–পথে ঘেরা,
এ আকাশ রেখেছিল ছেয়ে' ছেয়ে' কল্পনার তারার ফুলেরা।
কৈশোরের কুহু–সুরে সেথায় অনেক গীতি গেয়েছি সুরেলা—
আকাশ–কুসুমে গাঁথি কত মণি–মালা সেথা করিয়াছি খেলা।
তারপর এলো নামি যৌবন–মৌবন মেলা মধুপ গুঞ্জিত—
আলো আর জ্বালা উত্তাপিত ;
সে কম কাননে পশি মধু–মুগ্ধ তৃষ্ণাতুর ভ্রমরের মতো
লোভ আর কামনার তৃপ্তিহীন রসাস্বাদে রয়েছি নিরত।
তারো মাঝে ক্ষণে–ক্ষণে গোপন স্বপনশায়ী নভোচারী পাখী

www.pathagar.com

ইন্দ্রধনু-আরঞ্জিত নিঃসীম নভের পথে গেছে মোরে ডাকি'।
ঊষার আলোর সাথে মনের বিহঙ্গ মোর গেছে উড়ে' উড়ে'—
কত মাঠ-তেপান্তর গিরি-বন হয়ে পার দূর হতে দূরে।
লাভাঙ্কের লোভাতীত মুক্ত-মনা সুনির্মল শিশুর মতন
অকস্মাৎ উঠিয়াছে মহা মুক্তি আশে জাগি সারা চিত্ত-মন।
উঠেছে রাঙিয়া হিয়া ঊষসীর রক্তরাগ সিঁথির সিঁদুরে—
মানস অম্বর মোর শিহরি' জাগিছে তারি জ্যোতির্ময় সুরে।
জীবন-যৌবন-ভোলা শুনি সেই জাগরণী দীপক বাঁশরী
সুর কুরঙ্গের আত্মহারা মোহে গেছি নিজেরে পাসরি'।

আর কখন জানি সে সুর-সঙ্গীত-রেশ গিয়াছে হারিয়ে—
আর নিখিল মোর ডুবে' গেছে কামনায় অন্ধকার ছায়ে।
সংসারের ঘূর্ণি-পাকে আবর্তিত কর্দমের কলুষ কালিমা
শ্রাবণ মেঘের মতো বারম্বার ঢাকিয়াছে মোর নভঃসীমা।
সেথা ঝলেছে পুনঃ লেলিহান লালসার জলদর্চি -শিখা—
সে দাহে গিয়াছে জ্বলি' দিক-হারা দিগন্তের দূতের লিপিকা।
উদ্দাম আবর্তময়ী বল্গাহীন বাসনার ঝড়ের ঝাপটে
ভগ্ন-পক্ষ পাখী মোর হারায়েছে পথ তার নভাঙ্গন পটে।
ফেলিয়া মদিরা সম মাটির কামনা-রসে হারায়ে চেতনা—
নভরা বিহঙ্গম ভুলে' গেছে বিবস্বান জ্যোতিবিন্দু কণা।
মাটি আর মহাকাশ মুক্তি আর বন্ধনের পর্যায়ে-পর্যায়ে—
রেখেছে জীবন বাঁধি' কভু আলো কভু কালো অন্ধকার ছায়ে।
পুণ্য আর পাপ বুঝি শুক্ল আর কৃষ্ণ দুই পক্ষ পরিক্রমা
মৃত্যু আছে তাই সদা বিশ্ব-বুকে জন্ম এতো কান্ত মনোরমা।
মনে হয় এ জীবন নিত্যনব আলো আর আলেয়ার খেলা—
তারি কি ধাঁধায় ঘুরি এই দীর্ঘ জীবনের কেটে গেলো বেলা?

মুসাফির

চির রাহাগীর আমি মুসাফির,
চির-প্রশান্ত চির-অস্থির,
কভু ভাসি স্রোতে—কভু যাচি তীর
        জীবনের নদী-কূলে
গৃহী-সনে আমি বাসা বাঁধি ঘরে
বায়ু সনে ভ্রমি বন-মর্মরে
মাটির ধুলায় খুঁজি স্বর্গরে
        মর্মের ফুলে-ফুলে।

www.pathagar.com

কবে যে যাত্রা নাহি আজ জানা
নাহি কোন দেশ নাহি সে ঠিকানা—
কালের সাগরে ভাসমান পানা
চলিয়াছি যুগে-যুগে—
চির অনাগত জীবন-জোয়ারে
প্রাণনার উদ্যোগে।

কোনো আসিলাম কোন্ চির আশে
কোনো পথ চলা—যাব কার পাশে—
কোন্ সে সুদূর কল-উচ্ছ্বাসে
বারেবারে ডাকে মোরে—
কিছু তো জানি না—তবু পথ চলি
বারবার বাধা-বিঘ্নেরে দলি—
প্রাণ-তরঙ্গ উঠে উচ্ছলি
অজানার মোহ-ঘোরে।
কত অরণ্য-প্রান্তর-ছায়
কত মরু-মেরু-গিরি-দরিয়ায়
আমার চপল চরণ-রেখায়
কত পথ হলো আঁকা—
তারি বিচিত্র বঙ্কিম জালে
সারা ধরা আজ ঢাকা।
কোথা হতে আসি কোন্ দেশে যাই—
কে রহিল সাথে—সে যে সাথে নাই,
কারে চাহিয়াছি—কারে চাহি নাই,
আজ মনে নাই কিছু—
চলি সম্মুখে-শুধু সম্মুখে
অতীতেরে রাখি পিছু।

জান্নাত ছাড়ি—কবে কোন ক্ষণে
ক্ষণিকের মোহে ভুলি প্রলোভনে
আসিলাম হেথা ভুবন-ভবনে
সব কথা গেছি ভুলে—
তারপর কতো জীবনের স্রোতে—
কভু আঁধিয়ারে—কভু-বা আলোতে
ভ্রমিয়াছি শত পথ হতে পথে
মহাকাল কূলে-কূলে।

নূহর ডিঙায় ভেসে ভেসে বুঝি—
প্লাবনের শেষে নব ধরা খুঁজি
রচিয়াছি নব সভ্যতা-পুঁজি
নব জাগা ধরাতলে—

www.pathagar.com

সৃজন-পাগল শিল্প-মানসে
সৃষ্টির কল্লোলে।
দজ্‌লা-ফোরাত-নীলনদ-তীরে
ঘুরিয়াছি শত উৎসব-ভিড়ে
নমরূদ আর ফেরোয়াঁরে ঘিরে
গড়ি শত মোহ্-আশা—
কেনানের আর হেজাজের আলো
আবার সেথায় জ্যোতি যে জ্বালালো
ভুলেছি আবার জাহেলির কালো
চির সে সর্বনাশা।
আজো মোর চলা হয়নি তো শেষ—
অজানা পথের মোহের আবেশ
আজো মোরে ডাকে ধরি নব বেশ
ভুল হতে নব ভুলে—
চির-রাহাগীর আমি মুসাফির
চির-প্রশান্ত—চির-অস্থির
কভু ভাসি স্রোতে—কভু যাচি তীর
জীবনের নদীকূলে।

অন্তরালে

অজানা পথিক আমি নামহীন পথের পাথারে,
অমূল পানার মতো চলিয়াছি স্রোতে ভাসি' ভাসি'—
প্রহর গনেছি সেথা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে,
কভু বা শুনেছি দূরে বিষ-নীলা প্রেতায়িত হাসি।

সে-ব্যথা-তিমির-তীরে ক্ষণে ক্ষণে উঠেছে উদ্ভাসি
প্রিয়ার কাকলি সম কার জানি বাঁশরীর বাণী—
মাটি আর অশ্রু-গড়া পৃথিবীরে কেনো ভালোবাসি,
আমার মনের কোণে সে-সুরে হয়েছে জানাজানি।

সে-সুরে পাথার জুড়ি ঢেউ-এ ঢেউ-এ চলে কানাকানি
অথই নীরের শেষে আছে শ্যাম তীরের নিশানা—
মুহূর্তে-মুহূর্তে-জাগা যত ক্রূর মৃত্যু হানাহানি,
সবারে উত্তরি মেলে নবাঙ্কুর নিত্য সেথা ডানা।

জানার অরণ্য-তলে গুণ্ঠিতা সে কুণ্ঠিতা অজানা
সুপ্তির নৈঃশব্দ বুকে প্রাণসম গোপনে সঞ্চরি—
নির্ভয় চরণে দলি লক্ষ বাধা বন্ধনের মালা

www.pathagar.com

নৈরাশ্য–নিবিড় নীড়ে রচিতেছে আশার মঞ্জরী।

ব্যথার সিন্ধুর বুকে আলোজ্জ্বল সেই স্বর্ণ–তরী
ঝঞ্ঝা–ঝড় বিক্ষোভিত দিকহারা রাত্রির তিমিরে,
বিভ্রান্ত যাত্রারে দানে দৃপ্ত বল বাহু–বক্ষ ভরি—
আবার ভিড়ায় তারে বালার্কিত পূর্বাশার তীরে।

অন্ধকারে পথ–হারা আমার মানস সন্ন্যাসীরে
দীর্ঘ দিন ঘুরায়েছি সেই স্বপ্ন–দিশারী সন্ধানে
কভু বা খুঁজেছি তাঁরে বেদনার তপ্ত অশ্রুনীরে
কভু বা বিক্ষুব্ধ চিতে বিদ্রোহের তীব্র গানে–গানে।
আজিও পাইনি তারে জলে–স্থলে কোথা কোনোখানে
তবু জানি আছে সে যে, আছে হেথা আছে সর্বকালে,
বাহিরে খুঁজেছি শুধু–চাহিনিতো অন্তরের পানে
হয়তো সে আছে বসি, মোর লাগি তারি অন্তরালে।

নয়া তারানা

কওমী জিন্দিগী মোর জিন্দানের জিঞ্জির বন্ধন
নিঃশেষে টুটিয়া আজ মেলে পাখ নিঃসীম গগনে,
মঞ্জেলে মকসুদ যেথা মানবতা মহিমা স্পন্দন—
কাবার নূরানী আলো সেথা জ্বলে প্রতি ক্ষণে–ক্ষণে।

আমরা হারায়ে পথ কামনার কন্টকের বনে
সুদীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপি লুটিয়াছি জাহেলী জুল্‌মাতে
খুদা ও খুদীরে ভুলি ছুটিয়াছি মায়া–মৃগ সনে,
পাইনি মুক্তির পথ ধুঁকিয়াছি অন্ধকার রাতে।
সে রাতি পারায়ে আজ নব সুবে–সাদেকের সাথে
হয়েছে আবার দেখা ;—সীমা–হারা দিগন্ত–ইশারা
আমাদেরে দেয় ডাক নবারুণ আলোর সম্পাতে ;—
হেরার মঞ্জিল–রাহী মুসাফির ! দেবে নাকি সাড়া ?

আমার রুহানী–রাজ খাক–গড়া বন্ধনের কারা
মানেনি কখনো কভু—মোর তরে আলম আল্লার
রয়েছে সম্মুখে খোলা,—আমার পতাকা চাঁদ–তারা
অসীম আকাশ সম দৃষ্টি মোর অনন্ত উদার।

দেশ–রচা সীমা–রেখা উত্তরিয়া আমি বারম্বার
রচেছি আমার নীড় জাহানের দিক–দিগন্তরে—
রচিলাম গেহ পুনঃ ভূ–গোলের সীমা হয়ে পার,
আমার শান্তির বাণী আবার রণুক ঘরে–ঘরে।

www.pathagar.com

আশঙ্কিত

শতাব্দীর অন্ধকার বেঁধেছে জমাট,
তীর্যক তমিস্রা-তটে শুধু রণে হতাশা-কল্লোল,
গিয়াছে হারায়ে পথ—বিভ্রান্তির তপ্ত মরু মাঠ
মৃত্যুর উল্লাসে মাতে—লু-সাইমুম সেথা খায় দোল।

লোভান্ধ হায়েনা আর শৃগালের উগ্র ডামাডোল
আতঙ্কিত বিভীষিকা নিত্য সেথা করেছে সৃজন
তারো মাঝে জানি কার ক্ষণে ক্ষণে জাগে আর্তরোল,
নিশীথ নিদ্রার ঘোরে বিশ্ব বুঝি হেরে দুঃস্বপন।

আশ্বাস-আনন্দ ভরা প্রভাতের সোনালী তপন
রাক্ষসী রাহুর গ্রাসে অন্ধকারে হারায়েছে পথ,
সত্যের সন্ধানী আলো আজ বুঝি লভে অস্তায়ন,
উদয় প্রাচ্যেরে ঘেরে গোধূলির প্রতীচী পর্বত।

আজিকে ন্যায়ের শক্তি যাদু-মুগ্ধ চিত্রার্পিত বৎ
দম্ভের দম্ভোলি দাপে হারায়েছে সম্বোধি-সম্বিৎ
সুন্দর স্বপ্নেরে গ্রাসে কামনার পূতি-গন্ধ ক্ষত,
পুণ্যের শুভ্রতা মুছি জাগে বর্ণ রক্ত আর পীত।

মৈত্রির মুমুক্ষা নয়—শুধু দ্বন্দ্ব সংঘাত-সঙ্গীত,
মানুষে মানুষে আর দেশে দেশে স্বার্থ কোলাহল
সারা বিশ্ব জুড়ি বুঝি টলায়েছে সভ্যতার ভিত,
প্রলয় শিঙ্গার বাণী আজ শেষে হবে কি সফল?

"এবার বাঁধিব ঘর"

জীবনে এসেছে সন্ধ্যা এবার
দীর্ঘ দিনের পর
বন্ধু গো মোর আশা আছে মনে,
এবার বাঁধিব ঘর।

এবার বাঁধিব ঘর
যেথায় রাজিবে চির নিঝ্‌ঝুম
শান্তির পরিবেশ
যেথায় ফেলিব শেষ ক্লান্তির
নিঃশ্বাস নিঃশেষ,
দিনে-দিনে-টানা চির অফুরান

www.pathagar.com

বকেয়া কাজের রেশ
যেথা মোরে বাঁধিবে না
যেথা দিনান্তে শুধে যাব ভাই
জীবনের শেষ দেনা।

এতদিন শুধু তৃণের মতন
ভেসেছি স্রোতের পর,
কভু চলিয়াছি ঢেউ-এ দুলি-দুলি—
কভু বা পেয়েছি চর,
কভু অরণ্যে হারায়েছি পথ
দুর্গম দুস্তর,
যাত্রা থামেনি তবু—
হয়ত হয়েছি ক্ষণিক পঙ্গু—
চরণ থামেনি কভু।

কখন চলেছি বেদনা-ক্ষুব্ধ
ঝঞ্ঝাবর্তে নাচি—
কভু বা নিঝুম পাতাল-গভীর
গহ্বরে ডুবিয়াছি—
কভু আসিয়াছি পর্বত ছাড়ি
কাদার কোলেরে যাচি—
পঙ্কিল শুচিহীন,
সেথায় দেখেছি লভেছে জন্ম
কামনার শত মীন।
কভু বা দখিনা সমীরের সনে
হিল্লোলে দুলি-দুলি,
মধু কল্লোলে গান গেয়ে গেয়ে
সব ব্যথা গেছি ভুলি—
কমলের ফুলগুলি
কামবন আর কুমুদেরে লয়ে
সে সুরে নয়ন খুলি
আমার আননে রহিয়াছে চাহি
সুধা-হাসে উচ্ছলি—
কোরকের আঁখি তুলি—
কমলের ফুলগুলি।

কভু-কভু হায় রোষ-বন্যায়
ভাঙিয়াছি কূল কত
ভেঙেছি গর্ব-স্মৃতির সৌধ,

www.pathagar.com

অহমিকা উদ্ধত।
সৃজণ-তরণী বয়ে চলে জানি
কাল হতে মহা কালে,
আজিকার ফুল ঝরে যেয়ে কাল
নব ফুল ফোটে ডালে,
মধুপেরা জানি নাহি চুমে সেই
রিক্ত বোঁটার ডালে—
রাতের শিশির শুধু
সজল পরশে নিশীথে নিভায়
স্মৃতির দহন ধু ধু।
আজি মনে পড়ে দীঘল পথের
অতীতের দিনগুলি
কোন্ সে-দেবতা—চরণে যাহার
দিছি প্রাণ অঞ্জলি—
দেখিনি তো তারে চির রহস্য
গুণ্ঠন কভু খুলি
তবু হায় তারি হাতে,
দিয়েছি বুঝিবা সপি তনুমন
পথচলা নবপ্রাতে।

জীবনে এসেছে সন্ধ্যা এবার
দীর্ঘ দিনের পর—
বন্ধু গো মোর আশা আছে মনে
এবার বাঁধিব ঘর।

তাপ-দগ্ধ বসুন্ধরা

আকাশে আগুন ঝরে—ধু-ধু মাঠ তৃণ-শষ্পহীন,
তাপ-দগ্ধ বসুন্ধরা যেন মরু দিগন্ত-বিলীন;
ছায়া নাই, শান্তি নাই, ক্লিষ্ট দিঠি যায় যত দূর
শুধু রুদ্র রৌদ্র জ্বালা-শুধু শুষ্ক পাতার নূপুর
রেখেছে মুখর করি' এই তপ্ত মৃত্তিকা-আবাস;
তৃষিত পৃথিবী যেন ক্ষণে-ক্ষণে ফেলিতেছে শ্বাস
দুঃসহ বেদনা-দাহে দীর্ণ করি' জীর্ণ বক্ষ তার;
বনানী-প্রান্তর ঘিরি' তারি বুঝি ক্ষুব্ধ হাহাকার
ঝরিছে অঝোরে লুটি'—অশ্রু নাই, শুধু হলাহল
মরু-শুষ্ক অক্ষি-কোলে—শুধু তীব্র লু-এর অনল
দীর্ঘায়িত দিন ব্যাপি' রচিতেছে ঝঞ্ঝার আবেগ—

www.pathagar.com

অম্বরে ঝলসে শুধু অম্বু-হীন রক্তশিখ মেঘ।
বহ্নিমান রোমে বসি' নীরো বুঝি বাঁশরীর সুর
বাজাইছে ক্রুর হাস্যে—রূঢ় তার চিত্ত-অন্তঃপুর
ঝুরিল না কভু হায় মুমুক্ষায় মমতা-সজল—
তাহারি নয়ন-ক্ষরা বিষ-বহ্নি বুঝি বিশ্ব-তল
দগ্ধ করে অনুক্ষণ—নাই কোথা প্রেম-বিন্দু লেশ
চারিদিকে জ্বলে শুধু লালসার দাবাগ্নি অশেষ,
বেদনা-বিধুর লাগি' নাই নাই, কণা শান্তি জল,
করুণা-কোমল অশ্রু আঁখির পল্লবে টলমল্
হেথায় রচে না আর অনুপম মুক্তা মনোহর—
নেই হেথা স্নিগ্ধ আঁখি—সুধা-সিক্ত শান্ত সরোবর।
নয়নে ঠিকরে শুধু রোষের উষর মরু-জ্যোতি,
স্পর্শে তার লুপ্ত হয় অঙ্কুরিত লক্ষ প্রাণ-স্রোত
অকালে সূতিকা-গৃহে। মৃত্তিকার তপ্ত আঁখি-লোর
অসহ-ব্যথায় ভারি হয়ে গেছে পাষাণ-কঠোর।
বিদীর্ণ-হৃদয় ধরা বুঝি তাই তুলি' ক্রুদ্ধ রব
এলায়ে চিকুর রুক্ষ—রচে ধুলি-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব,—
কভু বা ক্ষিপ্র-গতি কভু তীব্র ঘূর্ণি-প্রভঞ্জন
করিতেছে অহর্নিশি তাপ-তপ্ত পাবক বপন।
শষ্প-রেখ ধরণীর কান্ত-শ্যাম অরণ্য-কুন্তল,
ইন্দ্র-ধর আরঞ্জিত সুরঙীন নব পুষ্পদল,
মরকর বর্ণ-নিভঃ তরঙ্গিত উচ্ছল ফসল—
আজ তার হারায়েছে চিত্ত-হরা কান্তির বিভব,
আদিগন্ত ব্যাপ্ত যেন দাব-দগ্ধ বনানীর শব।
চির মৃত্যুময়—
ধরায় চিছে শুধু দ্বিধাহীন নিষ্ঠুর প্রলয়।

এমনি মৃত্যুর পুরে স্তব্ধ যেথা জীবনের সুর
সৃষ্টি-লীলা গতি-হারা শুধু ক্রুর ধ্বংসের অসুর
যেখানে তাণ্ডবে মাতে, করে তীক্ষ্ণ খড়গ-করবাল
মারীত রক্ত-বীজ ক্ষুধা-অন্ধ দুর্ভিক্ষ ভয়াল
যেথায় ছড়ায়ে ফেরে রচে নিত্য মৃত্যুর মশান;
তারো কে ক্ষণে ক্ষণে উৎসবের আনন্দের গান
কারা যেন উঠে গাহি,—মনে হয় শ্মশান-সঙ্গীত
প্রেত লোক হতে জাগি ধ্বসিতেছে সভ্যতার ভিত্।
নূতন নীরোরা যেন এলো ফিরে' রোমে এ প্রাচীর,
ব্যোমে ভূমে বহ্নি এর—হলো দগ্ধ সব শান্তি-নীড়।
শব-ভূক শকুনেরা তাই বুঝি জমায়েছে ভীড়—

www.pathagar.com

করিছে আকণ্ঠ পান বিগলিত ক্লেদাক্ত রুধির।
প্রেম-প্রীতি মানবতা সবি হায় হয়েছে নিঃশেষ
ধরায় রাজগী লভে লোভ-অন্ধ হিংসা আর দ্বেষ।
নির্বিকার নিসর্গ নিঠুর—
বিদগ্ধ সৃষ্টির বুকে গেয়ে' যায় বৈশাখীর সুর।

হে শান্ত শীতলক্ষ্যা

হে শান্ত গহীন নদী মহাকাল গহন গহ্বরে
অনাদি স্রোতের সনে অসীমায় চলিছ বহিয়া—
তবু বর্ষা-বসন্তের তরঙ্গিত পহরে পহরে
তোমার অমূর্ত বাণী কলস্বনে যেতেছে কহিয়া
অমর সৃষ্টির গাথা ;
তুমি তব সৃষ্টির বিধাতা—
বর্ণে-বর্ণে লীলায়িত নীলোৎপল-কুমুদ কহ্লারে
তীরে-তীরে পুঞ্জিভূত মুঞ্জরিত শ্যাম ধান্য শীষে—
শ্রাবণ-তরঙ্গ-বেগে কল্লোলিয়া আসি বারম্বারে
সৃজন-রহস্যলোকে তুমি বন্ধু গিয়াছ যে মিশে।
তুমি আস, তুমি যাও জানি
হে লক্ষী শীতল লক্ষা
তারি সাথে রেখে যাও মৃত্যুহীন তব শান্ত বাণী।
তুষার হিমাদ্রি বুকে কবে জানি জেগেছিল জ্বালা
বিরহিণী কোন্ সিন্ধু স্মরি
ব্রহ্মপুত্র সূত্র-স্রোতে গাঁথি সেই তপ্ত অশ্রুমালা
সে কোন্ পথিক জানি শত তীর্থ-সঙ্গম উত্তরি
সে-বারি আনিল বহি তব চির শান্ত বক্ষ-কোলে
দক্ষিণের দাক্ষিণ্য আশায়—
ত্বরান্বিত মিলনের উদ্বেলিত আনন্দ কল্লোলে
গিরি-সিন্ধু দোহে মিলি নিত্য নব সৃষ্টি-বন্দনায়
উঠিবে উচ্ছ্বসি—
তব বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশি,
ছিল আশা তার—
হে শান্ত শীতল লক্ষা,
তব স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জলভার
হে সহা সাফল্য শুভ
বহিয়াছে বলো কতবার—
কভু কোনো বার ?

www.pathagar.com

নূতন চাঁদের কিশ্‌তী

আকাশ–দরিয়া কূলে নূতন চাঁদের কিশ্‌তি বাঁকা
ফেলিছে নোঙর,
দূরের বন্দর–পথে আর কেন বৃথা চেয়ে থাকা—
খামোশ ! থেমেছে লহু–ঝড়।
ঘাটের সারেং তবু রহ সবে হুঁশিয়ার খাড়া
কখন তুফান পুনঃ উঠে,
ঈশান–আকাশে আজো রহি–রহি বিজুলি ইশারা
আয়েশী মিতালী দেয় টুটি।
নিমক–জহর পানি সিয়া–কালো ছায়া ফেলি–ফেলি
ফেনার মুকুটে,
খুনেলা মেঘের ডাকে বেচৈন ঝড়ের পাখা মেলি
মউজে–মউজে সবে লুটে ;
গহীন দরিয়া বুকে পাতালের ডাক যায় শুনা,
হাজারো দেওএর কলরব
মাল্লারা আল্লারে ডাকি মাফ চাহে জিন্দেগীর গুনা
জাগে তীব্র আজানের রব ;
দেওয়ানা ঢেউ–এর শীষে জ্বলে লাখো দোজখের জ্বালা
লেলিহান আগুনের জিব—
তারি সাথে ফিরে নাচি সফেদ ফেনার লাখো মালা
উল্লাস–উদ্‌গ্রীব।
সাগর–ঘোড়ার পিঠে পিশাচ–শোয়ার লাখো যুঝি
ছুটেছে উদ্দাম—
আকাশ–জমিন ফাড়ি বিকট তাণ্ডবে যাবে বুঝি
মুছে দিবে দুনিয়ার নাম।
সে–ঝড় তুফান কাটি নূতন চাঁদের কিশ্‌তী বাঁকা
ভিড়িয়াছে কুলে—
ঘায়েল মাস্তুল ঘেরি শতছিন্ন পালের বলাকা
আজো সেথা দুলে।
মাল্লারা হুশিয়ার।
নূতন সফর–পথে আবার যাত্রার আগে
নিও চিনে ইশারা ঝঞ্ঝার।
অনেক দরিয়া–পথ অচেনা দ্বীপের তীর কত
এখনো রয়েছে অনাবাদ—
এখনো দুনিয়া জুড়ি বে–খেয়াল জাতি বহু শত
পায়নি তোমার সুধা–স্বাদ।
গহীন পানির বুকে প্রবালেরা যেথা গড়ে দেশ

www.pathagar.com

নিত্য নয়া নয়া,
খেলিছে যাদেরে ঘেরি তিমিযুথ আন্দন-আবেশ
দুলিছে মলয়া—
এলাচী-দানার বু'য়ে যেথায় বাতাস ভরপুর
উতলা পাগল—
দারু-চিনি বন-ছায়ে পাখীরা তুলিছে কল-সুর
যেথা অবিরল,
অনামা নদীর কূলে যেথা লুটে মুকুতা-মানিক
অঢেল দেদার,
জন-হীন বাঁকা তীরে হারায়ে গিয়াছে যেথা দিক্
সীমা নাহি আর—
সেথায় ফসল তব বপন করিতে হবে আজ
এসেছে সময়—
তাহারি সোনার শীষে বিখচিত করি তব তাজ
করো ধরা জয়।
তোমার বাণীর বীণা গুঞ্জরিয়া উঠুক আবার
উদাত্ত উদার—
সে-সুর-নূরের তেজে লুপ্ত হোক যত মিথ্যাভার
মোহ-অন্ধকার।
জ্ঞানের দরিয়া বুকে ঈমানের কিশ্‌তীখানি তব
আবার ভাসুক—
আজি তাই নভে বুঝি ভিড়িছে চাঁদের কিশ্‌তী নব
আলোক-উৎসুক।

নয়া সয়লাব

মরা দরীয়ার কোলে—
দেওয়ানা মউজ জাগিছে কি ফের সয়লাব-কল্লোলে?

শুকনা-সফেদ বালিয়াড়ি ঘিরে কালো-নীল পানি বুঝি
সোতের সোয়ারে চড়ি উল্লাসে নয়া পথ ফেরে খুঁজি।
ভুলে-যাওয়া তার রাহ্-মঞ্জিল আহ্ আজ বালু-বুকে
তামাটে তপ্ত তন্দুরী সম তিয়াসীর দাহে বুকে।
শীতল পানির নিতল গহরে সুক্তির মুক্তারা
যেথায় জ্বলিত শিশির-কোমল আলোকের শুকতারা,
সেথায় হেরেছি জ্বালিয়াছে শুধু সাহারার বালু-কণা;
শূন্য-সলিল মরু-বুকে বুঝি শবনামও জমিল না।
সহসা আজিকে হেরি—

www.pathagar.com

তারো বুকে ঘেরি নয়া জীবনের বাজে তরঙ্গ-ভেরী।

ডোবে-আফ্‌তাব—আলো-তাপ তার নিভে যায় ক্ষণতরে
কভু মাহতাব কভুবা হেলাল তবু জাগে নভ পরে।
সেতারার বাতি জুড়ি সারা রাতি রয় জাগি আঁখি মেলি,
ছায়াপথ-জাগা রোশনীর ছায়া খনে-খনে যায় খেলি।
তারা শেষে যবে নাবে নভে-নভে আঁধারের কালো ছায়া—
তখনি সহসা সুবেসাদেকের জাগে নব আলো মায়া।
তিমির-তটিনী জ্যোতি-সয়লাবে উল্লাসে উঠে হাসি
নিদ্রা-নিবিড় স্তব্ধ নিখিলে বাজে পুনঃ প্রাণ-বাঁশী।
আজানের মধু সুরে—
জাগরণী-বাণী ওঠে রণি-রণি মিনারের চূড়ে-চূড়ে।
হাজারো বছর ছিল যারা সারা দুনিয়ার সেরা জাতি—
ভুলি পথ তার শেষে হলো হায় নিভু-নিভু তারি বাতি।
মুস্তাকিমের মুস্তেক ভুলি গুস্তাখী হলো যত
তারি ফলে তার জীবন-সূর্য হয়েছিল রাহু-গত।
শওকত আর শানের সিন্ধু জ্বাহেলী ভাটার টানে
বালুচর সম উঠেছিল জাগি এইখানে-ওইখানে।
মউৎ-বিজয়ী জেহাদী-যোশের যমযম-বারি-ধারা
ভুলিয়া তাহারা হয়েছিল হায় যৌবন-প্রাণ-হারা।
আবার নিযুত শহীদী বুকের খুন-ঝরা ঢেউ-দোলে
মরু মরক্কো সীমা হতে দূর বালীদ্বীপ জাভা-কোলে
জাগে নয়া প্রাণ-শিখা,
নূতন করিয়া ইতিহাস তারি হবে বুঝি পুনঃ লিখা।

কে দিল সে ডাক

আমারে নীলার বুকে কে দিল সে ডাক—
চাঁদের জোছনা—গড়া নভ-চারী বলাকার ঝাঁক
আলোর পাখায় ভাসি' দিশাহারা চির-উষা পানে
রাতের তিমির টুটি' যে-পথে চলেছে গানে-গানে—
রূপের সুরেলা মায়া রচি' নব আকাশে-আকাশে
নীলিমা-মেখলা যেথা কায়াহীন ছায়া ধরি' হাসে—
সীমাহারা তারি বুকে, বাণী-হীন তারি গীতি-লোকে
কালের বিহগ উড়ে অজানার অরূপ আলোকে।

বিরতি-বিরাম-হারা তারি চির বিধুনিত পাখ্‌—
আমারে নীলার পথে ওগো বন্ধু দিলো কি সে ডাক?
বাদল-সলিল-ধোয়া অমলিন-শরত-গগন

www.pathagar.com

আজিকে নীলেরি গাঢ় সুগভীর স্বপন-মগন—
তারায় তারায় সেথা আলোময়ী অসীম ইশারা
চলিতেছে থাকি' থাকি'—শ্বেত মেঘ-তরী পথ-হারা
উধাও চলিছে ভাসি'—সীমার বাঁধন-টুটা বাণী
আমারে ডাকিয়া যায় তারি বুকে কেন নাহি জানি।

হেথায় মাটির ধরা আকুল স্নেহের বাহু মেলি'—
কুমুদ-কমল-কাশ সুরভিত শেফালী চামেলি,
ছলছল-জল-ভরা তটিনী-তড়াগ সুশীতল—
আমারে বাঁধিতে চাহে জননীর স্নেহে অবিরল ;
অসীম নীলার ডাকে সুদূরপিয়াসী মোর হিয়া
বাঁধন টোটার লোভে খনে খনে উঠে শিহরিয়া—
ভুলিতে পারি না তবু ধরা-মার ব্যথা মাথা আঁখ্—
আমারে নীলার বুকে ওগো বন্ধু তবু দিবে ডাক ?

অনির্বাণ শিখা

অন্ধকার রাত্রি-ধুকে বাদুড়ের ডানার আওয়াজ
যেথায় শতাব্দী জুড়ি রচিয়াছে মৃত্যু-বিভীষিকা—
যেথায় সমাধি-বুকে সদর্পিত সম্রাটের তাজ
ধূলিভস্ম তলে ডুবি ভোলে আত্ম-গৌরবের শিখা ;
সেথায় সহসা হেরি হিরন্ময় আলোর বিভাষ
প্রাচীর দিগন্তব্যাপি নবারুণ মেলে বুঝি পাখা
পশ্চাতে পালায়ে যায় দীর্ঘবাহী অন্ধকার ত্রাস,
অলক্ষ্যে আসিছে ছুটি জ্যোতির্ময় কিরণ-বলাকা।

প্রাচ্যের প্রাচীর ছাপি প্রাণ-বন্যা ওঠে উচ্ছলিয়া
বিদীর্ণ-বেদন ঊষা জীর্ণ-আশা ভয়ার্তের বুকে
সৃষ্টির আন্দর-রসে রচি সিংহ-শার্দুলের হিয়া
উত্তরি শতাব্দীপথ ঝঞ্ঝাবেগে চলিছে সম্মুখে।
কৃষ্ণকায় মহাদেশ কৃষ্ণতর জনসংঘ সাথে
দুর্গম অরণ্য আর গিরি-ঘেরা মরু-দুর্গ গড়ি—
যুগান্ত দীপালী হতে ছিল বহু শতাব্দী পশ্চাতে,
আলোর আহবানে সে-ও আজ হেরি উঠিছে শিহরি।
মেঘনা-পদ্মার বুকে আর গঙ্গা-সিন্ধুর কল্লোলে
নূতন-জীবন-বন্যা ক্ষণে ক্ষণে দেয় আজ সাড়া
দজলা ফোরাত ঘেরি উচ্ছলিত প্রাণ-ঊর্মি দোলে,
পিরামিড শীর্ষ ছাপি নীলনদ আজ আত্মহারা।

www.pathagar.com

হোয়াংহোর পীত বুকে পীত–চর্ম ড্রাগন–সুতেরা
অহিফেন নেশা ছাড়ি কোটি কণ্ঠে তোলে জয়ধ্বনি,
সে বজ্র আরাবে কাঁপি লুপ্ত যত শৃঙ্খলের ঘেরা,
সে ডাকে সুদূর প্রাচী আজ পেলো মুক্তির সরণী।
প্রসবের ব্যথা বহি জাগিতেছে নতুন ধরণী
সহস্র বিভ্রান্তি–ভরা আজ তার নব পথ চলা
অনেক ব্যর্থতা আর বন্ধু–বেশী বহু গুপ্ত ফণী
নভ সে সৃষ্টির পথে রচিতেছে শত বিঘ্ন–জলা।
সে বাধা উত্তরি তবু সৃজনের নব চন্দ্রকলা
রাত্রির তিমির ছাপি গাহিতেছে আলোর গীতিকা
প্রাচীনের ভিত্তি পরে নব প্রাচী আশায় উজ্জ্বলা,
আবার জ্বালালে বুঝি প্রাণদীপ্ত অনির্বাণ শিখা।

উদয়াস্ত

আশা–রঙিন উদয়–আকাশে স্বপ্ন–সবিতা হাসে,
নূতন ফুলের প্রত্যাশা–ভরা দিনগুলি ওঠে–দুলে—
হারা–দিগন্ত কালের সাগরে নতুন তরণী ভাসে,
প্রাণ–উচ্ছল ঊর্মিরা নাচে জীবনের কূলে–কূলে।

কতনা কামনা, কত উদ্যম কত যে উদ্দীপনা
সিন্ধু–গহনে রচিবে নতুন প্রবাল–দ্বীপের মালা,
বন্ধ্যা মাটির বক্ষে আঁকিবে শস্যের আল্পনা,
ব্যথার তিমিরে জ্বালিবে প্রদীপ জীবনানন্দ–ঢালা।

চলমান পথ বাধা–বন্ধুর শত কন্টকে ভরা,
বিষের বীজাণু রয়েছে সেথায় বাঁকে–বাঁকে ওৎ পেতে—
যাত্রীরা যবে চির সে সত্য হয়ে গেছে বিস্মরা
তখনি বুনেছে মরণের বীজ সোনার ফসল ক্ষেতে।

দ্রুত–ধাবমান অশ্বের মতো জীবন বল্গা–হারা
বীজাণু–পিছল মৃত্যু–গহরে ডুবেছে স্খলিত পদে—
ঊষা না ফুরাতে উধাও হয়েছে আলোর রশ্মি–ধারা,
ডুবিয়াছে খেয়া পাড়ি না জমাতে অকালে সিন্ধু–নদে।
কীটের খবর রাখে না যে–জন ফুলের ফসল তারি
ঝরে যায় হায়—সে নহে কখনো জীবন–ফুলের মালী
মৃত্যুর বুকে যারা তোলে প্রাণ–অঙ্কুর সঞ্চরি,
তারাই জগতে সত্য সাধক অমর বিত্তশালী।

মধ্য দিনের অকাল সন্ধ্যা তাদের গগনে কভু

www.pathagar.com

রাতের আঁধার আনেনা বহিয়া বিবশ বেদনা-ভরা—
সংগ্রাম-ঘেরা বিশ্ব-নিখিলে তারাই বিজয়ী প্রভু,
জ্ঞানের আলোকে করিতেছে জয় তারাই মৃত্যুর-জরা।
ঊষার স্বপ্ন তাদেরি জীবনে শান্তির সমারোহে
সাঁঝের ছায়ায় সোনার ফসলে তরণী ভরিয়া তোলে—
বিদায়ের খনে তাদেরি লাগিয়া আকাশ-ধরণী দোহে
লুটায় তিমির-অলক খুলিয়া অস্ত-অচল কোলে।

ধরণীর কামনা-কিষাণ

মাটির গহন-চারী সৃজনের রহস্যের বাণী
অঙ্কুর-ইঙ্গিতে করে যার সনে নিত্য কানাকানি—
আদিম প্রভাতে কবে কুমারী হিয়ার ভালবাসা
সৃজন-সোহাগে-কাঁপা বীজ-লীনা অঙ্কুরের ভাষা—
প্রথম সরমে কাঁপি কিশোরী ধরণী যার কানে
কয়েছিল নত আঁখে কবে সেই বসন্তের গানে—
আজো সেই ভালোবাসা হেমন্ত-ধানের শীষে-শীষে
তৃণে-তৃণে মাঠে-মাঠে শ্যামলে-সোনালী রাগে মিশে
নিরালা আলোর পথে নাম-নাহি-জানা কত ফুলে
সিঞ্চিত শিশিরে ধুয়ে দেয় অর্ঘ্য নিত্য পদ-মূলে
প্রেমে মহীয়ান—
তুমি সেই চির প্রিয়—ধরণীর কামনা-কিষাণ।

স্রষ্টার সৃষ্টির আদি বাণী-হারা মূক বন্ধ্যা বুক
ছিল না সেদিন গীতি, দুলিত না লীলা-নৃত্য-সুখে
পুঞ্জিত শস্যের মেলা দিক্‌-হারা দিগন্ত প্রান্তরে
ঋতুর আবর্তে মাতি সোনালী ফসল থরে থরে
শ্যামল পত্রের ডানা প্রসারিয়া আকাশের পানে
মাটির বন্ধন টুটি' জাগিত না নবাঙ্কুর-গানে—
সে-বন্ধ্যা ঊষর বুকে মর্মের মমতা-সুধা ঢালি'
সৃষ্টির স্বপন-আঁকা চিত্তের আনন্দ-আলো জ্বালি'
হে বন্ধু তুমিই হেথা জাগায়েছ শ্যাম শষ্প-হাসি ;
মঞ্জুল মঞ্জরী বুকে দক্ষিণা বপনে বাজে বাঁশী—
সেও তব দান—
সৃজন-সুন্দর ধ্যানে চির-মগ্ন হে ধ্যানী কৃষাণ।

হলের ফলকে তব পলকে পলকে দাও মেলি'—
মাটির গোপন সুধা-কল্লোলিত কল-নৃত্য-কেলি।—

www.pathagar.com

বীজের অন্তর-শায়ী অচেতন ঘুমন্ত বলাকা
স্পন্দিত পরশে তব দিগন্তের পথে মেলি পাখা
আনন্দে শিহরি উঠে—বক্ষে তার মুক্তি-আকুলতা
আলোর উচ্ছাসে কাঁপে ; স্নেহ-স্নিগ্ধ মাটির মমতা
সে-শিশু অঙ্কুর লাগি আপনারে করি নিঃস্ব লয়
চিত্তের মাধুরী রসে রচে তার পথের সঞ্চয়।
তোমারো অতন্দ্র সেবা রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয় তার বোনা
তাই তার বক্ষে ফলে আনন্দের গুচ্ছ গুচ্ছ সোনা ;
নবান্নের গান—
শস্যের হিল্লোলে তুমি রচ নিত্য হে কবি-কিষাণ।

সে তুমি লুণ্ঠিছ আজি অন্নহীন পথের কাঙাল—
বিবর্ণ কঙ্কাল তনু, আঁখি-কোলে নাই স্বপ্ন-জাল ;
তোমার শ্রমের ফলে ভরিতেছে বিশ্বের ভাণ্ডার
তোমারি ভাণ্ডার শুধু শূন্যতায় করে হাহাকার—
অঙ্গনে-অঙ্গনে তব আনন্দের কলহাস্য-রোল
নবান্নের গন্ধভরা গ্রামান্তের ছায়া-স্নিগ্ধ কোল,
বিরস বিবশ সব—ব্যথা-ম্লান নিথর নিরব—
গুঞ্জরিছে সেথা শুধু লোভ-লুব্ধ বঞ্চনার স্তব।
মাঠে আজো স্বর্ণ ফলে তবু রিক্ত কাঁদে তব ঘর
তৃষ্ণায় মরিছ বন্ধু রহি' নিত্য সুধা-সিন্ধু' পর।
তোমারে বঞ্চিত করি লুণ্ঠে যারা তব অন্ন-গ্রাস
স্বকরে রচিছে তা'রা আপনারি চির সর্বনাশ—
মহা অকল্যাণ—
তার মাঝে শান্তি কোথা কহ কহ হে বন্ধু কিষাণ।

দিগঙ্গনের দিগ্বলয়ে

দিগঙ্গনের দিগ্বলয়ে অস্ত রবি রং মাথায়
পান্থেরা সব ঘর পানে যায় গান গেয়ে শেষ অন্তরায়।
সন্ধ্যা নামে—সন্ধ্যা নামে,
অরুণ দেবের অশ্ব থামে,
সন্ধ্যা নামে গাঁও ঢেকে হায় অন্ধকারের আঙ্‌রাখায়—
দিগঙ্গনের দিগ্বলয়ে অস্ত রবি রং মাখায়।

পক্ষীরা নীড়-অঙ্গনে যায়—পক্ষ-পালে ভাসায় নাও,
গাঙ চিলেরা গাঙ ছাড়ি' ঐ দূর দিগন্তে হয় উধাও—
হাট-ফেরা সব যাত্রি যত
রাত্রি ভয়ে কুণ্ঠাহত

www.pathagar.com

মাঠ পারায়ে ঘাট কিনারে ভীড় করে হায় শেষ খেয়ায়।
গোষ্ঠ ছাড়ি পুষ্ট গাভী যায় ফিরে ঘর ভর সাঁঝে
তুষ্ট রাখাল মিষ্ট মধুর উদাস বাঁশীর সুর ভাঁজে—
কাজলী গাইয়ের আজলা ছানা
দিগ বিদিকে দিচ্ছে হানা—
গো-খুর-তোলা ধুলির জালে সন্ধ্যা-ভালে ফাগ্ ছড়ায়—

সূর্যমুখীর শৌর্য গেল, হাসনাহেনার হাসছে মুখ,
পঙ্কজিনী শঙ্কা-মলিন কুমুদিনীর ঘুচল দুখ,
তপ্ত রবি ডুবল শোকে—
সুপ্তি নামে গাঁয়ের চোখে,
শান্ত সমীর শান্তি বিলায়, ফুল-বনে দেয় দোল শাখায়।

ক্লান্ত-কাতর কিষাণ-কিশোর কাস্তে ছাড়ি' দিন শেষে
চলছে যেথায় কলমী লতায় নীল কমলের দল মেশে,
ছান্' করি সেই ঝিলের জলে
ফিরছে গেহে কৌতূহলে
যেথায় বধূ গাঁয়ের কোলে দীপ জ্বালি' তার পথ তাকায়।
নীলাঞ্জনা দিক-বধূ তার নিলাজ নভের চোখ ঢাকি'
রঞ্জিত-রাগ সন্ধ্যা-ফাগে লাজ-আল্পনা দেয় আঁকি—
মুখর দিনের বিদায়' খনে
গুঞ্জন ভায় কুঞ্জবনে—
অঞ্জনা তার অঞ্জলি দেয় দিন-শেষের ঐ বন্দনায়,
দিগঙ্গনের দিগ্বলয়ে অস্তরবি রং মাখায়।

কামনা

চির-সুন্দর ! তোমার দান
আমারে দাও
প্রেম-সুন্দর ! প্রাণের গান
আবার গাও।
আলো-রঞ্জন ঊষার তট
দেখেছি ভাই,
কালো-অঞ্জন রাতের পট
ভুলেছি তাই।
তরু-পল্লব নিবিড় শ্যাম
মেলিছে কেশ,
রবি-বল্লভ কুসুম দাম

www.pathagar.com

মধুর বেশ।
বন–অঞ্চল দোদুল দোল
দখিনা বায়,
চল–চঞ্চল সমীর কোল্
আজি সে চায়।
ছায়া–গুণ্ঠন সাঁঝের ভাল্
তারার টীপ্
করে লুণ্ঠন কথার জাল
সুরের দীপ।
চির–সুন্দর ! তোমার দান
আমারে দাও—
প্রেম–সুন্দর প্রাণের গান
আবার গাও।
শ্বেত মর্মরে হিয়ার ফুল
হেরেছি তাজ—
বন–মর্মরে মনের ভুল
ভুলেছি আজ।
নভ–অঙ্গনে উঠেছে চাঁদ
রূপের হাট
আলো–অঙ্গনে পেতেছে ফাঁদ
ধরণী–বাট্
চির–বঞ্চিত বিরহী মন
কাহারে চায়,
সুধা–সিঞ্চিত কুসুম–বন—
কি দিবে তায় !
নীল–বন্দরে সাগর জল
আনিছে ঢেউ,
গিরি–কন্দরে আলোর ফল
বুনিছে কেউ।
চির–সুন্দর ! তোমার দান
আমারে দাও—
প্রেম–সুন্দর ! প্রাণের গান
আবার গাও।

নদী–পল্লবে দেখেছি দোলে
কুমুদ–কাশ্
জল–কল্লোলে কে নিলো কোলে
মরাল–হাঁস।

www.pathagar.com

লতা-বন্ধনে দিয়াছে ধরা
বিটপী দল,
ফুল-চন্দনে দেখেছি ভরা
তমাল তল।
অলি-গুঞ্জনে রণিছে গীতি
প্রেমের স্তব,
মধু-গুঞ্জনে মধুপ নিতি
পেলো কি সব?
সুধা-সঙ্গীতে নিখিলে জাগে
অলকা-পুর—
উষা-ইঙ্গিতে ধরণী মাগে
আলোর সুর।
চির-সুন্দর তোমার দান
আমারে দাও—
প্রেম-সুন্দর! প্রাণের গান
আবার গাও।

কালের পাতা

যায় বয়ে যায়—
মহাকাল-কল্লোলিনী শ্রান্তিহীন পায়—
কে জানে কোথায়?
নিঃসীম ব্যাপ্তির পথে নিঃশঙ্ক যাত্রায়
পল আর মুহূর্তের মাত্রায়-মাত্রায়
রাত্রি আর দিবসের নিত্য আলো-ছায়া
বেগ আর গতির ভেলায়
কোন্ স্বপ্ন-কল্পনার নীহারিকা মেঘে
নিগূঢ় আবেগে
যুগ আর শতাব্দীর তরঙ্গ-দোলায়
মহাকাল স্রোতস্বিনী যায় বয়ে যায়—
কাহার সন্ধানে—
কেহ নাহি জানে।
শুধু হেরি সীমাহীন সম্মুখের পানে
আদি সৃষ্টি-মন্ত্র-জাগা স্তব্ধ গানে-গানে
নব-নব বিকাশের সৃষ্টি-সুধা পিয়া
যায় সে ভাসিয়া
অসীমের নায়

www.pathagar.com

কে জানে কোথায়?
এই দ্রুত ধাবমান গতির রেখায়
নভোচারী রবি-করে পূর্ণেন্দু-লেখায়
অকলঙ্ক অনির্বাণ আলোর মালায়
জ্যোতিষ্ক জ্বালায়
অফুরন্ত বর্ণের মায়ায়
সন্ধ্যা আর প্রভাতের সুদীর্ঘ ছায়ায়
আঁকা হয়ে যায়
নিত্য নব অঙ্কুরিত নূতন অধ্যায়—
কালের পাতায়।
এই বসুন্ধরা—
কত প্রেম-প্রীতি আর কত স্বপ্ন-ভরা
সুষমা-সৌন্দর্যময়ী চিত্ত-মনোহরা,
জীবন-স্পন্দন ঘেরা আনন্দ-পসরা—
এই বসুন্ধরা—
কোন্ দূর কোটি কল্প অনাদি অতীতে
সৃষ্টির আদিম প্রাতে প্রথম সংগীতে
বাণীর মঞ্জীর-তালে স-নৃত্য ভংগীতে
বিশ্ব-বরণীতে
অকল্প অরূপ মাঝে রূপের সম্বিতে
অতি অলক্ষিতে
উঠেছিল জাগি—
সুপ্তি-ঘোর মায়া-মগ্ন মহা তন্দ্রা ত্যাগি—
কবে সে জানি না;
শুধু জানি অন্তরীক্ষ-অন্তর-আসীনা
অনাহত অনাদির বাণীহীন বীণা
সে-কথা আঁকিয়া গেছে প্রস্তরে প্রান্তরে
মাটির গহন বুকে প্রতি স্তরে স্তরে
কান্তারে গহরে
সমীর-প্রবাহ-বাহী নভাঙ্গন পরে
লক্ষ লক্ষ জ্যোতির্ময় তারার আখরে
দীপ্ত অমলিন।

তারো আগে কত বর্ষ কত লক্ষ দিন
মহাকাল বক্ষ রোলে হারায়েছে বিন্
বিস্মৃতি বিলীন।
এই গন্ধ-গীতি-ময়ী বর্ণ সুরঙীন
বসুধা নবীন

www.pathagar.com

সেদিন আছিলো যেন সুর-হারা বীণ
রূপাতীত অরূপের প্রজ্ঞা সমাসীন।
শুধু এক মহা পুণ্য স্পন্দনবিহীন
মহা মৌন অস্তিত্বের স্তব্ধ ধ্যান-লীন
ছিল সর্বক্ষণ;
আধো আলো আধো ছায়া তমিস্রা-মগন
আছিলো সে অন্তহীন কোটি বর্ষ ধরি'
কর্ম-কুণ্ঠ নৈঃশব্দের নিঃসীমে সঞ্চরি
নিঃসঙ্গ একাকী।
তারি মাঝে অকস্মাৎ কে উঠিল ডাকি'
কামনার মুক্তপক্ষ পাখী;
সে ডাকে উঠিল কাঁপি স্তব্ধ মহাকাশ
সে ডাকে উঠিল জাগি তৃষা তপ্ত আশ
সৃষ্টিময়ী প্রকাশের লাগি।
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুবুকে নব ঊর্মি জাগি
উঠিল শিহরি—
জাগিল কল্লোল-দোলা মহাশূন্য ভরি
তরঙ্গ-কম্পিত;
উচ্চারিত হল বাণী সৃষ্টি মন্ত্রঃপুত
"হও বিশ্ব হও আবির্ভূত।"
এলো সৃষ্টি আনন্দ-স্পন্দিত
নন্দন-নিন্দিত—
গীতি-গন্ধ ছন্দ-পুলকিত;
এলো দীপ্ত প্রাণ-বহ্নি-কণা
সৃজন-কম্পন-জাগা বিস্ময়ী চেতনা
বিশ্ব-অসীমায়;
অনন্ত সে দিল ধরা সীমায় সীমায়
নিত্য নব সৃজন লীলায়।
অনাদি শিল্পীর আর অনাদি স্রষ্টার
বিশ্ব রচনার
হল শুরু রেখাঙ্কন আদি কল্পনার
মুগ্ধ মমতায়—
কালের পাতায়।

শুকতারা

এসেছিলে তুমি ঝঞ্ঝা-নিশীথে অন্ধ তিমির তলে,
বিদায় নিয়েছ শুক-তারা হয়ে ঊষসীর অঞ্চলে।

www.pathagar.com

হিন্দ্‌-জোড়া শত জিন্দান-গাহে সেদিন বান্দা যত
অত্যাচারীর পদ-বন্দনা গেয়ে যেত অবিরত—
জিন্দেগী ছিল জিঞ্জিরে বাঁধা—মঞ্জিল আঁধারে ঢাকা,
গিয়েছিল ভুলে কওমী-ঝাণ্ডা তারকা-চন্দ্র আঁকা।
গিয়েছিল ভুলে—অর্ধ ধরণী তাহারি অঙ্ক-কোলে
হয়েছে ললিত হাজার বছর জীবনের হিল্লোলে।
তারাই সেদিন হায়—
পড়েছিল ঢলে মুর্দার সম মৃত্যুর প্রচ্ছায়।

সেই শুম্‌শাম্‌ সমাধি-নীরব নিরাশা-অন্ধকারে
জ্বালাইলে তুমি আশার মশাল জ্যোতি-রাগে আন্‌ধারে।
আনিলে আবার প্রাণের জোয়ার স্তব্ধ তটিনী-কূলে
ভাসালো কিশ্‌তি মাল্লারা ফের দিকহারা পাল তুলে।
নোঙ্গর-টুটা নয়া হিম্মতে বাধার সিন্ধু-বুকে—
রচিবে তাহারা নব মঞ্জিল অভয় সৃষ্টি-সুখে।
হে নব সিন্দাবাদ
জাতির জীগরে জাগাইলে তুমি হাজারো স্বপ্ন-সাধ।

এসেছিলে হেথা মর্দে-মুমিন সিংহ-শাবক তুমি
মুক্ত আজাদ করে গেলে তব বন্দী জন্মভূমি।

কালি কলম মন

কালির আখরে কলমের মুখে
যাহা কিছু লিখ ভাই,
মনের গহনে আঁকা নাহি হলে
দাম তার কিছু নাই।
যত বোল্‌চাল্‌ আওড়াও মুখে
পেটো যত ঢোল ঢাক
সত্যের বাণী সে যদি না হয়
রহো তবে নির্বাক।
কালির আখরে করিও না কালো
মুক্তির সোজাপথ
বুকের রক্তে এঁকে যাও তুমি
যুক্তির অভিমত।
তোমার কলম নাহি রচে যেনো
মিথ্যার স্তুতি গান
মানব মনের তার চেয়ে বড়ো
নাহি কোনো অপমান।

www.pathagar.com

অত্যাচারীর হত্যা-ভয়াল
শাসন শোষণ যত
তব কলমের কালি-আঁকা বাণী
রোখে যেনো অবিরত।
অজ্ঞানতার কৃষ্ণ রজনী
ভ্রান্তির ব্যথা-সুর
তোমার মনের জ্ঞানের আলোকে
চিরতরে হোক্ দূর।
বিশ্ব জুড়িয়া দুখীর কান্না
অপমান অনশন
মহান মনের সুধার পরশে
হোক চির নিরসন।
কালি কলমের কোমল রেখায়
মানব মনের দান
পুঁথি-ভাণ্ডারে হোক সঞ্চিত
মানবতা জয়-গান।

মোনাজাত

দিলের মিনার শূন্য আমার
মুয়াজ্জিন, কত দেরী—
আজানের নূর জ্বালিবে না, নাশি
জুলমাত্ আন্ধেরী?
*　*　*
ওয়াক্তে-ছালাত হতেছে করীব
মোক্তাদি সব খাড়া,
আঁসূর পানিতে অজু সবাকার
হয়ে গেছে কবে সারা।
বেদিল জালিম তারি ফাঁকে ফাঁকে
কুফরীর তীর হানে,
কাতার-বন্দী মোমেনেরে ভেজে
মউতের সন্ধানে
জামাতেরে টুটি আনে সে ক্ষণিক
ঘোর অন-শৃঙ্খলা,
দ্বীনি-মেহেরাবে নাড়া দেয় বুঝি
মোনাফেকী জ্বেলজ্বেলা।
আসে নমরূদ আসে ফেরাউন,

www.pathagar.com

আসে নব আবরাহা,
ঝুটা মোন্তেকে ধরারে জড়ায়
'লায়লাহা'–আজদাহা।
ছফেদ ইমানে হানে কালো দাগ
আনে ঘোর সন্দেহ,
তারি মউজের অতল আঁধারে
চিরতরে ডুবে কেহ।
দিলের মিনার শূন্য যে মোর
মুয়াজ্জিন, কত দেরী—
আজানের নূর জ্বালিবে না, নাশি
জুলমাত্ আন্ধেরী?
* * *
কেহ আনে হেথা মোর্শেদী নামে
আল্লার শরীকানা,
কবরেরে ঘিরি রচে নব নব
ছেজদার বোতখানা।
কোরানেরে ভুলি ফাসেকি বাণীরে
রূহানী ছবক রূপে
কেহবা ধরিয়া ডুবেছে অতল
কুফরী অন্ধকূপে।
আল্লা নহেন, নবীজী নহেন,
লোভ তার হলো হাদী,
উম্মী বোঝে না—বসিয়াছে এরা
ব্যবসার ফাঁদ ফাঁদি।
যারা হেথা খাঁটী নায়েবে-রছুল
ধনে তাঁর লোভ নাহি,
সেই ছালেহীন কোথা আজি ভাই,
আছি তাঁরি পথ চাহি।
বুকে মুখে তাঁর 'আল্লা' জেকের,
খোদা-প্রেম আঁসু চোখে,
ব্যথিতের ব্যথা শেল হানে দিলে,
কেঁদে ফেরে তাঁরি শোকে।
সারা মানবের খেদমতে শুধু
ফেরে তিনি দেশে দেশে,
সত্যের তরে তিনি যে দাঁড়ান
মৃত্যুরও পাশে এসে।
লোভ-মোহ তারে পারে না ভুলাতে
ভ্রান্তির পথ-বাঁকে,

www.pathagar.com

দুনিয়াতে তিনি ডরে না কাহারে
ছেওয়া এক আল্লাকে।
আলেমীর আর বে-ইনসাফীর
যেথা ক্রুর আগ্ জ্বলে,
বাদশাহী-আর বাদশারে সেথা
দলে তিনি পদতলে।
কোমল-কোমল দিল্ তাঁর সাদা,
তবু তিনি বীর-বাহু,
যাহাদের মাঠে ফিরেন গরজি
'লা-শরিক আল্লাহু'।

নিলের মিনার শূন্য যে মোর,
মুয়াজ্জিন কত দেরী—
আজানের নূর জ্বালিবে না, নাশি
জুলমাত আন্ধেরী?

* * *

সবদর জঙ্গে অহুদ
আজো শেষ হয়নি তো,
...মোশরেক ইহুদী নাছারা
ফাছেকেরা আছে যতো—
সন্ত্রাসের শত সে যন্ত্র
রচি তব চারিপাশে
তোমারি বিনাশ আশায় নাচিছে
পৈশাচ উল্লাসে।
খারেদজ্জাল জাগিছে এবার
কোহকাফ গিরি-পারে,
ইয়াজুজ আর মাজুজেরা তাই
শান দেয় তলোয়ারে।
তোমার শুকনা হাড়-মাসে আজো
লোহু লাল আছে কিনা—
তারি যে পরখ চলে দুনিয়ায়
নিষ্পেষি তব ছিনা।
জায়নামাজের জায়গা যে ডোবে
তারি লহু ছয়লাবে,
দোবারা সে অজু জিন্দারা করে
সেই তাজা খুনী আবে।

* * *

ছাবেরীন সাথে আছেন আল্লা

সে কথা তো ঠিক জানি,
দিল তবু আজ বড় পেরেশান
লা'য়ানতি ঘানি টানি।
ইমাম আমারে দাও আজ খোদা
মুসলিম মোত্তাকি—
ইমানে-আমানে যে হবে মোমেন,
কোনোখানে নাই ফাঁকি।
ঝুটা ছিয়াছৎ যাঁর পেশা নয়
মোজাহেদ যিনি খাঁটি,
সোনা-দানা নহে, যাচে যিনি শুধু
জেহাদের ধুলি-মাটি ;
উঁচা প্রাসাদের আসমানে বসি
লাখো সে তনখা গুনি
বাজাবে না যিনি নকল ত্যাগের
কান-ফাটা ঝুনঝুনি।

শাওন গাঙের পানি

এই শাওন গাঙের পানি—
আমার নাইয়া উজান বাইয়া
গেলো কুণ্ডাই জানি গো—
গেলো কুণ্ডাই জানি।

নদীর যৈবন আইলো পানি কূলে-কূলে,
বিলের যৈবন আইলো পদ্ম ফুলে-ফুলে,
আমার যৈবন আইলো কান্দি আউলা চুলে গো—
আমি কান্দি আউলা চুলে।

আমার মনের নায়ের মাঝি বৈদেশেতে ঘুরে
নয়া বৌ-এর নায়র লইয়া সোনার পুরে-পুরে।
পূবাল বাতাস লাইগ্যা পালে
ডোর ছিঁড়ে তার বৈঠা-হালে,
বৈদেশিনী মায়ার জালে রে
তার বাছা পরাণ-খানি।
এই শাওন গাঙের পানি।

আসমানে তার জাগলো বুঝি নয়া চান্দের ফালি,
আন্ধা ঘরে একলা আমি কাইন্দা মরি খালি—
অন্য চরে সোঁতের পানি আমার চরে বালি রে ভাই
আমার চরে বালি।

www.pathagar.com

বাইস্যা পানি পাইয়া রঙ্গে বনের মাতামাতি,
মাঠের বুকে হাইস্যা উঠে সবুজ ধানের বাতি,
আমার ভাঙা বুকের ঘরে—
আজ্ঞিখ বাইয়া শাওন ঝরে,
টাইন্যা চলি কার তরে রে
এই নিত্য দুখের ঘানি।
এই শাওন গাঙের পানি।

ওগো জাগর-মন্ত্র-দাতা

নয়া সূর্যের তির্যকীত রশ্মিফলা
ভেদ করেছে তিমির-ব্যাধের বক্ষ বুঝি,
তাই তো আলোর হরিণ-শিশু প্রাণোচ্ছলা
ফিরছে নাচি' শ্যামল তাজা বিশ্ব খুঁজি'।

পুঞ্জিত রয় নিত্য প্রাণের পুঁজি
মৃত্যু-জয়ী সেই দেশে যে যাত্রা তারি—
চিৎ-কোকনদ নিঁদেও যেথা প্রাণের পুঁজি
জাগৃতির সেই অর্ণবে সে জমায় পাড়ি।

কূল-হারা সেই সিন্ধু-তরীর মাল্লা-দাঁড়ী
হালের মাঝি—পালের বেগে চলছে যারা,
তারাই পারে উত্তরিতে ঢেউ-এর সারি—
তারাই আনে মেরুর বুকে প্রাণের সাড়া।

তারাই রচে তুহিন-তটে স্রোতের ধারা—
কল্লোলিত স্রোতস্বিনী সাগর-বাহী;
রিক্ত পাষাণ সিক্ত করি' আপন হারা
তারাই চলে নিত্য ফুলের ছন্দ গাহি'।

সেই সরণীর তুমিও কবি মূর্ত রাহী,—
মৃতের বুকে আনলে নয়া জীবন-গীতি,
শঙ্কিতেরে কইলে ঃ জাগো শঙ্কা নাহি,
অ-ভয়েরে ভয় যে পাবে স্বয়ং ভীতি।
তারি পায়ে পড়বে লুটি' বিশ্ব-ক্ষিতি,
সম্ভ্রমে আর শ্রদ্ধাভরে যুক্ত-পাণি—
জয়-ধ্বনি জাগবে তারি নিত্য-নিতি,
মর্ত্য জুড়ি' গুঞ্জিবে সেই মন্ত্র-বাণী।

কবি তোমার মূর্ছনা সেই জানলো জানি
মূর্ছিত আর মরার দেশে বহ্নি-জ্বালা,

www.pathagar.com

মিথ্যাচারী ভয়ের বুকে বজ্র-হানি'
আঁধারেরে করল আবার আলোয় আলা।
স্তব্ধ শিরায় জাগলো জীবন রক্ত-ঢালা,
গোলাম হলো আযাদ মানুষ শৌর্য-শাণ
দাসের গলায় দুলল আবার বিজয় মালা—
ঝাণ্ডা তাহার রচল তারা –চাঁদের ফালি

অশ্রু নহে—বক্ষ-ঝরা শোণিত ঢালি'
গড়ছে আজি তারাই দেশের দুর্গ যত
তোমার গাওয়া জঙ্গ-উতলা গজল খালি
হর্ কদমে আজো তাদের কণ্ঠ-গত।

সেই তোমারি কণ্ঠ হায় রে নীরব-নত
আর শুনি না বজ্র-ভরা জীবন-গাথা—
যোশ-সায়রে ঢেউ জাগায়ে লক্ষ শত
জাগবে কি ফের ওগো জাগর-মন্ত্র-দাতা?

দুয়ার খোলো রে

ভাঙ্গা ঘাটের জঙ্গ-এ খাওয়া
নোঙ্গর তোলো রে
বান্ধা পানির আন্ধা মোহের
শিকলি খোলো রে।
ও ভাই নোঙ্গর তোলো রে।

কাল্ দরিয়ার তল্-জোড়া ভাই নিমক-জহর পানি
তার বুকে ভাই জোয়ার-ভাটার চলছে কানাকানি
ও ভাই চলছে জানাজানি।
সেই দরিয়ার গহীন তলে মুক্তা-মানিক জ্বলে,
সেই খানেতে হাজার প্রাণের স্রোতের খেলা চলে—
তেমনি কইরা খুশীর বাতি জ্বাইল্যা বুকের তলে
ও ভাই পাহাড়-ভাঙা প্রাণের দোলায়
আপনি দোলো রে।
ও ভাই বেদনা ভোলো রে।
অনেক বাধার বেড়ার জালে ঘেরাও তোমার বাড়ী
তোমার নদীর বক্ষে মোহের চর যে সারি-সারি
সেথায় চলবে না রে পাড়ি।
নীল গগনের খিল্ নাহি রে—নাই রে সীমা নাই
সেই মুলুকে জাগছে ছলক কূল-ভুলানী ঠাঁই,

www.pathagar.com

সেই অকূলের ফুল-ভেলাতে চলবে এবার ভাই—
সেথায় চান্দ-সুরুযের বাইন্ধা রশি
ঝুলন ঝোলো রে
ও ভাই দুয়ার খোলো রে।

বন্ধু হুঁশিয়ার

আসমানে ঝড়ের লালী, দরিয়াতে ঢেউ ;
বন্ধু হুঁশিয়ার !
তুফানে পড়িলে বন্ধু রয় না সাথে কেউ
ও হায় আঙ্খি মুছিবার।
বন্ধু হুঁশিয়ার॥

যে-গঞ্জে যাইবারে বন্ধু, দূরের সে যে পথ,
বাঙ্কে বাঙ্কে ঘুরছে হে ঠাঁই মউতী আফত ;
সে গাঙে পাড়ির লাগি কিস্তি মেরামত—
না হইলে অতলে ডুইব্যা হইবা ছারেখার।
বন্ধু হুঁশিয়ার॥

বন্ধু রে—হাঙ্গর-কুম্ভীর ফিরে সে-নদীর জলে,
সর্প আর মাণিক্য খেলে সে-জলেরও তলে ;
সুযোগে শিকার পাইলে গিলে ছলেবলে
ও তারা গিলে পলে পলে।
সে ফান্দে পড়িলে বান্ধা না-পাইবারে পার।
বন্ধু হুঁশিয়ার॥
এপারে খেয়ার ঘাটা ছাওয়া ফুলে ফুলে,
এই না দেইখা কাঞ্চা বন্ধু না যাইও রে ভুলে ;
সে-ফুলে সাপেরা খেলে বিষের ফণা তুলে
আহা নাচের দোলায় দুলে,
ঐ রূপ-দরিয়ার কূলে।
সে-ঠাঁই গেলে নাই রে আশা জিন্দা ফিরিবার
ও হায় পরাণ পুষিবার॥
বন্ধু হুঁশিয়ার॥

কালের ইশারা

বয়েস আমার ভাই
দুই কুড়ি পার—

আজ জাগে মন জুড়ি
কথা পারাবার ;
জীবনের সুখ-দুখ,
ভাটা ও জোয়ার
আসি বার বার—
আয়ুর নদীর বুকে
পলিমাটি ভার
জমায়েছে বহু—
অনেক কলিজা-ঝরা
চোট্-লাগা লোহু
কালো-কালো ছক্ করা
কত দাগ কাটি—
সে পলিমাটিতে আছে মিশি—
আঁখির বাদল-ভরা বহু অমানিশি
সেখানে ঘুমাইয়া আছে চুপে
দুখের বোশেখী দিনে
তাপ-ভরা ধুপে
সে মাটি যখন যায় ফাটি
লালসা-লোহিত আঁখে
লোভের দানব যত
নিঠুর চরণে যবে
যায় হাঁটি হাঁটি
তারি বুক দলি—
খোদার আরশখানি
তাহারি অসহ ভারে
উঠে বুঝি টলি।

*   *   *

দুনিয়ার বুকে
লোহুর ঢেউ-এরা আজ উঠিয়াছে রুখে
লাখো ছয়লাবে
সে ঝড় মাতনে আজ
কেবা ঠাঁই পাবে—
কূলের কিনারে
অথবা অতল পথে
পাতালের দ্বারে
কে কহিবে ভাই ;
আজ বুঝি তাই

www.pathagar.com

আমাদের পড়িয়াছে ডাক
তোমার স্বকরে খোঁড়া
　　　　শত নদী বাঁক
লাখো-লাখো আঁখি-ঝরা
　　　　আসুঁ-নীরে ভরা—
নিযুত্ কলিজা-ছেঁচা লহুর পশরা
যেথা জমিয়াছে
তারি কাছে-কাছে
আমাদের কাঁচা দেহ-গাছে
　　　　রচা চাই বাঁধ।
বন্ধু সেই আশার আহ্‌লাদ
　　　　আজ বরবাদ—
আর নাই সাধ
ছলনার ত্যাগ-অভিনয়ে।
তোমাদের বোঝা বয়ে বয়ে
আজ আমাদের
　　　　কূজোঁ শিরদাড়া।

*　　　　*　　　　*

এলো ঐ কালের ইশারা—
তাই তব শির পরে
　　　　ঝুলিতেছে খাড়া
মৃত্যুর শমন—
　　　　আজ অনুখন।

*　　　　*　　　　*

　　　　তাতে মোর কি?
আমার শোণিত-রাঙা লাল সুর্কি
　　　　আর মোর পাঁজরের ইঁট
গড়িয়াছে শত-তলা
তব পাকা ভিট
　　　　মজবুত করি—
মোর সেই হাড়-মাস নব রূপ ধরি
আজ যদি তব উঁচা প্রাসাদের চূড়া
　　　　হাতুড়ি-শাবল হানি
　　　　করে গুঁড়া গুঁড়া
মোর তাতে কি?
মোর আঁতে কি
ভাত-বিনা-ঠন্-ঠন্-মোর পাতে কি
　　　　সে পতনে লাগিবে হুচোট্?

www.pathagar.com

ফাঁকা কথা বাহানায় দোস্তির জোট
বাহাবা—বাহাবা বলি বড়দের মোট
গরীবের শিরে বহানোর,
করমী খাদেমী নামে যত তোড়জোড়
আজ চুরমার—
লোলুপ-নজর-ঢালা কালো সুর্মার
যত জুরিজারি
মেহেদী-পাতার খুনে আধোলাল দাড়ি
জোশের বাতাসে যারে দেয় নাড়ি নাড়ি
সন্ধ্যা-সকাল
সব বানচাল।
চাষীর খামার লুটি যত ধান-চাল
উপাসী দেশেরে শোষি যত জান-মাল
কুলির কলিজা টুটি যত খুন লাল
হইয়াছে জমা—
নাই তার ক্ষমা
কোনোখানে আজ।
বিনা মেঘে বাজ
আজ তাই জ্বালিমের
খোঁজে শির-তাজ।
শোনো বন্ধু শোনো ঐ
যুগের আওয়াজ।

অমৃত সন্তান

হে কায়েদ নূতন দিনের!
নূতন সূর্যের মতো
নূতন জীবন রশ্মি
তুমি আনিয়াছ
আমাদের আঁধার আকাশে!
তুমি নাহি যাচ
কভু কারো পাশে
কোনো প্রতিদান।
তবু তব আলোকের বান
প্রতিদিন চলেছে ভাসায়ে
আমাদের কুটির অঙ্গন,
আমাদের সর্ব দেহ মন

www.pathagar.com

নিত্য অনুক্ষণ।

* * *

আকাশের পাখীদের মতো
আমাদের প্রাণ-বিহঙ্গম,
কামনা-কর্দম ছাড়ি
নীল-নভ-সাগর-সঙ্গম
আজ ফেরে খুঁজি।
শাশ্বত মুক্তির এই পুঁজি
সে যে তব দান।

দাসত্বের কারারুদ্ধ প্রাণ
হেথা আজ পেয়েছে সন্ধান
অফুরন্ত জীবন উৎসের—
বিশ্ব-ছাওয়া মুক্তি-মানসের
নব পরিচয়।
যেই জানা হয়েছিল লয়
বহু যুগ-শতাব্দীর সঞ্চিত জঞ্জালে—
যুক্তিহীন গোঁড়ামীর ছন্দহীন তালে
যে-সঙ্গীত প্রাণধারা ভুলেছিল পথ
যুক্তির আলোক দীপ্
তব সূর্য্য-রথ
সে হারানো পথের সন্ধান
করিয়াছ দান।

* * *

আমরা আবার আজ আলোক-পিয়াসী
নভোচারী চাতকের মতো—
স্বার্থের শকুনী-দিঠি গূঢ় গুহাবাসী
নীচ-গামী পাতাল অতল—
সহস্র বন্ধন আর লুব্ধ ফাঁদ শত
আসি অবিরত
আমাদের সংকল্প অতল
চাহিছে টুটিতে—
সে-বাধারে দলি পদতলে
আমাদের হৃদয়-কমল
তবু আজ চাহিছে ফুটিতে
নব স্বপ্ন-নভে।

তেরোশ বৎসর আগে কবে
হেরার গুহায়

যে আলোক ভাস্বর ছটায়
করেছিল নিখিল প্লাবিত
বিশ্বের মঙ্গল-আশে সর্ব-সমর্পিত
ত্যাগ-দীপ্ত সে আলোর কথা
আমাদের হিয়া
আজ পুনঃ তোলে উদ্ভাসিয়া।

*   *   *

হে কায়েদ নূতন দিনের—
এও তব দান
মিথ্যার আঁধার টুটি
আলোকের এ গান
এও তব দান।

*   *   *

মৃত্যুরে দলিয়া তুমি আনিয়াছো প্রাণ
সমাধির বুকে
নূতন আলোকে।
প্রদীপ্ত সূর্যর লাগি
সন্ধ্যা নহে চির অন্তর্ধান
নূতন প্রভাত-পথে
এ যে তার নূতন আহবান।
হে কায়েদ নূতন দিনের
মৃত্যু নহে তব অবসান
জীবন্ত সূর্যের মতো
বিশ্বের মানস-লোকে
তুমিও যে মৃত্যু-জয়ী
অমৃত-সন্তান।

হিমালয়

মূল : মুহম্মদ ইকবাল
অনু : বে-নজীর আহমদ

(১)

হিমালয় ! হিমালয় ! হে ভারত-সাম্রাজ্য-প্রাচীর !
আকাশ আনত শীর্ষে নিত্য চুমে তব উচ্চশির।
কালের কঠোর চিহ্ন তোমাতে অঙ্কিত নাহি হয়,
অম্লান যৌবন তব করিয়াছে সন্ধ্যা-ঊষা জয়।

www.pathagar.com

'সিনা'র পাহাড় ছিল জ্যোতির্ময় শুধু মুসা তরে,
তুমি পূর্ণ জ্যোতিবিন্দু নিখিলের সর্ব আঁখি পরে।

(২)

বাহিরের চর্মচোখে তুমি শুধু প্রস্তর পাষাণ,
সত্যদৃষ্টি কহে তুমি ভারতের রক্ষক মহান।
সপ্ত-স্বরা গগনের সুনির্মল প্রথম আকাশে
তোমার প্রাসাদ-চমু বিরাজিত সগৌরব হাসে।
মনের গহন গেহে যে-বাণী নিভৃতে একা ফিরে
তাহারি জিজ্ঞাসা নিয়া মানস ধাবিত তব তীরে।
তুষার তোমার শিরে পরায়েছে উষ্ণীষ-গৌরব
প্রদীপ্ত জ্যোতির পানে চাহি সে যে হাসিছে নীরব।

(৩)

অনন্ত অতীত কাল কোথা গেছে নাহি জানি ঠিক,
বর্ষীয়ান তব কাছে সেও শুধু মুহূর্ত ক্ষণিক।
উপত্যকা-কোলে তব কৃষ্ণমেঘ রচে চন্দ্রাতপ,
তোমার শিখর সনে সপ্তর্ষিও চলে মন্ত্র-জপ।
মৃন্ময়ী ধরণী-বুকে যদিও সে বিরাজিত তুমি—
তব সত্য অধিষ্ঠান নীলাঞ্জনা ঊর্ধ্ব নভঃভূমি।
তব উৎস-ঝর্ণা যেন কল্লোলিত স্ফটিক চঞ্চল
অনিল-হিল্লোল ওঠে তব তরে প্রিয়ার অঞ্চল।

(৪)

প্রভঞ্জন-গতি-পথ রহিয়াছে কৃষ্ণ ঘন-করে,
বিদ্যুৎ-বল্লরী-লীলা বিথারিলে সেই মেঘ পরে।
হিমালয় ! হিমালয় ! তুমি ক্রীড়া-আনন্দ-অঙ্গন—
জড়ের ক্রীড়ার লাগি' স্রষ্টা তোমা করেছে সৃজন !
চঞ্চল মেঘের নৃত্য হেরি যবে তব শীর্ষ পরে
উদ্বেল আনন্দে কাঁপি' আঁখে মোর সুখ-অশ্রু ঝরে।
এখানে যে হয়, করিদল চিরমুক্ত শৃঙ্খলবিহীন
উড্ডীন বিহঙ্গ সম শূন্যপথে হতেছে বিলীন।

(৫)

ঊষার সমীর স্নিগ্ধ আলোড়িত তোমারি লাগিয়া
তব তরে শিহরিছে নিখিলের প্রতি-পুষ্প-হিয়া।
পত্রের নীরব স্থিতি—সেই তার অকথিত বাণী,
ফুলের চয়ন রব—সে-বাণী কখনো নাহি জানি।
সে যেন কহিছে শুধু—নীরবতা সেই মোর বাসা।

www.pathagar.com

(৬)

তোমার অঙ্গন হতে বহে নদী সঙ্গীতমুখর,
পিযুষ-অমৃত সুধা—তব বারি তারো শ্রেয়তর।
সুনির্মল বারি তব সে যেন গো সৃষ্টির মুকুর,
বক্ষে তারি সারা বিশ্ব হেরিতেছে বিশ্ব-সুমধুর।
সরিৎ-প্রবাহ তব বহে নাচি' নৃত্য-সাবলীলা।
যুগল ইরাক-প্রিয়া—তাহাদের মত কলগান,
তোমার সরিৎ পাশে—সে যে শুধু শিশুর সমান।
হে পথিক ! হে চঞ্চল। চিরযাত্রী হে নদীপ্রবাহ।
চিত্ত যেন বুঝিতেছে নিত্য তুমি কী সঙ্গীত গাহ।

(৭)

নিশার লাইলী যবে এলাইয়া দেয় বেণী তার,
তোমার নদীর বাণী ডাকে মোরে ডাকে বারম্বার।
গোধুলীর নীরবতা শান্ত স্তব্ধ, আনম্র, আনত
তারি লাগি দিনু বলি বিশ্বের মুখর বাণী যত।
প্রতি বৃক্ষ, প্রতি পত্র, প্রতি শস্প-তৃণ-পুঞ্জ মাঝে
গহন মৌনতা—ঘন কি যেন সে চিন্তা-ছায়া রাজে
সন্ধ্যার সোনালী আভা তোমার শিখরে যবে কাঁপে
কপোল-নিকুঞ্জে তব বিশ্ব যেন মধুচন্দ্র যাপে।

(৮)

হিমালয় ! হিমালয় ! কহ কহ অতীত কাহিনী,
যেদিন আদিম নর প্রথম কুটীর গেহখানি
রচেছিল বক্ষে তব, সৃজনের উদ্বেল আশায়
কৃত্রিম কুহক-ছাপ ঢালেনি কালিমা যবে তায়,
সেদিনের পুণ্য-পূত জীবনের বাণী কহ কহ—
সরল কলঙ্কহীন সে আদি আনন্দ আজি লহ !
হে কল্পনা সাথী মোর। চল মোরা যাই পুনঃ ফিরে,
সেদিনের চিরশান্ত মৌন-পূত ঊষাসন্ধ্যা-তীরে,
হে কাল-গতির চক্র। নিত্য তুমি কোন দূরে ধাও !
অতীত কালের বুকে আবার আবার ফিরে যাও।

নজরুল

জড়ের বুকে আনলে তুমি ঝড়ের কলরোল,
ফুলের দেশে আনলে তুমি হুলের ব্যথা-দোল।

www.pathagar.com

ঘুম-পাড়ানী ছড়ায় ছড়ায়
নিত্য যেথা মরণ জড়ায়
সেথায় তোমার অগ্নি-বীণায়
আনলে আগুন বোল।
জড়ের বুকে আনলে তুমি ঝড়ের কলরোল।

বদ্ধ জলের স্তব্ধকোলে নাইকো ঢেউয়ের খেলা,
সেথায় তুমি ভাসিয়ে দিলে বন্যা-সোতের ভেলা
আনলে অচল-আয়তনে মাতাল ঢেউয়ের মেলা গো
পাতাল-উতল মেলা।
মৌমাছি নয়—ভীমরুলেরে মারলে তুমি ঢেলা
আহা বিদ্রূপেরি ঢেলা—
তাইতো বাউল পথ-চলারা বনলো তোমার চেলা গো ;
বনলো তোমার চেলা।

দেশ-জোড়া এ ঢোড়ার দেশে-বাইরে আছে ভোল্
বিষের বালাই নাহি রে শুধু ছদ্মবেশের খোল।
সেথায় তোমার বিষের বাঁশী
সুখের সুরায় কইলো হাসি ঃ
কেউটেরা সব কোথায় আছিস্ তোল, রে ফণা তোল।
ভাঙ রে তোরা ঢোড়ার দেশের আড়ম্বরের ভোল !

ভীরুরা সব বীরের বেশে বনতো মুজাহিদ
জঙ্গ্ এলো যেই অমনি ভয়ে বিলুপ্ত সম্বিদ
মুর্গি-কাটা রক্ত মাখি
কইতো তবু উচ্চে হাঁকি ঃ
এইতো মোরা এলুম করে লড়াই কতে জিত।
ভাঙার গান গাইলে সেথা
চাঙ্গা হলো মুক্ত-চেতা
জাগলো হাতে নাঙ্গা অসি, ভাঙলো ভয়ের নিঁদ।
ভীরুরা সব বীরের বেশে বনতো মোজাহিদ।

অন্দরেরি অন্ধকারে বন্দী মায়ের জাত,
হাজার বরষ ঝরলো সেথা নীরব অশ্রুপাত
সাম্যবাদীর গানে গানে,
আনলে জোয়ার রুদ্ধ প্রাণে
অন্ধকারের বন্ধকারা ভাঙলো অকস্মাৎ
হাসলো ঊষার রাঙা রবি ঘুচলো কালো রাত।

দাসের জাতি লুটতো ভুঁইয়ে শঙ্কা-ভয়ে নীল
সর্ব অঙ্গে চিহ্ন পদের নাইকো বাকি তিল

www.pathagar.com

বিদ্রোহেরি ঝাণ্ডা তুলি—
অত্যাচারীর ভাঙলে খুলি
গোলামদেরে কইলে সবে জিন্দা করো দীল
মুক্তি তোমার আসছে এবার নয় দূরে মঞ্জিল।

আজকে তোমার আজাদ এ দেশ—আজকে তুমি চুপ,
দাসেরা সব মন্ত্রে তোমার আজ দেশেরি ভূপ—
মায়ের জাতি উচ্চ শিরে—
মুক্তি হাওয়ায় আজকে ফিরে,
আজকে শুধু হায় রে তব লুপ্ত মানস রূপ।
তাই তুমি নিশ্চুপ?

বিদ্যুৎ চমকায়

বিদ্যুৎ চমকায়
প্রতীচীর প্রত্যন্ত সীমায়।
খনে খনে গরজিছে বাজ—
গুরু গুরু গভীর আওয়াজ,
পৃথ্বি ওঠে কাঁপি।
দেখি শুধু সর্ব নভ ব্যাপি
স্তরে-স্তরে কৃষ্ণ কালো মেঘ
সঞ্চারিছে ঝড়ের আবেগ
দূর বায়ুকোণে।
প্রলয়-দূতেরা বুঝি গোণে
তারি উগ্র মুহূর্ত যাত্রার,
উন্মত্ত তাণ্ডব নাচে দুরন্ত দুর্বার
পথে পথে চূর্ণ-চুরমার
কখন করিবে সে যে সৃষ্টি বিধাতার
চলার আবেগে—
তারি আশে রয় তারা জেগে।

* * *

তাহারি ঈঙ্গিত হেরি রক্ত মেঘে-মেঘে
করিতেছে খেলা।
ওরে মন, তুই এই বেলা
বুঝে দেখ হবি তুই সাথী তার কি না,
হাতে তোর প্রলয়ের বীণা—
রক্ত-আঁখি-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য সীমানা
পায়ে তোর লঙ্ঘনের ডাক;

www.pathagar.com

ঘূর্ণি-ঘন প্রভঞ্জন রহিবে অবাক
হেরি তোর শক্তি বারম্বার—
বক্ষে তোর নৃত্য-বেগ উদ্দাম ঝঞ্ঝার,
অক্ষি-পথে ঠিকরিছে ক্রুদ্ধ জ্বালা বহ্নিমান
আগ্নেয়-গিরির—
বক্ষ ভেদি উঠিয়াছে গর্বোদ্ধত তোর উচ্চ—
সুদর্পিত শির
দৃপ্ত ভঙ্গিময়—
পৃথ্বি-সারা পড়ে তোরি ত্রাস-ভয়ে কাঁপি-কাঁপি
বিলুণ্ঠিয়া পায়,
শুধু না কৃপারে আশায়।
তীক্ষ্ণ তোর কৃপাণের ছায়।
চেঙ্গিজের হালাকুর, তৈমুরের বাহু
আজ হোক বাহু
ফের বিশ্বময় !
আজ তুই আন ডাকি নূহের প্রলয়
রক্তের প্লাবনে ঃ
যেথায় প্রবল আজ প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে
কাড়িতেছে দুর্বলের গ্রাস,
যেথায় বিজ্ঞেরা আর বিজ্ঞানীরা মিলি,
বিজয়িনী বিজ্ঞানের কুহকিনী বলে
কানুনে-কৌশলে
ছড়াইছে দিনে-দিনে বিনাশ-বিলয় গর্ভ
বিভ্রান্তির ত্রাস,—
যেথায় শান্তিও নামে ভ্রান্তি-বাহী দুর্বলেরা
মেঘ সম খায় শুধু ঘাস
আর ব্যাঘ্র সবলেরা-সুযোগ সন্ধান মতো
মহানন্দে মাতি
সেই সব অতি-বুদ্ধি তাজা তাজা ভেড়া
ধরে ধরে খায় সুখে ধরণীর সর্বদিক
খুঁজি পাতি পাতি
পিটাইয়া খনে খনে "ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি" ঢেড়া
মাথা করি নেড়া,
অথবা বাড়ায়ে চুপে টিকি-দাড়ি দেড়া
পীর, গুরু, ঋষি কিম্বা তাবারিশ সেরা
বনে যায় চাহিদা মাফিক
যেথা ঠিক ঠিক ; —

www.pathagar.com

যেথায় ঠগীরা সদা দুর্বলের খুনে ছোপা
সহিংস লেবাস
সাবধানে ঢাকি ঢাকি আ-গোড়ালি প্রলম্বিত
পরে পীত কিম্বা শ্বেত শুভ্র বহির্বাস,
মুখে জপে অহিংসার ভাষ
সবারে শুনায়ে
তিলক প্রলেপ আঁকি সারা অঙ্গ-গায়ে
ধরে শান্তি ধ্বজাধারী মহাত্মার বেশ
আর বোনে পথে-পথে মুনাফা মওকা বুঝি,
চাহে যাহা যেথা যেই দেশ
মুক্তি, মোক্ষ, ধর্ম কিম্বা সাম্যের আবেশ
ভ্রমি দিগ্দেশ ; —
আহা যেনো পরহিতে সদা দীল-খোলা
বাবা সে ভোম্বলা !
অথচ গোপনে
লোলুপ নজর খুলি শুধু দিন গণে
কোন ছুতা-ছলে
কখন সুবিধা মতো গোলামী-শিকলে
বাঁধিবে দুর্বলে।

*   *   *

শ্বেত, পীত, লাল যতো জুলুম-বাদীরা
দীর্ণ করি অসংশয়ে রক্ত-বাহী শিরা
অক্ষম জাতির,
অথবা নির্ভয়ে তার ছিন্ন করি শির
লক্ষ-মুখে সেই রক্ত পিয়া নিরন্তর
নির্বিকারে রচে যেন দৃশ্য ভয়ঙ্কর
যেথা বিশ্ব ভর—
আর হেন সর্বনাশা হিংস্র জুলুমের
নাহি পূর্ণ প্রতিকার যেথায় বিশ্বের
নাহি সত্য অধিকার যেথায় নিঃস্বের
চলে শুধু নিত্যনব অন্তহীন জের
অত্যাচারের,—
যেথা সর্ব দেশ
নির্বিবাদে মেনে চলে হেন হীন পাশবিক
নীতির নির্দেশ,—
পূরবে পশ্চিমে কোথা আজো কেহ পাবে না কে
যে-ব্যাপারে মূলগত পার্থক্যের লেশ—
ওরে মন তবে সেথা

www.pathagar.com

আর কোন লজ্জাহীন ছলনার ক্লেশ
 সহিতেছ বৃথা—
করো পাঠ—করো পাঠ সত্যের সংহিতা
 নির্বেদ নির্মম—
রেখো না রেখো না আর মিথ্যাময়ী করুণার
 কণা ক্ষুদ্রতম
নারী সম অন্তরে লুকায়ে,
কঠোর বাস্তব পথে অগ্রগামী হও তুমি
 রক্ত–আঁকা শক্তি–দৃঢ় পায়ে।
 এনে রেখো নিত্য নিরন্তরঃ
অশ্রু–জলে নাহি গলে শক্তিমান দানবের
 পাষাণ অন্তর ; —
শক্তিরে রুখিতে চাহি শক্তি দৃঢ়তর
 বজ্রাগ্নি–প্রখর।
ওরে মন ভুলো না কখনো—
ফাল্গুনী বসন্তে তুমি যত স্বপ্ন বোনো—
আষাঢ়ের বজ্র নয় মিছে,
বর্ষে–বর্ষে বর্ষা–জাগা প্লাবনে আনিছে
শ্যাম শস্য সম্পদ সম্ভার
ধ্বংসের হাপরে হেরো সৃষ্টি নব জাগিতেছে
 নিত্য বারম্বার।
বন্যা নাই—ফসল ফলাও,
ধ্বংস নাই—নব সৃষ্টি চাও,
জরা মৃত্যু নাহি কোথা—তবু আশা চিত্তে তব
 নব জাতকের—
ওরে মূর্খ এই তোর অদৃষ্টের ফের ?

* * *

জীর্ণ ধরা জীর্ণ জাতি, বিজীর্ণ সভ্যতা
রচে শুধু বার্ধক্যের ক্লান্তি–আবিলতা।
 যুগ–যুগ–পুঞ্জীভূত জীর্ণতার ভিতে
 কেহ কভু পারে না রচিতে
নভ–চুম্বী গৌরবের প্রবুদ্ধ প্রাসাদ।
নব সৃষ্টি তরে যদি থাকে কভু সাধ
 হতে হবে সত্য–অভিসারী—
নির্মম পাষাণ পথে বাস্তব দিশারী,
 অকম্পিত বজ্র–দৃঢ়–পদ।
তারি লাগি রাজ্য–পাট বিশ্বের সম্পদ
 চেয়ে আছে পথ।

www.pathagar.com

ধ্বংস-স্তূপ ছায়ে
স্তূপীকৃত আবর্জনা নিঃশেষে সরায়ে
চিরন্তনী শিল্পী সেথা তুলিছে গড়ায়ে
নব সৌধমালা—
অবসাদ-ক্লেদ-মুক্ত আশায় উজালা
নব ভিত্তি পর—
সমুন্নত লৌহ-দৃঢ়তর।
মিথ্যার আলেয়া হতে প্রলয়ের আলো
লক্ষ গুণে ভালো—
সেথা মেলে সত্যের সন্ধান ;
সেথা নাহি ছলনার ছদ্ম অবদান
মুখে হাসি—বিষ-কুম্ভ প্রাণ।
ওরে মন হও সত্যচারী—
হোক পথ সূচী-তীক্ষ্ণ কন্টক-বিসারী
কঠিন কঠোর—
দূর হোক তবু আজ মিথ্যা মায়া-ঘোর।
...
বজ্র গাহে আগমনী নূতন বৃষ্টির,
প্রলয় সংকেত বহে নূতন সৃষ্টির।

পরিক্রমা

স্বপ্ন দেখছি,
হয়তো বা সে দিবা-স্বপ্ন।
তবু
মন্-মুকুরের রেখায় রেখায়
ছায়া-চিত্রের ছবির মতো
চলছে ভেসে স্বপ্ন-ছবি—
সাদা-কালো স্বচ্ছ-গাঢ়,
আলো-ছায়ায় দো-রঙিলা
বর্ণচ্ছটা,—
রাত্রি-দিবার পর্বান্তরের
দৃশ্য-লীলা।
*
দেখছি চেয়ে ঃ
যুগ-যুগান্ত পুঞ্জিত সব

www.pathagar.com

কলুস-কালি পঙ্ক-রাশি,
তামস-তিমির—
চিত্ত-লোক আর তনু-তটে,
বোধি এবং বোধের স্তরে
নাস্তিক্য আর দ্বৈত্য-বাদের
দ্বন্দ্ব-ধাঁধার মরীচিকায়
যে সাহারা করলো সৃজন—
তারি নিঠুর দহন-দাহে,
অসাম্য আর অত্যাচারের
লু-সাইমুমী বাষ্প-বিষে
সমাজ দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
কুষ্ঠ-বাত আর দুষ্ট ক্ষতের
ঘটলো প্রসার,
প্রকাশ্য আর গোপন পথে,
বিবরচারী সর্প সম
অলক্ষিত নিঃশব্দতায়।
হাহাকার আর আর্তনাদে
উঠলো কেঁপে
সিন্ধু-মৌলী বসুন্ধরা।
মানবরূপী হিংস্র পশুর
পাশব লীলায়
শ্যাম-কুন্তলা শান্ত ধরা
মিইয়ে গেল—মুষড়ে গেলো
দাব-দগ্ধ কানন সম।

আবার দেখি ঃ
অন্ধকারের নিবিড় নীড়ে
জাগলো হঠাৎ জ্যোতির্জ্বালা
নূর-জলোয়া।
স্পর্শে তারি
শুষ্ক মরুর বালুর কণা
বিস্ফুরিত বারুদ সম
তীব্রচ্ছটা জ্যোতির্লেখায়
সপ্ত আকাশ বসুন্ধরা
করলো উজল উদ্ভাসিত,
বহ্নিমান আর দীপান্বিত।

*

মূর্চ্ছিত-প্রাণ জাতির বুকে

www.pathagar.com

প্রাণ-শিহরণ
জাগলো আবার—
আত-তৌহিদী আল-কিমিয়ার
প্রাণ-জিয়ানো পরশ পেয়ে।
নূরের নবীর হেরায় জ্বালা
তুর-উজালা নূর-ঝলকে
নিকষ-কালো তিমির-তীরে,
আঁধার-ছাওয়া চিত্ত-মনের
গুহায় গুহায়
উদয়-ঊষার অরুণ সম
জীবন-জ্যোতি
উঠলো জেগে।—
উঠলো জেগে
লাঞ্ছিত আর নিপিষ্টেরা
আবার নূতন আলোর স্রোতে,
দু-কূল-ডোবা বন্যা-ধারায়
বিশ্ব-নিখিল মানস-লোকের
তীরে তীরে।
অসাম্য আর অত্যাচারের
উৎস-ধারা ঃ
কুফ্‌র এবং শিরক্‌-বাদিতা—
হেয়তরের চরণ-তলে
শ্রেয়তরের শির-আনতি,
আতঙ্ক আর অজ্ঞানতার
বেদীর মূলে
সন্ত্রাসিত মানব-মনের
ব্যর্থ পূজা,
তনের-মনের খাস গোলামীর
শিকল-ধাঁধা,
সকল ভীতি, বেদন-বাধা—
মউৎ-জয়ী আত্‌-তৌহিদের
তড়িৎ-তেজে,
পরশ-ছোঁয়ায়
এক নিমিষে উধাও হলো—
লুপ্ত হলো বিনিঃশেষে।
বিশ্ব-প্রভুর খাস্‌ খিলাফৎ—
প্রতিনিধির উচ্চ আসন।

www.pathagar.com

*
পদ-পদবীর সাথেই থাকে
কর্ম-কৃতির দাবীর বোঝা।
স্রষ্টা যিনি—সৃষ্টি-পালন
কাজ তো তার-ই।
বিশ্ব-প্রভুর প্রতিভূ-যে
সত্যপথে—ন্যায়ের পথে
বিশ্ব-জনার শাসন-সেবা
          তারি তো কাজ।
তাই তো দেখি ঃ
মুমীন দলের আমীর হলো
          মানব সেবক
          কওমী খাদেম।
সে নয় কভু
গর্ব-অন্ধ বিত্ত-গোলাম,
          কিম্বা সে নয়
          বাদশা প্রভু—
দণ্ড-মুণ্ডের স্বেচ্ছাচারী
          হর্তা-ধাতা।
*
দ্বিন-ইলাহীর পান্থ যারা—
সবাই হলো
সাম্য-ন্যায়ের খোদার রাহের
          স্বেচ্ছা-সেনা—
          বীর মুজাহীদ।
সত্য-নীতির প্রতিষ্ঠা আর
জুলুম-শাহীর ধ্বংস আশে
চল্লো জেহাদ দিক্-দিগন্তে
বিশ্ব-ভূমির সর্ব পথে।
শতাব্দীরো অর্ধ ভাগে
দিগ্বিজয়ের ঝাণ্ডা উঁচা
দেশ-বিদেশে উড়লো তাহার
সুনির্ভয়ে—উচ্চ শিরে।
*
          অবাক কাণ্ড !
          জঙ্গ-ময়দানে
প্রাণ-নেওয়া নয়—প্রাণ-দেওয়ারি

www.pathagar.com

কোশেশ বেশী।
সমর-জয়ী বীর সেনারা
অঝোর ধারে কাঁদছে বসি।
খোদার কাছে
কোরবানী তার
জানের-তনের
হয়নি কবুল
হায় বুঝি কোন গুণার দোষে।
শাহাদতের শহদ শুধা
মিল্লো না তাই ভাগ্যে বুঝি।
*
মহাকালের চিত্র-পটে
দৃশ্য নতুন আসলো আবার।
কালের চক্রে
মুক্তি-বানে আসলো ভাটা
মুক্ত-মনা খাদেম-নেতা
ধন-দাসত্বে পড়লো বাঁধা।
বিত্ত বিলাস ভোগের মোহে,
মিথ্যামানের অহংকারে,
শক্তি-মদে
খোদার দেওয়া আকাশ-মাটির
বনলো সে হায় মালিক একা—
শাহান-শাহা বাদশা-রাজা।
দস্যুসম নেয় সে কেড়ে
লাখ্ মানুষের শ্রম-গড়ানো
প্রাণ-জড়ানো
বিত্ত-কড়ি—আবাদ-ক্ষেতি।
বীর মুজাহীদ—খোদাই সেনা
তারি হীন কূট-কৌশলে
বনলো ক্রমে টাকায় কেনা
গোলাম-সম
বেতন-ভোগী সৈন্য-সিপাই।
আত্-তৌহিদের সত্য নহে,
আল্-আহাদের তথ্য নহে,
দ্বিন-আজাদীর সাম্য নহে—
কাম্য হলো
রাজ্য-বাদের তস্করতার
লজ্জাবিহীন নিষ্ঠুরতা,
ঔদ্ধত্য আর মদান্ধতা,
শোষণ-পেষণ স্বার্থ-লোভের

www.pathagar.com

অকুণ্ঠিত লুটের খেলা।
ঝুট্ খলীফা করলো খেলাফ
খোদ্ খোদারি আশীষ সম
আত্-তৌহিদী মুক্তি-সনদ।
ইখওয়ানী আর ইনসানিয়ৎ
পড়লো শেষে কবর-চাপা।
ভ্রাতৃ-সমাজ দ্বিন্-ই-মিল্লাত্
বনলো হঠাৎ খাস্ তাঁবেদার
দাসের জাতি—রায়ত-প্রজা।
মুমিনেরা কমিন হেন
ভুল্লো হেলায়
খুন্-শাহাদৎ জঙ্গী-জেহাদ।
সাম্রাজ্য আর শাহানশাহীর
ঘটলো প্রসার—
পাক্ খিলাফৎ স্থান পেলো না
আর কোথাও।
দ্বিন্-ইলাহীর জোশ্-জলোয়া
জ্বল্লো না আর দীপক-রাগে।
রুদ্ধ-সলিল শরিৎ সম
জমলো শুধু পঙ্ক-কাদা।
সিন্ধু-জয়ী মুক্তি-তরী
পঙ্ক-বুকে পড়লো বাঁধা।
"ঐক্য-বোধের শক্ত রশি
রাখবে কসি হস্তে ধরি"—
ঐশীবাণীর এই যে নির্দেশ
মানলো না আর কোথায় কেহ
সুন্নি-শিয়া মুঘল-পাঠান,
উমাইয়া আর আব্বাসিয়া
কণ্ঠ টুটে পরস্পরে।
সবুজ ধরা সিক্ত হলো
শাহাদতের রক্তে নহে—
খুন-খারাবীর কৃষ্ণ লহু
ধ্বংস-বিলয় আনলো শুধু,
ঐক্য-হারা সখ্য-হারা
বাটল-ধরা দুর্গে তাহার।

* * *

প্রাণ-উতলা আত্-তৌহিদী
বন্যা-স্রোতের
স্তব্ধ-আবেগ শেষ জোয়ারে
কয়টি মউজ

www.pathagar.com

সাত শতাব্দীর দীর্ঘপথে
পাক-ভারতের সিন্ধু-কূলে
ধীর মন্থরে
চল্লো বয়ে।
ঝড়ের বেগ আর স্তব্ধ জড়ের
শিথিল গতি
সেই মউজের কণায়-কণায়
লুকিয়েছিল
সঙ্গোপনে।
তাইতো দেখি—
সর্ব্বব্যাপী বন্যা-প্লাবন
সৃষ্টি-হেথায় ব্যর্থ হলো
বারম্বারে।
স্বল্প-বারি মন্দ-স্রোতা
চরায়-ভরা
নদীর মতো
রইলো জেগে বক্ষে তাহার
খণ্ড হ্রদের সলিল সম
হেথায়-হোথায়
প্রাণ-সরোবর—
জীবন-সুধা।
মুক্ত-স্রোতা দিক্-বিসারী
নদীর নীরে
মৃত্যুময়ী ঢেউ-তরঙ্গে
উজান-বওয়া
পালের তরীর
স্বচ্ছ সবল গতির গীতি
অকুণ্ঠিতে সেথায় গাওয়ার
আর রইলো না
সম্ভাবনা।
তারি ফলে সৃষ্ট হলো
ধর্ম এবং জাতির নামে
দ্বি-চারিণী দ্বন্দ্ব-দ্বিধা—
দু-মুখ-গামী পন্থা-নীতি।
হিস্পানী আর হিন্দুস্তানে
একই ছবির দৃশ্য চলে।
আন্দালুস আর দিল্লীতে তাই
আত্ম-বিরোধ দ্বন্দ্বে-ক্ষরা ;

www.pathagar.com

আপন জনার রক্ত-স্রোতে
অন্য জাতির রাজ-তরণী
ভিড়লো আসি নির্বিবাদে।
বীর জাতি হায় ভীরুর মতো
বইলো তারি লানত শিরে।
ভূই-বিদেশী দস্যু হলো
তখত-ই-তাউস তাজের রাজা।
এক শতাব্দীর খাস গোলামীর
দাস-আমলে
রিক্ততারি তিক্ততাতে
জাগলো চেতন ফের আযাদীর।
ঐক্য-বাণীর আযান-ধ্বনি
জাগলো আবার মিনার-শিরে।
মীনা-র মাঠের কোরবানী কি
নূতনতর দৃশ্য-পটে
পাক-ভারতের সবুজ-মাঠে
খুনের খেলায় মাতলো পুনঃ?
লাখ্ মুজাহিদ তর-তাজা শির
দেয় শিরোপা মুক্তি মাগি।
মুক্তি তবু আসলো না হায়।
কোথায় বুঝি বেজায় ফাঁকি
লুকিয়ে ছিলো বক্ষে তারি।
আরাফাতে সব মিল্লো বটে—
নয় এ মিছে—
কিন্তু বুঝি
ঠিক ছিলো না কিবলা-কাবা।
আত-তৌহিদী পাক খিলাফৎ
দৃষ্টি-পথে রইলো না তাই
দ্বিন-ইসলামী পাঞ্জা-আঁকা
বাদশাহী আর শাহানশাহী
কায়েম-ই তার খায়েশ ছিল।
তারি ফলে—
মক্কা-কাশির দ্বন্দ্ব-বিরোধ
উঠলো জাগি শির উচায়ে
ব্যর্থ হলো সকল আয়াস।
পুরাণ পাপের গুনাহ্ গারী
দিতেই হলো
বেজায় সুদে।

*

www.pathagar.com

আবার আরেক যুগ-শতাব্দীর
দীঘল-টানা পথ পারায়ে
আজকে আবার
আসলো হেথায় নও আযাদী—
নতুন নামে—নবাদর্শে।
রাজগী নহে—জমহুরিয়া
নাম যে ইহার।
'ইসলামিয়া'—জয়-টীকা তার
ভালে আঁকা।
দ্বন্দ্ব-দ্বিধার স্থান নাহি আর।
কাবার পথে আবার চলার
ডাক এসেছে।
*
মুক্তি-পথের পুল-সেরাৎ নয়
নেহাৎ সোজা।
ভুলের ফলে কুল হারালাম
অনেক বার-ই—
আর নহে ভাই।
*
গোঁজা-মিলের মিথ্যা বোঝার
লজ্জা ছাড়ি—
সত্য-সোজা পন্থা বাহি
জাতির কায়েদ—আজম নেতা
আনলো আবার
পাক আযাদী
পুণ্য পাক এ-পাকিস্তানে।
লক্ষ্য তাহার—
দিবালোকের দ্যুতির মতো
স্পষ্ট প্রখর ঃ
নও খিলাফৎ কায়েম হবে
নূতন যুগের নূতন আলোয়।
*
সেই নিশানা সামনে রাখি
আজ মুজাহিদ বীর সেনারা
সামনে চলো—
কা'বার পথে আবার চলার
ডাক এসেছে,
সামনে চলো—সামনে চলো।

www.pathagar.com

আলাপনী

বুকে জাগে আশা,   মুখে নাই ভাষা
মনে ফিরে অনুরণি,
সেই মুক মুখে   বাণী দিক আনি
আজ নব আলাপনী।
রাত গেছে কেটে   দিনের কপাটে
খিল বুঝি গেছে খুলি,
নূতন আলোর   কিশলয়গুলি
উঠিতেছে দুলি-দুলি।
বনের পাতার   প্রাসাদ শিখরে
পাখীদের ঘুম টুটে,
অমনি তাদের   ঠোঁটের বীণায়
আলাপনী গান ফুটে।
সে- গানেরি তানে   শষ্প-নয়নে
শিশির-অশ্রু দোলে,
সে-গানেরি তানে   কুসুম-কাননে
কোরকেরা আঁখি খোলে
দুখিনা মলয়   মৃদু মৃদু বয়
বয়ে নিয়ে তারই বাণী
নূতন দিনের   নব অভিযান
করে সেথা কানাকানি।
নূতন আশার   নূতন ভাষার
নবতর গতি চাহে,
নূতন যুগের   কোকিলেরা নব
আলাপনী গান গাহে।
যুগের আলোরে   যুগ-যুগ ধরি
আমাদের চিত-নভে
দেইনি প্রবেশ,   আলোর তরণী
তাই ডুবে গেছে কবে।
কাল-সাগরের   মরা বন্দরে
আমরা নোঙর ফেলি
রুদ্ধ স্রোতের   পঙ্কিল জলে
করিয়াছি জল-কেলি।
আমাদের যত   যাত্রী-জাহাজ
সেই পাঁকে গেলো বাধি,
জীবন-সূর্য   আঁধিয়ারে ঢাকি
এলো নামি কালো আঁধি।
এলো ঝড় ঘোর   আসিল তুফান
ভাঙিল কিশতি যত,
তার সাথে এলো   পাগল জোয়ার

www.pathagar.com

উদ্দাম উদ্ধত।
অচলায়তন দুর্গ–দুয়ার
ভেঙে পড়ে তারি ঘাড়ে,
ভাঙে শৃঙ্খল ছিল বাঁধা যত
আমাদের পায়ে পায়ে।
নয়া জামানার মুক্তিদূতের
আজ বুঝি আগমনী
তাই বুকে বুকে নব আশা সুখে
জাগে নব আলাপনী।

হিন্দোল

দোল দাও দোল দাও হে চিত্ত হিন্দোল
বৈশাখের এল নিমন্ত্রণ,
দিগন্তে জাগিছে শোন বজ্রগর্ভ ঝঞ্ঝা কলরোল
ফুঁসিতেছে দাব–দগ্ধ বন।
শান্তিবাণী আজ ব্যর্থ সব,
শক্তির দৈত্যেরা হেথা পিয়া তীব্র দম্ভের আসব
ধ্বংসের তাণ্ডব তুলি দুর্ব্বলের পঞ্জর প্রাচীরে
ছায়া স্নিগ্ধ অন্তরের তীরে
ইন্দুলেখা ছন্দ আঁকা শান্ত সিন্ধু নীরে
জ্বালিতেছে বাড়বাগ্নি জ্বালা—
সর্ব্বনাশী তীব্র বিষ ঢালা,
গ্রামান্তের শীর্ণ নদী প্রশান্ত নিরালা,—
আনন্দের শুভ্র কুন্দমালা,
সে বহ্নি দহনে দহি দহি
রণ–রুদ্র শতাব্দীর অত্যাচার সহি
তিক্ত ব্যথা বহি,
শ্মশান অঙ্গনশায়ী চিতাগ্নির মত
জ্বলিতেছে নিত্য অবিরত।
সেথা দিক দোল,
তব দীপ্ত চিত্তের হিন্দোল।
ভূমিকম্প উৎসারিত উৎস স্রোত সম
চিরদগ্ধ মরু বুকে শ্যাম শস্য কম
করুক সৃজন,—
আনন্দের নব পুষ্পবন।
ভরে দিক সারা বিশ্ব কোল

www.pathagar.com

দিক সেথা দোল
তব দীপ্ত চিত্তের হিন্দোল।
* * *
অন্তর দাক্ষিণ্য ভরা দক্ষিণ অনিলে
অরণী প্রান্তরে আর অন্তরীক্ষ নীলে
তুমি আনো শান্তি সুধাধারা—
অতৃপ্ত আত্মারা
সে শক্তি শরিৎ স্রোতে হোক আত্মহারা
হোক তৃপ্ত, হোক শান্ত মুক্তি মাতোয়ারা।
দিক আজ সাড়া
বিশ্বজোড়া যত সর্ব্বহারা
স্বপ্নময় নূতন স্পন্দনে
কল্পনার স্বর্গের নন্দনে
লোভ-লুব্ধ পুণ্যের বন্ধনে
চির-বন্দী যারা—
কাম আর কাঞ্চনের কারা
গ্রাসিল যাদেরে
সীমান্তের সীমারেখা ছেড়ে
উদ্ধত পাপেরে আর বিনীত পুণ্যেরে
পণ্য সম গণ্য যারা করে,
ঘূর্ণি ঘেরা জীবন-বন্দরে
তাহারা সকলে,
পাপী তাপী আর্ত দলে দলে
ভুলি সর্ব্ব গ্লানি দুঃখ পীড়া,
ঊর্ধ্ব স্বর্গচারী কিংবা পাতাল বন্দীরা
প্রাণের হিন্দোল তালে আনন্দ মন্দিরা
আবার বাজাক হেথা মর্ত্যের ধূলিতে,
বলগাহীন আকাঙ্খার বেদনা ভুলিতে।
হেথায় নামুক স্বর্গ প্রেম অর্ঘ্য রঙিন তুলিতে
আঁকুক বিশ্বের পর্ব্বে নব চিত্রলেখা,
প্রাণ মন সর্ব্বজয়ী প্রীতি দীপ্ত রেখা,—
দেয় যেন দেখা
আনন্দ-কলাপ মেলি মানস-মঞ্জুসা রচা
নৃত্যরত কেকা।
বাদল-মঞ্জীর পায়ে মর্ত্য হিয়া বিসারিত
কুঞ্জতলে একা
বিশ্ব মন ভোলা।
সে প্রাণ স্পন্দন রোলে উল্লাস উল্লোলা
তব দীপ্ত চিত্তের হিন্দোলা।

www.pathagar.com

বাক্য-পারাবার

বন্ধু আজ কথা নহে আর,
বাক্য পারাবার
আশার রঙিন নায়ে তুলি সদ্য উচ্ছ্বাসের পাল
আসন্ধ্যা সকাল
মুগ্ধ বাক্-বিভূতির দমকা হাওয়ায়
ভুলি আপনায়
নিত্য বারম্বার
হয়েছি তো পার—
বন্ধু আজ বাক্য নহে আর।
কি মিলেছে সেথা ?
শুধু ব্যর্থ আশা আর বঞ্চনার ব্যথা ;
শুধু অশ্রু-লবণাক্ত জল—
সেথা টলমল।
মিলেনি প্রবাল দ্বীপ—শ্যাম দুর্বাদল
সুশীল সিন্ধুর বুকে যেথায় উজ্জ্বল,
জ্যোতি-ঝলমল
রচিয়াছে মরকত-মালা
মধু-গন্ধ-ঢালা—
নাহি ত সেথায় দ্বীপ নির্জ্জন নিরালা।
মিলেনি উর্ব্বশী সেথা
মিলে নাই কৌস্তভ সে মণি,
মিলেছে বাড়ব-বহ্নি, ঝঞ্ঝার অশনি,
মিলিয়াছে তীব্র কালকূট,
ভরি করপূট,—
আর শুধু মৃত্যুর দূতেরা
চির হিংস্র জিঘাংসায় ঘেরা—
মরুর-হাঙর
রচিয়াছে সেথা তার ঘর।
তোমার বাক্যের সিন্ধু নহে রত্নাকর
আমাদের লাগি।
বন্ধু আর দিবা-স্বপ্নে জাগি
রবো কত কাল ;
শুধু বাক্য-জাল
পরিপূর্ণ করে না উদর।
প্রতিশ্রুতি-ঘন তব দুর্বহ ভূধর
চাপায়ো না আমাদের ক্ষীণ বক্ষোপর

www.pathagar.com

মিথ্যা ছলনায়।
দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
নিপিষ্ট মানব শিশু বুঝি সে হারায়
ধৈর্যের বাঁধন।
দুঃসহ সাধন
নিতেছে তাহারে ডাকি বিপ্লবের রক্ত-রাঙাপথে
ক্ষুধা-আর-নির্যাতন-রথে
অবরুদ্ধ স্তব্ধ বেদনায়।
বাক্য-ছলনায়
পারিবে না আর বন্ধু ভুলাতে যে তারে ;—
তব সিংহ-দ্বারে
ঐ শোনো বজ্র-মুষ্ঠাঘাত—
শাবল-করাত
রচিতেছে ভাঙার সঙ্গীত ;
মলয় বসন্ত শেষে সুমেরুর শীত
আনিতেছে তুষারের হানা,
ঝঞ্ঝার বিহঙ্গ আজ মেলিয়াছে ডানা
চক্রবাল ঢাকি—
আর নাই বাকি
দেনা শোধিবার ;
বন্ধু আজো হও হুঁশিয়ার—
বাক্য নহে—
বাক্য নহে আর।

লক্ষ্মীছাড়ার গান

অঙ্ক-কষা বুদ্ধি ভুলি পাগলামী সব আয়,
ভাস্‌বি যদি বন্যা-বুকে নোঙর-ভাঙা নায়।

বদ্ধ নদীর স্তব্ধ ঘাটে রইলি বহুকাল
চলতি পানির ঢেউ-দোলাতে খোল রে পুন হাল—
ঝড়-তুফানে আকাশ জুড়ি তোল রে নায়ের পাল
বে-ডর বে-হিসাব—
পুরাতনের আন রে বুকে আনকোরা খোয়াব
নয়া রবির ছাপ—
আয় রে চলি দুপায় দলি ভয়ের অভিশাপ—
বে-ডর-বে-হিসাব।
বিজ্ঞ জনা করবে মানা নাড়বে পাকা শির

www.pathagar.com

আলোর দিনে ভয় দেখাবে ঝঞ্ঝা অশনির
হানবে অচল-আয়তনী বাধার লাখো তীর—
কুৎসা-কালো বিষ ;
এক তুড়িতে দে উড়িয়ে সে-সব চারি দিশ
নিত্য অহর্নিশ—
বস্তা-পচা অচল কথা পায়ের তলে পিষ—
কুৎসা-কালো বিষ।

মৃত্যু যদি আসেই পথে—অমর কেবা বল
পৌষ-মাঘে জল শুকায় বলি থামবে শাওন ঢল্?
পথের সীমা নাই বলে কি আজ হবো অচল—
পঙ্গু গতি-হীন?
রাতের আঁধার আসবে বলে আসবে নাকি দিন—
আলোয় অমলিন?
মৃত্যু আছে, তবুও বাঁচি—এই তো জীবন চিন—
বাজাই আশা-বীণ।
বন্দী দিনের ফন্দি-ফিকির মিথ্যা বাজী-মাত,
শঙ্কা-ভরা দিনের আলো, লুকোচুরির রাত,
চলতে সোজা সত্য পথে বন্দী অকস্মাৎ—
জুলুম শত লাখ
আজকে সে-সব অতীত কথা এক পাশেতে রাখ।
মুক্ত-আজাদ আজ যে তোরা-দরাজ গলায় হাঁক—
রক্ত কারো আঁখ
তোদের পথে ছুঁড়বে না আর মিথ্যা-ভয়ের পাঁক—
জুলুম শত লাখ।
আজ তোরা সব জুলুম বাজের কণ্ঠ চেপে ধর—
ছোট-বড়োর নাইকো বিভেদ—নাইকো
আপন-পর
অত্যাচারী যেথায় যত কাঁপুক থরোথর,
শঙ্কা-ভয়ে নীল,
তাদের পাষাণ বক্ষ-ঝরা রক্ত-ভরা ঝিল
দিক মুছায়ে জাতির ভালে কলঙ্কেরি তিল
তাদের পাপে নীল।

লুকিয়ে তোরা আছিস কোথা লক্ষ্মী-ছাড়ার দল—
গুঁড়িয়ে দে আজ পোষ-মানাদের পোষাকী সম্বল,
বাসুকি সব আয় উপরে ফুঁড়ি পাতাল-তল—
বিষের ফণা তোল—
তোদের শত ছোবল-ঘাএ মিথ্যা-চারীর ভোল

www.pathagar.com

আজকে তোরা খোল।
অত্যাচারীর বিশ্ব ভরি প্রলয়-ভরা দোল
আজকে তোরা তোল।

সাবধানীদের বুদ্ধি ভুলি পাগলামী সব আয়—
ভাস্‌বি যদি বন্যা-বুকে নোঙর-ভাঙা নায়।

তাজাল্লী

নিশীথের তিমির নিবিড়
ধরিত্রীর বক্ষজোড়া রুদ্ধশ্বাস মৃত্যুর শিবির
গড়ে যারা অহর্নিশ—দম্ভের দম্ভোলি
দুর্বলের শিরশীর্ষে ক্রুদ্ধ রোষে তুলি
তারাই প্রলয়-খেলা খেলে নিত্য চির স্বার্থ আশে
বিশ্ব জুড়ি রচে মৃত্যু সর্বনাশা ধ্বংসের সন্ত্রাসে।
অকম্পিত হস্ত মেলি অগণিত সুখের সংসারে,
নিরীহের-নিষ্পাপের দৈন্য-ঘেরা পর্ণগৃহে দ্বারে
এরাই পিশাচসম হানিছে বিলয়-বজ্র নিত্য বারম্বারে,
নিরপরাধীর শান্ত কুটির প্রাঙ্গণে
মাতিছে এরাই পুনঃ মদমত্ত রণে।
মুক্তির ছলনা-বাণী সরবে উচ্চারি
মুক্তিরে দলিছে পায়ে অবহেলে এরা এই চির স্বেচ্ছাচারী
প্রতি দিনে দিনে—
বোমা আর বক্ষ-ভেদী সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীনে
দিশে দিশে দেশে-দেশে হত্যা আর লুণ্ঠনে-লুণ্ঠনে
শুষিতেছে জনে-জনে কল্যাণের মৈত্রীর গুণ্ঠনে
লজ্জাহীন বর্বরের মত ;
এরাই সতত
চির-গণ-তান্ত্রিকতা-মন্ত্র-বাণী রবে
বারম্বারে ভুলাইতে চাহিতেছে সবে।
ভুলিছ তাহারা,
এখনো হয়নি সারা বিশ্ব দিশাহারা—
এখনো সবিতা শশী নীলাঞ্জন নভে
ফিরিতেছে নিশিদিন আলোকের স্তবে—
সত্যময় স্রষ্টারে স্মরিয়া ;
এখনো বিবেক-বোধি নিঃশেষে মরিয়া
যায়নি পৃথিবী হতে—
এখনো অগণ্য লোক সততার পথে

www.pathagar.com

চলিছে নির্ভয়ে তুলি চিরোন্নত শির—
এরাই বিশ্বের বুকে সত্য মহাবীর
চলিছে সম্মুখে শত বাধা-বিঘ্ন দলি।
এদেরে ঘেরিয়া তব নূরের তাজাল্লী—
হে বিধাতা পাতা জগতের
তোমারি সৃষ্টির লাগি জ্বলুক বিজলী জ্যোতি তব রহমতের
তাহারি রোশনী-রাগে সর্ব জল-স্থলী
রহুক উদ্ভাসি—
লুপ্ত হোক অন্ধকার রাশি।

পদক্ষেপ

অবিরাম পদ-ক্ষেপে মহাকাল
চলে বিশ্ব বুকে—
সৃষ্টির অসীম খেলা পলে-পলে
চলিছে সম্মুখে।
ক্ষণ আগে যে মুহূর্ত প্রাণাবেগে
আছিল চঞ্চল—
ক্ষণ পরে সে-ই হলো মৃত স্তব্ধ
অতীতে অতল।
এখানে সজীব শুধু আগে-চলা
গতি-পদক্ষেপ—
অতীত মৃতের বুকে জীবনের
আনন্দ-প্রলেপ।

শ্রাবণ-সন্ধ্যায়

আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায়
বর্ষার ঝুমুর বাজে মোর আঙিনায়।
দাদুরীর কলকণ্ঠ রব,
ঐকতান আনন্দের সংগীত-উৎসব
গোধূলি-বেদীর মূলে দিনান্তের স্তব
কে যেন রচিছে
তারি শান্ত প্রতিধ্বনি জাগে ঊর্ধ্বে-নীচে
সর্ব পাশে ঘিরে মোরে রহিয়া রহিয়া।
প্রায়াগত শর্বরীর উন্মথিত হিয়া
সে-গুঞ্জনে উঠিছে জাগিয়া

www.pathagar.com

ক্রম-ঘন অন্ধকারে মেলি কৃষ্ণ পালা
নিমীলিত নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতি-আঁকা
নভাঙ্গন-তলে।
হেথায় মাটির বুকে খদ্যোতেরা জ্বলে
ঝিল্লির মল্লার তানে নৃত্য-রাগে মাতি।

দিনান্তের প্রান্তবাহি নামে সন্ধ্যা-রাতি
শিঞ্জিত চরণে ;
বৃষ্টির নূপুর পরি' উচ্ছলিত মনে
খেলে ক্ষণে-ক্ষণে
মর্মরিত বনানীর পল্লবে-পল্লবে
শ্রান্তিহীন মধুচ্ছন্দ রবে।
সে-গীতি-গুঞ্জন-মুগ্ধ আনন্দ-বিবাগী
অন্ধকার রন্ধ্রশায়ী লক্ষ কীট-পতঙ্গেরা অকস্মাৎ জাগি
মাটির বন্ধন হতে চির মুক্তি মাগি
মেলে লক্ষ ডানা।
পার হয়ে দিগন্তের সীমান্ত-সীমানা
যেতে তারা চায়—
ভেসে ভেসে বহু দূরে—কে জানে কোথায় ?
আজ এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।
এ পাশে বীথিকা-কূলে কেতকী-কেশরে
সুরভি-সুষমা-সুধা বিন্দু-বিন্দু ঝরে
একান্ত নীরবে
তবু তার নিভৃতের গন্ধ মহোৎসবে
অস্তশায়ী তপনের আরক্ত মঞ্জরী,
অন্ধকার সন্ধ্যা আর শান্ত বিভাবরী
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে শিহরি
দেয় অর্ঘ-ডালা
কদম্ব-কামিনী-কুন্দ শত পুষ্পমালা।
অশ্রান্ত বর্ষণ-ছোঁয়া পেয়ে
তড়াগ-তটিনী-প্লাবী স্রোত-ধারা ছেয়ে
কুমুদ-কহলার আর কমল-কলিকা
লক্ষ লক্ষ রূপ-বহ্নি-শিখা
উঠিয়াছে জ্বলি
দীপ্তিময় অম্বুজ অঞ্জলি।

তারি পাশে-পাশে
আজ এই সন্ধ্যা-অবকাশে
সুনিপুণ করপুটে লয়ে স্বর্ণ-তুলি

www.pathagar.com

শিল্পী কে আঁকিছে যেন বর্ণালী গোধূলি
কত চিত্র-আঁকা।
ফিরিছে নীড়ের পানে বিশ্রান্ত বলাকা
শ্বেত পক্ষ মেলি।
গৃহাগত বিহঙ্গেরা করিতেছে কেলি
তরুশীর্ষে বসি
ডাহুকেরা ক্ষণে ক্ষণে মুখরি সরসী
ঝাপটিছে ডানা।
তরল-তিমির-ছাওয়া রাত্রির সীমানা
নাহি মানি মানা
কখন গোপনে জানি ঘেরিছে ধরণী
মুছে গেছে আলোর সরণী
আধোজাগা তমসা-ছায়ায়
সে অজানা মোহিনী মায়ায়
নভের নয়ন-ধারা ঝরে রহি রহি
বেদনা-বিরহী
মালতির আঁখি কোণে রজনী গন্ধায়
আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায়।

বিজয় দিবস

দু'শতাব্দী গোলামী অন্তে হলাম যেদিন মোরা আজাদ—
জাতির চিত্ত-মুকুরে জাগিলো সেদিন অনেক স্বপ্ন-স্বাধ।
অতীত যুগের প্রাচ্য জাতিরা ভাঙিয়া তাদের ঘুমের ঘোর,
নিশিত রাতের আঁধার বিদূরি চাহিলো আনিবে আলোর ভোর
জ্ঞান-সাধনা, মুক্তি-সাধনা-নব দিগন্ত বিশ্ব-ময়—
রচিবে ইহারা ধরণী জুড়িয়া মানবতা-বাদী চির-বিজয়।

ভারতের বুকে রয়েছে প্রধান হিন্দু-মোমেন দুইটা জাত—
এরাই একদা করেছে হেথায় রাজ-জাতি রূপে কালাতিপাত।
কালের চক্রে হলো উভয়েই এ-দেশের বুকে বিদেশী দাস—
একে অপরের পরাজয় খুঁজি আনিল ডাকিয়া সর্বনাশ।
কালের চক্র ঘূর্ণন সাথে ভাগ্যের গতি ঘুরিল ফের—
বিশ্ব জুড়িয়া, জাগে বিপ্লব বাধ-ব্যথা টুটি বন্ধনের।
দুই মহা জাতি—উভয়ে চাহিলো গড়িবে হেথায় আপন রাজ—
বাধিলো বিরোধ কে নিবে জিনিয়া নব আজাদী মুক্তি-তাজ।

আসিলো শেষে যুগল রাষ্ট্র ভারত এবং পাকিস্তান
হিন্দুরা পেলো ভারত-শাসন পেলো পাকিস্তান মুসলমান।

www.pathagar.com

ভারত হলো রে ঐক্য-বদ্ধ এক অখণ্ড যুক্ত দেশ—
মুমিনেরা পায় স্বদেশ দুইটি—যেথা তার দুই প্রান্ত শেষ।
পূর্ব সীমায় পূর্ব বাংলা—পশ্চিমেতে রয় সে পাঞ্জাব—
সংখ্যা-লঘু সিনধী-বেলুচ মানিলো তাহারি রাজ-প্রভাব।
তাহাদের কভু ভিন্ন ভাষা আচার-চলন-বেশ-পোষাক—
সেইখানেই রয় লুকিয়ে বিভেদ-বিরোধ-ভরা ঘোর বিপাক।

খুললো প্রথম প্রাচ্যের বুকে বাংলা-ই নতুন যুগের দ্বার—
জিনলো সে যে বিশ্ব-জয়ী মহান নোবেল-পুরস্কার,
আরব-ইরান-চীন-জাপানের পায় নাক কেহ আর সেদিন—
জ্ঞানে-ধ্যানে সুর-সঙ্গীতে তারা পায়নি কেউ সে মধুর বীণ।
আমার মায়ের ভাষার ছন্দে মুগ্ধ হলো যে বিশ্বলোক—
আমাদের কবি রবি-নজরুল জ্বালে যে ধরায় নও আলোক।
পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা পাইল না সেই বাংলা-রূপ—
পরিয়া-বিদেশী উর্দু-জবান-তারেই বানায় ভাষার ভূপ।
বাঙালীরা জানি সংখ্যা-গুরু যে পাকিস্তানের সর্বময়—
পূর্ব পাকের সর্বজনে যে বাংলা ভাষা নিত্য কয়—।
পশ্চিম পাকে অনেক ভাষা—হর এলাকার ভিন্ন বোল—
ভাষায়-ভাষায় রহিয়াছে জাগি নিত্য সেথা গণ্ডগোল।

বর্ষায়

বজ্র-বাঁশী বাজলো আবার আকাশ চিরে-চিরে,
বন্যা নামে বন্য সুখে ঘূর্ণি-ঘোলা নীরে—
ওই, পদ্মা তীরে-তীরে।
বৃষ্টি নামে সৃষ্টি-নাশা অঝোর ধারায় নাচি
নূহের প্রলয় আসলো ফিরে—রইবে না কেউ বাঁচি ?
কে, আনলো মরণ যাচি ?
ঝঞ্ঝারা সব পঞ্জা কসে গাছের ডালে-ডালে
ডাকিনীরা নাচছে যেনো তাথৈ তালে-তালে—
অমাবস্যার কালে।

মেঘনা-বুকে মেঘের ডাকে ঢেউ-দেও-এরা জাগে
গর্জি ফিরে সিংহ-সম ধ্বংস অনুরাগে—
ঝড়ের আগে-আগে।

বাসুকি তার জিহ্বা বুঝি মেলছে নভ-তলে
বিজলী-রাগে তাই কি হেথা ; উঠছে জ্বলে-জ্বলে
বহ্নি পলে-পলে ?

www.pathagar.com

কালো মেঘের ঝাণ্ডা ওড়ে পাহাড় শিরে-শিরে
তারি ছায়ায় দিনের আলো ডুবছে ধীরে-ধীরে—
সন্ধ্যা-তিমির ভীড়ে।

দস্যি কিশোর কোথায় তোরা অসুর-হানা তেজে
আয় না সবে এমনি দিনের শিষ্য খাঁটি সেজে—
বজ্রে দেহ মেজে।

প্রাণ-হারানো মরার দেশে মরুভূমির জ্বালা
জীবন-বানে সিক্ত করি জাগুক ঢেউ-এর মালা—
মুক্তি-সুধা ঢালা।

হেমন্তে

আজ সোনায় ভরা ধানের ক্ষেতে
বুক-ভরা সুখ আনন্দেতে
নতুন শীতের পরশ পেয়ে
উছল ধরা উঠছে নেয়ে

কূলে কূলে ভরাট পানি
স্তব্ধ আজি সোঁতের বাণী
তারি দেওয়া পলি-মাটি
তাইতো গানের আমেজ খাঁটি

উত্তরে ঐ শীতল বায়ু
সতেজ হলো সকল স্নায়ু
আবার নয়া ভালবাসা
নতুন দিনের নতুন ভাষা

কিষাণেরা উঠছে মেতে
ফসল কাটার গানে গানে।
শিশির ঝরে আকাশ বেয়ে,
শান্ত রোদের বানে-বানে
ফসল কাটার গানে-গানে।

উধাও হলো কোথায় জানি—
ভাটি নদীর টানে-টানে।
ফলায় ফসল আটি-আটি,
উঠছে ছেয়ে আকাশ পানে
ফসল কাটার গানে-গানে।

ছড়া হেথায় নতুন আয়ু
তারি সরস দানে-দানে—

www.pathagar.com

জাগায় হেথায় নতুন আশা,
কে কয়ে যায় কানে-কানে
ফসল কাটার গানে-গানে।

হে পঞ্চম ঋতুর বলাকা

তুষার শুভ্রতা-আঁকা বিস্তারিয়া দাও পক্ষ তব
হে পঞ্চম ঋতুর বলাকা।
দিগন্তে ঝিমাক বসি কুয়াসার স্বপ্নভরা নভ
ম্লান আঁখি আধো তন্দ্রামাখা।
তোমার পরশ ছায়া ঘুম-ঘন আলস-শীতল
বুলাইয়া দাও সর্ব্বদিকে—
জড়ায়ে-কুঞ্চিত কায়া বার্ধক্যের নৈঃশব্দ নিতল
জলেস্থলে দাও আজি লিখে।
যৌবন-উচ্ছাসহারা জীর্ণ তনু-শীর্ণা স্রোতস্বিনী
তব পদপ্রান্ত ঘেরি ঘেরি
গাহুক নিঃসঙ্গ গীতি বিস্মরিয়া কল্লোল কিঙ্কিণী
স্তব্ধ হোক তরঙ্গের ভেরী।
বিস্তীর্ণ বালুকা-বেলা বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের মত,
প্রসারিয়া দুই ক্লান্ত ডানা,
তরঙ্গিনী-তীর জুড়ি বিলুণ্ঠিত হোক মৃত্যু-হত
ধ্বংস হোক—করিও না মানা।
ধূসর-পিঙ্গল-বাসে উত্তরীয় বিরচি আপন
অরণী ঢাকুক তণু তার,
শীতার্ত কম্পিত দেহে সে রহুক আতঙ্ক-মগন
প্রতিমূর্তি বেদনা শঙ্কার।
মর্মরিত বনপথে জীর্ণপত্র শবের মিছিল
অবিশ্রাম স্রোতসম বহি—
বহুক বিলুপ্তি পথে নাহি রাখ স্মৃতি-চিহ্ন তিল—
চিরন্তনী বিধুর বিরহী
শিশির অশ্রুর ছায়া-মায়াময় শীতের ধরণী
এ কোন্ রহস্যলোকে ঢাকা—
সে মগ্ন ধ্যানের বুকে তবু চলো বিরচি শরণী
হে পঞ্চম ঋতুর বলাকা।
এ গূঢ়-নৈষ্কর্ম-লোকে সুগোপন ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত
অকস্মাৎ কভু দেয় দেখা—
আমরা বিস্ময়ে হেরি মানবের কল্পনার ভিত—

www.pathagar.com

লুপ্ত তার শেষ চিহ্ন–লেখা।
উদ্দাম উত্তর বায়ু ক্লান্তিহীন তোমার সারথী
হেরি ছুটে পর্বতে–প্রান্তরে—
বিচূর্ণিয়া পদতলে জরাজীর্ণ ভীরুর আরতি
সৃষ্টি আনো ধ্বংসের বাসরে।
কুহেলী–তুহিনতলে অঙ্কুরের অগ্নি ওঠে জ্বলি,
মাতৃগর্ভে একান্ত গোপনে—
চ্যুত–বৃন্ত মঞ্জরীতে অনাগত বাসন্তী অঞ্জলি
স্বপ্ন–মূর্তি লভে ক্ষণে ক্ষণে।

বহ্নিশিখা

শ্মশ্রু ভেজা অশ্রু জলে মুক্তি নাহি আসে,
সুপ্ত–তাজা রক্তে শুধু মুক্তি–সুধা হাসে।

হুতাস–কালো রাত্রি রচে মৃত্যু–পুরীর ভূষা,
রাঙা আশার সূর্য আনে দীপ্ত আলোর ঊষা।

শক্তিহীনের ভক্তি মরে ব্যর্থ রিক্ততাতে,
সার্থকতা নিত্য চলে বীর্যবানের সাথে।
ভয়ের ভূতের সূত–সাথীরা অন্ধকারে কাঁপে,
বীর সাহসী শির তুলি তার দীপ্ত দিবস যাপে।

মৃত্যু–ভীতি নিত্য যারা চরণ তলে দলে,
বিশ্ব–জগৎ ভৃত্য সম তাদের পথেই চলে।

তোমার আশা তোমার ভাষা, তোমার বিজয়–গীতি,
তোমার বুকের রক্ত–রাগে রইবে উজল নীতি।
অন্য পন্থা নাহি—
স্মরণ রেখো বন্ধুরা সব মুক্তি–পথ–বাহী।

প্রদীপ্ত প্রভাতী আলো

প্রদীপ্ত প্রভাতি আলো দাসত্বের কালোরাত্রি টুটি ;
রুধির রঞ্জিত রাগে উদয় অচলে উঠে হাসি—
বন্ধন–বিমুক্ত জাতি ঊষসীর পুষ্প সম ফুটি,
আসিন্ধু প্রান্তর ঘেরি ঘ্রাণে–ছন্দে উঠিছে উদ্ভাসি—
দেশ–প্রান্ত চুমি—
সে দেশ আমার দেশ—মোর বাংলা—মোর জন্মভূমি।

আমার মুখের ভাষা—তৃষা–আশা–গুঞ্জন–গীতিকা

www.pathagar.com

অন্তরে অন্তরে তোলে কত ছন্দ আনন্দ-ব্যঞ্জনা—
স্তব্ধ-মূক কণ্ঠ-তলে উদ্বেলিয়া উঠে বাণী-শিখা,
মুহূর্তে-মুহূর্তে রচি কত মুগ্ধ স্বপ্ন-সম্ভাবনা—
নাহি তার সীমা—
সেখানে রহে না বাঁচি দীর্ঘদিন নৈশব্দ-কালিমা।

রুদ্ধ-বাক্ চিত্ত জাগে নভ দীর্ণ বজ্রের গর্জনে,
মিথ্যার ভ্রূকুটি যত স্পর্শে তার শূন্যে যায় মিশে—
সপ্ত-সিন্ধু-নির্ঘোষিত উদ্বেলিত তরঙ্গের সনে
সত্যের ডংকারা বাজে বিশ্বজুড়ি সর্ব দিশে-দিশে
তারি জয়-ধ্বনি—
বঙ্গের অঙ্গন ভরি মুহুর্মুহু উঠে আজ রণি।

রক্ত-ভেলা

আঁধার রাতের পাথার-বুকে যখন ভাসে রক্ত-ভেলা
পূর্বাচলের শীর্ষে হাসে তখন ঊষার আলোর মেলা
অশ্রুজলের সৃষ্ট মেখে—
আঁধার নামে তীব্র বেগে
কুজঝটিকা রয় সে জেগে নিত্য অষ্ট প্রহর বেলা।
বুকে রাঙা রক্তে জাগে দীপ্ত দিনের আলোর খেলা।

কান্না-ঝরা অশ্রু-নীরে বৃদ্ধ-ভীরুর শ্মশ্রু ভেজে।
বীর্যবানের রক্তে নাচে সৃষ্টি নব শৌর্য ত্যেজে।
চপট খেয়ে কপোল-জোড়া,
নামায় যারা নয়ন-ঝোরা—
মানুষ নামের যোগ্য যারা—যদিও চলে মানুষ সেজে।
তাদের পায়ে দানের শিকল নিত্য দিনে চলছে বেজে।

যাত্রা যাদের হয় রে শুরু রুটির স্রোতের অধীর টানে—
জীবন-তরী চলবে তাদের মুক্তি-মধুর তীর্থ-পানে।
তপ্ত তাজা রক্ত ছানি—
বীর্য জমে সবাই জানি—
সেথায় বাজে সৃষ্টি-বাণী নিত্য নব জীবন গানে—
সেই পথেরি দিশার ধারা বিশ্বলোকে সবায় মানে

হে মোর দেশের বীর সূতেরা রক্তে আঁকি পথের দিশা
টুটলে যারা আলোর বানে অধীন দেশের আঁধার নিশা—
আজ তাদেরে সালাম জানাই—
বাজছে জাতির চিত্ত সানাই—

www.pathagar.com

আজ গোলামীর নাই রে বালাই—আজ মিটেছে মুক্তি তৃষা—
মৃত্যু-জয়ী ভাইরা আবার সালাম জানাই ভক্তি-মিশা।

আজিকে এলো রে মুক্তি-দিন

আজিকে এলো রে মুক্তি-দিন,
উড়িছে গগনে বিজয়-কেতন বাজিছে মধুর চিত্ত বীণ।

চরণে দুলিছে অতল সিন্ধু-শিয়রে তুঙ্গ অদ্রি-রাজ,
ডান হাতে মোর সুধার ভাণ্ড বাম হাতে নাচে বহ্নি-বাজ
বন্ধুরে দেই প্রীতির পরশ-অত্যাচারীরে মৃত্যু-তাজ।
জীবনে এ মোর নিত্য কাজ।
আমার দেশের বক্ষ-ফুলায়ে আর কেহ নহে শঙ্কা-লীন
এলো রে আজিকে মুক্তি-দিন।
অত্যাচারীর হত্যা-ক্ষরিত আমার ভাইয়ের রক্ত-ঢল,
বাঁধন টুটার কত না প্রয়াস বারে বারে হেথা করেছে তল।
নিঃসম্বল—

তবুও লড়েছি কতবার মোরা মুছিয়া বেদনা-অশ্রু-জল,
বারে বারে তাহা হলো প্রতিহত—হইনি তবুও চির-বিফল
যুগ-যুগ ব্যাপী ব্যথা-সাধনায় বহু-বাঞ্ছিত মিলিল ফল,
প্রাণ-উছল।
আঁধার রাতের ধাঁধার ছলনে পেয়েছি জীবনে অনেক দুখ
বন্দী-কারার অন্ধ-গহরে রয়েছি একাকী বধির মুক,
বন্ধন-হারা জীবনেরে মাগি রয়েছি তবুও সুউন্মুখ ;

সফল আজিসে স্বপ্ন-সুখ
আজাদ এদেশ ফেলিছে মুছিয়া অতীতের যত গোলামী-দীন
এলো আজ ফিরে মুক্তি-দিন।

নিকট-দূরের অনেকে সেদিন সেজেছিল মোর বন্ধুবর
আপন ভাইয়ের চেয়েও তাহারা হলো রে নিবিড় নিকটতর।
স্বার্থপর
গুঢ় সুচতুর চির সে অরিরা ছিল সীমাহীন আত্মপর
এসেছিল হেথা কুণ্ঠা ভুলিয়া নিরবে লুটিয়া আমার ঘর
অথবা আমারি ধ্বংস-শ্মশানে গড়িবে রাজ্য নূতনতর।
হায় রে কুটিল বন্ধুবর।
আমারি ত্যাগের সাধনা বিপুল—আমারি বুকের
শোনিত লাল।
দলিল অভয়ে চরণে পিষিয়া ষড়যন্ত্রের গোপন জাল

www.pathagar.com

ঝুটা বন্ধুর টুটা সে ফন্দি পড়িল ধ্বসিয়া তাল-বেতাল
এলো তার শেষ বিলয়-কাল্

সেই ছলনার বধ্য-ভূমিতে জাগিল সদ্য দেশ স্বাধীন।
এলো আজ সেই মুক্তি দিন।

বন্ধুরা রহ হুঁশিয়ার সদা মেলি চারিপাশে সজাগ আঁখ
স্বদেশীবিদেশী স্বার্থবাদীরা খুঁজিছে আমার ভুলের ফাঁক
রহি নির্বাক—
করো সংহত বুকের শক্তি অনুসরি মহা কোরানপাক
ভুলি সংঘাত আত্ম-বিরোধ মুমিনেরে দাও মৈত্রি-ডাক
জানের গগনে হও উড্ডীন মেলিয়া ঐক্য-ঈমান-পাখ্
হবে রে লুপ্ত ব্যথা-বিপাক।
তুমি মুসলিম রক্ত তোমার জেহাদের জোশে সুরঙ্গিন
মৃত্যু-বিজয়ী শাহাদৎ-সুধা জিগরে তোমার বাজায় বীণ
দিকে-দিকে সারা বিশ্বের বুকে তোমার বিজয়ী চরণ-চিন
আজিও রয়েছে লুপ্তি-হীন।
নিখিল জগৎ চায় হতে পুণ তোমারি আবার বক্ষলীন
এলো রে আবার মুক্তি-দিন।

বিজয় দিবস

বহু শতাব্দী পর—
বাংলার বুকে জাগিল মুক্ত স্বাধীনতা নবতর।

অতীতের ছায়ে হেরিছি আমরা আজের বাংলাদেশ
বহু অঞ্চলে খণ্ডিত সে-যে, নাহি এক সীমা-রেখ—
বঙ্গ-ভঙ্গ কলিঙ্গ রূপে ছিল তার সমাবেশ—
বহুধা ছিন্ন ভিন্ন রাজের হতো সেথা অভিষেক।

দূর মাদ্রাজ দেশ হতে শেষে আসি হেথা সেন-রাজ
লক্ষণাবতীর বক্ষ জুড়িয়া করিল সংস্থাপন
সনাতনী এক সমাজ বিধির গোঁড়ামীর দাহ-ঝাঁজ
তারি ফলে হেথা বিদেশী পাঠান জিনিল সিংহাসন।

তারপরে এলো বিলাসী মোগল—তার পরে ইংরাজ
রাজ্য শাসনে চালালো উভয়ে নিজ ভাষা—নিজ বোল
কোটি কোটি দেশ-বাসীর ভাষারে দিলো লাঞ্ছনা-লাজ
দিলো না তাদেরে সম-অধিকার-চেতনার হিল্লোল।

এলো বিপ্লব-এলো সংগ্রাম-জাগিল স্বাধীন দেশ
বঙ্গ-ভারতে জাগিল মানুষ-হিন্দু-মুসলমান।

www.pathagar.com

এক দেশবাসী যদিও উভয়ে, বিভেদের নাই শেষ
স্বীয় ধর্মের সন্ধানে তারা অকাতরে দেয় প্রাণ।

নব এ স্বাধীন দেশ–বুকে জাগে দুইটি স্বাধীন জাত
দুইটি আজাদ দেশ নিল গড়ি পরিহরি সংগ্রাম—
হিন্দু–প্রধান অঞ্চল গেলো হিন্দুরা প্রণিপাত
মুসলিম যেথা সংখ্যায় গুরু পাক–ভূমি তার নাম।
উপমহাদেশের দুই পাশ জুড়ি জাগিছে পাকিস্তান
ভাষা আর স্থান বিভেদে সেথায় বাধিল বিরোধ ঘোর

পূর্বের বাংলা দলিলো হেথায় পশ্চিমা অভিযান
একাদশ বুকে এক ভাষা জ্যোতে আনিলো আলোর ভোর।

পাক ভারতের এই দুই দেশে দুই ভাষা বহু জাত—
আমার দেশের বুকে জাগে শুধু মিলন–সুপ্রভাত।

বিজয়–দিবস তার
বরষে বরষে জাগায় হেথায় ঐক্যের অভিসার।

শতদল-১

পূব বাংলার পূব নভকোলে সুবে–সাদেকের নূরানী হাসি
আলো শতদলে ঐ হেরো দোলে আঁধার রাতের নিরাশা নাশি।
অনেক ব্যথার পাথার পারায়ে গোলামী গোলক–ধাঁধারে টুটি—
অনেক ছলারে কলারে দলিয়া সত্যসবিতা উঠিছে ফুটি।
মুক্তি–মুখর শুকরগুজারী উঠে গুঞ্জরি আকাশ ছাপি
রক্ত–পিয়াসী খুনিয়ারা যত শূনি সে বজ্র উঠিছে কাঁপি।
বহু শহীদের জীগর শোনিতে লালীম রাঙা শাহানা রাগে—
নব–যৌবন–জোয়ার জলেরা শত ফণা মেলি ঐ যে জাগে।
তরুলতা হারা মরা মরুভূর দাহন–দগ্ধ বালুকা বুকে
শ্যামল স্নিগ্ধ প্রাণ–অংকুর আশা–হিল্লোল দুলিছে সুখে।
তিমির নিবিড় নিশীথে শেষে—
ঊষার রাঙা কেতন উড়ায়ে আলো শতদল জাগিছে হেসে।

বুড়া অতীতের স্থবিরেরা যত আলোর ঝলকে সভয়ে কাঁপে
হুতুম পেচারা হতাশা আঁধারে কোটর গহরে জীবন যাপে।
মরা সামানার কামনা পিছল লোভের লাভের বনিক যত
সাম্য–ন্যায়ের নব এই যুগে কাঁপিছে সভয়ে শঙ্কাহত।
শোষণে–পেষনে শাসন যাহারা করেছে দেশেরে পাশব–বলে,
আজিকে তারাই পড়িছে লুটিয়া নিপীড়েতের ঐ চরণ–তলে।
সুখ–দুখ আর হরিষ–বিষাদ দিবানিশি সম চক্রপথে

www.pathagar.com

করে পরিক্রমা সারা বিশ্বের কালের প্রতিটি কক্ষ হতে।
জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি-লয়ের চলিছে নিত্য এই যে খেলা—
তারি তরঙ্গ কল্লোলে ভাসি চলে অনন্ত বিম্ব-বেলা।
সেই সে ভেলারি বক্ষ জুড়ি—
প্রাণ-শতদল মুক্তি পুলকে মেলিছে নিত্য নবীন কুঁড়ি।

স্খলিত-শিকল উতল বঙ্গ চিত্তে জাগিছে ললিত গীতি
বন্ধন-টুটা ছন্দ-নৃত্যে মাতাবে সে আজ মর্ত্য ক্ষিতি।
শঙ্কা ভীতির বিগত স্মৃতি আগত দিনের ডঙ্কা রবে,
হতেছে লুপ্ত তপ্ত আসরে স্বপ্ন-মুখর স্বাগত স্তবে।
তুষার পাথার গহর কুড়িয়ে জাগিছে হরিত দ্বীপের মালা—
শ্মশান-মশান আসন জুড়িয়ে জাগে অঙ্কুর জীবন-জ্বালা।
লাখো শহীদের বক্ষ শোনিতে রচিত জাতির সিন্ধুবুকে
জাগর মুখর জীবনতরণী বহিছে উজান আশার সুখে।
জীবন-তীর্থ দিতেছে ইশারা সমাগত ঐ সমুখ পানে।
নবজীবনের কিরণ জ্বালি—
জাতির নূতন প্রাণে শতদল হাসিছে উষার ময়ূখমালী।

শতদল-২

সবুজ ধান আর শ্যামল বনের
ছায়ায় ঢাকা আমার দেশে
ঝিলের বিলের নদীর কোলে
অথই পানি বেড়ায় হেসে।
শতদল আর কুমুদ কাশের
সেথায় বসে মুগ্ধ মেলা
মধুর সুধা পানপিয়াসী
মধুকরের নিত্য খেলা।
সেখানে রয় নিত্য জাগি
গুঞ্জনীত গানের সুরে
দখিন হাওয়ায় শাখার পালে
সে সুর দেশে বেড়ায় ঘুরে।
আমার তোমার হৃদয়-পুরে
আলের পথে-নিকট দূরে
মাঠের বুকে—কানন জুড়ে
নীল-নীলিমায় গগন চূড়ে
সে সুর দেশে বেড়ায় ঘুরে
মধুর সুরে।

www.pathagar.com

সেই সুরেরি কাঁপন লাগি
সুপ্ত হিয়ার শতদলে—
আশায় ভরা জাগর মুখর
সূর্য-ঊষার কিরণ জ্বলে।
নিদ্রা-নিবিড় কৃষ্ণকালো
আঁধার রাতের পাথার ছাড়ি
লক্ষ-কোটি যাত্রী নবীন
তীর্থপথে জমায় পাড়ি।
সেথায় তারা মুক্তি-পাগল
তৃপ্তি-ভরা দীপ্তি যাচে
স্পর্শে যাহার মৃত্যু নাশি
অমর আলোর বিশ্ব বাঁচে।
সৃষ্টি তাহার পায়ের কাছে—
আত্মসুখে নিত্য নাচে—
পুষ্প-কলি আশার গাছে
তাইতো সেথায় জেগেই আছে।
ছন্দে তারি বিশ্ব বাঁচে
মুক্তি-নাচে।

সেই নাচের পরশ লাগি
প্রাণ-শতদল উঠছে ফুটি ;
লয়ের ক্ষয়ের ভয়ের ভীতি
জয় আরাবে পড়ছে লুটি।
জীবন গানের পবন দোলা
স্বপন আশা বপন করি
ধরার তীরে রক্ত-নীরে
দৃপ্ত জীবন তুলছে গড়ি।
বিশ্ব আনন উঠছে ভরি
মুক্তি-কানন-কুসুম বনে
আমার দেশের যশের জ্যোতি
জাগছে নয়া ঊষার সনে।

লক্ষজনের বক্ষ মনে
দীপ্ত রবে সঙ্গোপনে
নিখিল শান্তি স্বস্ত্যয়নে
সর্বক্ষণে।

বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা

বন্ধু গো মোর, সবার কাছে নয়তো কথার কথা।

www.pathagar.com

রক্তে যদি ঢেউ না লাগে—কেউ না জাগে দেশে,
কেউ না সাজে খুন্‌-শাহানা শহীদানের বেশে,
কেউ না যদি আর্ত-জনার দাঁড়ায় পাশে এসে,
দীপ্ত মুখে হেসে—
দেশ তো জাগিবে না।
তংকা-ভাড়ায় বাড়াও তুমি যতই সৈন্য-সেনা,
শংকা-হরণ মুক্তি কভু যায় না টাকায় কেনা,—
একটি শুধু পরীক্ষিত পন্থা আছে চেনা—
কই সে কথা শোনো ঃ
জাতির ভালে কলঙ্কেরি চিহ্ন কালো কোনো
অঙ্কিত হয় যদি—
রইবে সে যে মূর্ত হয়ে নিত্য নিরবধি—
কেউ না যদি করছে তারে ধৌত পলে-পলে
তরুণ বুকের সদ্যক্ষরা রক্ত-গড়া জলে।
কেউ না যদি বক্ষ-হাড়ে অস্ত্র গড়ি-গড়ি
বিশ্ব-দাহন অগ্নি-বাণে ভস্ম করি করি
মিথ্যা-শিবির যত
নিঃশেষিয়া সত্তা আপন নিত্য অবিরত
অগ্রপথে চলে
বাঁচবে না শোন দেশ শুধু রে বুদ্ধি-সুকৌশলে
ছদ্ম ত্যাগের ছলে।
কোরবানী তোর চাই
লক্ষ-কোটি পশুর খুনে তৃপ্তি কিছু নাই,
আল্লা পশুর খুন্‌-পিয়াসী নয়তো কভু ভাই,
মনের অসুর হত্যা-করা কোরবানী তোর চাই ;
আপন বুকের রক্ত-ক্ষরা কোরবানী তোর চাই—
কোরবানী তোর চাই।

কণ্ঠ-ফাটা বক্তৃতাতে কথার ঘণ্টা বাঁধি
ঘুচবে না রে আধ-মরাদের সুপ্তি-মরণ ব্যাধি
দীর্ঘ নিশ্বাস যতই ফেলো—যতই কান্নাকাটি,
পাষাণ-হৃদয় গলবে না তায়—ভিজবে শুধু মাটি—
বন্ধু আমার, স্মরণ রেখো এই কথাটি খাঁটি
বৃথাই কান্নাকাটি।
জীবন-বাণী কহে ঃ
বীরের ভোগ্যা বসুন্ধরা—ভীরুর নহে—নহে।

www.pathagar.com

এলো রে সেই ডাক

ঘর পুড়ানো ঝড় দেখেছো—পাহাড়-উঁচা বান ?
এক নিমেষে করলো যাহা ধ্বংস লাখো প্রাণ।
আসলে তুফান ঘূর্ণি-পাগল ক্রুদ্ধ থরোথর,
একই পথে ফুসলো যেনো হাজার অজগর।
তারি পায় উঠলো ফুলে লোনা সাগর-জল,
লক্ষ দেওয়ের চিৎকারে যে জগৎ টলমল।
আসলে ছুটে পানির পাহাড়—আকাশ ছোঁয়া ঢেউ,
মরলো হাজার লক্ষ মানুষ—অর্ধমৃত কেউ।
ভাসলে সোঁতে পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-শিশু সব
এক নিমেষে থামলো আহা আর্তনাদের রব !
নাই কো প্রাণের লেশ—
চৌদিকে আজ কাঁদছে যেনো মৃত্যুপুরীর দেশ।
পক্ষী-পশুর দল—
লাখ মানুষের সাথে তারাও ডুবল অতল-তল।
ঘর-বাড়ারো নাই নিশানা শূন্য শুধু মাঠ—
ক্ষেতের ফসল বৃক্ষ-লতা সব-ই রে লোপাট।
শুধুই লোনা জল—
শতেক দ্বীপের চৌদিকে আজ করছে টলমল।
দ্বীপের বুকে বাঁচলো যারা গুটিকতেক জল—
সাগর-তীরে হইলো যাদের সর্বস্ব হরণ,
সেই অসহায় মানুষ দলের বাঁচার অধিকার—
বিশ্ব-জোড়া মানুষ জাতি করলো রে স্বীকার।
আজ যারা ভার লইবে রে সেই মহান দায়িত্বের,
তারাই হলো সত্য নেতা বিশ্ব-মানবের।
এলো রে সেই ডাক—
ওরে তরুণ ওরে অরুণ, রইবে কি নির্বাক ?

নতুন আলোর যাত্রা শুরু

আঁধার রাতের ঝড়ের শেষে
সুবে-সাদেক জাগলো বুঝি—
রোশ্‌নী-জ্বালা সূর্য নয়া
আলোর হাসি আনলো খুঁজি।

হাসছে কানন, হাসছে সাগর
হাসছে অসীম আকাশ-নীলা—
চলছে নাচি ঢেউ-এর দোলায়

www.pathagar.com

ঝিলিক্ দেয়া রূপের লীলা।

নিশার কালো বোর্খা টুটি
সোর্খ-রূপালী জ্যোতির ফলা—
নূতন দিনের খুলছে দুয়ার।
নূতন আশায় আলোজ্বলা।

হাজার শাখে ডাকছে পাখী—
মিনার-চূড়ে আযান জাগে,
নিখিল জগৎ মেলছে আঁখি
তারি বাণীর মধুর রাগে।

মানুষ আবার নাযাত পেয়ে
আঁধার রাতের আযাব্ হতে
কদম বাড়ায় সহজ সরল
মুক্তি-উজল কাবার পথে।

নিঁদের বেহুঁশ আবেশ টুটি
চেতন-উজল কেতন তুলি—
লক্ষ পথিক চলছে আবার
মিথ্যা মোহের বাঁধন খুলি।

মমিন যত দীলের জমিন
ঈমান-সবল ফসল বুনি'—
করছে পুন সবুজ-তাজা
নূতন ঊষার আযান শুনি।

আঁধার কালো দুপুর রাতের
খুন্-খারাবী লুটের মেলা—
আজ হতেছে খতম্-সাবাড়
তাহার যত ভেল্কি-খেলা।

সরল মানুষ ধোঁকার গরল
আজ-চিনেছে অনেক ঠেকে—
বিষ নহে যে আবে-হায়াত
আজকে তারা চিনছে দেখে।

নূতন আলোর যাত্রা শুরু
সেই আলোকে আজকে কাটুক
বন্ধ আঁখির পর্দাপুরু।

লড়াই করেই জয় মিলে ভাই

লড়াই করেই জয় মিলে ভাই—বড়াই করে নয়,
চড়াই পথের সরাই-রাহী থোড়াই জানে ভয়।

www.pathagar.com

জোরের বালাই নাই কো যাহার চোরের মত চুপি
নিঁদের রাতে সিঁদ কেটে আর নিভিয়ে কোণের কুপি—
হুজুগ বুঝে সুযোগ মতো পরের ঘরের পাশে
হরণ করার পরম আশায় চরণ টিপে আসে,
পড়লে ধরা তারাই কড়া দরাজ আওয়াজ তুলি,
সাচ্চা রে শেষ গচ্চা দিয়া ছড়ায় মিছা বুলি—
জেনেই সুনিশ্চয়।
লড়াই করে জয় মিলে ভাই—বড়াই করে নয়।

সত্য লাগি নিত্য যারা বুকের লহু ঢালে—
বিশ্ব-বুকে শীর্ষ হয়ে দীর্ঘ কালে-কালে
তারাই বাঁচে—খোদার কাছে তারাই সেরা জাতি,
আঁধার রাতের বাধার পথে তারাই জ্বালে বাতি।
মরণ-জরা হরণ করি স্মরণ-লোকে-লোকে—
তারাই রাখে জগৎটাকে অটল ব্যথা-শোকে
শান্ত-সুনির্ভয়—
লড়াই করে জয় মিলে ভাই—বড়াই করে নয়।

ছ্যাবলা কথার তুবড়ি-ভরা থ্যাবড়া-মুখো যারা—
কথার জোরে নেয় সে কেড়ে বিশ্ব নিখিল সারা।
কাজের কথায় হাজির হলে পাছের দুয়ার খুলি—
আস্তে চুপে ভেস্তে পড়ে লেজের ডগা তুলি।
বোঝার পথে বোঝা সে সব বীরের চূড়ামণি—
স্মরণ রেখ তারাই ধরায় হরণকারী শনি—
তারাই পথের ভয়—
লড়াই করে জয় মিলে ভাই—বড়াই করে নয়।
জানের চেয়ে মানের কদর নিত্য যাহার কাছে—
মৃত্যু ভরা মর্ত্যে জেনো, সেই তো বেঁচে আছে।
আয়ু-বায়ু বইলে শুধু—সে নহে রে বাঁচা,
মরণ পরে স্মরণবাহী—সেই যে অমর সাচা।
পরের লাগি যে রয় জাগি আরাম হারাম করি
বিশ্ব হারা আত্মহারা নিত্য তারে স্মরি।
দেয় সে বরাভয়—
লড়াই করে জয় মিলে ভাই—বড়াই করে নয়।

কাজের কাজি হয় না রাজী জুয়ার বাজী লাগি
বাঁধন কাটা সাধন লাগি রয় সে জনম জাগি।
তিমির-ঘেরা নিবিড় রাতের শিবির-সীমা কোলে
তাহার দিলের আলোর মেলা দীপের সম দোলে।

www.pathagar.com

সেই আলোরই ঝালর বাহি ভুলের পথচারী—
.......আবার ক্ষমায়-ভরা কূলের পানে পাড়ি—
শান্ত জ্যোতির্ময়—
লড়াই করে জয় মিলে ভাই—বড়াই করে নয়।

আঁধীর-চেতা সমর-নেতার রুধির-নেশা টুটি
বিশ্ব জোড়া বিশ্বাসীরা আয় রে সবে ছুটি ;
অনেক যুগের অনেক দুখের অনেক অনাচারে
আজ জমেছে ব্যথার পাহাড় নিখিল দ্বারে-দ্বারে।
সেই অশুচি বেদন মুছি জাগ রে মানব জাতি—
খোল রে আঁখি,—ডাকছে পাখী, কাটছে আঁধার রাতি
বিশ্ব-জগৎময়।
লড়াই করে জয় মিলে রে—বড়াই করে নয়।

রঙধনু

নূতন দিনের রঙ-ধনু
করবে বুঝি রাঙা আবার বিশ্ব-জনার মন-তনু।

মেঘের বনে বজ্র বাজে—ঝঞ্ঝা নাচে তাথৈ-থৈ,
বিজলী বুকে ফুটছে লাখো চোখ-ধাঁধানো বহ্নি-খই,
খুন-রঙিলা রং-রেজেরা আজকে তোরা রনলি কই—
কোথায় রঙের পিচকিরি ?
মেঘলা-কালো ঝঞ্ঝামাতাল নভাঙ্গনের বুক চিরি
জীগর-ঢালা রক্ত-রাগে রচবি যারা বর্ণ-শ্রী,
আয় রে তোরা আয় রে ছুটে চৌ-সীমানা দিক্ ঘিরি
স্পর্শে যাহার উঠবে নাচি চিত্ত-মনের সকল অণু,
নূতন দিনের রঙ-ধনু।

যুগ-যুগান্ত ভুলছি মোরা খুন-শাহানা বেলাস-বেশ
রচতো যারা চিত্ত-মনে নও জোয়ানী-জোশ-আবেশ,
ফেলতো মুছে এক নিমেষে ভয়-ভীতুদের শংকালেশ
করতো সবায় জঙ্গ মাতাল—
জালেম জাহান কাঁপতো যাহার পায়ের নীচে টাল্ মাটাল,
সাত দরিয়ায় মেলতো যাহার জঙ্গী বহর উজান পাল,
ঝাণ্ডা যাহার নাচতো নভে গর্বভরে সাঁঝ-সকাল—
চাঁদ-সেতারার রঙ্‌ধনু—
বন্ধুরা আয় সেই যোশে যার আজকে আগুন মন-তনু।

www.pathagar.com

রঙ-ধনু আন্-রঙ-ধনু আন্ চিত্তাকাশের বুক জুড়ি
আঁকবে যারে সত্যচারী বীর্য-বানের খুন-ঝুরি,
রইবে যাহার শীর্ষে আঁকা শাহাদতের মঞ্জুরী,
পুণ্য-আভা জ্যোতির্ময়—
আত্মলাভের অন্ধকারে বন্ধ যাহা নয় রে নয়,
লাঞ্ছিত যে-বাঞ্ছা লভি হেলায় করে বিশ্বজয়,
সৃষ্টিরে যে অব্যাহত রাখছে নাশি ধ্বংস-লয়
আন রে তোরা বিশ্বে আবার মৃত্যু জয়ী সেই অভয়—
প্রাণ-রঙিলা রঙ ধুন—
বন্ধুরা কর স্পর্শে তারি আজকে তাজা মন-তনু।

মৃত্যুর বুকে পেতে গেলো এরা জীবনের জয়-তখ্ত্

কালের ললাটে এঁকে গেল যারা কাল-জয়ী জয়-টিকা,
বিশ্বের বুকে গেল যারা জ্বালি' চির-জ্যোতি প্রাণশিখা,
নিশীথ নিশার নিকষ নিলয়ে ঊষার আশার বাণী
নব-জীবনের আলোয় ভরিয়া যারা নিজে দিলো আনি'
জন্মার জঠরে আনিল যাহারা যৌবন-ঢেউ-দোলা,
প্রাণের জোয়ারে চির টলমল শোক-তাপ-ব্যথা-ভোলা—
সৃজন-লীলার স্বপন রচিয়া ধ্বংসের বুকে বুকে
স্রষ্টার এই সৃষ্টি ভরিয়া এরাই সৃজন-সুখে
মৃত্যুরে নিষ্ফল
বারেবারে হেথা করিয়াছে হাসি' নব এ স্রষ্টাদল।

দিবসের শেষে আসে সে সন্ধ্যা আঁধারের ব্যথা পিয়া,
উল্লাস-শেষে ক্রন্দন জাগে শূন্য এ সারা হিয়া,
হেমন্ত শেষে রিক্তা ধরণী কেঁদে ফিরে মাঠে মাঠে,
শীতের পরশে বাঁশী থেমে যায় পল্লীর বাটে বাটে,
চাঁদনী-চোয়ানো ফাগুন-আকাশ শাওন-নিশীথ জুড়ি'
সজল মেঘের নয়ন-আসারে কেঁদে মরে ঝুরি' ঝুরি'।
বরষার ভরা উতলা তটিনী নিদাঘ-দহন-দাহে
শীর্ণ বুকের স্পন্দন-হারা করুণ কাহিনী গাহে।
ধরণী ভরিয়া নিতি
কালের কণ্ঠে বাজিয়া চলেছে এ চির-জীবন-গীতি।

তবু এ নিত্য অমল সত্য নহে নহে কোন কালে—
সত্য সে যাহা মৃত্যুর বুকে জীবনের আলো জ্বালে।
যুগে যুগে আসে মানব মহান জীবনেরি বাণী বহি'

www.pathagar.com

মৃত্যুরে ছাপি' জীবনেরি লীলা দুলিতেছে রহি' রহি।
জাতিরো জীবনে প্রলয়ের দোলা ধ্বংসের উৎসবে
অত্যাচারীর নিঠুর আঘাতে যুগে যুগে জাগে যবে—
তখনি সে আসে, স্রষ্টা সে নব, যুগ-বীর—যুগ-নেতা,
বিলয় ব্যথারে নাশিয়া সে আনে সৃষ্টির জয় সেথা।
আতাতুর্ক-শওকৎ—
মৃত্যুর বুকে পেতে গেলো এরা জীবনের জয় তখ্‌ত্‌।

লাল পল্টনের রণ-সঙ্গীত

রণভেরী ঘন বাজে, কমরেড,
বাঁধো হাতিয়ার আহব তরে—
স্বাধীনতা লাগি যুঝিব আমরা
রচি নব পথ ধরণী পরে ;
মোরা বীর সেনা চির নির্ভীক
টলে না হৃদয় কাহারো ডরে।

মজুর শ্রেণীতে জন্ম মোদের,
স্বল্পেই মোরা তুষ্টি গণি—
ঐক্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা হল
আমাদের রণ-তূর্য-ধ্বনি !

ক্ষুধানল আর শৃঙ্খল-ডোর
ছিল আমাদের নিত্য সাথী,
ভিখারীর মত অন্ন কুড়ায়ে
কাটিত মোদের দিবস রাতি।
সে আঁধার নাশি জাগে হেরো আজি
মুক্তি-উষার আলোক-ভাতি।

গান গেয়ে মোরা রণভূমে ছুটি,
চলো চলো রণে ঝঞ্ঝাগতি—
মুক্তি-সেনানী মোরা নাহি ডরি
ক্ষমতা মাতাল রাজ্য-পতি !

ঊর্ধ্বে-আসীন শাসক প্রভুরা
কোথা হতে তারা শক্তি লভে ?
গোলাগুলি আর কামান বিমান
আমরা বানালে পায় তো তবে !

আছে বিশ্বাস অচল অটল
চরম বিজয় মোদেরি তরে—

www.pathagar.com

মোরাই টুটিব গোলামী-বাঁধন
বেদনা-পিষ্ট নিখিল পরে।
মৃত্যু বরিয়া লড়ো, কমরেড,
মুক্তির লাগি হর্ষ-ভরে !

গড়বি তোরা স্বর্গ নবীন

তরুণ তোরা অরুণ আলো উদয় ঊষার পথে
নিখিল জোড়া যাত্রা যে তোর প্রাণের রশ্মি রথে !
যেথায় আছে ব্যথার আঁধার
চলার পথে বাঁধন বাধার
মুক্তি আলো বুনবি সেথা আপন বক্ষ হতে,
কিশোর তোরা কুসুম-কেশর নিত্য জীবন-পথে ॥

বক্ষে তোদের রক্ত তাজা দুলছে নাচি নাচি
সেই নাচনে ভয়-ভীরুরা উঠুক আবার বাঁচি !
প্রাণের শঙ্কা নাশি
বাজা অভয় ডঙ্কা বাঁশী
পন্থা নবীন রচবি যদি কন্টকেরে যাচি,
লইতে হবে যাত্রাপথে সৃষ্টি দোলায় নাচি ॥
নিঃস্বেরে আজ বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দিবি তোরা,
স্বার্থত্যাগের পার্থরা সব জাগ রে নিখিল জোড়া।
সখ্য প্রেমের ঐক্যে বাঁধি
ফেল মুছে আজ হিংসা আর্দি
দে ছুটায়ে স্বপ্ন-আশার পঙ্ক্ষী রাজের ঘোড়া,
গড়বি তোরা স্বর্গ নবীন বিশ্ব-নিখিল জোড়া ॥

জিহাদ জিন্দাবাদ

বহু বরষের মঞ্জিল-শেষে সফল স্বপ্ন-সাধ—,
গাজী-মুজাহীদ—ঐ শোনো শোনো ঃ জিহাদ জিন্দাবাদ !

জং-ধরা তব তলোয়ার বুকে রক্তের রং মাখি—
হাড়ের পাষাণে শান্ দাও তারে বিদ্যুৎ-দ্যুতি আঁকি ;
ঘুন্-ধরা খুন্-সোরাহীর মুখ আজ ফের দাও খুলি—
জিগর-চোঁয়ানো সয়লাবে মুছো অতীতের ভুলগুলি।
আরাম-বিভোর নিদালির ঘোর আবার হারাম করো—
দুশ্‌মন যত সম্মুখে তব কাঁপিবে যে থরো-থরো।

www.pathagar.com

মউতেরে আজ ফউৎ করিয়া জিন্দেগী আন্‌কোরা—।
লও জিনি—তার জৌলুষ যেন ঝলসে জাহান-জোড়া।
সত্যের সৈনিক—
তব পানে আজ নিখিল-বিশ্ব-নয়ন নির্নিমিখ্।

জন্ম-মৃত্যু চলে পাশাপাশি—সত্য নহে এ নিতি—
শহীদেরা সেতো মরণ-বিজয়ী জীবনের বিবৃতি।
মর্দে-মোমিন ভয়-ডর-হীন জাহান জমিন জুড়ি—
আনে ইন্‌সাফ্ নাশে ব্যথা-পাপ ঢালি খুন-ফুলঝুরি।
শাহাদৎ-লহু জাগায়েছে বহু মরা কওম বারে বারে—
রচিয়াছে গুল-বাগিচা অতুল দুর্গম মরু-পারে।
বুলন্দ্ নসীব বীর বাচ্চারা—দ্বীনের সাচ্চা সেনা,
জঙ্গ ময়দানে শোধে বারে বারে জাতির মৃত্যু-দেনা।
জিহাদী-যোশের আবেশ-আকুল দরাজ গুর্দা-দীল্—
এরাই জাতির আজাদী-জঙ্গে মুক্তির আবাবীল্।
আয্‌রাহা যেথা যত
এদেরি হাতের সিজ্জিল-ঘায়ে যুগে-যুগে হলো হত।

আজিকার এই দিনে

এমনি সে মহাখনে,
জাগে যৌবন প্রাণ-শিহরণ
বাংলার প্রাঙ্গণে।

বিদেশী শাসন গোলামী ত্রাসন
যুগ-শতাব্দী ধরি
এদেশের বুকে উদ্ধত সুখে
রচেছিল শর্বরী।

দিনের আলোক গিয়েছিলো নিভে
নিশীথ আঁধার-তলে
দলিত-পিষ্ট কাঁদিত নীরবে
তিক্ত নয়ন-জলে।

মানুষের জাতি ভুলি মর্যাদা
জালিমের পদে লুটি
পথে-পথে কাঁদি মাগিত ভিক্ষা
ক্ষুধার অন্ন দুটি।

ব্যথা হাহাকারে দিক-দিগন্ত
শিহরিয়া বারে বারে

www.pathagar.com

স্তব্ধ রাতের আঁধারে লুকাত
অপমানে আপনারে।

বেদনারো আছে সীমা—
অমা-নিশীথের শেষে জাগে নয়া
ঊষসীর অরুণিমা।

তরুণেরা শেষে বুকের রক্তে
শক্তির শিখা জ্বালি—
মুক্তির মহা প্রাঙ্গণ-তলে
আত্মা-রে দিলো ডালি।

তাহারি তপ্ত স্পর্শে জাগিলো
বাংলার সুপ্ত জাতি—
হলো রে উপ্ত দিক-দিগন্তে
মুক্তির আলো-ভাতি।

আজিকার এই দিনে—
বেজেছিলো নব মুক্তির বাণী
জাতির চিত্ত-বীণে।

মুক্তি-জোয়ার

হেরেছি সেদিন মুক্তি-জোয়ার রক্তের বর্ষণে
শুনেছি সেদিন মুক্তির ডাক বজ্রের ঘর্ষণে—
আমারি আঙিনাতে।
অভয় হিয়ার আলোর মশাল ভয়াল কৃষ্ণরাতে
জ্বালায়ে দেখেছি কিশোর যুবক প্রৌঢ়েরা এক সাথে।
জননী কন্যা ভগ্নীজায়ারা সমদৃঢ় পদপাতে
রক্ত-কেতন হাতে
যৌবন-জল-কল্লোল সম চলিছে সমুখ পানে,
তীর্থের সন্ধানে—
যেথায় চিত্ত সাম্য ন্যায়ের সত্যের শুধু মানে।

লাখো শহীদের বুকের রক্তে রচা এই স্বাধীনতা
মাঠে প্রান্তরে দিয়েছে ছড়ায়ে কত আশা—কত কথা
ক্ষুধার মুক্তি ভাষার মুক্তি মুক্তিহীনতা হতে—
রঙীন আভায় রচেছে স্বপ্ন গেহে-গেহে পথে-পথে
শোষণে-শাসনে-দলিত-পিষ্ট মানুষের বুকে-বুকে
চির নিপীড়িত বেদনা-ক্লিষ্ট জনতার মুখে-মুখে
নতুন আশার গীতি—

www.pathagar.com

হয়েছে মুখের সুধার শিখরে লক্ষ হিয়ারে তিতি।

এই যে মহান নতুন যাত্রা আজ দেশে হলো শুরু
পদে পদে তার রহিয়াছে বাধা কভু ক্ষীণ কভু গুরু।
ক্ষমতা-বিত্ত কামনা নিত্য চিত্তের কোণে-কোণে
অতি অগোচরে লাখো অন্তরে ধ্বংসের বীজ বোনে
লোভের-লাভের শৃঙ্খল বেড় সত্তারে ঘিরে যদি—
স্বার্থের নেশা অর্থ পিয়াসা জাগে যদি নিরবধি
অকাল মৃত্যু ভীতি—
জাতির আত্মচেতনারে ছেয়ে সুগোপনে জাগে নিতি
মহামানবতা মুক্তি বারতা শান্তির মধুবাণী
আঁধার-বিদারী নব পথ-রেখা আলোকের সন্ধানী
আমার এ-দেশে উষা-আশ্লেষে সত্যিই এলো কিনা
আমাদের প্রতি চরণ-ক্ষেপনে আজ তাহা যাবে চিনা।
অহংকারের হুঙ্কারে মাতি ফের-যদি পথ ভুলি—
ভাগ্য-বিধাতা দেশের ললাটে বুলাবেন কালো তুলি।
সেকথা স্মরণে রাখি—
আজ-আমাদের মুক্তি তীর্থে যেতে হবে পথ আঁকি।

প্রদীপ শিখা

রক্ত-রাগে জ্বাল্‌লো যারা আঁধার রাতে প্রদীপ শিখা,
আঁকলো তারাই জাতির ভালে নূতন দিনের বিজয়-টিকা।

ঐক্য এবং সখ্য-বোলে আমার যত ছদ্ম জ্ঞাতি,
সেদিন আমার সত্তা-বোধের হত্যা-লীলায় উঠ্‌লো মাতি—
আমার মুখের অন্নসনে আমার মায়ের মুখের ভাষা,
মুক্ত-স্বাধীন মানব সম বাঁচার যত স্বপ্ন-আশা—
লুটার লাগি আট্‌লো কুটিল সর্বনাশা মিথ্যা ছলা,
সেদিনের সে ভয়াল ক্ষণে জীবন-জ্যোতি অচঞ্চলা
জাতির বুকে অভয় সুখে তোমরা আসি তুললে জ্বালি—
তরুণ প্রাণের অরুণ-লীলা তপ্ত-তাজা শোণিত ঢালি।
মহান সে ত্যাগ হয়নি বৃথা—
তারি আলোয় রচ্‌লো জাতি আজের মহামুক্তি-গীতা।

তোমরা সেদিন আবেদনের কান্না-ঝরা ভিক্ষাঝুলি
বিজ্ঞজনের ইঙ্গিতে কেউ আপন কাঁধে লওনি তুলি।
তোমরা সবুজ, তোমরা অবুঝ, রক্তবীজের লালন ভূমি,
নৃত্য-উতল তোমার পথে মৃত্যু পালায় চরণ চুমি।

শঙ্কা-বিলীন ভয়ঙ্করের ধ্বংস ভয়াল অঙ্ক-কোলে
সদ্য নব সৃষ্টিখেলার অঙ্কুরেরা নিত্য দোলে,
এই যে নিঠুর কঠোর খাঁটি বিশ্ব-লীলা চিরন্তনী—
বক্ষে তারি জাগায় নিতি সৃষ্টি তাহার প্রতিধ্বনি।
যে জন কভু চায় না পথে লাভের লোভের অঙ্ক-কষা
সত্য লাগি যে জন মানে সর্বনাশের সর্বদশা—
সেই পথেরই পথিক তোরা—
আন রে তোরা সৃষ্টি নব নিত্য নূতন বিশ্ব-জোড়া।

একুশের স্মরণে

শহীদের রক্তে-রচা হে আজাদী আমার
গোলামী রাত্রির শেষে সূর্য-রাঙা ভার
আনিয়াছ তুমি—
তোমার পরশে জাগি মোর জনমের
প্রাণের স্পন্দন-দোলে উঠিছে শিহরি
জীবনের সর্ব ব্যথা-ক্লান্তি পরিহরি
নূতন জগতে।
মহামুক্তি—তীর্থবাহী দীর্ঘ দীপ্ত পথে
বাধার বন্ধন টুটি যাত্রা হলো শুরু,
উদ্বেল আশায় কাঁপা চিত্ত দুরু দুরু
কত স্বপ্নে ভরা।
অন্তহীন সম্ভাবনা-পূর্ণ বসুন্ধরা
নিত্যনব সৃষ্টি-বাহী ঐশ্বর্য-প্রান্তরে
অসীম-দিগন্ত-চারী সপ্ত সিন্ধু-পারে
দিতেছে ইশারা
সুপ্তি-টুটা চিত্ত মোর আজ দিছে সাড়া
শান্তিময় নব বিশ্ব সৃজনের লাগি
ক্লান্তিহীন কর্ম-যোগে রহিবে সে জাগি—
দিবস শর্বরী
সারা-বিশ্ব-মানবতা কল্যাণেরে স্মরি
সর্ব বাধা-বন্ধনেরে নির্ভয়ে লঙ্ঘিয়া
আত্ম-স্বার্থ-বিসর্জিত সমর্পিত-হিয়া
সাধকের মতো
নিত্য-নব সৃষ্টি-পথে সক্রিয় সতত
রহিবে সে অনলস আনন্দিত চিত
স্বগৃহে স্বদেশে আর বিশ্বচারিভিতে

www.pathagar.com

নব প্রাণ-শিখা
উঠুক বিভাসি আজ—আজ হোক লিখা
মুক্তির বন্দনা নব-তব রক্ত-রাগে
হে শহীদ ! তব সৃষ্ট নব বিশ্ব-বাগে।

রক্ত-মশাল

নাশলো যারা রাত্রিকালো আলোর রক্ত-মশাল জ্বালি
হাসলো যারা বিজয় হাসি আপন বুকের রক্ত ঢালি,
দনুজ-দমন বীর তাহারাই অনুজ সম নিত্য হেরে
অত্যাচারী শক্তিরে নয়—শক্তিহারা দুর্বলেরে।
পাথরগড়া পাহাড় সম বক্ষে তারা বজ্র রোখে
সেই পাষাণের ঝর্ণা বয়ে মুক্তিনামে মর্ত্যলোকে।
চরণ তলে মরণ দলি মরণ জয়ের মন্ত্রমহা
সর্বনাশের কেন্দ্রে বসি ধৈর্য্য অটল সর্বহারা
তারাই দানে বিশ্বজনে শিষ্য গড়ি সর্বদেশে ;
নিষ্ঠা নত যেথায় যত তারাও তখন পার্শ্বে এসে
মুক্তি মাগে ঝঞ্ঝা বেগে এগিয়ে চলে সমুখ পানে
মর্ত্য জোড়া আকাশ বাতাস মুখর করি বিজয় গানে।
গন্দু-ভীরু লঙ্ঘে তখন তুঙ্গগিরি শৃঙ্গ-চূড়া
গতির দাপে পৃথ্বি কাঁপে হয় বাধারা চূর্ণ গুড়া।
আবার সুনীল গগন কোলে
সত্য ন্যায়ের মুক্তি-কেতন উচ্চ শিরে নিত্য দোলে।

মাধবী-গুঞ্জন

আরক্ত বসন্তে-আজ বক্ষে মোর উদ্বেলিত রক্ত-ফল্গু নাচে,
তুহিন-তুষার গলি জাগিতেছে ঘুম-ভাঙা তরঙ্গ-শিশুরা—
সদ্য-জাগা জোয়ারেরা স্তব্ধ-বেগ শ্রান্তি তুলি নৃত্য-গতি যাচে,
আবর্তে-আবর্তে করি যত বাধা-বন্ধনের চূর্ণ-গুড়া-গুড়া।

দক্ষিণের সিন্ধু-বুকে শিহরি-শিহরি কাঁপে মলয়া দক্ষিণা,
বাড়ব-বহ্নির মেলা জ্বালিতেছে শিখা তার পুনঃ সঙ্গোপনে—
জীবন-উল্লাসে-কাঁপা ঝঞ্ঝার গুঞ্জনে-বাঁধ নব-রুদ্র-বীণা।
সৃষ্টির আবেগ-সুখে রচিতেছে শত স্বপ্ন সারা বিশ্ব-মনে

আনন্দ-স্পন্দন-জাগা নন্দনবন্দনা-গাঁথা আবেশ উল্লোলা,
নিঃসীম দিগন্ত-টুটা মুক্তির হিন্দোলা-কোলে চির ছন্দ-গতি—
মর্ত্যের মাটির বুকে আবেগ-উচ্ছাস-রায় জাগায়েছে দোলা,

www.pathagar.com

যাত্রা তার দূরান্তরে—মানে না সে আজ কোনো সীমান্তের যতি।

দুর্বলের যাচঞা-মাখা আর নহে ক্লেদায়ি অশ্রুর অঞ্জলি,
শূরের শৌর্যের সুরে নির্ঘোষিত রুদ্র-বাক দৃপ্ত বজ্র-বাণী—
দুর্বার দুর্জয় গানে চলিয়াছে পন্থা বাহি সর্ব বাধা দলি,
রক্ত-চক্ষু নিষেধেরে বিদ্রূপিত উপেক্ষায় মৃত্যু-শেল হানি।

অবিচার-অত্যাচার, শোষণ-শাসন আর যত হত্যা-লীলা
শ্যামলা পৃথ্বির বুকে বহায়েছে অক্ষমের লক্ষ অশ্রু-ধারা
নিষ্পাপের রক্ত-ঝড়ে ছেয়ে গেছে বারম্বার শান্ত নভ-নীলা,
আতংকিত বিশ্ব-ধরা হয়েছে মূর্ছিত-ভীত স্তব্ধ দিশাহারা।
সে যুগ-যুগান্ত আজ ডুবে যাক চিরতরে বিস্মৃতি-অতলে,
রুধির-পঙ্কের বুকে দীপ্ত-রাগ পঙ্কজেরা উঠুক উদ্ভাসী—
ক্রন্দন-স্পন্দিত ধরা নন্দন-নন্দিত হাসে শত পুষ্পদলে
ললিত লাস্যের ভাষে জাগুক প্রশান্ত সুখে সর্ব শঙ্কা নাশি।

নিপিষ্ট-মানব যত আত্মার উত্তাপে জাগি উদাত্ত সঙ্গীতে,
বিশ্বের সীমান্ত-ঘেরা কানন-কান্তার আর নগরে-প্রান্তরে—
মুক্তির মন্দ্রিত বাণী সঞ্চারি তুলুক সারা তন্দ্রাহত চিতে,
দৃপ্ত মহা-মানবতা রহে যেন নভোন্নত কোটি বর্ষ তরে।

সে মহা লক্ষ্যের পানে শত-লক্ষ বক্ষ-ঢালা রক্তের অক্ষরে,
যেতে হবে নিত্য গাঁথি চির-অগ্র-দুরান্তের আহবান-লিপিকা,
তবেই রহিবে জাগি অতন্দ্রিত জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে—
মুক্তি স্বাক্ষর আঁকা প্রদীপ্ত আলোক-জ্বালা অনির্বাণ শিখা।

ভক্তির ভৃঙ্গার ভাঙি শক্তি-দুর্জয়-দুর্গ নিত্য যারা গড়ে,
অটল আত্মার তেজে দীপ্ত আত্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি রচি—
তাদেরি প্রশস্তি-গাথা গুঞ্জরিয়া উঠে সারা ধরণী-অম্বরে,
কাঞ্চন-মুকুট রাজে তাদেরি গৌরব-ঘেরা শির-শীর্ষ খচি।

আর নহে ক্রন্দনের লবণাক্ত অশ্রু-ক্ষরা বন্দনা গীতিকা,
দুর্দম যৌবন-ঝরা স্বেদ-রক্ত-উত্তাপিত গর্জন-অশনি—
মন্দ্রিত মন্ত্রণা-গানে প্রকম্পিত করি নভ-আসিন্ধু মৃত্তিকা
তুলুক দাবাগ্নি-রোষে বিপ্লবের বিদ্রোহের রুদ্র জয়ধ্বনি।

দুঃশাসন দুঃশীলেরা শোনে না শোনে না কভু মধু মৈত্রী-বাণী,
শান্তি সুশুভ্র নীড়ে এরা নিত্য রচে তপ্ত নরকাগ্নি-জ্বালা—
যখনি গরজে উঠে ধ্বংসের ভয়াল শিঙ্গা প্রলয়-সন্ধানী,
তখনি তাদের আসে চিরতরে নির্মূলিত বিপর্যয়-পালা।

আরক্ত বসন্তে আজ নিধন যজ্ঞের সেই যাত্রা হোক শুরু,
নূতন সৃষ্টির লাগি নিঃশেষে বিলুপ্ত হোক যত আবর্জনা—

www.pathagar.com

খুনির নৃত্যের তালে বাজুক পথের ডঙ্কা বজ্র গুরু গুরু।
অনাগত নূতনেরে জানাক স্বাগত-গীতি ঝঞ্ঝার বন্দনা।

রক্তে যেদিন জাগলো জোয়ার

রক্তে যেদিন জাগলো জোয়ার মুক্তি সেদিন আসলো নাচি
মৃত্যু-মলিন আমার জাতি সেদিন থেকে উঠলো বাঁচি।
কান্না-কাতর অশ্রুজলে
শ্মশ্রু-বধূর চিত্ত গলে
জালেম রাজের মন না টলে মুক্তি সে যে দেয় না যাচি,
তার তরে চাই বিশ্ব-ত্রাশন খালেদ তারেক সব্যসাচী।

বন্ধু গো মোর শান্তিবাদী যুক্ত করের মহান নেতা,
কইছি তোমায় সত্যি করে আজকে দুটো মনের ব্যথা
স্বস্তি-বাদী যতই কহ
চরণ ধূলো যতই লহ
খুঁড়ছ তত মরণ দহ—মরবে ডুবি তুমিই সেথা ;
জালিম জনা-জালিম-সদা—হয় না কভু উদার চেতা।

একটি কথা চিত্ত-মনে নিত্যকালে নে সে মানি
যুক্তকরের যুক্তি নহে—সে হলো ভাই রুদ্র-পাণি।
গুতোর চোটে কয় বাবাজী
অন্য কথায় নয় সে রাজী
অর্ঘ-ভরা ফুলের সাজি—যতই তারে দাও না আনি,
শুনবে না সে—শেষ না যদি করছো তারে বজ্র হানি।

সেই অশনি মন্ত্র জাগে যখন ঝরে রক্ত ঝোরা।
কংস ও তার বংশ যত যেথায় আছে বিশ্ব-জোড়া
শহীদ-বীরের রক্তবানে
ডুববে চির অস্ত-পানে
নামবে তখন মূর্ত পানে মুক্তিধারা পাহাড়-তোড়া
জাগবে আবার সূর্য নূতন আশা আলোর স্বর্ণ-মোড়া।

নূতন দিনে সূর্য হাসে

রক্তে যদি বান ডাকে ভাই, ভাঙে তবেই পাহাড়-চূড়া
শক্তি-হীনের ভক্তি-পূজার হয় না কভু পাষাণ গুঁড়া।

চিত্ত কঠিন বিত্ত-লোভীর নিত্য লাভের লুব্ধ থাবা
যুক্ত করের যুক্তি শুনি বনবে ত্যাগী যায় না ভাবা

www.pathagar.com

অত্যাচারীর হত্যা-নিঠুর রক্ত-পিছল গুপ্ত ছোরা,
আর্তনাদের ব্যর্থ ব্যাকুল কান্না কাতর মানেই থোড়া।
ভিক্ষাবাদে দীক্ষিতেরা শিক্ষা-পথে চলুক যত,
রইবে তারা জীবন-জুড়ি পদ-পদবীর চরণ গত।
মানুষ নামের ফানুষ ঘুড়ী যতই উড়ায় উচ্চ নভে
মান-ত্যাগী হায় প্রাণ মাগে যে, নিত্য সে রয় তুচ্ছ ভবে।
বীর্য-বানের শৌর্যে যারা সিংহ জীবন যাপে,
সেই তাঁদেরি চরণ তলে নিত্য সারা বিশ্ব কাঁপে।

এই সে বাণী কালে কালে—
সূর্য-চাঁদের আলোয় জ্বালি চমকে উদার আকাশ ভালে।
তরুণ বুকের রক্ত-অরুণ তপ্ত কিরণ ছড়ায় যবে—
মুক্তি-পাগল শক্তি-শাবক সেই তখনি সিংহ রবে
শঙ্কা নীরব স্তব্ধ গেহে ডঙ্কামুখর বজ্রহানে,
সুপ্ত-মানুষ অমনি জাগে দীপ্ত প্রাণের দৃপ্ত-গানে।
সেদিন দেশের সর্ব পাশে
অত্যাচারীর আত্মা কাঁপে মৃত্যু-ভয়াল ধ্বংস ত্রাসে।

আমার মায়ের, আমার ভায়ের চরণ-ঘেরা শিকল টুটি,
আমার দেশে আমার কেশে মুক্তি-জোয়ার পড়ছে লুটি।
আজকে জাতির চিত্তাকাশে—
বন্ধ কারার দ্বন্দ্ব-হারা নূতন দিনের সূর্য হাসে।

আগুন-জ্বালা ফাগুন দিনে

আগুন-জ্বালা ফাগুন দিনে শোণিত-ঢালা পলাশ-বনে
আমার মনের বীণার বাণী দখিন হাওয়ার দোলন সনে
গানে-গানে বেড়ায় নাচি বাউল-উতল ডালে-ডালে
কূজন-মুখর কোয়েল-শ্যামার পাখার-রচা পালে-পালে
শ্যামল মাঠের আলে-আলে,
নটরাজের তালে-তালে!
সেই পুলকের আলোয় রচা নূতন জীবন-স্বপন যত,
চাইলো সেদিন লোভের রাহু করবে তাহাও কবলগত!
অনেক আগে তাহার ভোগে গেছেই চলে আমার মাটি!
আমার বিষয়-আশয় যত আমার নিবাস-আবাস বাটি।
আমার ক্ষেতের ধানের আটি—
হয় সে তারো মালিক খাঁটি
হায় তবু তার লোভের ক্ষুধা থামলো না শেষ অন্ত টানি।

www.pathagar.com

কান্না-হাসির পান্নাঝরা মায়ের মুখের পূর্ণ বাণী
চাইলো তাহাও স্তব্ধ করি কাড়বে আমার মনের কথা !
আমার জ্ঞানের আমার ধ্যানের ছন্দেগাথা কল্প-লতা।
আশার ভাষার অনন্যতা,
করবে সবি মৃত্যুহতা।
অস্তাচলে অস্ত-গতা।

অন্ন-হারা দৈন্য-দুখে ছিলাম তবু আধেক বাঁচি।
যুক্তি-ন্যায়ের মুক্তি আশে—ঐক্য-প্রীতির সখ্য যাচি,
হায় রে আমার মিথ্যা আশা—সেদিন দেখি ব্যর্থ ফাঁকি,
ধর্ম-দ্বীনের বোলচালে সে রাখছে আপন স্বরূপ ঢাকা—
বক্ষে আমার চরণ রাখি।
নেয় সে হৃদয়শোনিত ছাঁকি।
সইলো না আর অত্যাচারের সেই শাসন আর শোষণ-খেলা
ভাসলো ব্যথার সিন্ধু-বুকে মুক্তি-নিদান রক্ত-ভেলা।
লক্ষ বুকের তপ্ত-তাজা নৃত্য-পাগল শোণিত বানে,
লুপ্ত হলো হন্তা যত রুদ্র-ভয়াল মরণ টানে—
মহাকালের ধ্বংস-যানে—
অপমান আর অসম্মানে।

বাংলা দেশের অঙ্গনে ফের উঠলো ফাগুন আগুন হাসি
কুণ্ঠা-হারা কণ্ঠে তাহার বাজলো আবার মুক্তি-বাঁশী।
ঘাটের মাঠে বাটের ঘাটে জাগলো জীবন নূতন প্রাতে,
আশার স্বপন করলো বপন দখিন পবন উদার হাতে।
যাত্রা-পথের বন্দনাতে
তাইতো দেশের চিত্ত মাতে।

মুক্তির দিনে

রক্তে আকুল বান ডেকেছে আজকে উদয় ঊষার বুকে
নূতন জাগা আলোর শিশু সেথায় স্রোতে সাঁতার কাটে—
শ্যামল তরুর কোমল শাখে বিহগ জাগে কূজন সুখে
লোহিত কায়া ছায়ার মায়া বেড়ায় পূবের আকাশ পাটে।

আঁধার রাতের বাধার সাথে জীবন যারা কাটায় যুঝি,
জ্যোতির শিখা বিজয়-টিকা আকাশ ভাষে আকার আশে,
মরীচিকার ধাঁধায় তারা হারায় হেলায় আসল পুঁজি
শোনিত জ্বালা প্রদীপ যদি না রয় জাগি পথের পাশে।

আপনহারা হৃদয়ঝরা তরল তাজা রুধির শুধু

www.pathagar.com

স্বপন জ্বালা জীবন আনে মরণভরা ধরার বুকে
তারই সরস ছোঁয়ায় জাগে ঊষর মরু ধূসর ধূ-ধূ ;
ফসল ফলের দোলায় দুলি হাজার ফুলের সোহাগ সুখে।

হৃদয় যেথায় সদাই নত ভীরুর অবোধ শান্তি বাঁধে,
রুদ্র বলের শুভ্রে ভরা নিঃস্ব শোষা বিশ্বলোকে
সেথায় কাঁপে আশার বায়ু রিক্ত দুখির আর্তনাদে,
সেথায় ঝরে নয়নধারা আকুল করা বেদন শোকে।

আঁধার আলোয় পুণ্য পাপে ব্যাপ্ত ভবে শান্তি নীতি,
কপোল বামে চপোট খেয়ে ডানের কপোল ধরবে তুলি
স্বর্গলোকের খোঁজ রাখি না মাটির পড়া বিশ্বক্ষিতি
এই যে মহান সহন বাণী—নিত্য নিতি যায় যে ভুলি,

অধীর স্রোতা রুধির গড়া নিখিল জোড়া মানুষ যত—
হাজার ভুলের পাথার বাহি ধরায় যারা জমায় পাড়ি—
সেথায় ক্ষমার তীর্থপথে নিত্য রহি অব্যাহত
ক্বচিৎ কেহ হয়তো চলে—সবাই চলে সে পথ ছাড়ি।
স্বর্গ-নরক সড়ক গড়া ভোগের ত্যাগের মর্ত্যবুকে,
অসুর সুরের দ্বন্দ্ব খেলা জোয়ার-ভাটায় নিত্য চলে—
আলোর চেয়ে অন্ধকারে যায় যে চলা ভুলের সুখে,
ঊর্ধ্বে ওঠায় শ্রান্তি আছে—সহজ যাওয়া পাতাল তলে।

সেই পাতালের অতল পথে লোভের লাভের অধীর ডাকে—
ধূর্ত যত স্বার্থবাদী লক্ষ জনের বক্ষ শোষি
বিত্ত ধনের দুর্গ গড়ি নিত্য সুখের স্বপ্ন আঁকে,
আত্মারে তার হত্যা করি মিথ্যা আশায় আত্ম তোষি।

সিক্ত শীতের অন্তে আজি তপ্ত ফাগুন চৈত্র হাসে
তুষার ঘেরা ঊষর ধরার সজল শ্যামল বন্যা জাগে
জীবন-তীরে বুকের নীড়ে নতুন আশার জোয়ার আসে
মিথ্যাবারের রাত্রি এখন লুপ্ত হবে ঊষার রাগে।

মহামুক্তির সত্যের বাণী

জিন্দেগী বন্দরে—
নোঙ্গর-হারা কিস্তি অনেক তীরে তীরে ভীড় করে।
সিন্ধু দরিয়া ঝঞ্ঝা-তুফানে উত্তাল ঢেউ তুলি,
জীবন-মৃত্যু সৃজন-ধ্বংসে করে হেথা কুলাকুলি।
সৃষ্টির দিন হতে—

www.pathagar.com

হয়তো জাহান চলছে এমনি মহাকাল পথে পথে।

কর্মমুখর দিবসের শেষে সুপ্তির ছায়াতলে
সারাটা বিশ্ব রহে অচেতন দিশাহারা দলে দলে।
এ নহে মৃত্যু—এ নহে বিলয়—এ যে নব জাগরণী।
প্রভাত পাখীর কূজনের জয়গীতি উঠে রণি।
সৃষ্টির চিরনীতি—
কর্ম আর বিশ্রাম দোহে গাহে একই মহাগীতি।

ধরণীর কত জাতি ও ধর্ম আসি এ ধরণী বুকে
যুগ-শতাব্দী মহাগৌরবে বিরাজে বিজয় সুখে।
তারপরে তারা হারায়ে চেতনা পড়েছে আলসে ঢলি—
নবতর দেশ গিয়াছে তাদেরে হেলায় চরণে দলি।
এ নহে বিলয় কভু—
আবার তাহারা উঠিছে জাগিয়া, হয়েছে বিশ্ব-প্রভু।

দুনিয়ার সেরা আখেরী নবীর মোজাহিদ যোদ্ধারা,
সত্যের লাগি' সাম্যের লাগি' ঢালি' নিজ লহুধারা
বিশ্বের বুকে করিল কায়েম খেলাফতে রব্বানী ;
হাজার বছর নাহি হতে পারে ভুলিল সে মহাবাণী।
আজ পুনঃ দেখো চাহি—
বহু জাতি দেশ তারি জয়গীতি উঠিয়াছে পুনঃ গাহি।

সত্যের শিখা মুক্তির শিখা নাহি নিভে চিরতরে ;
সূর্যের সম রাত্রির শেষে জাগে সে যে ধরা পরে।
আজাদীরো পদ্ধতি—
ক্লান্তির পরে ঘুমায়ে দুনিয়া পুনঃ পায় নবগতি !
মহা-মুক্তির সত্যের বাণী বারেবারে আসে ফিরে—
মহাবিশ্বের তীরে।

মুক্তি-বিহঙ্গম

পিঞ্জর-বিমুক্ত পাখী মেলিয়াছে নভাঙ্গনে পাখা,
সে নভ দিগন্ত-হীন-নাহি-বাধা-বন্ধন-সীমানা—
সেথায় স্বপ্নালু হিয়া—মুক্ত-পক্ষ যাত্রী সে বলাকা
মেলেছে পাখার পাল উপেক্ষিয়া শত লক্ষ মানা।

সম্ভাবনা-সমুজ্জ্বলা অনাগত অনন্ত অজানা
সম্মুখে বিস্তৃত সেথা—পূর্ণ হতে নব পূর্ণতার
আকাঙ্খা-অঙ্কুর শত সেথা আজ ঝাপটিছে ডানা—

www.pathagar.com

ইথার–তরঙ্গে বুঝি বাজে তারি স্পন্দন–ঝংকার।

সেখানে শৃঙ্খল–ঘেরা অন্ধকার বন্ধ কারাগার
তাহার গতির পথে নাহি রচে দুর্লঙ্ঘ পর্বত—
সেখানে কল্পনা–নভে অবারিত দিগন্তের দ্বার
রচিছে অর্গল–হীন সীমা–হারা দূরান্তের পথ।

সে সুদূরে যাত্রা শুরু—যাত্রী–পাখী নিয়াছে শপথ—
বজ্র–ঝড় আসে যত—আসিবে না পক্ষ বিধুনন—
ঝঞ্ঝার ঝাপটে কভু হয়তো ঝরিবে বক্ষক্ষত,
চলা তবু থামিবে না—এই দৃঢ় জীবনের পণ।

আজ হেথা পৃথ্বি–পথে শান্তিহীন লক্ষ অগণন
অক্ষমের ভীড় চলে—জানে না কো কোথা শান্তি–নীড়—
উদ্ধত শক্তির ভয়ে সন্ত্রাসিত বিশ্ব অনুক্ষণ
অশ্রুর সিন্ধুর বুকে খুঁজিতেছে সান্ত্বনার তীর।

বল আর বিত্ত–গড়া অগণিত দাসত্ব–জিঞ্জির
রেখেছে ধরারে বাঁধি সর্পসম নিষ্ঠুর বাঁধনে
মুক্তির বিহঙ্গ আজ তোলে তার কণ্ঠ সুনিবিড়
সর্বভয়–ভীতি হতে নিখিলের বিমুক্তি সাধনে।

কালিয়া আখিঁর ধারা

কালিয়া আকাশ বাইয়া ঝরে কালা পানি,
কালিয়া আখিঁর ধারা খোঁজে কারে জানি গো
খোঁজে কারে জানি।

কালিয়া কেশের বোঝা বাতাসেতে উড়ে,
সে কালা কেশের বায়ে কদম্বেরা ঝুলে—
আহা কমল–কেয়া ঝুরে,
আমার মনের মায়া–পুরে
আহা বনের কায়া জুড়ে।

কালা সে ভোমরা ডাকে ফুলের কুঁড়ি ফুটে,
কালিমা কোকিলা ডাকে ফাগুন আইয়া জুটে,
কালিয়া মেঘের ডাকে মাছের হিয়া লুটে রে ভাই
নদীর হিয়া টুটে।

www.pathagar.com

আর আমার ময়ূর-মনা পেখম মেইল্যা উঠে রে
পখম মেইল্যা উঠে।

কালিয়া রাতের কোলে বাঁশের বংশী বাজে,
রসের যমুনা নাচে আমার হিয়ার মাঝে রে
আমার মনের মাঝে।

কালা সে আন্ধারী নামে সাঁঝের আঙ্খি-তলে,
সে আন্খি উজালা করি চান্দের বাতি জ্বলে রে
তারার বাত্তি জ্বলে।

আমাবস্যা আইস্যা সারা দুন্যাই করে কালা,
তারই বুকে লুইট্যা উঠে হেলালী উজালা—
ও ভাই নয়া চান্দের মালা।
সে-মালা পরিয়া চকোর পঙ্খী সে উতালা।

ত্যাগের ঈদ

বরষ-ভরা ভোগের শেষে
এলো ত্যাগের ঈদ ;
জীবন দিয়ে জীবন লাভের
জাগলো রে উম্মিদ।
জন্ম মৃত্যু নিত্য খেলা
বিশ্ব জগতের,
জন্ম হলো যাত্রা শুরু,
মৃত্যু তারি জের
সত্য লাগি জীবন দেয়া
মৃত্যু সে তো নয় ;
ভয়ের দেশে ভয়-বিনাশী
সেই তো বরাভয়।
মৃত্যুজয়ী সেইতো জীবন
অমর মহত্বের।
হিম্মতি সব উম্মতেরা
কোথায় নবীজীর
আল্লাহ্ ছাড়া সবার কাছে
উচ্চ যাহার শির ;

www.pathagar.com

চক্ষে যাহার বহ্নি জ্বলে
অত্যাচারী লাগি
দুঃখী তরে ঝরছে যাহার
অশ্রু অনুরাগী
সেই তো খাঁটি সাচ্চা সোনা
সেই তো সাচ্চা বীর।
মৌ-লোভীদের দৌলতে কি
লৌহ হলো দীল
সেখানে নেই দয়া-মায়ার
একটি কণা তিল ;
সেথায় শুধু লোভের কৃমি
করছে কিলিবিল—
আহা করছে কিলিবিল।

মওলা-রাহী মৌলভীরা
আয় রে তোরা ভাই,
নিজের তাজা খুন লহুতে
জ্বালবে যে রোশনাই
ব্যথার আঁধার মুছবে যে-জন
ভাঙবে দুখের নিঁদ।
আজকে বুঝি তাদের তরে
আসলো রে উম্মিদ
রাতের শেষে সূর্য সম
আনন্দ তৌহিদ।
এলো ত্যাগের ঈদ।

আলোর ইশারা

নূতন ঊষার আলোর ইশারা আমারে দিয়াছে ডাক—
মরা অতীতেরা চেয়ে আছে শুধু বিস্ময়ে নির্বাক।
প্রতি নিমেষের জীবনের সাথে বিজড়িত ক্ষণগুলি
ফেলে-আসা পথে আঁকে পথ-চিন তুলি শত অঙ্গুলি।
সেদিনের পথ-ধূলি—
আমারে ডাকিয়া বারে বারে বুঝি কাঁদিতেছে ফুলি ফুলি।

www.pathagar.com

আজ মনে জাগে,—এই যে দীঘল পথে-পথে শুধু চলা।
বিরাম-বিহীন স্রোত-ধারা সম অকারণে কথা বলা—
ক্ষণিক লাভের লোলুপ লালসে লুফে নেয়া মিছে ছলা,
আজ কোথা সেই আলেয়ার আলো—মেঘে-ঢাকা নভ-তলা।
হায় আশা চঞ্চলা—
ঊষার সবিতা গোধূলি-শয়ান—নিভে গেছে জ্যোতি-ফলা।

হাজারো বাধার পাথারে-পাথারে ঢেউ-এ ঢেউ-এ দুলি' দুলি'
ফেলি আঁখি-জল ভুলে ফসল হেন কত নিছি তুলি।
তবু সুদূরের দিশারীরে মোরা যাই নাই কভু ভুলি।
গতায়ু সে দিনগুলি
আমার মনের বনে এলো ফিরে হয়ে গীতি বুলবুলি,
নূতন ঊষার আশার আলোরা এলো যেন দ্বার খুলি।

জীবনের খেলা এমনি সে বুঝি—জয়-ক্ষয়, ওঠা-নামা—
কভু ঝড়ো বেগে সমুখেতে চলা—অকারণে কভু থামা,
কভু হিয়া-বনে বায়সেরা ডাকে-কভু ডাকে পিক-শ্যামা।
জীবনের ওঠা-নামা,
আজ যার দাম খাঁটি সোনাদানা—কাল দাম ঝুটা তামা।

আলোয়-উজালা দিবসের শেষে রজনীর আসে পালা
এরা সবিতারে আবরে তখন কাফনের কালো ডালা ;
শিশিরের ছলে তাই বুঝি ঝুরে বেদনার মণি-মালা।
তবু ভুলি এতো জ্বালা,
আবার নূতন আলো-শিশু কোলে হাসে পুনঃ ঊষা-বালা।

আমারো জীবনে জীবন-চাকার শেষ গতি এলো বুঝি,
প্রভাতের রবি যাত্রা-সারথি তাই মোরে ফেরে খুঁজি।
জীবন-সূর্যমুখীরা যখন আসিতেছে ধীরে বুঁজি—
তখনি কি শেষ পুঁজি
যেতে হবে লয়ে উদয়ের পথে আঁধারের সাথে যুঝি?
প্রভাতের রবি যাত্রা-সারথী তাই মোরে ফেরে খুঁজি।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

এই পুস্তক যাহাদের জন্য সংকলিত, তাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাদের অনেকেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি উচ্চতর শিক্ষায়তনে প্রবেশার্থী। সেখানে সাধারণ ভাষা-জ্ঞান ও সাহিত্য-জ্ঞান, বিশেষ করিয়া নিজ মাতৃভাষা ও সেই মাতৃভাষায়-রচিত সাহিত্যে মোটামুটি জ্ঞানার্জনের পরবর্তী অধ্যায় হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিশ্লেষণমূলক, তুলনামূলক ও গবেষণামূলক শিক্ষা দানই এ অধ্যায়ের প্রধান লক্ষ্যিভূত বিষয়। সেখানেই ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারা এবং তাহাদের গীত ও প্রকৃতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ব্যাপক আলোচনা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সেই স্তরে প্রবেশের পূর্বেই এ বিষয়ে—বিশেষতঃ মাতৃভাষা ও মাতৃভাষায়-রচিত সাহিত্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তদোপরি এই সাহিত্য-সংকলনটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াই সংকলিত হইয়াছে। এবং ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট পূর্ববর্তী সাহিত্য-সংকলনগুলিতেও এই একই ধারা অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। এই সকল নানা কারণে বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি ও ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া বোধহয় অসমীচীন হইবে না।

বঙ্গ জাতি হইতে দেশবাচক বঙ্গ নামের উৎপত্তি। বঙ্গ জাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, তিনটি জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং এই তিন জাতি হইতেছে বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ এবং ইহারা পক্ষী অর্থাৎ পক্ষী-সদৃশ যাযাবর।

পূর্বদিকে হটিতে হটিতে এই যাযাবর বঙ্গ জাতি এখন যে-স্থানকে পূর্ববঙ্গ বলা হয় তথায় বাস করিতে থাকে। তাহা হইতেই পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় বঙ্গ।

'রাঢ় ও সুহ্ম জাতির নাম হইতে পশ্চিমবঙ্গের নাম হয় রাঢ় ও সুহ্ম। উত্তর বঙ্গকে বলা হইত বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র-ভূমি। ইহার সুপ্রাচীন নাম পুন্ড্র বা পুন্ড্র বর্ধন। "গৌড়" শব্দ সাধারণতঃ বরেন্দ্র-ভূমিকে নির্দেশ করিলেও অনেক সময় রাঢ় ও সুহ্ম ভূমির সহিত বরেন্দ্র-ভূমিকে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ বাদ দিয়া সমস্ত বাংলাদেশকে বুঝাইত।

সারা বাংলাদেশকে বুঝাইতে ফার্সীতে "বাঙ্গালহ্" বা "বাঙ্গালাহ্" শব্দ চলিত হয় মুসলমান শাসনকালে। ইহা হইতেই বাঙ্গালা বা বাংলা ও ইংরাজী Bengal শব্দের উৎপত্তি।

'বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম জাতি আর্যেতর অর্থাৎ অনার্য ছিল বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ ইহারা যে আর্য ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। এই সময় বাংলাদেশের যাহারা আসল অধিবাসী ছিল তাহারা দ্রাবির অথবা অস্ট্রিক গোষ্ঠির ভাষা বলিত।

www.pathagar.com

'গুপ্ত-শাসনকালে বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আর্য-ভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়। খৃষ্টীয় শতকের মধ্যে বিস্তর অনার্যভাষী, হয় আর্যভাষী হইয়া গেল, নয় ক্রমাগত কোণ-ঠাসা হইয়া পার্বত্য অরণ্য ও জনবিরল স্থানে আত্মগোপন করিল। সপ্তম শতকের প্রারম্ভে চীনীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্-ৎ-সাঙ বাংলাদেশ পরিভ্রমণের সময় গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা শুনিয়াছিলেন।

আর্য ভাষীরা যখন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে উপনিবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের কথ্য-ভাষা সংস্কৃত-রূপ ছাড়িয়া প্রাকৃত-রূপ ধারণ করিয়াছে। তদানীন্তন আববির্তের বা আর্যদেশের পূর্বাঞ্চলে যে-প্রাকৃত ভাষা বলা হইত, তাহার নাম ছিল পূর্বী প্রাকৃত। বাংলাদেশে যে-আর্য ভাষা প্রবর্তিত হইল তাহা এই পূর্ব প্রাকৃতেরই প্রকার ভেদ। কথ্য-ভাষা প্রাকৃত হইলেও বাংলার এই আর্যদের, তথা সেই সময়ের সারা বাংলাদেশের, পোষাকী ভাষা অর্থাৎ সাহিত্য ও রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতই রহিয়া গেল।

বাংলাদেশে প্রবর্তিত পূর্বী প্রাকৃত ক্রমশঃ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া বিবর্তন বশে বাংলা ভাষায় পরিণত হয় আনুমাণিক খৃষ্টীয় দশম শতকে। নবম-দশম শতাব্দীই যে বাংলা ভাষার আনুমাণিক উদ্ভব-কাল—অধিকাংশ পণ্ডিতের ইহাই অভিমত।

বাংলা ভাষাও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন স্বরূপ যে-পুস্তকটি পাওয়া গিয়াছে তাহারও রচনা-কাল প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই পুস্তকটি হইল চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। ইহাকে সাধারণতঃ "চর্য্যাপদ" বলা হয়। "চর্য্যাপদগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক রচিত গীতিময় কবিতা। এইগুলিতে পয়ার, ত্রিপদী, মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতি বাংলা ছন্দের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে "সনেট" বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ও প্রবর্তন করেন—ইহাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন স্থান দুইটি পদে দেখা যায়। এ পর্যন্ত ৫১টি "চর্য্যা" আবিষ্কৃত হইয়াছে। পট-মঞ্জুরী, কামোদ, ...বড়ারী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীর সাহায্যে এই চর্য্যা-গীতি বা বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলি গীত হইত। ....ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, শবরপাদ প্রমুখ চব্বিশজন সিদ্ধাচার্য কর্তৃক এই "চর্য্যাপদ"গুলি রচিত। সেই আমলে বৈষ্ণব-পদাবলীর মত বিভিন্ন পদকর্তা-রচিত "চর্য্যাপদ" জাতীয় বিরাট বৌদ্ধ-গীতি-সাহিত্য ...ছিল। "চর্য্যাপদে"র ৫১টি "চর্য্যা" ব্যতীত অন্যগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এগুলি বাংলা কীর্তন গানের প্রাচীনতম-রূপ।

এই চর্য্যাপদগুলি আদি বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও সে সময় ইহাকে বাংলা ভাষা বলা হইত না। বাংলা ভাষার তখনও "বাংলা-ভাষা" বলিয়া নামকরণ হয় নাই। "সন্ধ্যা-ভাষা" নামে তখন ইহা পরিচিত। "চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে"র আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে "সন্ধ্যা ভাষা মানে আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার ; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" "চর্য্যাপদ"-গুলির সম্পাদক অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের মতে "সন্ধ্যা ভাষার অর্থ, বিশেষ চিন্তা করিয়া যে আমার প্রচ্ছন্ন অর্থ স্থির করিতে হয়।" কাজেই দেখা যাইতেছে, উপনিবেশিত আর্যগণের পূর্বী প্রাকৃত ও আদি অধিবাসীদের দ্রাবিড় জাতীয় ভাষার সংমিশ্রণে যে-নব বঙ্গ ভাষার সৃষ্টি হইল—চর্য্যাপদগুলির রচনা কালে যে ভাষা "বঙ্গ-ভাষা" বা "বাংলা-ভাষা" নাম গ্রহণ করে নাই এবং বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক মতবাদ পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার মত উন্নত ভাষা-ভঙ্গীও

www.pathagar.com

অর্জন করে নাই। গঠনুন্মুখ ভাষার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক এবং এই জন্যই বোধহয় এই নব-গঠিত অর্ধপরিস্ফুট ভাষাকে তখন "সন্ধ্যা-ভাষা" বলিয়া অভিহিত করা হইত।

যাহা হউক, "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে" আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ-রচিত একটি পদ-ই সর্বপ্রথমে সন্নিবেশিত। তদানীন্তন সন্ধ্যা ভাষা বা আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন স্বরূপ উক্ত চর্য্যা-পদটি ভাবানুবাদ-সহ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিত্র পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনু পাখ ভিতি লেহুরে পাস॥
ভনই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

ভাবানুবাদ

"কায়ারূপ তরুবর, পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল॥
দৃঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুই ভণে গুরুকে পুছিয়া ইহা জান॥
সকল সমাধি দ্বারা কিবা করা যায়।
সুখ দুখে নিশ্চিত মরিবেই হায়॥
ছন্দের বন্ধন এড় করণের (পারিপাট্য) আশ।
শূন্যতা পক্ষের দিকে লহ তুমি পাশ॥
লুই বলে ইহা আমি ধ্যানে দেখিয়াছি।
ধমণ চমণ দুই পীড়িতে বসেছি॥"

উপরোক্ত চর্য্যাপদগুলি অর্থাৎ বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলি রচনার কালে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পাল-রাজাগণ বাংলাদেশ শাসন করিতেন। তাহাদের সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় গান ও দোহা (উপদেশ বাক্য) জনসাধারণের কথ্য-ভাষা বাংলাতেই প্রচারিত হয় এবং তাহার ফলে একটি লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। একাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ হইতে আগত গোঁড়া হিন্দু আচারনিষ্ঠ সেন রাজবংশ বাংলাদেশ অধিকার করিয়া বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাত ও হিন্দু ধর্মের প্রচলন করেন। এই বংশের বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খৃ: অ:) কান্য-কুব্জ হইতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে আনিয়া হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন এবং সাহিত্য ও রাষ্ট্রভাষায় সংস্কৃত আমদানী করিয়া সেখানেও ভাষাগত কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় আদেশ দ্বারা বাংলা ভাষার চর্চা রহিত করিয়া

www.pathagar.com

দেওয়া হইল। শুধু তাহাই নহে। রাজাদেশ অনুসরণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রবেত্তাগণও দেব-ভাষা সংস্কৃত ব্যতীত মানব-ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কেহ শাস্ত্রালোচনা করিলে ও তাহা শ্রবণ করিলে তাহার জন্য রৌরব নামক নরকের ব্যবস্থা দান করিলেন : —

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানব: শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

অতএব দেখা যাইতেছে—বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসারলাভ ঘটিয়াছে বৌদ্ধ আমলে--বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী বৌদ্ধ পাল-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রাচীনকালে ভারতীয় সাহিত্য এবং তদানীন্তন পৃথিবীর সকল সাহিত্যই প্রধানতঃ রাজ-সভার পোষকতায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিত। বাংলায় বৌদ্ধ-শাসনকালেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ পরবর্তী হিন্দু সেন-রাজাদের আমলে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটিল ঠিক বিপরীত ব্যবহার। তাহার পর সেন-রাজাদের বিলোপ সাধন করিয়া বাংলায় যখন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল তখন রাজ দরবারের পোষকতায় বাংলা সাহিত্যের পুনর্জন্ম ঘটিল ও সুদিন ফিরিয়া আসিল। ইহার পর ইংরাজ আমলে ইংরাজ সরকারের সহায়তায় এবং খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারক ক্যারী মার্সম্যান ও ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারক রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য নব রূপায়ণ লাভ করিয়া রচনা-শৈলীর বিভিন্ন ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া আজ বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই পতনোত্থানের ইতিহাসের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয়-বিষয় হইল এই যে, প্রচার-ধর্মী বৌদ্ধ, ইসলাম, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম ধর্মের ধর্ম-প্রচারের তাগিদ প্রধানতঃ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রেরণা যোগাইয়াছে। তদোপরি বৌদ্ধ ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রাধিপতিগণও তাঁহাদের শাসনাধীন জনসাধারণের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত ঐতিহ্য ও বিধি-বিধানের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহাদিগকে স্বদলে, স্বমতে ও স্বধর্মে আনা এবং তাহাদের সুশাসন ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া তদ্দ্বারা আপন-আপন রাষ্ট্রক্ষমতার স্থায়িত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছেন। অপরপক্ষে তদানীন্তন প্রচার বিরোধী সনাতন হিন্দুধর্ম এবং সনাতনী হিন্দু রাজন্যবর্গ স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।

এরূপ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ভিতর বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারাকে আমরা মোটামুটিভাবে চারিটি যুগে বিভক্ত করিতে পারি— (১) বৌদ্ধ যুগ ; (২) মুসলিম যুগ ; (৩) হিন্দু রেনেসাঁ যুগ ও (৪) মুসলিম রেনেসাঁ যুগ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বৌদ্ধ যুগ বলিতে "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে"র রচনা কালকেই অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতাব্দীকেই বুঝানো হইয়াছে। এই সময়ে বাংলাদেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পাল-রাজাগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের অব্যবহিত পরেই অবাঙ্গালী ও সনাতনপন্থী সেন-রাজাগণ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অপাতের করিয়া তাহার বিনাশ-সাধনে সপ্রযত্ন হন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন প্রকার নব সৃষ্টি বা অগ্রগতির কথা কল্পনা করাও অবান্তর।

www.pathagar.com

সেনরাজাদের পরেই ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন ভাষী ও ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতিবাহী মুসলমানেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২০২ সালে) বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের স্বকীয় ভাষা ফার্সীকেই রাজ ভাষায় পরিণত করিলেন। এই নবাগতদের পক্ষে এদেশের বিভিন্ন অংশ জয় করিয়া ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ ও এদেশকেই স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রায় দুই শতাব্দী কাটিয়া গেল। প্রতি রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর ইহাই স্বাভাবিক। বাংলার এই মুসলমান শাসকেরা যখন বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ দান করিলেন তখন খৃষ্টীয় চুতর্দশ শতাব্দীর শেষ পদে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজেই দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পদে পর্যন্ত এই তিন শতাধিক বৎসরকালকে বাংলা সাহিত্যের "অন্ধকার যুগ" বলা যাইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই যুগে রচিত কোন বাংলা পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাহার পরেই আসিল বাংলা সাহিত্যের "মুসলিম যুগ"। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যাংশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কালকে (১৩৫০-১৭৫৭ খৃ: অ:) "মুসলিম যুগ" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। হিন্দু সেন-রাজাগণ কর্তৃক নিগৃহীত ও পর্যুদস্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার স্বাধীন ইলিয়াস্ শাহী পাঠান সুলতানদের পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় আবার নব-জন্ম লাভ করিল। রাজ দরবারের অনুকরণে ক্রমে ভদ্র সমাজেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদর হওয়ায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণও এই ভাষায় অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাংলা অক্ষরে লিখিত আজ পর্যন্ত যতগুলি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব পুরাতন পুঁথি হইল বড়ু চন্ডীদাস বা দ্বিজ চন্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"। অধিকাংশ পন্ডিতের মতে এই পুস্তকটির রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই বড়ু চন্ডীদাস গৌড়ের তদানীন্তন ইলিয়াস শাহী সুলতানের নিকট তাঁহার কাব্য প্রতিভার জন্য যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহের কাহারো মতে সুলতান শামস্-উদ্দীন শাহের কর্মচারী মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নাম দিয়া ভাগবতের দশম ও একাদশ শব্দের বাংলা কাব্যানুবাদ করেন এবং সুলতান তাঁহার কবিত্ব শক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধিতে ভূষিত করেন। এ বিষয়ে কবি নিজেই বলিয়াছেন : —

"গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥"

উক্ত সুলতানের অপর এক কর্মচারী "শুভরাজ খান" গোবর্ধন পাঠককে দিয়া স্মার্ত ও পৌরাণিক কাব্য সংকলন করাইয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুলতান আলা-উদ্দীন মুজাফ্ফর হুসাইন শাহ (১৪৮৩-১৫১৯ খৃ: অ:) গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার শাসনকালকে "মুসলিম যুগে" বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে চৈতন্যদেবের প্রধান সহায়ক ছিলেন রূপ-সনাতন অর্থাৎ রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামক দুই সহোদর ইহারা উভয়েই সুলতান হুসাইন শাহের যথাক্রমে "সাকর মল্লিক" বা চীফ সেক্রেটারী এবং "দবীর খান বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। রূপ গোস্বামী ছিলেন একাধারে ভক্ত, কবি, আলঙ্কারিক, রসবেত্তা দার্শনিক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাতা। সনাতন গোস্বামী ছিলেন বৈষ্ণব সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় "হরিভক্তিবিলাস", "দিকপ্রকাশিকা" এবং "সটীক ভাগবতামৃত" ও "বৈষ্ণবতোষিণী" নামক গ্রন্থনিচয়ে রচয়িতা।।

www.pathagar.com

"মনসা মঙ্গলে"র কবি বিজয় গুপ্ত হুসাইন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিয়াছেন। মহাভারতের অনুবাদকারিগণের মধ্যে প্রাচীনতম কবি কবীন্দ্র (পরমেশ্বর) শ্রীকর নন্দী হুসাইন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের আদেশে মহাভারত বাংলায় কাব্যানুবাদ আরম্ভ করেন এবং এই অনুবাদকালেই হুসাইন শাহ এবং পরাগল খানের মৃত্যু হওয়ায় হুসাইন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ এবং পরাগল খানের পুত্র ছুটীখানের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অনুবাদ কার্য শেষ করেন। "যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রমুখ কবিগণ মুসলমান সুলতানদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিদ্যাপতি নাসির শাহের গুণকীর্তন করিয়াছেন। সুলতান নুসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরুজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ভারতচন্দ্রের বহুপূর্বে "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করেন। আরাকান রাজ থদো-মিন্তার (১৬৪৫-১৬৫২) মুসলমান প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে কবি আলাওল "পদ্মাবতী", "সেকেন্দার নামা", "তোহফা", "সপ্তপয়কর" প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দী, ফার্সী ও আরবী ভাষা হইতে বাংলায় কাব্যানুবাদ করেন।

বাংলা সাহিত্যের "মুসলিম যুগে" রচিত বাংলা সাহিত্য মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—হিন্দু কবি-রচিত সাহিত্য ও মুসলিম কবি রচিত-সাহিত্য। হিন্দু কবি-রচিত সাহিত্য আবার মোটামুটি তিন ধারায় প্রবাহিত—অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। [এ সম্পর্কে এই পুস্তকে "বাংলা সাহিত্য-পরিক্রমা" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য]। "মঙ্গল-কাব্য" নামে অভিহিত কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত— (১) লৌকিক দেবতাদিগকে লইয়া রচিত কাব্য—যথাঃ মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ইত্যাদি ; (২) পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত কাব্য—যথাঃ শিবমঙ্গল, দুর্গামত অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি এবং (৩) বৈষ্ণব-জীবন-চরিত সাহিত্য—যথাঃ চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি শেষোক্ত ভাগটি "মঙ্গল" নামাঙ্কিত হইলেও প্রকৃত মঙ্গল-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। মুসলিম কবি-র সাহিত্য মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত—আরবী-ফার্সী-হিন্দী হইতে অনূদিত কাহিনী-কাব্য ইসলামী ধর্মীয়-কবব্য।

যাহা হউক, মুসলিম যুগের বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সেগুলি কিভাবে অনুধাবনযোগ্য।

প্রথমতঃ বাংলায় মুসলিম শাসনকালে (১৩৫০-১৭৫৭) মুসলিম সুলতানদের ও তাঁহাদের হিন্দু মুসলমান উচ্চ কর্মচারী ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ ও আদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নব-জন্মলাভ হয় এবং নবতর সমৃদ্ধির পথে ইহার অগ্রগতি সূচিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ পাল-রাজাদের ন্যায় বাংলার মুসলিম শাসকগণও উদার মতাবলম্বী ও পরমত ছিলেন বলিয়া মঙ্গল-কাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের মত নিছক হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ও হিন্দু সাহিত্যও এই মুসলিম-যুগে শুধু সৃষ্ট ও প্রচারিতই হয় নাই—চরম পরিপুষ্টি ও উন্নতির পর্যায়ে হয়। অহিন্দু ও অনার্য ভাষা, সাহিত্য ও ভাবধারার বাহক হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দু সেন-রাজাগণ ও তাঁহাদের সমর্থক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যেভাবে নিপিষ্ট ও নির্মূল করিব করিয়া গিয়াছেন, মুসলিম ভাষা ও ভাবধারার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও বাংলার মুসলিম শাসকের ভাষা ও সাহিত্যের তেমন কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করা দূরের কথা—ইহার পুনর্জীবন দান ও সমান করিয়া ইসলামের মূলগত ঔদার্য ও বিশ্ব-মুখীনতার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ এই যুগে হিন্দু গ্রন্থকারগণ রচিত সমস্ত সাহিত্যই একান্তভাবে ধর্ম-কেন্দ্রীক। একমাত্র মুসলমান কবিগণই এই যুগে মানবীয় সুখ-দুঃখ ও প্রেম-প্রীতি লইয়া রচিত কাহিনী-কাব্য বাংলা-সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। কবি মুহম্মদ সগীর এই ধারার প্রাচীনতম কবি এবং কবি আলাওল ইহার শ্রেষ্ঠতম উদগাতা। শুধু রস-সৃষ্টির জন্য রচিত এই কাব্যগুলি পরিপূর্ণভাবে কাব্য-রসোত্তীর্ণ ও অনুপম সাহিত্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত।

চতুর্থতঃ এই যুগে এবং ইহার পূর্ববর্তী যুগে রচিত সমস্ত বাংলা সাহিত্যই পদ্যে রচিত। এই যুগ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে সাহিত্য-পদ-বাচ্য কোনরূপ গদ্য সাহিত্য ছিল না। অনুশাসন, তাম্র-লিপি, দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠি-পত্রাদিতে যে-কার্যকরী ও একান্ত অপরিহার্য গদ্য ব্যবহৃত হইত তাহা কোনক্রমেই সাহিত্য-আসরে পাংতেয় হইবার যোগ্য ছিল না। এই যুগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সী। কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী পাল ও সেন বংশের শাসন কালেও যে বাংলা দেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তদানীন্তন বাংলা-সাহিত্যে গদ্যের অভাব।

পঞ্চমতঃ এই যুগের প্রথম ভাগে মুসলিম সুলতানদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সাহিত্য রচিত হইতে থাকে তাহা প্রধানতঃ অনুবাদ-সাহিত্য এবং এই অনুবাদ-কার্য সাধিত হয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতি-সভ্যতামূলক গ্রন্থাদি হইতে। কাজেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়েস্থ প্রমুখ উচ্চবর্ণের যে-সকল সাহিত্য-সাধক সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন শুধু তাহারাই এই কর্যে ব্রতী হন। কাজেই এই সময়ে অনূদিত গ্রন্থগুলি সংস্কৃত-বহুল পরিমার্জিত বাংলায় রচিত। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই কবি মুহম্মদ সগীর, বাহরাম খান হইতে আরম্ভ করিয়া কাযী দৌলত, আলাওল ও হায়াৎ মামুদ প্রমুখ যে-সকল মুসলমান কবি বাংলা কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন তাঁহারা কাহিনী-কাব্য রচনা করিয়া ভাব ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে মৌলিকতা আনয়ন করিলেন বটে—কিন্তু রচনা-শৈলীর দিক দিয়া তাঁহাদের নব-অর্জিত বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রে তখন তাঁহাদের অনুকরণ ও অনুসরণের যুগ—ভাষার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অর্জন সেই প্রাথমিক যুগে সম্ভবপর নয়। কাজেই তাঁহাদের রচিত কাব্যের ভাষাও পূর্ববর্তী হিন্দু অনুবাদ সাহিত্যিকগণেরই অনুরূপ অর্থাৎ পরিমার্জিত বাংলা। এই সংস্কৃত-বহুল পরিমার্জিত বাংলা রচনা-রীতিতেও ইহারা—বিশেষতঃ আলাওল সমসাময়িক হিন্দু কবিগণের সমকক্ষতা এবং কোন-কোন স্থলে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে এই প্রাথমিক যুগের মুসলমান কবিদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—ভাষা তাঁহাদের পরিমার্জিত বাংলা হইলেও তাঁহারা আরবী অক্ষরে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই পদ্ধতিটি অনেকটা আধুনিক যুগে পাক-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে প্রচলিত রোমান বা ইংরাজী অক্ষরে এদেশের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থার মত। যাহা হউক বাংলায় প্রায় ছয় শত বৎসর ব্যাপী মুসলিম রাজত্ব-কালে রাষ্ট্র-ভাষা ফার্সী থাকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের ভাষা অনেকটা আরবী ফার্সী-বহুল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, যেমন, বিচার সম্পর্কে, আইন-আদালত, ফেসাদ-ফৌজদারী, মামলা-মকদ্দমা, নাজির-পেশ্‌কার, হাকিম-মুন্‌সেফ, উকিল-মোক্তার, হুকুম-রায়, আর্জি-দরখাস্ত, প্রভৃতি শব্দ ; ভূসম্পত্তি ব্যাপারে—য'মীদার-তালুকদার, য'মী-জিরাত ; নায়েব-আম্‌লা, জমা-ওয়াশিল, দলের-বাকী প্রভৃতি শব্দ ;

www.pathagar.com

বাণিজ্য ব্যাপারে—নাফা-লোকসান, মাল-মাত্তা, নগদ-বাকী ; উসুল-তাগাদা, দোকান-মোকাম, তওল-ওজন, কয়াল-মাল্লা, আসল-নকল, হিসাব-নিকাশ ; দালালী-তেজারতি, হাল-বকেয়া, আমানত-জমা, আমদানী-রফতানী, সাল-তারিখ প্রভৃতি এবং ইত্যাকার আরও অজস্র শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে এমন একাঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, এই শব্দ-সম্ভার তখন বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিণত। বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমানদের নিত্য ব্যবহার্য শব্দ—যথা, নামায-রোযা, হজ্জ-জাকাত অযু-গুসল, আল্লাহ-খুদা, নবী-রসুল, পীর-পয়গাম্বর, আরাম-আয়েশ, হক-ইন্‌সাফ, ফুফু-ফুফা, খালা-খালু, ইজ্জত্-হুরমত্, আদব-কায়দা, কলম-কিতাব, জঙ্গ-লড়াই প্রভৃতি অগণ্য শব্দ তখন বাংলা ভাষার সঙ্গে একাঙ্গ।

প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের ভাষা গণমুখী হইতে বাধ্য। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে দেখিতে পাই, তদানীন্তন বাংলার হিন্দু-মুসলমান ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচলিত আরবী-ফার্সী-বহুল ভাষা, বাংলা ভাষার ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক ধারা অনুসারেই, বাংলা-সাহিত্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সংস্কৃত-বহুল বাংলায় রচিত সৈয়দ আলাওলের "সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল" নামক কাব্য-গ্রন্থ এই সময় আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত প্রচলিত বাংলায় কাব্যানুবাদ করিতে যাইয়া কবি মুন্সী মালে মুহম্মদ কৈফিয়ত স্বরূপ বলেন : —

"এই পুঁথির সায়ের ছিল আগু জামানার।
সমস্‌কৃত সাধু ভাষায় হৈল তৈয়ার॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কছেল্লা।
তে কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা॥"

শুধু ইহাই নহে। এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা কাব্যে ছন্দ ও অনুপ্রাসের রাজা বলিয়া অভিহিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ও তাঁহার রচিত কাব্যে এই সময় অজস্র আরবী-ফার্সী-শব্দ যথেষ্ট নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। কোন ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দ পূর্ব হইতেই ওতপ্রোতভাবে একাত্ম হইয়া মিশিয়া না গেলে তাহাকে ঐ ভাষার উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে-বিশেষতঃ তদানীন্তন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মত কবির রচিত উচ্চাঙ্গের কাব্যে অনাহূত, অহেতুক বা আকস্মিকভাবে আমদানি করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনার জন্যই এরূপ ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারতচন্দ্র নিজেও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন :—

"না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল—
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।
প্রাচীন পন্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যেহোক সেহোক ভাষা কাব্য-রস লয়ে।"

অতএব "যাবনী-মিশাল" ভাষা অর্থাৎ আরবী-ফার্সী মিশ্রিত ভাষা যে তখন কাব্য-রস সৃজনের জন্য অপরিহার্য, তাহা স্বীকৃত সত্য এবং এই ধারায়ই তখন গঠনান্মুখে বাংলা সাহিত্য ক্রম-বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সাহিত্য-পদবাচ্য না হইলেও

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় কার্য পরিচালনার জন্য যে-গদ্য সে-যুগে ব্যবহৃত হইত—যেমন দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠি-পত্রাদিতে ব্যবহৃত গদ্য—তাহাতেও আরবী-ফার্সী শব্দের যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল—এবং সে ধারা আজও—বিশেষ করিয়া দলিল-দস্তাবেজে নির্বিবাদে অব্যাহত রহিয়াছে। এই সকল নানা অবিসংবাদী তথ্য হইতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারা, আরবী-ফার্সী-শব্দ-সমৃদ্ধ বাংলা রচনা-শৈলী অর্থাৎ মুসলমানী বাংলার খাদ ধরিয়াই অগ্রাভিসারী। এই সাহিত্য-ধারার প্রথম ও প্রধান উদ্গাতা কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্। তিনি ভারতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী লোক।

ষষ্ঠতঃ এযুগে মুসলমান সুলতানগণ এবং তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সামন্তগণ বাংলা-সাহিত্য রচনায় যে-পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছেন তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণকেই দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের নিকট হইতে সেরূপ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নাই।

সপ্তমতঃ এই যুগে একমাত্র আরাকানের বৌদ্ধ অধিপতিগণই মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদিগকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছেন। কোন হিন্দু কবি-সাহিত্যিক তাঁহাদের নিকট হইতে সেরূপ সাহায্য পান নাই। মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভারতের হিন্দু-অধিপতিগণ বঙ্গ-ভারত হইতে সেই সময়ে কিয়ৎকালপূর্বে বৌদ্ধ-ধর্ম ও বৌদ্ধ-রাজত্ব উৎখাত করার ফলে বোধহয় বাংলার পূর্ব প্রান্তবর্তী রোসাং বা আরাকানের বৌদ্ধ-রাজগণ হিন্দুদিগের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং সেই হিন্দু-বিজেতা মুসলমানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখি, সেই সময়ে আরাকানের বৌদ্ধ-রাজদরবারে শুধু মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণই সমাদর লাভ করেন নাই—সেই বৌদ্ধ-রাজাদের মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের মধ্যেও অনেকেই মুসলমান ছিলেন।

অষ্টমতঃ এই যুগে যে-সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের প্রায় কেহই মুঘল-পাঠান বংশোদ্ভব নহেন। ইহাঁদের প্রায় সকলেই আরব বংশোদ্ভব। এই মুসলিম কবিদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে। এক শ্রেণী প্রধানতঃ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টির খাতিরেই সাহিত্য-চর্চা করিয়াছেন এবং ইহারাই বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম কাহিনী-কাব্য রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যের অবয়বে প্রাণ-চঞ্চল নব শোনিত-ধারা সঞ্চার করেন। আর এক শ্রেণী কবি সাহিত্যিক আরবী-ফার্সী ভাষা-অনভিজ্ঞ অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারের জন্যই বাংলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। কারণ এই সময় হিন্দু-ধর্মীয়-সাহিত্য মঙ্গল-কাব্য ও বৈষ্ণব গীতি কবিতার দুকূল-প্লাবী বন্যায় সারা বাংলা প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলিম জনসাধারণও নিজ মাতৃভাষায় রচিত এই সকল কাব্যের রসাস্বাদনে মত্ত হইয়া উঠে। ফলে তাহারা এই সকল ধর্মীয় কাব্যের কাব্য-রসের সঙ্গে তদনিহিত ধর্মীয় শিক্ষাও গ্রহণ করিতে থাকে। এবং ইসলামের শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্মও গ্রহণ করিয়া বসে। যবন হরিদাস তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আরবী-ফার্সী ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে আরবী-ফার্সী ভাষায়-নিবদ্ধ ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া এইরূপ আচরণ করা মোটেই অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক নহে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই এই যুগের দ্বিতীয়োক্ত মুসলিম কবিগণ ইসলাম-ধর্ম ও সভ্যতার বিভিন্ন দিক লইয়া তদানীন্তন বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত

www.pathagar.com

আরবী-ফার্সী-বহুল বাংলায় সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই যুগের প্রায় সকল মুসলিম কবি সাহিত্যিকই তাঁহাদের আরব দেশীয় পীরের আদেশে এই সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এরূপ সাহিত্য-চর্চা তখন পুণ্য অর্জনের অন্যতম উপায় বলিয়াও স্বীকৃত হইত।

নবমতঃ এই যুগে অর্থাৎ পাক-ভারতে মুঘল-পাঠান-শাসনকালে মুঘল-পাঠান সম্রাটগণ এবং মুঘল-পাঠান বংশীয় আমীর ওমরাহ্‌ ও নওয়াব সুবাদারগণের প্রায় কেহই পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারের বিশেষ কিছু চেষ্টা করেন নাই। পাক-ভারতে—বিশেষ করিয়া বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয় প্রধানতঃ আরব দেশীয় পীর-আউলিয়া ও ফকির-দরবেশদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক বল, নির্মল চরিত্রবল ও আপ্রাণ প্রচার-প্রচেষ্টার ফলে। এই যুগের আরব-বংশোদ্ভব মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণের প্রায় সকলেই এই সকল আরব দেশীয় পীর-আউলিয়ার মুরীদ বা শিষ্য ছিলেন এবং স্ব স্ব পীরের নির্দেশেই রস-সৃষ্টি ও ধর্ম-প্রচারণার উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দশমতঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাংলা সাহিত্যের এই যুগে এবং তাহার পূর্ববর্তী বৌদ্ধ-যুগে বাংলা সাহিত্য-রচনার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে ধর্ম এবং পরবর্তী ইংরাজ আমলেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ বাংলা গদ্য রচনার প্রেরণা আসিয়াছে খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম ধর্মের ধর্মীয় তাগিদ হইতেই। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের নির্মিতি যুগের মূল উৎস হইল ধর্ম।

ইহার পরবর্তী যুগকে বাংলা-সাহিত্যের হিন্দু-রেনেসাঁ-যুগ বা হিন্দু নব-জাগরণ বা পুনর্জাগরণ-যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ঊন-বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত এই যুগ সম্প্রসারিত। যদিও ঊন-বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে একদিকে খৃষ্টানধর্ম প্রচারকারী ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উইলিয়াম ক্যারী ও মার্সম্যান প্রমুখ খৃষ্টান পাদরী ও তদানীন্তন ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রয়োজনের তাগিদ এবং অন্যদিকে ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম-ধর্মে প্রচারের উদগ্র কামনা ও প্রসার বাংলা গদ্য-সাহিত্য-সৃজন সম্ভবপর করিয়া তুলিল—তথাপি এই সময়-রচিত বাংলাগদ্য সাহিত্য পদবাচ্য হয় নাই। অবশ্য কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রগণের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে যাইয়া রামবাম বসু "লিপিমালা" এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "বত্রিশ-সিংহাসন" নামক পুস্তকদ্বয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিলেন এবং তদ্‌পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামবাম বসু-রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "প্রতাপাদিত্য-চরিত" বাংলাগদ্যে প্রকাশিত হবে ; কিন্তু এই সকল পুস্তকের ভাষা ও রচনা-শৈলী সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ হয় নাই। প্রকৃত রসোত্তীর্ণ ও সাহিত্য-পদ-বাচ্য বাংলা-গদ্য-সাহিত্য সর্বপ্রথম রচনা করিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊন-বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু তাঁহার এই গদ্য অত্যন্ত সংস্কৃত-বহুল এবং জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তাহার কোনরূপ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য ছিল না এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারার সঙ্গেও তাহার কোনরূপ যোগ-সূত্র ছিল না। এই ছিন্ন-সূত্র সাহিত্য ধারার প্রবর্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারায় বৌদ্ধ যুগের অবসানের পর মুসলিম-যুগের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যের

www.pathagar.com

ধারা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল—এই সময়ে রচিত কোন বাংলা-সাহিত্যের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ ছিল—রাষ্ট্র-বিপ্লব। অনুরূপ কারণেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ইংরাজ-শাসন এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর কাল অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাংলার সাহিত্যাকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব পর্যন্ত সত্যিকার রসোত্তীর্ণ কোন বাংলা-সাহিত্য এদেশে রচিত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। পৃথিবীর সর্বত্রই রাষ্ট্র-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা পরিবর্তনের যুগে অল্পাধিক এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, এই একশত বৎসর পর্যন্ত বাংলার গণ-মানস আত্মীক আনন্দ-লাভের যে-ধারা আবিষ্কার করিল তাহা হইল—গেউন, আখড়াই, টপ্পা, পাঁচালী, কবিগান প্রভৃতি গণ-মনোরঞ্জনকারী নকারী এক প্রকার গীতি-সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য-আসরে ইহাদের কোন স্থান নাই। কারণ এগুলি যথার্থ সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ নহে।

বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারা হইতে ইংরাজ-আমলে রচিত বাংলা-সাহিত্য যে অকস্মাৎ এক নব-ধারায় প্রবাহিত হইল, তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজেরা সুচতুর ও দূরদর্শী জাতি। তাঁহারা জানিতেন, শুধু অস্ত্র-বলে বা পশুশক্তি দ্বারা কোন জাতিকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখা যায় না। কোন জাতিকে—বিশেষ করিয়া পূর্বতন শাসক-জাতিকে পদানত করিয়া রাখিবার একমাত্র পথ হইল, সেই জাতির ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং তাহার বাহন সাহিত্যকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দুইটি পন্থা অবলম্বন করিলেন। একদিকে ফার্সী-ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া সেখানে ইংরাজী ও নব-গঠিত বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল—আর একদিকে আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত ও ইসলামী-ভাবধারা সমন্বিত বাংলার গণ-সাহিত্যকে বিদূরিত করিয়া তদস্থলে সংস্কৃত-বহুল ও হিন্দু-ভাবধারা-প্লাবিত "বিদ্যা-সাগরীয়" সাহিত্য সৃজনে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া হইল। অতীতে পৃথিবীর সর্বত্র রাজানুকূল্যেই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধ এবং মুসলিম যুগেও এইভাবেই বাংলা-সাহিত্য সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ আমলেও তাহাই হইল। "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" নামক অধ্যায়ে "সংস্কৃতিকরণ" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক সজনীকান্ত দাস মহাশয় এ সম্পর্কে বলেন, "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তী হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার ও উইলিয়াম ক্যারী বাংলা-ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতী করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন যন্ত্রের সূত্রপাত হয় এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর-মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরাজী প্রবর্তনে এই যন্ত্রের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ; আরবী-পার্‌সীকে অশুদ্ধ ধরিয়া—শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সে কালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধান রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল ; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পার্‌সীর বিরুধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন ; ফলে দশ-পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা-গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাকসটন

www.pathagar.com

অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, ভাগবদগীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলার শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে সজনীকান্ত দাস মহাশয় ইংরাজগণ কর্তৃক বাংলা-ভাষা হইতে আরবী-ফার্সী শব্দের নির্বাসন প্রচেষ্টাকে "আরবী-ফারসী নিসূদন-যজ্ঞ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা ভাষার ক্ষেত্রে "নিসূদন-যজ্ঞ" অর্থাৎ বধ বা হত্যা-যজ্ঞই ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইংরাজ আমলে বাংলা-ভাষা হইতে আরবী-ফার্সী শব্দের আকস্মিক অপসারণ প্রকৃতপক্ষে গায়ের জোরেই সাধিত হইয়াছিল—ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসারে নহে। কিন্তু কোন জীবন্ত ভাষার স্বাভাবিক গতিধারাকে নিছক গায়ের জোরে চিরদিন রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। বাংলা-ভাষার বেলায়ও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। নজরুল-যুগ বা মুসলিম-রেনেসাঁ-যুগে আসিয়া সেই রুদ্ধ স্রোতধারা আবার কূল প্লাবিত করিয়া প্রবহমান হইয়াছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

ইংরাজ-আমলের এই সংস্কৃত সাহিত্য-যুগকে "ইংরাজ-যুগ" না বলিয়া "হিন্দু-রেনেসাঁ-যুগ" বলিয়া অভিহিত করার কারণ রহিয়াছে। সেই কারণ হইল এই যে, এই নব-গঠিত বাংলা-ভাষার মাধ্যমে ইংরাজদের প্রধান জাতীয় ধর্ম—খৃষ্টান-ধর্ম এবং ইংরাজ-জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি যতখানি প্রসার ও প্রেরণা লাভ না করিয়াছে, তদপেক্ষা সহস্র গুণে বেশী প্রেরণা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে হিন্দু-ধর্ম এবং হিন্দু বা আর্য-ধর্ম ও জাতির সংস্কৃতিগত আদি বাহন সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে হিন্দু জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বিশেষতঃ এই নব-সংগঠিত বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ শাখায় কোন ইংরাজের কোনরূপ দান নাই। এই যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ কর্তৃকই রচিত ও সৃষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই উচ্চ বর্ণের হিন্দু। ইহাঁরা যে-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাহাই তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠিবে—ইহাই স্বাভাবিক। এই দিক দিয়া তাঁহারা সফল ও সার্থক, সাহিত্য-স্রষ্টা। মাইকেল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের অমর প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় আসীন। তথাপি এই সাহিত্য বাংলা-ভাষা-ভাষী সমগ্র গণ-মানসের প্রতিচ্ছবি নহে। বাংলা-ভাষাভাষী গণ-সংঘের শতকরা পঞ্চাশেরও বেশী যাহারা—সেই মুসলমানদের কোন সত্যিকার প্রতিচ্ছবি এই সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ইহা ছাড়া, বাংলার জন-সংখ্যার শতকরা প্রায় আশীজন যাহারা—সেই পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান কৃষক সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই সাহিত্যে রূপায়িত হয় নাই। কাজেই প্রকৃতপক্ষে ইহা নগর-বাসী হিন্দু-মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্য—বাংলার যথার্থ জাতীয় সাহিত্য নয়। [এ সম্পর্কে "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" ও "মিলাদ শরিফ" শীর্ষক কবিতাদ্বয়ের কাব্য-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।] যাহা হউক আলোচ্য হিন্দু-রেনেসাঁ-যুগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগও আধুনিক যুগ। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কাল পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ এবং মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্যকে আধুনিক বলিয়া অভিহিত করিলে অসমীচীন হইবে না। এই আধুনিক যুগের মধ্যেই আবার আর একটি উপ-যুগ আছে। তাহা হইল "রবীন্দ্র-যুগ"। কারণ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি যুগ।

ইহার পরেই আমরা উল্লেখ করিতে পারি, "মুসলিম রেনেসাঁ" যুগের কথা। এই যুগের প্রধান স্রষ্টা নজরুল ইসলাম ও জসীম-উদ্‌দীন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে, রবীন্দ্র প্রতিভার ভাস্বর আলোতে আবির্ভূত হইয়াও ইহারা রবীন্দ্র-প্রভাবের বাহিরে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারায় সফল

www.pathagar.com

ও সার্থক সাহিত্য-সৃজনে সক্ষম হন। বাংলা-ভাষী জনগণের শতকরা পঞ্চাশেরও বেশী যে-মুসলমান, তাহাদের তাহ্যীব ও তমদ্দুন অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাধনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রাণ-উদ্বেল ভাব ও ভাষা-ভঙ্গীতে নজরুল-সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠিল। পুঁথি-সাহিত্যের হারানো সূত্র আবার ফিরিয়া পাইয়া বাংলা-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের সেই মূল-উৎস-মুখ হইতে অকুণ্ঠ রস-ধারা পান করিয়া নজরুল-সাহিত্য এক নব প্রাণ-বন্যায় সারা গণ-মানসকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নবযুগের আবির্ভাব হইল। অপর দিকে, বাংলা-ভাষী জন-সংখ্যার শতকরা প্রায় আশীজন যাহারা—সেই কৃষক সমাজের, বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও ভাবনা অনেকটা তাহাদেরই ভাষা-ভঙ্গীতে রূপায়িত করিয়াছেন জসীমউদ্‌দীন। বাংলার অলিখিত পল্লী-গীতি সাহিত্যের হারাইয়া-যাওয়া স্রোতধারা আবার নূতন প্রাণ-বন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। এতদিনে বাংলা-সাহিত্য যারা বাংলা-ভাষা-ভাষী গণ-মানসের পরিপূর্ণরূপ লইয়া বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল-জসীমের সম্মিলিত সাহিত্যের ভিতর যথার্থ মানসিকতা লাভ করিল। হিন্দু রেনেসাঁ-যুগের শ্রেষ্ঠতম নির্দশন বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে মুসলিম রেনেসাঁ যুগের স্রষ্টা নজরুল-জসীমের সাহিত্য-ধারা এক পূর্ণতর সার্থকতার অভিমুখে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া পাশাপাশি বহিয়া চলিল। বাংলার সাহিত্য-স্রোত আজও প্রায় সেইভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। বাংলার অত্যাধুনিক সাহিত্য যাহাকে বলা হয়—তাহাতে অনেকটা সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের নব-নব আঙ্গিকের প্রয়োগ-কৌশল লইয়া নানারূপ পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-কার্যই প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা এখনো কোনরূপ বিশিষ্ট বা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে নাই।

বানান পদ্ধতি—এই পুস্তকে যে বানান-রীতি অনুসৃত হইয়াছে, সে সম্পর্কে এখন দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। সংস্কৃতমূলক ও খাঁটি বাংলা-শব্দের বেলায় "চলন্তিকা" নামক অভিধানের বানান-রীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের বেলায় পূর্ব বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড কর্তৃক যে বানান পদ্ধতি অনুমোদিত ও নির্ধারিত হইয়াছে—অর্থাৎ আরবী-ফার্সী-উর্দুর "জিম" ( )-এর স্থলে বর্গীয় "জ" এবং "যাল্" ( ), "যে" ( ), "যোয়াদ" ( ), এবং "যই" ( )-এর স্থলে "অন্তস্থ য" হইবে—তাহাই এখানে অনুসৃত হইয়াছে। তদুপরি আরবী-ভাষায় এ-কার এবং ও-কার নাই। মাত্র ই-কার ও উ-কার আছে। "জের" ( ) অথবা "ইয়া" ....দ্বারা—ই-কার উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু যেখানে একসঙ্গে "জের্" ( ) এবং "ইয়া" ( ) রহিয়াছে সেখানে দীর্ঘ-ই-কার ( ) দেওয়া হইয়াছে। যেখানে শুধু "পেশ" ( ) অথবা ওয়াও ( ) আছে, সেখানে হ্রস্ব-উকার এবং যেখানে "পেশ" ( ) এবং "ওয়াও" ( ) একত্রে রহিয়াছে, তথায় সাধারণতঃ দীর্ঘ-উকার ( ) ব্যবহার করা হইয়াছে। কাহারো-কাহারো মতে আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের প্রচলিত বাংলা-বানানই অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু কোনটি "প্রচলিত বানান" তাহা নির্ণয় করাই সুকঠিন ব্যাপার। কারণ বিভিন্ন বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক একই শব্দের বিভিন্নরূপ বানান করিয়াছেন। যথা—মহাম্মদ, মোহাম্মদ, মুহাম্মদ, মুহম্মদ ইত্যাদি। কাজেই এই নীতি গ্রহণযোগ্য কিনা তাহা বিবেচ্য। পুঁথি-সাহিত্যের বানান সম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় নাই। কারণ পুঁথি-সাহিত্যের বানান একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়—অনেকটা প্রচলিত উচ্চারণের ধ্বনির সহিত তাহার সামঞ্জস্য ঘনিষ্ঠতর। সংস্কৃত বা বাংলা-ব্যাকরণ-

www.pathagar.com

নির্ধারিত বানান-পদ্ধতির সঙ্গে তাহার তেমন কিছু যোগাযোগ নাই। এই বানান-রীতি বদলাইতে গেলে, পুঁথির ভাষার বিশিষ্ট রূপকেই পরিবর্তন করিতে হয়। ইহা সমীচীন নহে।

ঋণ-স্বীকার—এই মুখবন্ধে বাংলা-ভাষার ক্রম-বিকাশের ধারা বর্ণনা ব্যাপারে ডা: শহীদুল্লাহ্‌, ডা: এনামুল হক, মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ডা: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুকুমার সেন, শ্রীযুত তুলসী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সজনী কান্ত দাস প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ-রচিত বাংলা-ভাষার বিভিন্ন শাখার ইতিহাস এবং নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সুধীজনের প্রবন্ধাদি হইতে বিবিধ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পুস্তকের প্রবন্ধ-পরিচিতি, কাব্য-পরিচিতি ও টীকা ইত্যাদি রচনায় বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক লিখিত সমালোচনামূলক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদিও প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট সহায়তা দান করিয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সংশোধনী—নানা কারণে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত পুস্তকটি মুদ্রিত হওয়ার ফলে বানান ব্যাপারে ইহাতে কিছুটা ভুল-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের শেষ দুই পৃষ্ঠায় ইহাদের যথাসম্ভব একটি সংশোধনী দেওয়া গেল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইসলামের বিধান অনুসারে হযরত মুহম্মদ (দ:) এবং অন্যান্য নবী, রসুল ও প্রধান ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতগণের এবং হযরত মুহম্মদের (দ:) সাহাবা অর্থাৎ সহচরগণের নামোল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কয়েকটি বিভিন্ন সম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি ইহা ধর্মীয় নির্দেশ। হযরত মুহম্মদের (দ:) নামোচ্চারণের পর বলিতে হয়—"সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম"। এই আরবী বাক্যটির অর্থ : "তাঁহার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ ও শান্তি অবতীর্ণ করুন"। এই বাক্যকে আরবীতে দরূদ বা দুরূদ বলা হয় ; ইহার অর্থ : শান্তি-বাণী। ইহাকে বাংলায় সংক্ষেপে (দ:)—এইভাবে লেখা হয়। হযরত মুহম্মদ (দ:) ব্যতীত অন্যান্য নবী ও রসুলগণের এবং জিব্‌রাইল, মিকাইল, আয্‌রাইল ইস্‌রাফীল প্রমুখ প্রধান ফেরেশতা বা ফিরিশ্‌তাগণের নামের শেষে উচ্চারণ করিতে হয়—'আলায়হেস্‌ সালাম"—অর্থাৎ "তাঁহার উপর (আল্লাহ্‌র) শান্তি অবতীর্ণ হোক"। ইহাকে বাংলায় সংক্ষেপে (আ:)—এইভাবে লেখা হয়। হযরত মুহম্মদের (দ:) সহচর বা সাহাবীগণের নামের শেষে উচ্চারিত হয়—"রাদি আল্লাহু আনহু"— অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ তাঁহার উপর প্রসন্ন হউন"। ঐরূপ ব্যক্তি যদি নারী হন তাহা হইলে আরবী ব্যাকরণানুসারে "আনহু"-র স্থানে "আন্‌হা" হইবে অর্থাৎ বাক্যটি হইবে—"রাদি আল্লাহু আন্‌হা"। এই উভয় বাক্য বাংলায় সংক্ষেপে (রা:)—এইরূপভাবে লেখা হয়। এই পুস্তকেও উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।

বে-নজীর আহ্‌মদ

www.pathagar.com

শব্দার্থ

[আ: = আরবী ভাষা ; ফা: = ফার্সী ভাষা; উ: = উর্দু ভাষা ; হি: = হিন্দী ভাষা ; তু: = তুর্কী ভাষা ; পু: = পুর্তগীজ ভাষা।]

অ

অগম—অগম্য ; অগাধ ; অথৈ।
অর্গল—খিল্ বা হুড়কা।
অচল—পর্বত ; গতিহীন ; স্থির।
অর্চনা—পূজা ; উপাসনা।
অর্চনারতি—অর্চনা ও আরতি ; অর্থাৎ উপাসনা বা পূজা এবং প্রদীপাদি দ্বারা দেবমূর্তি বরণ।
অজর—জরা বা বার্ধক্যহীন ; জীর্ণতা রহিত।
অঞ্জলিয়া—আঁজল বা যুক্ত পাণি বা জোড় হাত দ্বারা অর্পণ করিয়া।
অটবী—বন ; অরণ্য।
অতিরঞ্জন—অত্যুক্তি ; বর্ণনা চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য মিথ্যার অবতারণা।
অতীন্দ্রীয়—ইন্দ্রিয়াতীত ; ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
অদ্রি—পর্বত।
অধিত্যকা—পর্বতের উপরস্থ বিস্তৃত ভূমি।
অধ্যুসিত—অধিষ্ঠিত ; উপনিবিষ্ট।
অনল-তেজা—অগ্নির মত তেজ বিশিষ্ট।
অনাড়ম্বর—আড়ম্বর বা জাকজমকহীন ; সাধাসিধা।
অনিত্য—অস্থায়ী।
অনিবর্চনীয়—বচন বা কথায় যাহা ব্যক্ত করা যায় না।
অনুচিকীর্ষা—অনুকরণ করিবার ইচ্ছা।
অনুকম্পাপরবশ—দয়ার বশবর্তী।
অনুপ্রাণনা—প্রাণ-চাঞ্চল্য।
অনুরঞ্জন—প্রীতিসম্পাদন ; তুষ্টকরণ।
অন্তরীক্ষ—আকাশ।
অন্তঃ সলিল—অন্তর্ভৌম জল বিশিষ্ট ; যে-নদীর পানি ভূগর্ভে বা অপ্রকাশ্য ভাবে প্রবাহিত।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—মৃত-সৎকার কার্য ; কবর দেওয়া ; শব দাহ করা।
অন্ধ তমসাচ্ছন্ন—ঘোর অন্ধকারময়।
অন্য-নিরপেক্ষ—অন্যের উপর নির্ভরশীল নহে, এমন প্রকার ; স্বাধীন।
অবলা—নারী ; স্ত্রীলোক।
অবগুণ্ঠন—ঘোমটা ; পর্দা।
অবদান—মহৎ কার্য ; কীর্তি ; দান।
অব্যয়—অক্ষয় ; অপরিবর্তী ; অবিনাশী।
অভিযান—যুদ্ধ-যাত্রা ; দেশাবিষ্কার ইত্যাদির জন্য সদল বলে গমন।
অভিযাত্রিক—পথিক ; তীর্থ-যাত্রী।

www.pathagar.com

অভ্র—মেঘ ; আকাশ ; স্বচ্ছ নমনীয় স্তরময় খনিজ পদার্থ ; Mica.

অমরা—স্বর্গ।

অমিয়—সুধা ; অমৃত।

অমিত তেজা—অপরিমিত বা অসীম তেজ বিশিষ্ট।

অম্বর—আকাশ ; বস্ত্র।

অম্বু—পানি ; জল।

অম্বুরাশি—সাগর।

অরুণ—সূর্য।

অলক—মুখের শোভাবর্ধক ললাটশায়ী কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ।

অলিন্দ—বারান্দা।

অলৌকিক—লোকাতীত ; যাহা মানুষের দ্বারা সম্ভবপর নয় ; যাহা ইহলোকের নয়।

অহর্নিশ—দিবারাত্র ; অহ অর্থাৎ দিবাভাগ এবং নিশা বা রাত্রির সমবায়।

আ

আওয়াজ (ফা:)—শব্দ ; ধ্বনি।

আকবত (আ:)—পরকাল।

আখের (আ:)—অন্য উচ্চারণ : আখির। অর্থ : শেষ ; অন্ত।

আখেরাত (আ:)—পরকাল।

আখেরি যামানা—শেষ যুগ ; কলি কাল। "আখেরি" শব্দ আরবী "আখের" বা "আখির" শব্দ হইতে উৎপন্ন ; ফার্সী ব্যাকরণানুযায়ী "ই" প্রত্যয় যোগ করিয়া "আখেরি" করা হইয়াছে ; অর্থ : শেষ কালীন। "যামানা" আরবী শব্দ ; অর্থ : যুগ ; কাল।

আগ্ (ফা:)—অগ্নি ; আগুন।

আগমনী—আগমন সম্বন্ধীয় ; উমার পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক গান।

আঁছু (হি:)—আসু ; অশ্রু ; চোখের পানি।

আজাব (আ:)—প্রকৃত বানান "আযাব"। অর্থ : শাস্তি।

আড়ে—আড়ালে।

আতশ (ফা:)—অগ্নি।

আতশী (ফা:)—অগ্নিময়।

আত্মোদর সর্বস্ব—নিজের উদর বা পেট ভরানোতে ব্যস্ত ; একমাত্র নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত।

আদ্যোপান্ত—আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত।

আন্জাম (ফা:)—অন্য বানান "আঞ্জাম"। আয়োজন বা ব্যবস্থা করিয়া কার্য সমাধা। ইহার আরবী প্রতিশব্দ "ইন্তেযাম"।

আন্যীর (আ:)—ডুমুর জাতীয় মিষ্ট ফল বিশেষ ; Fig.

আনার কলি—ডালিম ফুলের কুঁড়ি।

আফতাব (ফা:)—সূর্য।

আব্ (ফা:)—পানি ; জল।

আবে হায়াত (ফা:)—অন্য বানান : আব্-ই-হায়াত্। অর্থ : অমৃত ; সুধা। "আব্" ফার্সী শব্দ—অর্থ: পানি ; "হায়াত্" আরবী শব্দ—অর্থ : জীবন ; আয়ু। যে-পানি পান করিলে চিরজীবি হাওয়া যায় তাহাকেই আবে-হায়াত বা আব্-ই-হায়াত্ বলে।

www.pathagar.com

আবডাল—আড়াল ; অন্তরাল।
আবর (হিং)—মেঘ।
আবের পাঙ্খা—স্বচ্ছ নমনীয় ও স্তর বিশিষ্ট অভ্র নাম খনিজ পদার্থে তৈয়ারী বাতাশ দিবার পাখা।
আভরণ—অলংকার।
আমীন (আ:)—বিশ্বাসী ; বিশ্বস্ত ব্যক্তি।
আমীর (আ:)—আদেশ-দাতা ; নেতা। আরবী "আম্‌র্" বা "আদেশ" শব্দ হইতে উৎপন্ন।
আমেজ—আভাষ ; লেশ ; অল্প মিশ্রণ।
আয়েব (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ "আয়ব্"। অর্থ : দোষ ; ত্রুটী।
আয়েশী (আ:)—আরামপ্রিয় ; বিলাসী।
আযাদ (ফা:)—স্বাধীন ; মুক্ত।
আযাদী (ফা:)—স্বাধীনতা ; মুক্তি।
আরতি—প্রদীপাদি দ্বারা দেবমূর্তি বরণ।
আলম (আ:)—পৃথিবী ; জগৎ।
আলবোলা—হুকা।
আলেখ্য—চিত্রপট ; অঙ্কিত প্রতিমূর্তি।
আলিম্পন—আল্পনা ; ঘরের মেঝে, পিড়ি বা দেওয়ালে অঙ্কিত মঙ্গল-চিত্র।
আসব—মদ্য ; চুয়ানো মদ।
আস্তব্যস্তে—ব্যস্ততার সহিত ; তাড়াতাড়ি।
আহব—যুদ্ধ।
আহুতি—বিসর্জন ; নিক্ষেপ ; দেবতার প্রীতি-সম্পাদনার্থ অগ্নিতে ঘৃতদান।
আহ্নিক—প্রাত্যাহিক ; দৈনিক ; হিন্দুদের প্রতিদিনের কৃতা সন্ধ্যা বন্দনাদি।

ই

ইত্তেহাদ (আ:)—ঐক্য।
ইন্‌সান্ (আ:)—মানব।
ইন্‌সাফ্ (আ:)—ন্যায়-বিচার।
ইনাম (আ:)—পুরস্কার।
ইন্তেযার (আ:)—প্রতীক্ষা ; আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা।
ইন্তেযারী (আ:)—প্রতিক্ষা করণ।
ইন্তেকাল (আ:)—মৃত্যু ; পরলোকগমন। আরবী "নক্‌ল্" অর্থাৎ "স্থান পরিবর্তন" শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ ইহকাল হইতে পরকালে স্থান পরিবর্তন বা মৃত্যু।
ইন্ধন—জ্বালানি ; কাঠ, কয়লা ইত্যাদি যে-সকল দাহ্য পদার্থ দিয়া আগুন করা হয়।
ইমামতি (আ:)—নেতৃত্ব। আরবী "ইমাম" বা "নেতা" শব্দ হইতে উৎপন্ন। জমায়াত নামায অর্থাৎ একাধিক লোক সম্মিলিতভাবে যে-নামায আদায় করেন সেই নামাযের নেতৃত্ব। ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব।
ইয্‌যত্ (আ:)—সম্ভ্রম ; মান।
ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।
ইরাণী—ইরাণ বা পারস্য দেশীয় ; ইরাণ-দেশ-বাসী।

www.pathagar.com

ইল্‌ম্ (আ:)—বিদ্যা ; জ্ঞান। প্রচলিত ভুল উচ্চারণ “এলেম”।
ইল্লত্ (আ:)—দোষ ; কলঙ্ক।

ঈ

ঈশান—উত্তর-পূর্ব কোণ বা দিক।

উ

উইল (ইংরাজী)—যে-দান-পত্র দাতার মৃত্যুর পর বলবৎ হয়।
উত্তরীয়—উড়ানি ; চাদর।
উত্তর সাধক—পরবর্তীকালে যাঁহারা সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; শেষে যাহার সাহায্যে কার্য সম্পন্ন হয় ; তান্ত্রিক সাধনায় সাধককে যে সাহায্য করে।
উত্তুঙ্গ—অতি উচ্চ।
উৎসর্জন—উৎসর্গ।
উৎসারিত—উৎক্ষিপ্ত ; অপসারিত।
উদাত্ত—উচ্চ স্বর ; সংগীতের স্বরভেদ ; বেদ গানের উচ্চ স্বর।
উদ্গাতা (উদ্‌গাতা)—সাম-বেদ গায়ক ; যে উচ্চ স্বরে বা উদাত্ত স্বরে গান করে।
উদীয়মান—যাহার উদয় হইতেছে ; যে উঠিতেছে বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।
উদ্দীপ্ত—উৎসাহ বা উত্তেজনাপূর্ণ ; প্রজ্জ্বলিত ; জ্বলন্ত ; আলোকিত।
উদ্দীপন—দীপ্তকরণ ; উৎসাহিত করণ ; উত্তেজন ; প্রজ্জ্বলন।
উদ্বুদ্ধ—জাগরিত ; প্রবুদ্ধ।
উদ্বোধন—বোধন বা চেতনা সঞ্চার ; জাগরণ।
উঞ্ছবৃত্তি—হীন ব্যবসায় ; নীচ বৃত্তি ; হীন জীবিকা।
উপকণ্ঠ—উপান্ত ; গ্রাম-নগরাদির প্রান্ত।
উত্তরায়—প্রবল শব্দ ; চিৎকার।
উম্মত (আ:)—সম্প্রদায় ; জাতি।
উর্মি—ঢেউ ; তরঙ্গ ; যে উর্ধ্বে গমন করে।
উষ্ণীষ—শিরস্ত্রাণ ; পাগড়ি।
উস্তাদ—গুরু ; শিক্ষক। আরবী “উস্তায” ....শব্দের ফার্সী প্রয়োগ।

এ

এয়ছা (হি: এবং উ:)—এরূপ
একিন (আ:)—স্থির বিশ্বাস।
এতিম (আ:)—পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক।

ঐ

ঐতিহ্য—বিশ্রুতি ; কিংবদন্তী ; ইতিহাস পরম্মরাগত কথা ; পরম্পরাগত উপদেশবাক্য ; Tradition.
ঐহিক—ইহকালের ; এজন্মের।

ও

ওড়না (হি:)—মেয়েদের ব্যবহার্য চাদর বা উড়ানি।

www.pathagar.com

ওযু (আ:)—ধৌত করা ; প্রক্ষালন ; প্রচলিত অর্থ : নামাযের বা অন্য কোন পূণ্য কাজের জন্য বিশেষ নিয়মানুসারে শরীরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশ ধৌত করা। এদেশে প্রচলিত উচ্চারণ "অযু"।

ওলনের দড়ি—অবলম্বী লম্বরেখা নির্ণয়ের জন্য নীচে ভার বাধা রশি বা দড়ি ; Vertical.

ওয়াক-ধরানো—বমি উদ্রেককারী।

ওয়াক্‌ফ্‌ (আ:)—উৎসর্গিকৃত ; সম্পত্তি উৎসর্গকরণ।

ওয়াদা (আ:)—প্রতিশ্রুতি ; প্রতিজ্ঞা।

ওয়ারেশিন (আ:)—উত্তরাধিকারিগণ ; আরবী "ওয়ারিশ" বা "উত্তরাধিকারী" শব্দের বহুবচন।

ওয়াস্তে (আ:)—নিমিত্ত ; আরবী "ওয়াস্তা" শব্দের ফার্সী ব্যবহার।

ক

কওসর (আ:)—অমৃত ; সুধা।

কওসর-ভর—অমৃত-ভরা ; সুধাপূর্ণ।

কটক—সৈন্য ; সেনা-নিবাস।

কড়ি—সঙ্গীতে সুরের উচ্চ বা কড়া পর্দা। সুরের নিম্ন বা কোমল পর্দাকে "কোমল" বলা হয়।

কদম (আ:)—চরণ ; পা।

কদম্ব-কুসুম—কদম ফুল।

কদম্ব-কুসুম-প্রতিমা—কদম ফুলের ন্যায় ; কদম ফুলের প্রকৃতি বা আকৃতি বিশিষ্ট।

কদর (আ:)—সম্মান ; মর্যাদা।

কনক—স্বর্ণ ; সোনা।

কপ্নি—কৌপিন ; নেংটি।

কবল—গ্রাস ; যথা—কবল-মুক্ত।

কবুল (আ:)—স্বীকৃতি।

কম্বু—শঙ্খ।

কমি নাই (হি:)—অভাব নাই।

করতার—কর্তা বা সৃষ্টি-কর্তা।

করভ—হস্তি-শাবক ; উষ্ট্র-শাবক ; উষ্ট্র।

করাল—ভীষণ ; কঠোর ; তুঙ্গ।

করী—হস্তি।

কর্ণ-কুহর—কানের ছিদ্র বা রন্ধ্র।

কল্লোল—জলের কল্‌কল্‌ শব্দ ; জল-তরঙ্গের শব্দ।

কল্লোলিনী—নদী।

কলম্ব—ধনুকের তীর।

কশাঘাত—চাবুকের আঘাত ; বেত্রাঘাত।

কসম (আ:)—শপথ ; দিব্য।

কাড়া—ঢাক জাতীয় বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।

কানন-কুন্তলা—কানন বা বন কুন্তল বা কেশের স্বরূপ যাহার ; যাহার উপর বন কেশের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

www.pathagar.com

কানাত—বস্ত্র-গৃহ ; তাঁবু ; তাঁবুর দেয়াল বা পর্দা।
কাণ্ডারী—কর্ণধার ; নাবিক।
কান্তার—নিবিড় অরণ্য ; দুর্গম পথ।
কান্তি—লাবণ্য ; শোভা ; সৌন্দর্য।
কাপালিক—নর-কপালধারী তান্ত্রিক সাধু।
কাফেলা (আ:)—যাত্রীদল।
কারচোব (আ:)—কাপড়ের উপর নকশার কাজ।
কালাম (আ:) বাণী ; বাক্য।
কালকূট—তীব্র বিষ ; হলাহল।
কাঁসর—কাঁসার বাদ্য-যন্ত্র।
কাঁসি—কাঁসার কানা-উচু থালা বিশেষ ;কাঁসর।
কিংকর্তব্য—বিমূঢ়—হতভম্ব ; বিস্ময়, ভয়, লজ্জা ইত্যাদির জন্য কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম।
কিরীট—মুকুট।
কিশলয়—কচি পাতা ; নব পল্লব।
কিশ্‌তি (ফা:)—নৌকা।
কুটিল—শঠ ; চক্রী ; খল ; কপট।
কুঞ্জর—হস্তি ; অন্য শব্দের পরে সন্ধি-আবদ্ধ হইয়া ব্যবহৃত হইলে অর্থ হয় "শ্রেষ্ঠ"। যথা—বীর-কুঞ্জর।
কুঞ্জ-ভবন—বাগান-বাড়ী।
কুদরত (আ:)—শক্তি ; সামর্থ।
কুছ-পরোয়া—কোন প্রকার ভয়। "কুছ" হিন্দী শব্দ—অর্থ : কিছু ; "পরোয়া" বা "পরওয়া" ফার্সী শব্দ—অর্থ ; ভয়।
কুন্দ-সন্নিভ—কুন্দ বা কুঁদ নামক এক প্রকার সাদা ফুল-সদৃশ।
কুণ্ঠা—সংকোচ ; দ্বিধা।
কুর্তা (হি:)—জামা।
কুর্নিশ (ফা: এবং হি:)—প্রণতি ; সসম্ভ্রম সালাম।
কুল্ (আ:)—সকল ; সমস্ত ; যথা—কুল্ মুলুক-অর্থাৎ সকল-দেশ।
কুলিশ—বজ্র।
কুসীদ—সুদ।
কুসুম-স্তবক—ফুলের গুচ্ছ।
কুসুমোদ্যান—ফুলের বাগান।
কৃপাণ—তরবারি।
কেতকী—কেয়া ফুল।
কেতন—পতাকা ; নিশান।
কেরামত (আ:)—প্রকৃত বানান ; "কারামত্"। অর্থ : ক্ষমতা ; মহিমা।
কেলি—খেলা ; প্রমোদ ; বিহার ; কৌতুক।
কেশর—সিংহের ঘাড়ের দীর্ঘ লোম ; ফুলের ভিতরের কেশের বা চুলের সদৃশ অঙ্গ।
কেশরী—সিংহ ; যাহার কেশর আছে।
কোদন্ড—ধনু।
কৌমুদী—জ্যোৎস্না।

www.pathagar.com

খ

খঞ্জর (ফা:)—অন্য বানান : "খন্‌জর্ : অর্থ : ছোরা।

খতিব (আ:)—অন্য বানান : খতীব ; অর্থ : অভিভাষণ দাতা ; বক্তা। "খুৎবা" শব্দ দ্রষ্টব্য।

খঞ্চিপোষ (ফা:)—প্রকৃত বানান : "খাঞ্চাহ্-পোশ" অর্থ : কাষ্ঠ নির্মিত ট্রে বা খাঞ্চার বস্ত্রাবরণ।

খলিল (আ:)—অন্য বানান : খলীল। অর্থ : অন্তরঙ্গ বন্ধু ; বিশিষ্ট বন্ধু।

খাক্ (ফা:)—মাটি।

খামাখা (ফা:)—প্রকৃত বানান : "খাহ্‌মখাহ্" অর্থ : অকারণে ; অনর্থক ; বৃথা।

খামিন (ফা:)—সাধারণ বস্ত্র ; মলিন বস্ত্র।

খিদ্‌মত্ (আ:)—অন্য উচ্চারণ : খেদ্‌মত্। অর্থ : সেবা।

খিদ্‌মত্‌গার—সেবাকারী ; সেবক। খিদ্‌মত্ বা খেদ্‌মত্ আরবী শব্দ ; অর্থ : সেবা ; "গার" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : "কারী"।

খিন্ন—খেদ-যুক্ত ; দুঃখিত।

খুন (ফা:)—রক্ত।

খুশ-রোষ (ফা:)—আনন্দের দিন ; খুশির দিন। অন্য বানান : খোশ্-রোয্।

খুৎবা (আ:)—অভিভাষণ ; বক্তৃতা। অন্য উচ্চারণ : খোৎবা।

খেতাবী—আরবী খেতাব বা খিতাব শব্দ হইতে উদ্ভূত। অর্থ : উপাধি।

খেলাত (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ : খিল্‌য়াত্। অর্থ : পুরস্কার ; রাজদত্ত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।

খোশামদ (ফা:)—অন্য বানান : খুশ্-আমদ বা খুশামদ ; অর্থ : স্তাবকতা।

খোশবু (ফা:)—অন্য বানান : খুশ্‌বু : অর্থ : সুগন্ধ। খোশ্ বা খুশ্ অর্থ : আনন্দিত ; প্রফুল্ল ; ভাল। "বু" অর্থ : গন্ধ। যে গন্ধ মানুষকে প্রফুল্ল বা আনন্দিত করে।

গ

গমি (আ:)—দুঃখ ; আরবী "গম্" বা দুঃখ শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গযব (আ:)—প্রকৃত আরবী উচ্চারণ ; "গদ্‌ব্" ফার্সী উচ্চারণ : "গযব্" অর্থ : রোষ ; ক্রোধ।

গন্ড শৈল—ক্ষুদ্র পাহাড় ; ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে উৎক্ষিপ্ত সুবৃহৎ প্রস্তর বা পর্বতাংশ।

গরজায়—গর্জন করে।

গাজে—গর্জন করে।

গালিম (আ:)—শত্রু।

গিরি-বর্ত—পার্বত্য পথ ; পর্বতের রাস্তা।

গিরি-সংকট—গিরি বা পর্বত-মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ।

গুল্‌মার্ (ফা:)—পুষ্পময়; মাত্ ;মাতোয়ারা ; "গুল" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : পুষ্প।

গুল্‌ফান্ (ফা:)—গুলাবী ; রঙ্গিন ; কুসুম-কোমল বা কুসুম সদৃশ দেহধারী। "গুল্" অর্থ : কুসুম বা ফুল ; "ফাম্" অর্থ : দেহ।

গুল্‌শান (ফা:)—পুষ্পোদ্যান ; ফুল বাগান।

গুলিস্তান (ফা:)—ফুল বাগান।

গুলাম (আ:)—অন্য উচ্চারণ : গোলাম। অর্থ : দাস ; ক্রীতদাস।

গুম্বজ (ফা:)—মূল শব্দ : "গুম্বদ"। অর্থ : মসজিদের গোলাকৃতি ছাদ।

গৈরিক প্লাবন—গিরি বা পর্বত-জাত বন্যা ; গেরুয়া বা গৈরিক বর্ণের পার্বত্য জলের বন্যা।

www.pathagar.com

গোধূলি—সায়ংকাল (যখন গরুর পাল ধূলি উড়াইয়া গৃহে ফেরে)।
গোনাগার (ফা:)—প্রকৃত বানান : "গুনাহ্‌গার"। অর্থ : পাপী ; পাপাচারী।
গোসল (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ : গুসল্। অর্থ : স্নান ; সমস্ত শরীর ধৌত করণ ; অবগাহন।
গোস্তাখ (ফা:)—বে-আদব ; ধৃষ্ট।
গোঁজ—বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদির জন্য গম্ভীর।

ঘ

ঘৃতাহুতি—মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিতে ঘৃতার্পণ ; বহ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃত দান।

চ

চমরী—"চমর" অর্থ : এক প্রকার পাহাড়ী হরিণ ; স্ত্রীলিঙ্গে "চমরী"। চমরের লেজ বা লেজের লোম দ্বারা "চামর" বা ব্যজনী তৈয়ার হয়।
চরাচর—সমস্ত জগৎ ; স্থাবর-অস্থাবর সকল কিছু সহ জগৎ ; "চর" অর্থ : জঙ্গম বা গতিশীল বা অস্থাবর ; "অচর" অর্থ : স্থিতিশীল বা স্থাবর।
চক্রবাল-রেখা—দিঙ্‌মন্ডল : দিগন্ত-বৃত্ত ; যে-রেখা আকাশ-প্রান্তে চক্রাকারে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে।
চর্মাবলী—ঢাল সমূহ।
চারা (ফা:)—উপায় ; যথা : বে-চারা, না-চার বা লা-চার অর্থাৎ উপায়হীন।
চিত্ত-বৈকল্য—চিত্ত বিভ্রম, মনোবিকার।
চিত্ত-বিনোদন—চিত্তের বা মনের আনন্দ-সাধন ; মনের আনন্দ জন্মান।
চিত্রার্পিত—চিত্রপটে অঙ্কিত।
চিন্ময়—জ্ঞান-স্বরূপ ; জ্ঞানময় ; চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ।
চিল্লায় (হি: ও উ:)—উচ্চ স্বরে চিৎকার করে।
চুনী—রক্তরাগ মণি ; রক্তবর্ণের মণি।
চুম্‌কি—সাড়ী ইত্যাদিতে কারুকার্য করার জন্য ব্যবহৃত সোনালী রূপালী ছোট ছোট চাক্‌তি।
চেরাগ (ফা:)—প্রদীপ ; বাতি।
চোড়ে—চোটে ; ক্রোধের সহিত।

ছ

ছক্‌রা গাড়ি—এক প্রকার ঘোড়ার গাড়ি : ছ্যাকরা গাড়ি।
ছাওয়াল (হি:)—ছেলে ; সন্তান।
ছুরত্ (আ:)—বাংলা বানান : সুরত্। অর্থ : রূপ চেহারা ; আকৃতি।
ছেব—আপেল।

জ

জগঝম্প—ঢাক জাতীয় বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।
জঙ্গ (ফা:)—যুদ্ধ।
জটিল—দুর্বোধ ; গোলমেলে।
জড়—নিঃস্পন্দ ; অচেতন ; নিষ্ক্রিয় ; অজ্ঞান ; ভৌতিক ; ভূত্ বা বস্তুগত ; ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ; Material.

www.pathagar.com

জবর-দখল (আ:)—বলপূর্বক দখল। আরবী "জবর্" অর্থ : বলপ্রয়োগ করণ ; অত্যাচার করণ। যথা : জোর-জবর ; (প্রচলিত কথায় : "জোর-জব্বর"।) আর ফার্সী "যবর্" শব্দের অর্থ : শক্তিশালী ; বৃহৎ ; যথা—"যবর-দস্ত" লোক-ফার্সী "দস্ত" অর্থ : হস্ত। কাজেই যবর-দস্ত অর্থ : শক্তিশালী বা প্রতাপশালী হস্ত অর্থাৎ প্রতাপশালী লোক।

জবুস্থবু—জড়সড় ; জড়তুল্য ; নড়ন-চড়ন হীন।

জরীন (ফা:)—"জরি" বা "জরী" অর্থাৎ সূক্ষ্ম সোনালী বা রূপালী তার বা অনুরূপ তার-জড়ানো সূতা দ্বারা কারুকার্য খচিত।

জলদ—মেঘ ; যে জলদান করে।

জলধর—মেঘ ; জলকে যে ধারণ করে।

জলধি-হৃদয়ে—সাগর বুকে ; সমুদ্র বক্ষে।

জলসা (আ:)—আনন্দ-সম্মিলন ; সম্মিলন।

জলাঞ্জলি—মৃতের তৃপ্ত্যর্থে চিতায় জলদান ; অঞ্জলি প্রমাণ জল ; বিদায় ; সম্বন্ধ ত্যাগ।

জলৌকা—জেকি।

জলোয়া (আ:)—জ্যো:তির প্রকাশ ; ঝিলিক।

জান্ (ফা:)—প্রাণ।

জার্জার্ (ফা:)—প্রকৃত বানান : "যার্যার্" অর্থ : অঝোরে (ক্রন্দন)।

জারি (ফা:)—এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বানান : যারী ; অর্থ : কান্নাকাটি। এই অর্থেই জারী-গান বা যারী-গান শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ : শোক-সঙ্গীত। আরবী "জারি" শব্দের বানানও "জারি"। ইহার অর্থ : প্রচারিত করা বা হওয়া ; প্রবাহিত হওয়া বা করা ; প্রকাশিত হওয়া বা করা। যথা—সমন জারি ; খুন্ জারি অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত বা প্রকাশিত হওয়া।

জমা'ত (আ:)—অন্য বানান : "জমায়াত" অর্থ : সমাবেশ ; দল ; সমবায়।

জমা'ত নামায—একাধিক লোকের দলবদ্ধ বা সমবেত নামায। "নামাজ" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : উপাসনা ; প্রার্থনা। ইহার আরবী প্রতিশব্দ : "সালাত"।

জায় নামায (ফা:)—নামায পড়ার আসন।

জাম (ফা:)—পেয়ালা ; বাটি

জাঁহা (ফা:)—অন্য উচ্চারণ "জাহান" এখানে "ন" উহ্য রহিয়াছে—যেমন বাংলাতে চাঁদ-চান্দ ; ফাঁদ—ফান্দ। জাঁহা বা জাহান অর্থ : জগৎ পৃথিবী।

জাহান্নাম (আ:)—নরক।

জি-কাদ মাস (আ:)—যিল্কাদ মাস ; প্রকৃত বানান ; যী-কাদ বা যীলকাদ্ ; হিজ্রী বা মুসলমানী সালে প্রচলিত চান্দ্রমাসের একাদশ মাস।

জের (ফা:)—ধ্বংস ; পরাজয় ; অনুবৃত্তি ; পরবর্তী অংশ।

জ্যোতির্ময়—দীপ্তিময় ; আলোকময়।

জোয়ান (হি:)—প্রকৃত বানান : "জওয়ান"। অর্থ : যুবক ; নব যুবক।

জোশী (ফা:)—"জোশ্" শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থ : উন্মাদনা ; উত্তেজনা।

ঝ

ঝকমারি—হয়রানি ; ঝঞ্ঝাট ; আপদ ; লেঠা ; নির্বুদ্ধিতা ; ভ্রম।

ঝাণ্ডা (হি:)—পতাকা ; নিশান।

ঝিয়ারী—মেয়ে ; কন্যা।

www.pathagar.com

ট

টঙ্কার—ধনুকের জ্যা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে-শব্দ হয়।

টালমাটাল—ছল ;ছুতা ; বায়না ; দোলন ; কম্পন।

টুইয়েদিত—উত্তেজিত করিয়া দিত ; লেলাইয়া দিত।

ঠ

ঠাট—দল : সৈন্যদল।

ত

তখ্‌ত (ফা:)—সিংহাসন।

তছুরূপাত (আ:)—অধিকার-ক্ষমতা ; ভোগ-ক্ষমতা ; ব্যয়করণ-ক্ষমতা ; মালিককে না বলিয়া ব্যয়-করণ বা আত্মসাৎকরণ ; ক্ষতিকরণ ; চুরিকরণ। আরবী "তাসার্‌রুফ্‌" শব্দ হইতে উৎপন্ন।

তজল্লী (আ:)—জ্যোঃতির ঝলক।

তটিনী—নদী।

তদারক (আ:)—পরিদর্শন।

তদারক-নবীস—"নবীস" ফার্সী শব্দ—অর্থ : লিখক ; কার্য-ব্রতী ; "তদারক-নবীস" অর্থ : তদারক বা পরিদর্শন কার্য-ব্রতী ব্যক্তি ; পরিদর্শনপূর্বক তাহার রিপোর্ট বা বিবরণ লিখক।

তন্ত্রীচয়—তারসমূহ ; বীণার তারসমূহ।

তপস্যা—ক্লেশকর সাধনা ; কঠোর সংযমপূর্ণ আরাধনা।

তপঃপ্রভাব—তপস্যা বা কঠিন সাধনালব্ধ আত্মজ্ঞান বা আত্মশক্তি প্রভাব।

তমদ্দুন (আ:)—সংস্কৃতি ; কৃষ্টি ; Culture.

তমিস্র—অন্ধকার।

তরঙ্গ-ভঙ্গ—ঢেউএর খেলা।

তরঙ্গিনী—নদী।

তলবার—তলোয়ার ; তরবারি।

তস্‌লিম (আ:)—সালাম ; প্রণতি। "দেহ কুঞ্চিত ও অবনত করিয়া, দক্ষিণ করের উল্টা দিক মৃত্তিকা স্পর্শ করাইতে হয়। পরে ধীরে ধীরে হাত তুলিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া করতল কপালে স্পর্শ করিতে হয়। বাদশাহ্‌দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনবার তস্‌লিম করিতে হয়।"—আইনে আকবরী।

তস্‌বিহ (আ:)—প্রশংসা ; আল্লাহর প্রশংসা বা নাম জপ ; আল্লাহ্‌র নাম জপের মালা ; Rosary.

তাওয়াফ (আ:)—পরিক্রমণ ; চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ঘুরা।

তাগিদ (আ:)—প্রকৃত বানান : তাকিদ। অর্থ : বারবার চাওয়া বা কিছু করিতে বলা।

তান্‌জাম্‌ (হি:)—অন্য বানান : তাঞ্জাম। বেহারার স্কন্ধে বাহিত কুর্সি বা চেয়ারের আকার খোলা পাল্কি ; Scdon Chair.

তাজ (আ:)—মুকুট।

তাণ্ডব নৃত্য—উন্মাদ নৃত্য ; শিবের নৃত্য বা নাচ।

www.pathagar.com

তামাদি (ফা:)—অন্য বানান "তামাদী"। অর্থ : বাজেয়াপ্ত ; দাবী করিবার নির্ধারিত সময় অতিক্রম।

তামাম (আ:)—সমস্ত।

তামুদ্দুনিক—আরবী 'তমদ্দুন" বা সংস্কৃতি শব্দের বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশেষণ করা হইয়াছে। অর্থ : সাংস্কৃতিক।

তাম্বু—তাঁবু ; বস্ত্রাবাস।

তামিল (আ:)— আরবী "আমল" বা "কার্য" শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থ : (আদেশ) কার্যকরী করা বা প্রতিপালন করা।

তাযীম (আ:)—সম্মান।

তারিফ (আ:)—প্রশংসা ; বাহাদুরী, পরিচয়। অন্য বানান : "তারীফ"।

তালিম (আ:)—শিক্ষা ; উপদেশ।

তিরোভাব—অন্তর্ধান ; অদৃশ্য হওয়া ; মহাপুরুষদের মৃত্যু।

তুঙ্গ—উচ্চ।

তুরাণী—তুরাণ বা মধ্য এসিয়ার তুর্কীস্তান–বাসী।

তুরিতে—ত্বরায় ; শীঘ্র।

তুরী—প্রাচীন হিন্দুদের পিত্তল–নির্মিত রণ–বাদ্য ; রাম–শিঙা।

তুরীয়–সমাধির অবস্থা ; ধ্যানাবস্থা।

তূর্য—ভেঁপু বা শিঙাজাতীয় বাদ্য–যন্ত্র বিশেষ ; তুরী।

তুহার—"তোমার" শব্দের অপভ্রংশ ; মৈথিলী কাব্যে ব্যবহৃত হয়।

তেগ (ফা:)—তলোয়ার।

তোরণ—সিংহদ্বার ;ফটক ; গেট্।

তোশা খানা (ফা:)—ভাণ্ডার–গৃহ ; মূল্যবান জিনিষাদি রাখিবার ঘর।

তোশাদান (ফা:)—গুলি–বারুদ ইত্যাদি রাখিবার থলে বা আধার।

ত্রিপদী—টিপয় বা ত্রিপদ বিশিষ্ট ছোট গোল টুল ; তিন চরণযুক্ত পদ্য।

দ

দয়ার্জন—দয়া ও সারল্য।

দক্ষিণা—ক্রিয়া–কর্মের পর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ইত্যাদির প্রাপ্য অর্থ ; শিক্ষা সমাপ্তির পর গুরুকে দেয় অর্থ।

দরিয়া (ফা:)—সাগর ; নদী।

দশন—দন্ত ; দাঁত।

দস্ত্ (ফা:)—হাত।

দাওয়া—বারান্দা ; রোয়াক।

দাগা (ফা:)—দুঃখ ; মর্মব্যথা।

দাবানল—বনাগ্নি ;"দাব" অর্থ : বন ; "অনল" অর্থ : অগ্নি।

দামাম (ফা:)—দামামা ; জয়ঢাক।

দিগন্ত–বিসর্পী—দিগন্ত বা চক্রবাল রেখা পর্যন্ত বিস্তারিত বা প্রসারিত।

দিগম্বরী—বস্ত্রহীনা ; উলঙ্গিনী।

www.pathagar.com

দিগ্বলয়—দিক-চক্র ; চক্রবাল ; আকাশ এবং মাটি যেখানে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়—তথাকার চক্রাকার রেখা ; Horizon.

দিন-গুযার—দিন অতিবাহন ; দিন কাটানো ; "গুবার" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : অতিবাহন।

দ্বিরুক্তি—দুইবার করিয়া উল্লেখ ; দুইবার উক্তি।

দিন্-দার—ধর্ম-ভীরু, ধর্ম-পরায়ণ ; "দিন" বা "দীন" আরবী শব্দ—অর্থ : ধর্ম ; "দার" ফার্সী শব্দ—অর্থ : ওয়ালা বা অধিকারী।

দিনার—আরবী মুদ্রা বিশেষ।

দিনমণি—সূর্য।

দিবাকর—সূর্য।

দিল্ (ফা:)—অন্য বানান "দীল"। অর্থ : হৃদয়।

দিলাওয়ার (ফা:)—হৃদয়বান ; বীর ; দিল্ বা দীল্ শব্দ হইতে উৎপন্ন।

দীপা—দীপ্তিমান ; উজ্জ্বল ; ভাস্বর।

দু আওরি—দুবার করিয়া।

দুগ্ধ-ফেন-নিভ—দুধের ফেনার ন্যায় (সাদা ও কোমল)।

দ্যুতি—প্রভা ; ঔজ্জ্বল্য।

দুনো—দ্বিগুণ।

দুন্দুভি—দামামা বা ঢাক-জাতীয় প্রাচীন বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।

দুরপনের—দুর্মোচনীয় ; যাহার অপনয়ন দুঃসাধ্য।

দুশমনি (ফা:)—শত্রুতা।

দুষ্কর—দুঃসাধ্য ; দুরন্ত।

দুস্তর—দুর্লঙ্ঘ ; যাহা পার হওয়া দুঃসাধ্য।

দেওদান—দৈত্য-দানব।

দেদার—প্রচুর।

দেদীপ্যমান—অতিশয় দীপ্তিশীল ; জাজ্জ্বল্যমান।

দোয়া (আ:)—প্রার্থনা ; আশীর্বাদ।

দোজখ (ফা:)—প্রকৃত বানান : "দোযখ" ; অর্থ : নরক।

দোর্রা (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ ; দুর্‌রা ; অর্থ ; দীর্ঘ চাবুক। ফার্সী প্রতিশব্দ ; "কোরা"।

দোর্দণ্ড প্রতাপ—প্রবল প্রতাপ ; দণ্ডতুল্য দৃঢ় বাহুর প্রতাপ বা পরাক্রম।

দ্রবীভূত—গলিত।

ন

নর্ক—নরক।

নটিনী-লাচ্ছন—নর্তকীর চিহ্ন অঙ্কিত ; নর্তকীর ন্যায় দক্ষ ; "লাচ্ছন" অর্থ : চিহ্ন ; অঙ্কন ; ধ্বজা ; কলঙ্ক।

নযর (আ:) ....—দৃষ্টি।

নযর (আ:)—...সশ্রদ্ধ উপঢৌকন যেমন—"নযর-নেয়ায্"—"নেয়ায্" ফার্সী শব্দ—অর্থ : সশ্রদ্ধ উপঢৌকন অর্থাৎ আরবী "নযর" শব্দের ফার্সী প্রতিশব্দ। এখানে একই অর্থ বোধক দুই ভাষার দুই শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.pathagar.com

নরেন্দ্র—নর যা মানুষের মধ্যে ইন্দ্র স্বরূপ ; শ্রেষ্ঠ নর ; রাজা ; নরপতি।
নশ্বর—নাশশীল ; অস্থায়ী।
নহর (আ:)—ক্ষুদ্র জল স্রোত ; খাল।
নাকাড়া (আ:)—প্রকৃত বানান : "নাক্করাহ্"। অর্থ : ঢাক বা জয়ঢাক।
নাঙ্গা (ফা:)—উলঙ্গ ; নগ্ন।
নার্গিস-লালা (ফা:)—"নার্গিস" এক প্রকার ফুল এবং "লালা" অন্য এক প্রকার রঙ্গীন ফুল। ফার্সী কাব্যে এই দুইটি ফুলের নাম বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
নান্দী পাঠ—নাটকাদির প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ বা দেবতার সন্তোষর্থে স্তব, স্তুতি ; বন্দনা-গান।
ন্যায়োপেত—ন্যায় উপেত অর্থাৎ ন্যায় সঙ্গত ; ন্যায্য।
নিয়ামত (আ:)—আশীর্বাদ ; দান ; আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ।
নিক্কন—ঝংকার ; ধ্বনি।
নিকেতন—গৃহ।
নিগড়—শিকল ; শৃঙ্খল।
নিগূঢ়—গুপ্ত ; রহস্যময় ; দুর্জ্ঞেয় ; গভীর।
নির্ঘোষ—উচ্চ নিনাদ বা শব্দ।
নিদাঘ—গ্রীষ্ম কাল।
নিরঙ্কুশ—নির্বিঘ্ন ; বাধাহীন ; মুক্ত : স্বাধীন ; অনিবার্য ; স্বেচ্ছাচারী ; অঙ্কুশ-হীন,—হস্তীকে পরিচালিত করিবার জন্য বক্র লৌহ-দণ্ড নির্মিত অস্ত্র বা ডাঙ্গসকে অঙ্কুশ বলা হয়।
নিরঞ্জন—পরমাত্মা ; অবলম্ভক ; নির্মল ; জলে প্রতিমা বিসর্জন।
নির্মাল্য—দেবতাকে নিবেদিত মাল্য পুষ্প ইত্যাদি।
নির্মোক—সাপের খোলস ; বর্ম।
নীড়—পাখীর বাসা ; কুলায়।
নীলাঞ্জন—তু'তে ; রসাঞ্জন।
নীলাম্বু—সমুদ্র।
নীলাম্বর—নীল আকাশ ; নীল সাড়ী বা বসন।
নূর (আ:)—জ্যো:তি।
নৃতত্ত্ব—মানবের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক বিদ্যা ; Anthropology.
নেকাব (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ ; "নকাব্"। অর্থ : স্ত্রীলোকদের মুখাবরণ।
নৈষ্ঠিক—শাস্ত্রে বা ধর্মানুষ্ঠানের অনুরক্তিবান ; নিষ্ঠাযুক্ত ; আচার অনুষ্ঠানের যথাযথ পালনকারী।
নোকর (হি:)—প্রকৃত বানান : নওকর ; অর্থ : চাকর।

প

পংখের কাজ—ঘড়ের মেঝে বা দেওয়ালের উপর চুনের মস্‌ত লেপ।
পক্ষরাজ—পক্ষীর রাজা ; গরুড় পক্ষী ; রূপকথার কাল্পনিক পক্ষ বিশিষ্ট ঘোটক।
পদাতি—"পদাতিক" শব্দের অপভ্রংশ ; পদাতিক সৈন্য।
পয়গাম (ফা:)—সংবাদ।
পয়োধর—স্তন ; মেঘ। "পয়" : শব্দের অর্থ : দুগ্ধ বা জল। যে পয়: ধারণ করে তাহাকে "পয়োধর" বলা হয়।

www.pathagar.com

পবন-পথ—আকাশ।
পরওয়ানা (ফা:)—হুকুম-নামা ; আদেশ-পত্র ; প্রতিবাদীর নামে আদালত হইতে জারি করা হুকুমনামা।
পরশ্রীকাতর—ঈর্ষাযুক্ত ; অন্যের সৌভাগ্য বা উন্নতি দেখিয়া যে কাতর হয়।
পরিব্রাজক—নিত্য ভ্রমণকারী ; পর্যটক ; ভিক্ষু : সন্ন্যাসী।
পর্যঙ্ক—পালঙ্ক।
পল্লব—কচি পাতা।
পল্বল—ডোবা ; বিল।
পলকে-প্রলয়—মুহূর্তের মধ্যে মহাকাণ্ড বা অনত্যপাত বা বিনাশ-সাধন।
পাইক—লাঠিয়াল ; লেঠেল।
পাক (ফা:)—পবিত্র।
পাগ—পাগড়ি।
পাঁজুনী—পাঞজোর ; চরণের অলঙ্কার বিশেষ ; নূপুর।
পাঞ্জা (ফা:)—প্রকৃত বানান : পাঞ্জাহ্। অঙ্গুলি সহ হাতের তালু বা ঐরূপ তালুর ছাপ। 'ফাতেহা-ই-দোয়ায দহম" শীর্ষক কবিতার "তিরোভাব" অংশে "পাঞ্জাহ্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।
পাতশা (ফা:)—বাদ্‌শা শব্দের অপভ্রংশ।
পাদপ—বৃক্ষ ; পদ দ্বারা যে পান করে।
পাদরী (পুর্তগীজ শব্দ)—খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রচারক।
পাদ-পূরণ—কবিতার অবশিষ্ট চরণ দ্বারা শ্লোক সম্পূর্ণ করণ।
পান্থশালা—অতিথিশালা ; মুসাফিরখানা।
পাণ্ডুলিপি—খসড়া ; হাতের লেখা কাগজ বা পুঁথি ;মুদ্রিত পুস্তকাদির আদর্শ ; Manuscript.
পারাবার—সমুদ্র।
পাশব—পশুরতুল্য ; পশু সম্বন্ধীয়।
পীর (ফা:)—শাব্দিক অর্থ : বৃদ্ধলোক। প্রচলিত অর্থ : মুসলমান আধ্যাত্মিক গুরু।
পুঁছ করল—জিজ্ঞাসা করল।
পুচ্ছগ্রাহিতা—অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয়তা।
পুত্তলী—পুতুল।
পুরবাসী—নগরবাসী ; গৃহবাসী ; গৃহস্থ।
পূতি—পচা গন্ধযুক্ত।
পূর্ব-সূরী—পূর্ববর্তী বিদ্বান বা কবি।
পেরেশান (ফা:)—অস্থির ; অধীর।
পৌত্তলিক—প্রতিমা-পূজক।
প্রক্রিয়া—কার্য প্রণালী ; পদ্ধতি ; Process.
প্রক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত ; মূল রচনার ভিতর অন্য কর্তৃক যোজিত।
প্রজ্ঞা—তত্ত্বজ্ঞান।
প্রতীচ্য—পশ্চিম দিকস্থ দেশ ; প্রাচ্য দেশের পশ্চিমস্থ দেশ ; যে দিকে সূর্য অস্তগমন করে সেই দেশ। ["প্রাচ্য" শব্দ দেখ।]
প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব—উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করার ক্ষমতা।

www.pathagar.com

প্রতিবেদক—নিবারক।
প্রত্নতত্ত্ব—পুরাতত্ত্ব ; প্রাচীন ইতিহাস ; Archacology. প্রাচীন যুগের মুদ্রা, লিপি, ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় বিদ্যা।
প্রদোষ-তিমির—সন্ধ্যার অন্ধকার।
প্রবুদ্ধ—জ্ঞান-প্রাপ্ত ; উদ্বুদ্ধ ; জাগ্রত।
প্রভঞ্জন—ঝড়।
প্রমত্ত—অতিশয় মত্ত ; উন্মত্ত।
প্রসক্তি—আসক্তি।
প্রসন্নতা—সন্তুষ্টি ; প্রফুল্লতা।
প্রসূন—ফুল ; পুষ্প।
প্রস্রবন—উৎস ; ঝর্ণা ; নির্ঝর।
প্রলয়-ডম্বুরু—"ডম্বুরু" অর্থ : ডুগ্‌ডুগি ; যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ডম্ ডম্ শব্দ করে। কথিত আছে, প্রলয় বা পৃথিবী ধ্বংসের দিন ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে থাকিবে। প্রলয়-ডম্বুরু দ্বারা ঐ ভয়ঙ্কর শব্দকে বুঝায়। ["আশার-ছলনা" শীর্ষক প্রবন্ধের "প্রলয়-ভেরী" টীকা দ্রষ্টব্য।]
প্রহরণ—অস্ত্র।
প্রাচ্য—পূর্ব দিকস্থ দেশ ; পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল ; ইউরোপের পূর্ব দিকস্থ ভূমণ্ডল।
প্রেমার্ণব—প্রেমের সমুদ্র।
প্রোজ্জ্বল—প্রদীপ্ত ; বিশেষভাবে উজ্জ্বল।

ফ

ফক্কিকার—ফাঁকি।
ফখর (আ:)—অহংকার ; গর্ব
ফতে (আ:)—প্রকৃত বানান "ফতেহ্" অর্থ : জয়।
ফতো—আরবী "ফৌৎ" বা মৃত শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ : অসার।
ফরজন্দ (ফা:)—সন্তান।
ফলার—ফলাহার ; চিঁড়া, দই, দুধ, মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি আহার।
ফাঁপর—দমবন্ধ অবস্থা।
ফিরদৌস (আ:)—সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ।
ফুকরে উঠা—হিন্দী "পুকার" বা "উচ্চ স্বরে ডাকা" শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ : উচ্চ স্বরে ডাকা।
ফুলুস্ রফিক (আ:)—পয়সা (দাও) বন্ধু। "ফুলুস্" অর্থ : পয়সা ; "রফিক" অর্থ : বন্ধু।
ফুল্ল প্রীতি—ফুটন্ত ফুলের মত বিকশিত প্রীতি ; পরিপূর্ণ প্রীতি।
ফেয্—ফেল্ট, বা জমাট পশমের তৈয়ারী তুর্কী টুপি।
ফোকারিয়া—উচ্চস্বরে ডাকিয়া ; "ফুক্‌রে উঠা" শব্দ দ্রষ্টব্য।

ব

বউরূপী—বহুরূপী শব্দের অপভ্রংশ। যে বিভিন্ন পোষাকে বিভিন্ন রূপধারণপূর্বক খেলা দেখায়।
বর্ধিষ্ণু—বৃদ্ধিশীল।
বজ্জাত (ফা:)—দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট ; ধূর্ত। প্রকৃত শব্দ : বদ্-যাত্। "বদ্" অর্থ : খারাব ; "যাত্" অর্থ : মূলবস্তু বা মূল প্রকৃতি। কাজেই "বজ্জাত" বা "বদ্-যাত্" অর্থ : খারাপ বা দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট।

www.pathagar.com

বরকত (আ:)—প্রাচুর্য ; শ্রীবৃদ্ধি ; বৃদ্ধি ; গুণ ; কোন ভাল কিছুর প্রভাবে শ্রীবৃদ্ধি সাধন।
বয়ান (আ:)—বর্ণনা।
বসুধা—পৃথিবী।
বস্তুগত্যা—বস্তুত: ; বাস্তবিক ; প্রকৃতপক্ষে।
বহর—প্রস্থ ; ওসার।
বাগেবাগ্ (ফা:)—আহ্লাদে আটখানা ; অত্যধিক আহ্লাদিত।
বাজ—বজ্র ; পাখী বিশেষ।
বাড়বানল—সমুদ্র গর্ভস্থ অগ্নি।
বাত্ (হি:)—বাক্য ; কথা।
বাতায়ন—জানালা।
বাতুলাশ্রম—পাগলদের বাসস্থান ; পাগলা-গারদ।
বাদ্ (ফা:)—বায়ু।
বাপী—দীঘি ; তড়াগ।
বাবুদক—বাচাল ; বাক্য বাগীশ।
বাযু (ফা:)—বাহু।
বালান—পুস্তকের এক-এক খণ্ড ; Volume ; লেটিন "Bellum" শব্দ হইতে উৎপন্ন।
বারিধি—সাগর।
বাষ্পবারি—বাষ্প-সম্ভুত জল ; হৃদয়ের উচ্ছাস-জনিত বাষ্প-সম্ভুত জল ; চোখের জল।
বিক্রান্ত—মহাবল ; পরাক্রমশালী।
বিগ্রহ—যুদ্ধ ; দেবতার মূর্তি।
বিচে (হি:)—মধ্যে।
বিচ্ছুরিত—বিকীর্ণ ; অনুরঞ্জিত ; অনুলিপ্ত।
বিটপী—বৃক্ষ ; যাহার বিটপ বা শাখা আছে।
বিথার—বিস্তার।
বিধান—বিধি ; ব্যবস্থা ; শাস্ত্র বিহিত নিয়ম।
বিনোদন—তুষ্টি-সাধন।
বিভোর—বিহ্বল ; আত্মহারা।
বিল্‌কুল্ (আ:)—সমুদয় ; সমস্ত ; বেবাক ; নিঃশেষে ; সম্পূর্ণ।
বিশ্ব-কোষ—সার্বভৌম জ্ঞান বা নিখিল শাস্ত্রবিষয়ক অভিধান ;
বিদ্যা-কল্পদ্রুম ; Encyclopaedia.
বিশ্ব-নিন্দুক—যে ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলকেই নিন্দা করে।
বিশ্ব-বিমোহন—পৃথিবী মুগ্ধকারী।
বিশ্লেষণ—পৃথক করণ ; উপাদান-নির্ণয় ; ব্যবচ্ছেদ ; Analysis.
বিষাণ—শিঙা।
বিষাদাকুলিত—দুখে নিমজ্জিত।
বিহঙ্গম, বিহঙ্গ—পাখী ; পক্ষী।
বীজন—ব্যজন ; বাতাস করণ ; চামর, পাখা ইত্যাদি সঞ্চালন ; পাখা, চামরাদি।
বীজ-মন্ত্র—ইষ্ট দেবতার প্রতীক স্বরূপ মন্ত্র ; ইষ্টদেবতার নাম রূপ মূলমন্ত্র ; মূল মন্ত্র।

www.pathagar.com

বুক-ধরাস্—যাহাতে বুক ধড়ফড় করে এমন ত্রাস বা ভীতিযুক্ত।

বুনিয়াদ (আ:)—ভিত্তি।

বুলন্দ দরওয়াজা (ফা:)—সুউচ্চ তোরণ বা সিংহদ্বার। "বুলন্দ" (ফা:) অর্থ : সুউচ্চ ; দরওয়াজা (ফা:) অর্থ : দ্বার; তোরণ।

বৃক—ব্যাঘ্র, বাঘ।

বেইমানী, বেইমানি (ফা:)—বিশ্বাস হীনতা ; "ইমান" আরবী শব্দ, অর্থ : বিশ্বাস "বে" নাস্তি-বাচক ফার্সী উপসর্গ। শব্দের শেষে ফার্সী প্রত্যয় "ই" বা "ঈ" যোগ করিয়া ইহাকে গুণবাচক বিশেষ্যে পরিণত করা হইয়াছে। মূল শব্দ আরবী হইলেও আলোচ্য আকারে ইহার প্রয়োগ ফার্সী ভাষায়।

বেদরদ (ফা:)—নির্মম ; বেদনা-বোধহীন।

বেটা (হি:)—পুত্র।

বেণুকুঞ্জ—বাঁশ বন।

বেহেশত্ (ফা:)—প্রকৃত বানান : "বেহিশ্ত্"। অর্থ : স্বর্গ।

বৈচিত্র্য—চমৎকারিত্ব ; বিচিত্রতা।

বৈতালিক—স্তুতি-পাঠক ; প্রভাত-ফেরী ; যাহারা প্রভাত কালে মঙ্গল-গান গাহিয়া বা স্তুতিপাঠ করিয়া রাজা ও রাণীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করেন।

বৈজয়ন্তী—বিজয় পতাকা।

বোর্ণী—প্রশান্ত মহাসাগরের বোর্ণীও দ্বীপের অধিবাসী।

ব্যঞ্জনী—পাখা ; ব্যজন বা বাতাস করিবার তালবৃন্ত ; চামর।

ব্যাপদেশে—উপলক্ষে।

ব্যাপ্তি—প্রসার ; বিস্তৃতি।

ব্যোম—আকাশ।

ভ

ভাদ্র বধূ—ছোট ভাই-এর স্ত্রী।

ভারতী—বাণী ; বাক্য ; সরস্বতী ; ভাষা ; বচন ; সংবাদ।

ভাস্কর্য—ধাতু প্রস্তরাদি খোদিত করিয়া মূর্তি গঠন শিল্প।

ভাস্বর—দীপ্ত ; আভাময়।

ভাস্কর—সূর্য ; প্রস্তরাদি হইতে মূর্তি ইত্যাদি নির্মাণ কারক।

ভীম বাত—প্রবল ঝঞ্ঝা ; ভীষণ তুফান।

ভূজঙ্গ—সর্প।

ভূমা—সর্বব্যাপী ভগবান ; পরমাত্মা।

ভেরী, ভেরি—জয়ঢাক ; ঢাক।

ভৈরব—ভীষণ ;ভীম ; ভারতীয় সঙ্গীতের ছয় রাগের অন্যতম রাগ।

ভৈরবীর সুর—ভারতীয় সঙ্গীতের ছয় রাগের অন্যতম রাগ "ভৈরব"-এর এক রাগিণীর নাম "ভৈরবী"। সেই ভৈরবী রাগিণীর সুর।

ম

মউজ (আ:)—ঢেউ, তরঙ্গ।

মজলিস (আ:)—সভা ; বৈঠক।

www.pathagar.com

মঞ্জীর—নূপুর ; পায়ের অলঙ্কার বিশেষ।
মদকল—মদমত্ত ;মত্ততাহেতু অস্ফুট শব্দকারী।
মদ—গর্ব ; প্রমত্ততা।
মদন-সখা—বসন্ত।
মন-অঙ্কে—মনের কোলে।
মননশীল—গভীর চিন্তাশীল ; অবিরাম অনুচিন্তনশীল।
মন্‌যুর (আ:)—গৃহীত।
মনীষী—তীক্ষ্নধী ; জ্ঞানী ; পণ্ডিত।
মণ্ডলী—দল ; সন্ন্যাসী দল ; ধর্মীয় দল ; কুণ্ডলী ; পরিধি ; বেষ্টক।
মন্দ্রিত—গভীর ধ্বনিময়।
মন্দানীল—মৃদু বায়ু।
মনিব ওয়ারী—মনিব অনুযায়ী ; মনিব অনুসারে।
মর্ম কৃত্তন—মর্ম ছেদন বা কর্তন।
ময্‌হাব (আ:)—ধর্মপন্থা ; ধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন দল ; ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায়।
ময্‌লুম (আ:)—অত্যাচারিত।
মরণ-ঠাটা—মৃত্যু-বজ্র।
মরীচিকা—সূর্য-কিরণে জল ভ্রম ; মৃগতৃষ্ণিকা ; Mirage.
মশ্‌গুল (ফা:)—বিভোর ; মত্ত।
মস্‌নদ (আ:)—মূল্যবান ফরাশের আসন বা ঢালা আসন ; প্রচলিত অর্থ : সিংহাসন।
মস্ত্‌ (ফা:)—মত্ত।
মহাকাল—চিরন্তন সময় ; রুদ্র শিব ; যম।
মহাভাগ—মহাভাগ্যবান ; দয়াদি সদ্‌গুণ সম্পন্ন।
মহাচক্র—দিগ্বলয়।
মহিম (আ:)—যুদ্ধ। আরবী “মুহিম” বা যুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। বাংলা মহিম শব্দের অর্থ : মহিমা বা গৌরবযুক্ত।
মহী—পৃথিবী।
মাক্‌বেরা, মক্‌বেরা (আ:)—সমাধিস্থান ; সমাধি-সৌধ।
মাদল—ঢোল বিশেষ।
মানস—মন ; চিত্ত ; অভিলাস।
মানস-বৈরাগী—যে মনে-মনে সংসারাশক্তি হইতে নিস্পৃহ।
মামুলী (আ:)—সাধারণ ; প্রচলিত।
মাযার (ফা:)—পূণ্যাত্মা সাধু বক্তির সমাধিস্থান কবর।
মারুত-হিল্লোল—বাতাসের তরঙ্গ।
মালঞ্চ—ফুল-বাগান ; পুষ্পোদ্যান।
মাৎসর্য—পরশ্রীকাতরতা।
মাহ্‌তাব (ফা:)—চন্দ্র।
মিনার (ফা:)—মস্‌জিদের স্তম্ভাকৃতি চূড়া। মস্‌জিদে একটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত মিনার থাকে। পাক-ভারতের বৃহৎ-বৃহৎ মস্‌জিদগুলিতে—যথা দিল্লীর জুমা মস্‌জিদ, লাহোরের শাহী

www.pathagar.com

মস্‌জিদ ইত্যাদিতে চারিটি করিয়া মিনার আছে। মিনারের উপর উঠিয়া সাধারণত: আযান দেওয়া হয়।

মিম্বর (আ:)—ইমাম বা নামাযের পরিচালকের খুৎবা বা অভিভাষণ দানের সময় দাঁড়াইবার জন্য সিঁড়ি বা ধাপওয়ালা উচ্চ স্থান বা বেদী।

মুর্দা (ফা:)—মৃত।

মুনাফিক (আ:)—ভণ্ড।

মুনাজাত (ফা:)—প্রার্থনা ; আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা।

মুয্‌দা (ফা:)—সুসংবাদ : খুশ্‌খবর।

মুরীদ (আ:)—শিষ্য।

মুল্‌তবি (আ:)—স্থগিত। আরবী "ইল্‌তবা" অর্থাৎ "অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া" শব্দ হইতে উৎপন্ন।

মুল্লুক (আ:)—দেশ। প্রকৃত শব্দ : মুল্‌ক্‌।

মুষল ধারায়—মুষল বা মুদ্গরের ন্যায় স্থূল ধারায় ; প্রবল ধারায়।

মৃদুল হিল্লোল—মৃদু ঢেউ ; ক্ষুদ্র তরঙ্গ।

মৃন্ময়—মাটির দ্বারা তৈয়ারী।

মেহের (ফা:)—অনুগ্রহ ; করুণা।

মোক্ষ—ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি ; সর্বপ্রকার সাংসারিক আশক্তি ও বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি।

য

যঈফ্‌ যয়ীফ্‌ (আ:)—বৃদ্ধ ; দুর্বল।

যবনিকা—পর্দা।

যবর (ফা:)—বলশালী ; শক্তিশালী ; প্রতাপশালী ; বৃহৎ : যথা—যবর-দস্ত লোক। ইহার শাব্দিক অর্থ : শক্তিশালী বা প্রতাপশালী হস্ত অর্থাৎ প্রতাপশালী ব্যক্তি। দস্ত্‌ ফার্সী শব্দ ; অর্থ : হস্ত।

যবাতীতে (ফা:)—প্রমুখাৎ ; মুখের কথা দ্বারা "যবান" ফার্সী শব্দ—অর্থ : ভাষা ; কথা ; জিহ্বা।

যষ্টি—লাঠি।

যাজক—যজ্ঞ-সম্পাদক ; যাজ্ঞিক ; পুরোহিত।

যামানা (আ:)—কাল ; যুগ।

যালিম (আ:)—অত্যাচারী।

যারী (ফা:)—ক্রন্দন ; কান্নাকাটি ; যথা—যারী গান।

যিন্‌জীর, যিঞ্জীর (ফা:)—শিকল, শৃঙ্খল।

যিন্দেগী (আ:)—জীবন।

যিন্দেগানী (ফা:)—জীবন-যাত্রা

যিন্দান (ফা:)—কারাগার।

যুথনাথ—বন্য হস্তিদলের নেতৃ-স্থানীয় অগ্রচালক হস্তি।

র

রওযা (আ:)—শাব্দিক অর্থ : বাগান। প্রচলিত অর্থ : পুণ্যাত্মা ব্যক্তির সমাধিস্থান। ফার্সী প্রতিশব্দ : মাযার।

www.pathagar.com

রজত চন্দ্রিকা—রূপার ন্যায় সাদা জ্যোৎস্না।
রজত শুভ্র—রূপার ন্যায় সাদা।
রফিক (আ:)—(সাধারণ) বন্ধু।
রমণীয়—সুন্দর ; মনোহর।
রন্ধ্র—ছিদ্র।
রসনা—জিহ্বা।
রাজ যক্ষ্মা—ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মা রোগের ভীষণতম প্রকরণ।
রাশেদিন্ (আ:)—"রশীদ' বা "রাশেদ" শব্দের বহু বচন। "রশীদ" শব্দের অর্থ "যে ব্যক্তি নিজে সৎপথে চলে এবং অন্যকে সৎপথে চালায়।"
রুদ্র—উগ্র : ভীষণ ; শিব ; শিবের সংহার মূর্তি।
রুহ্ (আ:)—আত্মা।
রেউড়ি—গুড়ের পাক করা মিষ্টান্ন।
রেয়াত (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ ; "রিয়াআৎ"। অর্থ : মাফকরণ ; অব্যাহতি ; রেহাই।
রেহেন, রেহান (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ : "রিহান" অর্থ : বন্ধক ; ঋণের পরিবর্তে কোন জিনিষ ঋণদাতার নিকট গচ্ছিত রাখা।
রোমাঞ্চ—পুলক, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদির হেতু গাত্র-লোম ; খাড়া হওয়া ; গায়ে কাটা দেওয়া।
রোয়ে (হি:)—রোদন করে ; ক্রন্দন করে।
রোরুদ্যমান—ক্রন্দন রত।
রোষোৎপত্তি—ক্রোধ সঞ্চার।
রোশ্‌নি (ফা:)—আলোক। প্রকৃত উচ্চারণ : "রৌশ্‌নি"

ল

ললনা—নারী।
ললাট-ফলক—কপাল ; কপালের অস্থি।
লয় (সঙ্গীতে)—গীত বাদ্য নৃত্যের পরস্পর সংগতি অথবা তালের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ ; Tempo ; বৃহৎ সত্তার সহিত মিলনের ফলে স্বাতন্ত্র্য লোক ; ধ্বংস ; প্রলয়।
লালিত—সযত্নে পালিত।
লিপিকা—পত্র, ছোট পত্র।
লীন—লয়প্রাপ্ত ; মিলিত ; অদৃশ্য ; লুপ্ত ; লগ্ন।
লীলা-কানন—ক্রীড়ার্থ উদ্যান বা উপবন ; খেলার স্থল।
লোকান্তর গমন—পরলোকগমন ; মৃত্যু।
লোকারণ্য—বহু লোকের সমাগম ; লোকের অরণ্য বা বন স্বরূপ।

শ

শকুন্ত-লাবণ্য—পাখী বা শকুনের কান্তি বা সৌন্দর্য।
শতদল—পদ্মফুল।
শতরঞ্জ খেলা—দাবা খেলা। আরবী "শতরঞ্জ" শব্দের অপভ্রংশ।
শম্‌শের, শম্‌শির (ফা:)—তরবারি।
শর্বরী—রাত্রি।
শশধর—চন্দ্র ; শশক অর্থাৎ খড়গোশ-চিহ্ন ধারণকারী ; খড়গোশাকৃতি কাল দাগ ধারণকারী।

www.pathagar.com

শশাঙ্ক—চন্দ্র ; শশক অঙ্কে বা কোলে যার।
শশী—চন্দ্র।
শহদ (ফা:)—মিষ্ট ; মধু।
শান্-শওকত (আ:)—জাক্‌জমক ; মহা আড়ম্বর।
শাবক—বাচ্চা ; ছানা।
শার্দুল—ব্যাঘ্র ; বাঘ।
শারদীয়—শরৎকালীন।
শারীর—শরীর সম্বন্ধীয় : শারীরিক।
শাহান্‌শাহ্ (ফা:)—রাজার রাজা ; সম্রাট।
শামিয়ানা (ফা:)—প্রকৃত বানান : সামিয়ানা ; অর্থ : সমতল ছাদ বিশিষ্ট তাঁবু ; চাঁদোয়া ; চন্দ্রাতপ।
শাশ্বত—চিরন্তন।
[illegible]—প্রশংসনীয় ; আত্মগৌরবজনক।
[illegible]—নূপুর ইত্যাদির গুঞ্জন বা শব্দ।
[illegible]ত্রাণ—পাগড়ি।
শুক্ল—সাদা ; ধবল ; শুভ্র ; শ্বেত।
শুক্লাম্বর—সাদা কাপড়।
শূচি বাই—শূচিতা বা পবিত্রতা রক্ষার জন্য পাগলামী ; শূচিতা রক্ষার বাতিক।
শুভ্র—সাদা।
শৈবাল—শেওলা।
শৈল—পর্বত ; শিলা সম্বন্ধীয়।
শোনিত—রক্ত।
শোর আওয়াজ (ফা:)—উচ্চ শব্দ ; বিরাট বিপুল ধ্বনি।
শোষ হৃদে—শুষ্ক হৃদয়ে।
শ্বাপদ-সঙ্কুল—আক্রমণকারী পশু সমাকীর্ণ ; "শ্বাপদ" অর্থ : কুকুরের ন্যায় পদ বিশিষ্ট ; শীকারী বা আক্রমণকারী এবং মাংসাশী পশু। "সঙ্কুল" অর্থ : সমাকীর্ণ ; পূর্ণ।

স

সওগাত (ফা:)—উপহার
সওয়ার (ফা:)—আরোহী।
সঞ্জীবনী—প্রাণ সঞ্চারকারী।
সত্যধ্বজী—সত্যের ধ্বজা বা নিশানধারী ; লোক দেখানো সত্যপরায়ণতা বিশিষ্ট।
সত্তা—অস্তিত্ব ; বিদ্যামানতা ; নিত্যতা।
সঞ্চালনী শক্তি—পরিচালনকারী শক্তি।
সন্দেশবহ্—বার্তা বা সংবাদ বহনকারী।
সন্ধ—সন্ধেহ।
সন্ধ্যা-আহ্নিক—সন্ধ্যাকালীন বন্দনা বা দেবার্চনা।
সন্তর্পন—সম্যক তৃপ্তিদান বা তোষণ।
সফর (আ:)—ভ্রমণ ; বিদেশ-যাত্রা।
সফেন—ফেনার সহিত ; ফেনাযুক্ত।
সবিক্রম—পরাক্রমের সহিত ; বলের সহিত ; প্রতাপের সহিত।

www.pathagar.com

সমন-ওয়ারিন—সমন ও ওয়ারেন্ট ; আদালতে হাযীর হইবার নির্দেশ-পত্র এবং গ্রেফতারী পর্‌ওনা।
সমাহার—সংগ্রহ ; সমূহ ; সংক্ষেপ।
সমীর—বাতাস।
সমীরণ—বাতাস।
সরণী—পথ।
সরসী—সরোবর ; পুষ্করিণী।
সর-যমীন (ফা:)—প্রকৃত বানান : "সরে-যমীন"। অর্থ : ঘটনা স্থল ; অকুস্থল ; ভূ-পৃষ্ঠ ; কোন ব্যাপার সংক্রান্ত স্থান।
সল্‌মা—শল্ক বা আঁশের আকৃতি বিশিষ্ট সোনালী রূপালী ক্ষুদ্র পাত।
সলিল—জল ; পানি।
সস্মিত—সহাস্য ; মৃদু হাসিযুক্ত।
স্বখাত সলিল—আপন হাতে খনিত জল।
স্বর্গীয় দূতগণ—ফেরেশ্‌তাগণ।
সাই—স্বামী ; প্রভূ।
সাইমুম (আ:)—প্রকৃত বানান : "সিমুম"। অর্থ : উত্তর আফ্রিকা ও আরবের মরুভূমিতে প্রবাহিত এক প্রকার উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাবায়ু।
সাকী (আ:)—যে পানি পান করায় ; প্রচলিত অর্থ : মদ্য পরিবেশিকা নারী।
সাগর-বেলা—সমুদ্রের তট বা তীর।
সামন্ত—অধীন রাজা ; মুখ্য প্রজা।
সামান (ফা:)—জিনিষ-পত্র ; সাজ-সরঞ্জাম।
সারঙ—অন্য বানান : সারঙ্গ। অর্থ : সঙ্গীতের সুর বিশেষ ; বেহালা-জাতীয় বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।
সারস্বত—সরস্বতী বা বিদ্যা সম্বন্ধীয় ; ব্রাহ্মণের শ্রেণী।
সিকতাময়—বালুকাময়।
সিভিলিয়ান—বে-সামরিক শাসনকার্য (Civil Administration) পরিচালনার জন্য নিযুক্ত উচ্চতম রাজকর্মচারী।
সিপিতে—ঝিনুকে।
সুকর—সুসাধ্য
সুর্খী (ফা:)—লালিমা ; রক্তিমা ; "সুর্খ" অর্থাৎ লাল বা রক্তবর্ণ শব্দ হইতে উৎপন্ন।
সুধাকর—চন্দ্র।
সুপ্রভাত—সকাল বেলাকার অভিবাদন ; ইংরাজী Good Morning শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ।
সুমেরু—উত্তর মেরু ; চির বরফাচ্ছন্ন পৃথিবীর সর্বোত্তম প্রান্ত।
সুরৎ (আ:)—চেহারা ; আকৃতি।
সুরভিত—সুবাসিত ; সুগন্ধযুক্ত।
সুরাখ (ফা:)—ছিদ্র।
সুশীলতা—সচ্চরিত্রতা।
সুষমা—অতিশয় শোভা ; লাবণ্য।
সেতারা (ফা:)—তারকা ; তারা।
সেলামত, সালামত (আ:)—শান্তি ; মঙ্গল।
সৈকত—নদী বা সমুদ্রের বালুকাময় তট বা তীর।

www.pathagar.com

সোসর—সদৃশ ; তুল্য।
সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।
সৌধ—(সুধা-ধবলিত বা চুনকাম করা) প্রাসাদ।
সৌম্য—শান্ত ; মনোজ্ঞ ; প্রিয়-দর্শন।
সৌরোত্তাপ—সূর্যের উত্তাপ।
স্পন্দিত—মৃদু কম্পিত।
স্বাগত-সম্ভাষণ—শুভাগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনা-বাক্য ; Welcome ; কুশল-প্রশ্ন।
স্থাপত্য-শিল্প—সোধ-শিল্প, গৃহ প্রাসাদাদি নির্মাণ সম্বন্ধীয় বিদ্যা বা বিজ্ঞান।
স্পন্দমান—স্পন্দিত ; মৃদু কম্পিত।

হ

হযম (আ:)—পরিপাক।
হদ্দমুদ্দ—আরবী "হদ্" এবং "মদ্" এই দুই মিলিত শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ : শেষ সীমা, বড় জোর।
হর্ম্য—প্রাসাদ ; অট্টালিকা।
হর্ম্যরাজি—প্রাসাদসমূহ ; অট্টালিকাসমূহ।
হরিৎ—সবুজ।
হর্যক্ষ—সিংহ।
হলকর্ষণ—লাঙ্গল দ্বারা চাষ।
হলাহল—তীব্র বিষ।
হর্ষ-বিকম্পিত—আনন্দে কম্পিত।
হাজা-মজা—কাদা জলে পচিয়া যাওয়া এবং বুজা বা ভরাট হওয়া।
হাবিব, হাবীব (আ:)— অন্তরঙ্গ বন্ধু।
হাম্মাম (আ:)—স্নানাগার।
হায়দর (আ:)—সিংহ।
হাযির (আ:)—উপস্থিতি।
হাযিরানে-মজলিস (ফা:)—সভা বা বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।
হারাম (আ:)—নিষিদ্ধ।
হারাম-যাদা (ফা:)—"হারাম" আরবী শব্দ ; অর্থ : নিষিদ্ধ ; "যাদা" ফার্সী শব্দ : অর্থ : উদ্ভূত বা জন্ম-গৃহীত ; "হারাম-যাদা" অর্থ : নিষিদ্ধ বা অবৈধভাবে জন্মগৃহীত সন্তান বা জারজ সন্তান।
হাল আমল (আ:)—বর্তমান কাল।
হালি—নৌকার হাল।
হিম্মৎ (আ:)—সাহস ; বীর্য।
হিল্লোল—তরঙ্গ ; দোলন।
হিল্লে—আরবী "হিলা" বা উপলক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ : কাহারো দায়িত্বে সমর্পণ ; উপায় ; ব্যবস্থা।
হুতাশন—অগ্নি।
হেক্মত, হিক্মত (আ:)—কৌশল ; বিজ্ঞান ; চাতুর্য।
হেজায্—আরবের একটি প্রদেশ—এখানেই মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফ অবস্থিত।
হেমকান্ত—সোনার কান্তি বা বর্ণ বিশিষ্ট।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অক্ষয়কুমার বড়াল

(১৮৬০-১৯১৯)

কলকাতায় চোরাবাগানে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণ-বণিক্ সম্প্রদায়ে কবির জন্ম হয়। পরবর্তী কৃষি ব্যাংক ও জীবন-বীমা কোম্পানীর অফিসে কেরাণীর কাজ করিতেন। কাব্য-সাহিত্যের সেবাই জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গীতিকবিদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও তার বড়াল স্বকীয় মৌলিকতায় বিশিষ্ট করুণ রসের উৎসার—আত্মতন্ময় ভাব-বিহ্বলতা, মিতভাষিতা তাঁর বর্ণনা প্রভৃতিতে বাংলা-ভাষায় একরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। "প্রদীপ" .."শঙ্খ", "ভুল", এবং "এযা"ই তাঁহার কাব্যগ্রন্থ ; তন্মধ্যে "এযা"ই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইহার তাঁহার কবি-খ্যাতি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আজহারুল ইসলাম

(জন্ম ১৯১১ খৃষ্টাব্দ)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে ইহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে ইনি বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া কিছুকাল তিনি কিশোরগঞ্জে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী থাকেন। বর্তমানে ইনি পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদক। ইনি "রুবাইয়াৎ-ই সাইফ উদ্দীন বাখারজী" ......ফার্সী হইতে বাংলায় কাব্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার রচিত "মনিরার বিরাগ" নামক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতি ও ইসলামের বিভিন্ন বিশ্ব-জনিন দিকই ইহার কবিতার বিষয়বস্তু। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার বহু বই ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে এবং এগুলি সাহিত্য-রসিক সুধী সমাজের যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে। ইহার কাব্যে বাহুল্যবর্জিত এক শান্ত-মধুর রসের আমেজ পাওয়া যায়।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

(১৮৬৯-১৯৫৩)

চট্টগ্রাম,পাটিয়ার সূচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। তিনি সংস্কৃত সহ এন্ট্রেস পাশ করিয়া সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হন। স্বনামখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার লেখায় এই

www.pathagar.com

পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ফৌজদারী আদালতে একটি কেরানীর চাকুরী দেন। অল্পদিন কাজ করিয়া তিনি এই কাজ ত্যাগ করেন এবং শিক্ষা বিভাগীয় স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টারের আফিসে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ লাভ করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নানা লোক মারফত প্রায় ২,৫০০ (আড়াই হাজার) প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাহার মধ্যে সহস্রাধিক পুঁথি বাংলার মুসলমানদের দ্বারা প্রাচীন বাংলার মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য–সাধনার প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ এত বড় সংগ্রহ আজ কোন কোন লোক বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান করিতে পারেন নাই। ইহাই সাহিত্য–বিশারদ সাহেবের জীবনের ....।

ইহা ব্যতীত তদসম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার "গোরক্ষ বিজয়", রতিদেবের "মৃগলুব্ধ", আলীরাজার ...প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। চট্টগ্রামের পণ্ডিত–সমাজ তাঁহাকে সাহিত্য বিশারদ" ও নদীয়ার পণ্ডিত–মণ্ডলী "সাহিত্য–সাগর" উপাধি দান করেন। ১৯৫৩ সালের ৩০শে .....তিনি পরলোকগমন করেন।

আবদুল কাদির
(জন্ম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ)

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত আড়াইসিধা গ্রামে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি দীর্ঘদিন কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সমস্ত কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহার ভাষা গ্রাম্যতাদোষ–মুক্ত ও বিশুদ্ধ এবং প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ। "দিলরুবা" নামে তাঁহার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি "জয়তী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদন করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের প্রচার বিভাগের পূর্ব–পাকিস্তান শাখার আঞ্চলিক প্রচার বিভাগীয় অফিসার এবং উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা "মাহে নও" নামক পত্রিকার সম্পাদক।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন
(জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মোমেনশাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে কলিকাতা রিপন কলেজে বি–এ পরীক্ষা দিবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া পরীক্ষা দানে বিরত হন এবং "গৌড়ীয় সর্ব–বিদ্যায়াতন" নামক তদসময়-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া বি–এ পাশ করেন। ইহার পরেই তিনি "দৈনিক মোহাম্মদী" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করিয়া সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। পরে তিনি যথাক্রমে "সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ", ইংরাজী "দি মুসলমান", "সাপ্তাহিক খাদেম", "দৈনিক সোলতান", "সাপ্তাহিক মোহাম্মদী" ও "মাসিক মোহাম্মদীর" সম্পাদকীয় বিভাগে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। বর্তমানে তিনি "দৈনিক আজাদ" পত্রিকার

www.pathagar.com

প্রধান সম্পাদক। ছাত্র জীবন হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। তখন হইতেই তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে "কচি–পাতা", "ত্রিস্রোতা" ও "অনাবাদী জমি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবুল ফজল
(জন্ম ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)

ইনি চট্টগ্রাম জেলার কেওচিয়া গ্রামে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এ এবং বি–টি পাশ করিয়া শিক্ষকতাজীবনে প্রবেশ করেন এবং গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন স্কুল–মাদ্রাসায় প্রায় দশ বৎসর কাজ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাইভেট ছাত্ররূপে বাংলা ভাষায় এম–এ, পাশ করেন এবং কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলায় অধ্যাপক পদ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে উক্ত পদে নিয়োজিত আছেন। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "চৌচির", "মাটির পৃথিবী", "বিচিত্র কথা", "সাহসিকতা", "প্রদীপ ও পতঙ্গ", "কায়েদে আযম", "প্রগতি", "জীবন পথের যাত্রী" এবং "কোরানের বাণী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবুল মনসুর আহমদ
(জন্ম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)

আবুল মনসুর আহমদ মোমেনশাহী জেলার ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র–জীবনেই তাঁহার সাহিত্য–সাধনা শুরু হয়। ঐ সময় "আল–ইসলাম", "সওগাত", "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–পত্রিকা" প্রভৃতি সাময়িক কাগজে তাঁহার বহু গল্প ও প্রবন্ধ ছাপা হয়। বি–এ পাশ করার পরই তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সাংবাদিকতা অবলম্বন করিয়া পরপর "সোলতান", "মোহাম্মদী", "খাদেম" ও "দি মুসলমানে"র সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৯২৯ সালে মোমেনশাহী জজ কোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরে ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরপর "দৈনিক কৃষক", "নবযুগ" ও "ইত্তেহাদে"র সম্পাদকরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

আবুল মনসুর সাহেব শুধু সাহিত্যিক ও সাংবাদিকই নহেন, তিনি একজন সুপরিচিত রাজনীতিবিদও বটেন। তবে তাঁর রাজনীতিক সাধনা ও শক্তিশালী কলম প্রধানতঃ বাংলার কৃষক–প্রজাদের মুক্তি–আন্দোলনেই নিয়োজিত। এই জন্যই আবুল মনসুর সাহেবের সাহিত্য জীবন–মুখী ও ভাষা গণ–মুখী। বস্তুতঃ এই দুইটিই তাঁর সাহিত্য সাধনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ব্যঙ্গ রচনায় তিনি বিশেষ সিদ্ধহস্ত এবং এ ক্ষেত্রে তিনি বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

www.pathagar.com

তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে "আয়না" ও "ফুড কন্‌ফারেন্স" নামক ব্যঙ্গ রচনা, "সত্য মিথ্যা" নামক উপন্যাস এবং "ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া" ও "মুসলমানী কথা" নামক শিশুপাঠ্য বই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। "সওগাতে" ধারবাহিকরূপে প্রকাশিত তাঁহার "জীবন ক্ষুধা" নামক উপন্যাসটিও বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

আশরাফ আলি খাঁ

(১৯০১-১৯৩৯)

(যশোহর জেলার আল্‌ফাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত পানাইল গ্রামে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আশরাফ আলী খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু বি-এ পাশ করিবার পূর্বেই খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় তিনি কলেজ ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া যান এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন।

অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গেলে তিনি অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া কলিকাতা ইনকামট্যাক্স আফিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ চাকুরিতে থাকাকালিনই "বেদূঈন" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং "বেদূঈনে"র কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরই সরকারী চাকুরিতে ইস্তাফা দেন। অর্থ সংকটে "বেদূঈন" বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর তিনি ক্রমান্বয়ে "সাপ্তাহিক রক্ত-কেতু" এবং "দৈনিক সোলতান" পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক "ভোরের কুহু" নামক গজল গানের বইটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাহার এক বন্ধুর আর্থিক সাহায্যে "বেদূঈন" পত্রিকাটি তিনি পুনঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর "বেদূঈন" পুনরায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি কঠোর অর্থসংকটে পতিত হন এবং এই সংকটের ভিতরই তাহার বিখ্যাত কবিতা-পুস্তক "শেকোয়া" ও "কঙ্কাল" রচিত হয়। "শেকোয়া" ইকবালের অমর উর্দুকাব্য "শেকোয়া"র কাব্যানুবাদ। অনুবাদ হইলেও ইহা মূল বানান সৌন্দর্য ও ছন্দ বেগ হারায় নাই। ইহাকে মূল রচনা বলিয়াই মনে হয়।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের অসহভার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে অহিফেন সেবন করিয়া কলিকাতায় আত্মহত্যা করেন।

আহ্‌সান হাবীব

(জন্ম ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)

কবি আহ্‌সান হাবীবের জন্ম ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। বরিশাল জেলার শংকর পাশা গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। শিক্ষা সমাপ্তির পর সাহিত্যসাধনার দৃঢ়সংকল্প লইয়া ইনি কলিকাতায় আসেন এবং পরপর কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকরূপেও কাজ করেন।

অতঃপর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "অল ইন্ডিয়া রেডিও"র কলিকাতা কেন্দ্রে লেখক, বক্তা এবং অনুষ্ঠান পরিচালকরূপে চাকরী গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে ইনি ঢাকায় বাস করিতেছেন এবং "দৈনিক ইত্তেহাদের" সাহিত্য–সাময়িকীর সম্পাদকরূপে কাজ করিতেছেন। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহিতও ইনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ইনি কিশোর বয়সেই বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় কবিতা ও গল্প লিখিতে শুরু করেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই পাঠক ও সমালোচক মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। বর্তমানে ইনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের অন্যতম খ্যাতিমান কবি। শিশুসাহিত্য সৃষ্টিতেও ইহার বিশিষ্ট দান আছে।

ছন্দের নৈপুণ্য, শব্দযোযনার সুসংগতি এবং সংযত ও পরিমার্জিত ভাষা ইহার কবিতার বৈশিষ্ট্য। "রাত্রি শেষ" এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

ইব্রাহিম খাঁ

(জন্ম ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ)

মোমেনশাহী জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার শাবাজনগরে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি বহুদিন করটিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং সেজন্য এখনও "প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ" নামেই ইনি জনসাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। ইহা ছাড়া ইনি ইতিপূর্বে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য, পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য এবং পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতির আসনও অলংকৃত করিয়াছেন। তিনি আজীবন সাহিত্যানুরাগী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা জীবন সাহিত্য–সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার "কামাল পাশা" ও "আনোয়ার পাশা" নামক নাটকদ্বয় প্রকাশিত হইলে তৎকালে বাংলার তরুণ মুসলিম সমাজে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার রচিত "সোনার শিকল", "লক্ষীছাড়া", "মনিষী মজলিস", "হীরক হার", "কাফেলা", "বাবর", "সালাহ্উদ্দীন", "তুর্কী উপকথা", "ঋণ–পরিশোধ", "ভিস্তি বাদশা", "জঙ্গী জীবন", "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র" প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ এবং "এনেক্‌ডোট্‌স্ ফ্রম্ ইসলাম" নামক ইংরাজী গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০–১৮৯১)

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। প্রথমে সংস্কৃত ও পরে ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া ইনি বহু সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। ইনি পণ্ডিত সমাজ–কর্তৃক পাণ্ডিত্যের জন্য "বিদ্যাসাগর" এবং জনসাধারণ কর্তৃক বদান্যতার জন্য "দয়ার সাগর" উপাধিতে বিভূষিত হন। একাধারে মহাপণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ–সংস্কারক ও খ্যাতনামা লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ ইহার ভাগ্যেই সমধিক ঘটিয়া ছিল। চাকুরি জীবনে তিনি সর্বপ্রথম ফোর্টউইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ক্রমে নিজের যোগ্যতা দ্বারা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য–পদ–বাচ্য প্রথম বাংলা

www.pathagar.com

গদ্য-রচয়িতা। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃতবহুল। "বেতাল পঞ্চবিংশতি", "শকুন্তলা", "সীতার বনবাস", "ভ্রান্তি বিলাস" প্রভৃতি নানা গ্রন্থে তাঁহার রচনা-শৈলী বিদ্যমান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(১৮১২-১৮৫৯)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিস্থানীয় কবি। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, চব্বিশ-পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়স হইতে তিনি মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন এবং যৌবনে তিনি কবিওয়ালাদের সখের ও পেশাদারী দলের গান বাঁধিয়া দিতেন। তিনি "পাষণ্ডপীড়ন", "সাধুরঞ্জন", "সংবাদ রত্নমালা" প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পত্রিকা "সংবাদ প্রভাকর" তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি "প্রবোধ্ প্রভাকর" ও "হিত প্রভাকর" নামক দুইখানি কবিতা পুস্তক এবং "শকুন্তলা", "বোধেন্দু বিকাশ" ও "কলিনাটক" নামক কয়েকটি নাটক রচনা করেন। মোটের উপর কবিওয়ালা, কবি, সম্পাদক ও নাট্যকার হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহার কবিতায় কোন কল্পনা বিলাস দেখা যায় না বটে, তবে তিনি জাতিকে হাস্যরস পরিবেশন এবং দারুণ বিদ্রূপের কশাঘাত প্রদান করিয়াছেন। বাস্তব চিত্র অঙ্কনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

এয়াকুব আলী চৌধুরী

(১৮৮৭-১৯৩৮)

ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রামে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্ম হয়। তিনি আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া মুসলমান সাহিত্য-জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য তীক্ষ্নসংলাপ, অকাট্য যুক্তিবাদ ও ভাবপ্রবণতার মিশ্রণে অপূর্ব ও মনোরম। তিনি রক্ষণশীল চিন্তাধারার পরিপন্থী ছিলেন। এইজন্য নিছক সত্য কথাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার লিখিত "নূরনবী", "মানবমুকুট" ও "শান্তিধারা" বাংলা সাহিত্যের অমূল্য অবদান। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এস, ওয়াজেদ আলী

(১৮৯০-১৯৫১)

হুগলী জেলার বড় তাজপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী বংশে ওয়াজেদ আলী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলীগড়ে শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংলন্ড গমন করেন এবং ১৯১৫ সালে ব্যরিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ওয়াজেদ আলী আলীগড়ে শিক্ষা লাভের ফলে বাংলা ভাষা ভাল জানিতেন না। কিন্তু ব্যারিষ্টার হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদানের পর ব্যারিষ্টার ও বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ

www.pathagar.com

চৌধুরীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ঐ সময় প্রমথ চৌধুরী "বীরবল" এই ছদ্ম নামে "সবুজপত্রে"র মারফত বাংলা-সাহিত্য-আসরকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীই ওয়াজেদ আলীকে বাংলা ভাষা শিখান এবং "সবুজপত্রে", "অতীতের বোঝা" নামক ওয়াজেদ আলীর প্রথম বাংলা-রচনা প্রকাশ করিয়া তাঁর সুপ্ত সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে রসিক সমাজের পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার পর বিভিন্ন কাগজে তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধ, গল্প, কথিকা, নাটক ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ছোট বড় বইএর সংখ্যা কুড়িটি। তন্মধ্যে "দরবেশের দোয়া", "মাশুকের দরবার", "গ্রানাডার শেষ বীর", "বাদশাহী গল্প", "ইরান-তুরানের গল্প", "গল্পের মজলিস", "সুলতান সালাদিন", "জীবনের শিল্প", "ভবিষ্যতের বাঙ্গালী", "মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ", "আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা", "সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান", ইব্‌নে খল্‌দুনের সমাজ-বিজ্ঞান", "ইসলামের ইতিহাস", "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" এবং "একবালের পয়গাম" বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তিনি কলিকাতা হইতে "গুলিস্তা" নামক একটি মাসিক পত্রিকাও বাহির করেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল আইন ব্যবসায় করার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন এবং বহু বৎসর ঐ পদে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প পূর্বে ঐ কার্যে ইস্তফা প্রদান করেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাজী আকরম হোসেন

(জন্ম ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)

কাজী আকরম হোসেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত পায়গ্রাম কসবায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার ইঙ্গ-ফার্সী বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সুদীর্ঘকাল বেসরকারী ও সরকারী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। "ইসলামের ইতিহাস", "নওরোজ", "আমরা বাঙালী", "পথের বাঁশী", "পল্লীবাণী", "যুগবাণী", "মুক্তিবাণী", "মসনভী রুমী" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

কাজী ইমদাদুল হক

(১৮৮২-১৯২৬)

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ কাজী ইমদাদুল হক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার গদাইপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল ময়মনসিংহ জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কাজ করিয়া কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে বদলী হন। জীবনের শেষাংশে তিনি ঢাকার "বোর্ড অব ইন্টার-মিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশনের" সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত

www.pathagar.com

ছিলেন। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া বালকদের শিক্ষার পথ সুগম করেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনাও কম ছিল না। "প্রবন্ধ-মালা", "নবী-কাহিনী" এবং "আব্দুল্লাহ্" নামক উপন্যাস লিখিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অক্লান্ত সাহিত্য-সেবা ও সরকারী কার্যের গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

কাজী কাদের নেওয়াজ

(জন্ম ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)

মুর্শিদাবাদ জেলায় মাতুলালয়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট গ্রাম। বহরমপুর কলেজ হইতে বি-এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ও বি-টি পাশ করিয়া তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করেন এবং বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে উক্ত কার্যেই নিযুক্ত আছেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা চর্চা আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। "মরাল" নামে তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কাজী নজরুল ইসলাম

(জন্ম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে (১৩০৬ বাংলার ১১ই জ্যৈষ্ঠ) কবি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তিনি "বাঙালী-পল্টন" ভুক্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করেন ; তখন তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প। স্বীয় কর্ম ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে তিনি সামান্য সৈনিক হইতে অচিরে "হাবিলদার" পদ লাভ করেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি "মোসলেম ভারত" নামক মাসিকপত্রে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করিতে থাকেন। ছন্দ বৈচিত্রে ভরপুর ও অপূর্ব কবিত্বময় এই কবিতাগুলি তাঁহাকে বাংলার শিক্ষিত সমাজে একজন অলোক-সামান্য প্রতিভাবান কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করে।

এই কবি চিরদিন কর্মে ও চিন্তায় স্বাধীন এবং দাসত্বের বন্ধন-মুক্তি ও প্রাচীন সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার কামনায় উন্মাদ। এই কারণেই তিনি সাধারণতঃ "বিদ্রোহী কবি" আখ্যায় চিহ্নিত হন। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি, সুরশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক এবং ভাবপ্রবণ গাল্পিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলার আর কোন কবি এতগুলি গুণের অধিকারী নহেন। তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় কবি বলিয়া তাঁহার কাব্যে বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি এখন নিতান্তই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং দারুণ অর্থ-সংকটের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। পশ্চিম-বাংলা সরকার ও পূর্ব-বাংলা সরকার মাসিক সাহিত্যিক

www.pathagar.com

বৃত্তি দিয়া তাঁহার এই অর্থ কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছেন। তিনি অসংখ্য গানের রচয়িতা। এতদ্ব্যতীত "অগ্নিবাণী", "দোলন চাঁপা", "ফণিমনসা", "ছায়ানট", "সর্বহারা", "চিত্তনামা", "সিন্ধু-হিন্দোল", "চক্রবাক", "বুলবুল", "জিঞ্জীর", "ঝিঙেফুল", "সন্ধ্যা", "চোখের চাতক", "চন্দ্রবিন্দু", বিষের বাশী", "হাফিজ", "নতুন চাঁদ" প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ ; "ব্যাথার দান", ও "রিক্তের বেদন" নামক গদ্য-কাব্যময় গল্প-গ্রন্থ, "মৃত্যুক্ষুধা", "বাঁধনহারা" ও "কুহেলিকা" নামক উপন্যাস এবং "আলেয়া" ও "ঝিলিমিলি", "সেতুবন্ধ" ও "পুতুলের বিয়ে" নামক নাটক লিখিয়া তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এক নূতন রূপ দান করিয়াছেন।

কাজী মোতাহার হোসেন

(জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯২১ সাল হইতে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বা সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics) বিভাগের অধ্যক্ষ। কয়েক বৎসর হইল ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংখ্যাতত্ত্বে "ডক্টরেট" পাইয়াছেন। শুধু বিজ্ঞান সাধনায়ই তিনি বিরাট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে। সুদীর্ঘকাল যাবত বিবিধ সাহিত্য সাধনায় তাঁহার অর্জিত গৌরবও কম নহে। "সওগাত", "বুলবুল" ও "বর্ষবাণীতে" তাঁহার লেখা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার "সঞ্চয়ন" নামক রচনা-সংগ্রহ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। ভাষার সরলতা মতের মৌলিকতা ও মত প্রকাশের সাহসিকতা ইহার রচনার বৈশিষ্ট্য বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামক প্রগতি পন্থী বিখ্যাত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র স্বরূপ "শিখা" নামক পত্রিকারও সম্পাদনা তিনি করিয়াছেন। বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক শিক্ষা ও সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছেন।

কায়কোবাদ

(১৮৫৯-১৯৫১)

ঢাকা জিলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রবীন্দ্রনাথ হইতে তিন বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহার মন প্রধানতঃ গীতি প্রবণ হইলেও মহাকাব্য রচনায় তাঁহার ক্ষমতা প্রভূত। "মহাশ্মশান" নামক মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অমর অবদান। এতদ্ব্যতীত "অশ্রুমালা" ও "অমিয়-ধারা" নামক দুইটি গীতি-কবিতার পুস্তক এবং "শিব-মন্দির" নামক আর একখানি মহাকাব্যও ইনি রচনা করিয়াছেন। ইনি যখন বাংলা-সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, কুষ্টিয়ার মীর মোশারফ হোসেন এবং মোমেনশাহীর মৌলভী রেয়াজুদ্দিন

www.pathagar.com

ব্যতীত আর কোন মুসলমান লেখক বাংলায় ছিল না। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ছন্দের মুক্ত-গতিতে এবং কবিত্বের সকল প্রকাশ ভঙ্গিতে ইহার কবিতা ও কাব্য মধুর ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

কালিদাস রায়

(জন্ম ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ)

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতার মিত্র ইন্‌স্‌টিটিউশনের একজন সহকারী শিক্ষক এবং আধুনিক কবিদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সম্ভবতঃ বংশগত সংস্কারের ফলে কবির কবিতাগুলি বৈষ্ণব ভাব মাধুর্যে পেলব ও মধুর। "পর্ণপুট", "ঋতুমঙ্গল", "কিশলয়", "বল্লরী" প্রভৃতি বহু কাব্য লিখিয়া তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

কালী প্রসন্ন ঘোষ

(১৮৪৩-১৯১১)

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামে কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সংস্কৃত-টোলে পড়িয়া পরে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যাবধি অক্লান্ত সাধনায় তিনি ইংরেজী সংস্কৃত, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই কালীপ্রসন্ন অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ভাওয়াল রাজষ্টেটের ম্যানেজারের কাজ গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সম্পাদিত "বান্ধব" পত্রিকা বঙ্কিম সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনের" প্রায় সমকক্ষ ছিল। কালীপ্রসন্ন ঢাকার "সারস্বত সমাজ" হইতে "বিদ্যাসাগর" এবং গভর্নমেন্ট হইতে "রায় বাহাদুর" ও "সি, আই, ই", উপাধি লাভ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি, তন্মধ্যে "প্রভাত-চিন্তা", "নিভৃত-চিন্তা", "নিশীথ-চিন্তা", "ভ্রান্তি বিনোদ", "সঙ্গীত মঞ্জুরী", "ছায়াদর্শন", "সমাজ-শোধনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

(১৮৩৭-১৯০৫)

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে এক বৈদ্যবংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, বাংলা ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। যশোহর জেলা-স্কুলে কবি হেডপণ্ডিত পদেও কিছুদিন কাজ করেন। তিনি বহুদিন বিখ্যাত "ঢাকা-প্রকাশের" সম্পাদক ছিলেন। "সদ্ভাব-শতক" তাঁহার কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই কাব্যটির

www.pathagar.com

নীতিমূলক অপূর্ব কবিতাগুলি কবিকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছেন। পারস্য কবি হাফিয ও সা'দীর ভাব গাম্ভীর্যে কাব্যখানি প্রকৃতই মধুর। কবি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন

(জন্ম ১৯০১ খৃষ্টাব্দ)

ইনি ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চারিগ্রামে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া কৈশোরেই তিনি কলিকাতায় গমন করেন এবং সেখানে শ্রমিকের কাজে ভর্তি হন। জ্ঞানার্জনের উদগ্র আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে তিনি নিজ চেষ্টায় শ্রমিকের কাজের সাথে সাথে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর তিনি কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা এবং সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন তিনি "মুসলিম জগৎ" ও "সাম্যবাদী"র সম্পাদক ছিলেন। "মোহাম্মদী", "সওগাত", "সত্যাগ্রহী" প্রভৃতি পত্রিকার সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "মুসলিম জগতে"র সম্পাদক থাকাকালে "বিদ্রোহ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তাঁহার কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঐ সময় হুগলী জেলে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। শিশু-সাহিত্য রচনায়ও ইনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে "আমাদের নবী", "মুসলিম বীরাঙ্গনা", "খুলাফা-ই-রাশেদিন","সোনার পাকিস্তান", 'রংমশাল" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বহু পাঠ্য-পুস্তকেরও ইনি গ্রন্থকার।

গোলাম মোস্তাফা

(জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

যশোহর জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠা কবিদের মধ্যে ইনি একজন। ইনি পদ্য ও গদ্য লেখায় সুদক্ষ এবং নূতন ছন্দ প্রবর্তনে বিশেষ মনোযোগী। সঙ্গীত রচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। তিনি সম্প্রতি ইসলামী সঙ্গীত ও পাকিস্তানী গীতিকা রচনায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার "রক্তরাগ", "খোশরোজ", "হাস্নাহানা", "সাহারা", "কাব্য কাহিনী" প্রভৃতি কবিতা পুস্তক, "ভাঙ্গাবুক", "রূপের নেশা" প্রভৃতি উপন্যাস এবং "বিশ্বনবী", "ইসলাম ও কমিউনিজম্‌" প্রভৃতি গ্রন্থ সুধী-সমাজে আদৃত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১৮৫৫-১৯১৮)

ইনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের বিখ্যাত কবি এবং তাঁহার কালে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে বাংলা ১২৬১ সালে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) ইনি জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। তাঁহার সমসাময়িক আধুনিক কবিগণের তুলনায় গোবিন্দ দাস তেমন শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার রচনায় আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট এবং ভাষায় ও কল্পনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও আছে। তাহার কল্পনার প্রসার বড় অল্প ছিল—কিন্তু ভাবের একাগ্রতা বা অনুভূতির তীব্রতা কিছু অধিক ছিল। তিনি যে সত্যকার স্বভাব কবি ছিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ—তাঁহার জীবন ; সামাজিক বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাবে এবং অতিশয় উদ্দাম ভাবপ্রবণ হওয়ায় তিনি জীবনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন—শুধু শোকতাপ ও দারিদ্র্য দুঃখই নয়, তাঁহাকে দারুণ উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রধান—"কুঙ্কুম", "কস্তুরী", "প্রেম ও ফুল", "বৈজয়ন্তী"।

জগদীশচন্দ্র বসু

(১৮৫৮–১৯৪০)

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি–এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গমনপূর্বক ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বি–এস–সি" উপাধি লাভ করেন। ইহার পর দেশে ফিরিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। তাঁহার প্রধান আবিষ্কার বৃক্ষলতাদির প্রাণ–স্পন্দনানুভূতি। এজন্য তিনি নানাপ্রকার নূতন নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। মার্কনি যখন ইউরোপে বেতার টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন, সেই সময়ে জগদীশচন্দ্রও তাহার মূলসূত্র আবিষ্কার করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় স্ব–প্রতিষ্ঠিত "বসু বিজ্ঞান–মন্দিরে" সাধনায় নিরত ছিলেন।

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আবাল্য বন্ধু। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সুগভীর ছিল। বহু মাসিকপত্রে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। "অব্যক্ত" নামক গ্রন্থে তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

জসীমউদ্‌দীন

(জন্ম ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)

ফরিদপুর জেলার "তাম্বুল খানা" নামক গ্রামে কবি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় এম–এ পাশ করিয়া বহুদিন পল্লী–গীতিকা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অধ্যাপক পদে অনেক দিন কাজ করেন। বর্তমানে তিনি পূর্ব–বাংলা গভর্নমেন্টের প্রচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

কবি মনে প্রাণে পল্লী–দরদী। এইজন্য পল্লী–জীবনের সুখ–দুঃখের চিত্র তাঁহার লেখনীতে যেমন অপূর্ব মধুর হইয়া ফুটিয়াছে, তেমনটি আর দেখা যায় না। বাংলার পল্লী–

www.pathagar.com

সাহিত্যে তাঁহার অবদান তুলনাবিহীন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে "নক্‌সী কাথার মাঠ", "রাখালী", "বালুচর", "ধানখেত", "সোজন বাদিয়ার ঘাট", "হাসু", "রঙ্গিলা নায়ের মাঝি", "এক পয়সার বাঁশী" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। "নক্‌সী কাথার মাঠ" পুস্তকখানি জেমস মিলফোর্ড কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

তালিম হোসেন

(জন্ম ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ)

ইংরাজী ১৯১৮ সালে রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার চাকরাইল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী, করটিয়া ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়া শেষোক্ত কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। বিভাগ পূর্বকালে ইনি কিছু সময়ের জন্য "মাসিক মোহাম্মদী"র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে "মাসিক মাহে-নও" এর সম্পাদক বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইনি সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। আদর্শ মুসলিম মানসের সঙ্গে বর্তমান যুগ ও সমাজ-চেতনা এই কবির কাব্যকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়াছে। এ-যুগে ইসলামী রেনেসাঁর প্রতীক পাকিস্তান-আন্দোলনে ইহার সাহিত্যিক অবদান উল্লেখযোগ্য। ইনিই পাকিস্তান সম্পর্কে প্রথম কবিতা ও গান রচনা করেন।

ইনি কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, ব্যঙ্গ রচনা ও শিশু-সাহিত্য রচনায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণতঃ "সিন্দবাদ" এই ছদ্মনামে ইহার গদ্য ও ব্যঙ্গ রচনাসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দীনেশচন্দ্র সেন

(১৮৬৬-১৯৩৮)

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার বগজুড়ি গ্রামে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বংগভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ গবেষণার পরিচয় লাভ করিয়া স্যার আশুতোষ তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডি-লিট" উপাধীতেও বিভূষিত করেন। তাঁহার "ফুল্লরা", বেহুলা", "সতী", "জড়ভরত", "রামায়ণী-কথা" প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। "ময়মনসিংহ গীতিকা", "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া তিনি বিদেশ হইতেও খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার History of Bengali Language and Literature. Folk literature of Bengal. Chaitanya and his Companions. Bengali Prose Style প্রভৃতি বহু ইংরেজী গ্রন্থও বিখ্যাত। এইরূপ বহুপ্রকারে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া তিনি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বেহালাস্থ (কলিকাতায়) ভবনে পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১৮৬২-১৯১৩)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাধারণতঃ ডি. এল. রায় নামে খ্যাত। ইহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র লাল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এম–এ পাশ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি কিছুদিন সেটেল্‌মেন্ট অফিসারের কার্য করিয়া পরে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

দ্বিজেন্দ্র লাল বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম। ইনি নানা দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও আজীবন সাহিত্য–সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত বহু সংগীত ও প্রবন্ধ “ভারতী”, “নব্যভারত”, “প্রভা”, “প্রবাসী” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি সঙ্গীতের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া বাংলার সঙ্গীতকে এক অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র লালের “চন্দ্রগুপ্ত”, “সাজাহান”, “পরপারে” “মেবার পতন”, “রাণা প্রতাপ”, “সিংহল বিজয়” প্রভৃতি নাটক বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে, নাট্যালয়ে এবং সুধী সমাজে চিরকাল আদর লাভ করিবে। “মন্ত্র”, “সীতা”, “পাষাণী”, “হাসির গান”, “আলেয়া” ও “আষাঢ়ে” তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

নবীনচন্দ্র সেন

(১৮৪৬-১৯০৯)

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোপীমোহন সেন মুন্সেফ ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে বি–এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন এবং বৃদ্ধ বয়সে চট্টগ্রামেই অবসর জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯০৯ সালে চট্টগ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং স্বগ্রামে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

“পলাশীর যুদ্ধ” নামক কাব্যখানি বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অমর অবদান। প্রধানতঃ এই কাব্যের জন্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ–কবিখ্যাতি থাকিলেও “রঙ্গমতী”, “কুরুক্ষেত্র”, “প্রভাস”, “অমিতাভ”, “রৈবতক”, “অবকাশ–রঞ্জিনী”, “ভানুমতী”, “প্রবাসের পত্র”, “আমার জীবন” প্রভৃতি বহু কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহার রচনা একদিকে যেমন সরল ও মধুর, অন্যদিকে তেমন কবি প্রাণের স্ফুরণে উদ্দীপ্ত।

নুরুল মোমেন

(জন্ম ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে, যশোহর জেলার বুড়োইচ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি–এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি–এল পাশ করিয়া

www.pathagar.com

কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। বর্তমানে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ইনি উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে লন্ডনে ছিলেন এবং শেষের দিকে লন্ডনের পাকিস্তান হাইকমিশনে এডুকেশন অফিসার হিসাবে কার্য করেন। ইনি বৃটিশ রেডিও বি. বি. সি. হইতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিশু বিভাগ "দাদাভাই" নামে পরিচালনা করিতেন। ইহার সর্বপ্রথম লেখা নাটক "রূপান্তর" বাংলা ১৩৫১ সালে শারদীয়া আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে। ইহার অনতিকাল পরে "নেমেসিস" নাটক প্রকাশিত হইয়া ইহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এরূপ স্বীকৃত হয় যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক সজনীকান্ত দাস বলেন, ".......সার্থক শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এতদূর গভীর অনুভূতি বাংলা সাহিত্যে দেখিনি।" শুধু ইহাই নহে, তিনি ইংরাজীতে দুইখানি নাটক লিখিয়া মঞ্চস্থ করেন এবং উভয় নাটকই ইংরাজ দর্শক ও অন্যান্যের নিকট হইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রাপ্ত হয়। যদিও নাটক দ্বারাই ইহার লেখার সূচনা হয়, তবুও গল্প, শিশুদিগের কবিতা এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধও উনি লেখেন। এবং তাঁহার প্রত্যেক বিভাগের লেখাই অন্তর্নিহিত হাস্যরসে সার্থকভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্যরসিক জনের সাদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। এই পুস্তকে সঙ্কলিত "নর সুন্দর" তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলির একটি।

প্যারিচাঁদ মিত্র

(১৮১৪-১৮৮৩)

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলায় ইহার জন্ম হয়। ইনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাংলা, ফার্সী ও ইংরেজীতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদনা করিয়া তিনি বঙ্গভাষার সেবায় সচেষ্ট হন। বাংলা ভাষায় কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষা চালাইবার প্রথম প্রচেষ্টা তাঁহারই। এই ভাষায় রচিত "আলালের ঘরের দুলাল" তাঁহার অমর কীর্তি। এতদ্ব্যতীত "রমারঞ্জিকা", "মদ খাওয়া বড় দায়", "জাত থাকার কি উপায়", "আধ্যাত্মিকা", "অভেদী", "কৃষিপাঠ", স্বীতাঙ্কুর", 'যৎকিঞ্চিৎ", "ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত", "বামা তোষিণী" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বেভারেণ্ড লর্ড, ইহাকে বাংলা Dickens বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকই ঔপন্যাসিক সুলভ অনেক গুণ তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রমথ চৌধুরী

(১৮৬৮-১৯৪৪)

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জমিদার বংশে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান যশোর। শৈশব ও বাল্যজীবন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরেই অতিবাহিত হয়। এজন্য তিনি কথ্য-বাংলার সুন্দর ভঙ্গী ও বাক্‌চাতুরী যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনি সহজাত প্রতিভার-বলে সেই ভাষায় তিনি নিজের অতিশয় মার্জিত রসিকতা নানা চিন্তার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল রচনায় তিনি "বীরবল" এই

www.pathagar.com

ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভাষার ঐ ভঙ্গীকে "বীরবলী ভঙ্গী" বলা হইয়া থাকে। প্রমথ চৌধুরী অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং কতকগুলি গল্পও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্যে কথ্যভাষার অন্যতম পথ প্রদর্শক। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অনুগামী। তাঁহার "নানাকথা", "চার-ইয়ারী কথা", "বীরবলের হালখাতা" এবং "নীললোহিত" প্রভৃতি গদ্য রচনা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তিনি "সনেট পঞ্চাশৎ" নামে একখানি কবিতাগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন—তাহারও ভাষায়, ভাবে এবং ছন্দে তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গী বজায় আছে। "সবুজপত্র" নামক বিখ্যাত মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিয়াও তিনি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাষাবিদ-পণ্ডিত ও ব্যরিষ্টার ছিলেন। তাঁহার সমগ্র কর্মজীবন কলিকাতায়ই অতিবাহিত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ফররুখ আহ্‌মদ

(জন্ম ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ)

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলায় মাঝ-আইল গ্রামের সৈয়দ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর রাজনীতি ও কৃষ্টিক্ষেত্রে ইনি পাকিস্তান ও রেনেসাঁ আন্দোলনে যোগ দেন। মুসলিম ঐতিহ্য, তাহ্‌যীব ও তমদ্দুনের অনুপ্রেরণাকে প্রাণ-দীপ্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাহার মধ্যে প্রচুর দেখা যায়। রোমান্টিক কাব্য, গান, শিশুপাঠ্য ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনাতেও ইনি সমান পারদর্শী। "হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী" এই ছদ্মনামে ইনি অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম-মুনীরা" নামক কাব্যগ্রন্থ বাংলার কাব্যরসিকদের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে ইনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে লেখক ও শিক্ষা-বিষয়ক কার্যসূচীর পরিচালক হিসাবে কাজ করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮-১৮৯৪)

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি-এ। বি-এ পাশ করিয়াই তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন এবং অতীব দক্ষতার সহিত রাজকার্য করিয়া প্রথমে "রায় বাহাদুর" ও পরে "সি. আই.ই." উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিকচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস "দূর্গেশনন্দিনী" রচিত হয়। গদ্য-সাহিত্যে ইহা যুগান্তর আনয়ন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের "দূর্গেশনন্দিনী", "কপাল-কুণ্ডলা", "মৃণালিনী" প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাসের ভাষা সংস্কৃতবহুল। "বিষবৃক্ষ", "চন্দ্রশেখর", "যুগলাঙ্গুরীয়" প্রভৃতিতে সংস্কৃতের প্রভাব কম পরিলক্ষিত হয়। "ইন্দিরা", "রজনী", "রাধারাণী", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "রাজসিংহ", "আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী", "সীতারাম", "কমলা-কান্তের দপ্তর" প্রভৃতিতে তাঁহার নিজস্ব ভাষা-রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

বন্দে আলী মিয়া

(জন্ম ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ)

ইনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইনি কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। প্রধানতঃ ইনি এবং কবি জসীম উদ্‌দীনই পল্লী-কবিতাকে বাংলার সাহিত্য-আসরে চিরস্থায়ী মর্যাদাবান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পল্লী-কবিতা রচনায় ইনি বোধহয় জসীম উদ্‌দীনেরও পূর্বসুরী। ইহা ছাড়া, গল্প, নাটিকা প্রভৃতি রচনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার "ময়নামতীর চর" ও "অনুরাগ" প্রভৃতি কাব্য বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। বহু শিশুপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছেন।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

(১৮৩৫-১৮৯৪)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা নামক পল্লীতে ইহার জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বাল্যবধি কবিতা রচনার প্রতি তাঁহার প্রবণতা ছিল। তাঁহার "সারদা মঙ্গল" একটি অপূর্ব মধুর গীত-কাব্য। ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের ভাব-শিষ্য বলা হয়। "বঙ্গ-সুন্দরী", "নিসর্গ-সুন্দরী", "সাধের আসন", "বন্ধু-বিয়োগ", "মায়াদেবী", "প্রেম-প্রবাহিণী" প্রভৃতি বহু কাব্য লিখিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের গীতি-কবিতার নূতন সুর, নূতন ভঙ্গী ও আদর্শ বিহারীলালই প্রবর্তন করেন। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

(১৮৮০-১৯৩২)

রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের "সাবের পরিবার" নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইংরাজীতে ইহার সংক্ষিপ্ত নাম "মিসেস আর. এস. হোসেন"। এই নামেই ইনি বিশেষ পরিচিতা। ইনি কোনদিন কোন স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করেন নাই। পারিবারিক শিক্ষার সাহায্যে ইনি বাংলা এবং ইংরাজীতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইহার স্বামী মি: সাখাওয়াৎ হোসেন বিহারের অধিবাসী এবং উচ্চ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি কলিকাতায় মুসলমান মেয়েদের জন্য "সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" নামক একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সারা জীবন তাহা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে "আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন" নামে এক মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইনি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইনি যখন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তখন কোন মুসলমান মহিলা এদিকে আকৃষ্ট

www.pathagar.com

হন নাই। "মতিচূর", "সুলতানার স্বপ্ন", "অবরোধ কাহিনী" প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ বাংলা গ্রন্থ। ইংরাজী রচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। "Sultana's Dream" বা "সুলতানার স্বপ্ন" তাঁহার রচিত ইংরাজী গ্রন্থ। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

বেগম শামসুন্নাহার

(জন্ম ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)

ইনি পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ মরহুম আবদুল আজিজ বি-এ'র দৌহিত্রী। নোয়াখালি শহরে ইহার পৈত্রিক নিবাস অবস্থিত হইলেও, ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববাংলার যে কয়টি মুসলিম পরিবার সর্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষার, বিশেষ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার মর্যাদা বুঝিয়া ছিলেন, বেগম নাহারদের পরিবার তন্মধ্যে একটি। ইনি কলিকাতায় "লেডী রেবোর্ণ" মহিলা কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপিকা ছিলেন।

বাংলার বহু নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেগম শামসুন্নাহারের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি কয়েকবারই বাংলার হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের পক্ষ হইতে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন ও নিখিল ভারত মহিলা সংস্থানের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

ইনি একজন সুলেখিকা হিসাবেও বাংলার সাহিত্য জগতে সুপরিচিতা। তিনি তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার সহ কয়েক বৎসর "বুলবুল" নামক একখানি উন্নত ধরনের সাহিত্যিক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার "রোকেয়া জীবনী", "পুণ্যময়ী", "ফুল বাগিচা", "বেগম মহল" ও "শিশু শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে।

বেগম সুফিয়া কামাল

(জন্ম ১৯১১ খৃষ্টাব্দ)

বেগম সুফিয়া কামাল বাকেরগঞ্জ জেলার শায়েস্তাবাদ পরগণায় মাতামহ নওয়াব সৈয়দ মুয়াজ্জম হুসেন চৌধুরীর গৃহে খৃষ্টীয় ১৯১১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ত্রিপুরা জেলাবাসী মরহুম সৈয়দ আবদুল বারী, বি-এল। এ সম্ভ্রান্ত পরিবারের অভ্যন্তরে বাংলাভাষা শিক্ষার প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু সুফিয়া গোপনে খেলার সাথীদের সহায়তায় অক্ষর জ্ঞান সমাপ্ত করিয়া পুঁথি সাহিত্য হইতে ক্রমশঃ আধুনিক সাহিত্যের দ্বারপ্রান্তে পদার্পণ করেন। এগার বৎসর বয়সে জ্ঞাতিভ্রাতা সৈয়দ নেহার হোসেনের সাথে বিবাহের ফলে তিনি পড়াশোনা ও কবিতা চর্চার অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহাকে বৈধব্য বরণ করিতে হয়। ইহার পর তাঁহার জীবন সংগ্রাম এত তীব্র হইয়া উঠে যে বৃদ্ধা মাতা ও শিশু সন্তানকে লইয়া জীবিকা সংস্থানের জন্য তাঁহাকে কলিকাতা কর্পোরেশন-এর অধীনে শিক্ষায়িত্রীর কার্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সাধনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। ১৯৩৯ সালে তিনি চট্টগ্রামে মি: কামালউদ্দীনের সাথে পরিণীতা হন। তাঁহার কবিতা ও অন্যান্য লেখা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার একটি গল্প বই "কেয়ার কাঁটা" ও দুইটি কবিতার বই "সাঁঝের মায়া" ও "মায়া-কাজল" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কবি শাহাদাৎ হোসেনের সমধর্মী একজন রবীন্দ্র অনুসারী কবি।

www.pathagar.com

বে-নজীর আহমদ

(জন্ম ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)

ইনি ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধানুয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস উক্ত মহকুমার অন্তর্গত ইলমদী গ্রামে। ইনি ১৯২১ সালে খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন, দেশ ও জাতির সেবাই ইহার জীবনের আদর্শ বলিয়া ইনি বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলের লোক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে যোগদান করিয়া মুসলিম লীগের বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে রেনেসাঁ-কর্মীদের ইনি অন্যতম। ১৯২৭ সালে ইনি "নওরোজ" নামক একটি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। দৈনিক "আজাদের" সম্পাদকীয় বিভাগে ইনি দীর্ঘদিন কাজ করেন এবং "দৈনিক নবযুগ" পত্রিকারও ইনি বার্তা-সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার "বন্দীর বাঁশী" ও "বৈশাখী" নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বাংলার যুদ্ধোত্তর যুগের সাহিত্য-রসিকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে "রবীন্দ্র-প্রয়াণে" নামক যে কবিতা তিনি লিখিয়া ছিলেন, তাহা আধুনিক বাংলা ভাষার একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বলিয়া সমাদৃত। "ইসলাম ও কমুনিজম" নামে তাঁহার একটি গদ্য-গ্রন্থও সুধী-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার বহু কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

(১৮৩৪-১৯১০)

আনুমানিক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই দেওয়ান বংশ ফার্সী-ভাষা চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে বাংলা ও ফার্সী এই দুই ভাষা শিক্ষা করেন। পরে তিনি সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করেন এবং বহুদিন পর্যন্ত মোমেনশাহী জেলা স্কুলে পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় তিনি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন এবং চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হিসাবে তিনি "ভাই" বলিয়া অভিহিত হন এবং তাঁহার নামের সঙ্গে ইহা যুক্ত হয়। তিনি ৪২ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ যাইয়া একজন বিজ্ঞ মওলবী সাহেবের নিকট আরবী ও ফার্সী ভাষা বিশেষভাবে চর্চা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় "কুরআন" ও "হাদিসের"র অনুবাদ করেন। ফার্সী হইতেও কয়েকটি পুস্তক তাঁহার দ্বারা অনূদিত হয়। ইসলাম সম্পর্কীয় তাঁহার রচিত ও অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা কুড়ির অধিক হইবে। তন্মধ্যে ১। কুরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ), ২। হাদিস (বঙ্গানুবাদ) ১০ খণ্ড, ৩। মহালিপি, ৪। ধর্মসাধন নীতি, ৫। চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী, ৬। ধর্ম বন্ধুর প্রতি কর্তব্য, ৭। মহাপুরুষ মুহম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম, ৮। তত্ত্ব সন্দর্ভমালা, ৯। এমাম হাসেন ও

www.pathagar.com

হুসাইনের জীবনী, ১০। চারিজন ধর্মনেতা, ১১। হাফেয (বঙ্গানুবাদ), ১২। হিতোপখ্যান মালা, ১ম ভাগ (গোলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ), ১৩। হিতোপখ্যান মালা, দ্বিতীয় ভাগ (বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ), ১৪। নীতমালা (কিমিয়া-ই-সাযাদৎ হইতে সংকলিত), ১৫। তাপসমালা, ৬ খণ্ড (তায্‌কেরাতুল্‌ আওলিয়া হইতে সংকলিত), ১৬। তত্ত্ব-রত্ন মালা (মওলানা রুমী হইতে সংকলিত), ১৭। মহাপুরুষ ১ম ভাগ, ১৮। দরবেশী এবং ১৯। তত্ত্ব-কুসুম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৭৬ বৎসরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্র রায়
(১৭১১-১৭৫৯)

ইনি নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। "রায়-গুণাকর" ইহার উপাধি ছিল। ইনি হুগলী জেলার পেড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের "রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ইনি চতুর্থ পুত্র ছিলেন এবং বর্ধমানাধিপতির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া অতি অল্প বয়সে গৃহ ও স্বগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে "অন্নদা-মঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪৮ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। "মানসিংহ" ও "সত্যনারায়ণের পাঁচালী" নামক ইহার আরও দুইখানি কাব্য আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কবি বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অপূর্ব শব্দবিন্যাস ও ছন্দের মহিমায় ইনি অদ্বিতীয়।

মনিরুজ্‌জামান ইসলামাবাদী
(১৮৭৪-১৯৫০)

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীনপন্থী (Old Scheme) মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি আজীবন বাংলা ভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথমে "সাপ্তাহিক সোলতান" এবং পরে "দৈনিক সোলতান" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। তিনি "আল ইসলাম" মাসিক পত্রিকায় ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি "ভারতে মুসলমান সভ্যতা", "ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান", "খগোল শাস্ত্রে মুসলমান", "আওরঙ্গজেব" প্রভৃতি অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিখেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

মহিউদ্দীন
(জন্ম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ)

ইহার জন্ম ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে। জন্মস্থান ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খরিয়া খালপাড়া গ্রাম। বর্তমানে ইনি জন্মস্থান হইতে অর্ধমাইল দূরে বাগ্‌রা গ্রামে বাস

www.pathagar.com

করিতেছেন। বংশগত নাম বান্দা-ই-রব্বুল-আলা মহীউদ্দীন চৌধুরী। এই নাম অত্যধিক দীর্ঘ বলিয়া কবি নিজেকে কেবল মহীউদ্দীন নামে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। শৈশবে পিতৃহারা হইয়া অতি অল্প বয়সে কলিকাতা চলিয়া যান এবং স্কুল-কলেজের দুয়ারে ধর্ণা না দিয়া সেখানে বিদ্বান ব্যক্তিদের ও পুস্তাকাগারের সহায়তায় নিজ চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি অবিভক্ত-ভারতের শ্রমিক-আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে পাকিস্তানের শ্রমিক-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দেশ-সেবায় নিরত আছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : "পথের গান", "স্বপ্ন-সংঘাত-যুদ্ধ-বিপ্লব", "জনসাধারণ", "আণ্ডার দি শ্যাডো অব্ এন্ এনার্কিক ওয়ার্লড" (তাহার কতিপয় বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ) এবং "গরীবের পাঁচালী", উপন্যাস : "মহামানবের মহাজাগরণ", "নতুন সূর্য", "নির্যাতিত মানবতার নামে", "আলোর পিপাসা", "দুর্ভিক্ষ", "শিল্পির স্বপ্ন", "শাদি মোবারক" ; গল্পগ্রন্থ : "নিরুদ্দেশের যাত্রী", প্রবন্ধ : "নবভারত", "নতুন সমাজ", "চিঠি" এবং নাটক : "রক্তাক্ত পৃথিবী"।

তিনি গদ্য ও কবিতা এই উভয় রচনাতেই যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাব ও সুর বলিষ্ঠ ও ঋজু এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে স্বকীয়তা বিদ্যমান।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

যশোর জেলায় সাগরদাড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। কবি প্রথমে হিন্দু কলেজে এবং পরে বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ গমন করিয়া তিনি তথায় জীবিকার্জনের জন্য কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এইখানেই তিনি হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন এবং ইংরেজীতে কবিতা রচনা ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন ; এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মাত্র চার বৎসরের মধ্যে মহাকাব্য, কবিতা ও নাটক লিখিয়া বাংলা ভাষায় নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাংলা কাব্য জগতে শুধু পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবর্তনার অগ্রদূত নহেন, একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক ; অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক ; চতুর্দশ পদী কবিতার প্রথম লেখক ; নূতন ভাষা, নূতন ছন্দ, নূতন কল্পনার স্রষ্টা। ইংরেজী রচনায়ও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ এবং "কেপটিভ্ লেডী" নামক ইংরেজী কাব্য তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার সূচিত করিতেছে। "তিলোত্তমা-সম্ভব", "মেঘনাদ বধ", "বীরঙ্গনা" প্রভৃতি কাব্য এবং "শর্মিষ্ঠা", "কৃষ্ণকুমারী", "পদ্মাবতী" প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

মাহবুব-আল-আলাম

(জন্ম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)

ইনি চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদ গ্রামে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি সৈনিকরূপে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে যোগদান করিয়া মেসোপোটোমিয়া বা ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে

তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বাংলা সরকারের অধীনে সাব–রেজিষ্ট্রাররূপে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ "ইন্‌সপেক্টর অব রেজিষ্ট্রেশন অফিসেস্" পদে উন্নীত হইয়া ১৯৫৩ সালে সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সাধনা ও মনিষার যোগে ইহার সাহিত্য–সৃষ্টি বাংলা ভাষাকে নিঃসন্দেহরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও রস–রচনাতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে "পল্টন জীবনের স্মৃতি", "মোমেনের জবান বন্দী", "তাজিয়া", "পঞ্চ অন্ন" ও "আলাপ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ও শ্রীযুত অন্নদা শঙ্কর রায়ের পত্রালাপের সমষ্টি

মীর মোশার্‌রফ হোসেন

(১৮৪৮–১৯১১)

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার লাহিড়ীপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। ইনি মোমেনশাহী জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দিলদুয়ার নিবাসী যমীদার গজনভী সাহেবদের ম্যানেজার ছিলেন। এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইনিই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সার্থক সাধক ও স্রষ্টা। ইহার "বসন্তকুমারী", "জমিদার দর্পণ", "এর উপায় কি" নামক নাটক এক সময়ে মুসলিম সমাজে বিশেষ সাহিত্যিক প্রেরণা যোগায়। "বিষাদ সিন্ধু" ইহার অমর সৃষ্টি। এই পুস্তকটি বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। "গাজী মিয়ার বোস্তানী" এবং "ইসলামের জয়" নামক আরও দুইখানি পুস্তক লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মুজীবুর রহমান খাঁ

(জন্ম ১৯১০ খৃষ্টাব্দ)

মোমেনশাহী জেলার উলুয়াটি গ্রামে ইনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মোমেনশাহী কলেজ হইতে বি–এ পাশ করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই ইহার নানা প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার লেখার বিষয়বস্তু সাধারণতঃ দেশ–বিদেশের সাহিত্য, সাহিত্য–সমালোচনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। "দৈনিক আজাদে"র যুগ্ম–সম্পাদক ও "মাসিক মোহাম্মদী"র সম্পাদক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অধুনালুপ্ত ইংরাজী "সাপ্তাহিক কম্‌রেডের"ও তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত "পাকিস্তান", "বিলাতে প্রথম ভারতবাসী" পূর্ব পাকিস্তান", (ইংরাজী) প্রভৃতি পুস্তক সুধী সমাজের সমাদর লাভ করিয়াছে। পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে থাকিয়া যাঁহারা চিন্তার সাহায্যে লড়াই করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার স্থান অন্যতম।

www.pathagar.com

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
(জন্ম ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ)

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই তিনি পল্লী-গীতি সংগ্রহ করিয়া "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে থাকেন। "হারামণি" (তিন খণ্ড), "শিরণী", "ধানের মঞ্জুরী", "পয়লা জুলাই", "আগর বাতি", "মুস্কিল আসান", "আওরঙ্গজেব্", "মেঘ ও রৌদ্র" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

১৯৫২ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের "ডেলিগেট্‌রূপে আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সম্মেলনে লন্ডনে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত সরকারী কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা কলেজে বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
(জন্ম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ)

ইনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই, ২৪ পরগণার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পীরের সেবাইতরূপে তাঁহার পূর্ব পুরুষ বাদশাহী আমলে সমস্ত গ্রামটি ও অন্যান্য সম্পত্তি নিষ্করররূপে প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯১০ সালে কলিকাতার সিটী কলেজ হইতে সংস্কৃতে বি-এ অনার্স পাশ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু কতিপয় পণ্ডিত তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে অস্বীকৃত হওয়ায় ভাষাতত্ত্বে এম-এ পড়িয়া পাশ করেন। তিনি প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Docteur de Punivcrsite de Paris ডিগ্রী ও Phonctics এর ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবী, হিব্রু, ফার্সী, আবেস্তান, তিব্বতি, ফরাসী, জার্মান, হিন্দী, উর্দু, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি বহুভাষার সহিত পরিচিত। তিনি "দীওয়ান-ই-হাফেয", "রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম", "শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ" প্রভৃতি পুস্তকের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি "ভাষা ও সাহিত্য", "রকমারী" প্রভৃতি পুস্তকের লেখক। বহুদিন পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যক্ষ।

মোজাম্মেল হক
(১৮৬৫-১৯৩৩)

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত নদিয়া জেলার শান্তিপুরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতি ও যশ অর্জন

www.pathagar.com

করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত "কুসুমাঞ্জলি", "অপূর্ব দর্শন কাব্য", "প্রেমহার", "জাতীয় ফোয়ারা" ও "হজরত মোহাম্মদ কাব্য" এবং "শাহনামা", "মহর্ষি মনসুর", "তাপস-কাহিনী", "ফেরদৌসী-চরিত", "টিপুসুলতান", "হাতেম তাই", "দরাফ খান গাজী" এবং "জোহরা" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি ১৩০৭ বাংলা সালে কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা "লহরী" প্রকাশ করেন এবং বহু পরে তাঁহার পুত্র জনাব আফজালুল হক সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক-পত্র "মোসলেম ভারতে"রও তিনি কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(জন্ম ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ)

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। মৌলানা সাহেব কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিয়া সমাজ, জাতি ও দেশ সেবার উপায়রূপে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেন। "সাপ্তাহিক মোহাম্মদী", অধুনালুপ্ত "দৈনিক খাদেম", "মাসিক মোহাম্মদী" ও "দৈনিক আজাদ" তাঁহার জীবনব্যাপী সমাজ-সেবার ফল। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া চিত্তরঞ্জন দাসের সহিত কারাবরণ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার গবেষণামূলক "মোস্তফা চরিত" লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "সমাজ ও সমাধান" আর একটি বিশেষ গবেষণামূলক গ্রন্থ। তাঁহার "আমপারার অনুবাদ" কোরান শরীফের অনুবাদে একটি নূতন দান। এতদ্ব্যতীত তিনি কোরান শরীফের "সাত পারা" পর্যন্ত অনুবাদ করিয়াছেন।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

(১৮৯৬-১৯৫৪)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বাঁশদহা গ্রামে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় বাবুলিয়া হাইস্কুল হইতে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং "দি মুসলমান" সম্পাদক মজীবর রহমান সাহেবের সংস্পর্শে আসিয়া এবং দেশ ও জাতির সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ২/৩ বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করার পর তিনি ছাত্র-জীবন পরিত্যাগ করেন এবং "সাপ্তাহিক মোহাম্মদী"র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সাপ্তাহিক "দি মুসলমানে"ও লিখিতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে তিনি "দৈনিক মোহাম্মদী", "দৈনিক সেবক", "সাপ্তাহিক সওগাত", "সাপ্তাহিক খাদেম" এবং ইংরাজী "দি মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন।

সুষ্ঠু চিন্তা এবং পরিশীলিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষাই ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত "স্মার্ণা-নন্দিনী'," "মহামানুষ মোহসিন", "মরু-ভাস্কর", "সৈয়দ আহমদ", "নওয়াব

www.pathagar.com

আবদুল লতিফ” প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যের মর্যাদাবান সম্পদ হিসাবে চিরকাল সমাদর লাভ করিবে। কঠিন দারিদ্র্যের সাথে তিনি চিরদিন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন কিন্তু সাহিত্য-সেবার উন্নত ও আদর্শ জীবন হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। ১৯৫৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

মোহাম্মদ কাসেম

(জন্ম ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)

ইনি ঢাকা শহরের অধিবাসী। পিতার কর্মস্থল কুমিল্লায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁহার ছাত্র-জীবন আরম্ভ হয়। তিনি কৈশরের শেষ সীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঢাকা হইতে প্রকাশিত “প্রাচী” নামক পত্রিকায় তাঁহার প্রথম গল্প রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত “অভিযান” নামক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর তিনি দীর্ঘদিন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “দৈনিক সোলতান” পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। এই সময় কলিকাতার “বিচিত্রা” ও অন্যান্য বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাগুলিতে তাঁহার গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে এবং গল্প-লেখক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থ “আগামীবারে সমাপ্য” প্রকাশিত হয়। ভাষা ও রচনাভঙ্গীর জন্য এই পুস্তক বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। “মোহাম্মদী” পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত “বারোয়ারী’ উপন্যাসের বারজন রচয়িতার মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

মোহাম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্

(জন্ম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)

ইনি বাংলার অন্যতম চিন্তাশীল লেখক। “পারস্য প্রতিভা” ও “মানুষের ধর্ম” নামক পুস্তক লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা মার্জিত ও ওজস্বিনী, দৃষ্টিভঙ্গী উদার, ছন্দ সংস্কারমূলক। তিনি বাঙালী পাঠকগণকে পারস্য-সাহিত্য ও সুফীমতের সহিত পরিচিত করাইয়া বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ পাবনা জেলার ঘোড়শাল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি কখনও সাহিত্য-চর্চায় বিরত হন নাই। সম্প্রতি তিনি পূর্ববাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডিপুটী সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

(১৮৮৯-১৯৩৬)

লুৎফর রহমান যশোহর জেলার মাগুড়া মহকুমার অন্তর্গত তাঁহার মাতুলালয় পারনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান উক্ত মাগুড়া মহকুমার অন্তর্গত

www.pathagar.com

হাজরাপুর গ্রাম। তিনি এন্ট্রান্স পাশ করার পর হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার জেরারগঞ্জে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া নারী জাতির সেবার জন্য "নারীতীর্থ" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে "নারী-শক্তি" নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "প্রকাশ" নামক কবিতা পুস্তক। তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে "উন্নত জীবন", "মহৎজীবন", "মানব জীবন", "সত্য জীবন", "ছেলেদের মহত্ত্ব কথা", "মুসলমান", "মঙ্গল-ভবিষ্যৎ", "প্রীতি-উপহার", "বাসর-উপহার", "ছোটদের কারবালা", "ডন্‌কুইক জোট্" (অনুবাদ), "সার্থক-জীবন" (অপ্রকাশিত) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি গভীর চিন্তাশীল ও শক্তিশালী প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮৮-১৯৫২)

নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। তিনি পিতৃকুল হইতে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও মাতৃকুল হইতে কবি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সংশ্লিষ্ট। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার খ্যাতি কাব্য সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি একজন ভাল কাব্য ও সাহিত্য সমালোচক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "স্বপন-পশারী", "বিস্মরণী", "স্বরগরল" ও "হেমন্ত-গোধূলী" প্রসিদ্ধ। ১৯৫২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

ইনি ইংরাজী ১৯৬১ সালে বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় বিখ্যাত ঠাকুর বংশে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্য "বনফুল" বাহির হয়। ১৭ বৎসর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে "ভারতী" পত্রিকায় বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর সারাজীবন ধরিয়া ক্রমাগত কাব্য, নাটক, নভেল, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মাসিক পত্র "সাধনা" প্রকাশ করেন। ১৯০০-১৯০১ সালে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদক হন। ১৯০২ সালে স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ১৯১২ সালে কবির বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে, "বঙ্গীয়-স্যহিত্য-পরিষদ" এক বিরাট সভায়

www.pathagar.com

দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্বর্ধনা করেন এবং ঐ বৎসর তিনি তৃতীয় বার য়ুরোপ-ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পান। ১৯১৫ সালে নাইট পদবী লাভ করেন। ১৯১৯ সালে "জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদস্বরূপ "স্যার" উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে সমগ্র য়ুরোপ পর্যটন করেন এবং সর্বত্র অসাধারণ সম্মান লাভ করেন। ১৯২১ সালে "বিশ্বভারতী" ও পর বৎসর "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে একাদশতম বিদেশ ভ্রমণে বাহির হন ও য়ুরোপে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্বে তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন করিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে কোন কোন দেশে একাধিকবার গমন করেন। ১৯৩১ সালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পূর্ব হইলে পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ তাঁহাকে আনন্দ ও সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং সেই উপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী উৎসব হয় ; সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ তাঁহাকে "কবি সার্বভৌম" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯৩২ সালে তিনি পারস্যের সম্রাটের নিমন্ত্রণে আকাশযানে পারস্য গিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট, কিঞ্চিদূর্ধ ৮০ বৎসর বয়সে কবি পরলোকগমন করেন।

তাঁহার কবিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শুধু বাংলার, ভারতের বা এশিয়ার নহেন, বিশ্বের একজন কালজয়ী শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্য, সঙ্গীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই, যাহা তাঁহার করস্পর্শে মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠে নাই। তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে জগতের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৭৬-১৯৩৭)

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের অধিবাসী। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। চাকুরিসূত্রে ইনি দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে বাস করেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্যটন করেন। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের কথা ও বাঙালী সমাজের নানা বৈচিত্র্য ইহার রচনার প্রধান উপাদান। সমাজের কোন অসংগতিই তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই এবং মানুষের মনুষ্যত্বকে এক মর্যাদা বোধ হয় আর কেহই দিতে পারেন নাই।

"কাশীনাথ" তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের রচিত উপন্যাস। ইহার পর চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে "বড়দিদি", "চন্দ্রনাথ" এবং "দেবদাসের পাণ্ডুলিপি" রচিত হয়। "রামের সুমতি", "পথ-নির্দেশ" এবং বিন্দুর ছেলে" নামক সুবিখ্যাত গল্প কয়টি শরৎচন্দ্রের ছত্রিশ বৎসর বয়সের রচনা। তাঁহার রচিত "চরিত্রহীন", "পরিণীতা", "বিরাজ বউ", "দত্তা", "পল্লীসমাজ", "মেজদিদি", "শ্রীকান্ত", "অরক্ষণীয়া", "নিষ্কৃতি", "বৈকুণ্ঠের উইল", "গৃহদাহ", "দেনা পাওনা", "নব বিধান", "শেষ প্রশ্ন" প্রভৃতি উপন্যাসরাজি এবং তাঁহার গল্পসমূহ বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। ১৯৩৭ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

শাহ্ গরীবুল্লাহ্

(খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দি)

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ বালিয়া হাফিজপুর নিবাসী ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই হাফিজপুর পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম। শাহ্ গরীবুল্লার জন্ম-সন ও মৃত্যু-সন নির্ণীত না হইলেও তিনি যে কবি ভারতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী কিংবা প্রায় সামসাময়িক তাহা অনেকটা বলা চলে। ভারতচন্দ্র (১৭১১-১৭৫৯) অষ্টাদশ শতাব্দির লোক। দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত সংস্কৃতপ্রধান ভাষার পরিবর্তে মুসলমান সমাজে নিত্য ব্যবহৃত আরবী ও ফার্সী-মিশ্রিত সহজ ও প্রচলিত বাংলায় পুঁথি-সাহিত্য রচনা করিয়া শাহ্ গরীবুল্লাহ্ বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিরাট সৃজনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে মুসলমানী বাংলায় রচিত পুঁথি-সাহিত্যের জনক বলা যাইতে পারে।

শাহাদৎ হোসেন

(১৮৯৪-১৯৫৩)

চব্বিশ-পরগণা জেলার বশীরহাট মহকুমার পণ্ডিতপোল গ্রামে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি একজন সত্যকার প্রাণবন্ত কবি ছিলেন। ইহার প্রকাশভঙ্গী ক্লাসিক্যাল বা উৎকর্ষপ্রবণ রীতির অনুসারী। ভাষার সৌষ্ঠবে ও প্রাঞ্জলতায় কবি সমাজে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ইনি "মৃদঙ্গ", "চিত্রপট", "কল্পলেখা", "রূপচ্ছন্দা" প্রভৃতি কাব্য, "পথের দেখা", "রিক্তা" প্রভৃতি উপন্যাস এবং "সরফরাজ খাঁ", "আনার কলি" প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শেখ আবদুর রহিম

(১৮৫৯-১৯৩১)

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জেলা ২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার মোহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা প্রতিকূল কারণে কলিকাতার সিটি স্কুলের এন্ট্রান্স ক্লাশ পর্যন্ত পড়িয়া তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হয়। তিনি ১৮৮৯ সালে "সুধাকর" নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার পর তিনি "মিহির ও সুধাকর" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে তিনি "মোসলেম হিতৈষী" নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি সাংবাদিক ও ধর্মগ্রন্থ লেখক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি", ইহা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৩১ সালের ১৪ই জুলাই পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

শেখ ফজলুল করিম
(১৮৮২-১৯৩৭)

রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন সভাব-কবি। অতি অল্প বয়স হইতে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভা প্রকাশ পায়। তাঁহার বয়স যখন মাত্র একাদশ বৎসর (১৮৯৩), তখন তিনি "সরল পদ্য-বিকাশ" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। বর্তমানে তাঁহার কবি-প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। গদ্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। নদীয়ার সাহিত্য-সভা তাঁহাকে "সাহিত্য-বিশারদ" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য ইনি "বাসনা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "পরিত্রাণ—কাব্য", "চিন্তার চাষ", "পথ ও পাথেয়", "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি", "প্রেমের স্মৃতি", "লাইলী মজনু", "আফগানিস্তানের ইতিহাস", "রাজর্ষি এব্‌রাহীম" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বাংলাদেশে যশস্বী হইয়াছেন। কল্পনা ও আয়াসসাধ্য ভাষা ইহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সরল ভাষায় এমন সুন্দর করিয়া ভাব প্রকাশ খুব অল্প কবির দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শেখ হবিবর রহমান
(জন্ম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ)

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে যশোহর জেলার ঘোষগতি নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি বাংলা-সরকারের শিক্ষা-বিভাগে একজন কর্মচারী ছিলেন এবং অল্পদিন হইল এই কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আজীবন সাহিত্যসেবা করিয়া ইনি "সাহিত্যরত্ন" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ন্যায় এমন অমায়িক, বিনয়ী ও সাহিত্য-সাধনায় উৎসৃষ্টপ্রাণ ব্যক্তি বিরল। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়া পারস্য সাহিত্যের মাধুর্য এবং মুসলিম-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য বঙ্গের সুধীসমাজ লাভ করিয়াছেন। ইনি অদ্যাবধি গদ্যে ও পদ্যে তেইশখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই পুরস্কার ও গ্রন্থাগারের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। তাঁহার "আবেহায়াৎ", বাংলা সাহিত্যে গযল গানের প্রথম পুস্তক। এতদ্ব্যতীত তিনি "কোহিনূর-কাব্য", "চেতনা","বাঁশরী", "পারিজাত", "গুলশান", "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৮৮২-১৯২২)

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। তাঁহার পৈত্রিক বাস কলিকাতায়। তাঁহার ন্যায় বহু ভাষাবিজ্ঞ বিদ্বান কবি বাংলায় অধিক জন্মেন নাই। তিনি কিশোর বয়স হইতেই কবিতা রচনা ও অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তিনি পৃষ্ঠব্রণ-রোগে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.pathagar.com

বাংলা কাব্য জগতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের যাদুকর বলিয়া বিখ্যাত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে "ছন্দ-সরস্বতী" বলিয়া সমাদর করিতেন। একদিকে মৌলিক কবিতা-রচনায় যেমন তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই অনুবাদ কার্যেও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক "সবিতা" ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অতঃপর "তীর্থসলিল", "তীর্থরেণু", "কুহু ও কেকা", মণি-মঞ্জুষা", "অভ্র-অবীর", "বেলা শেষের গান" প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে চিন্তায়, ছন্দে ও শব্দালঙ্কারে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

সুফী মোতাহার হোসেন

(জন্ম ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ)

সুফী মোতাহার হোসেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভবানন্দপুর নামক গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস বাখরগঞ্জ জেলার বাউফল থানার অন্তর্গত বীরপাশা গ্রাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করেন। ঢাকা "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামক প্রসিদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে লিখিত তাঁহার অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পূর্ব বাংলার বিখ্যাত পত্রিকাগুলির প্রায় সবগুলিতেই তাঁহার কবিতা সর্বদা প্রকাশিত হইতেছে। "সনেট" রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এ বিষয়ে বর্তমান বাংলায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বি।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত "বাংলা কাব্য পরিচয়ে" ইহার একটি কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার কাব্য-সাধনা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে সমান সমাদৃত।

ইনি দারিদ্র্য নিবন্ধন কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে এখন পর্যন্ত সমর্থ হন নাই।

বর্তমানে ইনি ফরিদপুরের একটি বেসরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন।

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

(জন্ম ১৯২০ খৃষ্টাব্দ)

যুদ্ধোত্তর বাংলার উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে সৈয়দ আলী আহ্‌সান সাহেব অন্যতম। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার আলোকদিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইহার কবিতায় সাম্প্রতিক যুগের ইংরাজী কবিতার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমালোচনায়ও ইহার হাত আছে। ইহার কবিতা নানা সাময়িক কাগজে প্রকাশিত হইয়া থাকে। "নজীর আহমদ" ও "চাহার দরবেশ" নামে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলাওল
(১৬০৭-১৬৮০)

কবি আলাওলের জীবন-কাল আনুমানিক ১৬০৭ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। চট্টগ্রাম জেলার "জোববা" গ্রামে আলাওল জন্মগ্রহণ করেন। ফরীদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে তাঁহার পিতা মজলিস কুতুব নামক কোন ভূস্বামীর কর্মচারী ছিলেন। "আরাকান-রাজসভায় বাংলা সাহিত্য" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। স্থানান্তরে যাইবার কালে পিতাপুত্র পর্তুগীজ জলদস্যুর হাতে পড়েন। পিতা এই সময়ে নিহত হন ও পুত্র আরাকানে গিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে আরাকানে মগ-রাজা থদো-মিন্তার (১৬৪৫-১৬৫২) রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানেই তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্তি হন। কিন্তু শীঘ্রই রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুগ্রহে, পরে সৈয়দ মুসার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি "পদ্মাবতী", "সেকান্দর নামা", "তোহফা", "সপ্ত পয়কর" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হিন্দী, ফারসী ও আরবী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ ও সংকলন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

আলাওলের ন্যায় এত ভাষায় অভিজ্ঞ কবি প্রাচীন-বাংলা সাহিত্য আর একটিও নাই। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বলিষ্ঠ প্রতিভা, অপর্যাপ্ত বহুদর্শিতা এই কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থান দান করিয়াছে। তিনি সুললিত বৈষ্ণব পদাবলী রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী
(১৮৮০-১৯৩১)

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এই সিরাজগঞ্জ হইতেই তিনি সিরাজী উপাধি গ্রহণ করেন, পারস্যের শিরায হইতে নহে। দারিদ্র্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ না হইলেও স্বাবলম্বন ও সাধনার দ্বারা তিনি বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা, সমাজ হিতৈষী ও সুবক্তা ছিলেন। বলকান যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণ প্রেরিত মেডিকেল মিশনের সদস্যরূপে তুরস্কে গিয়া তিনি সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তজ্জন্য তিনি তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে সম্মান ও খেলাত লাভ করেন। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতে এবং বক্তৃতায় তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি "প্রেমাঞ্জলি" (কবিতা), "অনল প্রবাহ", (কবিতা), "স্পেনবিজয় কাব্য" (কবিতা), "রায় নন্দিনী" (উপন্যাস), "তারাবাঈ" (উপন্যাস), "ফিরোজা বেগম" (উপন্যাস), "তুরস্ক ভ্রমণ" (ভ্রমণ বৃত্তান্ত), "স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা" (প্রবন্ধ), "আদব-কায়দা" (প্রবন্ধ) প্রভৃতি ১৫ খানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি ১৯৩১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.pathagar.com

সৈয়দ এম্‌দাদ আলী

(জন্ম ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ)

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের খিলগাঁও গ্রামে ইহার জন্ম ও বাস। ইনি আজীবন পুলিশ বিভাগে কাজ করিয়া এখন স্বগ্রামে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। সরকার ইহাকে "খানসাহেব" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি কিছুদিন "নবনূর" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করেন। চিরদিন পুলিশ বিভাগের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়াও ইনি জীবনে সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করেন নাই। "ডালি" নামক ইহার একখানি কাব্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই কবির "তাপসী রাবেয়া" নামক গদ্য গ্রন্থটিও বিশেষ সমাদৃত।

সৈয়দ হাম্‌জা

(১৭৩২-১৮০৭)

হুগলী জেলার উদনা গ্রামে বাংলা ১১৩৯ সালে (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে যাঁহারা বহু পুঁথি কাব্য প্রণেতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, সৈয়দ হাম্‌জা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১২০১ সালে তিনি গরীবুল্লার অসমাপ্ত "আমীর হাম্‌জা"র অবশিষ্ট অংশ রচনা করেন। সৈয়দ হাম্‌জার "জৈগুনের পুঁথি" ১২০৪ সালের ২৩শে আশ্বিন (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) লেখা হয়। উর্দু হইতে বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তিনি দুইখানি রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন। মনোহর এবং মধুমালতীর বিখ্যাত প্রেমোপাখ্যান লইয়া তিনি "মধুমালতী" লেখেন। তিনি ইহা ১১৮৮ সালে আরম্ভ করিয়া ১১৯৫ সালে (১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দ) সমাপ্ত করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ১২১০ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) সৈয়দ হাম্‌জা "হাতেম তাই" রচনা করেন। ইহাই তাঁহার সর্বশেষ রচনা। তিনি ১২১৪ সালে দেহত্যাগ করেন।

হায়াৎ মামুদ

(১৬৯৯-১৭৫৩)

কবি হায়াৎ মামুদ বর্তমান রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত "ঝাড় বিশিলা" গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শা কবীর ; তিনিও একজন কবি ছিলেন। তিনি ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে "আম্বিয়া-বানী", ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে "মহরম-পর্ব" বা "জারিজঙ্গ নামা", ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে "চিত্ত-উত্থান", এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "হেতু-জ্ঞান" কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যগুলি সরল বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত। কাহিনী রচক হিসাবে তাঁহার প্রতিভা প্রাচীন-বাংলা সাহিত্যে কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত উত্তরবঙ্গে এখনও তাঁহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ-পরিচিতি

শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন

প্রাচীন ভারতের উজ্জয়িনী রাজ্যের অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" রাজ-সভার অন্যতম রত্ন মহাকবি কালিদাস "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্", নামক সংস্কৃত ভাষায় এক নাটক রচনা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত নাটকের আখ্যনভাগ "শকুন্তকা" নামকরণ করিয়া বাংলা ভাষায় সংকলন করেন। "শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন উল্লেখিত "শকুন্তলা" নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়ের অংশবিশেষ।

বাংলাদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা-সাহিত্যে গদ্য ছিল না। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে ইংরাজ মিশনারী বা ধর্মপ্রচারকগণ এবং ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যের প্রথম রচয়িতা। অবশ্য ইহার পূর্বে শিলালিপি, তাম্র-লিপি এবং দুই একটি দলিল-দস্তাবেজে একপ্রকার বাংলা গদ্যের ক্বচিৎ সাক্ষাৎ মিলে—কিন্তু সেগুলি বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও বিভিন্ন ভাষার এমন সংমিশ্রণে এবং এমন ভাষা-রীতি দ্বারা লিপিবদ্ধ যে সেগুলিকে "বাংলা-গদ্য" না বলাই শ্রেয়। যাহা হউক, মিশনারীবৃন্দ ও রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত "বাংলা-গদ্য" প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হয় নাই। বাংলা-গদ্যকে প্রথম যথার্থ সাহিত্যিক রূপদান করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু তাঁহার এ গদ্য অত্যন্ত সংস্কৃত-বহুল এবং জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তাহার কোনরূপ মিল বা সামঞ্জস্য ছিল না। ফলে সে ভাষা-রীতি বর্তমানে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য।

এই নাটকের গল্পাংশ হইল এই—প্রাচীন ভারতের দুষ্যন্ত নামক এক সম্রাট মৃগয়ায় বাহির হইয়া এক হরিণ শিশুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হন এবং মহর্ষির পালিত কন্যা শকুন্তলার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গান্ধর্ব বিধানে তাহাকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল সেই তপোবনে অবস্থান করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। শকুন্তলার নিকট স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাজ-নামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় রহিয়া যায়। ইতিমধ্যে কোপন স্বভাব দুর্বাসা মুনির অভিশাপে মহারাজ দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান এবং মহর্ষি কণ্ব কর্তৃক শকুন্তলা স্বামীগৃহে প্রেরিত হইলে দুষ্যন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসেন। স্বামীগৃহে যাইবার সময় শকুন্তলা এক নদীতে স্নানকালে পূর্বোক্ত রাজ-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় হারাইয়া ফেলাতেই দুষ্যন্তের নিকট তাঁহাদের বিবাহের কোন প্রমাণ বা স্মৃতি-চিহ্ন উপস্থিত করা সম্ভবপর হয় নাই। কিছুদিন পর সেই অঙ্গুরীয় পুনরায় মহারাজ দুষ্যন্তের হস্তগত হয় এবং সেই অঙ্গুরীয় দর্শনমাত্র শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহের সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হয় এবং শকুন্তলাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আগ্রহে অধীর হইয়া উঠেন। অতঃপর কশ্যপমুনির আশ্রম হেমকুট পর্বতে শকুন্তলার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হয়।

www.pathagar.com

টীকা

দক্ষিণবাহু স্পন্দন—হিন্দু শাস্ত্রমতে পুরুষের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইলে তদ্বারা শুভ লক্ষণ সূচিত হয় ; ঘনিষ্ঠ আপনজনের সঙ্গে বিশেষ করিয়া স্ত্রীর সহিত স্বামীর মিলনের সংকেত বুঝায়।

চক্রবর্তী লক্ষণ—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যিনি রাজা হইবেন তাঁহার হস্তে একপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। ঐ চিহ্নকেই "রাজচক্রবর্তী লক্ষণ" বলা হয়।

অপ্সরা সম্বন্ধ—শকুন্তলা নাটকের উপাখ্যান অনুসারে স্বর্গের মেনকা নাম্নী অপ্সরা শকুন্তলার মাতা এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার পিতা। এখানে তাহার মাতার অপ্সরা সম্বন্ধ সম্পর্কেই বলা হইয়াছে।

মৃগ-তৃষ্ণিকা—মরীচিকা ; সূর্য-কিরণে জল-ভ্রম। গ্রীষ্মকালে সূর্যের কিরণ বালুকা-ভূমিতে, বিশেষ করিয়া মরুভূমিতে পতিত হইলে জলবৎ প্রতীয়মান হয় এবং তৃষ্ণার্ত মৃগ বা হরিণগণ দূর হইতে জলভ্রমে তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং অনেক সময় তৃষ্ণার্ত হইয়া সেখানে প্রাণ হারায়। এই ভ্রান্তিকে মৃগতৃষ্ণিকা বা মৃগ-তৃষ্ণা বলে।

স্থান মাহাত্ম্য—হিন্দু সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস—মুনি-ঋষিগণের আশ্রমে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ থাকেনা, এখানে আশ্রমের ঐরূপ মাহাত্ম্যই বুঝাইতেছে।

চাকরির ঝক্‌মারি

এই প্রবন্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে "টেকচাঁদ ঠাকুর"-রচিত ও বাংলা-গদ্যে লিখিত প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে উদ্ধৃত।

জনসাধারণের ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ-বিরহিত সংস্কৃত-বহুল "বিদ্যাসাগরীয় ভাষা" নামে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত ভাষা-রীতির বিরুদ্ধে তাঁহার সমসাময়িক অপর দুইজন সাহিত্যিক রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র এক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের মুখপত্র স্বরূপ তাহারা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও তদসন্নিহিত অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় "মাসিক পত্রিকা" নামে এক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামে কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" নামক এক সামাজিক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে "আলালের ঘরের দুলাল" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলা-সাহিত্যের ভাষা-রীতি-পরিবর্তনের ব্যাপারে এই পুস্তক এক বিপ্লব আনয়ন করে। পরবর্তী সময় এই পুস্তকের ভাষা "আলালী ভাষা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই উপন্যাসের আখ্যানভাগের সারমর্ম হইল এই—বাবুরাম বাবু মাল ও ফৌজদারী আদালতে কাজ করিয়া উৎকোচ ও তোসামোদের সহায়তায় প্রচুর ধন ও পদ-মর্যাদা অর্জন করেন। তাঁহার পুত্র মতিলাল পিতামাতার অতি আদরে ও কুসংসর্গে পড়িয়া চরিত্রহীন হইয়া সর্বস্বান্ত হয় এবং পরে সৎসংগে আসিয়া চরিত্র শোধন হওয়ায় নানা ঘটনার ভিতর দিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

এই মতিলাল কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় কুসঙ্গীদের সহিত মিলিয়া অসৎকার্য করার ফলে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে আবদ্ধ হন। সে সংবাদ বৈদ্যবাটীতে তাহার পিতার নিকট

www.pathagar.com

দিবার জন্য জমিদারের এক সরকার বা ক্ষুদ্র কর্মচারী তথায় প্রেরিত হয়। মতিলাল ও তাহার দলবলের মত দুষ্টলোকদের সাজা হোক—ইহাই উক্ত সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা—তথাপি চাকুরির খাতিরে তাহাকে মতিলালের সাহায্যার্থে মতিলালের পিতার নিকট যাইতে হইতেছে। "চাকরির ঝকমারিতে" দরিদ্র চাকুরিয়ার এই দুর্ভাগ্যের কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে তথাকথিত বড় লোক বা "বাবু"দের মজলিসের একটা নিপুন চিত্র এবং ঐ বাবুগণ কর্তৃক দরিদ্র জনসাধারণের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অত্যাচারের একটি নিখুত বর্ণনাও আলোচ্য উদ্ধৃতাংশে রহিয়াছে।

টীকা

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা—বেগুন ভাজা করিবার সময় তপ্ত কড়াইএ ফুটন্ত তৈলের মধ্যে বেগুন ছাড়িয়া দিলে যেমন অকস্মাৎ ঝাৎ করিয়া শব্দ করিয়া একটা তীব্র ঝাঝ উঠে—অন্যের একটা কথা বা কাজের ফলে তেমনি অকস্মাৎ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়া।

বাহিরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন—বাঙ্গালী বড় লোকেরাই সাধারণতঃ ধূতির দীর্ঘ কোঁচা ঝুলাইয়া কাপড় পরিয়া থাকেন। সুতরাং কোঁচা ঝুলাইয়া কাপড় পরা দ্বারা বড়লোকগিরি বোঝায়। আর ছুঁচারা শূন্য হাঁড়ি-পাতিলেই কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করিয়া ছুটাছুটি করে। কাজেই ছুঁচার কীর্তন দ্বারা ঘরের হাড়ি পাতিলে খাবার চাল পর্যন্ত নাই—ইহাই বোঝায়। অতএব এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ হইল প্রকৃতপক্ষে ভিতরে ভিতরে নিঃস্ব ও আন্তঃসারশূন্য হইয়াও বাহিরে লোক-দেখানো বড়লোকগিরি ফলানো।

উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খাড়ি—উপরে চাকচিক্য বিশিষ্ট অথচ ভিতরে খড়—অর্থাৎ খড়ের ন্যায় লাবণ্যহীন শুষ্কতা। এই প্রবাদ বাক্যের অর্থ হইল : অন্তঃসারহীন বহ্বাড়ম্বর।

ঢেঁকির কচ্‌কচি—ঢেঁকি চালাইবার সময় অনবরত ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ শব্দ হইতে থাকে। কিন্তু সে শব্দ দ্বারা কোন যথার্থ ভাব বা অর্থ প্রকাশিত হয় না। অতএব এই প্রবচনের অর্থ হইল—অর্থহীন বাগাড়ম্বর বা অযথা বক্‌বক্‌ করা।

পুঁটি মাছের প্রাণ—পুঁটি মাছ অতি অল্প প্রাণ মাছ। পানি হইতে উঠানো মাত্র সে দুই একটা লাফ দিয়াই গতায়ু হয়। অতএব আলোচ্য প্রবচনের অর্থ হইল : অতি অল্প আঘাতেই যাহার মৃত্যু হয় সেরূপ অল্প-প্রাণ ব্যক্তি ; অথবা অতি অল্প ক্ষতি বা লোকসানেই যে নিঃস্ব বা সর্বহারা হয় সেরূপ ক্ষুদ্র বা দরিদ্র ব্যক্তি।

উঠসার কিস্তি—দাবাবড়ে খেলার কিস্তি বিশেষ : উঠ কিস্তি : বল বা বড়ে উঠিবার দরুন যে কিস্তি পড়ে।

সমুদ্র তটে

আলোচ্য আখ্যানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস "কপাল কুণ্ডলা" হইতে উদ্ধৃত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও ভাষা-রীতির জনক। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-বহুল বাংলা এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের অনুসৃত কলিকাতা-অঞ্চলের কথ্যভাষা—এই উভয়ের মধ্যবর্তী ও উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত এক ভাষা-রীতি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বিরাট সাহিত্য-প্রতিভা-বলে সে ভাষা-রীতিকে যে-রূপ দান করিয়া যান আজো বাংলা-সাহিত্যে প্রধানতঃ তাহাই অনুসৃত হইতেছে।

www.pathagar.com

"কপাল কুণ্ডলা" উপন্যাসের প্রধান নায়ক নবকুমার। গঙ্গা-সাগরে অর্থাৎ গঙ্গা নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে সেখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে হিন্দুদিগের একটি ধর্মীয় মেলা হইয়া থাকে। নবকুমার অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নৌকাযোগে সেই মেলা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কুজ্‌ঝটিকার দিকভ্রান্ত হইয়া সুন্দর বনের পাশে উপনীত হন এবং নৌকায় জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব হওয়ায় তীরে অবতরণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণের জন্য বনে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে নদীতে জোয়ার আসায় তাঁহাকে বনমধ্যে ফেলিয়াই নৌকা চলিয়া যায়। তখন সেই জনমানবহীন অঞ্চলে ক্ষুধার তাড়ণায় ও আশ্রয়ের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক কাপালিককে দেখিতে পান এবং রাত্রে সেই কাপালিকের কুটীরে সাময়িক আশ্রয় ও আহার্য প্রাপ্ত হন। পরদিন কুটীরে সঞ্চিত ফলমূল শেষ হইয়া গেলে ফলমূলান্বেষণে নবকুমার বাহির হইয়া পড়েন এবং পথভ্রান্ত হইয়া সমুদ্র-তটে উপনীত হন এবং কাপালিকের পালিতা কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ লাভ করেন। "সমুদ্র-তটে" তাহারি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। "সমুদ্রে তটে" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে সমুদ্রের বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। নবকুমারের সঙ্গে সমুদ্র তটে যে নারীর সাক্ষাৎ লাভ হয়—সেই নারীর চেহারা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামে গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেন-রেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে ; কানন-কুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ।

(খ) বিচিত্র হৃদয়-যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এইরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না।

(গ) ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল ; যেন পরনে সেই ধ্বনি রহিল ; বৃক্ষ-পত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল ; সাগর নাদে যেন মন্দিভূত হইতে লাগিল।

(ঘ) সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়-তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।

তাপসী হয্‌রত রাবিআ বসরী

এই প্রবন্ধটি বিখ্যাত মুসলিম তাপসী রাবিআ বসরীর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। আরবী-ফারসী ভাষায় মুসলিম আউলিয়া-দরবেশের জীবনী সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক বাংলা-ভাষায় সংকলিত "তাপস-মালা" নামক গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধৃত।

গিরিশচন্দ্র সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করায় "ভাই গিরিশচন্দ্র সেন" নামে অভিহিত হন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় এতদূর বুৎপত্তি লাভ করেন যে তাঁহার বীজিতাবস্থায় "মওলানা গিরিশ সেন" নামেও তিনি তাঁহার আরবী-ফারসী-বিদ মুসলমান বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বাংলা-ভাষায় যত পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সবগুলিই ইসলামী বিষয় লইয়া। প্রসিদ্ধ সাধক মওলানা শেখ

ফরিদ উদ্দীন আত্তার কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত "তাযকেরাত–উল–আউলিয়া" নামক মুসলমান সুফী সাধকদের অর্থাৎ আউলিয়া–দরবেশের জীবন–চরিত গ্রন্থও তিনি "তাপসমালা" নাম দিয়া ছয় খণ্ডে বাংলা–ভাষায় সংকলন করেন। ভাষা–রীতির দিক দিয়া তিনি মোটামুটি বঙ্কিকের অনুসারী।

মুসলমান তাপস–তাপসী বা আউলিয়া–দরবেশদের মধ্যে তাপসী রাবিআর জীবনে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কেহবা বেহেশতের আশায়, কেহবা দোযখের ভয়ে, কেহবা মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবনে সুখ–শান্তি কামনায় আল্লাহ্‌র এবাদত–বন্দেগী বা আরাধনা করিয়া থাকেন এবং পার্থিব সমস্ত সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু রাবিআর ধর্ম–সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিষ্কাম অহেতুকী আল্লাহ্ প্রেম এবং আল্লার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণ। "আয় আল্লাহ্ তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট আমি আর কিছুই চাহিনা। যদি নরকের ভয়ে তোমার আরাধনা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর। যদি স্বর্গলোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে তাহা হারাম—অবৈধ কর" তাঁহার এই প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের নিষ্কাম আল্লাহ্ প্রেমের আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছে। তাপসী রাবিআর জীবনের এখানেই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

টীকা

হাসান–বস্‌রী—আরবের মদীনা নগরে হাসান বস্‌রী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন হযরত মুহম্মদের (দ:) প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি আয়িশার (রা:) বিশ্বস্ত পরিচারিকা। কথিত আছে যে, বিবি আয়িশার (রা:) স্নেহ–অঙ্কে স্থান লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে শিশু হাসান অতি অল্প বয়সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হন। হযরত মুহম্মদের (দ:) জামাতা হযরত আলী (রা:) ছিলেন তাঁহার ধর্মজীবনের পথ–প্রদর্শক এবং হযরত আলীর (রা:) জ্যেষ্ঠপুত্র এবং হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রা:) ছিলেন তাঁহার ধর্ম–বন্ধু। যৌবনে হীরাজহরতের ব্যবসায় তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং এই উপলক্ষে দেশ–বিদেশ ভ্রমণ করেন। একবার রোম–নগরে যাইয়া কোন ঘটনা দর্শনে তাঁহার জীবনের সুপ্ত বৈরাগ্য জাগ্রত হইয়া উঠে এবং তিনি সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে আত্মসমর্পণ করেন। সিদ্ধি লাভের পর বসরা নগরে আসিয়া ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি লোক–সমাজে উপদেশ দিতেন। এখানেই তাঁহার বাকী জীবন অতিবাহিত হয়। এইজন্যই তিনি হাসান–বস্‌রী নামে পরিচিত।

ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম—তিনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্‌খ্ নামক রাজ্যের বাদ্‌শাহ ছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় রাজ্য ও রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া তিনি আল্লাহ্‌র পথে বাহির হইয়া যান এবং সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও এবাদৎ দ্বারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। মক্কা শরীফে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি সর্বত্যাগী তাপস ছিলেন। তাঁহার পিতা আদহাম্‌ও একজন বিখ্যাত সুফী বা দরবেশ ছিলেন। [এই পুস্তকের "সুখী কে?" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্নাবলী

১। হযরত রাবিআর জীবন–কাহিনী তোমার নিজ ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। তাপসী হিসাবে রাবিআর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তাহা বর্ণনা কর।

৩। রাবিআ কিরূপে দাসীত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

www.pathagar.com

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর : —

(ক) প্রকৃতপক্ষে তাঁহার (আল্লাহ্‌র) অর্চনা অহেতুকী।

(খ) এই সংসার আল্লাহ্ তাআলারই রাজ্য।

৫। টীকা লিখ :—

হাসান–বসরী ; ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম।

৬। আলোচ্য প্রবন্ধের এক জায়গায় রাবিআ বলিয়াছেন : "যদবধি তাঁহাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে) জানিয়াছি, লোকের প্রতি বিমুখ হইয়াছি"। কি প্রসঙ্গে এবং কেন রাবিআ একথা বলিলেন তাহা বর্ণনা কর।

আশার ছলনা

"আশার ছলনা" কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত একটি গভীর চিন্তামূলক প্রবন্ধ। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমের সমসাময়িক লোক। বাংলার বর্তমান ভাষা–রীতি সংগঠন ব্যাপারে কালীপ্রসন্নকে বঙ্কিমের দোসর বলা চলে। বঙ্কিমের "বঙ্গ–দর্শন" পত্রিকার ন্যায় ঢাকা হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের "বান্ধব" পত্রিকাও বাংলা গদ্য–রচনায় যুগান্তর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। কালীপ্রসন্নের রচনা গভীর, যুক্তি–বিচারে প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের চিন্তা–শক্তিকে জাগ্রত করিবার উপযোগী এবং তাঁহার ভাষা সাবলীল, শক্তিশালী ও কাব্যময়। তাঁহার "নিশিথ–চিন্তা" নামক পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই "বান্ধব" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এই পুস্তকের সকল লেখাই নিশিথ সময়ে রচনা বলিয়া কালীপ্রসন্ন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "আশার ছলনা" উক্ত "নিশিথ–চিন্তা" গ্রন্থেরই একটি প্রবন্ধ।

কালীপ্রসন্ন এই প্রবন্ধের শিরোভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত "আত্মবিলাপ" নামক কবিতার প্রথম দুই লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এই প্রবন্ধের সারমর্ম হইল এই—মানুষের জীবনে দুঃখ, বিপদ, শোক, সর্বনাশ, মৃত্যু, বেদনা প্রভৃতি সর্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে বসিয়াও আশা করে নূতন সুখের, নব জীবনের, নবতর সম্পদের। আদর্শবাদী মানুষ যাঁহারা—তাঁহারা চাহেন পরোপকারে, জন–সেবায় এবং জ্ঞানসাধনায় জীবন ব্যয় করিবেন। কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনে ও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়—মানুষ লোভের তাড়নায় স্বার্থের প্ররোচনায় অপর মানুষের সর্বনাশ সাধন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছেনা—এমনকি ভ্রাতা–ভগ্নী, স্বামী–স্ত্রী, আত্মীয়–স্বজন পর্যন্ত স্বার্থের খাতিরে একে অন্যের অমঙ্গল সাধনে পশ্চাদপদ হইতেছেনা—মানুষের প্রেম–প্রীতি, স্নেহ–ভালবাসা, মায়া–মমতা সবকিছুই লোভ ও স্বার্থের সংস্পর্শে আসিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় মানুষের জীবন, মানুষের আদর্শবাদ—এক কথায় মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবতা একদিনও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতনা—যদি না আশা মানুষকে ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সম্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারিত। অপর কথায়, আশাই জীবন, আশা না থাকিলে এই শোক–দুঃখপূর্ণ সংসারে মানুষ হয়ত একদিনেই আত্মহত্যা করিত অথবা মানুষের সকল আদর্শবাদ লুপ্ত হইয়া সারা পৃথিবী পাশবতায় পূর্ণ হইয়া যাইত। এই প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

টীকা

প্রলয়-ভেরী—প্রলয় অর্থ হইল সৃষ্টি নাশ। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চ পদার্থে বিশ্বপৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কথিত। একদিন মৃত্তিকা জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে স্রষ্টায় লয় বা লীন হইয়া যাইবে—অর্থাৎ সৃষ্টি নাশ হইয়া যাইবে। সেই অবস্থাকে বলা হয় প্রলয়। আর ভেরী অর্থ ঢাক্। কথিত আছে প্রলয়ের দিনে ঢাকের শব্দের ন্যায় উচ্চ ও ভয়ংকর শব্দ হইতে থাকিবে। অতএব "প্রলয়-ভেরী" দ্বারা বোঝায়, প্রলয় দিনে ঢাকের ন্যায় ধ্বংশের সুউচ্চ ভয়ংকর শব্দ।

কর-সূত্র-ধৃত ক্রিড়া-পুত্তল—পুতুলের নাচ দেখাইবার সময় পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত সংযুক্ত সূক্ষ্ম সূতা নৃত্য-পরিচালকের হাতে থাকে এবং কৌশলে সেই সূতার সাহায্যে পরিচালক পুতুলের নানাবিধ নৃত্য ও খেলা দেখাইয়া থাকে। কাজেই পুতুল-নাচে পুতুলের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব বা ক্ষমতা নাই—সমস্ত কিছুই পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। সেইজন্য "কর-সূত্র-ধৃত ক্রিড়া-পুত্তল" হইল অন্যের পরিচালনায় পরিচালিত ক্ষমতাহীন বস্তু বা ব্যক্তি।

মৃগ-তৃষ্ণিকা—"শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধের "মৃগ-তৃষ্ণিকা" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। "আশার ছলনা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "মানুষের এক অপূর্ণ বিকশিত রুগ্ন সমাজে প্রীতির আশা বৃথা।" কেন বৃথা তাহা লেখকের অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "সংসারে সকলেই অথ্যার অধীন।" একথার প্রমাণ স্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) আশাই মানব-হৃদয়-রূপ চির-চঞ্চল বিচিত্র যন্ত্রের সঞ্চালনী শক্তি।

(খ) আশারই কি আর এক নাম মৃগ-তৃষ্ণিকা?

(গ) অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অবোধের পক্ষে জ্ঞান আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর আলোক এক।

(ঘ) মনুষ্য হাতে ধরিয়া যাহাকে পদক্রম শিখাইয়াছে পদক্রম শিখিয়াই সে তাহাকে আঘাত করিতে চাহিয়াছে।

৪। টীকা লিখ:—

প্রলয়-ভেরী ; কর-সূত্র-ধৃত ক্রিড়া-পুত্তল।

৫। "আশার ছলনা" শীর্ষক প্রবন্ধের সারমর্ম লিখ।

রাজা আর রাজ্য

এই প্রবন্ধটি মীর মোশাররফ হোসেন-রচিত "বিষাদ-সিন্ধু" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। "বিষাদ-সিন্ধু" কারবালায় ইয়াজিদ-সেনাবাহিনী কর্তৃক হযরত ইমাম হুসাইন ও তাঁহার পরিজনবর্গের

অনেকের নৃশংস হত্যার করুণকাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি অমর সাহিত্য-সৃষ্টি এবং বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। বাংলার তাজ ও তখ্‌ত্ হইতে অনতিকাল পূর্বে বঞ্চিত মুসলমান তাঁহাদের রাষ্ট্রভাষা ফার্সী এবং প্রচলিত আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত "মুসলমানী" বাংলা-ভাষার রচনা-রীতি হইতে নানা কারণে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা নব প্রচলিত বিশুদ্ধ বাংলার রচনাশৈলীকে কিরূপ বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত শুধু আয়ত্ত নহে—নব রূপদানে সমর্থ হইয়াছিলেন, মোশার্‌রফ্ হোসেনের রচনাবলী—বিশেষ করিয়া তাঁহার "বিষাদ-সিন্ধুর" ভাষা ও রচনা-পদ্ধতি তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

"বিষাদ-সিন্ধু" ইতিহাস নহে—ঐতিহাসিক উপন্যাস মাত্র ; অর্থাৎ কিছুটা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা অপরাধ নহে—প্রশংসনীয়। বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ-সাহিত্যিক স্কট্ এবং বাংলার বঙ্কিমও এ রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের উদ্ধৃতাংশের বিষয়-বস্তু হইল এই—ইয়াযিদের পিতা খলীফা মুআবিয়ার আমলের অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও বয়োবৃদ্ধ প্রধান-মন্ত্রী হামান উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন ইয়াযিদের বিবিধ অপরিণামদর্শী কার্যে বাধাদান করার ফলে ইয়াযিদ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারবালায় ইমাম হুসাইনের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী সেনাদল মুহম্মদ হানিফার নেতৃত্বে যখন ইয়াযিদের রাজা ও রাজধানী অধিকারে উদ্যত, সে সময় বৃদ্ধ হামান কারাগারে থাকিয়াও দামেস্ক-রাজা অর্থাৎ ইয়াযিদের রাজ্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজা ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত কতকগুলি মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব সম্পর্কে স্বগতোক্তি করেন। "রাজা আর রাজ্য" বৃদ্ধ হামানের স্বগোতোক্তি। এই স্বগোতোক্তিগুলির মর্মার্থ হইল এই—রাজা যেখানে অত্যাচারী—রাজ্যের দুর্দশা সেখানে অনিবার্য। সেরূপ অবস্থায় অত্যাচারী রাজার পতন হওয়া একান্ত উচিত। কারণ, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য প্রজার—রাজার নহে। কাজেই সেই দুর্দিনে দেশ-প্রেমিক প্রজা মাত্রেরই কর্তব্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা ও অত্যাচারী রাজাকে বিদূরিত করিয়া দেশে সুশাসন প্রবর্তন করা। কেননা, রাজার দুঃশাসনের ফলে দেশের স্বাধীনতা একবার নষ্ট হইয়া গেলে সে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর স্বাধীনতা হারাইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মানুষের পক্ষে অধিকতর লজ্জা ও হীনতাজনক আর কিছুই নহে। অতএব জন্মভূমির সেই অমূল্য স্বাধীনতা রক্ষা মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন, জ্ঞানী ও স্বদেশ-প্রেমিক প্রত্যেক মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

টীকা

দামেস্ক—পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন শহর। আরবের উত্তরাংশে অবস্থিত স্বাধীন ও গণ-তান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র—শাম বা সিরিয়ার রাজধানীর নাম দামেস্ক্। দামেস্ক্-কে দামাস্কাস্‌ও (Damuscus) বলা হয়। সিরিয়ার মুসলমানী নাম শাম। দামেস্ক্ অতি প্রাচীন শহর। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহা প্রাচ্য-রোমক সাম্রাজ্যের এশিয়াস্থিত প্রদেশসমূহের রাজধানী ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা:) শাসনকালে সিরিয়া মুসলমানগণ কর্তৃক রোমকদের নিকট হইতে বিজিত হইবার পর দামেস্ক্ সিরিয়ার প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হয়। ইসলামের চতুর্থ ও শেষ গণ-তান্ত্রিক খলীফা হযরত আলী (রা:) গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হওয়ার পর সিরিয়ার গভর্ণর মুআবিয়া খলীফার পদ অধিকার করিয়া খলীফা-পদকে বংশগত রাজ-তন্ত্রে পরিণত করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

তদানীন্তন রাজধানী মদীনা হইতে রাজধানী দামেস্কে অপসারিত করেন। মুআবিয়া কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশীয় খলীফাদিগকে "উমাইয়া বংশীয় খলীফা" বলা হয়। এই বংশের খলীফাগণ প্রায় ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব কালে বরাবরই দামেস্ক তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

ইয়াযিদ—ইসলামের গণ-তান্ত্রিক খলীফা-পদকে যিনি রাজ-তন্ত্রে পরিণত করেন ইয়াযিদ সেই খলীফা মুআবিয়ার পুত্র এবং মুআবিয়ার পরবর্তী রাজ-তান্ত্রিক খলীফা। ইয়াযিদ মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী খলীফা ছিলেন। তিনি ৬৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাহারই আদেশে তাহার সেনাবাহিনী ইরাকের ইউফ্রেটিস্ বা ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালায় হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ ও শেষ গণ-তান্ত্রিক খলীফা হযরত আলীর (রা:) কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা:) তাঁহার পরিবারের অধিকাংশ লোকসহ ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অবসন্ন করিয়া অন্যায় যুদ্ধে নিহত করে। এই পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু আলোচ্য "বিষাদ-সিন্ধু" গ্রন্থে বর্ণিত মুহম্মদ হানিফা প্রভৃতির সহিত ইয়াযিদের যুদ্ধ ; হানিফা কর্তৃক দামেস্ক অধিকার : ইয়াযিদের পলায়ন ও পর্বত কর্তৃক গ্রাসিত হওয়ার কাহিনী—প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক ঘটনা মাত্র ; এইগুলির পশ্চাতে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের অস্তিত্ব নাই। কারণ প্রবন্ধ-পরিচিতিতে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, "বিষাদ-সিন্ধু"—ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইতিহাস নহে।

জয়নাল আবেদীন—প্রকৃত বানান "যয়ন্-উল্-আবেদীন"। তিনি হযরত ইমাম হুসাইনের (রা:) মধ্যম পুত্র। কারবালার নৃশংস যুদ্ধে ইয়াযিদ-সেনাবাহিনী কর্তৃক হযরত ইমাম হুসাইন (রা:) ও তাঁহার পরিবারবর্গের অধিকাংশ যখন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন তখন যয়ন্-উল্-আবেদীন নাবালক থাকায় কোনক্রমে হত্যার হাত হইতে রক্ষা পান! তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর কোনরূপ রাজনীতিতে যোগদান না করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম চর্চায় নিযুক্ত থাকেন।

মুহম্মদ হানিফা—তিনি কোন রাজ্যের অধিপতি বা কোন প্রদেশের "ওয়ালী" বা গভর্ণর পর্যন্ত ছিলেন না কিংবা কোন যুদ্ধে সেনাপতির পদও গ্রহণ করেন নাই। তবে তিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রা:) পুত্র এবং হযরত ইমাম হুসাইনের (রা:) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের (রা:) গর্ভধারিণী মাতা এবং হযরত মুহম্মদের (দ:) কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমার (রা:) মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা:) মুহম্মদ হানিফার মাতা "বিবি হনুফা" বা "বিবি হানাফিয়া"কে বিবাহ করেন। এই পর্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। কিন্তু "বিষাদ সিন্ধু" গ্রন্থে বর্ণিত ইয়াযিদের সহিত মুহম্মদ হানিফার যুদ্ধ, হানিফা কর্তৃক দামেস্ক-রাজ্য অধিকার এবং পলায়নপর ইয়াযিদকে অনুসরণ করিতে যাইয়া ইয়াযিদের সঙ্গেই পর্বত কর্তৃক গ্রাসিত হওয়ার কাহিনী নিছক কল্পনা মাত্র। [এই প্রবন্ধের "ইয়াযিদ" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।]

ওমর আলী—প্রকৃত উচ্চারণ "উমর আলী"। কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। "বিষাদ সিন্ধু" উপন্যাসের একটি কাল্পনিক চরিত্র।

গাযী রহমান--"বিষাদ-সিন্ধু" উপন্যাসের মুহম্মদ হানিফার মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখিত। কিন্তু মুহম্মদ হানিফা কখনো কোন রাজ্যের অধিপতি বা শাসন-কর্তা ছিলেন না। কাজেই তাঁহার মন্ত্রী থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং "গাযী রহমান" ও "বিষাদ-সিন্ধু" উপন্যাসের একটি কাল্পনিক চরিত্র মাত্র।

শনিক্ষয়—শত্রুক্ষয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে শনিগ্রহের কোপদৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, সে বিপন্ন হয়। কাজেই "শনিক্ষয়" অর্থে শত্রুক্ষয় বা বিপদক্ষয় বুঝায়।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। কোন্ কোন্ অভাব বা দুর্যোগ ঘটা সত্বেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার আশা থাকে, "রাজা আর রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। রাজা আর রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক কি, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৩। রাজ্যের সহিত প্রজার সম্পর্ক এবং রাজ্যের প্রতি প্রজার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং কিরূপ, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৪। যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইলে কি কি ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৫। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) স্বাধীনতা ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না।

(খ) রাজা আর রাজ্য, এই দুইটি পৃথক কথা, পৃথক ভাব, পৃথক সম্বন্ধ।

(গ) রাজ-নীতি, সমর-নীতি, এই দুইটি নীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যত জ্ঞান লাভ হইবে, যত অভিজ্ঞতা জন্মিবে, ততই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কিনা আছে।

(ঘ) সমর-কাণ্ড—যেমন কুটিল, তেমনি জটিল।

৬। টীকা লিখ :—

মুহম্মদ হানিফা ; দামেস্ক ; ইয়াযিদ ; শনিক্ষয় ; গাযী রহমান।

৭। এই প্রবন্ধটির সারমর্ম তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

হাযির

এই প্রবন্ধটি বিশ্ব-বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু রচিত বাংলা-প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত।

স্যার জগদীশ জীবন-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক-সাধক হইলেও বাংলা-সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার দান সামান্য নহে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও বিশিষ্ট বন্ধু। হয়ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রভায় তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহার লেখার সর্বত্র কাব্যের সুর অনুরণিত। সেই সঙ্গে ধ্যানী বৈজ্ঞানিকের ধ্যান-গম্ভীরতায় তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ।

বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যোদ্ঘাটন ও অজানাকে জানার সাধনায় বৈজ্ঞানিক-সাধক আর ধ্যানী-সাধক সমগোত্রীয়। গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির ফলে অজ্ঞাত সত্যের যে-ক্ষণিক ঝলক বৈজ্ঞানিক ও সাধকের মন বিদ্যুৎ-চমকের মত নিমেষে উদ্ভাসিত করিয়া যায়—সেই ক্ষণিক-পাওয়া সত্যকেই বৈজ্ঞানিক বহুবিধ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানায়ত্ত করেন—আর ধ্যানী-সাধক তাহাকেই আত্মিক-সাধনা ও ধ্যান-তপস্যার ভিতর দিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। স্যার জগদীশ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাঁহার জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাধনার পথে বহুবার তেমনি অজানা সত্যের ঝলক—

অজ্ঞাত সত্যের আহ্বান তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। সেই আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া তিনি দীর্ঘকালব্যাপী আপাতঃ-ব্যর্থ পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের নিঃসঙ্গ ও কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং চরমে সেই অজ্ঞাত সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য এই যে সত্যের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-ঝলক ও অকস্মাৎ আহ্বান বৈজ্ঞানিক ও সাধকের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া যায়—এ আহ্বান বিশ্ব-স্রষ্টারই আহ্বান। সফলতাই আসুক, আর বিফলতাই আসুক, প্রত্যেক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও ধ্যানী-সাধককেই এ আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। স্যার জগদীশ এমনি আহ্বানের উত্তরে বলিয়াছেন, "প্রভু হে, তোমার আহ্বানে আমি উপস্থিত—আমি হাযির।" বিশেষ করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার পর যেদিন এ পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়া তাঁহাকে স্রষ্টার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে সেদিন নিজের সমস্ত অক্ষমতা স্রষ্টার চরণে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া এবং তাঁহারি নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি শুধু এই কথাই বলিবেন, "প্রভু হে, আসামী হাযির"। স্যার জগদীশ তাঁহার সেই আত্মনিবেদনের কথাই আলোচ্য "হাযির" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধটি বিভাগ-পূর্ব যুগে রচিত। কাজেই ইহাতে শুধু ভারতের কথা বলা হইয়াছে। এই "ভারত" দ্বারা পাক-ভারতকে বুঝাইবে।

প্রশ্নাবলী

১। "হাযির" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক সাধনার কথা নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। পদার্থতত্ত্ববিদ জগদীশচন্দ্র বসু পদার্থ-তত্ত্ব চর্চা পরিত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ব চর্চায় কেন আত্মনিয়োগ করিলেন আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে।

(খ) আমি কি এক ? একটু মনস্থির করিলেই দুই-এর মধ্যে যে সর্বদা কথা চলিতেছে তাহা শুনিতে পাই ; ইহারাই আমাকে চালাইতেছে।

(গ) একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(ঘ) বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

(ঙ) একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

৪। বৈজ্ঞানিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য কতখানি ধৈর্য ও গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

খলীফা নির্বাচন

এই প্রবন্ধটি শেখ আবদুর রহিম-রচিত "ইস্‌লাম ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। শেখ আবদুর রহিম বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত বাংলায় সাহিত্য-রচনাকারী মুসলিম সাহিত্য-সাধকদের

www.pathagar.com

অগ্র–পথিক দলের অন্যতম নেতা। তাঁহার ভাষা–রীতি সাবলীল, শক্তিশালী ও সুন্দর এবং ইসলামী তাহ্‌যীব ও তমদ্দুন অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক লইয়া তাঁহার সাহিত্য রচিত। এই প্রবন্ধটিও ইসলামী রাষ্ট্র–বিধানের অন্যতম মূল-ভিত্তি গণ–তন্ত্রের প্রথম জয়–যাত্রার কাহিনী অর্থাৎ প্রথম খলীফা নির্বাচনের প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। এই প্রবন্ধের মূল বিবরণ হইল এই—

রসূলুল্লাহ্‌ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসুল হযরত মুহম্মদ (দ:) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও আরবময় ইসলামী–রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অর্থাৎ তিনি একাধারে মুসলমানদের ধর্ম–নেতা ও রাষ্ট্র–নেতা উভয়ই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে মুসলমানদের ধর্ম ও রাষ্ট্র নেতা হিসাবে কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা বা প্রতিনিধি হইবেন সে সম্পর্কে তিনি জীবিতাবস্থায় কোন কিছু উপদেশ দিয়া যান নাই। ফলে তাঁহার পরলোকগমনের দিন তাঁহার খিলাফৎ বা প্রতিনিধিত্ব লইয়া মুসলমানদের মধ্যে বেশ একটু মত–বিরোধ দেখা দিল। মক্কার যে–সকল মুসলমান নবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মক্কার তদানীন্তন অমুসলমানদের হস্তে কঠোর নির্যাতন সহ্য করিয়া ও সর্বস্ব হারাইয়া মদীনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে "মুহাজির" বা "আশ্রয়–প্রার্থী" বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং মদীনার যে–সকল মুসলমান ইসলামের সেই শৈশবকালে মক্কার ও আরবের অন্যান্য স্থানের অমুসলমানদের অসহনীয় অত্যাচার হইতে হযরত মুহম্মদকে (দ:) ও অন্যান্য নবদীক্ষিত মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মদীনায় আশ্রয় দান করেন, তাঁহাদিগকে "আন্‌সার্‌" বা "সাহায্যকারী" বলা হয়।

রসূলুল্লাহ্‌ মদীনা নগরেই পরলোকগমন করেন এবং মদীনাই তখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এই অবস্থায় মুসলমানদের আশ্রয়দাতা মদীনার স্থায়ী অধিবাসী "আন্‌সার্‌"গণ—না, ধর্মের জন্য সর্বত্যাগী মক্কা হইতে আগত "মুহাজির"গণ—এই দুই দলের মধ্যে ইসলাম–ধর্ম প্রতিষ্ঠায় কাহার কৃতিত্ব অধিক এবং তাহার ফলে কোন্‌ দল রসুলুল্লাহ্‌র খলীফা হইবার অধিকতর যোগ্য, সে লইয়া মতভেদ দেখা দেয়। অবশেষে আন্‌সার ও মুহাজিরদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এক মিলিত সভায় হয্‌রত আবু বকর–ই বিবিধ কারণে খলীফা বলিয়া নির্বাচিত হন।

হযরত আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হইবার পর সর্বপ্রথম যে খুৎবা বা অভিভাষণ দান করেন ইসলামের ইতিহাসে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এই অভিভাষণে তিনি মুসলমানদের নেতৃত্বের নিম্নলিখিত প্রধান সূত্রগুলি বর্ণনা করেন। (১) নেতা ভালভাবে কাজ করিলে তাঁহাকে সমর্থন করিতে হইবে, কিন্তু তিনি ভুল করিলে উপদেশ দিয়া সেই ভুল সংশোধন করিতে হইবে ; (২) সরল ও দুর্বলকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে এবং উভয়ের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে হইবে ; (৩) বিশ্বস্ততার কার্যের অনুগমন করিতে হইবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার কার্য হইতে দূরে থাকিতে হইবে ; (৪) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হইতে দূরে সরিয়া থাকা চলিবেনা এবং (৫) নেতা যতক্ষণ আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের আদর্শ মানা করিয়া চলিবেন, শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত নেতার আদেশ মান্য করিয়া চলিতে হইবে ; কিন্তু নেতা সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে তাঁহাকে মানা করিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া যাইবে এবং সেরূপ নেতারও জনসাধারণের নিকট হইতে আনুগত্য লাভের কোনরূপ অধিকার থাকিবে না।

www.pathagar.com

টীকা

প্রেরিত মহাপুরুষ—রসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল এবং ইসলাম-ধর্ম-প্রবর্তক হযরত মুহম্মদকেই (দ:) এখানে প্রেরিত মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। "রসূল" আরবী শব্দ ; ইহার অর্থ : প্রেরিত ব্যক্তি বা আল্লাহ্‌র বাণী-বাহী প্রেরিত মহাপুরুষ। [এই পুস্তকের "নাত" শীর্ষক কবিতার "রসূল" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

হযরত আবু বকর (রা:)—ইনি হযরত মুহম্মদের (দ:) আবাল্য বিশ্বস্ত বন্ধু এবং প্রথম পুরুষ-শিষ্য এবং ইসলামী-রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা। হযরত মুহম্মদের (দ:) শ্বশুরও তিনি ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌র সর্বকনিষ্ঠ পত্নী বিবি আয়েশার (রা:) তিনি পিতা। বিবি আয়িশার (রা:) গৃহেই রসূলুল্লাহ্ পরলোকগমন করেন এবং ঐ গৃহেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। হযরত মুহম্মদ (দ:) যখন কুরাইশদের অত্যাচারে মক্কা হইতে হিজ্‌রত্ অর্থাৎ দেশত্যাগ করিয়া শত্রুদের সমস্ত প্রহরা ও অবরোধ ব্যর্থ করিয়া গোপনে মদীনায় চলিয়া আসেন সেই কঠিন সময়ে একমাত্র আবু বকরই (রা:) তাঁহার সাথী ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে হযরত আবু বকর (রা:) ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহম্মদ (দ:) এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম ইসলামের সেবায় তাঁহার সর্বস্ব দান করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ্ আতিক-ইব্‌ন্-আবু কোহাফা আবু বকর সিদ্দিক। কিন্তু তিনি "আবু বকর" অর্থাৎ "কুমারী বা নিঃসন্তান নারীর পিতা"—এই নামেই পরিচিত। "কুমারী বা নিঃসন্তান নারী" দ্বারা হযরত মুহম্মদের (দ:) সর্ব কনিষ্ঠা পত্নী বিবি আয়িশাকেই (রা:) বুঝায়। কারণ বিবি আয়িশা (রা:) নিঃসন্তান ছিলেন। হযরত মুহম্মদের (দ:) পরলোকগমনের পর হযরত আবু বকর (রা:) ৬০ বৎসর বয়সে ইসলামী-রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হিসাবে আড়াই বৎসর কাল পর্যন্ত দৃঢ়হস্তে সুশাসন চালাইয়া রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং হিজরী ১৩ সাল, ২২শে জমাদিউস্-সানী এবং খৃষ্টীয় ৬৩৪ সালে ২৪শে আগস্ট তারিখে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। সেজন্য তাঁহার উপাধি "সিদ্দিক" বা "সত্যবাদী"।

হযরত উমর ফারুক (রা:)—এই পুস্তকের "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "উমর ফারুক" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

হযরত মুসা (আ:)—এই পুস্তকের "নাত" শীর্ষক কবিতার "মুসা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

তূর—এই পুস্তকের "ফাতেহা-ই-দোয়ায্-দহম" শীর্ষক কবিতার "তূর" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

হযরত আবু উবায়দা (রা:)—তিনি হযরত মুহম্মদের (দ:) অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত সাহাবা বা সহচরগণের অন্যতম। মক্কার কুরাইশ বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি প্রবীন ও অত্যন্ত ধীর-স্থির লোক ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। হযরত উমরের (রা:) শাসনকালে তিনি ইরাকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাম বা সিরিয়াস্থ প্রধান সেনাপতি পদে রচিত হন। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের যেরুযালেম প্রধানতঃ তাঁহারই পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ["উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "খালিদ" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।]

খলীফা—এই পুস্তকের "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "খলীফা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কুরাইশ—আরবের একটি শ্রেষ্ঠ বংশ। হযরত মুহম্মদ (দ:) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশীয়গণ মক্কানগরীর অধিবাসী। প্রাক্-ইসলামী যুগে সারা আরবের উপর এই বংশের প্রভাব ছিল অসীম। কারণ তদানীন্তন সারা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির "কাবা"র ছিলেন ইহারা পুরোহিত। হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) ও তৎপুত্র হযরত ইস্‌মাঈল (আ:) কর্তৃক মক্কায় প্রতিষ্ঠিত একশ্বেরবাদী ভজনালয় "বায়তুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গৃহ এই কাবা

www.pathagar.com

কালক্রমে পৌত্তলিকতার প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায় এবং তথায় ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুরাইশ বংশীয়গণ তাহার সেবাইত বা পুরোহিত হন। হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক ইসলাম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কাবা গৃহ হইতে এই ৩৬০টি প্রতিমা বিদূরিত হয় এবং তথায় পুনরায় একেশ্বরবাদী উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুরাইশ বংশের বিপুল প্রতিপত্তি ও লাভজনক-পৌরহিত্যের চির অবসান ঘটে। এই জন্যই ইসলাম প্রচারের সময় কুরাইশ বংশের প্রায় সকলেই একত্রে মিলিত হইয়া হযরত মুহম্মদের উপর ও নবদীক্ষিত মুসলমানগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে থাকে এবং তাঁহাদিগকে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিতে বাধ্য করে। কালক্রমে সত্যের জয় হইল এবং মক্কা হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক বিজিত হইয়া তথায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন এই কুরাইশ বংশীয়গণই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং হযরত মুহম্মদের (দ:) পরলোকগমনের পর "খুলাফায়ে রাশেদিন" অর্থাৎ প্রথম চার খলীফা হযরত আবু বকর (রা:), হযরত উমর ফারুক (রা:), হযরত উসমান (রা:) ও হযরত আলী (রা:) এবং তাহাদের পরবর্তী উমাইয়া বংশীয় ও আব্বাসীয় বংশীয় খলীফাগণ সকলেই এই কুরাইশ বংশ হইতেই উদ্ভূত হন। "রাশেদিন" আরবী "রশীদ" বা "রাশেদ" শব্দের বহুবচন। যিনি নিজে সৎপথ অনুসরণ করিয়া চলেন এবং অন্যকে সৎপথে চলিতে উপদেশ দান করেন তাহাকেই "রশীদ' বা "রাশেদ" বলা হয়। ইসলামের প্রথম চারিজন খলীফা ইসলামের গণ-তান্ত্রীক-নীতি অনুসরণ এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও আড়ম্বরহীন প্রকৃত ধর্মীয়জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে "খুলাফায়ে রাশেদীন" বলা হয়। "খুলাফা" "খলীফা" শব্দের বহুবচন। ইহাদের পরবর্তী খলীফাগণ খলীফা-পদকে বংশগত রাজ-তন্ত্রে পরিণত করেন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করিতে থাকেন।

মদীনা--এই পুস্তকের "জিন্দা পাকিস্তান" শীর্ষক কবিতার "মদীনা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাফেকা—মদীনা অঞ্চলের মহল্লার নাম।

"আমীনে হাজেহিল উম্মত"—আরবী বাক্য। ইহার প্রকৃত বানান : "আমীনে হাযেহিল উম্মত"। ইহার অর্থ : "এই উম্মত বা জাতির আমীন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি।" "আমীন" আরবী শব্দ। অর্থ : বিশ্বস্ত ব্যক্তি। "উম্মত" আরবী শব্দ। অর্থ : জাতি বা কোন ধর্মের অনুবর্তী ব্যক্তিবর্গ। ["নাত" শীর্ষক কবিতার "উম্মত" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্নাবলী

১। প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদের (দ:) পরলোকগমনের দিন মদীনা ও মদীনাবাসী মুসলমানগণের অবস্থা তথা সারা আরবের অবস্থা, "খলীফা নির্বাচন" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। হযরত আবুবকর (রা:) কি ভাবে খলীফা নির্বাচিত হইলেন আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৩। হযরত আবুবকর (রা:) খলীফা হিসাবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া সর্বপ্রথম যে-অভিভাষণ দান করেন তাহাতে ব্যক্ত মূলনীতিগুলি আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে বর্ণনা কর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

www.pathagar.com

(ক) হায় আরব ! আজ তোমার বক্ষে যে গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিরাট বিশ্বব্যাপী কাতর ক্রন্দন ও অশ্রুজলের উচ্ছ্বাসেও তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না।

(খ) যাহা পূর্ণ ছিল, তাহা শূন্য হইয়াছে। যাহা উজ্জ্বল ছিল, তাহা মলিন হইয়াছে। যাহা জীবন ছিল, তাহা মৃত্যুতে দাঁড়াইয়াছে।

৫। **টীকা লিখ :--**

হযরত আবুবকর (রা:) ; কুরাইশ ; হযরত আবু উবায়দা।

গয্‌নীর রাজোদ্যানে ফিরদৌসীর প্রবেশাধিকার

এই প্রবন্ধটি মোজাম্মেল হক সাহেব-রচিত "ফিরদৌসী-চরিত" নামক ফিরদৌসীর এক জীবনী-গ্রন্থ হইতে সংকলিত। মুসলমান সমাজে যে-সকল সাহিত্যিক বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত বাংলায় গ্রন্থ রচনায় প্রথম সফল হস্তক্ষেপ করেন মোজাম্মেল হক তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভাষা-রীতি বঙ্কিম-প্রভাবান্বিত এবং ভাষার ধারা সুললিত ও সাবলীলা-গতি-বিশিষ্ট। কিন্তু রচনার বিষয়বস্তু সমস্তই মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুসারী।

মহাকবি ফিরদৌসী জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলির অন্যতম ফার্সী-ভাষায় রচিত "শাহ্-নামা" নামক মহাকাব্যের রচয়িতা গয্‌নীর অধিপতি সুলতান মাহমুদের সভাকবি হিসেবে এবং তাঁহার আদেশে ফিরদৌসী ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ষাট হাজার শ্লোকে বিশুদ্ধ ফার্সী ভাষায় এই মহাকাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রাচীন পারস্য বা ইরান সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত আদ্যোপ্রান্ত কাব্যাকারে প্রথিত হইয়াছে। এই কাব্যের ভাষা অত্যন্ত সুমার্জিত, সুমিষ্ট, অবাধ ও বেগবান।

ফিরদৌসী ইরানের "তুস" নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। গয্‌নীর অধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান মাহমুদের বিদ্যোৎসাহিত্য ও বদান্যতার কথা শ্রবণ করিয়া নিজ ভাগ্যান্বেষণে তিনি স্বদেশ হইতে গয্‌নী আগমন করেন। কিরূপ নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়া তিনি সর্বপ্রথম গয্‌নীর রাজ্যোদ্যানে গযনী-অধিপতির জন্য তিনজন সভাকবির সহিত পরিচিত ও তাঁহাদের দ্বারা অভার্থিত হইয়া রাজ-সভায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন—আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

টীকা

গয্‌নী--বর্তমান আফগানীস্তানের একটি অতি প্রাচীন শহর। প্রাচীনকালে গয্‌নী আফগানীস্তানের রাজধানী ছিল—এবং রাজধানীর নামানুসারে রাজ্যের নামও গয্‌নী ছিল। ১৭ বার ভারত আক্রমণকারী ও পশ্চিম-ভারতের গুজরাটস্থিত সোমনাথের মন্দির ধ্বংশকারী প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান মাহমুদের রাজধানী এই গয্‌নী নগরেই অবস্থিত ছিল। সেই সময় পশ্চিমে ইরান হইতে পূর্বে পাঞ্জাব পর্যন্ত গয্‌নী রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

সুলতান মাহমুদ—তিনি গয্‌নীর প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্‌বিজয়ী অধিপতি ছিলেন, তিনি তুর্কী বংশীয় লোক। তাঁহার রাজ-বংশের নাম গয্‌নী রাজবংশ। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে তাঁহার রাজ-বংশ ধন-গৌরবে ও প্রবল

www.pathagar.com

প্রতাপে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুলতান মাহমুদ সতরবার পাক-ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সুশাসক, ন্যায় বিচারক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

ফিরদৌসী--বিশ্ব-বিখ্যাত কবি ফিরদৌসী ইরান দেশের খোরাসান প্রদেশের প্রসিদ্ধ তুস্ নগরের উপকণ্ঠে সাদাব-ইয়ার্ জান নামক পল্লীতে হিজরী ৩৫৮ সালে (৯৪০ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম আবু-আল-কাসেম। "ফিরদৌসী" তাঁহার উপনাম বা উপাধি মাত্র। তিনি যখন গয্‌নীর সুলতান মাহ্‌মুদের রাজ-সভার সভা-কবি তখন একদা তাঁহার অপূর্ব কবিতামালা শ্রবণ করিয়া সুলতান বিমুগ্ধ হইয়া যান এবং তাঁহাকে "ফিরদৌসী" বলিয়া অভিহিত করেন। "ফিরদৌসী" শব্দের অর্থ "স্বর্গীয়"। এই বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী সুলতান ও তদীয় অমাত্যবর্গ কর্তৃক তিনি আরও বিবিধ গৌরবান্বিত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সাধারণতঃ "ফিরদৌসী" নামেই তিনি পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তুস নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি "ফিরদৌসী তুসী" নামেও আখ্যাত।

গযনীর রাজসভার তিনজন কবির সঙ্গে ফিরদৌসীর যে-কাব্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বাংলায় তাহার কাব্যানুবাদ এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। তাহার মূল ফার্সী কবিতার চরণগুলি এই—

চু' আরযে তু মাহ্ নাবাশদ্ রৌশন্,
মানন্দে রোখ্‌ৎ গুল্ না-বুয়াদ্ দর্ গুল্‌শন্।
মেজ্জগানৎ হামী গুজব্ কুনাদ্ যে জৌশন্,
মানন্দে সিনানে গে'ও, দর্ জঙ্গে পশন্।।

গে'ও—মহাকবি ফিরদৌসী-রচিত শাহ্‌নামার একটি কাল্পনিক চরিত্র। কি করিয়া "দাবা" খেলার প্রবর্তন হয় তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে ফিরদৌসী এই চরিত্রটির অবতারণা করেন। গল্পটি এই—জম্‌হুর নামক এক ভারতীয় রাজা সান্দালী নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নাবালক পুত্র গে'ওকে রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করিলে তদীয় স্ত্রী তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাই-কে বিবাহ করেন এবং মাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাই-এর ঔরসে গে'ও-এর মাতার "তাল্‌হান্দ" নামক আর এক পুত্র হয়। গে'ও-এর বয়স যখন ৭ বৎসর এবং তাল্‌হান্দের বয়স দুই বৎসর তখন মাই মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং প্রজাগণ কর্তৃক রাণী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। সাবালক হওয়ার পর কে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে এই লইয়া গে'ও ও তাল্‌হান্দের মধ্যে বিবাদ বাঁধে এবং রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইজনকে সমর্থন করিতে থাকে। গে'ও ছোট ভাই তাল্‌হান্দের সঙ্গে সর্বপ্রকার আপোষ মীমাংসায় ব্যর্থ হইয়া অবশেষে প্রস্তাব করেন যে, দুই দলের মধ্যে রক্তপাতহীন এক যুদ্ধ হোক এবং উভয় পক্ষের সৈন্য-পরিচালনা-নৈপুণ্য দ্বারা যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হোক। তদনুসারে নগরের বাহিরে এক বিস্তৃত প্রান্তরে দুই দলের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের সময় হঠাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তাল্‌হান্দ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাণী এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া উক্ত যুদ্ধ কিভাবে সংঘটিত হয় তাহা জানিতে চাহেন। তখন ঐ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের একটি মানচিত্র বা প্লেন অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ছক্ কাটিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গজ, অশ্ব, সৈন্য-সামন্ত যে-যে-ভাবে ছিল সেভাবে দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং সৈন্য পরিচালন-কৌশলও বলিয়া দেওয়া হয়। এই ছক্ কাটা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্লেন হইতেই দাবা খেলার উৎপত্তি।

পশন—পশনের যুদ্ধে গে'ও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তীরন্দাজ হিসাবে তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। এ সম্পর্কিত বিবরণ শাহ্-নামায় উল্লেখিত আছে।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। ফিরদৌসীর সর্বপ্রথম গয্‌নী আগমনের পর গয্‌নী সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে-ধারণা হয় আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। গয্‌নীর রাজ্যোদ্যানে ফিরদৌসী কিভাবে প্রবেশাধিকার পাইলেন আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কাব্য-কাননে বিচরণ করা স্বল্প সাধনার কার্য নহে।

(খ) ভস্মাবরণের মধ্যেও অগ্নি থাকে। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডেও বারি বর্ষণ করে, কদাকার কোষাভ্যন্তরেও রত্ন থাকিতে পারে এবং অন্ধকারময় গভীর গহ্বরেই মণির উদ্ভব হয়।

৪। টীকা লিখ :—

ফররুখী, ফিরদৌসী, গয্‌নী, সুলতান মাহমুদ।

আকাঙ্ক্ষা

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা-সাহিত্যাকাশের প্রদীপ্ত সূর্য। তিনি তাঁহার নামের সার্থকতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই যে-টি তাঁহার প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে প্রাণবন্ত না হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বাংলা ভাষার রচনা-রীতির গতি নির্দ্ধারণে দুইজনের দানই সর্বাধিক ; তাঁহাদের একজন বঙ্কিক আর একজন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিম বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-বহুল বিদ্যাসাগরীয় রচনা-রীতির হাত হইতে মুক্তি দেন কিন্তু তাহাকে কথ্য ভাষার স্তরে আনিতে পারেন নাই। প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" নামক উপন্যাসে কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিবার প্রথম উদ্যোক্তা বটে—কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণ রূপদান করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্য-ভাষাকে শুধু সাহিত্যিক মর্যাদাই দান করেন নাই—তাঁহার অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহাকে বাংলা-সাহিত্যের রূপরস মাধুর্য-ময় এক শক্তিশালী বাহনরূপে গঠন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য "আকাঙ্ক্ষা" নামক প্রবন্ধ ও তাহার পরবর্তী "আমার ছেলে বেলা" ও "পায়ে চলার পথ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই কথ্য-ভাষায়ই রচিত।

আকাঙ্ক্ষা প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হইল এই—ব্যক্তি জীবনে এবং জাতীয় জীবনে বড় হইতে হইলে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল উদার ও বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা। মানুষকে সর্বক্ষেত্রে পরিচালিত করে তাহার মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা—তাহার দেহের বল নহে। কারণ দেহের বল পরিচালিত হয় মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে। মনের আকাঙ্ক্ষা যদি ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হয়—যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ-সর্বস্ব হয়—তবে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের সীমাও হইবে সংকীর্ণ—গণ্ডীবদ্ধ। যেখানে সংকীর্ণতা সেখানেই কুসংস্কার, গোড়ামী ও স্থবিরতা। সুতরাং জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃত উন্নতির জন্য,—মুক্তবুদ্ধি ও উদার মনুষ্যত্বসম্পন্ন জীবনগঠনের জন্য চাই উদার ও বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে

www.pathagar.com

কার্যে পরিণত করিবার জন্য দুঃসাধ্য অধ্যবসায় ও দুর্জয় সংকল্প। আর দু:সাধ্য ও দুর্জয় সংকল্পময় এই উদার ও বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাকে কার্যে পরিণত করিতে পারে একমাত্র তরুণেরাই।

টীকা

মাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশি—এখানে "মাদৃশী"র স্থলে "যাদৃশী" হইবে, ছাপার ভুলবশতঃ এইরূপ হইয়াছে। এই সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ—মানুষের ভাবনা বা চিন্তা যেরূপ, তাহার সিদ্ধিও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

১। "আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে বলা হইয়াছে, "এই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে য়ুরোপ শিক্ষকতার ভার পেয়েচে। কেন পেয়েচে?"—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে এই প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। এই প্রবন্ধের একস্থানে প্রশ্নকরা হইয়াছে, "প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞান-সমুদ্রের যে-বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে সে বন্দর কোথায়?"—এই প্রবন্ধেরই অনুসরণে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। কোন্ দেশে মানুষ আপন সমাজে আত্মাকে দেখতে পায়না, কেবল হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি এবং মৃতযুগের আবর্জনারাশিকেই চারিদিকে দেখতে পায়?—এই প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার উত্তর লিখ।

৪। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার লিখ।

৫। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে শিশুকাল থেকেই কোমর বেঁধে আমরা খর্ব করি"— এই প্রবন্ধের অনুসরণে এই কথার সত্যতা প্রমাণ কর।

৬। পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা কর :—

(ক) জীর্ণতাই আবর্জনা, জীর্ণতাই যাত্রা-পথের বাধা।

(খ) যে-মানুষ গৌরব পায়, সে-ই গুরু হয়।

(গ) মানুষের যে বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সেটাকে বড় করে তুলে মানুষ বড় হয় না, ছোটই হয়ে যায়; সে যেন খাঁচার ভিতরে পাখীর ওড়া, তাতে পাখার সার্থকতা নাই।

(ঘ) মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীন।

(ঙ) যে বিদ্যা তারা শিক্ষকদের হাত থেকে গ্রহণ করেচে সে বিদ্যা তাদের আপন দেশেরই সাধনার ধন, তার মধ্যে শুধু ছাপার অক্ষর নেই।

(চ) আমাদের যে দারিদ্র্য, সে আত্মারই দারিদ্র্য।

(ছ) আত্মার সচল প্রবাহ যখন শুষ্ক, তখনই আচারের নীরস নিশ্চলতা।

(জ) সৃষ্টিকে যে সত্য বহন করেচে, সে সত্য সচল।

(ঝ) অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মত লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই।

(ঞ) যে জ্ঞান আমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যায়, গোড়া থেকেই সেই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের অসত্য ব্যবহার।

www.pathagar.com

(ট) যে সমাজে কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই, সমস্তই ধরাবাঁধা, সে সমাজ কি বুদ্ধিমান শক্তিমান মানুষের বাসের যোগ্য? সে সমাজে মৌমাছির চাক বাঁধবার জায়গা।

(ঠ) যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয়ত ভিক্ষা পাই, যখন দিতে পারি তখন আপনাকে পাই।

আমার ছেলে বেলা

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত "আমার ছেলে বেলা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বাংলা-সাহিত্য-সমাজেই শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তাহা নহে—সামাজিক ও পারিবারিক সম্ভ্রম ও মর্যাদার দিক দিয়াও তাঁহার আসন ছিল অতি উচ্চে। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং বৃহৎ জমিদার। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বোধহয় সর্বপ্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। এমন বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও রবীন্দ্রনাথকে ছেলে বেলায় কিরূপ অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবন-যাপন করিতে হইয়াছে আলোচ্য "আমার ছেলে বেলা" প্রবন্ধ তাহারি আলেখ্য। জীবন গঠনের সময় অর্থাৎ বাল্যে ও কৈশোরে সাধারণ পরিধেয় ও সাধারণ আহার্য ইত্যাদি গ্রহণ এবং ভোগ-বিলাসহীন সংগ্রামশীল সাধারণ জীবন-যাপন পরবর্তী জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যথার্থ বড় হইবার জন্য কতখানি প্রয়োজন—রবীন্দ্রনাথের মত জগৎ-বিখ্যাত মহা মণিষীর ছেলে বেলাকার জীবনের বিবরণ হইতে তাহা অনায়াসে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। যাহারা ছেলে বেলা হইতে বিলাস-ব্যসনে প্রতিপালিত হইয়া ননীর পুতুল হইয়া দাঁড়ায়--কঠোর জীবন সংগ্রামে তাহাদের স্থান নাই।

এই প্রবন্ধের আর একটি বক্তব্য হইল এই যে, শিক্ষা ও বিদ্যা-অর্জন-ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম দরকার নিজ মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জন করা।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তাঁহাদের গৃহ-ভৃত্যকে "ব্রজেশ্বর" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার "জীবন স্মৃতি" নামক ঐ গৃহ-ভৃত্যটির নাম দিয়াছেন "ঈশ্বর"। "ব্রজেশ্বর" ও "ঈশ্বর" একই ব্যক্তি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের উক্ত "জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থের টীকায় ও পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ "পাখী", "গরীব", "নবাবী", "আমিরী" প্রভৃতি শব্দ "পাখি", "গরিবি", "নবাবি", "আমিরি"—এইভাবে বানান করিয়াছেন, অর্থাৎ দীর্ঘ-ই-কারের (ঈ) স্থলে হ্রস্ব-ই-কার (ই) ব্যবহার করিয়াছেন। বর্তমান প্রচলিত বানান অনুসারে "পাখী" এবং "গরীব" শব্দে হ্রস্ব-ই-কার এবং দীর্ঘ-ই-কার উভয়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু "নবাবী" ও "আমিরী" এই শব্দদ্বয় যখন কিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাহাদের বানান হইবে "নবাবি" এবং "আমিরি" রূপে অর্থাৎ শেষ অক্ষরে হ্রস্ব-ই-কার যোগ করিয়া ..... শব্দ দুইটি যখন বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবে তখন তাহাদের বানান হইবে "নবাবী" ও "আমিরী" রূপে অর্থাৎ তাহাদের শেষ অক্ষরে দীর্ঘ-ই-কার (ঈ) যোগ হইবে। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই নীতি অনুসরণ করেন নাই।

www.pathagar.com

টীকা

তোশাখানা—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : ভাণ্ডার গৃহ ; মূল্যবান জিনিষাদি রাখিবার ঘর বা ভাণ্ডার। কিন্তু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা।" আরবী-ফার্সী ভাষায় কিংবা "নবাবি জবানিতে" "চাকর-নোকরদের মহলকে" কখনো "তোশাখানা" বলা হয় না এবং হইত না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, "তোশাখানা" অর্থ ভাণ্ডার-গৃহ। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক "চাকর-নোকরদের মহল" অর্থে এই শব্দটির প্রয়োগ ভুল।

যবানিতে—ফার্সী শব্দ। প্রকৃত বানান : যবানীতে। অর্থ : প্রমুখ্যাৎ মুখের কথা দ্বারা। "যবান" শব্দ হইতে উৎপন্ন—এই "যবান" শব্দের অর্থ : ভাষা ; কথা ; জিহ্বা।

আমিরি--আরবী শব্দ। প্রকৃত বানান : আমীরী। "আমীর" শব্দ হইতে উৎপন্ন। "আমীর" শব্দের প্রকৃত অর্থ : আদেশ-দাতা বা নেতা। আরবী "আম্‌র্" বা "আদেশ" শব্দ হইতে "আমীর" শব্দ উদ্ভূত। আমিরি বা আমীরী শব্দের এদেশে প্রচলিত অর্থ : বিলাসিতা এবং বিত্তশালীতা ; জাক্‌জমক্‌পূর্ণতা।

লক্ষ্মীবন্ত—ভাগ্যবান ; ধনবান। হিন্দুশাস্ত্রমতে "লক্ষ্মী" ধন, ঐশ্বর্য, সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অতএব "লক্ষ্মীমন্ত" অর্থ "লক্ষ্মীবান অর্থাৎ ধন, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যশালী।

শুচিবাই—শুচিতা বা পবিত্রতা রক্ষার জন্য পাগলামি বা শুচিতা রক্ষার বাতিক।

প্রশ্নাবলী

১। ব্রজেশ্বর কে? তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি?—"আমার ছেলে বেলা" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার উত্তর দাও।

২। রবীন্দ্রনাথের ছেলে বেলাকার কলিকাতার অবস্থা, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে বর্ণনা কর।

৩। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের শরীর ও স্বাস্থ্য কেমন ছিল এবং সেরূপ থাকিবার কারণ কি, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৪। নীলমাধব ডাক্তার কে এবং তদানীন্তন চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ ছিল, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার পরিচয় দাও।

৫। কিশোরী চাটুজ্যে কে এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি, তাহা বর্ণনা কর।

৬। বাল্যে রবীন্দ্রনাথের আহার্য ও পরিধেয় কিরূপ ছিল, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার বিবরণ দাও।

পায়ে চলার পথ

এই লেখাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত "লিপিকা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। ইহা একটি কাব্যময় গদ্য রচনা—অপূর্ব সুন্দর ইহার ভাষা—সহজ, সরল অথচ কোন্ অতল গহনতায় যেন লীন হইয়া গিয়াছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত এক অজানা পল্লী-অঞ্চলের পথ মহামনীষার ধ্যান-স্বপ্নের যাদু স্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে—ক্ষুণ্ন হইয়াছে মহৎ নগণ্য হইয়াছে সর্বাগ্রগণ্য। এই পৃথিবীর বুকে নিত্যদিন মানুষের এই যে আনা-গোনা চলিয়াছে—

www.pathagar.com

জীবনের অশ্রান্ত স্রোত এই যে একটানা বহিয়া যাইতেছে—কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত সাধ, কত স্বপ্ন—বুকের আঁধার গুহায় নিঃশেষিত কত অকথিত বাণীর তরঙ্গ—ক্ষণিক জানা-অজানার কত নিত্যনব মিছিল এই অশ্রান্ত চির প্রবহমান স্রোতের বুকে ঢেউ-এর দোলায় দোলায় উঠিতেছে পড়িতেছে আর মহাকাব্যের অনন্ত সাগরে চির লীন হইয়া যাইতেছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যে মুহূর্ত চলিয়া গেল, যে দিন গত হইল—যে জানা সমাপ্ত হইয়া গেল—সে আর ফিরিয়া আসেনা—আসেনা তাহার সেই প্রথম জানার অবিকৃত প্রতিকৃতি লইয়া। হয়ত আবার নূতন জানা হয়—কিন্তু সে-জানার পরিবেশ ভিন্ন, মানস-স্বরূপ ভিন্ন। অতীত জানা সে আর নয়। অগণিত মানুষের লক্ষ আশা-আকাঙ্ক্ষাময় এই চির চলমান এবং চির বিলীয়মান জীবন-স্রোতের কাহিনীই রবীন্দ্রনাথের সোনার কাঠির স্পর্শে এই প্রবন্ধে অপরূপ মহিমায় রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

এই লেখাটি কলিকাতা-অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য-ভাষায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীর স্পর্শে কথ্য-ভাষাও যে কিরূপ অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-সুষমাময় হইয়া উঠিতে পারে এই লেখাটি তাহার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

টীকা

পদাবলী—ইহা এক প্রকার গীতি-কবিতাময় কাব্য। ইহাকে সাধারণতঃ বৈষ্ণব-পদাবলী বলিয়াই অভিহিত করা হয়। কারণ বৈষ্ণবদের আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণের (পরকীয়া) প্রেম-লীলাই এই কাব্যের মূল-বিষয়বস্তু। অতি সুমধুর ও ললিত ভাষায় এই কাব্য রচিত। বৈষ্ণব-কবি-চিত্তের অশ্রুজলে গাঁথা এই গীতি-কবিতার উৎস হইল ভক্ত ও প্রেমিকের আরাধ্য ও প্রেমাস্পদকে পাওয়ার ব্যাকুলতা। হৃদয়-প্রধান বাঙ্গালীর কাব্য-প্রতিভা এই জন্যই এই গীত-কবিতায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারিয়াছে। ইহা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাহিরের কোন প্রভাব ইহাতে নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস পদাবলী-কাব্যের যে-মধুর ধারা বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করিলেন তাহাই দীর্ঘ দিন বাংলার দুই কূল ছাপাইয়া বন্যাবেগে বহিয়া চলিল। সেই ধারার জের রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহের পদাবলী এবং গীতাঞ্জলী পর্যন্ত দেখিতে পাই। দেড় শতেরও অধিক পদ-কর্তা বৈষ্ণব-পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকজন মহিলা এবং মুসলমান কবিও আছেন। পদাবলীতে মোটামুটি তিন প্রকারের ছন্দ দেখা যায়; যথা—মাত্রাবৃত্ত; অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মিশ্রিত ছন্দ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রধান রস পাঁচটি; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। পদাবলী এই পঞ্চ রসের সমবায়ে রচিত।

ভৈরবীর সুর—ভারতীয় সংগীতের ছয় রাগের অন্যতম রাগ হইল "ভৈরব"। সেই ভৈরব রাগের ছয় রাগিণীর অন্যতম রাগিণী হইল "ভৈরবী"। এখানে সেই ভৈরবী রাগিণীর সুরের কথাই বলা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। "পায়ে চলার পথ" শীর্ষক প্রবন্ধটির মূল-বক্তব্য তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর:

(ক) একদিন এই পথকে মনে হইয়াছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

www.pathagar.com

(খ) এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

(গ) আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম ; দেখলুম, এই পথটি বহু বিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

(ঘ) বোবা পথ কথা কয়না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

(ঙ) পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।

তোতা কাহিনী

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত "লিপিকা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইহা একটি রূপক-গল্প। পৃথিবীর কোন কোন দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা যে-ভাবে পরিচালিত হয় তাহাতে শিক্ষার্থী অপেক্ষা শিক্ষার-আয়োজনকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর জন্যই যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন ও আয়োজন—এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতিগত প্রবণতাকে অনুসরণ করিয়া—সে প্রবণতাকে হত্যা করিয়া নয়—শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলাই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—এই সহজ সত্যটিকেই আজকাল কোন কোন দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ অবলীলাক্রমে ভুলিয়া যান কিংবা অগ্রাহ্য করেন। ফলে শিক্ষার্থীর শারীরিক মৃত্যু না হইলেও তাহার মনন-শক্তি ও প্রাণ-স্ফূর্তির যে প্রভূত অবনতি ঘটে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যে তাহা নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যায়—একথা অনস্বীকার্য। অথচ এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার নাম করিয়াই এই ব্যবস্থার পরিচালকগণ দেশের ও রাষ্ট্রের অজস্র অর্থ নষ্ট করেন এবং নিজেরা আত্মসাৎ করেন। এই অব্যবস্থা ও অনাচারের কঠোর প্রতিবাদ হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ ইহাকে রূপকের আবরণে বিদ্রূপের কঠোর কাশাঘাত করিয়াছেন। রাজ-শক্তির তোষামোদকারী কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য কিংবা অতি পাণ্ডিত্যের আত্মভোলা সারল্যে কঠোর সত্য ব্যক্ত না করিয়া কর্তৃপক্ষের মনোমত কথা বলিয়া থাকেন এবং তদ্বারা কর্তৃপক্ষকে ভ্রান্তিজনক পরামর্শ দান করেন। ফলে দেশের ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। আলোচ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও বিদ্রূপের কশাঘাত হানিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। "তোতা কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধের সারমর্ম তোমার নিজ ভাষায় লিখ?

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না ; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে।

(খ) পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল।

(গ) তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

www.pathagar.com

বঙ্গদেশ

এই নাট্যাংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত "নূরজাহান" নামক নাটক হইতে উদ্ধৃত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাধারণতঃ জি, এল, রায় নামেই পরিচিত। হাস্য-রসাত্মক কবিতা এবং গানের রচয়িতা হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেও নাট্যকার হিসাবেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের অন্যতম। তাঁহার নাটকের ভাষা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও মনোমুগ্ধকর। বলার ভঙ্গিটিও অতি চমৎকার। বক্তব্যের পরিমিতির সীমারেখা তাঁহার নাটকে কোথাও লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচিত নাটকগুলির প্রধান সুর হইল স্বদেশ-প্রেম।

আলোচ্য নাট্যাংশও সেই স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন পরিস্ফুট। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আসল নাম মেহেরুন্নিসা। মেহেরুন্নিসার প্রথম স্বামী শের খাঁ বা শের আফগান বর্ধমানের শাসনকর্তা ছিলেন এবং বঙ্গদেশকেই স্বদেশ বলিয়া অনেকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শের খাঁ ও মেহেরুন্নিসার কথোপকথনের মাধ্যমে নাট্যকার এই নাট্যাংশে বাংলার অপূর্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য এবং সেই সঙ্গে তাহার দৌর্বল্য ও দুর্ভাগ্যের কথা গভীর দরদের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা স্বদেশের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ এবং অনুরাগের স্বপ্ন-রঙ্গে অনুরঞ্জিত।

টীকা

নূরজাহান—এই পুস্তকের "কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতার "নূরজাহান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

শের খাঁ--"কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতার "নূরজাহান" ও "শের-আফগান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

আসফ--পূর্ণ নাম আসফ খান। তিনি নূরজাহানের ভ্রাতা এবং সম্রাট শাহ্জাহানের শ্বশুর। বিশ্ববিখ্যাত "তাজমহল" যাঁহার সমাধির উপর নির্মিত, সম্রাট শাহ্জাহানের সেই প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের তিনি পিতা। তিনি সম্রাট শাহ্জাহানের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন।

প্রশ্নাবলী

১। "বঙ্গদেশ" শীর্ষক নাট্যাংশের অনুসরণে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

২। আলোচ্য নাট্যাংশের এক স্থানে বলা হইয়াছে "এত সুখ বুঝি কারো সয়না।" কেন সয়না—
উক্ত নাট্যাংশেরই অনুসরণে বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) হা অনাথা অমরাবতী ! কি সুখে হতভাগিনী। হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অবিরাম।

(খ) আদর উত্তম জিনিষ। সে বৃষ্টি ধারার মত ধরণীকে শ্যামলা করে। কিন্তু অত্যধিক আদর অতিবৃষ্টির মত নিজের কাজ নিজেই নষ্ট করে।

(গ) কে বল্বে—কোন্‌গুলি সুন্দর—ঐ গাছের স্থল পদ্মগুলি, না আমাদের ঐ স্থল পদ্ম দুটি।

(ঘ) টীকা লিখ :—
আসফ।

বঙ্গ বীরাঙ্গনা সখিনা

এই পল্লী-গীতিকাটি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কে প্রভূত গবেষণাকার্য পরিচালনা করিয়া তাঁহার বিখ্যাত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য তাহার ঐতিহ্য ও বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে সুধী সমাজ ও জনসাধারণের এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মানের শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গৃহীত হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অপর একটি বিরাট দান বাংলার পল্লী-গীতিকাগুলির সংকলন ও সম্পাদনা। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

প্রাচীনকালে যখন বাংলা-শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না, তখন সমসাময়িক কোন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত গ্রাম্য স্বভাব-কবিগণ সহজ ছন্দে ও প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় কাব্য রচনা করিতেন এবং তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া গীত বা গান হিসাবে গ্রামে গ্রামে গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। এই শ্রেণীর গীত বা গানকে পল্লী-গীতিকা বা ব্যালাড্ (Ballad) বলা হয়। পৃথিবীর গ্রাম সর্বদেশেই এইরূপ পল্লী-গীতিকা রহিয়াছে। এই গীতিকাগুলির রচয়িতা কবি কে বা কাহারা তাহা অনেক সময়ই জানা যায় না এবং এগুলি লিখিত পুস্তকাকারেও পাওয়া যায় না। পুরুষানুক্রমে এই সকল গীতিকা পল্লী-গায়কদের মুখে-মুখে চলিয়া আসে এবং পরিশেষে কোন সমজদার প্রকৃত সাহিত্য-রসিক সেগুলি পল্লী-গায়কদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং শিক্ষিত জন-সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। এই শ্রেণীর পল্লী-গীতিকার অনেকগুলিই অপূর্ব কাব্য-সম্পদে ও ঘটনা-বৈচিত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। "বঙ্গ বীরাঙ্গনা সখিনা" তেমনি একটি পল্লী-গীতিকা।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গ বীরাঙ্গনা সখিনা" এবং এরূপ আরও অনেকগুলি পল্লী-গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদন করিয়া "ময়মনসিংহ-গীতিকা" ও "পূর্ববঙ্গ-গীতিকা" নামক দুইটি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত সমৃদ্ধি সাধিত হইয়া বিশ্বের সাহিত্য-রসিকদের নিকট তাহার মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পল্লী-গীতিকাগুলি সম্পর্কে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দান করেন। সেই বক্তৃতাগুলি "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান" নামক একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি সেই গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত।

এই পল্লী-গীতিকাটি অত্যন্ত করুণ-রসাত্মক। ইহার মর্মার্থ হইল এই : সতী-সাধবী নারীর প্রতি-ভক্তি ও পতি-প্রেম মানব জীবনের পক্ষে এক মহামূল্য সম্পদ। পতি-প্রাণা নারী পতি-প্রেমের প্রেরণায় স্বামীর জন্য পৃথিবীর সর্ব দুঃখ, সর্ব কষ্ট, সর্ব লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারেন—এমনকি নিজ জীবনের মায়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু সেই স্বামীরই নিকট হইতে সে পতি-প্রেমের যদি অমর্যাদা হয় তবে সাধবী নারী তাহা সহ্য করিতে পারেন না—সেখানে তিনি ছিন্ন-বৃন্ত কুসুমের মত মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়েন।

সখিনা—প্রকৃত শব্দ "সুকায়না !"

www.pathagar.com

ঈশা খাঁ—ভারতে পাঠান রাজত্বের শেষ-দিকে এবং মুঘল-রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলাদেশ বারজন স্বাধীন অধিপতির কর্তৃত্বাধীনে আসে। ইহারা বাংলার "বার ভূইয়া" নামে অভিহিত। ঈশা খাঁ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি একজন বিখ্যাত বীর ও প্রতাপশালী অধিপতি ছিলেন। মুঘল-সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি রাজা মানসিংহকে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করেন এবং অবশেষে নানা ঘটনা-বৈচিত্রের ভিতর দিয়া সম্রাট আকবরের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমান ময়মনসিংহ বা মোমেন-শাহী জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

প্রশ্নাবলী

১। "বঙ্গ বীরাঙ্গনা সখিনা"র গল্পাংশটি তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। বিজয়ী স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সখিনা যে-সকল আয়োজনের কথা উল্লেখ করেন, আলোচ্য পল্লী-গীতিকার অনুসরণে তাহার বর্ণনা লিখ।

৩। দরিয়া কে? ফিরোয খাঁ বন্দী হইবার পর দরিয়া ফিরোয খাঁর পত্নী সখিনা বিবিকে যে-বেশ ধারণ করিবার জন্য উপদেশ দান করে—আলোচ্য পল্লী-গীতিকার অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৪। ফিরোয খাঁ বন্দী হইবার পর তাঁহার পত্নী সখিনার যুদ্ধ-যাত্রা এবং স্বীয় পিতার ও মুঘল-সম্রাটের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত তাঁহার যুদ্ধের বিবরণ তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৫। ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা কর :—

(ক) বিহানে ফুটিয়া ফুল সন্ধ্যাকালে ঝরে।
আর নাহি সাজে কন্যা পালঙ্ক উপরে॥

(খ) মরণ ঠাটা পড়িল যেন গোলাপের বাগে।
মিলাইল মুখের হাসি, পরাণে দাগা লাগে॥

(গ) যে বক্ষ শেল-শূল বন্দুকের গুলি সহিয়া কত আশায়, কত শৌর্যের সহিত অনাহারে রাত্রিদিন যুদ্ধ করিতেছিল, সেই রমণী বক্ষ কোমল ফুল-শবের আঘাত সহিতে পারিলনা।

৬। টীকা লিখ।

ঈশা খাঁ।

ফাল্গুন

এই প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী-রচিত গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত। প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব প্রতিভাবলে কলিকাতা ও তদসন্নিহিত অঞ্চলের কথ্য-ভাষাকে রূপ-রস-মাধুর্যময় এক বিশেষ রচনা-রীতিতে উন্নীত করিয়া তাহাকে বাংলা সাহিত্যের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। একথা সত্য। প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালী ভাষা" নামে কথিত তাঁহার রচনা-রীতি দ্বারা এ রচনা ভঙ্গির প্রথম উদ্যোক্তা।

www.pathagar.com

একথাও সত্য। কিন্তু এ-ভাষা-ভঙ্গীকে প্রকৃত সাহিত্যিক মর্যাদা দান এবং তাহাকে বাংলা ভাষার এক অপরিহার্য ও সৌন্দর্যময় বঙ্গীরূপে সুধী সমাজের সমক্ষে প্রথম উপস্থিত করিবার গৌরব প্রমথ চৌধুরীর। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-সূরী। প্রমথ চৌধুরী "বীরবল" এই ছদ্মনামে তাঁহার এই রচনা-ভঙ্গী লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এইজন্য তাঁহার এই রচনা-ভঙ্গী "বীরবলী ভঙ্গী" নামেও পরিচিত। এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, অতিশয় মার্জিত রসিকতা ও অপূর্ব বাক্‌চাতুরীর ভিতর দিয়া গভীর তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা। এ ব্যাপারে আজো তিনি অদ্বিতীয় রহিয়া গিয়াছেন।

এই প্রবন্ধের বক্তব্য হইল এই : আমাদের দেশে প্রচলিত ঋতুর সংখ্যা ছয়টি। কিন্তু এক বর্ষা ঋতু ছাড়া অন্য পাঁচটি ঋতু কখন অলক্ষ্যে আসে এবং অলক্ষ্যে চলিয়া যায় তাহা আমরা সঠিকরূপে বুঝিতেও পারিনা। ইহাদের ঋতু পরিবর্তন ক্রিয়া এত মন্থর ও ধীরগতিতে সম্পন্ন হয় যে তাহা ঠাহর বা অনুধাবন করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আর বিলাতে ছয় ঋতুর স্থলে মাত্র চারিটি ঋতু গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, বসন্ত। কিন্তু প্রত্যেক ঋতুর আবির্ভাব এত প্রত্যক্ষ ও প্রকট যে, যে-কোন লোকের চক্ষেই তাহা অতি সহজে ধরা পড়ে। যাহা হউক, আমাদের দেশে ঋতুর এই অলক্ষ্য ও মন্থর পরিবর্তনের প্রতি রহস্য করিয়াই হয়ত প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, এদেশে বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কবির কাব্যের মধ্যে পাই—প্রকৃতির মধ্যে নহে। কাব্যে বসন্তের যে-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সে-বর্ণনাগত অবস্থা এদেশে কস্মিনকালেও ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কাজেই আলোচ্য প্রবন্ধকার রহস্যচ্ছলেই বলিতেছেন যে, আমাদের দেশে বসন্ত ঋতু কবির কল্পনা মাত্র—বাস্তব অস্তিত্ব ইহার কোথাও নাই। আর যে-বস্তুর অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না, সে-বস্তুর অস্তিত্ব কোন কালে যাইতে পারেনা। কারণ মন-গড়া জিনিষকে মন দিয়া খাড়া রাখিলেই চিরকাল সে খাড়া থাকিতে পারে। এখানে মন দিয়া খাড়া রাখার অর্থ হইল—আনন্দময় কল্পনা ও স্মৃতির সাহায্যে তাহাকে জিয়াইয়া রাখা। এভাবে জিয়াইয়া রাখিতে যাইয়াই এই বসন্ত-ঋতুর কল্পনা-কুশল স্রষ্টা আদি কবিগণ আদিকাল হইতে বসন্তোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-শাস্ত্রমতে কাব্য আর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন সরস্বতী দেবী। কাজেই কবিদের আদিকালের বসন্তোৎসবই বর্তমানে সরস্বতী পূজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

টীকা

বরুণাস্ত্র—হিন্দু শাস্ত্রমতে বরুণ হইলেন জলের দেবতা। কাজেই বরুণাস্ত্র বা বরুণের অস্ত্র হইল বৃষ্টি।

ছয়রাগ--ভারতীয় সঙ্গীতের যে-শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে তদনুসারে ইহার ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিনী আছে। ছয় রাগ হইল এই : ব্রহ্মার মতে : (১) শ্রী (শীতে গেয়) ; (২) বসন্ত (বসন্তে গেয়) (৩) পঞ্চম (গ্রীষ্মে গেয়) ; (৪) মেঘ (বর্ষার গেয়) ; (৫) ভৈরব (শরতে গেয়) এবং (৬) নটনারায়ণ (হেমন্তে গেয়)। ভরত ও হনুমন্মতে—(১) ভৈরব ; (২) মালকোষ ; (৩) হিন্দোল ; (৪) দীপক ; (৫) শ্রী এবং (৬) মেঘ। সোমেশ্বর মতে ১) ভৈরব ; (২) মালব ; (৩) শ্রী ; (৪) হিন্দোল ; (৫) দীপক ; এবং (৬) মেঘ। আর এক মতে—(১) বসন্ত ; (২) বৃহন্নট ; (৩) মল্লার ; (৪) মালব ; (৫) প্রদীপ এবং (৬) কৌশিক। মতান্তরে—(১) ভৈরব ; (২) কৌশিক ; (৩) হিন্দোল ; (৪) দীপক ; (৫) শ্রী এবং

www.pathagar.com

(৬) মেঘ। অন্য মতে—(১) ভৈরব ; (২) মালব ; (৩) সারঙ্গ ; (৪) হিন্দোল ; (৫) দীপক এবং (৬) মেঘ।

অসবর্ণ বিবাহ—হিন্দু ধর্মে চারিটি বর্ণ বা শ্রেণী আছে ; যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণ-বিভাগকে বর্ণাশ্রম বলা হয়। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে এক বর্ণের হিন্দু অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারেন না। কিন্তু কালের পরিবর্তন অনুসারে এখন এক বর্ণের হিন্দুর সঙ্গে অন্য বর্ণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপ বিবাহকে "অসবর্ণ বিবাহ" বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। "ফাল্গুন" শীর্ষক প্রবন্ধটির মূল-বক্তব্য তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। আমাদের দেশের ও বিলাতের ঋতুর মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কি প্রকার, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার বর্ণনা দাও।

৩। সরস্বতী পূজা প্রকৃতপক্ষে কি এবং কি ভাবে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার বিবরণ দাও।

৪। পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া ব্যাখ্যা কর :

(ক) আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘমল্লার ছাড়া আর পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর একটিতে বেমালুমভাবে গড়িয়ে যায়, আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ট হয় গোপনে, ক্রম বিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রম বিলীন হয় পর ঋতুতে।

(খ) মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সে দেশে (ইউরোপে) প্রত্যক্ষ করা যায়।

(গ) সে দেশে (ইউরোপে) শরৎ তার শেষ উইল, পাণ্ডুলিপিতে নয়, রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায়, কেননা মৃত্যুর স্পর্শে তার পিত্ত নগ্ন—রক্তপ্রকুপিত হয়ে ওঠে, প্রদীপ যেমন নেভ্বার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি করবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে।

(ঘ) আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীত ও বর্ষার দাম্পত্য বন্ধন চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয় ; কেননা এ হেন অসবর্ণ বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণবর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

(ঙ) যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানেনা, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনও অর্থ নেই, কোনও সার্থকতা নেই,—বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে ; কেননা, ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন ভোলানো, তার কাজ ভোলানো।

(চ) বসন্তে প্রকৃতি সুন্দরী নেপথ্য বিধান করেন ; সাজগোজ দেখবার যদি কোন চোখ না থাকে তা হলে কার জন্যই বা নবীনপাতার রঙ্গীন সাড়ীপরা, কার জন্যই বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা ?

www.pathagar.com

(ছ) কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি চান তার বদলে সত্য।

৫। টীকা লিখ :—
ছয় রাগ ; অসবর্ণ বিবাহ।

বঙ্গ সাহিত্য-পরিক্রমা

এই প্রবন্ধটি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচিত প্রবন্ধ সমষ্টি হইতে সংকলিত। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের--বিশেষ করিয়া পুঁথি-সাহিত্যের সর্ববাদিসম্মত একজন বিরাট পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য এখানেই সীমাবদ্ধ নহে। আজীবন জ্ঞান-সাধক এই ব্যক্তিটি বাংলা-সহিত্যের সর্ব শাখার একজন রসজ্ঞ সমজদারও বটে।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি সুষ্ঠু পরিচয় দান করিয়াছেন। ইংরাজ আমলের পূর্বে বাংলা ভাষায় গদ্য-সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। ইংরাজ পূর্ব যুগের সমগ্র প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যই কবিতায় রচিত। সাহিত্যবিশারদ সাহেব হিন্দু-মুসলমান কবিবৃন্দ-রচিত এই প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী—যথা : মঙ্গল-কাব্য, পদাবলী-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, জীবনী-সাহিত্য, পল্লী-সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পর ইংরাজদের দ্বারা মুসলমানগণ রাজ্যচ্যুত হইলে এই রাষ্ট্র-শক্তি পরিবর্তনের আবর্তে প্রায় এক শতাব্দীকাল বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নাই। এই সময় জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁচালী, টপ্পা, কবি গান, খেউড়, আখড়াই প্রভৃতি গানের প্রচলন হয়। কিন্তু এগুলি প্রকৃত সাহিত্যিক মর্যাদা পাইবার যোগ্য নহে। অতঃপর ইংরাজগণ এদেশে তাহাদের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ইংরাজ সিভিলিয়ান বা বে-সামরিক উচ্চ ইংরাজ-রাজকর্মচারীদিগকে এদেশের ভাষা শিখাইবার জন্য মার্সম্যান ও উইলিয়াম ক্যারী প্রভৃতি ইংরাজ পাদ্‌রী বা ধর্ম প্রচারকগণের সাহায্যে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা-ভাষা চর্চার এক নূতন বুনিয়াদ গড়িয়া তুলেন। প্রধানতঃ এই ইংরাজ ধর্মপ্রচারকগণই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম স্রষ্টা। তবে এই নবসৃষ্ট গদ্য-সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিকে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া ইহাকে জনসাধারণের প্রায় অবোধ্য সংস্কৃত-বহুল করিয়া তুলিলেন। অতঃপর বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিম-মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত প্রদীপ্ত সূর্যসম যে-সকল ভাস্বর প্রতিভা আবির্ভূত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া দিয়া গেলেন, আলোচ্য প্রবন্ধে সাহিত্যবিশারদ সাহেব সে সাহিত্যেরও গুণাগুণ সম্পর্কে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের নব পর্যায়ের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন, শেখ আবদুর রহীম, মীর মোশার্‌রফ হোসেন হইতে কবি জসীমউদ্দীন পর্যন্ত সকলেরই অল্পাধিক আলোচনা এবং তাঁহাদের সাফল্য-অসাফল্যের মূলিভূত কারণ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

www.pathagar.com

টীকা

মঙ্গল-কাব্য—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিশেষ এক প্রকার সাম্প্রদায়িক সাহিত্য প্রচলিত ছিল। এই সময় বাংলা-বিজয়ী নবাগত মুসলমানদের ধর্মে যাহাতে বেশী লোক আকৃষ্ট না হয় সেজন্য স্বদেশ ও স্বধর্ম প্রেমিক বাঙ্গালী হিন্দু কবিগণ নিজেদের দেব-দেবীকে অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। এই গান রচকের, গায়কের, শ্রোতার ও গৃহস্থের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া রচিত, ইহাতে মঙ্গলকারী দেবতার মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে এবং এই গান এক মঙ্গলবার আরম্ভ হইয়া অপর মঙ্গলবার পর্যন্ত সাধারণতঃ গীত হইয়া থাকে। এই জন্য এই গানকে "অষ্টাহ গীত" বা "অষ্ট-মঙ্গলা"ও বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এবং রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি অনুবাদ-সাহিত্য প্রচারিত হইবার পূর্বে মঙ্গল-কাব্যেই ছিল বাংলাদেশের প্রধান সাহিত্য। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত পাঁচালী আকারে লিখিত এই কাব্যগুলি পুরাণ ও শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে এইগুলি লৌকিক-সাহিত্য। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার ছলে কবিগণ এই সকল মঙ্গলকাব্যে মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই বলিয়াছেন। ফলে এই গুলিতে সে যুগের বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ছবি সুস্পষ্ট। এই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব সাহিত্য ; বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ; পদাবলী সাহিত্য—এই পুস্তকের "পায়ে চলার পথ" শীর্ষক প্রবন্ধের "পদাবলী" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ সাহিত্য—খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলাদেশে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন পাঠান সুলতানদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা বাংলাদেশকেই স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং এদেশের জনসাধারণের ভাষাকে রাজ দরবারে সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, শাস্ত্র-পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থগুলিকে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। ফলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত পুস্তকগুলির অনুবাদের প্রয়োজন হইল। রাজ-দরবারের অনুকরণে ক্রমে ভদ্রসমাজেও বাংলা ভাষার আদর হওয়ায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু কবিগণ এবং মুসলমান কবিগণ এই ভাষায় অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত হইলেন। এই গৌড়ের সুলতানদের আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন ; কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হন ; কৃত্তিবাস ওঝাও গৌড়েশ্বরের আদেশেই সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ বাংলাকাব্যে অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া বড়ু চণ্ডীদাস, যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন, রূপসনাতন, বিজয় গুপ্ত, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণও তাঁহাদের কাব্যসাধনা মুসলমান সুলতানগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। আরাকানের বৌদ্ধরাজার মুসলমান প্রধানমন্ত্রী মগন ঠাকুরের আদেশে সৈয়দ আলাওল কবি জায়সী-রচিত হিন্দী কাব্য "পদুমাবৎ" পদ্মাবতী নামে বাংলা-কাব্যে অনুবাদ করেন। [এ সম্পর্কে এই পুস্তকের "হাম্‌দ্‌" শীর্ষক কবিতার কাব্য-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।]

গৌড়ের অধিপতি ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের আদেশ, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা হইতে যে-সকল ধর্মপুস্তক এবং কাব্যগ্রন্থ বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ হইয়াছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেইগুলিকেই "অনুবাদ সাহিত্য" নামে অভিহিত করা হয়। অনুবাদ-সাহিত্য বলিতে বর্তমান কালে আমরা যেমন যথাযথ অনুবাদ

www.pathagar.com

বুঝি সে যুগে সেরূপ ছিল না। মূল পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাগুলির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কবিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুবাদ কার্য করিয়া যাইতেন। ফলে বহুক্ষেত্রেই তাহা মৌলিক রচনার রূপ গ্রহণ করিত। কৃত্তিবাসের মহাভারত এবং কাশীরাম দাসের রামায়ণ সম্পর্কে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। অনুবাদ যুগের হিন্দু কবিগণ শুধু ধর্ম শাস্ত্রই অনুবাদ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের নিকট সাহিত্যমাত্রই ছিল ধর্ম-শাস্ত্র। কিন্তু মুসলমান কবিগণ সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে জড়িত করিতেন না। প্রধানতঃ মানবীয় সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি লইয়াই তাঁহারা কাব্য রচনা করিতেন। এই দিক দিয়া তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পথপ্রদর্শক।

শিবায়নের কবি রামেশ্বর--রামেশ্বর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাহার পূর্ণ নাম রামেশ্বর চক্রবর্তী। মেদিনীপুর জিলার যদুপুর গ্রাম তাঁহার আদি নিবাস। তিনি হেমৎ সিংহ নামক কোন ভূস্বামী কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করেন এবং মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের সভা-কবি পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর কর্ণগড়ের নিকটবর্তী অযোধ্যানগরে তিনি বাসস্থান স্থাপন করেন। রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিব-উপাসক রাজা যশোবন্ত সিংহের নির্দেশেই কবি "শিবায়ন" বা শিব-সংকীর্তন বা শিব-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য রচনার পূর্বে তিনি সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য একান্তভাবে চাষী-কাব্য।

শ্রীচৈতন্য—পাক-ভারতে মুসলিম-শাসনকালে, পঞ্চদশ শতাব্দী ও তদসন্নিহিত সময়ে যাঁহারা ভারতে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করিয়া বহু পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেন শ্রীচৈতন্য দেব তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, বৈষ্ণব তত্ত্ববাদের প্রধান প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বাদ ও অহিংসাবাদ এই ধর্মপন্থার মূলমন্ত্র। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী তিনি বর্তমান পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র একজন মহাপণ্ডিত ও জাতিতে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার সাজপুর হইতে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্টে বা সিলেটে আসিয়া বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসর বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বম্ভর বা নিমাই ধর্ম-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাকে মূর্খ রাখিবেন বলিয়া মনস্থ করেন। কিন্তু বালক নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার অত্যাচারে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। অগত্যা জগন্নাথ মিশ্র তাহাকে টোলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। অপূর্ব প্রতিভাবলে এই দুরন্ত বালক ২০ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ শাস্ত্র, কাব্য এবং দর্শন-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং তদানীন্তন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরকে পরাজিত করেন। কিন্তু তখনো তাহার বাল্যকালের দুরন্তপনা ও রহস্যপ্রিয়তা দূর হইল না। কেহ ধর্মের কথা বলিলে তিনি পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেন।

সর্পদংশনে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর গয়ায় অঞ্জলি দিতে গিয়া এক উদ্ভূত ভাবাবেশে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া মারা যান। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরায় চলিয়া যাইতে মনস্থ করেন। অনেক কষ্টে তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয়। এই ঘটনার পরে সকল দুরন্তপনা ও শিক্ষাভিমান দূর হইয়া তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া রহিলেন। পর বৎসর মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি কটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি ছয় বৎসর কাল পর্যন্ত বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে কাশী মিশ্রের গৃহে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থান করেন। এই স্থানে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোধান ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিলেও শুধু শ্রীচৈতন্য নামেই তিনি পরিচিত।

পদ্ম-পুরাণের কবি নারায়ণদেব—মোমেনশাহী জেলার বোরগ্রামের অধিবাসী নারায়ণদেব পদ্ম-পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বোরগ্রাম শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার অন্তর্গত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আবার সিলেট জেলা ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য বাংলা ও আসাম উভয় প্রদেশের লোকই কবির উপর দাবী করেন। আসামে পদ্ম-পুরাণের নাম "সুকনান্নি"। শব্দটি আসলে নাকি "সুকবি নারায়ণী"। ইহা হইতেই অসমীয়া-সাহিত্যে নারায়ণদেবের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অনুমান করা যায়।

নারায়ণদেবের যথার্থ কাল নির্ণয় সম্ভবপর হয় নাই। কোন পণ্ডিত তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন ; কেহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর এবং কেহবা পঞ্চদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন। নারায়ণদেবের জন্ম কায়স্থকুলে।

বিজয়গুপ্ত—বরিশাল জেলার বর্তমান গৈলা গ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লী ফুল্লশ্রী নিবাসী বৈদ্য বংশীয় বিজয়গুপ্ত মনসা-মঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিবদ্ধ আছে। তাঁহার রচনায় উল্লেখিত তারিখ অনুসারেই জানা যায় যে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ ১৪১৬ শকাব্দে (১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ের পাঠান সুলতান হুসাইন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। তিনি হুসাইন শাহের নিকট হইতে যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্ত সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের প্রকাশই বেশী।

দ্বিজ বংশীদাস—দ্বিজ বংশীদাস মনসা-মঙ্গলের একজন প্রধান ও জনপ্রিয় কবি। মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটওয়ারী গ্রাম কবির জন্মস্থান। ইনি সুপরিচিতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। বংশীদাসের যথার্থ কাল এখনো নির্ণয় হয় নাই। কাহারো মতে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক এবং কাহারো মতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। দ্বিজ বংশীদাস রাঢ়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও সুকণ্ঠ গায়ক এবং অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি। স্বরচিত মনসার ভাসান গ্রামে গ্রামে গান করিয়া তাঁহার জীবিকা-নির্বাহ হইত। তিনি প্রতিভাবান কবি অপেক্ষাও বিখ্যাত গায়করূপে অধিক পরিচিত ছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাধবাচার্য—মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান প্রথম শ্রেণীর কবিদের অন্তর্গত। তাঁহার কাব্য হইতেই জানা যায়, মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সপ্তগ্রাম নিবাসী মহাপণ্ডিত পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য ১৫০১ শকাব্দে (১৫৭১ খৃষ্টাব্দে) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। অনেকে অনুমান করেন, মাধবাচার্য তাঁহার পৈত্রিক নিবাস পরিত্যাগ করিয়া মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মেঘনা নদীর তীরে নবীনপুর গ্রামে (বর্তমান গোঁসাইগঞ্জে) বাসস্থান স্থাপন করেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মর্যাদা দান করেন মাধবাচার্য। মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র তাঁহারই অনুগামী।

মুকুন্দরাম—তাঁহার পূর্ণ নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি সমগ্র প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্যের কোন কোন অংশ কাউয়েল সাহেব ইংরাজী-

www.pathagar.com

পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য হইতেই জানা যায়, বর্ধমান জেলার রত্নানু নদীর তীরবর্তী দামুন্যা গ্রামে কবির ছয়-সাত পুরুষের বাস ছিল। কিন্তু স্থানীয় ডিহিদারের অত্যাচারে তিনি পৈত্রিক নিবাস ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল থানার অধীন আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় প্রার্থী হন এবং তদপুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথের সভাকবিরূপে তাঁহারই অভিলাসে মুকুন্দরাম অপূর্ব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে মতদ্বৈত থাকিলেও অনেকের মতে ১৫৯৪ অথবা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা শেষ হয়। কবি কঙ্কণের কাব্যের প্রকৃত নাম "অভয়া মঙ্গল"। তবে এই কাব্যে চণ্ডীর বর্ণনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করায় সাধারণতঃ ইহাকে চণ্ডীমঙ্গল বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মনরাম চক্রবর্তী—তাঁহার নাম ঘনরাম চক্রবর্তী। মুদ্রণের ত্রুটি বশতঃ "ঘনরাম" "মনরাম" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রাম কবির জন্মস্থান। সম্ভবতঃ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবৃহৎ ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের রচনা শেষ হয়। এই ধর্ম-মঙ্গল কাব্য ২৪ অধ্যায়ে মোট ৯,১৪৭টি শ্লোকে রচিত। তাঁহার কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবির উভয়েরই যথাযোগ্য সমাবেশ হইয়াছে।

কৃত্তিবাস—রামায়ণ অনুবাদকগণের মধ্যে কৃত্তিবাসই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনেকের ধারণা। তাঁহার জন্মকাল লইয়া মতভেদ আছে। তিনি মুখটি বংশীয় ব্রাহ্মণ উপাধিঃ ওঝা। তিনি গৌড়াধিপতির আদেশ তাঁহার অমর কীর্তি "রামায়ণ" অনুবাদ করেন।

কাশীরামদাস—মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে কাশীরামদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে দেব-উপাধি ধারী কায়স্থকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অনূদিত "মহাভারত"ই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি। মহাভারত ব্যতীত কাশীরামদাস স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব এবং নলোপাখ্যান নামক তিনখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মালাধর বসু—ভাগবত অনুবাদকগণের মধ্যে মালাধর বসুই প্রথম। কৃত্তিবাসের পরেই তাঁহার আবির্ভাব হয়। বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ত্রয়োদশ পূর্ব পুরুষ দশরথ বসু আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ বা কনৌজ হইতে আনীত পাঁচ জন কুলীন কায়েস্থের অন্যতম বলিয়া কথিত। মালাধর বসুর জন্মকাল জানা যায় না। তবে এইটুকু মাত্র শোনা যায় যে তিনি তাহার অনূদিত কাব্যগ্রন্থ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রচনা আরম্ভ করিয়া ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে রচনা শেষ করেন। গৌড়েশ্বর শামস্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ্ তাঁহার কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার উল্লেখিত অনূদিত গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"।

দৌলত কাযী—তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরাকান-রাজ থিরি-থু-ধর্মা বা শ্রীসুধর্মার সেনাপতি আশরফ খাঁর আদেশে "সতী ময়না" বা "লোর-চন্দ্রানী" নামক কাব্যগ্রন্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে রচনা করেন। ব্রজবুলি এবং বাংলা উভয় ভাষায় তাঁহার নিপুণতা ছিল যথেষ্ট। তাঁহার সুপরিপক্ক ভাষা, শালীনতা সম্পন্ন কবিত্ব এবং বর্ণনা-চাতুর্য অতিশয় উপাদেয়।

বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্তমান বিহার প্রদেশের একাংশের নাম মিথিলা। বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত বিস্‌পী বা বিস্ফী গ্রামে

www.pathagar.com

বিদ্যাপতির নিবাস ছিল। পূর্বে এই গ্রাম গড়বিস্পী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাম্রপাত্রে তাহার উল্লেখ আছে। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। ইনি চণ্ডীদাসের পূর্ববর্তী। আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। ভিন্নদেশ ও ভিন্ন ভাষার কবি হইলেও বাঙ্গালীই ইহার কাব্য হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার কবিতা ও কবিতার ভাষাকে বাংলা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে আদর্শ করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য বিদ্যাপতি মৈথিলি হইলেও বাঙ্গালী কবি হইয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া বাংলা ভাষা এবং মৈথিলি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং প্রাচীন বঙ্গ-লিপি ও মৈথিলি লিপির মধ্যেও সেই সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। বিদ্যাপতি পদাবলী ছাড়াও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদগুলির ভাষা যেমন লালিত্যময় ও মধুর, তেমনি খাঁটি কাব্য হিসাবে তাঁহার রচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্যাপতির আয়ুষ্কাল ৯০ বৎসর। তদনুসারে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি পরলোকগমন করেন।

চণ্ডীদাস—চণ্ডীদাস প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি এবং আদি গীতি-কবি। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তাহারও ঐতিহাসিকতা লইয়া মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। চণ্ডীদাস কাহারও নাম কিংবা চণ্ডী-সেবকদের উপাধিমাত্র তাহাও বলা শক্ত। গীতি-কবিতা রচয়িতা একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। যাহা হউক, যিনি বাংলার শ্রেষ্ঠতম আদি গীতি-কবি সেই চণ্ডীদাস আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারো কাহারো মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে তাঁহার জন্ম এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাহার কাব্য রচনা-কাল। অন্য চণ্ডীদাস হইতে তাঁহাকে পৃথক করিবার জন্য "দ্বিজ চণ্ডীদাস" নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হয়। তাঁহার আর এক নাম অনন্ত এবং তিনি "বড়ু" উপাধি ব্যবহার করিতেন। তিনি মহাপণ্ডিত, সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং সুগায়ক ছিলেন। বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের নিকটবর্তী নান্নুর এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা—এই উভয় স্থানেই চণ্ডীদাসের ভিটা প্রভৃতি দেখা যায়। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বই বোধহয় ইহার কারণ। আদি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এই দুই স্থানের কোথায় তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। যাহা হউক, তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। তাহার ভাষা অপূর্ব লালিত্য ও মাধুর্যময় এবং কাব্য পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ।

জ্ঞানদাস—ইনি শ্রেষ্ঠ পদ কর্তাদিগের অন্যতম। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ বংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "ব্রজবুলি" ভাষায় বহু পদ রচনা করিলেও ইহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। এই পদগুলির গভীর আন্তরিকতা, ভাবের স্বাভাবিকতা ও ভাষার লালিত্যে ইনি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।
গোবিন্দদাস—পদকর্তা বা পদাবলী রচয়িতা গোবিন্দদাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। ইনি চৈতন্য দেবের সহচর, কুমার নগর নিবাসী চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্য বংশীয় চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। গোবিন্দদাসের মাতামহ ছিলেন বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নিবাসী, ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত কবি দামোদর সেন। বৈষ্ণবদ্বেষী রক্ষণশীল সমাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গোবিন্দদাস তাঁহার অগ্রজ রামচন্দ্র সহ পৈত্রিক বাসস্থান কুমার নগর পরিত্যাগ করিয়া খেতুরীর সন্নিকটে তেলিয়াবুধরি গ্রামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। গোবিন্দদাস রচিত প্রায় সাড়ে পাঁচশত পদ বর্তমানে পাওয়া যায়। পদাবলী ছাড়া গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় "সঙ্গীত মাধব" নামে নাটক এবং

www.pathagar.com

"কর্ণামৃত" নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে গোবিন্দদাস পরলোকগমন করেন। [গোবিন্দদাস নামক আধুনিক যুগের একজন কবির জীবনী এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য।]

বৃন্দাবনদাস—ইনি জীবনী-সাহিত্যের কবিগণের অন্যতম। খুব সম্ভব ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনদাস বর্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর থানার অধীনে দেনুড় গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কবির গুরু এবং চৈতন্য দেবের অন্যতম প্রধান সহচর নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞাক্রমে কবি চৈতন্য দেবের জীবনী "চৈতন্য-ভাগবত" রচনা করেন। দেনুড় গ্রামে সম্ভবতঃ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে "চৈতন্য-ভাগবত" রচিত হয়। "চৈতন্য-ভাগবত" ছাড়া বৃন্দাবনদাস "ভক্তি-চিন্তামনি", "তত্ত্ব-বিলাস", "বৈষ্ণব-বন্দনা", "দধিখণ্ড" ও "নিত্যানন্দ-বংশ বিস্তার" প্রভৃতি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেকগুলি পদও পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস দীর্ঘায়ু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও ১৬০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

জয়ানন্দ—বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-ভাগবত" রচনার অনতিকাল পূর্বেই জয়ানন্দ চৈতন্য-দেবের জীবনী-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল"। জয়ানন্দ বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামের অধিবাসী ও চৈতন্য দেবের শিষ্য—সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল গুহিআ বা গুইঞা। চৈতন্য দেব শ্রীক্ষেত্র হইতে বর্ধমান প্রত্যাবর্তনের পথে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে পদার্পণ করেন এবং কবির নাম রাখেন জয়ানন্দ। "চৈতন্য-মঙ্গল" ব্যতীত জয়ানন্দ-রচিত "ধ্রুব-চরিত্র" এবং "প্রহ্লাদ-চরিত্র" নামক দুইটি পুস্তক পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সঠিক জানা যায় নাই।

লোচন দাস--লোচনদাসের অন্য নাম ত্রিলোচন বা সুলোচন। বর্ধমান জেলার কোগ্রাম নামক স্থানে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুলে একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আদর-যত্নে প্রতিপালিত হন। সেজন্য বাল্যকালে তাঁহার আদৌ লেখাপড়া হয় নাই। কিন্তু পরিণত বয়সে মাতামহের যত্নে ও চেষ্টায় তাঁহার অক্ষর পরিচয় ও বিদ্যালাভ হয়। উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও লোচনদাস একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। তিনি চার খণ্ডে চৈতন্য দেবের জীবনী-গ্রন্থ "চৈতন্য-মঙ্গল" রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তাঁহার অনেক সুমিষ্ট পদ পাওয়া যায়। লোচনদাস "ধামালী" পদের প্রবর্তক। "ধামালী" বা "ঢামালী" শব্দের অর্থ আনন্দে "মাতামাতি"। লোচনদাসের "ধামালী" পদগুলি বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। এই পদগুলির ভাষা বিশুদ্ধ এবং গ্রাম্য স্বাভাবিক কথ্য-ভাষা। আনুমানিক ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে লোচনদাস পরলোকগত হন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—আনুমানিক ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাসকে সঙ্গে লইয়া পিসীমার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস আজীবন দুঃখ-কষ্টে লালিত। জীবনে তিনি কখনো দার-পরিগ্রহ করেন নাই। যৌবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং তথাকার বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধকগণের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্য দেবের শেষ জীবন বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত না থাকায় সেই অভাব-মোচনের জন্য বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কৃষ্ণদাসকে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কৃষ্ণদাস প্রায় অশীতি বর্ষ বৃদ্ধ বয়সে

www.pathagar.com

এই দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। চৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় পুস্তকের রচনা আরম্ভ করেন। নয় বৎসর ব্যাপী গভীর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিন খণ্ডে এবং ১৫,০৫১টি শ্লোকে এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। গ্রন্থের নাম রাখা হয় "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।" চৈতন্য দেবের চরিতাখ্যানগুলির মধ্যে এই পুস্তকটি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাছাড়া কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় "গোবিন্দ-লীলামৃত", কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকা এবং বাংলা ভাষায় "অদ্বৈত-সূত্র-কড়চা", "রসভক্তি-লহরী", "স্বরূপবর্ণন" ও "রাগময়ী কণা" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন—এই নামের শুদ্ধ বানান : পণ্ডিত রিয়ায্-উদ্দীন। তাঁহার পূর্ণ নাম : পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ মাশহাদী। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "শকুন্তলার" ভাষা হইতে তাঁহার ভাষার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। যুগের দিক দিয়াও তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক লোক। পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মোমেনশাহী জেলার অধিবাসী। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।. মুসলিম জগতের নবজাগরণের অগ্রদূত, বিশ্ব-বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও সমাজ-সংস্কারক সৈয়দ জালালউদ্দীন আফগানী "প্যান-ইসলামইজ্‌ম" (Pan-Islamism) বা "বিশ্ব-মুসলিম-ঐক্যবাদে"র প্রবর্তক। পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন জামালউদ্দীন আফ্গানীর জীবন-চরিত অবলম্বনে "সমাজ ও সংস্কারক" নামক তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকটি রচনা করেন এবং তাহাতে-আফ্গানীর সেই মতবাদ প্রচারের প্রয়াস পান। "প্যান-ইসলামইজ্‌ম"-এর বিশ্ব-মুসলিম-ঐক্য এবং স্বদেশ-প্রেম সাহিত্যিক পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীনের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তবে তিনি গোঁড়া "প্যান-ইসলামইজমে"র পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁহার স্বদেশ তদানীন্তন ভারতের স্বাধীনতা এবং মঙ্গলের জন্যও তিনি চিন্তা করিতেন। তাহার "সমাজ ও সংস্কারক" গ্রন্থটি প্রথম কলিকাতার "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পুস্তকটির আদ্যোপান্ত মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণীতে অনুরণিত থাকায় তদানীন্তন ইংরাজ গভর্ণমেন্ট পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এই পুস্তকটি ছাড়া পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন "অগ্নি-কুক্কুট", "সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" এবং "সুরিয়া-বিজয়" নামক গ্রন্থগুলিও রচনা করেন। স্যার সৈয়দ আমীর আলী-রচিত "এ সর্ট হিষ্টরী অব্ দি সেরাসিন্স্" (A Short History of the Saracens) নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটিও তিনি বাংলায় "আরব জাতির ইতিহাস" নাম দিয়া অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার "মুসলমান সাম্রাজ্য" নামক পুস্তকটি পাণ্ডুলিপি আকারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন আহ্মদ—এই নামের শুদ্ধ বানান : মুন্শী রিয়ায্-উদ্দীন্ আহ্মদ। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন। নানা কারণে বিদ্যালয়ে তাঁহার লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। নিজ চেষ্টায় গৃহে অধ্যয়ন করিয়া তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথম জীবনে তিনি ত্রিপুরা জেলার বূপশার পাঠশালার শিক্ষকরূপে কর্ম-জীবনে প্রবিষ্ট হন। এই সময় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" নামক পুস্তকে একটি ভুল বাহির করিয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখেন। এইরূপে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পরিচিত হন।

অবশেষে একাগ্রভাবে সাহিত্য-সাধনা ও সংবাদপত্র পরিচালনা মানসে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমান সমাজে বিশেষ স্মরণীয় কাল। এই সময় কয়েকজন তরুণ বাঙ্গালী মুসলমান-সাহিত্যিক কলিকাতায় একত্রিত হইয়া সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। ইহাদের মধ্যে মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন, "মিহির ও সুধাকর" ও "মোসলেম হিতৈষী" পত্রিকার সম্পাদক এবং "হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি" নামক বিখ্যাত পুস্তকের গ্রন্থকার শেখ আবদুর রহিম এবং কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স ও ডভ্‌টন্ কলেজের আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক, খুলনা জেলার বাঁশদহ নিবাসী অধ্যাপক মেয়ারাজ্ উদ্দীন সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন এবং শেখ আবদুর রহিম কেহই আরবী-ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু বাংলা ভাষায় ও বাংলা রচনাশৈলীতে তাঁহাদের প্রভূত অধিকার ও দক্ষতা থাকায় অধ্যাপক মেয়ারাজ উদ্দীন সাহেবের সহায়তায় তাঁহারা আরবী-ফার্সী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ও সংকলন আরম্ভ করেন। মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন সাহেবের সুবৃহৎ গ্রন্থ "তোহ্‌ফাতুল মুস্‌লেমীন" তেমনি একটি পুস্তক। এতদ্ব্যতীত "এসলাম তত্ত্ব" (দুই খণ্ড), "কৃষক-বন্ধু", "গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ", "জোলেখা", "আমার সংসার জীবন", "রত্নাবলী", "হক্ নসিহত্" এবং "বৃহৎ হীরক-হার" প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন, শেখ আবদুর রহিম ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব মিলিত হইয়া "সুধাকর" নামক একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। "সুধাকর"-ই বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন এবং শেখ আবদুর রহিমই বাংলার মুসলমান সমাজে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে ও পরিচালনায় সর্বপ্রথম সাফল্য ও কৃতকার্যতা অর্জন করেন।

পরবর্ত্তী কালে মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন "মুসলমান" ও "নব সুধাকর" নামক স্বল্পকালস্থায়ী দুইটি সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদে বরিত হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি "ইসলাম প্রচারক" নামে একখানি মাসিক-পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগত হন।

মুন্সী মেহের উল্লাহ—(এই নামের শুদ্ধ বানান : মুন্‌শী মেহের উল্লাহ্)—মুন্সী মেহের উল্লাহ সাহেব যশোহর জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোপ নামক গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস যশোহর শহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছাতিয়ানতলা নামক গ্রামে। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণী পর্যন্ত। কিন্তু জীবনব্যাপী চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি আরবী, ফার্সী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় অগাধ বুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র, বিশ্ব-মুসলিমের রাজনৈতিক সাধনা এবং ইতিহাস সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি একজন সুলেখক ও বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। অতি দরিদ্রাবস্থা হইতে নিজের সাধনায় জীবনে প্রকৃত গৌরব ও সাফল্য অর্জন করেন। দুনিয়ার আরাম, আয়েশ ও অর্থোপার্জনের সকল আকাঙ্ক্ষাকে পদ-দলিত করিয়া বাংলার মুসলিম সমাজকে চারিত্রিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ব্যাপারে সমুন্নত ও উজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি সারাজীবন বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিয়া বেড়াইয়াছেন। তৎকালে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক প্রচারিত আক্রমণাত্মক ভ্রান্ত প্রচারণার হস্ত হইতে বলিষ্ঠ যুক্তি-তর্ক-বলে ইসলাম ও বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে রক্ষা করাই তাঁহার জীবনের মহত্তম ও প্রধানতম অধ্যায়। বাংলা-ভাষায় রচিত তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে "পান্দেনামা", "মেহেরুল ইসলাম", "রন্দে খৃষ্টিয়ান", "খৃষ্টান ধর্মের অসারতা", "বিধবা-গঞ্জনা" ও "হিন্দুধর্ম রহস্য" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকটি তদানীন্তন বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

www.pathagar.com

এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের তৎকালীন সংবাদপত্র "সুধাকর", "মিহির ও সুধাকর" এবং "ইসলাম প্রচারক" প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সকল সংবাদপত্রের প্রচার ও উন্নতির জন্যও তিনি তাহার পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছেন। তৎকালীন তরুণ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের পুস্তকাদি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্য সাধনায় উৎসাহিত করিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের বিখ্যাত অগ্নিময় কাব্যগ্রন্থ "অনল-প্রবাহ" এবং শেখ ফজলল্ করিম সাহিত্য-বিশারদ-রচিত "পরিত্রাণ কাব্য" তিনি স্বীয় অর্থে প্রকাশ করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুন শুক্রবার বেলা ১টায় ঠিক জুমা নামাযের সময় মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি এ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত কবি ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে আলাওল, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, কালীদাস রায়, জসীমউদ্‌দীন, শেখ আবদুর রহিম, মীর মোশাররফ হোসেন, কাযী ইমদাদুল হক এবং কবি কায়কোবাদের রচনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এই প্রবন্ধের টীকায় তাহাদের পরিচয় দান বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত অক্ষয়কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভাত কুমার, রাজশেখর বসু, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র মোহন বাগচী, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ যশস্বী লেখকগণের সকলেই বাংলা-সাহিত্যের আধুনিক যুগের স্বনামখ্যাত কবি-সাহিত্যিক। স্থানাভাববশতঃ ইহাদের রচনাদি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর না হইলেও এই সকল কবি-সাহিত্যিকের লেখা ও জীবনালেখ্যের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাহাদের পাঠ্য-জীবনে অল্পাধিক পরিচিত হইয়াছেন—এইরূপ অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। আর যদি পরিচিত না-ও হইয়া থাকেন তথাপি শিক্ষক মহোদয়গণের বা স্কুল-পাঠাগারের সহায়তায় তাঁহাদের রচনা এবং জীবনী সম্পর্কে পরিচয় লাভ কঠিন হইবে না। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আলোচ্য প্রবন্ধের টীকায় তাঁহাদের পরিচিতিও পরিত্যক্ত হইল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালের যে-সকল কবি-সাহিত্যিকের রচনা ও জীবনী অনেকটা দুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের পরিচিতি এখানে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত নিধুবাবু, দাশুরায় এবং কবিওয়ালা রামরাম বসুর যথার্থ সাহিত্য-পদ-বাচ্য কোন রচনা নাই। কাজেই তাহাদের পরিচিতিও আলোচ্য টীকায় পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। কোথা হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি এবং সাহিত্য কি—"বঙ্গ-সাহিত্য-পরিক্রমা" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার উত্তর দাও।

২। আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "দেশের সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেষ্টনীর সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত নিবিড়।" কেন নিবিড়, এই প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার ব্যাখ্যা কর।

www.pathagar.com

৩। এই প্রবন্ধে এক স্থানে বলা হইয়াছে, "একই সময়ে সাহিত্য রচনা আরম্ভ করা সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী পর দেখা গেল, কোন কোন ভাষার সাহিত্য উন্নতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত আছে। আর কয়েকটি ভাষা তখন পর্যন্ত শৈশব এড়াইয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমাদের বাংলা ভাষা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।" এই অবস্থার কারণ কি, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৪। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব দেশে উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেন উঠিয়াছিল, তাহা আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে ব্যাখ্যা কর।

৫। প্রাচীন যুগের কাব্যে এবং আধুনিক যুগের কবিতায় প্রভেদ কি এবং কোথায়, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার উত্তর দাও।

৬। মঙ্গলকাব্যের মূল্য কোথায় এবং এই শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি কাহারা, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার উত্তর লিখ।

৭। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের বৈশিষ্ট্য কি—তাহা বর্ণনা কর।

৮। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলা ও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হিন্দু সমাজেরই ইতিহাস। ইহার কারণ কি, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৯। পাকিস্তানী সাহিত্যের ধ্বনি কেন উত্থিত হইয়াছে, আলোচ্য প্রবন্ধকারের মতামত অনুসরণে তাহার কারণ দর্শাও।

১০। "সংকটে মধুসূদন" এই বাক্যটির যাথার্থ্য মাইকেল মধুসূদনের জীবনে কিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার বর্ণনা দাও।

১১। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) সুকর্ষিত ক্ষেত্রের অভাবে উত্তম জীবও অঙ্কুরিত হয় না।

(খ) কোকিল ও বুলবুলের পরস্পর জানাজানির মধ্যে মিলনের সুর পাওয়া যাইবে।

১২। টীকা লিখ :—

মঙ্গলকাব্য ; পদাবলী সাহিত্য ; পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন ; মুন্সী মেহের উল্লাহ্ ; চণ্ডীদাস ; বিদ্যাপতি ; দৌলত কাযী ; গোবিন্দ দাস।

ভারতে মুসলমান স্থাপত্য

এই প্রবন্ধের রচয়িতা মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেব মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন আরবী-ফার্সী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন এবং আমৃত্যু জ্ঞানার্থী সাধকের মত ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাস মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার মাতৃভাষা বাংলায় মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি তেমনি একটি তথ্য-বহুল ও গবেষণামূলক রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি জগতের বিভিন্ন স্থানের মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়া

www.pathagar.com

দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সর্বক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও স্থাপত্য-শিল্পক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পকে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া দূরের কথা—তাহার সমকক্ষও হইতে পারে নাই। প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনগুলির সহিত পাক-ভারতের বিভিন্নস্থানে ছড়ানো মুসলমানদের সমাধি-মন্দির, মসজিদ ও প্রাসাদমালার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, উৎকর্ষতার দিক দিয়া এই সকল মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের কোন তুলনাই হয় না—এমনকি সারা জগতের স্থাপত্য-শিল্পেও এই মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের কোন তুলনা নাই বলিলেই চলে।

টীকা

মুঘল—মধ্য এশিয়ার মঙ্গললিয়ার অধিবাসীদিগকে "মঙ্গল" বা "মোঙ্গল" বলা হয়। মুঘল শব্দ সেই মঙ্গল বা মোঙ্গল শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দু পাক-ভারতের বাদশা মুঘল-সম্রাটেরা এবং পাক-ভারতীয় অন্যান্য মুঘলেরা বাস্তবিক মোঙ্গল বা মঙ্গলিয়াবাসী ছিলেন না। তাঁহারা মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তানের আদি অধিবাসী অর্থাৎ তুর্কী।

কর্ডোভা—উমাইয়া বংশীয় চতুর্থ খলীফা, খলীফা ওয়ালীদের শাসনকালে তাঁহার উত্তর আফ্রিকাস্থিত সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি তারিক ৭১১ খৃষ্টাব্দে স্পেন দখল করেন এবং তাহার পর প্রায় আট শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানেরা স্পেনে রাজত্ব করেন। দক্ষিণ স্পেনে অবস্থিত কর্ডোভা প্রদেশের প্রধান নগর এই কর্ডোভা বহুদিন পর্যন্ত মুসলিম স্পেনের রাজধানী ছিল। শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐশ্বর্যে কর্ডোভা তখন সারা ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম নগর। সে সময় এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নের জন্য সারা ইউরোপ হইতে প্রতি বৎসর সহস্র-সহস্র ছাত্র আগমন করিত। বিশ্ববিখ্যাত রাজ-প্রাসাদ "আয্-যাহ্‌রা" বা "যোহ্‌রা প্রাসাদ" এখানেই অবস্থিত ছিল। মুসলিম আমলের অপূর্ব কারুকার্য ও শিল্পচাতুর্যময় এই রাজ-প্রাসাদ এবং অন্যান্য প্রাসাদ ও মসজিদাদির ধ্বংশাবশেষ এখনও সেখানে বিদ্যমান। বর্তমানে কর্ডোভা উক্ত নামীয় প্রদেশের রাজধানী।

গ্রানাডা—মুসলিম স্পেনের একটি স্বাধীন রাজ্য ও উক্ত রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গ্রানাডা। বর্তমান স্পেনের আল্‌মেরিয়া, গ্রানাডা এবং মুলোগা—এই তিনটি প্রদেশ লইয়া তদানীন্তন গ্রানাডা রাজ্য গঠিত ছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক ৭১১ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকৃত হয়। কর্ডোভা হইতে এই স্থানটি প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এই স্থানটি স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শনসমূহে পূর্ণ। বিশ্ব-বিখ্যাত আল্-হামরা প্রাসাদ এখানেই অবস্থিত।

বাগ্‌দাদ—বর্তমান ইরাকের রাজধানী। বিশ্ব-বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ ইরান-সম্রাট নওশেরিয়ার ইহা গ্রীষ্মাবাস ছিল বলিয়া কথিত। বাগ্‌দাদ অর্থ "সুবিচারের বাগান" (Garden of Justice) বাগ্‌দাদ অতি প্রাচীন শহর ; দজলা বা টাইগ্রীস নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। আব্বাসিয়া খলীফাগণের রাজত্বকালে প্রায় পাঁচশত বৎসর ব্যাপী ইহা মুসলিম জগতের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ধন-ঐশ্বর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইহা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগররূপে পরিগণিত হইত। আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলীফা আল্-মনসুর কর্তৃক ১৪৫ হিজরী বা ৭৬২ খৃষ্টাব্দে এই নগর নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখানেই তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। বিশ্ব-বিখ্যাত খলীফা হারুণুর-রশীদের রাজধানী এখানেই অবস্থিত ছিল। এই নগরই প্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাসে-উল্লেখিত বিচিত্র ঘটনাবলীর প্রধান-কেন্দ্র। ঐ সময় এই

www.pathagar.com

নগর মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। মধ্য এসিয়ার দুর্দান্ত হালাকু খানের আক্রমণে বাগ্‌দাদ ধ্বংশের পর ১২৫৮ খৃ: আব্বাসীয় বংশীয় খলীফাগণের পতন হইলে—নানা পর্যায়ের ভিতর দিয়া আরব-ইরাক তুর্কী-সুলতানগণের করতলগত হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে মেসোপোটমিয়া বা ইরাক প্রদেশের রাজধানী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বাগ্‌দাদেই স্থাপিত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বসমরের সময় ইংরাজগণ কর্তৃক ইরাক অধিকৃত হইলে সেখানে বর্তমান ইরাক-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাগ্‌দাদেই তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইরাক সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বাগ্‌দাদ নগরই তাহার রাজধানী।

বোখারা—আফগানিস্তানের উত্তরে মধ্য এশিয়ার একটি অধুনা-বিলুপ্ত প্রাচীন মুসলিম রাজ্য এবং ঐ রাজ্যের রাজধানী বোখারা অতি প্রাচীন শহর। একসময় ইহা সমগ্র মধ্য এশিয়ায় মুসলিম শিক্ষা-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বোখারা একটি অর্দ্ধ-স্বাধীন মুসলিম রাজ্য হিসাবে রুশ-সাম্রাজ্যের রক্ষণাধীনে আসে। বর্তমানে ইহা কমিউনিষ্ট রুশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উজবেক শোভিয়েট রিপাবলিকের অন্তর্গত। মুসলিম শাসনকালে এখানে অনেকগুলি বিখ্যাত মাদ্রাসা ও ইসলামী শাস্ত্র-শিক্ষা কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মসজিদ রহিয়াছে।

সমরকন্দ—মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন শহর। বিশ্ব-বিখ্যাত তৈমুর লং-এর ইহা রাজধানী এবং মুসলিম শিক্ষা-সভ্যতার এক বিরাট কেন্দ্র ছিল। এখানে তৈমুর লং-এর সমাধি স্থান বর্তমান। এই নগরের অতি প্রাচীন নাম ছিল "মারাকান্দা" (Maracanda)। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার (Alexander the Great) একবার এই নগর ধ্বংস করেন। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-ত্রাস চেঙ্গিজ খান এই নগর অধিকার করিয়া ইহাকে আবার ধ্বংস করেন। মধ্য এসিয়ায় মুসলিম রাজশক্তির অবনতি ঘটিয়ে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া ইহা অধিকার করিয়া নেয়। বর্তমানে ইহা সোভিয়েট রুশিয়ার সমাজতান্ত্রীক উজবেক সোভিয়েট রিপাবলিকের অন্তর্গত।

দামাস্কাস—এই পুস্তকের "রাজা আর রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের "দামাস্কাস" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। "ভারতে মুসলিম স্থাপত্য" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে পাক্‌ভারতের হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

মামলার ফল

ইহা একটি গল্প। এই গল্পের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসিক ও কথা-শিল্পী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার ভাষা ও সংলাপ অত্যন্ত মনোরম। অতি সহজ ও সরল ভাষায় গভীর ভাব ও চিন্তাধারা সাবলীল ও সুন্দর ভঙ্গীতে প্রকাশের অপূর্ব দক্ষতা তিনি দেখাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ভাষার "যাদুকর" বলা হয়। তিনি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক। তাঁহার রচিত ছোট গল্পের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের চিত্রই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। নারী ও নারীত্বের মর্যাদা ও গৌরব ঘোষণাই তাঁহার লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য "মামলার ফল" গল্পটি

www.pathagar.com

এক হিন্দু কৃষক পরিবারকে লইয়া রচিত। এখানেও নারীত্বের গৌরব ঘোষণাই লেখকের প্রধান লক্ষ্য। এক স্নেহময়ী নারীর মাতৃ-হৃদয় কি করিয়া পারিবারিক সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধের উর্ধ্বে উঠিয়া উদ্যত-দণ্ড মামলাকে নিমেষে ধূলিসাৎ করিয়া দিল এবং পরিবারের ভিতর পুনরায় শান্তির সমীরণ বহাইবার আয়োজন করিল— "মামলার ফল" গল্পে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

টীকা

অরণ্য ষষ্টী—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী ; জামাই ষষ্ঠী ; তিথি বিশেষ। (হিন্দু মতে মাতৃকাশ্রেষ্ঠা অর্থাৎ গৌরী পদ্মা ইত্যাদি ষোড়শ দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং শিশু-পালিকা দেবীকে ষষ্ঠীদেবী বলা হয়।)

প্রশ্নাবলী

১। "মামলার ফল" শীর্ষক গল্পটি সংক্ষেপে তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। আলোচ্য গল্পের গঙ্গামণির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৩। আলোচ্য গল্পের গয়ারামের প্রকৃতি বর্ণনা কর।

৪। আলোচ্য গল্পের পাঁচুর চরিত্র বর্ণনা কর।

৫। টীকা লিখ :—
অরণ্য ষষ্ঠী।

দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার

এই গল্পাংশটি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "শ্রীকান্ত" উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত। [শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-পরিচিতি সম্পর্কে "মামলার ফল" শীর্ষক গল্পের প্রবন্ধ-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।]

আলোচ্য গল্পাংশে "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট চরিত্র—দুঃসাহসী অথচ কোমল-প্রাণ ইন্দ্রনাথের অসম সাহসের একটি জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত সাহসী ব্যক্তি যে, ঘটনার আকস্মিকতার ক্ষণিকের জন্য চমকিত হইলেও অকতুভয়ে বিপদের সম্মুখীন হইয়া সেই বিপদের সমাধানে স্থির ও অচঞ্চল চিত্তে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন আর ভীরু ও আস্ফালনকারী ছদ্ম সাহসীরা বিপদের সময় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া সুযোগের সময় দুর্বল ও অক্ষমের উপর বীরত্ব ও প্রতাপ প্রকাশের প্রয়াস পায়—লেখক তাহা আলোচ্য গল্পাংশে একদিকে ইন্দ্রনাথ এবং অপরদিকে "পিসে মশাই", ভট্টচায্যি মশাই"ও, "পালোয়ান কিশোরী সিং"-এর চরিত্র এক করুণ ও হাস্যরসাত্মক পরিবেশের ভিতর দিয়া অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদের বিদ্যার্জন ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোরতা যে কতখানি নিষ্ফল ও হাস্যাস্কর ব্যাপার, এই গল্পাংশের "মেঝদা"র চরিত্র তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

টীকা

দক্ষ-যজ্ঞ—শিবের পত্নী সতীর পিতার নাম দক্ষ। দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সতী অনিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে আসিয়া দক্ষের শিব-নিন্দা হেতু

www.pathagar.com

দেহত্যাগ করিলে, শিব দক্ষালয়ে আসিয়া যজ্ঞ ধ্বংসপূর্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। এই ঘটনার অনুসরণে বর্তমানে "দক্ষযজ্ঞ" "হুলুস্থুল ব্যাপার" বা "মহামারি কাণ্ড" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তুলসীদাসী সুর—তুলসীদাস রামায়ণের হিন্দী-কাব্যানুবাদ করেন। সুর-সংযুক্ত বাংলা পুঁথি-পাঠের মত কাব্যানুবাদিত হিন্দী রামায়ণও একটি বিশিষ্ট সুর-সংযোগে পাঠ করা হয়। তুলসীদাসের ঐ রামায়ণ পাঠের বিশিষ্ট সুরকেই এখানে "তুলসীদাসী সুর" বলা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার" শীর্ষক গল্পাংশটি তোমার নিজ ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। আলোচ্য গল্পাংশের পিসে মশাই ও ভট্টচায্যি মশাই-এর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৩। আলোচ্য গল্পাংশের মেঝদা'র একাধিকবার পরীক্ষায় ফেল করিবার কারণ, তাঁহার সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলি উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৪। আলোচ্য গল্পাংশের "ছিদাম বউরূপী" কে? তাহার সম্পর্কে উক্ত গল্পাংশ পাঠে যাহা জান বর্ণনা কর।

৫। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) প্রত্যহ এই দেড় ঘণ্টাকাল অতিশয় বিদ্যাভাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ীতে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন।

(খ) একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই।

বিদায় হজ্জ্

এই প্রবন্ধের লেখক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব একজন প্রখ্যাত আলেম ও জ্ঞান-সাধক এবং শক্তিশালী সাহিত্যিক। রসুলুল্লাহ্ হযরত মুহম্মদের (দ:) জীবন সম্পর্কে তাঁহার রচিত গবেষণামূলক বিখ্যাত জীবনী-গ্রন্থ "মোস্তফা চরিত" হইতে এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইসলামের মূলভিত্তি কুরআন ও হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। রসুলুল্লাহ্ (দ:) নিজ কার্য ও বাক্য দ্বারা যে-সকল কাজ ও চিন্তাধারা অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন তাহার বিবরণকেই বলা হয় হাদিস। দশম হিজ্‌রীর শেষভাগে রসুলুল্লাহ্ (দ:) হজ্জ্ করিবার উদ্দেশ্যে দুই লক্ষাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে মক্কাশরীফে আগমন করেন এবং যথারীতি হজ্জ্-ক্রিয়া সমাধা করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ্। এই উপলক্ষে তিনি যে খুৎবা বা অভিভাষণ দান করেন তাহাতে ইসলামের মূল শিক্ষাগুলি উজ্জ্বলরূপে রূপায়িত হইয়া উঠে। ফলে ইসলামের ইতিহাসে এ খুৎবার মূল্য অপরিসীম। এই অভিভাষণ শেষ হওয়ার পর রসুলুল্লাহ্ জনতার দিকে চাহিয়া করুণ ও গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠেন, "বিদায়"। এইজন্য ইহা সাধারণতঃ "বিদায় হজ্জ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

টীকা

হজ্জ্—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : (মক্কার "কাবা" বা আল্লাহ্‌র ঘর) পরিক্রমণ। প্রচলিত অর্থ : প্রতি বৎসর হিজরী সালের যিল্-হজ্জ্ মাসের ৯ই তারিখ হইতে ১২ই তারিখ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশ হইতে আগত মুসলমানগণ কর্তৃক মক্কার কাবা-গৃহ পরিক্রমণ, সাফা-মারওয়ায় গমন, মক্কার নিকটবর্তী আরফাত্ নামক ময়দানে সমবেত হইয়া নামায আদায়, তৎপর তথা হইতে ফিরিবার পথে মুয্‌দালেফা ও মীনা নামক স্থানদ্বয়ে নামায ও অন্যান্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন এবং কোরবানী দান ইত্যাদির সমষ্টিভূত কার্যকে হজ্জ্ বলা হয়। অক্লেশে হজ্জ্-এর ব্যয় বহনে সক্ষম প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ও সুস্থ-দেহ মুসলমান নর-নারীর জন্য হজ্জ্-কার্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নিছক ধর্মের দিক ব্যতীত হজ্জ্-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যও অপরিসীম। ইসলাম ঐক্য ও সাম্যের ধর্ম। এই দুই আদর্শের রূপায়ণের জন্য হজ্জ্ একটি বাৎসরিক বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলন।

হিজরী—আরবী "হিজরত্" বা "দেশ-ত্যাগ" শব্দ হইতে উদ্ভূত। হযরত মুহম্মদ (দ:) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলে তাঁহার স্ব-বংশীয় মক্কার কুরাইশগণ তাঁহার ও নবদীক্ষিত মুসলমানগণের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে—এমনকি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যও ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। ইতিমধ্যে মদীনার নবদীক্ষিত মুসলমানগণ রসুলুল্লাহ্‌কে কুরাইশগণের অত্যাচারের গণ্ডীর বাহিরে এবং অনেকটা শান্ত পরিবেশ-সমন্বিত মদীনায় ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে থাকেন। এ সম্পর্কে তাঁহারা হজ্জ্-এর সময় মক্কায় আসিয়া উপর্যোপরি দুই বৎসর রসুলুল্লাহ্‌র নিকট নিম্নরূপ বায়াত্ গ্রহণ অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্‌র হস্তধারণপূর্বক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন : "আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরীক করিব না ; আমরা চুরি করিব না এবং ব্যাভিচার করিব না, আমরা আমাদের শিশু সন্তানদিগকে হত্যা করিব না ; আমরা পরনিন্দা এবং কুৎসা প্রচার করিব না ; প্রত্যেক ন্যায়-কার্যে আমরা রসুলুল্লাহ্‌র আদেশ মানিয়া চলিব এবং সুখে-দুখে আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিব।" মক্কার নিকটবর্তী আকাবা নামক পাহাড়ের উপর এই বায়াত্ বা প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয় বলিয়া ইহা "আকাবার বায়াত্" নামে ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বায়াত্ ইসলামের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে গৃহীত হয় এবং ইহার ফলে নব-প্রবাহিত ইসলামের শীর্ণ ও ক্ষীণ ধারা বিশ্বব্যাপী বিরাট সাফল্যের সুপ্রশস্ত বিশাল স্রোত-ধারায় প্রবাহিত হইবার সুযোগ লাভ করে। মদীনা বা ইয়াথ্রেব বাসীদের এই বায়াতের পর রসুলুল্লাহ্ নিজেও তাঁহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, তিনিও জীবনে-মরণে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না এবং আজ হইতে তাঁহাদের ও তাঁহার রক্ত এক হইয়া গেল। তখন মদীনার নাম ছিল ইয়াথ্রেব। রসুলুল্লাহ্ মদীনায় গমন করার পর ইয়াথ্রেবের নামকরণ হয় "মদীনাতুন্নবী" অর্থাৎ "নবীর শহর"। পরবর্তী সময় এই "মদীনাতুন্নবী"র নবী শব্দ বাদ যাইয়া ইহা শুধু "মদীনা" বা "শহর" নামেই বিশ্ব-বিশ্রুতি লাভ করে।

যাহা হউক এই ঘটনা কোনক্রমে ইসলাম-বিরোধী কুরাইশগণের কর্ণগোচর হওয়ায় মুসলমানগণের উপর তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হয়। ফলে দুই-তিনজন করিয়া গোপনে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া প্রায় একশত মুসলিম পরিবার মদীনায় যাইয়া উপস্থিত হন। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ নিজে তাঁহার চিরদিনের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ও ভক্ত হযরত আবু বকরকে (রা:) সঙ্গে লইয়া গোপনে মক্কা পরিত্যাগ করেন এবং বহু বিপদ-শঙ্কুল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উষ্ট্রারোহণে মদীনা হইতে মাত্র দুই মাইল দক্ষিণস্থ "কোবা" নামক স্থানে উপনীত হন। এখানে মাত্র কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া বহুসংখ্যক নবদীক্ষিত শিষ্য সমভিব্যাহারে ১৬ই রবিয়ল-আউয়াল, শুক্রবার সকাল বেলায় (২রা

www.pathagar.com

জুলাই, ৬২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি মদীনা নগরে প্রবেশ করেন। রসুলুল্লাহ্‌র গোপনে এই মক্কা-ত্যাগকেই ইসলামের ইতিহাসে "হিজরত" বা দেশ-ত্যাগ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই হিজরতের সময় হইতেই হিজ্‌রী সাল গণনা করা হয়। এই ঘটনার সাত বৎসর পরে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা:) এই সাল প্রবর্তন করেন। চান্দ্র মাস অনুসারে এই সাল প্রচলিত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও আরব দেশে এই চান্দ্র মাস অনুসারেই বৎসর গণনা করা হইত। ৪ঠা রবিয়ল-আউয়াল তারিখে রসুলুল্লাহ্ মক্কা হইতে রওনা হইয়া ১৬ই রবিয়ল-আউয়াল মদীনা নগরে যাইয়া প্রবেশ করেন। কিন্তু ঠিক এই তারিখ হইতে হিজ্‌রী সন আরম্ভ করা হয় নাই। আরব দেশে প্রচলিত মাসের মধ্যে মুহর্‌রম্ মাসই বৎসরের প্রথম মাস। কাজেই হিজ্‌রী সন রসুলুল্লাহ্‌র হিজরতের তারিখের পরবর্তী ১লা মুহর্‌রম তারিখ হইতে গণনা করা হয়। যেদিন হইতে হিজ্‌রী সাল গণনা আরম্ভ হয় সেদিন ইংরাজী ১৫ই জুলাই তারিখ। যদিও হযরত উমর (রা:) সরকারীভাবে এই সাল প্রবর্তন করেন, তথাপি কতকগুলি হাদিস্ অনুসারে দেখা যায় যে, হিজ্‌রতের 'পরে রসুলুল্লাহ্ স্বয়ং কোন ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করিবার সময় উক্ত ঘটনা হিজ্‌রতের এত সময় পূর্বে বা এত সময় পরে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইহা হইতেই হিজ্‌রী সালের প্রবর্তনের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়।

হযরত—এই পুস্তকের "মিলাদ-শরীফ" শীর্ষক কবিতার "হযরত" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাহাবী—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : সঙ্গী ; বন্ধু। প্রচলিত অর্থ : হযরত মুহম্মদের (দ:) সঙ্গে যে সকল মুসলমান অন্ততঃ তিন দিন অবস্থান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে "সাহাবী" বলা হয়। "সাহাবী" শব্দের বহুবচন "সাহাবা"। প্রত্যেক সাহাবীর নামোচ্চারণের পরে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাঁহার উপর প্রসন্ন আছেন"—প্রত্যেক মুসলমানকে এই কথা বলিতে হয়। রসুলুল্লাহ্‌র সাথী ঐরূপ ব্যক্তি নারী হইলে "রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা" বলিতে হইবে।

লাব্বায়েক্--আরবী শব্দ। অর্থ : উপস্থিত আছি বা হাযির আছি ; হজ্জ্-এর সময় আল্লাহ্‌র ঘর "কাবা" প্রদক্ষিণ করার সময় এই "লাব্বায়েক্" শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে হয় অর্থাৎ বলিতে হয়,—হে আল্লাহ্ তোমার নিকট হাযির আছি বা হাযির হইলাম। এই শব্দের অন্য শাব্দিক অর্থ হইল কাহারো আহ্বানে সাড়া দান।

জি-কাদ্ মাস—প্রকৃত বানান : যি-কাদ মাস। ইহা হিজরী সালের ১১শ মাস। অর্থাৎ যিল্‌কাদ্ মাস।

আদম (আ:)—ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মমতে আদম (আ:) মানব-জাতির আদি পুরুষ। আল্লাহ্ তাঁহাকে মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান তাঁহাকে শিক্ষা দান করেন। অতঃপর সমস্ত ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয়-দূতদিগকে এবং সুদীর্ঘকালীন উপাসনার ফলে আল্লাহ্‌র নিকট সুউচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত জিন্-জাতীয় মোক্‌রমকে নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা যেন সকলে আদমকে (আ:) সিজ্‌দা বা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। সকলেই সেই আদেশ প্রতিপালন করিল। কেবল অগ্নি দ্বারা নির্মিত জিন্-বংশীয় মোক্‌রম, সে অগ্নি-নির্মিত বলিয়া সেই গর্বে মৃত্তিকা-নির্মিত আদমকে সিজ্‌দা করিতে অস্বীকার করিল। গর্ব এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য—এই দুই পাপে মোক্‌রম আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হইয়া শয়তানে পরিণত হইল এবং সেদিন হইতে সে আদম-সন্তানদের অর্থাৎ মানব-জাতির চির শত্রুতে পরিণত হইল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আদম (আ:) তাঁহার স্ত্রী বিবি হাওয়া সহ বেহেশ্‌ত্-এ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে বেহেশ্ত-এর নিকট বিশেষ বৃক্ষের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এদিকে শয়তানের প্ররোচণায় বিবি হাওয়া হযরত আদমকে (আ:) নানা প্রকারে বুঝাইয়া অবশেষে তাঁহাকে উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াইতে সমর্থ হইলেন। ফলে হযরত আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া বেহেশ্ত্ হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন। আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইল। হযরত আদমের (আ:) বংশধরগণ হইতেই মানবজাতির উৎপত্তি। [এই পুস্তকের "হে মানুষ" শীর্ষক কবিতার "আদম-সন্তান" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য এবং "জিন্" ও "শয়তান" শব্দের টীকার জন্য "নাত" শীর্ষক কবিতার "শয়তান" শব্দের টীকা এবং "ফেরেশ্তা" শব্দের টীকার জন্য "নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার "ফেরেশ্তা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

হিজ্রত—এই প্রবন্ধের হিজ্রী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাফা-মার্ওয়া—এই পুস্তকের "কায়েদ আযম" শীর্ষক কবিতার "সাফা-মারওয়া" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

হরম—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : পবিত্র স্থান ; যে-স্থানে সর্বপ্রকার অপবিত্র, অন্যায় ও হিংসামূলক কাজ নিষিদ্ধ। প্রচলিত অর্থ : মক্কার কাবা শরীফের চতুষ্পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট ইলাকা--যেখানে সর্বপ্রকার হিংসামূলক ও অন্যায় কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মদীনায় হযরত মুহম্মদের (দ:) "রওযা" বা সমাধি-স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অনুরূপ স্থানকেও "হরম" বলা হয়। এই দুই স্থানকে "হারামাইনিশ্ শরীফাইন্" অর্থাৎ "দুইটি পবিত্র ও সম্মানিত হরম" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কা'বাতুল্লাহ্—আরবী বাক্যাংশ। অর্থ : আল্লাহ্র কা'বা ["জিন্দাপাকিস্তান" শীর্ষক কবিতার "কাবা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

আরফাত—মক্কা হইতে প্রায় ১২ মাইল ঈষৎ উত্তর-ঘেসা পূর্বদিকে অবস্থিত একটি বিশাল প্রান্তর। যিল্হজ্জ্ মাসের ৯ তারিখে দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অবস্থান করিয়া নামায আদায় হজ্জ্-ক্রিয়ার অবশ্য পালনীয় অঙ্গ। ঐদিনই সন্ধ্যায় আরফাত পরিত্যাগ করিয়া মুযদালেফা নামক স্থানে চলিয়া আসিতে হয়।

মুজদালেফা—প্রকৃত বানান : মুয্দালেফা। মুয্দালেফা একটি উপত্যকা এবং আরফাত ময়দান হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিম দিকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে অবস্থিত। আরফাত হইতে ৯ই যিল্হজ্জ্ সন্ধ্যায় রওয়ানা হইয়া মুয্দালেফায় আসিয়া ঐ রাত্র তথায় অবস্থান এবং মগ্রেব ও এশার নামায একত্রে আদায় করাও হজ্জ্-এর অন্যতম অঙ্গ। ১০ই যিল্হজ্জ্ সকালে ফযরের নামায সমাপনান্তে মুয্দালেফা পরিত্যাগ করিয়া মীনায় রওনা হইতে হয়। মুয্দালেফা হরমের অন্তর্গত নহে।

শরিয়ৎ—আরবী শব্দ। অর্থ : ইসলাম ধর্মের বিধান বা নিয়ম-কানুন।

মুর্খতা-যুগ—আরবে হযরত মুহম্মদের (দ:) জন্মের পূর্ববর্তী যুগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। আরবী ভাষায় ইহাকে বলা হয় : "আল্ আইয়াম্ইল্-জাহেলিয়াহ্"।

শোনিত-প্রতিশোধ—হযরত মুহম্মদের (দ:) আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে এই নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি নিহত হইলে নিহত ব্যক্তির বংশীয় লোকগণ হত্যাকারীকে কিংবা হত্যাকারীর বংশীয় অন্য কোন লোককে নিহত না করা পর্যন্ত এই হত্যার ন্যায়সঙ্গত সুবিচার বা যথার্থ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল বলিয়া স্বীকৃত হইত না। ফলে এরূপ একটি

www.pathagar.com

হত্যার ফলে বংশ-পরম্পরায় হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকিত। হযরত মুহম্মদ (দ:) আরবের এই প্রথাকে চিরতরে রহিত করিয়া দেন।

খোৎবা—আরবী শব্দ। প্রকৃত বানান : খুত্‌বা বা খুৎবা। অর্থ : অভিভাষণ।

আল্লাহ্‌র কিতাব—এখানে কুরআনকে বুঝাইতেছে। [এই পুস্তকের না'ত শীর্ষক কবিতার রসূল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

কাফের—আরবী শব্দ। অর্থ : আল্লাহ্‌য় অবিশ্বাসী ও আল্লাহ্-বিদ্রোহী। অনেকের ধারণা, অমুসলমান মাত্রকেই মুসলমানেরা "কাফের" বলিয়া অভিহিত করেন। এ ধারণা ভুল। যাহারা বিশ্ব-স্রষ্টার বিশ্বাসী—অথচ একাধিক স্রষ্টাকে মানিয়া চলে, তাহাদিগকে বলা হয় "মুশ্‌রেক্"—"কাফের" নহে। "মুশ্‌রেক্" শব্দ "শরীক" বা অংশীদার শব্দ হইতে উৎপন্ন। যাহারা "একমেবা দ্বিতীয়ম্" বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে অংশীদার যোগ করে তাহাদিগকেই বলা হয় "মুশরেক্"।

মুস্‌তফা বা মুস্তফা—আরবী শব্দ। শব্দিক অর্থ : মনোনিত বা নির্বাচিত (ব্যক্তি) ; Chosen। প্রচলিত অর্থ : আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (দ:)।

শের্ক--আরবী শব্দ। আরবী "শরীক" বা অংশীদার শব্দের ইহা মূল শব্দ। অর্থ : অংশীদারকরণ। প্রচলিত অর্থ : আল্লাহ্‌র অংশীদারকরণ অর্থাৎ বিশ্ব-স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া এক বা একাধিক অন্য কাহাকে বা অন্য কাহাদিগকে অন্যতর বা অন্যতম বিশ্ব-স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া। ইসলামের মূলমন্ত্র-কঠোর একত্ববাদের ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী কার্য।

প্রশ্নাবলী

১। "বিদায় হজ্জ্" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে হযরত মুহম্মদের (দ:) শেষ হজ্জ্-যাত্রার বিবরণ তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। বিদায় হজ্জ্-এ প্রদত্ত হযরত মুহম্মদের (দ:) অভিভাষণের সারমর্ম তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। হযরত মুহম্মদের (দ:) আলোচ্য হজ্জ্‌কে "বিদায় হজ্জ্" কেন বলা হয়, তাহার উত্তর দাও।

৪। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত মুহম্মদকে (দ:) কেন "ইব্‌রাহীম বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, তাঁহার প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র সশরীরী আশীর্বাদ" বলা হইল, প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। আরবে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে অ-কুরাইশদিগকে, হজ্জ্-এর সময় কি কি অপমান ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৬। টীকা লিখ :—

মুস্‌তফা ; কাফের ; হরম ; মুজ্‌দালেফা ; মূর্খতাযুগ ; শোনিত-প্রতিশোধ ; সাহাবী ; হজ্জ্।

www.pathagar.com

আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা

এই প্রবন্ধের রচয়িতা জনাব ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব সারা জীবন তাঁহার মূল্যবান রচনা-সম্ভার ও অগ্নিগর্ভ বাগ্মীতার সাহায্যে জাতীয় জাগরণের জন্য নিরলস সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, সেগুলি ইসলামী ও দেশ-প্রেমের জোশে উদ্বেল। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহার মূল বক্তব্য হইল এই : আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-গৌরব-বোধহীন জাতির লাঞ্ছনা ও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় জাগরণ ও জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ। এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করিবার প্রধান উপায় হইল—প্রকৃত শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা হইল, দুনিয়া ও আখেরাত অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের সুসমঞ্জস যুগপৎ উন্নতি বিধান। যে-শিক্ষা এই উভয় জীবনকে যুগপৎ উন্নত করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশে যে-শিক্ষা-অবস্থা প্রবর্তিত, তাহা নিতান্তই একদেশ-দর্শী—একদিকে মোক্তব-মাদ্রাসা আর একদিকে স্কুল-কলেজ। মোক্তব-মাদ্রাসায় ধর্ম কিছুটা শিক্ষা দেওয়া হয় বটে—কিন্তু সেখানে দুনিয়াদারী বা ইহলৌকিক নীতিমূলক প্রায় কোন শিক্ষারই ব্যবস্থা নাই। অপরদিকে স্কুল-কলেজগুলিতে ইহলৌকিক উন্নতি সাধনের বঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হইলেও সেখানে ছাত্র-ছাত্রিগণ ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞই রহিয়া যায়, বলা চলে। ফলে এই দুই শ্রেণীর শিক্ষায়তন হইতে যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হয় যথার্থ ইসলামের দৃষ্টিতে তাহারা অপূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত অপূর্ণ মানুষ। ফলে জাতীয় জীবনের সর্বশাখায় আজ নীতি-হীনতা অধঃপতনের ব্যাপক প্রসার। জাতিকে বাঁচাইয়া পৃথিবীতে সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া বর্তমান অবস্থার আশু অবসান অপরিহার্য।

প্রশ্নাবলী

১। "আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক প্রবন্ধের সারমর্ম তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) আত্মশক্তির প্রতি যাহার শ্রদ্ধা আছে, সে একদিন যত বিলম্বেই হউক না কেন, তরুর ন্যায় নিজের পায়ে নির্ভর করিয়া গগনমার্গে শির উত্তোলন করিবেই।

(খ) বিশ্বাস হইতেছে আত্মার খাদ্য। বিশ্বাস হইতে চিন্তা এবং চিন্তা হইতে কার্যের উৎপত্তি।

(গ) আত্মবিশ্বাস এবং আত্মোপলব্ধি দ্বারাই মানব-জীবনের গৌরব ও মহিমা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ আত্মবিশ্বাসের বলেই মানুষ, মানুষ হইয়া উঠে।

(ঘ) যে আঘাত দেয় সে অত্যাচারী হইতে পারে। কিন্তু সে অক্ষম নহে, বরং সে ক্ষমতাশালী। ... কিন্তু যে-নীরবে আঘাত হজম করে, সে নিশ্চয়ই অধম ও অক্ষম।

(ঙ) যে-মাঝি তুফানে নৌকা চালায় এবং যে-মাঝি নিথর নিস্তরঙ্গ নদীতে নৌকা চালায়, তাহাদের উভয়ের হাল একই রকম এবং একই কাঠের তৈয়ারী হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের সাহস ও নিপুণতা ঠিক একই রকমের নহে।

www.pathagar.com

নারীস্থান

এই লেখাটি মিসেস আর, এস্, হোসেন বা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত "মতিচূর" নামক গ্রন্থের "সুলতানার স্বপ্ন" শীর্ষক রচনা হইতে উদ্ধৃত। ইহা একটি সার্থক গল্প। এই গল্পের লেখিকা বাংলার মুসলমান সমাজের সর্বপ্রথম মহিলা, যিনি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার এবং তাঁহাদিগকে অনঐস্লামিক অবরোধ প্রথা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সারাজীবন সাধনা ও সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ইসলামের পর্দা-প্রথা এবং কয়েক বৎসর পূর্ব-পর্যন্ত মুসলমান-সমাজে, বিশেষ করিয়া মুসলমান শরীফ বা সম্ভ্রান্ত নামে অভিহিত সমাজে, ব্যাপকভাবে প্রচলিত অবরোধ-প্রথা এক জিনিষ নহে। ইসলামী পর্দা-প্রথা অনুযায়ী মুসলিম নারীগণ দেহকে সুষ্ঠুভাবে আবৃত করিয়া এবং শালীনতা রক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে অনায়াসে বাহিরে যাইতে পারেন—এমনকি যুদ্ধাদিতেও যোগদান করিতে পারেন। রসুলুল্লাহ্‌র জীবন-কালে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী গণতান্ত্রীক চার খলীফার শাসনকালে মুসলমান নারীদের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যাহা হউক বাংলার মুসলিম সমাজের এই অবরুদ্ধা ও অশিক্ষিতা নারীদিগকে শিক্ষার আলো এবং মুক্তির আলো দানের জন্য মিসেস আর, এস, হোসেন কলিকাতায় বালিকাদের জন্য "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ হাই স্কুল" নামে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন এবং আমৃত্যু বাংলা ও ইংরাজীতে লেখনী চালাইয়া যান। [তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে এই পুস্তকের "সাহিত্যিক রোকেয়া" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

বাংলার মুসলিম নারীদের পূর্বোক্ত শোচনীয় ও করুণ অবস্থার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিংবা এই ভাগ্যাহতা নারীদিগকে উৎসাহ দানের জন্যই বোধহয় তাঁহার এই গল্পের পরিকল্পনা। এই গল্পে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় অপারগ পুরুষ-জাতিকে গৃহাভ্যান্তরে অবরোধ-আবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষিতা নারীদের দ্বারা স্বদেশ-আক্রমণকারী শত্রু-সেনাবাহিনীর পরাজয় সাধন এবং স্বাধীন স্বদেশের সুষ্ঠু রাষ্ট্র-পরিচালনার এক মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গল্পের প্রধান বক্তব্য হইল—নারী সুশিক্ষিতা হইলে জ্ঞান-সাধনায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, দেশ-রক্ষায় ও রাষ্ট্র-পরিচালনায় শুধু পুরুষের সমকক্ষ নহে—সময় সময় তাহাদের অপেক্ষাও উন্নততর স্থান অধিকার করিতে পারেন।

এই গল্পটি বহু পূর্বে লিখিত। তখন ভারত বিভক্ত হইয়া পাক-ভারতে পরিণত হয় নাই। সেজন্য লেখিকা ইহাতে ভারত এবং কলিকাতার কথাই শুধু উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। "নারীস্থান" শীর্ষক গল্পের অনুসরণে নারীস্থানের দৃশ্য বর্ণনা কর।

২। এই গল্পের অনুসরণে নারীগণ কেন এবং কিরূপে পুরুষ জাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করেন, তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৩। নারীগণ কিভাবে শত্রু-সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন, তাহা বর্ণনা কর।

www.pathagar.com

মদন গাযী

এই লেখাটি কাজী ইমদাদুল হক সাহেব রচিত "আবদুল্লাহ্" নামক উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত। ইমদাদুল হক সাহেব বাংলার মুসলমান সাহিত্য-সাধকদের অগ্রপথিকদলের অন্যতম। তিনি প্রধানতঃ প্রবন্ধকার। তাঁহার রচনাবলী পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ। ইসলামের অতীত ইতিহাসের অনেক উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার লেখনীর সাহায্যে বাংলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার ভাষা সবল ও সাবলীল। আলোচ্য লেখাটি একটি অশিক্ষিত মুসলমান চাষী-পরিবারে আলেখ্য। গল্পের সংলাপে চাষীদেরই সহজ-সরলভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাদের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবাদিতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ের পরিণাম কি ভয়াবহ এবং ঋণ,—বিশেষ করিয়া সুদী-ঋণ কি তরিদগতিতে মানুষের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে, এই গল্পটিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। নির্জলা কুসীদ-ব্যবসায় শুধু ঋণ-গৃহিতা নয়, ঋণ-দাতাকেও লোভ-অন্ধ কোন্ পশুত্বের স্তরে নামাইয়া আনিয়া মানবতার দিক দিয়া তাহার চির সর্বনাশ সাধন করে—এই গল্পের তাহাও অন্যতম শিক্ষা।

প্রশ্নাবলী

১। "মদন গাযী" শীর্ষক গল্পের সার-সংক্ষেপ তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। আলোচ্য গল্পের দিগম্বর ঘোষের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

সুখী কে?

এই প্রবন্ধটি স্বেচ্ছায় বল্খের রাজ-সিংহাসন-ত্যাগী, মুসলিম জাহানের অন্যতম বিখ্যাত সুফী-সাধক "ইব্রাহীম আদহাম"-এর জীবনী সম্পর্কে শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য-বিশারদ রচিত জীবন-চরিত-গ্রন্থ "রাজর্ষি এব্রাহীম" হইতে উদ্ধৃত। ফজলুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মুসলমান সাহিত্যিকদের ভিতর অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কাব্য ও গদ্য রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত। [এই পুস্তকের "স্বপ্ন" শীর্ষক কবিতার কাব্য-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।]

আলোচ্য উদ্ধৃতিটির মূল বক্তব্য হইল এই :—এই পৃথিবীতে রাজ-রাজেশ্বর হইতে পথের কাঙ্গাল পর্যন্ত প্রায় কেহই সুখী নহে। কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তবে আকাঙ্ক্ষার প্রকার ভেদ আছে। এই মানবীয় নিয়মানুসারে বল্খের অধীশ্বর বাদশাহ্ ইব্রাহীমও সুখী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সে দুঃখের কারণ পার্থিব সুখ-সম্পদ নহে। জীবনে-মরণে যাহার বিনাশ নাই সেই পরমার্থ সম্পদ আল্লাহ্ প্রেম এবং সেই আল্লাহ্র সত্তায় নিজের সত্তাকে বিলাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। জীবনের এই চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষিত পথে কি করিয়া তিনি যাইতে পারিয়াছিলেন—এই লেখাটিতে তাহারই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

টীকা

খিযর্—এই পুস্তকের "নতুন সফর" শীর্ষক কবিতার 'খিযির্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা—মুসলমানদের মধ্যে মোটামুটি দুইটি শাখা আছে—সুন্নী ও শিয়া। সুন্নীগণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—মযহাবী এবং লা-মযহাবী। এই "মযহাবী"দের মধ্যে পুনরায় চারিটি উপশাখা রহিয়াছে—হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। ইমাম আবু হানিফা এই হানাফী—উপশাখার ইমাম বা ধর্মীয় নেতা। পাক-ভারতের মুসলমানগণের অধিকাংশই হানাফী মযহাবভুক্ত। সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই সুন্নী মযহাব-ভুক্ত আর এই সুন্নীদের শতকরা ৬০ জন ইমাম আবু হানিফার মতানুবর্তী। শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে ইসলামের সর্বশাখার মধ্যে হানাফী-মতবাদই সর্বাপেক্ষা উদার। ইমাম আবু হানিফার পূর্ণ নাম আবু হানিফা আন্‌নোমান-ইব্‌ন-সাবিত। তিনি হিজরী ৮০ সালে (৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) ইরাকের কুফা-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ ইরান দেশের অধিবাসী। তিনি শিয়া মতাবলম্বী শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভ করিলেও সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন এবং ইসলামী আইন ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনকালেই ইসলামের খেলাফত্ বা খলীফা পদ উমাইয়া বংশের হাত হইতে আব্বাসিয়া বংশের হাতে চলিয়া যায়। কিন্তু তিনি আব্বাসিয়াদিগকে সমর্থন করিতেন না। সেইজন্য তাঁহাকে হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে 'আব্বাসীয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা—মুন্‌সুর তাঁহাকে তদানীন্তন বিশাল ইসলামী রাজ্যের "কাযী-উল্-কুয্যাত" বা প্রধান বিচারপতির আসন দিতে চাহিলেন। তিনি সে পদ গ্রহণে অস্বীকার করায় তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু কারাগারের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার ভিতরও তিনি তাহার মত পরিবর্তন করিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে কারাগারেই তাঁহাকে গোপনে বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করা হয়। এইভাবে হিজ্‌রী ১৫০ সালে (৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রশ্নাবলী

১। বল্‌খেশ্বর ইব্‌রাহীম কিভাবে সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া আল্লাহর পথে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন "সুখী কে?" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর : —

(ক) রাজবেশের অভ্যন্তরেও যে সচরাচর একটি ব্যথীত, বিরাগী, নিঃস্বমন লুক্কাইত অবস্থায় রোদন করিয়া থাকে, অনেক সময় আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

(খ) বিদ্যার সহিত বিনয়ের মিলন না ঘটিলে সে বিদ্যা সুফল প্রসবিনী হয় না।

(গ) বৈরাগ্যের প্রবল বাড়বানলে যে হৃদয় অহরহ দগ্ধ হইতেছিল, সেই হৃদয়কে অধিকতর দগ্ধ করিবার জন্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল।

পল্লী-সাহিত্য

এই প্রবন্ধের লেখক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-ভাষার প্রধান অধ্যাপকরূপে তিনি বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সহিত পল্লী-সাহিত্য সম্পর্কেও বহু চর্চা এবং আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই পল্লী-সাহিত্যেরই মনোজ্ঞ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাংলার বর্তমান নাগরিক সাহিত্য প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মনিষার ফলে বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিলেও

www.pathagar.com

বাংলার সুদূর পল্লীর রূপ-কথা, উপকথা, ডাক ও খনার বচন, ছড়া, পল্লীগান ও পল্লী-গীতিকার সাহিত্যিক মূল্য এখনও অপরিমেয়। শুধু সাহিত্য নহে, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দিক দিয়াও এগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও অগ্রগতির জন্য পল্লীর অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের মুখে-মুখে সংরক্ষিত এই অলিখিত সাহিত্য-সম্পদগুলির আশু সংকলন ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, বর্তমান জগতের গণ-মুখী প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যিকদেরও উচিত, পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া পল্লীর জনসাধারণের যথার্থ জীবন-আলেখ্য অবিলম্বে সাহিত্যের বুকে অঙ্কন করা। আলোচ্য প্রবন্ধের ইহাই মূল বক্তব্য।

এই প্রবন্ধের ভাষা কলিকাতা ও তদসন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত—কিন্তু সম্পূর্ণ সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ। এ ভাষা রবীন্দ্র-ভাষা-রীতি অনুসারী।

প্রশ্নাবলী

১। পল্লী-সাহিত্যের প্রয়োজন কেন ?—উক্ত নামীয় প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে পল্লী-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর : —

(ক) বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে বায়ু-সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে এখানে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

(খ) আজ অনেকের আত্মা ইটপাথর ও লোহার কৃত্রিম বাধন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাচ্ছে।

ইসলামের ধারা

এই প্রবন্ধটি মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত "শান্তি-ধারা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব বাংলার হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত বেগবান ও শক্তিশালী। বন্যাস্ফীত স্রোতধারার মত আবেগ-আকুল তরঙ্গভঙ্গে এ ভাষা-মন্দাকিনী বহিয়া চলিয়াছে। এই দিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ লেখকের সংখ্যা সারা বাংলা-সাহিত্যেও বেশী নাই। তাঁহার লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যকে প্রাণের আবেগ ও আন্তরিকতা মিশাইয়া তিনি তেমনি শক্তিশালী ও সৌন্দর্যময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য প্রবন্ধটিও সেই জাতীয় একটি রচনা। ঐক্যই যে ইসলামের মূলমন্ত্র—ইসলামের সুদৃঢ় একত্ববাদ যে বিশ্বময় ঐক্যেরই প্রতীক—এই প্রবন্ধে সেই কথাই অতি সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।

টীকা

কলেমা—এই পুস্তকের "নাত" শীর্ষক কবিতার "কলেমা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

যাকাত—এই পুস্তকের "ফরমান" শীর্ষক কবিতার "যাকাত" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

নামায—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : উপাসনা ; প্রার্থনা। কুরআনে এই শব্দটিকে "সালাত্" বলা হইয়াছে।

রোযা—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : উপবাস। কুরআনে এই শব্দটিকে "সিয়াম" বলা হইয়াছে।

হজ্জ্—এই পুস্তকের "বিদায় হজ্জ্" শীর্ষক প্রবন্ধের "হজ্জ্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

মুর--উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিয়াশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদিগকে "মুর্" বলা হয়।

আল্লাহু আক্‌বর—আরবী বাক্য ; অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ মহান। এই বাক্যটিকে আরবী ভাষায় "ত্বক্‌বির" বলা হয়। মুসলমানদিগকে কোন আনন্দ বা বিজয় বা উৎসাহ সঞ্চার উপলক্ষে জয়-ধ্বনি করিতে হইলে এই বাক্যটি দ্বারাই সে জয়-ধ্বনি করা নিয়ম। কারণ ইসলামের নির্দেশ অনুসারে মুসলমান এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারো নিকট নতি স্বীকার করিতে পারেনা, অন্য কাহারো বন্দনা-গীতি গাহিতে পারেনা। এই জয়-ধ্বনিকে "নারায়ে ত্বক্‌বির" বলা হয়।

লাম্বায়েক—এই পুস্তকের "বিদায় হজ্জ্" শীর্ষক প্রবন্ধের "লাম্বায়েক" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

আস্‌সালামু আলায়কুম—আরবী বাক্য ; অর্থ : আপনাদের উপর (আল্লাহ্‌র) শান্তি (বর্ষিত হোক)। এই শান্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়াই মুসলমানগণ অন্যকে স্বাগত-সম্ভাষণ বা অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এখানেও সেই আল্লাহ্‌রই করুণা ও শান্তি প্রার্থনা—অভিবাদন গ্রহণকারীর কোনরূপ স্তব-স্তুতি বা বন্দনা-গীতি নহে। প্রাচীন হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত সংস্কৃত "ওঁ শান্তি" বাক্যটির সহিত মুসলমানদের এই অভিবাদন-বাক্যটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

যায়েদ—তিনি হযরত মুহম্মদের (দ:) ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত তাহাকে শুধু দাসত্ব হইতে মুক্তিদানই করেন নাই, তদানীন্তন তাঁর কৌলীন্য-প্রথা-প্রপীড়িত আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন-বংশ কুরাইশ বংশের কন্যা, আপন ফুফাতো ভগ্নীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। ইহাছাড়া, তদানীন্তন আরবের কৌলীন্যপ্রথার এবং আরবের শ্রেষ্ঠতম অভিজাত বংশীয়গণের প্রধান কেন্দ্র মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা:), হযরত উমর (রাঃ) প্রমুখ প্রখ্যাতবীর ও স্বীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন থাকা সত্ত্বেও হযরত মুহম্মদ (দ:) মক্কা-বিজয় অভিযানের প্রধান সেনাপতি-পদে বরিত করেন এই প্রাক্তন ক্রীতদাস যায়েদকে। ইসলামের চক্ষে সকল মানুষই সমান, সেখানে কুলীন-অকুলীন বলিয়া কোন প্রভেদ নাই—এই সাম্যমূলক মহান আদর্শ ইসলামের ইতিহাসে বারম্বার এইভাবে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়াছে।

বেলাল--এই পুস্তকের "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "বেলাল" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধের "তপ্ত বালুকা হইতে উত্থিত হইয়া দুর্ভাগ্য ক্রীতদাস নিখিল মুসলমানের প্রেম-সম্মানের স্বর্ণাসনে সমাসীন সম্রাট" বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনিই এই হযরত বেলাল।

ইসলামে ক্রীতদাস মহামান্য সম্রাট তনয়ার পাণি গ্রহণ করে—এই বাক্য দ্বারা দিল্লীর পাঠান আমলের দাস-বংশীয় সম্রাট ইল্‌তুত্‌মিশ্‌কে বুঝানো হইয়াছে। এ সম্পর্কে পাক-ভারতের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

মহামানব খলীফা ও অধম ক্রীতদাস উষ্ট্রারোহণের অধিকার তাহাদের উভয়েরই সমান--ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা:) যখন যেরুযালেম অধিকার সম্পর্কিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য একজন ক্রীতদাস সহ উষ্ট্রারোহণে যেরুযালেম যাইতেছিলেন—

www.pathagar.com

তখনকার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে এই পুস্তকের "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতা ও তদসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

মযহাব—আরবী শব্দ ; অর্থ : ধর্মীয় পথ ; বিশিষ্ট ধর্মীয় পথ-অনুসারী সম্প্রদায়। এই পুস্তকের "সুখী কে ?" শীর্ষক প্রবন্ধের "ইমাম আবু হানিফা" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। "ইসলামের ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে ইসলাম ধর্মে ঐক্যের যথার্থ স্থান কোথায়, নির্ণয় কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) জড় প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ শুধু সহানুভূতি নহে, জড় ও জীবের জীবনধারাও একই ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে।

(খ) এই চেতনাহীন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের রস-রক্তের সম্বন্ধ আছে।

(গ) প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ঐক্যসূত্র পরিষ্কার রূপে প্রকাশমান।

(ঘ) মানুষ বুঝিতে চায়, দেখিতে চায়, দেখাইতে চায়, সে স্বতন্ত্র, সে কিছু, তাহার আসনে সে গরীয়ান্ সম্রাট।

(ঙ) এই বিশ্ব চরম ও পরম একের বিকাশ ও বিলাস ; তাহাকে লাভ করিবার জন্য বিচিত্র বিশ্ব মূলে-মূলে ঐক্যের সাধনা করিতেছে।

(চ) প্রকৃতির প্রাণের মূলে যে-মন্ত্রের রাগিনী বাজিতেছে, ইসলাম ধর্মে সেই ঐক্যের সুমহান ঝংকার উঠিয়াছে।

(ছ) স্বাতন্ত্র্যে বিকাশ ও ব্যাপ্তি ; কিন্তু ঐক্যে শক্তি ; ঐক্য উৎসের মত বিচিত্রভাবে উৎসারিত হয়, নানা বর্ণে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

(জ) বিভিন্ন জল-বায়ুতে পুষ্প যেমন একই প্রকারে ফুটিয়া উঠে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায়, মুসলমানের প্রাণ-কমল প্রভুর পানে তেমনই একই প্রকারে বিকশিত হয়।

(ঝ) পতনে প্রার্থনায়, উত্থানে-জিগীষায় মুসলমান এক—নিবিড়রূপে এক, মহাজাতীয়তার তাড়িত প্রবাহে বিদ্ধ ও জীবন্ত এক।

বাংলা সাহিত্যের নবরূপায়ণ

এই প্রবন্ধটি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার রচিত প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত। [মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে এই পুস্তকের "নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার কাব্য-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।] রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকারী কবি-যশলিপ্সু ব্যক্তিবর্গের অতি-মাত্রিক কারুণ্য-রস-বিগলিত কবিতা-ভারে মুমূর্ষু ও জীবন্মৃত অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল।

www.pathagar.com

ঠিক সেই সময় নজরুল ইসলামের সৈনিকোচিত রণ-দামা নিনাদ-মুখর বীর্যবান কাব্য-ধারা ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের সর্বক্ষেত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়া বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যকে—বিশেষ করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে আবার প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করিয়া তোলে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার এই তথ্যই মনোরম ভাষা ও যুক্তিতর্কের সহিত পরিবেশন করিয়াছেন।

টীকা

আবুবকর—এই পুস্তকের "খলীফা-নির্বাচন" শীর্ষক প্রবন্ধের "হযরত আবুবকর" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

উসমান—এই পুস্তকের "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "উসমান" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

উমর—এই পুস্তকের "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "উমর ফারুক" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

আলী হায়দর—এই পুস্তকের "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "আলী হায়দর" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

লা শরীক আল্লাহ্‌—আরবী বাক্যাংশ। অর্থ : শরীকহীন বা অংশীদারহীন আল্লাহ্‌ ; অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র বিশ্ব-সৃজন, পালন ও প্রলয় সাধন ব্যাপারে অন্য কোন অংশীদার নাই।

প্রশ্নাবলী

১। নজরুল-কাব্যের বৈশিষ্ট্য কি, "বাংলা সাহিত্যের নবরূপায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর : —

(ক) যে-শব্দ, যে-বাণী মানবাত্মার হৃদয়-রহস্যের একমাত্র প্রকাশ পন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জন গুহাশায়ী অন্তর-দেবতা জীবন-লীলায় মূর্তি ধারণ করেন—সেই বাক্‌, সেই ব্যক্তিত্বাবগুণ্ঠিত ব্রহ্মের আত্মসৃষ্টি বা আত্মপ্রসারের আদি চেষ্টা মাতৃভাষাতেই সম্ভব।

(খ) অনন্ত বালুকারাশির দৈনন্দিন দহন-জ্বালা নিরুদ্দেশ মরু-সমীরণের প্রদোষকালীন হাহা শ্বাস, নিশিথ আকাশের দিগন্ত-বিসর্পী মহামৌণী নক্ষত্র-সভা—জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির ত্রিসন্ধ্যার ত্রিবিধমন্ত্রে বঙ্গ-ভারতীয় অর্চনারতি হইবে।

(গ) বাংলার কবিতা-মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে ব্যজনী বীজন চলিতেছে।

অধ্যবসায়

এই লেখাটি মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সাহেব রচিত প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত। শুধু মুসলমান নহে—সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রবন্ধকারগণের মধ্যে লুৎফর রহমানের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার সকল রচনাই নৈতিকতা ও আদর্শ-ভিত্তিক।

www.pathagar.com

ইংরাজী প্রবন্ধ-সাহিত্যে উচ্চাদর্শ ও নীতিমুখিনতা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়া স্মাইল, এডিসন ও কালাইলের যে-স্থান, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে লুৎফর রহমান নিঃসন্দেহে সে স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার রচিত "উন্নত-জীবন", "মহৎ-জীবন" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত কথ্য-ভাষা তাঁহার সাহিত্যের বাহন। তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে এ ভাষা সহজ সারল্য, প্রকাশ ব্যঞ্জনা ও ভাব-মাধুর্যে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে ভাষার সারল্য ও ভাবের গভীরতাময় অপূর্ব যাদুকরী রচনাশৈলী প্রবর্তনায় শরৎচন্দ্রের যে-স্থান, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যেও লুৎফর রহমান অনেকটা সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া বলা যাইতে পারে।

কঠোর সাধনা ও নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ই যে, মানব-জীবনের সাফল্য ও উন্নতির মূলীভূত কারণ—জগতের বিভিন্ন মনীষীর বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবিধ ঘটনা উল্লেখ করিয়া সে কথাই প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। তাহার বলার ভঙ্গীটি অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদয়-স্পর্শী।

টীকা

জর্জ ষ্টিফেন্সন—বাষ্প-পরিচালিত রেল-ইঞ্জিনের তিনি প্রথম উদ্ভাবক। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। শৈশবেই উপার্জনের পথ খুঁজিতে হইল। প্রথমে তিনি দৈনিক দুই পয়সা বেতনে গ্রামের এক বিধবার গরু চরাইতেন এবং অবসর সময় মাঠে বসিয়া মাটির ইঞ্জিন গড়িতেন। ১৪ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ নিরক্ষর ষ্টিফেন্সন কয়লার খনিতে কার্য গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি এই সকল ইঞ্জিন দেখিয়া খুলিয়া বাড়ীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে লাগিলেন এবং ওয়াট্ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠের জন্য ১৮ বৎসর বয়সে নৈশবিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার বর্ণ পরিচয় হয়। কর্মচারীদের জুতা সেলাই করিয়া তিনি নৈশবিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। এই মহাসাধকেরই আপ্রাণ সাধনায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নব-নির্মিত রেল-ইঞ্জিন ইংলন্ডের স্টক্টন হইতে ডার্লিংটন পর্যন্ত রেলপথে ছয়খানা মালগাড়ী ও একখানা যাত্রী গাড়ী পনর মাইল বেগে চালাইয়া লইয়া যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্টিফেন্সন-নির্মিত রেল-ইঞ্জিনের সাহায্যেই ইংলন্ডের লিভারপুল হইতে মাঞ্চেষ্টার পর্যন্ত জনসাধারণের ব্যবহার্য জগতের সর্বপ্রথম রেল লাইন স্থাপিত হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন্সন পরলোকগমন করেন।

ওয়াট—তাঁহার পূর্ণ নাম জেম্স্ ওয়াট। ব্যবহারোপযোগী প্রকৃত বাষ্পীয়-যন্ত্রের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এক সূত্রধরের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিলেও তিনি প্রায়ই সেখানে অনুপস্থিত থাকিতেন এবং নির্জনে বসিয়া কাঠ ও মাটি লইয়া যন্ত্রপাতি নির্মাণের চেষ্টা করিতেন। একদা এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ফুটন্ত পানিপূর্ণ এক কেট্লির নলের মুখ দিয়া বাষ্প বাহির হইতেছে দেখিয়া সেদিকে ওয়াটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি নলের মুখ বন্ধ করিয়া বাষ্পের শক্তির পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তদবধি এই বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য ওয়াট বদ্ধপরিকর হইলেন। ওয়াটের অক্লান্ত চেষ্টায় অবশেষে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত বাষ্পীয়-যন্ত্র নির্মিত হইল। ওয়াটের-নির্মিত বাষ্পীয়-যন্ত্র একস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপিত থাকিত এবং খনি হইতে কয়লা

www.pathagar.com

উত্তোলন, পানি-নিষ্কাশন ও কারখানার কল পরিচালনে ব্যবহৃত হইত। স্টিফেন্সন ইহার উন্নতি সাধন করিয়া রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।

নিউটন—তাঁহার পূর্ণ নাম স্যার আইজাক বা ইসাক নিউটন। (Sir Isaac Newton)। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব তাহারি আবিষ্কার। বেগ ও গতি বিজ্ঞান এবং দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁহার অত্যন্ত মূল্যবান মৌলিক আবিষ্কার রহিয়াছে। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর ইংলন্ডের লিংকনশায়ারের অন্তর্গত উল্‌সথ্রপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ লন্ডন শহরের কেনসিংটন নামক স্থানে পরলোকগমন করেন।

ডাক্তার বেন্ট্‌লে (ডক্টর বেন্টগে) তাঁহার পূর্ণ নাম রিচার্স বেন্ট্‌গে। তিনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডের ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত আউলটনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তিগণের (Classical Scholars) অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। ইহা ছাড়া তিনি একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ভল্‌টেয়ার—তাঁহার পূর্ণ নাম "জসিওয়া মারে-আরওয়া-দু-ভলতেন" (Francois Maric Arouct de Voltaire)। তাঁহার আসল নাম "আরওয়া" (Arouct)। ভল্‌টেয়ার (Voltaire) ছদ্ম সাহিত্যিক নাম। তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতবাদ অত্যন্ত উদার ও বিপ্লবমূলক ছিল। তাঁহার স্বাধীন ও বিপ্লবমূলক মতবাদের জন্য ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাকে প্যারিস হইতে তিনবার নির্বাসিত এবং দুইবার ফ্রান্সের ভয়াবহ কারাগার ব্যাসটাইলে গমন করিতে হয়। তাঁহার এবং ফ্রান্সের অন্যতম জগদ্বিখ্যাত বিপ্লববাদ সাহিত্যিক বৃশোর অগ্নিময় লেখার ফলেই ফরাসী-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সকলের অভিমত। শুধু সাহিত্য নহে—ইতিহাস রচনায় নূতন ধারার প্রবর্তক হিসাবেও তিনি বিখ্যাত। দার্শনিক উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাস, ব্যঙ্গ রচনা, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ৩০শে মে তিনি প্যারিস নগরেই পরলোকগমন করেন।

ডালটন—তাঁহার পূর্ণনাম জন্ ডালটন বা জন্ ডাল্‌টুন। ইংলন্ডের কাম্বারল্যান্ডের ইগলফিল্ড নামক স্থানে এক দরিদ্র তাঁতীর গৃহে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানতঃ নিজের চেষ্টায় বাড়ীতে পড়াশুনা করিয়া জ্ঞান অর্জন করেন। ইংলন্ডের তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আণবিক-তত্ত্বের সম্প্রসারণে তাহার উদ্ভাবিত "ডালটন ল" (Dalton's Law) নামক বৈজ্ঞানিক নিয়ম অত্যন্ত মূল্যবান। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডের ম্যানচেষ্টার নামক স্থানে তিনি পরলোকগমন করেন।

স্যার রবার্ট পিল—ইংলন্ডের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "টরী" বা গোঁড়া রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দুইবার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ এবং একবার প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লন্ডন শহরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইয়ং—পূর্ণনাম টমাস ইয়ং। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পদার্থবিদ্যা গণিত এবং প্রাকৃতিক দর্শনে (Natural Philosophy) তিনি বিশেষ বুৎপত্তিশীল ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

কার্লাইং—পূর্ণনাম : টমাস কার্লাইল। তিনি একজন বিখ্যাত বৃটিশ সাহিত্যিক। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষকতা অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনায়ই সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। একজন উদার ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবাদী লেখক হিসাবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মহাপুরুষদের আবির্ভাবই মানব-জাতির কল্যাণের মূল-উৎস। এই সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা "মহাপুরুষ ও মহাপুরুষ-পূজা" (Herocs and Hero-Worship) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতায় কার্লাইল ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদকে (দ:) অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। শুধু সাহিত্যিক নহে—একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং জীবন-চরিত লেখকরূপেও তাহার প্রভূত খ্যাতি। জীবনের প্রায় ২০ বৎসর তিনি জীবন-চরিত ও ইতিহাস রচনায় ব্যয় করেন। তাঁহার বিখ্যাত "ফারসী বিপ্লবের ইতিহাস" রচনা করিয়া তিনি বিপুল সুনাম অর্জন করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি লন্ডনের চেলসি (chelsea)) অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহার উদার ধর্মপ্রাণতা ও আদর্শবাদীতার জন্য তাঁহাকে "চেল্সীর ঋষি বা জ্ঞানী-পুরুষ (Sage of Chelsea) বলিয়া অভিহিত করা হইত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লন্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফরাসী বিপ্লব—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী দেশে প্রধানতঃ রাজ-তন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে গণ-উত্থান বা গণ-বিপ্লব সাধিত হয়, তাহাই ফরাসী-বিপ্লব (French Revolution) নামে অভিহিত। এই বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কাহারো মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর নব-জাগরণ, কাহারো মতে সামন্ততান্ত্রীক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত গণ-শ্রেণীর বিদ্রোহ ; আর কাহারো বা মতে কালে অনুপযোগী অতীত যুগীয় ও সীমাবদ্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম-প্রণালীর বিরুদ্ধে নব-উত্থিধণতান্ত্রীক বোর্জোয়া বা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-অধিকার স্থাপনের চেষ্টাই এই বিপ্লবের মূল কারণ। তবে একথা আজ স্বীকৃত যে, রাজকোষের শূন্যতাই এই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দীর্ঘকালীন যুদ্ধ, অন্যায় ও অকার্যকরী রাজস্ব-নীতি, বিপুল অপব্যয় এবং সর্বশেষে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য দান প্রভৃতি কারণে বিরাট ঋণের বোঝা সরকারের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল এবং এই নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে দেশকে উদ্ধার করা কাহারো দ্বারা সম্ভব হইল না। এই সময় ফরাসী, দেশের অধিপতি ছিলেন ষোড়শ লুই। তিনি ছিলেন অনেকটা অক্ষম ও দুর্বল-চিত্ত লোক। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি "ষ্টেট্স্-জেনারেল" (States-General) নামক প্রতিনিধিত্বমূলক সভাকে আহ্বান করিলেন রাজাকে রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে উপদেশ দিবার জন্য যদিও নামে এই সভার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসা হইতেছিল, তথাপি বিগত ১৭৫ বৎসর যাবত এই সভার অধিবেশন কখনো আহ্বান করা হয় নাই। এই সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১,২০০ জন। তন্মধ্যে ৩০০ জন যাজক-শ্রেণীর, ৩০০ জন অভিজাত-শ্রেণীর এবং ৬০০ জন জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন। জনসাধারণের ৬০০ জন প্রতিনিধির দুই-তৃতীয়াংশ আইন-জীবীদের মধ্য হইতে লইতে হইত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে ভার্সেলিজে এই সভার অধিবেশন বসিলে ভোটদানের পদ্ধতি লইয়া যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতবিরোধ ঘটে। ফলে ঐ বৎসর ১৮ই জুন জন-প্রতিনিধিগণ এক ভিন্ন সভায় মিলিত হন এবং রাজ-আদেশ অমান্য করিয়া নিজেদের সভাকে গণ-পরিষদ বা জাতীয়-পরিষদ (Constituent Assembly or National

www.pathagar.com

Assembly) বলিয়া ঘোষণা করেন। নিম্নপদস্থ-যাজকগণের বহু প্রতিনিধি এবং কিছু সংখ্যক অভিজাত প্রতিনিধি এই দলের সঙ্গে আসিয়া যোগদান করেন। এই গণ-পরিষদের সদস্যগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, ফ্রান্সের জন্য একটি লিখিত শাসন-তন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইবেন না। তখন রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইলেন কিন্তু তৎকর্তৃক অর্থ-দপ্তরের মন্ত্রী নেকার-কে পদচ্যুত করায় এক উত্তেজিত জনতা ১৪ই জুলাই কুখ্যাত কারা-দূর্গ ব্যাস্‌টাইলে (Bastille) হানা দিয়া কারা-অধ্যক্ষ ও প্রহরিগণকে নিহত করে। ভীত হইয়া ষোড়শ লুই তখন নেকারের হস্তে গভর্ণমেন্ট গঠনের ভার অর্পণ করেন। ফলে প্যারিসের নগর-শাসন-প্রতিষ্ঠান (City Government) হিসাবে মহল্লা-পঞ্চায়েতসমূহ (Paris Communc) গঠিত হইল এবং জাতীয় রক্ষীদলও (National Guard) সংগঠন করা হইল। ঐ বৎসরেই ৪ঠা আগস্ট গণ-পরিষদ সমস্ত প্রকার সামন্ত-তান্ত্রীক সুযোগ-সুবিধা বাতিল করিয়া দিল। ইতিমধ্যেএকপ্রতি-বিপ্লবের (Counterrevolution) গুজব উঠায় ঐ বৎসরেই ৫ই অক্টোবর এক বিরাট জনতা ভার্সেলিজে বা ভাসেলাই-এ গমন করিয়া তথা হইতে রাজপরিবার ও পরিষদ বলপূর্বক প্যারিসে সরাইয়া আনিল। অতঃপর গণ-পরিষদ কর্তৃক এক শাসন-তন্ত্র রচিত হইল এবং "মানব জাতির অধিকার ঘোষণা" (Declaration of the Rights of Men) নামক বিশ্ব-বিখ্যাত রাজনৈতিক সনদ এই শাসন-তন্ত্রের মুখবন্ধ (Prcamble) হিসাবে গৃহীত হইল। যে-সকল অভিজাত ও পরিষদবর্গ, এই সকল গোলমালে ইতিপূর্বেই দেশ হইতে পলায়ন করিয়া ছিলেন রাজাও তাহাদের সঙ্গে যোগদান মানসে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২০শে/২১শে জুন গোপনে দেশত্যাগের চেষ্টা করিলে পথে ধৃত হইয়া প্যারিসে আনীত হন এবং নতুন শাসন-তন্ত্র স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের (Liberty, Equality and Fraternity) বাণী তখন সকলের মূল-মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে পলাতক অভিজাতগণের প্রচেষ্টায় প্রুসিয়ার রাজা ও সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৭৯১ সালের ২৭শে আগস্ট "পিলনিজ ঘোষণাবণী" (Declaration of Pilnitz) নামক এক ঘোষণাবাণীতে প্রচার করিলেন যে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাঁহাদের স্বার্থ রহিয়াছে। অষ্ট্রিয়াও যুদ্ধমুখী হইয়া উঠিল। ফলে ১৭৯২ সালের ২০শে এপ্রিল ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল এবং তখন হইতেই ফ্রান্সের বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে প্রাথমিক পরাজয়ের ফলে গুজব উঠিল যে এই পরাজয়ের পশ্চাতে রাজা ও রাণীর গোপন হাত রহিয়াছে। তখন রাজাকে বন্দী ও পরিষদ বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং রাজ-তন্ত্রের পক্ষপাতী অসংখ্য লোককে নিহত করা হইল। ইহার পর অবিলম্বে জাতীয় সম্মেলন National Convenstion) নামে এক নির্বাচিত প্রতিনিধি-সভা গঠন করা হইল এবং ঐ বৎসর ২১শে সেপ্টেম্বর রাজ-তন্ত্র বাতিল করিয়া ফরাসী দেশের "প্রথম রিপাবলিক" (First Republic) বা গণ-তন্ত্রীক শাসন ঘোষণা করা হইল। অতঃপর দেশদ্রোহিতার অভিযোগে রাজার বিচার করিয়া ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারী রাজা ষোড়শ লুই-এর শিরচ্ছেদ করা হইল। রাজার হত্যার ফলে রাজ-তন্ত্রীদের বিদ্রোহ ঘোষণা এবং তাহাদের উপর বিপ্লবীদের অমানুষিক অত্যাচার মিলিয়া দেশে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিল। ঐ বৎসরই ২০শে অক্টোরব রাণীরও শিরচ্ছেদ করা হইল। সন্ত্রাসের রাজত্ব এতদূর চরমে উঠিল যে, এক বৎসরের মধ্যেই শুধু তথাকথিত বিচারের নামেই ১৭,০০০ লোককে হত্যা করা হইল। আর বিনা-বিচারে যে কত লোক নিহত হইল তাহার ইয়ত্তাই নাই। এ প্রচণ্ড বিপ্লবী ঝড়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের রোবেস্‌পেয়ার, ডেন্টন, হিবার্ট প্রমুখ বহু নেতার উত্থান-পতন ও মৃত্যু-দণ্ড ঘটিল। ইহার পর ১৭৯৫ সালের নূতন শাসন-তন্ত্র অনুসারে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট এক ডাইরেক্টরীর (Directory) হস্তে সমস্ত শাসন-

www.pathagar.com

ক্ষমতা অর্পিত হইল। ইহাদের শাসনাধীনে দেশের সর্বত্র দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র ও আর্থিক দেউলিয়ত্ব প্রকট হইয়া দেখা দিল। ফলে বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ১৭৯৯ সালের ১৯শে নভেম্বর এক সামরিক উত্থানের (Coupdetat) সাহায্যে সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইলেন এবং কার্যত এখানেই ফরাসী বিপ্লবের অবসান ঘটিল। নেপোলিয়ান প্রকৃতপক্ষে ফরাসী বিপ্লবেরই মানস-সন্তান। এই ফরাসী বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ে সারা ইউরোপ এবং এসিয়া-আফ্রিকাব্যাপী নেপোলিয়ানের বিভিন্ন সমর-অভিযানই ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক মতবাদ (Liberalism), জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিক সামগ্রীক যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

কমতি দি বাফুন—তাঁহার পূর্ণ নাম—"জর্জ লিউই লুক্লার্ক কো দু বাফু" (George Lois Lectere Comic de Buffon) তিনি ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্ (Naturalist) তিনি তাঁহার সারাজীবন ব্যয় করিয়া এই সম্পর্কে ৪৪ খণ্ডে এই বিরাট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

স্যার ওয়াল্টার স্কট--বৃটিশ ঔপন্যাসিক ও কবি। তিনি স্কটল্যান্ডের পল্লী-গীতি সংগ্রহ করিয়া পাঁচখণ্ডে প্রকাশ করেন এবং "মার্মিয়ন" (Marmion), "লেডী অব্ দি লেক" (Lady of the Lake) ও অন্যান্য কাব্য রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অতঃপর তিনি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ওয়েভারলী (Waverly) সিরিজের উপন্যাসাবলী, আই ভেন হো Ivanhoe, টেলিসম্যান Talisman, কেনিল্ ওয়ার্থ Kenilworth, প্রমুখ বহু উপন্যাস রচনা করিয়া ইংরাজী সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

জন ব্রিটন--বিখ্যাত ইংরাজ পুরা-তত্ত্ববিদ্। পুরা-কীর্তি ও প্রাকৃতিক-দৃশ্য বর্ণনামূলক পুস্তকাদির তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এবং প্রাচীন-কীর্তি সংরক্ষণ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

এডিনবার্গ শহর—স্কটলেন্ডের প্রসিদ্ধ শহর। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে এখানে স্কটলেন্ডের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলেন্ড ও ইংলন্ড একত্রিত হইয়া যাওয়ার পর রাজধানী লন্ডনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এখানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কটলেন্ডের সর্বোচ্চ আদালত অবস্থিত।

প্রশ্নাবলী

১। অধ্যবসায়ই যে জীবনে সাফল্য অর্জনের পথ—"অধ্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখিত কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বাফুন কে? তাঁহার ধৈর্য ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসারে আলোচনা কর।

৩। স্যামুয়েলের জীবনের কোন্ অবস্থা হইতে কি করিয়া পরিবর্তন সাধিত হইয়া সে-জীবন জ্ঞান ও বিদ্যায় সফল ও সার্থক হইয়া উঠিল, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর : —

(ক) প্রতিভাবলে অনেক মানুষ অসাধারণ কাজ করে ; কিন্তু বহু বছরের সহিষ্ণু সাধনার কাছে প্রতিভার কোন মূল্য নাই।

www.pathagar.com

মুক্তির গান

এই লেখাটি এস, ওয়াজেদ আলী সাহেব-রচিত "মাশুকের দরবার" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। ইহা একটি কথিকা। রূপকের ছলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং গৌরবকে এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এস, ওয়াজেদ আলী বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তিনি প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা রচনা করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধকার হিসাবেই তাঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি। তাঁহার রচনা গভীর তত্ত্বে ও তথ্যে সমৃদ্ধ ; ভাষা সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও পরিমার্জিত।

আলোচ্য রচনায় তিনি রূপকের আবরণে মুক্তির বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন। পরাধীন বন্দী জীবন যত ঐশ্বর্য সম্পদের ভিতরই লালিত হউক না কেন, মুক্ত স্বাধীন জীবন শত অভাব-অনটন-জর্জরিত অবস্থার ভিতরও তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয় ও প্রেয়—ইহাই রচনায় মূল প্রতিপাদ্য।

প্রশ্নাবলী

১। "মুক্তির গান" শীর্ষক রূপক গল্পটি তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর :—

(ক) উদাসমনে এক একবার সে গুলাব-সুন্দরীদের দিকে চাইত। .....কুণ্ঠার সবুজ অবগুণ্ঠন দূরে ফেলে দিয়ে প্রেম-বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তারা চেয়ে আছে।

(খ) শত বৎসরের পিঞ্জরাবদ্ধ নিরানন্দ জীবনের চেয়ে মুহূর্তের মুক্ত আনন্দ-মুখর জীবন সহস্র গুণে ভাল।

(গ) যারা বিরহ জানেনি, সুখের মূল্য তারা বোঝেনা।

আলেপ্পোর পথে

এই প্রবন্ধটি ইব্রাহীম খাঁ সাহেব-রচিত "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র" নামক ভ্রমণ-কাহিনীমূলক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইব্রাহীম খাঁ সাহেব বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক। তিনি প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত। তিনি প্রায় সারা জীবন অধ্যাপনা কার্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর তাঁহার রচনাবলীতে দেদীপ্যমান। তাঁহার ভাষা সাবলীল, বেগবান ও প্রাণস্পর্শী।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পশ্চিম এশিয়াস্থিত ইসলাম এবং সুপ্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির লীলাভূমি আলেপ্পো, বৈরুত প্রভৃতি স্থানের ও পার্শ্ববর্তী ভূমধ্যসাগরের ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মনোরম বর্ণনা দান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা এমন বাস্তবমূলক যে পড়িতে পড়িতে ঘটনা ও দৃশ্যাবলী যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

টীকা

শেখ সা'দী—এই পুস্তকের "শেখ সা'দী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আলেফ লায়লা—বিখ্যাত আরবী গল্প-গ্রন্থ। আমাদের দেশে ইহা আরব্যোপন্যাস বা Arabian Nights নামে সকলের নিকট পরিচিত। পুস্তকটির প্রকৃত আরবী নাম "আল্‌ফা লাইলাতও ওয়া লায়লাহ্" অর্থাৎ এক সহস্র ও এক রজনী।

কামাখ্যা কামরূপ—আসামের কামরূপ জেলায় কামাখ্যাদেবীর মন্দির অবস্থিত। গৌহাটি শহরের অদূরে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর স্থাপিত এই কামাখ্যা-মন্দির হিন্দুদের অন্যতম পীঠস্থান এবং সুপ্রাচীন তীর্থস্থান। সতীদেবীর এক অঙ্গ এখানে পতিত হয় বলিয়া কথিত। জনশ্রুতি যে, কামরূপ—বিশেষ করিয়া কামাখ্যায় তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞানী বহু-সাধু-সন্ন্যাসী থাকেন এবং তাঁহাদের সংশ্রবে আসিলে কেহই সে-স্থান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে চাহেনা। এখানে এই জনশ্রুতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কার্থেজ—উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে তিউনিস উপসাগরের তীরবর্তী প্রাচীন রাজ্য ও তাহার রাজধানীর নাম। ঐ সময় ঐ দেশকে পিউনিক সাম্রাজ্যও (Punic Empire) বলা হইত। এইখানেই রোম-আক্রমণকারী বিশ্ব-বিখ্যাত বীর হানিবল্ জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টপূর্ব ১৪৬ সালে রোমানদের আক্রমণে এই কার্থেজ ধ্বংস হয়।

মারাথন--অন্য বানান : ম্যারাথন। গ্রীস দেশের একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র। খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে প্রাচীন ইরানের সম্রাট দারায়ুস (Darius) গ্রীস আক্রমণ করিলে মারাথনের যুদ্ধে গ্রীকেরা তাহাদিগকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের বিজয়-সংবাদ লইয়া একটি লোক এক দৌড়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে আসিয়া পৌঁছে এবং সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দেহে ভূপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। বর্তমান জগতে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ দৌড়ের "ম্যারাথন-রেস" নাম ইহা হইতেই উদ্ভূত।

থার্মপলী—গ্রীসের উত্তর-পূর্ব কোণে মাউন্ট ইটা বা পর্বত ও ইজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ গিরি-পথের নামই থার্মপলী বা থার্মপাইলী। দক্ষিণ গ্রীসের একটি রাষ্ট্রের নাম ছিল স্পার্টা। খৃষ্টপূর্ব ৪৮০ সালে সেই স্পার্টার ৩০০ জন বীর-পুরুষ লিওনিডাসের নেতৃত্বে এই গিরি-বর্তে গ্রীস আক্রমণকারী ইরান-সম্রাট জারাস্কেস্‌কে (Xerxes) বাধাদান করেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত জারাস্কেসের ২১ লক্ষ সৈন্যকে আটকাইয়া রাখেন। পরিশেষে একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক জারাস্কিস্‌কে পর্বতের উপর দিয়া একটি গোপন-পথ দেখাইয়া দিলে জারাস্কিস্ ঐ পথে এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া ঐ তিনশত জন বীরকে গিরি-পথের সম্মুখ ও পশ্চাৎ—উভয় দিক হইতে এক সঙ্গে আক্রমণ করেন। কিন্তু ঐ তিনশত বীরের একজনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে ঐ যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই চির শয়ন লাভ করেন।

গিরিস—গ্রীস দেশকেই এখানে কবিতায় গিরিশ লেখা হইয়াছে। কবিতায় এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত।

মুআবিয়া-ইব্‌নে-আবুসুফিয়ান--ইনি ইসলামের প্রথম রাজ-তান্ত্রীক খলীফা এবং উমাইয়া বংশীয় প্রথম খলীফা। তাহার পূর্ববর্তী "খুলাফায়ে রাশেদিন" অর্থাৎ "সদুপদেষ্টা ও সদাচারী খলীফা চতুষ্টয়" নামে অভিহিত হযরত আবুবকর (রা:), হযরত উমর (রা:), হযরত উসমান (রা:) এবং হযরত আলী (রা:) সকলেই গণতান্ত্রীক খলীফা ছিলেন। মুআবিয়াই ইসলামে বংশগত রাজ-তন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতা আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশগণের প্রধান দলপতি এবং ইসলাম ও হযরত মুহম্মদের (দ:) প্রধানতম ও ভীষণতম শত্রু ছিলেন। তিনি ইসলাম ও হযরত মুহম্মদের (দ:) বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহার স্ত্রী হিন্দা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত জিঘাংসাপরায়ণা

www.pathagar.com

ছিলেন যে, বিখ্যাত ওহুদের যুদ্ধে হযরত মুহম্মদের (দ:) চাচা এবং প্রসিদ্ধ বীর হযরত হাম্‌যা (রা:) নিহত হইলে এই হিন্দা তাঁহার কাঁচা কলিজা চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। যাহা হউক, মুসলমানগণ কর্তৃক মক্কাবিজয়ের পর এই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাঁহাদের আত্মীয় পরিজন এবং মক্কার কুরাইশ বংশীয় অবশিষ্ট সমস্ত লোকসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। মুআবিয়া এই আবুসুফিয়ান ও হিন্দারই পুত্র। ইসলামের তৃতীয় গণ-তান্ত্রীক খলীফা হযরত উসমান (রা:) কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের লোক ছিলেন। মুআবিয়াও এই গোত্রেরই লোক। হযরত উসমানের (রা:) শাসনকালে মুআবিয়া সিরিয়ার গভর্ণর-পদে নিযুক্ত হন। হযরত উসমান (রা:) গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হওয়ার পর হযরত আলী (রা:) ইসলামের চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হইলে মুআবিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং হযরত আলীর (রা:)সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অবশেষে নানাকারণে তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর হযরত আলীও (রা:) গুপ্তঘাতকের হস্তে শহীদ হইলে মুআবিয়া ছলে-বলে-কৌশলে খলীফাপদ অধিকার করিয়া লন এবং বংশগত রাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হিজরী ৪০ সাল হইতে ৬০ সাল পর্যন্ত (খৃ: ৬৬১-৬৮০) রাজত্ব করেন। তাঁহার গোত্রের নামানুসারে এই রাজ-বংশের নাম হয় "উমাইয়া বংশ"। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর সংঘটক নর-পিশাচ ইয়াযিদ এই মুআবিয়ারই পুত্র এবং উমাইয়া বংশীয় দ্বিতীয় খলীফা।

সাইপ্রাস—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। তুরস্কের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল হইতে মাত্র ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে বৃটিশের অধীন।

রোডস্—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। বর্তমানে গ্রীসের অধীন।

খলীফা ওয়ালীদ—উমাইয়া বংশীয় চতুর্থ খলীফা। খৃষ্টীয় ৭০৫ সাল হইতে ৭১৫ সাল পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল। তাঁহার শাসনকালেই ভূমধ্যসাগরের ক্রীট, সিসিলী, মেজর্‌কা ও মিনর্‌কা দ্বীপে আরব-প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তাঁহার আমলেই ৭১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উত্তর আফ্রিকাস্থিত গভর্ণর ও সেনাপতি মুসা-ইব্‌ন-নুসায়ের এবং অপর সেনাপতি তারিক স্পেন জয় করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন, পূর্বে সিন্ধুদেশ এবং উত্তর-পূর্বে মধ্য এসিয়ার তুর্কীস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পিতা আবদুল মালিকের রাজত্ব-কালকে উমাইয়া বংশীয় খলীফাগণের সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে।

ক্রীট—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। গ্রীসের মূল ভূমিখণ্ড হইতে মাত্র ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা গ্রীসের একটি অংশ।

সিসিলী—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। ইটালীর দক্ষিণে মূল ভূখণ্ডের অনতিদূরে অবস্থিত। পূর্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। বর্তমানে ইটালীর অংশ।

মেজর্‌কা ও মিনর্‌কা—ভূমধ্যসাগরের বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দুইটি দ্বীপ। বর্তমানে স্পেনের অধীন।

ইস্তাম্বুল—অপর নাম কনষ্টান্টি-নোপল। মর্মরাসাগরের পশ্চিম তীরে ইউরোপীয় তুরস্কে অবস্থিত। ইহা তুরস্কের সুলতানগণের এবং তাহার পূর্বে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান সম্রাটদের রাজধানী ছিল। রোমক সম্রাট কন্‌ষ্টান্টাইন-দি-গ্রেট রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম হইতে সরাইয়া এখানে আনয়ন করেন এবং তাহার নামানুসারেই ইহার কনষ্টান্টিনোপল্ নাম হয়। ইহার পূর্বে এই নগরের নাম ছিল বাইজানন্টিয়াম। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর অধিকার করেন এবং এশিয়ামাইনরের আঙ্কারাস্থিত তাঁহাদের পূর্ব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কন্‌ষ্টান্টিনোপলেই রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগর এই উসমানিয়া বংশের (Ottaman Dynasty) শেষ সম্রাট সুলতান

www.pathagar.com

আবদুল মজিদের রাজত্বকাল পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্ক সুলতান আবদুল মজিদকে পদচ্যুত করিয়া তুরস্ককে গণ-তন্ত্রে পরিণত করার পর তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল হইতে সরাইয়া পুনরায় আঙ্কারায় আনা হইয়াছে।

টাইবার—ইটালীর একটি নদী। রোম নগরী এই নদীর তীরেই অবস্থিত।

সম্রাট দ্বিতীয় লুই—৮২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। তিনি "হলি রোমান এম্পায়ার" (Holy Roman Empire) বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তিনি সম্রাট প্রথম লোথাইরের (Emperor Lothair, I) পুত্র। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট ইটালীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাইজেন্টাইন সম্রাট—প্রাচীন বাইজেন্টিয়ান নগর বা কন্‌ষ্টান্টিনোপল—যে-সকল প্রাচ্য রোমক সম্রাটদের রাজধানী ছিল, তাঁহাদিগকেই বাইজেন্টাইন সম্রাট বলা হয়। [এই প্রবন্ধের "ইস্তাম্বুল" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।]

তারিফ—উমাইয়া বংশীয় চতুর্থ খলীফা—খলীফা ওয়ালীদের শাসনকালে তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর ও প্রধান সেনাপতি মুসা-ইব্‌ন্‌-মুসাইরের সহকারী সেনাপতি ছিলেন তারিক। ৭১১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রধান সেনাপতি মুসার নির্দেশে মাত্র ১২ হাজার সৈন্য লইয়া বর্তমান জিব্রাল্টার প্রবাসী অতিক্রম করেন এবং তদানীন্তন স্পেনের অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্র রাজা রডারিকের লক্ষাধিক সৈন্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্পেনের রাজধানী অধিকার করেন। তারিক এত অসমসাহসী বীর ছিলেন যে, জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া স্পেনের মূল ভূখণ্ডে অবতরণের পর তাঁহার সৈন্যগণ যাহাতে পশ্চাদাপসরণের কথা চিন্তা না করিতে পারে এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়ে, সেজন্য যে-সকল যুদ্ধ-জাহাজ-যোগে তিনি সসৈন্যে জিব্রাল্টার অতিক্রম করিয়াছিলেন সে সকল জাহাজের সমস্তগুলিই পোড়াইয়া ফেলেন। এই তারিকের নামানুসারেই জিব্রাল্টারের নামকরণ করা হয়। "জিব্রাল্টার" আরবী "জবল্‌-উত্‌-তারিক" অর্থাৎ "তারিকের পর্বত"—এই বাক্যাংশেরই ইংরাজী অপভ্রংশ।

জিব্রাল্টার—এই প্রবন্ধের "তারিক" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগকারী প্রণালী এবং তাহার তীরবর্তী পর্বত।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টী—বোনাপার্টী শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ : বোনাপার্ট। নেপোলিয়ান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি এবং ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন। ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপের এজাচিও শহরে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্সিকা দ্বীপ ফ্রান্স বা ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাসী সেনা বাহিনীর অফিসার পদের জন্য সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লবের সময় মাত্র ২০ বৎসর বয়সে অপূর্ব সামরিক দক্ষতা দেখাইয়া ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন এবং মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী সেনা-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মিসর ও সিরিয়া জয় করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। অতঃপর কয়েকটি বিখ্যাত ও বিরাট যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, ইংলন্ড ও প্রুসিয়ার মিলিত শক্তিকে বারংবার পরাজিত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে সারা ইউরোপের ডিক্টেটর হইয়া দাঁড়ান। অতঃপর রুশিয়ার রাজধানী মস্কো পর্যন্ত অভিযান করিয়া রুশিয়ার নিদারুণ শীতে ও রুশগণের পোড়া-মাটি-নীতির ফলে অনাহারে তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রায় ধ্বংশ হইয়া যায় এবং এই সময় হইতে তাঁহার

ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিতে থাকে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ড, রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মিলিত শক্তির নিকট জার্মানীর লীপজীগ বা লাইপজীগের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং সম্মিলিত শক্তিবর্গ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস অধিকার করেন। তাহারা নেপোলিয়ানকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করিয়া ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত টিরেনিয়ান উপসাগরস্থ এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর কাল নির্বাসন জীবন যাপনের পর নেপোলিয়ান গোপনে এল্‌বা দ্বীপ হইতে ফরাসী দেশে ফিরিয়া আসেন এবং রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইহার মাত্র ১০০ দিন পরেই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বেল্‌জিয়ামের অন্তর্গত ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তিনি ইংলন্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েলিংটনের পরিচালনাধীনে ইংলন্ড ও প্রুসিয়ার সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। অতঃপর তাঁহাকে আট্‌লান্টিক মহাসাগরস্থ সেন্টহেলেনা দ্বীপে কঠোর পাহারাধীনে নির্বাসিত করা হয়। সেখানেই তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান তাঁহার মৃতদেহ সেন্টহেলেনাস্থ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া প্যারিসে লইয়া আসেন এবং তথাকার বিখ্যাত "প্রেস্ দে-লা-ইন্‌ভেলিদ্" নামক মর্মর সৌধের অভ্যন্তরে সমাহিত করেন।

মুহম্মদ আলী পাশা—১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের মেসেডোনিয়া প্রদেশের অন্তর্গত কাভালা নামক স্থানে মুহম্মদ আলী পাশা জন্মগ্রহণ করেন। একদল বল্কান স্বেচ্ছাসেবকের নেতা হিসাবে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে মিশরের আবুকির নামক স্থানের যুদ্ধে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তৈমুরলং কর্তৃক তদানীন্তন মিসরের ফাতেমীয় খলীফাগণের নিকট বিক্রিত দাসগণের বংশোদ্ভব "মামলুক" নামক যে-বিক্রান্ত অশ্বারোহী সেনাদল কখনো প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নেতাদিগকে মিসরের সিংহাসনে বসাইয়া—কখনো বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬০০ বৎসর যাবত মিশরের শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, মুহম্মদ আলী পাশা তাহাদের নেতাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদিগকে চিরতরে দমন করেন এবং স্বীয় পুত্র ইব্‌রাহীম পাশার সাহায্যে আরবের ওহাবীদিগকেও দমন করেন। এই সময় মিসর, আরব, সিরিয়া, গ্রীস, মেসেডোনিয়া—এমনকি সমগ্র বল্কান উপদ্বীপ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ তখন তুরস্কের সুলতান। অতঃপর মুহম্মদ আলী নিউবিয়া ও কার্দোফান দখল করিয়া মিসর রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সুদানের খার্তুম নগর নির্মাণ আরম্ভ করেন। এই সময় যদিও তিনি নামে মাত্র তুরস্ক সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিতেন—প্রকৃতপক্ষে তখন তিনি ছিলেন স্বাধীন। যাহা হউক, গ্রীকেরা তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তিনি তুরস্ক-সুলতানের পক্ষাবলম্বী হইয়া এক বৃহৎ নৌ-বাহিনীসহ গ্রীস আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে সফলকাম হন। কিন্তু পরে বৃটিশ, ফ্রান্স ও রুশিয়ার মিলিত নৌ-বাহিনীর নিকট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নাভারিনোর যুদ্ধে তাঁহার নৌ-বাহিনী পরাজিত হয়। ইহার ফলে তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে গভর্ণর পদে রাখিতে অস্বীকার করিলে তাঁহার পুত্র ইব্‌রাহীম পাশার পরিচালনাধীনে তাঁহার সেনাদল ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া অধিকার করিয়া লয় এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করে। অতঃপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় মিসরের স্থায়ী বংশগত গভর্ণর পদের বিনিময়ে তিনি সিরিয়া ছাড়িয়া দিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মিসরের রাজধানী কায়রো নগরে তিনি পরলোকগত হন। কিছুকালপূর্বে পদচ্যুত ও দেশ হইতে নির্বাসিত মিসর-রাজ ফারুক এই মুহম্মদ আলী পাশারই বংশধর।

ইব্‌নে খুল্‌দুন—ইব্‌নে খল্‌দুন বিশ্ব-বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক। ইতিহাস-রচনার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনি আদি উদ্ভাবক ও প্রবর্তক—বিশ্বের সুধীসমাজ কর্তৃক একথা আজ

www.pathagar.com

অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকৃত। শুধু ঐতিহাসিক নহেন, তিনি একজন সর্বজন-মান্য ও মৌলিক সমাজ-তত্ত্ববিদ্, অর্থ-নীতিবিদ্ এবং দার্শনিক। ইব্‌নে খল্‌দুনের পূর্ণ নাম : আবু যাইদ ওয়ালী-উদ-দীন ইব্‌নে-খল্‌দুন। তিনি হিজরী ৭৩২ সালের ১লা রমযান (২৭শে মে, ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ) উত্তর আফ্রিকার তিউনিস্ নগরে এক প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আন্দালুসিয়া বা মুসলিম স্পেনের অধিবাসী ছিলেন এবং নানা রাজনৈতিক ঘটনা বিপর্যয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর আফ্রিকার তিউনিসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানেই ইব্‌নে খল্‌দুনের জন্ম হয়। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি তিউনিসিয়ার উচ্চ রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘূর্ণি-সংকুল যুগে উত্তর আফ্রিকা ও মুসলিম স্পেনের বিভিন্ন অধিপতির অধীনে কখনো বা সুউচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন—এবং কখনো বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া বা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কিঞ্চিতাধিক দুই যুগ পর্যন্ত এইরূপ বৈচিত্রময় ও ঘটনা-বহুল রাজনৈতিক জীবন যাপনের পর তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ব্যাপক অধ্যয়ন ও ঐতিহাসিক গবেষণা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত "মোকাদ্দামা" (Prolegomena) বা ইতিহাস-রচনার উপক্রমণিকা) এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাস "কিতাবুল ইবার" রচিত হয়। এই মোকাদ্দামা (Prolegomena)-তেই ইতিহাস-রচনার বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও অর্থ-নীতি সম্পর্কিত তাঁহার মৌলিক ও অমূল্য মতবাদগুলি লিপিবদ্ধ। অতঃপর ৭৮৪ হিজরী বা ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে চিরতরে তিউনিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি মিসরে চলিয়া যান এবং সেখানেই "আত্‌তারীফ্" নামক তাঁহার বিখ্যাত আত্ম-চরিত রচনা করেন। মিসরে তিনি কিছুকাল "কাযী-উল্-কুয্‌যাত্" বা প্রধান বিচারপতির আসনে বরিত হন এবং মিসরের তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপক পদে বরিত থাকিয়া বহু মূল্যবান বক্তৃতা দান করেন। এই সময় বিশ্ব-বিখ্যাত তৈমুর লং তদানীন্তন-তুর্কী-সুলতানকে পরাজিত করিয়া সিরিয়ার দামেস্ক বা দামাস্কাস নগর দখল করিলে ইব্‌নে খল্‌দুন সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মধ্য এশিয়ার বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। ৮০৮ হিজরী বা ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে মিসরের রাজধানী কায়রো নগরে তিনি পরলোকগমন করেন।

সিন্দবাদ—এই পুস্তকের "নতুন সফর" শীর্ষক কবিতার "সিন্দবাদ" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

সীজার—প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সীজার নামক দুইজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং দুইজনেই ভিন্ন উপলক্ষে মিসরে অভিযান করেন এবং মিসর অধিকার করেন। প্রথম সীজারের পূর্ণ নাম : কায়াস জুলিয়াস সীজার। তিনি খৃষ্টপূর্ব ১০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জুলিয়াস সীজার রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নেতা ও বিখ্যাত বীর ছিলেন। তিনিই গল্ বা ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানীর কিয়দংশ ও মিসর অধিকার করিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত কতিপয় উচ্চপদস্থ রোমান অভিজাতের ষড়যন্ত্রে তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪৪ সালে নিহত হন। জুলিয়াস সীজার নিহত হওয়ার পর তাঁহার অনুগত বন্ধু এন্টনী, তাঁহার নাতি (ভাগিনেয়ের পুত্র) কায়াস্ অক্টেভিয়াস্ সীজার এবং লেপিডাস নামক অন্য এক ব্যক্তি—এই ত্রয়ী শাসক-মণ্ডলীর (Triumvirate) হস্তে রোমান সাম্রাজ্যের শাসন-ভার অর্পিত হয়। তখন প্রকৃতপক্ষে বিশাল রোমান বা রোমক সাম্রাজ্যকে শাসনের সুবিধার জন্য তিনভাগ করিয়া এক-এক অংশের শাসন-ভার ইহাদের এক-একজনের হস্তে দেওয়া হয়। এন্টনীর হস্তে দেওয়া হয় পূর্ব ভাগ—অর্থাৎ গ্রীস, এসিয়া মাইনর, লেভান্ট ও আশ্রিত রাজ্য মিসর। ইহার শাসন-কেন্দ্র ছিল মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়া নগরী। মধ্য ও পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ রোম বা বর্তমান ইটালী, আইবেরিয়ান উপদ্বীপ বা স্পেন ও পূর্তুগাল, বৃটেন, গল্ বা ফ্রান্স

www.pathagar.com

এবং জার্মানীর রোমান অধিকৃত অংশের শাসন-ভার অর্পিত হয় অক্টেভিয়াস্ সীজারের হস্তে। ইহার রাজধানী হইল রোম নগরী। আর রোমান অধিকৃত মিসর ব্যতীত উত্তর আফ্রিকার ভার অর্পিত হইল লেপিডাসের হস্তে। কিন্তু কিছুদিন পরেই লেপিডাস্ এই ত্রয়ী-শাসক-মণ্ডলী হইতে বিতাড়িত হয় এবং তাঁহার শাসিত অঞ্চলও অক্টেভিয়াস সীজারের শাসনাধীনে চলিয়া আসে। দ্বাদশ বর্ষকাল এই ত্রয়ী ও দ্বয়ী শাসন চলার পর অক্টেভিয়াস সীজার একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন এবং "অগাষ্টাস্" উপাধি গ্রহণ করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাটরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি সম্রাট অগাষ্টাস সীজার নামে পরিচিত হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সুশাসক ছিলেন। রোমক জাতির ইতিহাসে তাঁহার শাসন-কালকে "সুবর্ণ যুগ" বলা হয়। খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় চতুর্দশ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

এন্টনী—তাঁহার পূর্ণ নাম : মাকসি এন্টোনিয়াস্ বা মার্ক এন্টনী। জুলিয়াস সীজার নিহত হওয়ার পর রোমক বা রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য যে ত্রয়ী-শাসক-মণ্ডলী (Triumvirate) গঠিত হয় এন্টনী তাঁহাদের অন্যতম। ["সীজার" টীকা দ্রষ্টব্য।]

এন্টনী রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শাসন-কর্তা থাকাকালীন এই অংশের স্বাধীনতা ঘোষণার আয়োজন করিলে মধ্য ও পশ্চিম অংশের শাসনকর্তা অক্টেভিয়াস সীজার তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনীসহ অভিযান করেন এবং গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে এক্টিয়ামের নৌ-যুদ্ধে খৃষ্টপূর্ব ৩১ সালে এন্টনীকে পরাজিত করেন। ফলে এন্টনী মিসরে পালাইয়া গিয়া সেখানে আত্মহত্যা করেন।

সুলতান আবদুল হামিদ—সুলতান আবদুল হামিদ দুইজন আছেন। উভয়েই তুরস্কের সুলতান। সুলতান প্রথম আবদুল হামিদ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে হামস্ শহরের খালিদের মস্‌জিদ সুলতান আবদুল হামিদ কর্তৃক যে সময়ে মেরামত করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সে-সময়ের সুলতান আবদুল হামিদ, সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারেন না।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের সুলতান ছিলেন। একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দেশের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তিনি তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। বুলগেরিয়া ও অন্যান্য স্থানে যে গণ-উত্থান হয় তাহা নির্মম ও ব্যাপক হত্যা দ্বারা দমন করার ফলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাঁহার প্রতিবাদ করে। ফলে সাময়িকভাবে হইলেও তিনি শাসন-সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য হন। তাঁহার শাসনকালে (১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দ) রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইউরোপ ও এসিয়াস্থিত তুর্কী সাম্রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ হারাইতে হয়। তবে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চক্রান্তে চক্রান্তে বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং বিশাল এক গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে রাজ্য-শাসন করিতেন। তাঁহাদের একজন যথার্থ স্বেচ্ছাচারী অধিপতি বলিলে অন্যায় হয়না। যাহা হউক তুরস্কের বিখ্যাত আনোয়ার পাশা-পরিচালিত "তরুণ-তুর্কী" (Young Turk) নামক এক বিপ্লবী রাজনৈতিক দল কর্তৃক তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

খালিদ—এই পুস্তকের "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "খালিদ" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

আলী আফজল সাহেব—তিনি পাকিস্তান গণ-পরিষদের ডিপুটী সেক্রেটারী। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সালার গ্রামের প্রসিদ্ধ দেওয়ান ফজলে রাব্বি সাহেবের পুত্র। তিনি

www.pathagar.com

একজন ব্যারিষ্টার। কিন্তু আইন-ব্যবসায়ে যোগদান না করিয়া তিনি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। ১৯৫১ সালে তুরস্কের কন্‌ষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল্ নগরে যে আন্ত-পার্লামেন্টারী কন্‌ফারেন্স হয় তাহাতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য যে-পাঁচজন ডেলিগেট নির্বাচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক ও তদানীন্তন পাক গণ-পরিষদের সদস্য জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেব, পাক গণ-পরিষদের ডেপুটী সেক্রেটারী আলী আফজাল সাহেব এবং পাক-গণ-পরিষদের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জনাব তমিজউদ্দীন খাঁ সাহেব। ইহারা এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান উপলক্ষে আরব, মিসর, সিরিয়া ও ইরান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন। যে-পুস্তক হইতে আলোচ্য প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র" নামক পুস্তকটি এই সুদীর্ঘ ভ্রমণেরই পত্রাকারে লিখিত বৃত্তান্ত।

তমিজুদ্দিন খাঁ সাহেব—ফরিদপুর জেলার খান্‌খানানপুর নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি ফরিদপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। কিন্তু জাতি ও ধর্মের সেবার জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তদ্‌উপলক্ষে কারাবরণ করেন। অতঃপর নিয়মতান্ত্রীক রাজনীতিতে যোগদান করিয়া তিনি বিভাগ-পূর্ব বাংলায় কয়েকবারই আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং একবার মন্ত্রীপদে আসীন হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাক গণ-পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আঙ্কারা—বর্তমান তুরস্কের রাজধানী। এসিয়া মাইনরে অবস্থিত। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইস্তাম্বুল বা কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া তথায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে এই আঙ্কারাই তুরস্কের রাজধানী ছিল।

আহ্‌লান সাহ্‌লান—আরবী বাক্যাংশ। প্রকৃত বাক্যাংশ : আহ্‌লান-ওয়া-সাহ্‌লাম। অর্থ : স্বাগতম ; "আহ্‌লান" শব্দের শাব্দিক অর্থ : আমাদের একজন হইয়া (আস) ; "সাহলান"-এর শাব্দিক অর্থ : স্বচ্ছন্দে আস।

প্রশ্নাবলী

১। "আলেপ্পোর পথে" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে প্রাচীন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের সম্বন্ধ নির্ণয় কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) উটের জাহাজে চড়ে এতকাল যারা পাড়ি দিয়েছে কেবল শুষ্ক মরু, সেইজাতি ইসলামের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যে কি করে সাগরের দুস্তর বুকে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করে বসল, এ ইতিহাসের এক নতুন বিস্ময়।

(খ) ম্যাপের সমুদ্রের সীমা আছে, চোখের সমুদ্রের সীমা নাই, কেবল নীল আর নীল ; ধূ-ধূ দূরে গিয়ে আকাশের নীল আর দরিয়ার নীল এক হয়ে গেছে।

৩। টীকা লিখ : —

আহ্‌লান সাহ্‌লান ; কার্থেজ ; আলেফ লায়লা ; মুআবিয়া-ইব্‌নে -আবু সুফিয়ান ; জিব্রাল্টার ; ইস্তাম্বুল ; ইব্‌নে-খল্‌দুন ; সীজার ; এন্টনী।

www.pathagar.com

নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ

এই লেখাটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচিত প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত। মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী বাংলা সাহিত্য-আসরের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁহার রচনাবলী গভীর চিন্তা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির আলোতে সমুজ্জ্বল। তিনি প্রধানতঃ প্রবন্ধকার এবং প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্ষেত্রে সুউচ্চ আসনে তাঁহার প্রতিষ্ঠা। বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভিন্নমুখী চিন্তা ও তুলনামূলক সমালোচনা-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠতম-স্তরে সমাসীন। তাঁহার ভাষা কলিকাতা-অঞ্চলের কথ্য-ভাষার প্রচলিত রীতি অনুসারী এবং অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও শক্তিশালী।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পাক-ভারতের তিনটি বিরাট সাহিত্য-প্রতিভা-নজরুল, ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। জাতীয় মানস-গঠনে ও তাহার আলোকে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারে এই তিনজনের দান কোন্ লক্ষ্যাভিসারী ও কতখানি অনুপ্রসারী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উচ্ছ্বাস-মুক্ত স্থির চিত্ত লইয়া তাহার স্থান ও মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়-বস্তু। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও প্রভাব এই তিন মনীষির উপর কতখানি পতিত হইয়া তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহার মাধ্যমে জাতীয় মানসকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে, এই প্রবন্ধের ইহাও অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

টীকা

নজরুল—এই পুস্তকের "বাংলা সাহিত্যের নব রূপায়ণ" এবং "সম্বর্ধনার উত্তরে" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় এবং এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে "সংক্ষিপ্ত জীবনী" এবং "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম্" শীর্ষক কবিতার "কাব্য-পরিচিতি" দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ—এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে "সংক্ষিপ্ত জীবনী" এবং "বর্ষ শেষ" শীর্ষক কবিতার "কাব্য-পরিচিতি" দ্রষ্টব্য।

ইকবাল—পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু ও ফার্সী কবি। তাঁহার রচিত শ্রেষ্ঠতম কাব্য-গ্রন্থগুলি--"আস্‌রাবে খুদী", "রমুজে বে-খুদী", "যাবেদ-নামা" প্রভৃতি ফার্সী ভাষায় রচিত। তাঁহার উর্দু ভাষায় রচিত কাব্য—"শেকোয়ো", "জওয়াবে শেকোয়া", "বাঙ্গেদারা" প্রমুখ গ্রন্থগুলিও সুউচ্চ সাহিত্য-স্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং বহু বিখ্যাত। তিনি শুধু কবিই নহেন—একজন প্রথিত-যশা দার্শনিক ও রাজনীতি-বিদ্। ইসলামী দর্শন-শাস্ত্রের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগুলিকে এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের কাব্য-রূপায়ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে দার্শনিক ইকবাল, কবি ইকবালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে তদানীন্তন "নিখিল ভারত মুসলিম লীগে"র (All-India Muslim League) এলাহাবাদ-অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ-দান প্রসঙ্গে তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। মুসলিম অধ্যুসিত অঞ্চল লইয়া যেখানে মুসলমানেরা ইসলামী তাহ্‌যীব ও তমদ্দুন অর্থাৎ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন—এমন এক পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রথম অনুভব করেন। কাজেই এই পাকিস্তানকে ইকবালের মানস-সন্তান বলিলে অন্যায় হয় না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইকবাল পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর দর্শন শাস্ত্রে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ড গমন করিয়া তথাকার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। ইংলন্ডে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি জার্মানীর মিউনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফার্সী ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সূফীবাদ সম্পর্কে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তা পূর্ণ এক "থিসিস্" বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি Ph.D বা "ডক্টর-অব-ফিলসফী" উপাধি লাভ করেন। ইহার পর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ড হইতে ব্যরিষ্টারী পাশ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অচিরেই আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়েই তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগুলি এবং জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইকবাল পুনরায় ইংলন্ড গমন করেন এবং তথায় বহু সভা-সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সমাদৃত হন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল এই মহামনীষী লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন।

বনি-আদম—এই পুস্তকের "হে মানুষ" শীর্ষক কবিতার "আদম-সন্তান" শীর্ষক টীকা এবং "নতুন সফর" শীর্ষক কবিতার "বনি-আদম" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

হামিনাস্ত, হামিনাস্ত্, হামিনাস্ত্—ফার্সী বাক্যাংশ ; অর্থ : "এইখানে আছে"। মুঘল সম্রাট শাহ্জান কর্তৃক নির্মিত দিল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্যময় বিশ্ব-বিখ্যাত হর্ম্য "দিওয়ান-ই-খাস"-এ এই ফার্সী কবিতাটি লিখিত আছে : —

আগার্ ফিরদৌস্ বর্‌রুয়ে যমীনাস্ত্

তো হামিনাস্ত্ ও হামিনাস্ত্ ও হামিনাস্ত্। —অর্থাৎ "যদি পৃথিবীতে (কোথাও) স্বর্গ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা এইখানে, এইখানে, এইখানেই (আছে)। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক এই কবিতারই শেষ চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সূফী ; সূফীমতবাদ—"সূফী" আরবী শব্দ। কাহারো কাহারো মতে এই শব্দটি আরবী "সুফ্" শব্দ হইতে উৎপন্ন। "সুফ্" শব্দের অর্থ হইল "পশম" বা পশম-নির্মিত কম্বল। অতএব, এই অর্থে, "সূফী" শব্দের অর্থ হইল "কম্বলাবৃত ব্যক্তি। হযরত মুহম্মদ (দ:) হেরা-গুহায় প্রথম "অহী" বা প্রত্যাদেশবাণী পাওয়ার পর কম্বল দ্বারা শরীর আবৃত করিয়াছিলেন। সেইজন্য "কাওয়ালী" প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও হযরত মুহম্মদের (দ:) প্রশস্তি-মূলক সঙ্গতাদিতে তাঁহাকে "কমলিওয়ালা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহা হউক, হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক উল্লেখিত কম্বলাবরণ গ্রহণ একটি "সুন্নত"-এ পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক কৃত, কথিত বা নির্দেশিত কার্যরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে। ঐরূপভাবে কম্বলাবৃত হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নৈকট্য লাভ করা যাইতে পারে—এই ধারণা ও বিশ্বাসের উপরই "সূফী" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। কাজেই "সূফী" শব্দের প্রচলিত অর্থ হইল : ইসলাম-নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নৈকট্য লাভী বা লাভেচ্ছু আধ্যাত্মিক-পথানুসারী ব্যক্তি।

আবার কাহারো কাহারো মতে "সূফী" শব্দ আরবী "সাফ্" অর্থাৎ পরিষ্কার বা নির্মল শব্দ হইতে উৎপন্ন। এই অর্থে যাঁহাদের আত্মা "পরিষ্কার ও নির্মল, তাঁহারাই "সূফী"। হযরত মুহম্মদের (দ:) সময় সংসার বিরাগী ও আল্লাহর পথে সর্বস্বত্যাগী একদল মুসলমান তাঁহার

www.pathagar.com

নিকট সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং তাঁহারা হযরতের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইসলামের জন্য কঠোরতম কার্য সম্পাদন এমনকি মৃত্যুবরণের জন্য ইহারা সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ ও ইসলামের জন্যই ইহাদের অধিকাংশ প্রাণ দিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে "আস্‌হাবে সুফ্‌ফা" বলা হইত। "আসহাব" শব্দ আরবী "সাহেব" অর্থাৎ "সাথী" বা "অধিকারী" শব্দের বহুবচন। "সুফ্‌ফা" শব্দ আরবী "সাফ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুফ্‌ফা শব্দের অর্থ পরিষ্কৃতি বা নির্মলতা। অতএব "আসহাবে সুফ্‌ফা"র অর্থ হইল "নির্মলতার অধিকারী", অর্থাৎ যাঁহাদের আত্মা বৈষয়িকতা ও স্বার্থপরতার সর্বপ্রকার কলুশ হইতে মুক্ত থাকিয়া চির নির্মল ও চির পরিচ্ছন্ন ছিল তাঁহাদিগকেই বলা হইত "আস্‌হাবে সুফ্‌ফা"। অনেকের মতে এই "আস্‌হাবে সুফ্‌ফা" দলই সূফীদের অগ্র-পথিক দল এবং ইহাদের নামের তাৎপর্যার্থেই "সূফী" শব্দের উদ্ভব।

সূফী-পন্থা ইসলামের একটি বিশিষ্ট পন্থা। ইসলামের মূল-মন্ত্র "তৌহিদ" বা আল্লাহ্‌র একত্বের সুদৃঢ় ও অবিচল স্বীকৃতি ও তদনুসারী কার্যের ভিতর দিয়া আল্লাহ্‌র "যেকের" অর্থাৎ স্মরণ, "ফেকের" অর্থাৎ মনন, "মুরাকেবা" অর্থাৎ ধ্যান এবং "মুশাহেদা" অর্থাৎ দর্শন, বা অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র চিরন্তন অনুগ্রহ ও নৈকট্যলাভ এবং তদ্দারা আত্মদর্শন লাভ-ই হইল "সূফী-তরিকা" বা সূফী-পন্থার উদ্দেশ্য ও নীতি। সূফী সাধকদের একটি প্রচলিত আরবী বাণী আছে। তাহা হইল এই : "মান্ আরাফা নাফ্‌সা, ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু"—অর্থাৎ যে খোদ্‌কে অর্থাৎ নিজকে জানে, সে-ই খুদাকে জানে। সূফীবাদের মূল-তত্ত্ব বোধহয় ইহাই। সূফী-তত্ত্বকে বলা হয়, "তাসাউফ"। সূফী শব্দ হইতেই এই শব্দের উদ্ভব।

প্রশ্নাবলী

১। বাঙ্গালী মুসলমানের মনের উপর রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট প্রভাবের কারণ কি, "নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা ব্যাখ্যা কর।

২। নজরুল ও রবীন্দ্র কাব্যে ঐক্য ও অনৈক্য কোথায় এবং কেন—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। নজরুল-রবীন্দ্র-সাহিত্যের রুদ্র রূপের সঙ্গে ইকবাল-সাহিত্যের ঐক্য কোথায় এবং কিরূপ, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৪। নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথে সাহিত্যের আধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্য কি, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা লিখ।

৫। নজরুল, ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথে পার্থক্য কোথায়, আলোচ্য অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৬। নজরুলের বিশেষত্ব কি, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৭। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মাতৃ-ভাষায় রচিত কাব্য ও সাহিত্য জন-মানসিকতার উপর যেরূপ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অন্য কোন ভাষার কাব্য-সাহিত্য তেমন পারেনা।

(খ) ইকবালী ভাবপ্রবাহ নজরুলী বন্যার পাশাপাশিই বয়ে চলেছিল এবং চলার পথে অনেক স্থানে তার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

(গ) একই দেশের, একই যুগের এবং একই ভাষার কবি হিসাবে নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্যামৃত আকণ্ঠ পান করে যা হয়েছিলেন, তাতেই তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

(ঘ) বাঁশীর সুরে বিষ ঢেলে—জীবনের বিস্তারে অগ্নি-সংযোগ করে তিনি (নজরুল) বিদ্রোহী সেজে ছিলেন।

(ঙ) প্রাচুর্যের অধিকার, আভিজাত্যের সীমা-বন্ধনী ও সংস্কৃতির এক বিশেষ ধরনের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় স্বাভাবিক ভাবে একটা মৃদুতা এনে দিয়েছিল, এটা স্বীকার না করে উপায় নাই।

(চ) বস্তুত: একথা বলাই হয়তো সংগত যে, নজরুলের বারুদ-স্তূপে রবীন্দ্রনাথের অনুজ্জ্বল স্ফূলিঙ্গ সংযুক্ত হওয়াতেই দেশের মনে আগুন ধরেছিল।

(ছ) রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করলেও নজরুল নিজেও একটা যুগ, তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে বাংলা কাব্য-জগতে যে-নতুন তেজস্বিতার আবেগ সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, তার মূল রহস্যের ইংগিত মেলে এইখানে।

(জ) গভীর গভীরকে আকর্ষণ করতো আত্মীয়তার সূত্রে।

(ঝ) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ইকবাল মূলতঃ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন—একে অন্যের সাথে হাত মিলিয়ে।

৮। টীকা লিখ :—

হামিনাস্ত্ : সূফী।

আলতাফ হুসাইন হালী

এই লেখাটি কাজী আকরম হোসেন-রচিত প্রবন্ধাবলী হইতে উদ্ধৃত। অধ্যাপক আকরম হোসেন সাহেব জীবনতর সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। তিনি গদ্য ও কাব্য-সাহিত্যের এই উভয় শাখায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাহা ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পাক-ভারতীয় মুসলমানদের পতনযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু কবি এবং নবযুগের নকীব আলতাফ্ হুসাইন হালীর জীবনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা

স্যার সৈয়দ আহমদ—পাক-ভারতে মুসলিম-শাসনের অবসান ঘটার পর মুসলমানদের নব-জাগরণের অগ্রদূত ও সুবিখ্যাত আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহ্মদ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম চাকরি দিল্লীর মুঘল দরবারে। অতঃপর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া নিজের প্রতিভা ও কার্যদক্ষতা বলে সাব্-জজ্ পদে উন্নীন হন। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল। এই সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে না পারিলে মুসলমান জাতির উন্নতির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সেই উদ্দেশ্যে গোঁড়া পন্থীদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করিয়া তিনি মুসলমানদের

www.pathagar.com

মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি অনেক নিরীহ বে-সামরিক ইংরাজ নরনারীর জীবন রক্ষা করেন এবং "ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ" (Causes of Indian Mutiny) শীর্ষক এক ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া এই বিদ্রোহের জন্য যে ইংরাজ সরকারের একদেশদর্শী নীতিও বহু পরিমাণে দায়ী, ইংরাজ জাতিকে সে কথা বুঝাইয়া দিলেন। ফলে বহু নির্দোষ হিন্দু-মুসলমান ইংরাজের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পায়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ড গমন করেন এবং তথাকার শিক্ষা প্রণালী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া সেই পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামী আদর্শের সংযোগে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আলীগড়ে বিখ্যাত আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তাহা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই আলীগড় কলেজই রাজ্যহারা পাক-ভারতীয় মুসলমানদিগকে নব জীবনের পথ প্রদর্শন করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সৈয়দ আহমদকে কে-সি-আই-ই-উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বহুমূল্য সুবর্ণ-পদক ও তরবারী প্রদান করেন। তিনি ইংরাজী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত উদার মতবাদ পোষণ করিতেন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ তিনি পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আলীগড় কলেজ প্রাঙ্গণেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

শামসুল উলামা—মুসলিম শাস্ত্রবিদ্‌দিগকে প্রদত্ত উপাধি। ইহা একটি আরবী বাক্যাংশ ; শাব্দিক অর্থ : বিদ্যানদিগের সূর্য।

মুশায়েরা—আরবী "শের" বা কবিতা শব্দ হইতে উৎপন্ন। "শায়ের" অর্থ কবি ; "মুশায়েরা", অর্থ : "কবি-সম্মেলন"। মুশায়েরায় আমন্ত্রিত কবিগণ সেখানে তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কিন্তু মুশায়েরা-আসরের একটি প্রচলিত প্রথা এই যে, গযল পাঠের সময় কেহ ধূম পান করিতে কিংবা পান খাইতে পারিবেন না।

রুবায়ী—আরবী-ফার্সী-উর্দু চতুষ্পদী কবিতা। "রুবায়ী"-র বহুবচন রুবায়াৎ—যথা রুবায়াৎ-ই-উমর-খৈয়াম। রুবায়ীর প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে মিল থাকে—তৃতীয় পদে মিল থাকেনা।

গযল—এক প্রকার আরবী-ফার্সী-উর্দু কবিতা। যে-কবিতায় সৌন্দর্য, প্রেম, বিরহ, মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা থাকে তাহাকে গযল বলে। এই কবিতায় কমপক্ষে ৫টি চরণ এবং উর্ধ্বে ২১টি পর্যন্ত চরণ থাকিবে।

ক্বসিদা—এক প্রকার আরবী-ফার্সী-উর্দু কবিতা। যে-কবিতায় কাহারো প্রশংসা বা নিন্দা করা হয় তাহাকে ক্বসিদা বলে। এই কবিতায় কমপক্ষে ১৫টি চরণ থাকিবে। প্রয়োজন অনুসারে ইহাকে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম স্তবকের প্রথম দুই চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুই চরণের মিল থাকিবে।

তৌহিদ—আরবী শব্দ। আরবী "আহ্‌দ্‌" বা এক শব্দ হইতে উৎপন্ন। তৌহিদ অর্থ : আল্লাহ্‌র একত্ব-বাদ। Monotheism. ইসলাম ধর্মের ইহাই মূল-ভিত্তি।

প্রশ্নাবলী

১। "আলতাফ হুসাইন হালী" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে সংক্ষেপে হালীর জীবনী আলোচনা কর।

www.pathagar.com

২। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে হালীর সময়ের উর্দু-কাব্যের অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে হালীর বিখ্যাত "মুসদ্দস-ই-হালী" নামক কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু ও মুসলমান সমাজের উপর তাহার প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসরণে উর্দু-কাব্য-সাহিত্যে হালীর স্থান নির্ণয় কর।

৫। টীকা লিখ :—
মুশায়েরা, ক্বসিদা, তৌহিদ ; শামসুল উলামা ; গজল।

কবি ও বৈজ্ঞানিক

এই প্রবন্ধটি কাজী মোতাহার হোসেন রচিত "সঞ্চয়ন" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কাজী মোতাহার হোসেন প্রধানতঃ একজন বৈজ্ঞানিক হইলেও বাংলা সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার দান নগণ্য নহে। তাঁহার রচনা—বিশেষ করিয়া তাঁহার "সঞ্চয়ন" নামক পুস্তকের রচনাবলী ভাষার সরলতা, মতের মৌলিকতা ও মত প্রকাশের সাহসিকতায় একান্তভাবে বিশিষ্ট বলিয়া প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষিগণও মত প্রকাশ করিয়াছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখীন দুই পন্থার পথিক বলিয়া প্রতীয়মান কবি ও বৈজ্ঞানিক কোথায় সাধনক্ষেত্রের নিগূঢ় ঐক্য-সূত্রে এক এবং কোথাই বা তাঁহাদের যথার্থ পার্থক্য—আলোচ্য প্রবন্ধে সে কথাই প্রবন্ধকার অত্যন্ত সাফল্য ও দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য কোথায়—"কবি ও বৈজ্ঞানিক" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে কবি ও দার্শনিকে প্রভেদ কোথায় তাহা উল্লেখ কর।

৩। কবি ও বৈজ্ঞানিক মানব জাতির অগ্রগতির পক্ষে পরস্পরের পরিপূরক—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে এই কথার সত্যতা প্রমাণ কর।

পুঁথি-সাহিত্যের উত্তরাধিকার

এই রচনাটি আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত। শামসুদ্দীন সাহেব মুসলিম-বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। অনুবাদ সাহিত্য এবং মৌলিক রচনায়ও বাংলা সাহিত্যের উচ্চ আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার রচনার সর্বত্র স্থিতধী বৈদগ্ধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর দেদীপ্যমান। তাঁহার ভাষা সাবলীল স্বচ্ছ ও পরিমার্জিত।

বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের যে-ধারা, সে ধারার গোমুখী-উৎস, জনসাধারণের মুখের ভাষা। বৌদ্ধ যুগের চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তায়মান মুসলিম-যুগের পুঁথি-সাহিত্য পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের যে-প্রাণ-চঞ্চল স্রোত-ধারা বহিয়া আসিয়াছে, গণ-ভাষা-

www.pathagar.com

মুখী সেই প্রাণ-ধারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-রাজ কর্তৃক রাজনৈতিক কারণে প্রণোদিত ও সৃষ্ট, সংস্কৃত-বহুল, গণ-অবোধ্য ভাষা-মরুর বালুকা-বক্ষে আসিয়া পথ হারাইয়া বসিল। এই অকস্মাৎ উদ্ভূত ভাষা-ভঙ্গী সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রতিবাদ, বঙ্কিমের সামঞ্জস্য-সাধন প্রচেষ্টা এবং প্রমথ-রবীন্দ্রের পশ্চিম বঙ্গীয় গণ-ভাষাভিসারী ভাষা-সৃজন প্রয়াস সুনির্দিষ্ট সীমা-রেখার ভিতর সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সেই ফেলিয়া-আসা যোগ-সূত্রের সন্ধানে কেহই বিশেষ তৎপর হইলেন না। অবশেষে সেই যোগ-সূত্রের সন্ধান দিলেন নজরুল। বাংলা সাহিত্য ভাষা ও ভাবের নব কল্লোলে উদ্বেলীত হইয়া উঠিল। আজ পূর্ব বাংলায় নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-সংস্থার নব উদ্বোধিত জাতীয় মানসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল-আবাহিত এই পুরাতন প্রাণধারার নবরূপায়ণ একান্তভাবে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই হারানো যুগ-যূত্র—পুঁথি-সাহিত্যের উত্তরাধিকার, পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকগণের-ই একান্তভাবে নিজস্ব-আলোচ্য প্রবন্ধে এই কথাই প্রবন্ধকার তাঁহার সুললিত ভাষায় সুযুক্তির সহিত উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

টীকা

গুরু-চণ্ডালীদোষ--গুরু ও লঘু শব্দের যে-যোগ ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ বিরুদ্ধ, তাহাকেই গুরুচণ্ডালী দোষ বলা হয় ; যথা : শকট-চড়া, গাড়ী-আরোহণ ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

১। "পুঁথি-সাহিত্যের উত্তরাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে বাংলায় মুসলিম শাসনকালে পুঁথি-সাহিত্যের মর্যাদা ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারায় নজরুল-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

শেখ সা'দী

এই প্রবন্ধটি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ সাহেব-রচিত "পারস্য-প্রতিভা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বরকতুল্লাহ্ সাহেব একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধকারগণের মধ্যে তিনি সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ভাষা সুপরিমার্জিত, লীলায়িত ও বেগবান। ছন্দময়ী, কাব্য-ঝংকারময় ভাষার অনুরণনে তাহার প্রায় সমস্ত রচনাই অনুরণিত। তত্ত্ব ও তথ্য এবং ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস সমাহারে সমৃদ্ধ তাঁহার রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

আলোচ্য প্রবন্ধে ইরানের বিশ্ব-বিখ্যাত কবি ও সাধক শেখ সাদীর অমর জীবন আলেখ্য ভাব সমৃদ্ধ অপূর্ব মাধুর্যময় ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

টীকা

বিশ্ব-বিজয়ী সিকান্দার—আলেকজাণ্ডারকেই (Alexandar the Great) আরবী-ফার্সী ভাষায় সিকান্দার বা সেকেন্দার বলা হয়। সিকান্দার বা আলেকজাণ্ডার গ্রীসের অন্তর্গত মেসেডোনিয়ার অধিপতি এবং বিশ্ব-বিখ্যাত বীর ছিলেন। তাঁহার সময়ের সমস্ত সভ্য জগত তিনি জয় করেন। ইরান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া তিনি পাক-ভারতের পাঞ্জাব পর্যন্ত

www.pathagar.com

দখল করেন। মেসেডোনিয়ার অন্তর্গত পেল্লা নামক স্থানে খৃষ্টপূর্ব ৩৫৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পর্বতময় মেসেডোনিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপ্ তাঁহার পিতা। খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ সালে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে বর্তমান ইরাকের সুপ্রাচীন শহর বাবিলনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়া নগর তিনিই নির্মাণ করেন।

নিযামিয়া মাদ্রাসা—বাগদাদের এই বিখ্যাত মাদ্রাসাটি বাগদাদের সাল্জুকবংশীয় সুলতান আল্প্ আর্স্লান এবং মালিক শাহ্-এর বিদ্যোৎসাহী ইরানদেশীয় উজীর নিযামুল্ মুল্ক্ কর্তৃক ১০৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতেই আব্বাসিয়া খলীফাগণ নামমাত্র বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। প্রকৃত রাষ্ট্র-ক্ষমতা সাল্জুক ও অন্যান্য তুর্কী বংশীয় সুলতানদের সম্পূর্ণ করতলগত থাকিত। যাহা হউক, নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রধানতঃ সাফেয়ী মযহাব ["সুখী কে"? শীর্ষক প্রবন্ধের "ইমাম আবু হানিফা" শীর্ষক টীকা এবং "ইসলামের ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধের "মযহাব" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।] এবং আশারী মতানুসারী শিক্ষাই দেওয়া হইত। ছাত্রগণ মাদ্রাসায়ই অবস্থান করিতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ বিভিন্ন তহবিল হইতে বৃত্তি পাইতেন। এখানে যে-শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহারই অনুকরণে ইউরোপের প্রথম যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ এখানে অধ্যাপনা করিতেন। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক আল্-গাযযালী ১০৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা করেন। ইরানের বিশ্ব-বিখ্যাত কবি ও জ্যোতির্বিদ উমর খাইয়ামের সঙ্গেও এই মাদ্রাসার সংযোগ ছিল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ অধিকার ও ধ্বংসের পরও নিযামিয়ার অস্তিত্ব বজায় ছিল। কিন্তু ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লং কর্তৃক বাগদাদ অধিকৃত হইবার দুই বৎসর পর নিযামিয়া বাগদাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন আল-মুন্তাসিয়া"র সঙ্গে একত্রিভূত হইয়া গেলে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

শেখ আব্দুল কাদির জিলানী—শেখ্ আব্দুল কাদির জিলানী সাহেব মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠতম ওলী বা ভক্ত তাপস বলিয়া পরিচিত। পাক-ভারতে তিনি "বড় পীর সাহেব" নামে অভিহিত হন। হিজরী ৪৭০ সালের ১লা রমযান (১০৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দ) উত্তর ইরানের অন্তর্গত জিলান জেলার নীফ্ বা নয়ফ নামক এক গণ্ডগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পিতৃকুলের দিক দিয়া হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র হযরত হাসানের (রা:) এবং মাতৃকুলের দিক দিয়া হযরত মুহম্মদের (দ:) অপর দৌহিত্র হযরত হুসাইনের বংশধর। বাল্যে স্বদেশে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে উচ্চতর শিক্ষালাভের আশায় বাগদাদ গমন করেন এবং তথাকার বিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কথিত আছে, ঐ সময় তিনি যে যাত্রীদলের সঙ্গে যাইতেছিলেন সেই কাফেলাটি পথে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তাঁহার নিকট কোন অর্থ আছে কিনা দস্যুদল কর্তৃক একথা জিজ্ঞাসিত হইয়া জামার আস্তিনের অভ্যন্তরে সেলাই করিয়া লুক্কায়িত দরিদ্র্য জননী কর্তৃক প্রদত্ত নিজের শেষ সম্বল ৪০টি দীনারের কথা অকপটে স্বীকার করেন এবং সে অর্থ তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন। তাঁহার এই অদ্ভুত সত্যবাদীতায় বিস্মিত দস্যুদলপতি এই অকারণ ও ক্ষতিকর সত্যভাষণের কারণ জানিতে চাহিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সর্বপ্রকার মিথ্যাভাষণে জননীর নিষেধই ইহার প্রধান কারণ। তাঁহার এই অত্যদ্ভূত মনোবল ও সত্যপ্রিয়তায় দস্যুদল তাহাদের জীবন-ব্যাপী মিথ্যা ও পাপাচারণের কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনায় এমন বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য দস্যুতা পরিত্যাগ করে।

নিযামিয়া মাদ্রাসার একজন কৃতি ও মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি ধর্ম ও অন্যান্য শাস্ত্রে তদানীন্তন সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করিয়া

কঠোর তপস্যা ও সাধনায় মগ্ন হন। ৫১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞানার্জন ও কঠোর সাধনায় লিপ্ত থাকিয়া অতঃপর লোক শিক্ষায় ব্রতী হন এবং অধ্যক্ষরূপে হযরত আবু সা'দ মুবারক আল্ মুখ্‌রিসির মাদ্রাসাটির ভার গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানে শিক্ষাকার্যে নিরত থাকেন। এই সময় তিনি জনসাধারণের নিকটও ধর্মের সাধারণ ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দান আরম্ভ করেন এবং তাঁহার অপূর্ব জ্ঞান ও বিরাট ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তিশালী পুণ্যময় জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার এই সকল ধর্ম-সভায় সত্তর হাজার পর্যন্ত লোক উপস্থিত হইত। হিজরী ৫৬১ সালে ১১ই রবীউস্‌সানী (১১৬৬ খৃষ্টাব্দ) বাগদাদেই তিনি পরলোকগমন করেন।

গুলিস্তাঁ—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : ফুলবাগান ; এখানে শেখ সা'দী -রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "গুলিস্তাঁ"কে বুঝাইতেছে।

ইব্‌নে বতুতা—তাঁহার পূর্ণ নাম ; আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ ইব্‌নে বতুতা। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর তাঞ্জিয়ার নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত আরব পরিব্রাজক। তিনি উত্তর ও মধ্য আফ্রিকা, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, রুশিয়া, ভারত, চীন, যাভা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং এই সকল দেশ সম্পর্কে তিনি বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান ভ্রমণ-কাহিনী আরবী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর ফেয্ নগরে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়।

বাগদাদ—"ভারতে মুসলমান স্থাপত্য" শীর্ষক প্রবন্ধের "বাগদাদ" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

দামেস্কাস—"রাজা আর রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধের "দামেস্ক" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

যেরুযালেম—"উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "যেরুযালেম" শীর্ষক শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বস্‌রা—বর্তমান ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুলাব-ফুলের জন্য বিখ্যাত। বস্‌রা প্রাচীন শহর। এই শহরটি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা:) কর্তৃক ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হন। পারস্য উপসাগর হইতে ইহা মাত্র ৭৫ মাইল দূরে।

খাইবার—পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত সীমান্ত প্রদেশের বিখ্যাত খাইবার পান্ বা খাইবার গিরি-বর্ত। শেখ সা'দী পশ্চিম-ভারত বা বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান পর্যন্ত আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বার্বারীর মরুপ্রান্তর—মিশরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে মরক্কো পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলকে "বার্বারী" বলা হয়। এই অঞ্চল মরুময়।

সিথীয়ান সীমান্ত—তুরাণ বা বর্তমান তুর্কীস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে প্রাচীনকালে সিথীয়া বা সাইথিয়া বলা হইত।

জিলান—উত্তর ইরানের একটি অঞ্চল ও প্রাক্তন প্রদেশ। এখানে এই নামে একটি জেলা এবং শহরও আছে। এই জিলান জেলার অন্তর্গত নীফ্ বা নয়ফ নামক স্থানে মুসলিম-জগৎ-প্রসিদ্ধ বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। এই পর্বতময় অঞ্চলটি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

কাশগড়—চীনা তুর্কীস্তানের অন্তর্গত মুসলিম-অধ্যুসিত সিংকিয়াং প্রদেশে কাশগড় নামক নদীর তীরবর্তী একটি প্রাচীন শহর। রুশিয়া, তিব্বত ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ইহার বাণিজ্যিক যোগাযোগ আছে। এক সময় ইহা ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনারা ইহা অধিকার করিয়া লয়। দেশবাসিগণ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেশকে চীনাদের কবল হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে চীনারা পুনরায় ইহা দখল করে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০।

www.pathagar.com

হজ্জব্রত—"বিদায় হজ্জ্" শীর্ষক প্রবন্ধের "হজ্জ" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

মওলানা—আরবী শব্দ, শাব্দিক অর্থ : আমাদের প্রভু। ইহা একটি উপাধি। ইসলামী শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ বিদ্যান ব্যক্তিকে "মওলানা" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

চেঙ্গিষ খাঁ (Genghis Khan or Jenghis Khan)--মঙ্গোল জাতীয় দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীর। তাঁহার আদি নাম "তেমুচিন" (Temuchin)। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার ওনন (Onon) নদীর নিকটবর্তী একস্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গোলিয়া এক ক্ষুদ্র উপজাতীয় অধিপতি ইয়েসুকাই (Yesukai) তাঁহার পিতা। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজকে মঙ্গোলিয়া জাতির "খান বা খাঁ" বলিয়া ঘোষণা করেন এবং চেঙ্গিষ খাঁ নাম গ্রহণ করেন। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর চীন এবং ১২১৮–২১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মধ্য এসিয়া অধিকার করিয়া তিনি উত্তর চীন হইতে জর্জিয়া ও আযরবিজান পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে রুশদিগকে পরাজিত করিয়া চেঙ্গিষের দুর্ধর্ষ বাহিনী বুলগেরিয়া পর্যন্ত অধিকার করে এবং এসিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উক্ত দেশটিকে ধ্বংস করিয়া আসে। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিষ খাঁ পরলোকগমন করেন।

হালাকু খাঁ (Hulagu Khan or Hulaku Khan)—মঙ্গোল জাতীয় দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি চেঙ্গিষ খাঁর পৌত্র এবং বিখ্যাত কুবলাই খাঁর ভ্রাতা। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরী অধিকার করিয়া বাগদাদের শেষ আব্বাসীয় খলীফাকে পদচ্যুত ও নিহত করেন এবং উক্ত নগরীর ধ্বংস সাধন করেন। অতঃপর ১২৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি আলেপ্পো ও দামাস্কাস অধিকার করিয়া সিরিয়াকে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। মেসোপোটমিয়াও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমনকরেন।

স্যার আউসলী (Sir Gorey Ouseley)—তিনি একজন বিখ্যাত বৃটিশ কুটরাজনীতিক এবং প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইরানে বৃটিশ রাজদূত ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ফ্রাঙ্কগণ—ফ্রেঞ্চ বা ফরাসী দেশের অধিবাসীদিগকে ফ্রাঙ্ক বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ত্রিপলী—সিরিয়ার একটি অতি প্রাচীন শহর। বর্তমানেও এ-শহরটি বিশেষ সমৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত উত্তর আফ্রিকার একটি দেশের নামও ত্রিপলী বা ত্রিপলোটিনা। ইহা মিসরের পশ্চিম পার্শ্বে এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

আলেপ্পো—সিরিয়ার একটি সুপ্রাচীন শহর। বর্তমানে ইহা সিরিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই শহরের প্রাচীন নাম "হলব্"।

শিরাজ—ইরানের একটি অতি প্রাচীন শহর। বিশ্ব-বিখ্যাত ইরানী কবি সা'দী ও হাফিযের জন্ম-স্থান এবং কর্মক্ষেত্র। এখানে মহাকবি হাফিযের সমাধিস্থানও বিদ্যমান।

"তরিকৎ বজুয্‌ খেদমতে খাল্‌ক নিশ্‌—
ব' বসবিহ্‌ ও সাজ্জাদা ও দলক্‌ নিশ্‌।"—

শেখা সা'দী-রচিত একটি প্রসিদ্ধ ফার্সী কবিতা। ইহার অর্থ হইল এই : তরিকৎ অর্থাৎ আল্লাহ্-প্রাপ্তির পথ মানব-সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তসবিহ্‌ পড়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম যপ করা এবং সেজ্‌দা করা অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা (তরিকৎ বা আল্লাহ্‌-প্রাপ্তির পথ) নহে।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। "শেখ সাদী" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় সংক্ষেপে শেখ সা'দীর জীবনী লিখ।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে শেখ সা'দীর সেবা-মূলক কার্যগুলি বর্ণনা কর।

৩। শেখ সা'দী অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে দুই একটি উদাহরণ দ্বারা একথার সত্যতা প্রমাণ কর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) শাহানশাহ্ সম্রাট ও দীনহীন প্রজা যে ভবনে একই মূল্য বহন করে, বিশ্ব-বিজয়ী সিকান্দার ও আশ্রয়হীন কাঙ্গাল যেখানে একই সজ্জায় নীত হয়, সেই গৃহ সাধুর জন্য নির্মিত হইল।

(খ) স্বর্গভ্রষ্ট শিশু মর্ত্যের মাটিতে খেলিতে খেলিতে ধূলিমাখা দেহে আজ গৃহে ফিরিল ; তাই সেইখানে তাহার মার্জনার জন্য বন্ধুগণের এই আকুল কামনার অভিনয়।

(গ) আকাশের উদারতা ও স্বর্গের শান্তি লইয়া সময় সময় যে-সকল মহাপুরুষ মরতের দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করেন ও জগতের কিঞ্চিত "যথার্থ কল্যাণ" সাধন দ্বারা মানুষের স্মৃতিপটে অক্ষয় পদ-চিহ্ন রাখিয়া যান, মহাত্মা সা'দী তাঁহাদের অন্যতম।

(ঘ) সাহিত্য, ধর্মনীতি বা ইতিহাসের অভিনব বার্তা যখন দেশের জনসাধারণের গৃহে গৃহে পৌছিবার কোনই সন্ধান না পাইয়া শুধু কতিপয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিত, তখন সা'দী নৈশ নক্ষত্রের মত আপন অনাড়ম্বর কিরণধারা উৎসারিত করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে সে আলোকরাশি উপহার দিতেন।

(ঙ) উর্ধ্বে অনন্ত উদার নীলাকাশ, চারিধারে ধরণীর সীমাহীন বিস্তৃতির অঞ্চল ঘেরিয়া দূর চক্রবাল-রেখা তাঁহার হৃদয়ে অসীমের তরঙ্গ খেলা আনয়ন করিত।

(চ) রজনীতে জগৎ যখন ঘুমঘোরে অচেতন হইত, প্রকৃতির নীরবতা দেখিয়া আকাশ যখন সহস্র কোটী প্রদীপ জ্বালিয়া বিধাতার আরতি দিত, সা'দী তখন ধ্যান-রাজ্যের অন্তহীন গভীরতায় নিমজ্জিত হইতেন।

৫। টীকা লিখ :

আলেপ্পো ; কাশগড় ; জিলান ; মওলানা ; ইব্‌নে বতুতা ; নিযামিয়া মাদ্রাসা।

জন-সেবা য়ুনিভার্সিটী

এই রচনাটি আবুল মনসুর আহমদ-রচিত "ফুড-কনফারেন্স" নামক ব্যঙ্গ-রচনামূলক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। আবুল মনসুর সাহেব বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক। তাঁহার রচনা প্রসাদ-গুণ বিশিষ্ট। তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-রচনা এবং সাহিত্যের এই ক্ষেত্রে তিনি

www.pathagar.com

বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি শুধু সাহিত্যিকই নহেন—বাংলার একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক গণ-নেতা। সেইজন্য তাঁহার রচিত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা গণ-মুখী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ ও বহুমুখী অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের সমাজে, ধর্মীয় ব্যাপারে এবং রাজনীতিতে যেসব ভণ্ডামী, ফাঁকিবাজি ও প্রতারণার প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে-ব্যাপক অধঃপতন সূচিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ও ওয়াকেবহাল। এবং সেই জন্যই এই সকল অবাঞ্ছিত অনাচারের প্রতিকারার্থে তিনি শ্লেষ ও ব্যঙ্গের তীব্র কশা হস্তে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আলোচ্য ব্যঙ্গ-রচনাটিও তাঁহার তেমনিই একটি রচনা। এই রচনাটি বৃটিশ আমলে আমাদের পরাধীনতার যুগে রচিত এবং তদানীন্তন বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার একটি অবিকৃত চরিত্র-আলেখ্য। আজিকার আযাদীর দিনে আমাদের রাজনীতি সেই শ্রেণীর নেতৃত্বের নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহা গভীরভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিবার সময় আসিয়াছে। জাতীয় জীবনের এইখানেই এই প্রকার ব্যঙ্গ-রচনার যথার্থ মূল্য।

টীকা

হাযিরানে-মজলিস—"হাযিরান" আরবী "হাযির" শব্দে বহুবচন। "হাযির" শব্দের অর্থ "উপস্থিতি" বা "উপস্থিত ব্যক্তি"। "মজলিস" আরবী শব্দ ; অর্থ : বৈঠক ; সভা। কিন্তু আলোচ্য বাক্যাংশটি উল্লেখিত দুইটি আরবী শব্দের সমবায়ে ফার্সী ব্যাকরণানুযায়ী গঠিত। বাক্যাংশটির অর্থ : সভায় বা বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।

হক্-সাব—এই নামটি দ্বারা আলোচ্য রচনায় মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণ নাম : আবুল কাসেম ফজলুল হক। বাংলার, বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নতিমূলক বহু কাজ বিরোধী দলের সহিত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কঠোর সংগ্রাম করিয়া সম্পাদন করায় এবং অনেক সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রিয় ও কঠোর সত্য-ভাষণের নির্ভীকতা প্রদর্শন করায় পাক-ভারতের মুসলমানগণের নিকট হইতে তিনি একদা "শেরে-বাংলা" বা "বাংলার ব্যাঘ্র" উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার চাখার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ এবং পরের বৎসর বি-এল পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিলে আর্থিক কারণে বাধ্য হইয়া কিছুদিনের জন্য তিনি গভর্ণমেন্টের অধীনে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ হইতে পদ-ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অচিরকালের মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ আইন-বিদ্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বরাবরই বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও আজ পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য তিনি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী-পদে বরিত হন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রী। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি

www.pathagar.com

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র রূপে নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনিই লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে বিখ্যাত "পাকিস্তান-প্রস্তাব" আনয়ন করেন। অতঃপর লীগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া কায়েদে আযমের সহিত মত-বিরোধ হওয়ায় তিনি লীগ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি পূর্ব বাংলার কৃষক-মজদুর পার্টি ও যুক্তফ্রন্ট পার্টির নেতা।

বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার দান অপরিসীম। কলিকাতার "ইসলামিয়া কলেজ", "লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ", ঢাকার "ইডেন কলেজ", আদিনার "ফজলুল হক কলেজ", চাখারের "ফজলুল হক কলেজ" প্রভৃতি তাঁহারই আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত "প্রাথমিক শিক্ষা বিল", "প্রজাস্বত্ব আইন", "ঋণ-সালিসী বোর্ড আইন" প্রভৃতি আইন পাশ এবং প্রচলন ব্যাপারেও ফজলুল হক সাহেবের হস্ত প্রত্যক্ষমান।

হজ্জে আকবরী—প্রতি বৎসর ৯ই যিল-হজ্জ্ তারিখ হইতে ১২ই যিলহজ্জ্ তারিখ পর্যন্ত মক্কা হজ্জ্ অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১০ই যিলহজ্জ্ তারিখে মক্কার সন্নিকটবর্তী আরফাত ময়দানে উপস্থিত থাকিয়া নামাযাদি আদায়ই হজ্জ্-এর প্রধান অঙ্গ। যে-বৎসর ঐ ১০ই যিলহজ্জ্ তারিখ শুক্রবার পতিত হয়—ঐ বৎসরের উক্ত হজ্জ্কেই হজ্জে্ আক্‌বরী অর্থাৎ "বড় হজ্জ্" বলা হয়। ["বিদায় হজ্জ্" শীর্ষক প্রবন্ধের "হজ্জ্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

লর্ড জ্যাকব—"ইয়াকুব" শব্দটি মূলে ইব্‌রাণী বা হিব্রু ভাষার অন্তর্গত। "ইবরাণী" ভাষা আরবী ভাষারই সমগোত্রীয় অন্যতম সেমেটিক ভাষা। "ইবরাণী" ও আরবী ভাষায় এই শব্দটি "ইয়াকুব" রূপেই উচ্চারিত। ইংরাজী ভাষায় ইহার উচ্চারণ "জ্যাকব" (Jacob)। যথা—হযরত মুহম্মদের (দ:) পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব নবীকে (আ:) ইংরাজী বাইবেলে Prophet Jacob (জ্যাকব নবী) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। "জন-সেবা য়ুনিভার্সিটী" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে লর্ড ইয়াকুবের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) সে ভাবল, নিজের জন্য কিছু করতে পারলাম না, তখন পরের জন্য নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পারব।

(খ) জ্ঞান যারা প্রচার করে তারা অজ্ঞান।

(গ) ক্ষমতা-বিহীন অধিকার বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পা ছাড়া আর কিছুই নহে।

(ঘ) পথে না বেরুলে পথ চিনা যায় কি? কাজ করতে করতেই না লোক কাজি হয়।

৩। টীকা লিখ :—

হজ্জে আক্‌বরী; হাযিরানে-মজলিস।

৪। আলোচ্য রচনায় "জন-সেবা য়ুনিভার্সিটীর" বিভিন্ন স্তর নির্ধারণের তাৎপর্য কি, ব্যাখ্যা কর।

বাগ্‌দাদে

এই রচনাটি মাহবুব্-উল-আলম-রচিত "পল্টন জীবনের স্মৃতি" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। জনাব মাহবুব্-উল-আলম একজন বিশিষ্ট ও শক্তিশালী সাহিত্যিক। যদিও তিনি গল্প,

www.pathagar.com

ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি অনেক কিছুই রচনা করিয়াছেন—তথাপি প্রবন্ধকার হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি সমধিক। যুক্তিবাদ ও স্পষ্টবাদিতা তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, পরিমার্জিত ও সাবলীল। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি মহানগরী বাগ্‌দাদের কথঞ্চিত বর্ণনা দান করিয়াছেন। প্রথম বিশ্ব-সমরে তিনি সৈনিকরূপে বাগ্‌দাদ গমন করেন। তখন প্রত্যক্ষভাবে যে-সকল জিনিষ সেখানে তাঁহার দৃষ্টিগোচর ও মানস-গোচর হয়, তাহারই মনোরম আলোচনা আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। তবে এই প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, সৈনিক জীবনের সূক্ষ্ম ও প্রাঞ্জল বর্ণনা। পলাসীর প্রান্তরে আযাদী হারাইবার পর সারা বাঙ্গালী জাতি, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলিম বীরত্বময় সৈনিক জীবনের উন্মাদনাময় আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হন। তাহার পর দেড়শত বৎসরেরও অধিক কাল পরে বিগত প্রথম বিশ্ব-সমরের সময়ই বাংলার হিন্দু-মুসলমান আবার সে সুযোগ লাভ করেন। এবং তখন হইতেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক সমর ও সামরিক জীবন সম্পর্কিত সাহিত্য-সৃষ্টি বাংলা ভাষায় আরম্ভ হয়। বাংলা-সাহিত্যের এই শাখায় জনাব মাহবুব্-উল্-আলম অগ্রপথিকদের নকীব। এই দিক দিয়াও এই প্রবন্ধটির মূল্য ও মর্যাদা অপরিসীম।

টীকা

বাগ্‌দাদ—"ভারতে মুসলমান স্থাপত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে "বাগ্‌দাদ" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী—তিনি "বড় পীর সাহেব"—নামেই সমধিক পরিচিত। "শেখ সা'দী" শীর্ষক প্রবন্ধের "শেখ আব্দুল কাদির জিলানী" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী সাহেব "সৈয়দ" বংশোদ্ভব। হযরত মুহম্মদের (দ:) সর্বকনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমার (রা:) গর্ভজাত সন্তানদের বংশ অর্থাৎ ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের বংশধরগণকেই "সৈয়দ" বলা হয়। অন্য কাহারো বংশধরকে "সৈয়দ" বলা হয় না। "সৈয়দ" শব্দের শাব্দিক অর্থ : নেতা। "শেখ" আরবী শব্দ এবং ইহারও শাব্দিক অর্থ : নেতা। "শেখ" উপাধি মাত্র। যে-কোন বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিকে "শেখ" বলা যাইতে পারে।

মামুন—তাঁহার পূর্ণ নাম : খলীফা আবদুল্লাহ্ আল্-মামুন। তিনি বাগ্‌দাদের সপ্তম আব্বাসীয় খলীফা এবং এই বংশের—এমনকি সারা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, বিদ্যোৎসাহী, যুক্তিবাদী ও প্রতাপান্বিত অধিপতি। ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বিশ্ব-বিখ্যাত আব্বাসীয় খলীফা হারুণুর রশীদের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্-আমীনের মৃত্যুর পর ৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি খলীফা-পদে সমাসীন হন। তাঁহার শাসনকালে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে, সাহিত্য, চারুকলা ও বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

হারুণ—বিশ্ব-বিখ্যাত আব্বাসীয় খলীফা হারুণুর রশীদ। তিনি বাগ্‌দাদের পঞ্চম আব্বাসীয় খলীফা। শুধু আব্বাসীয় বংশের নহে—তিনি সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সময়ে সারা জগতে ঐশ্বর্য, শক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্যই সর্বাগ্রগণ্য ছিল। বিশ্ব-বিখ্যাত আরব্যোপন্যাস কথিত অদ্ভুতকর্মা খলীফা হারুণুর রশীদ তিনিই। তাঁহার পিতা খলীফা আল্‌মাহ্‌দীর শাসনকালে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে মুসলিম সেনা-বাহিনী ৭৮২ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাটের বিশাল সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া বস্ফোরাসের তীর পর্যন্ত উপনীত হয় এবং তদানীন্তন রোমান রাজধানী কন্‌ষ্টান্টিনোপল অবরোধের উপক্রম করেন। তখন রোমক সম্রাজ্ঞী আইরিন (Irene) ৯০,০০০

www.pathagar.com

দিরহাম্ বার্ষিক করদানে স্বীকৃত হইয়া খলীফার সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই বীরত্ব ব্যঞ্জক কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহার পিতা আল–মাহ্‌দী তাঁহাকে "আর্–রশীদ", বা "ন্যায়-পথাবলম্বী" উপাধি দান করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্–হাদীর পরে তিনিই খলীফা হইবেন বলিয়া মনোনয়ন দান করেন। পিতৃদত্ত এই উপাধির ফলে হারুণুর্ রশীদ নামেই তিনি জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। যাহা হউক, খলীফা আল্–মাহ্‌দীর মনোনয়ন অনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্‌হাদী ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে খলীফা পদে বরিত হন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে হারুণুর্ রশীদ ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে খলীফা পদে সমাসীন হন। প্রায় দুই যুগব্যাপী প্রবল প্রতাপ ও ন্যায়–পরায়ণতার সহিত রাজ্য–শাসন করিয়া ৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার ও তৎপুত্র আল্–মামুনের রাজত্বকালকে নিঃসন্দেহে আব্বাসীয় শাসন কালের সুবর্ণ–যুগ বলা যাইতে পারে।

ঈদ—"ঈদ-উৎসব" শীর্ষক কবিতার "ঈদ" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বেদুঈন—"দুরন্ত আশা" শীর্ষক কবিতার "বেদুয়িন" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কড়ি ও কোমল—সঙ্গীতে সুরের কড়া বা উচুঁ পর্দাকে বলা হয় কড়ি এবং নীচু বা কোমল পর্দাকে বলা হয় কোমল।

প্রশ্নাবলী

১। "বাগ্‌দাদে" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে বাগ্‌দাদ নগরীর একটি বর্ণনা লিখ

২। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে বাগ্‌দাদ ও বস্‌রার পার্থক্য বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মুসলিম সভ্যতার বাসর গৃহে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু হায়, বর কন্যা কবে চলিয়া গিয়াছে, শুধু বিবাহ বাড়ীর মশালের ন্যায় এই মিনার ও গুম্বজগুলি অতীত উৎসবের চিহ্ন স্বরূপ বৃথাই দাঁড়াইয়া আছে।

(খ) বাগ্‌দাদের প্রাচীরও সুদৃঢ়। উহার অভ্যন্তরে আরবী পাগড়ীর সমারোহ নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু তুর্কী ফেযের সমারোহ এখনও আলেয়ার আলোর ন্যায় জ্বলিতেছে।

(গ) সম্মুখে ও ডানে ধূ ধূ মরুভূমি বেদুঈনের হাতের নাঙ্গা তলোয়ারের ন্যায় ঝল্‌মল্ করিতেছে।

(ঘ) কড়ি ও কোমলের মিশা–মিশি হইয়া উঠিল আরব–চরিত্র, এই কড়ি ও কোমলের মিশা–মিশিতে রচিত হইল ইসলামের গৌরব–যুগের ইতিহাস।

(ঙ) মেকিনা থেকে একেবারে বাগ্‌দাদে আসিয়া পড়িয়াছি। এ যেন শ্বশুরবাড়ী থেকে যমের মুখে।

(চ) মহান আরব তার স্বাধীনতা হারাইতে পারে, তবু আতিথেয়তা ভুলিতে পারে না।

(ছ) ইহাদের চোখের জলে রচিত হইল আমাদের "স্বখাত সলিল"। উহাতে ডুবিয়া মরা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হইল না।

www.pathagar.com

সম্বর্ধনার উত্তরে

১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর (২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল) রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলামকে স-সমারোহে সম্বর্ধনা করা হয়। বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত জলধর সেন, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর কুদরত-ই-খুদা, মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণ, রাজনীতিবিদ্গণ এবং বৈজ্ঞানিকগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নজরুল-সম্বর্ধনা-সমিতির সভাপতি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মি: এস, ওয়াজেদ আলী, বি-এ (ক্যান্টাব), বার-এট-ল, অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। অভিনন্দনপত্র পঠিত হইলে সম্বর্ধনাসভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জনতার করতালি ধ্বনির মধ্যে কবিকে সোনার দোয়াত-কলম এবং রূপার ঠোঙ্গায় (Casket-এ) অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। অতঃপর বিখ্যাত সুর-শিল্পী শ্রীযুত উমাপদ ভট্টাচার্য, শ্রীযুত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্তৃক কবির অভিনন্দনের জন্য বিশেষভাবে-রচিত একটি আবাহন সঙ্গীত গান করেন। নজরুলকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রটি এই :—

কবি নজরুল ইসলাম,

করকমলেষু—

কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙ্গালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা-সিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে—সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা-ঝোরার জল-ধারার মতো। সে স্রোতোধারায় বাঙ্গালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও।

বাংলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙ্গে সবুজ মহিমায় রাঙ্গিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছায়া বাঙ্গালীর পলক-হারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক বন্দনা গ্রহণ কর।

তুমি বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠে তেজ দিয়াছ ; মূৰ্চ্ছাতুর প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়াছে। আজ অরুণ-ঊষার তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে ;— তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির অভিবাদনে তুমি নয়ন-পাত কর।

তুমি বাংলার মধুবনের শ্যাম-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুল্‌বুলের বাণী দিয়াছ ; রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙ্গুর-লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙ্গালীর শ্যাম-কান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল শিরাযীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন-প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত-নিবেদন গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে-গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন-সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যাথা বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার—মানুষের নমস্কার।

কলিকাতা
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯।

গুণমুগ্ধ বাঙ্গালীর পক্ষে—
নজরুল-সম্বর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ।

সম্বর্ধনা-সভার সভাপতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই উপলক্ষে যে-অভিভাষণ দান করেন তাহা এই :—

"আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাংলাদেশ সম্মোহিত হইয়া আছে। তাই অন্যের প্রতিভা লোক-চক্ষে তেমন করিয়া ধরা পড়িতেছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দুইজন কবির মধ্যে সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম।

"নজরুল কবি,—প্রতিভাবান, মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের কবি-প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই ; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙ্গালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান ছিলেন ; কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালী রূপেই পাইয়াছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন।

"কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু ; কিন্তু নজরুল ইসলাম তাহা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরিয়া, বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।"

অতঃপর সভাপতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু উক্ত সভায় যে-বক্তৃতা দান করেন তাহা এই :—

"আচার্যদেব প্রায়ই অতিশয়োক্তি করিয়া থাকেন—বিশেষতঃ আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি কবি নজরুল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার একটিও ব্যর্থ অতিশয়োক্তি নহে। স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তাহা নাই। দেশ পরাধীন বলিয়া এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারেনা। নজরুলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব—কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন ; কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জ্যান্ত মানুষ।

"কারাগারে আমরা অনেকেই যাই ; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ, অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন তার

প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

"তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বে-রসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারিনা।

"নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়—এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু"র মত প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

"নজরুল হিন্দু-কবি বা মুসলমান কবি নন, বাঙ্গালীর কবি। বাংলাদেশের সভ্যতা হিন্দু বা মুসলমানের সভ্যতা নহে—সার্বজনীন সভ্যতা। কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বপ্ন।"

উপরোক্ত সম্বর্ধনা-সভায় প্রদত্ত উল্লেখিত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে নজরুল যে-ভাষণ দান করেন আলোচ্য "সম্বর্ধনার উত্তরে" শীর্ষক প্রবন্ধটি নজরুল-প্রদত্ত সেই ভাষণ। এই ভাষণটি ভাবে, ভাষায়, নবতর প্রকাশভঙ্গিমায় ও নজরুল-সাহিত্যের অন্তর্নিহীত উৎস-ধারার প্রাণদীপ্ত বিদ্যুস্ফুরণে ভাস্বর ও মহিমাময়। ইহা নজরুল-সাহিত্যের এবং সারা বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। নজরুল-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, বেগ ও আবেগ এবং গভীরতা ও ব্যাপ্তির যথার্থ সন্ধান এই রচনাটির সর্বত্র বিদ্যমান।

সারা বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ্ মনীষীবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত উপরে উদ্ধৃত অভিনন্দন-পত্র ও বক্তৃতাদি হইতেই নজরুলের সর্বতোমুখী সাহিত্য-প্রতিভা ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই সম্পর্কে "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" এবং "মিলাদ শরীফ" শীর্ষক কবিতাদ্বয়ের কাব্য পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

টীকা

নওরোয—"কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতার "নওরোয" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

শাহজাদা খুর্‌রম—মুঘল সম্রাট শাহ্‌জাহান সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে তাঁহার নাম ছিল "খুর্‌রম"। "শাহ্-জাহান" অর্থাৎ বিশ্বের অধিপতি—এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। "শাহ্‌জাদা" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : রাজপুত্র।

তাজ—আগ্রার বিশ্ব-বিখ্যাত তাজ-মহল।

যবন—গ্রীস দেশের অন্য নাম য়ুনান। "য়ুনানী" বা "যুনানী" অর্থ : গ্রীস-দেশ-বাসী বা গ্রীক। "যবন" শব্দ এই "য়ুনানী" বা "যুনানী" শব্দের অপভ্রংশ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ও তাঁহার পরবর্তী সেলুকাস প্রভৃতি গ্রীস-দেশ-বাসিগণই অর্থাৎ যুনানী "যবন"গণই সর্বপ্রথম পাক-ভারতের বুকে বৈদেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই জন্যই "যুনানী" বা "যবন"দের

www.pathagar.com

উপর পাক–ভারতীয়দের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। বিদেশী পাঠান ও মুঘলদিগকেও বৈদেশিক হিসাবে এদেশের হিন্দুগণ "যবন" বলিয়া অভিহিত করেন। পরবর্তী সময় "যবন" শব্দ ঘৃণা ও বিদ্বেষবাচক শব্দ হিসাবে "মুসলমান" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কাফের—"বিদায় হজ্জ" শীর্ষক প্রবন্ধের "কাফের" শীর্ষক টীকা এবং "মদীনা–পথিক" শীর্ষক কবিতার "কুফরী" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কীট্‌স্—তাঁহার পূর্ণ নাম : জন্ কীট্‌স্ (John Keats) তিনি ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। অপূর্ব সৌন্দর্য ও রস–মাধুর্যপূর্ণ গীতি–কবিতা রচনাই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষয়রোগ আক্রান্ত হইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি ইটালি গমন করেন এবং মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে পরলোকগত হন। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনেই সৌন্দর্য–পূজারী এই অপূর্ব প্রতিভাবান কবি তাঁহার গীতি–কবিতা ও সনেট বা চতুর্দশ–পদী কবিতার মাধুরী ধারায় মানুষের হৃদয় জয় করিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। "সম্বর্ধনার উত্তরে" শীর্ষক রচনাটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) এক–বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে?

(খ) আমার হৃদয়–ঘট যে ভরে উঠল। নদীর জল মঙ্গল–অভিষেকের ঘরে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে।

(গ) আজ আমার ভাষা শুভ–দৃষ্টির বধূর মত লাজ–কুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা।

(ঘ) ফুল ফুটানোর চেয়ে হুল ফুটানোতেই যাদের আনন্দ।

(ঙ) পানসে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো।

(চ) বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না।

(ছ) আমাকে বড় বলার বড় বলি করবেন না।

(জ) প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে যথেষ্ট লজ্জা দিচ্ছেন।

(ঝ) তাড়া যারা খেয়েছে, আমারো অনেক আগে থেকে মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে।

(ঞ) যে–উচ্চ গিরি–শিখরের পলাতকা সাগর–সন্ধানী জল–স্রোত আমি সেই গিরি–শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি; যেন মরু–পথে পথ না হারাই।

(ট) বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

(ঠ) আমি জানি, এই পথ–যাত্রার পাকে–পাকে, বাঁকে–বাঁকে কুটিল–ফণা, প্রখর–দর্শন শার্দূল, পশু রাজের ভ্রুকুটি। এবং তাদের নখর–দর্শনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে–অঙ্গে।

www.pathagar.com

(ড) ঈশান কোণের যে-কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-শীতল প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী-যে-দিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব পরিচয় নিয়ে।

(ঢ) যারা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁহাদের মত হলুমনা বলে,—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন।

(ণ) বনের পাখী নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনদিন অনুযোগ করেনা।

(ত) আম গাছকে চৌমাথার দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠ্যাঙ্গান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবেনা।

(থ) যৌবনের রক্তশিখ মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে-বরযাত্রী ... আমিও আছি তাঁদের দলে ; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে।

(দ) আমি আমার সুন্দরের হাতে শুধু বাঁশীই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি।

(ধ) এ যদি বেদনা সাগর-মন্থনের হলাহলই হয়, তাহলে ঐ সমুদ্র মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের।

দুরন্ত পথিক

এই প্রবন্ধটি নজরুল ইসলাম রচিত রচনাবলী হইতে সংকলিত। ইহা একটি কথিকা। রূপক কিংবা ইঙ্গিতের অন্তরালে মূল-বক্তব্য প্রকাশই এই শ্রেণীর রচনার উদ্দেশ্য। এইরূপ রচনার সফল রূপায়ণের জন্য আবেগময়, ভাব-তন্ময় ভাষা একান্ত অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে সে গুণ বিদ্যমান। মুক্তি-পথ-যাত্রীদের যাত্রা-পথ চিরন্তনকাল হতেই সংকট-সংকুল ও মৃত্যু-বিভীষিকাপূর্ণ অথচ ইহাদেরই উৎসর্গিকৃত প্রাণরশ্মির আলোর পরশে মৃতজাতি আবার সজীবিত হইয়া উঠে। অত্যাচারীর খড়গাঘাতে এই মুক্তি-পাগলদের জীবন-প্রদীপ যদি নিভিয়াও যায়, তাহা হইলেও তাঁহাদের সে-মৃত্যু দৈহিক মৃত্যু বা দেহের বিনাশ মাত্র। আত্মা ও আদর্শের ক্ষেত্রে তাঁহারা অবিনাশী—চির অমর। আর মৃত্যুর ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা ও পদ-দলিত করিয়া, অথবা অচলায়তনকে ডিঙ্গাইয়া একমাত্র আদর্শবাদী নব যৌবনই এই দুরন্ত পথের পথিক হইতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধের ইহাই মূল-বক্তব্য।

প্রশ্নাবলী

১। "দুরন্ত পথিক" শীর্ষক প্রবন্ধের সারমর্ম তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের আদর্শগত শিক্ষা কি, তাহা বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) দূরের দিগ্বলয় তাহাকে মুক্তির সীমা-রেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল।

www.pathagar.com

(খ) ওত মরণ নয়, জীবনের আরম্ভ।

(গ) আমার মৃত্যুতেই ত আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীদল, ওদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকব।

(ঘ) নিজে মরিয়া অন্যকে জাগানোতেই তোমার মৃত্যু চির-জাগ্রত, অমর।

চিত্রকলা

এই রচনাটি অধ্যাপক আবুল ফজল-রচিত "বিচিত্র কথা" নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। আবুল ফজল একজন দক্ষ কথা-শিল্পী ও প্রবন্ধকার। ভাব ও চিন্তা ধারায় তাঁহাকে অত্যাধুনিক বলিলে অত্যোক্তি হয় না। শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পরিমার্জিত কথ্য-ভাষাই তাঁহার সাহিত্যের বাহন। তাঁহার সংলাপ ও বাক্য-গঠন-রীতি আধুনিক রুচি ও রচনা-শৈলী সম্মত এবং ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পাক-ভারত—বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতির পথে চারুকলার স্থান যে অতি উচ্চ—একথা আজ অনস্বীকার্য। সাহিত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে সমপদ-বিক্ষেপে চারুকলা বা চিত্রকলার অগ্রগতিও সমষ্টিগত জাতীয় অগ্রগতির অপরিহার্য অঙ্গ—এ সত্য সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু এদেশে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। বাংলা-সাহিত্য আজ শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত এবং এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই বাংলা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকবৃন্দ সম্পর্কে অল্পাধিক ওয়াকেবহাল। কিন্তু আধুনিক পাক-ভারতীয় ও বাংলার চিত্রকলা অগ্রগতি লাভ করিলেও সে তুলনায় তেমন উন্নত স্থান অধিকার করিতে পারে নাই এবং সামগ্রীকভাবে এদেশের শিক্ষিত সমাজও দেশীয় চিত্রকলা ও চিত্র-শিল্পীদের সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ। আলোচ্য রচনায় প্রবন্ধকার উক্ত অজ্ঞতার কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন।

টীকা

বিশ্ব-ভারতী--রবীন্দ্র ঠাকুর-পরিকল্পিত একটি বিশিষ্ট আদর্শ অনুসারে, তদকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ব-বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ; বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম জেলার বোলপুর নামক স্থানে ইহা স্থাপিত। এখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য এবং চিত্রকলা ও অন্যান্য চারুশিল্প শিক্ষাদানের অত্যোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বহু ছাত্র-ছাত্রী এখানে শিক্ষা-লাভের জন্য আগমন করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০০-১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহাকেই বিশ্ব-ভারতীতে পরিণত করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ভারত-বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু তাঁহাদের সারাজীবন এই বিশ্ব-ভারতীর শিক্ষাদানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

রাফেল (Rapael)—তাঁহার পূর্ণ ইটালীয় নাম : রাফায়েলো সেন্টি (Raffaello Santi) বা রাফায়েলো সেঞ্জিও (Raffaello Sanzio)। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রকর। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইটালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরদের তিনি অন্যতম। তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্র সারা জগতের চারুকলা-শিল্পের অমূল্য সম্পদ। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে তিনি পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

দাভিঞ্চি—তাঁহার পূর্ণ নাম : লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci)। তিনি ইটালীয় বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী। রেনেসাঁ যুগের চিত্র-শিল্পের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। প্যারিসের লুভার-চিত্রশালায় রক্ষিত যীশু-জননী মেরীর মাতৃ-মূর্তী বিশ্ব-বিখ্যাত "মেডোনা" (Maddona) তাঁহারই অঙ্কিত। প্যারিসের লুভার এবং লন্ডনের নেশন্যাল গ্যালারী নামক বিখ্যাত চিত্রশালাগুলিতে তাঁহার অঙ্কিত আরও কতিপয় অমূল্য চিত্র-সম্পদ রক্ষিত আছে। লুভারে রক্ষিত অপূর্ব ছবি "মোনালিসা" (Mona Lisa) তন্মধ্যে অন্যতম। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পোপ দশম লিও-র অধীনে চিত্রাঙ্কনের কার্য সম্পাদন করেন। অতঃপর প্রথম ফ্রান্সিস্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি ফরাসী দেশে গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ সেখানেই গবেষণা কার্যে নিরত থাকেন। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন।

অবনীন্দ্রনাথ—তাঁহার পূর্ণ নাম : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে-স্থান, পাক-ভারতীয় চিত্রকলা ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের ঠিক সেই স্থান। অবনীন্দ্রনাথ নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু। অজন্তা চিত্রকলা, রাজপুত-চিত্রকলা, মুঘল-চিত্রকলা এবং বাংলার পট-চিত্রকলা—প্রধানতঃ এই চার রীতি অনুসারে অঙ্কিত চিত্রকলাকেই পাক-ভারতীয় চিত্রকলা বলা হয়। অবনীন্দ্রনাথ এই পাক-ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে পারসীক, চৈনীক ও ইউরোপীয় চিত্রকলার সমন্বয় সাধন করিয়া নব্য ভারতীয় বা নব্য পাক-ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব সুষমাময় অঙ্কন-রীতির উদ্ভাবন করেন এবং বিশ্বের চারুশিল্পক্ষেত্রে ইহাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতা আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি বিশ্ব-ভারতীর ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া যান।

নন্দলাল—পূর্ণ নাম : নন্দলাল বসু। তিনি পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য। তিনি সারাজীবন বিশ্ব-ভারতী কলা-ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে সেই পদ হইতে বার্ধক্য বশতঃ তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নব্য পাক-ভারতীয় শিল্পকলা-রীতির প্রচার, প্রসার, উৎকর্ষসাধন ও স্থায়িত্ব দানে তাঁহার দান সর্বাপেক্ষা অধিক।

দেবী প্রসাদ—পূর্ণ নাম : দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী। অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত নব্য পাক-ভারতীয় শিল্পকলা-রীতির একজন বিখ্যাত শিল্পী। শুধু চিত্র-শিল্পীই নহেন, তিনি একজন প্রথিতযশা ভাস্কর বলিয়াও পরিচিত। তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে সেই পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

অসিত কুমার—পূর্ণ নাম : অসিত কুমার হালদার। তিনিও নব্য পাক-ভারতীয় চিত্রকলা-পন্থী একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী। লক্ষ্ণৌ "গভর্ণমেন্ট স্কুল অব্ আর্টস্ এন্ড ক্র্যাফ্ট্স"-এর তিনি তাঁহার প্রায় সারা জীবন-ব্যাপী অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

মুকুল দে—তিনি লন্ডনের "রয়েল কলেজ অব্ আর্টস্"-এ চিত্র-শিল্প সম্পর্কে উচ্চতম শিক্ষালাভ করিয়া তথা হইতে A.R.C.A. উপাধি লাভ করেন। পাক-ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বোধহয় সর্বপ্রথম এই উপাধি অর্জনে সমর্থ হন। তিনি "এচিং" অর্থাৎ ধাতু নির্মিত পাতে হস্তাঙ্কিত চিত্র-শিল্পে বিশেষ পারদর্শী। বহু বৎসর পর্যন্ত তিনি কলিকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বর্তমানে তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিতেছেন।

www.pathagar.com

উকিল ভ্রাতৃদ্বয়—সারদা উকিল ও রণদা উকিল—এই দুই সহোদর ভ্রাতা। উভয়েই নব্য পাক-ভারতীয় শিল্প-কলা-পদ্ধতির প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী। ইহারা বাঙ্গালী হইলেও তাহাদের কর্ম-ক্ষেত্র দিল্লীতেই অবস্থিত। দিল্লীর বিখ্যাত "উকিল স্কুল অব্ আর্টস্" সারদা উকিল কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে সারদা উকিল পরলোকগত।

আবদুর রহমান চুঘ্‌তাই—আবদুর রহমান চুঘ্‌তাই পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদের অন্যতম। তিনি যদিও নব্য পাক-ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতির একজন বিখ্যাত শিল্পী, তথাপি তাঁহাকে প্রধানতঃ আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পের পুরাতন অঙ্কন-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও সুনিপুণ ধারার প্রধান প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় হয় না। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে ইরানী চিত্রকলার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উর্দু-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন কবি গালিব ও ইকবালের কাব্যরূপকে চিত্র-রূপ দান চিত্র-ক্ষেত্রে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গালিবের বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ "দিওয়ান-ই-গালিব"-এর চিত্র-সংস্করণ "মুরাক্কা-ই-চুঘ্‌তাই" নামে প্রকাশ করেন।

বহু চিত্র-শিল্পী ও স্থাপত্য-শিল্পীদের আবির্ভাবে সমৃদ্ধ এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে আবদুর রহমান চুঘ্‌তাই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মুঘল আমলের প্রখ্যাতনামা শিল্পীদের কয়েক জনই এই বংশোদ্ভব। চুঘ্‌তাই-এর পিতা তাঁহাকে ইঞ্জিনিয়ার করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু ২১ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার স্থপতি-বিদ্যাবিশারদ পিতৃব্যের নিকট হইতে চিত্র-বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রধানতঃ স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলেই চিত্র-শিল্পে তাঁহার বর্তমান উন্নত স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল তিনি লাহোরের "মেও স্কুল অব্ আর্ট" নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি এদেশের জীবিত শ্রেষ্ঠতম শিল্পীগণের অন্যতম।

হলিউড—উত্তর আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম "সিনেমা ষ্টুডিও" বা ছায়াচিত্র-নির্মাণাগার প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর বিখ্যাত ছায়াচিত্র-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এখানে সর্বদাই বিপুল সমাবেশ হইয়া থাকে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ—বাংলা সাহিত্য, চারুকলা ও সংস্কৃতি ইত্যাদির উন্নতির জন্য গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্ব শাখার অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক ও হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি এখানে সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অনেক পুস্তক এখান হইতে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি—এসিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও শিল্পকলা প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য প্রধানতঃ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ইংরাজ আমলে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ভাষার বহু দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পুঁথি-পুস্তক ও হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি এখানে সংরক্ষিত এবং বহুমনীষী ব্যক্তি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এখানে সর্বদা গবেষণারত।

প্রশ্নাবলী

১। আমাদের দেশে মোটামুটি চিত্রকলার প্রসার ও অবস্থা কিরূপ, "চিত্রকলা" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

২। আমাদের দেশে চিত্রকলার যথার্থ মর্যাদা ও প্রসার ব্যাপক না হওয়ার কারণ, আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে প্রদর্শন কর এবং তাহার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর।

www.pathagar.com

৩। আমাদের দেশে সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যে জন-চিত্ত-আকর্ষণ ব্যাপারে কোনরূপ পার্থক্য আছে কিনা এবং থাকিয়া থাকিলে তাহা কি এবং কেন—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহার ব্যাখ্যা কর।

৪। টীকা লিখ :—

হলিউড ; আবদুর রহমান চুঘ্‌তাই ; অবনীন্দ্রনাথ ; রাফেল ; দাভিঞ্চি ; নন্দলাল ; উকিল ভ্রাতৃদ্বয় ; বিশ্ব-ভারতী ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ।

মৌখিক বাংলা সাহিত্য

এই রচনাটি অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-রচিত প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত। মনসুর উদ্দীন সাহেব বাংলার পল্লী-গীতি ও পল্লী-সাহিত্য সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার দ্বারা, সংগৃহীত ও সংকলিত "হারামণি" প্রমুখ পল্লী-গীতি-গ্রন্থ পল্লী-সাহিত্যের সম্পদ এবং পল্লী-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার জীবন-ব্যাপী ব্যাপক গবেষণা ও সাধনার পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও দান উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত কথ্য-ভাষাই প্রধানতঃ তাহার সাহিত্যের বাহন। তাঁহার ভাষা সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পল্লী-সাহিত্য সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন। পল্লী-সাহিত্য সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের দ্বারাই রচিত ও পরিবেশিত। এই জন্য এই সাহিত্য পুঁথি-পুস্তকে লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না—লোকের মুখে-মুখেই ইহার প্রচলন ছিল। প্রবন্ধকার এই কারণেই বাংলার পল্লী-সাহিত্যকে "মৌখিক বাংলা সাহিত্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

টীকা

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ—সংস্কৃত ভাষার সুপ্রাচীন ব্যাকরণ। বোপদেব নামক একজন অধ্যবসায়শীল ও বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক ইহা রচিত। সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি গঠন, শব্দ ও ভাষা-বিন্যাস এবং তাহার প্রকৃতি ও আকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কিত আলোচনা ও তদসম্পর্কিত নিয়ম-পদ্ধতি ও সূত্রাদি এই ব্যাকরণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বেদ--হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্ম-গ্রন্থ। বেদ চারি প্রকার—সাম, ঋক্, যজু ও অথর্ব। প্রথমে তিনি বেদ ছিল। তাহাকে ত্রয়ী বলা হইত। অথর্ববেদ আসে অনেক পরে।

হাদিস্—আরবী শব্দ ; শব্দার্থ : সংবাদ ; সমাচার ; ইতিবৃত্ত। প্রচলিত অর্থ : ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদের (দ:) বাণী এবং তদকর্তৃক কৃত, আদিষ্ট ও সমর্থিত কার্যাবলীর বিবরণকে হাদিস্ বলা হয়। ইসলাম ধর্মে কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান এবং ইসলাম ধর্মের প্রচলিত বিধি-বিধান এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী এবং যুদ্ধ ও সন্ধি, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কিত সমস্ত আইন-কানুন প্রধানতঃ কুরআন ও হাদিস্ অনুসারেই রচিত।

শ্রুতি—বেদের অপর নাম শ্রুতি।

স্মৃতি—মনু প্রভৃতি কর্তৃক রচিত ধর্মগ্রন্থাদিকে স্মৃতি বলা হয় ; ধর্ম-সংহিতা ; বেদে যাহা আছে তাহার সারমর্ম স্মরণ রাখিয়া মন্বাদি কৃত ধর্ম-গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে স্মৃতি বলা হয়।

www.pathagar.com

রমা রোঁলা (Romain Rolland)—সাহিত্যে নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুস্তক দশ খণ্ডে লিখিত "জাঁ ক্রিস্তোফ" (Jean Christophe) নামক উপন্যাস। এতদ্ব্যতীত তিনি জার্মাণ সুর-স্রষ্টা বেথোভেন, ইটালীয় চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো, রুশ সাহিত্যিক টলষ্টয় এবং ভারতীয় রাজনীতিবিদ মহাত্মা গান্ধীর জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী চিন্তানায়ক। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

এডিসন—বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ প্রবন্ধকার ও কবি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রমা রোঁলার ন্যায় দীর্ঘজীবী হইয়া বার্ধক্য-জীবন যাপন করেন নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ও রমা রোঁলার নামের সঙ্গে একত্রে উল্লেখিত "এডিসন" তাঁহাদের মত বিশ্ব-বিখ্যাত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ সেই এডিসনকে বুড়া হইতে হইবে। কারণ আলোচ্য প্রবন্ধে বিখ্যাত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উদাহরণ স্বরূপই এই নামগুলির উল্লেখিত হইয়াছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক "এডিসন"ই এইরূপ বৃদ্ধ অথচ বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ণনাম টমাস আল্‌ভা এডিসন (Thomas Alva Edison)। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান যুক্ত-রাষ্ট্রের ওহিও রাষ্ট্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১২ সপ্তাহ কাল এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষাই তাহার স্কুল জীবনের বিদ্যালাভ। তিনি আপন চেষ্টা ও সাধনায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারদের অন্যতম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। গ্রামোফোন, বিদ্যুতের ব্যবহার ও বিদ্যুৎ-বাতির আবিষ্কার, বিদ্যুৎচালিত পরীক্ষামূলক প্রথম রেল-লাইন নির্মাণ ও পরিচালন স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন রিসিভার প্রভৃতি মানব-সভ্যতার আধুনিক দ্রুত অগ্রগতির সহায়ক তের শতেরও উপর আবিষ্কার তাঁহার দ্বারা সাধিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ—পরিশিষ্টাংশের "সংক্ষিপ্ত জীবনী" অংশে রবীন্দ্রনাথের জীবনী এবং "বর্ষ-শেষ" শীর্ষক কবিতা এবং "আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধের, যথাক্রমে, কাব্য-পরিচিতি ও প্রবন্ধ-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। মৌখিক বাংলা ভাষার স্থান সাহিত্যের কোন্ পর্যায়ে, উক্ত নামীয় প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

২। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আরবী ও ফার্সী ভাষার সম্পর্ক কি এবং কেন—আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মগজ হল মানুষের চিন্তার কারখানা। মগজের সাথে মানুষের যে লেনা-দেনা, তা আদিমকালের মত এখনও দেদার চলছে।

(খ) দেশের উন্নতির জন্য যেমন আমরা দিল্লী না গিয়ে পল্লীতে যাব, তেমনি সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আমাদিগকে ধ্বংসোন্মুখ পল্লীতে যেতে হবে।

৪। টীকা লিখ :—

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ; রমা রোঁলা ; এডিসন ; হাদিস্ ; বেদ।

www.pathagar.com

হারানো সুর

এই রচনাটি মোহাম্মদ কাসেম-রচিত গল্প সমষ্টি হইতে সংকলিত। মোহাম্মদ কাসেম একজন প্রবীন ও শক্তিশালী উপন্যাসিক ও গল্প-লেখক। তাঁহার রচিত উপন্যাস ও গল্প-সমষ্টি সংখ্যার দিক দিয়া খুব বহুল না হইলেও গুণে অর্থাৎ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হিসাবে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার রচনা সুনির্বাচিত, সুপ্রযুক্ত ও ভাব-গম্ভীর শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ। তাঁহার ভাষা সাবলীল এবং সংলাপ তীক্ষ্ণ ও বাহুল্য-বর্জিত।

আলোচ্য রচনাটি একটি ছোট গল্প ; পুত্র-হারা পিতার গভীর বেদনার রূপায়ণই এই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রশ্নাবলী

"হারানো সুর" শীর্ষক গল্পের মূল-বক্তব্য তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। —কেটে গেছে স্নেহময় প্রভাত, বৈরাগ্যময় দুপুর আর স্বপ্নময় রাত্রি।

(খ) ক্লান্ত, কাতর দুটি চোখে অসীম শূন্যতা—ওতে নেই প্রান্তরের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত।

(গ) হামিদা আজ বোল্-হারা বাঁশীর মতো বোবা।

নরসুন্দর

এই রচনাটি অধ্যাপক নূরুল মোমেন রচিত প্রবন্ধাবলী হইতে সংকলিত। নূরুল মোমেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক। নাটক, শিশু-কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, যেখানেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার মনন-শীলতা ও সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও রচনা-রীতি অত্যাধুনিক রচনা-শৈলী অভিসারী এবং অত্যন্ত সরল ও তীক্ষ্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধটি একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সামান্য ঘটনা এবং নগণ্য বিষয় ও শক্তিশালী লেখনীর মুখে কিরূপ সৌন্দর্য-সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে, এই প্রবন্ধটি তাহার একটি নিদর্শন। এই রচনাটি লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও লোক-চরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

টীকা

ওলনের দড়ি—শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

সোয়েডের জুতা—একপ্রকার বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে পাকা-করা চর্মকে "সোয়েড্" বলা হয়। এই জাতীয় চর্ম প্রকৃতপক্ষে মোলায়েম হইলেও ইহার উপরিভাগ দেখিতে অনেকটা কর্কশ, অমসৃণ ও ঘষা জিনিষের মত। এই জাতীয় চর্ম বেশ একটু দামী। এই সোয়েড্ জাতীয় চর্ম দ্বারা তৈয়ারী জুতাকে সোয়েডের জুতা বলা হয়।

www.pathagar.com

দশআনা-ছয়আনা কাট্—সম্মুখের দিকে লম্বা এবং ঘাড়ের দিকে ছোট—এই জাতীয় চুল-ছাঁটাই অর্থাৎ চুলের—এল্‌বার্ট কাট্" কে এখানে "দশআনা-ছয়আনা কাট্" বলা হইয়াছে। **হদিস**—আরবী "হাদিস্" শব্দের অপভ্রংশ। "হাদিস্" শব্দের শাব্দিক অর্থ : সংবাদ ; সমাচার ; ইতিবৃত্ত। [" মৌখিক বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধের "হাদিস্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **গুল**—(Scandal) ইংরাজী শব্দ ; অর্থ : কেলেঙ্কারি ; দুর্নাম ; অপযশ, কুৎসা।

প্রশ্নাবলী

১। "নরসুন্দর" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে নাপিতের চতুরতার কারণ বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) আপনাদের মধ্যে যাঁর টাকা আছে তাঁর গোমর ঢাকতে লোকের অভাব হয় না ; কিন্তু যার টাক আছে তার নাপিত ছাড়া উপায় নেই।

(খ) নাপিতের মারফত স্তব বেয়ে-বেয়ে কথার ও স্কেণ্ডেলের আনাগোনা চলে।

৩। টীকা লিখ :—

সোয়েডের জুতা ; ওলনের দড়ি ; হদিস ; দশআনা-ছয়আনা কাট্।

সাহিত্যিক রোকেয়া

এই প্রবন্ধটি বেগম শামসুন্ নাহার-রচিত "রোকেয়া জীবনী" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বেগম শামসুন্ নাহার বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিকদের অন্যতমা। প্রবন্ধ-সাহিত্যক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ ও মার্জিত।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজ-সেবিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বা মিসেস আর, এস, হোসেনের আদর্শময় কর্ম-বহুল জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার সত্যিকার প্রতিভা কোথায় তাহা উজ্জ্বলভাবে লোক-চক্ষুর সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাংলার নারী জাতি—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলিম নারিগণ বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিয়া জীবন-ক্ষেত্রে যথার্থ সাফল্য অর্জন করুক—এবং দেশের পুরুষ সমাজও বেগম রোকেয়ার জীবনালোচনা হইতে নারী ও নারীত্বের মর্যাদা ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া নিজ মাতা-কন্যা ও ভগ্নীদিগকে সেই জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করুক এবং ব্যাপকতর নারী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হোক—আলোচ্য প্রবন্ধ রচনার বোধ হয় ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

টীকা

কার্সিয়াং—দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দার্জিলিং জেলায় হিমালয়ের একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাস।

মধুপুর—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কাঠ-মোল্লা—"মোল্লা" আরবী শব্দ : শুদ্ধ উচ্চারণ "মুল্লা" ; অর্থ : ধর্মশাস্ত্র-অভিজ্ঞ ধর্ম-ভীরু ব্যক্তি। এখানে "কাঠ" শব্দ হিন্দী "কট্টর" শব্দের অপভ্রংশ। "কট্টর" শব্দের অর্থ :

www.pathagar.com

অত্যন্ত গোঁড়া ; যুক্তিহীনভাবে গোঁড়া। কাজেই "কাঠ-মোল্লা"র অর্থ : প্রকৃত ধর্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এবং লোক দেখানো বাহ্যিক ধর্ম-ভীরুতা সম্পন্ন যুক্তিহীন গোঁড়া ব্যক্তি।

প্রশ্নাবলী

১। "সাহিত্যিক রোকেয়া" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে রোকেয়া-রচিত সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বর্ণনা কর।

২। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে রোকেয়ার সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কিত প্রচেষ্টার কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। আলোচ্য প্রবন্ধের অনুসরণে "সাহিত্যিক রোকেয়া" ও "সমাজ-সেবিকা রোকেয়া"র তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪। টীকা লিখ : —
কাঠ-মোল্লা।

পাকিস্তানের দার্শনিক পটভূমি

এই প্রবন্ধটি মুজিবুর রহমান খাঁ-রচিত "পাকিস্তান" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। মুজিবর রহমান খাঁ বাংলার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিকগণের অন্যতম। তিনি সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে সংবাদপত্র সেবায়ও নিয়োজিত আছেন বলিয়া তাঁহার রচিত সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্য-সমাবেশ ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের প্রসার ও পরিধি ব্যাপকতর। তাঁহার ভাষা পরিমার্জিত এবং ক্লাসিক রীতির সঙ্গে আধুনিক ভাষা-ভঙ্গীর সমন্বয়ে মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। আলোচ্য প্রবন্ধটি তাহার একটি নিদর্শন। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হইল এই—মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় যত কিছু পরিবর্তন ও উন্নতি, তাহার মূলীভূত কারণ হইল মানুষের চিন্তাধারা ; আর সেই চিন্তাধারারই স্থায়ী রূপায়ণ হইল সাহিত্য। সুতরাং মানব জীবনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যত কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, সমস্ত কিছুই এই সাহিত্যের পটভূমির উপর ছায়া-চিত্রের চিত্র পরিবর্তনের মত নিত্যকাল ধরিয়া পট পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছে। প্লেটো হইতে ভল্টেয়ার, ভার্জিল হইতে ফিরদৌসী আর বঙ্কিম হইতে ইকবাল—এ কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান স্বপ্নের আজিকার এই বাস্তবায়ন, সেই সাহিত্য-বাহিত চিন্তা-সায়রেরই একটি তরঙ্গাভিঘাত ছাড়া আর কিছুই নহে। মানব-সৃষ্টির বিগত অনাদিকাল যাবত ইহাই চলিয়া আসিয়াছে এবং মানব-জীবনের অনাগত মহাকাল ধরিয়া ইহাই চলিতে থাকিবে এবং বর্তমানেও ইহাই চলিতেছে—আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের ইহাই সারমর্ম।

টীকা

হালি—অন্য বানান : হালী। এই পুস্তকের "আলতাফ্ হুসাইন হালী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ফিরদৌসী—"গযনীর রাজ্যোদ্যানে ফিরদৌসীর প্রবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধের "ফিরদৌসী" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

শাহনামা—উপরে উল্লেখিত "ফিরদৌসী" টীকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হাদিস—"মৌখিক বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধের "হাদিস" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিম--এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে "সংক্ষিপ্ত জীবনী" এবং "সমুদ্রতটে" শীর্ষক প্রবন্ধের "প্রবন্ধ পরিচিতি" দ্রষ্টব্য।

আনন্দমঠ, রাজসিংহ, দুর্গেশ-নন্দিনী, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম। তন্মধ্যে "আনন্দমঠ" রাজনৈতিক বিপ্লববাদমূলক উপন্যাস এবং এই পুস্তকেই বঙ্কিমের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত এবং বর্তমানে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত সন্নিবেশিত।

ইকবাল—"নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের "ইকবাল" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

শেক্‌ওয়া জওয়াবে শেক্‌ওয়া, আস্‌রারে খুদী—মহাকবি ইকবাল-রচিত তিনটি বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ। "শেক্‌ওয়া" এবং "জওয়াবে শেক্‌ওয়া" উর্দু ভাষায় এবং "আস্‌রারে খুদী" ফার্সী ভাষায় রচিত।

রুশো—তাঁহার পূর্ণ নাম : জাঁ জক্‌ রুশো (Jcan Jacques Rousseau)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। ফলে তাঁহাকে প্যারিস ও জেনেভা উভয় স্থানেই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী অত্যন্ত মূল্যবান। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা-জগতে রুশোর দানই বোধ হয় সর্বাধিক। ফরাসী বিপ্লবের বাণী—স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity)—তাঁহার এবং ফ্রান্সের অন্যতম চিন্তাবীর ভল্টেয়ারের লেখায়ই রূপলাভ করিয়া ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড দাবানল সৃষ্টি করে বলিয়া ঐতিহাসিকদের ধারণা। তাঁহার বিখ্যাত আত্মচরিত কন্‌ফেসন্‌স্‌ (Confessions) সারা বিশ্বের আত্মচরিত-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

তুর্গেনিভ—তাঁহার পূর্ণ নাম : ইভান সিরগাউভিচ্‌ তুর্গেনিয়েভ (Ivan Sergeyevich Turgenev)। তিনি বিখ্যাত রুশ গ্রন্থকার। তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাসাবলী প্রধানতঃ সামাজিক সমস্যা লইয়াই রচিত। কৃষকদের জীবন লইয়া তাঁহার বিখ্যাত গল্প সমষ্টি "স্পোর্টস্‌মেন্‌স্‌ স্কেচেস" (Sportsman's Sketches) কৃষি-গুলামী প্রথার ভিত্তি-মূল টলাইয়া দেয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার অপূর্ব উপন্যাসমালা "এ নেষ্ট অব্‌ জেন্টল ফক্‌" (A Nest of Gentle Folk), "রুডিন" (Rudin), এবং "ফাদার্স এণ্ড সান্‌স্‌" (Fathers and Sons) রচিত। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বিদেশেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার শেষ রচনা "স্মোক্‌" (Smoke) এবং "ভার্জিন সয়েল" (Virgin Soil) যথাক্রমে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

গর্কী--তাঁহার ছদ্ম নাম : গর্কী বা মেক্সিম গর্কী (Maxim Gorki)। তাঁহার আসল নাম : এলেক্‌সি মেক্সিমোভিচ্‌ পিয়েস্‌খভ (Aleksey Maximovich Pyeskhov)। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত রুশ গ্রন্থকার। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বহু বৎসর পর্যন্ত ভবঘুরের জীবন যাপন করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে সাম্যবাদ-পন্থী ছিলেন বলিয়া সমাজের বঞ্চিত ও নির্যাতিত হতভাগ্যদের প্রতি তাঁহার গভীর দরদ-বোধ ছিল এবং এজন্য তাঁহার গল্প-উপন্যাসগুলিতে তিনি ইহাদের বাস্তব জীবন-চিত্র অঙ্কনে সচেষ্ট হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বহু বৎসর পর্যন্ত

www.pathagar.com

বিদেশে অবস্থান করিয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার স্বদেশ তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে। তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে "টুয়েন্টি সিক্স মেন্ এন্ড্ এ গার্ল" (Twenty-six Men and a Girl), "চেলকাশ্" (Chelkash), এবং "মালভা" (Malva), উপন্যাসগুলির মধ্যে "ফোমা গর্ডেএভ" (Foma Gordeyev) ও "মাদার" (Mother) ; এবং নাটকের মধ্যে "লোয়ার ডেপ্থ্স" (Lower Depths) বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্লেটো—গ্রীক দার্শনিক এবং সর্বদেশের ও সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা-বীর। খৃষ্টপূর্ব ৪২৮ কিংবা ৪২৭ সালে তিনি এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম : (Aristocles) এরিষ্টোকল্স। বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রীক দার্শনীক সক্রেটিসের (Socretes) তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত "একাডেমী" (Academy) এথেন্স নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহু জ্ঞানার্থীকে সেখানে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। এই একাডেমী পরিচালনা ব্যাপারে গ্রীসের ও সারা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরিষ্টটল্ (Aristotle) তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত পুস্তক "ডায়ালগস্"-এ (Dialogues) তাঁহার দার্শনিক মতবাদগুলি লিপিবদ্ধ। ভাষার লালিত্য এবং ভাব ও চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতার জন্য এইগুলি সারা বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। খৃষ্টপূর্ব ৩৪৮ কিংবা ৩৪৭ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

ভল্টেয়ার—"অধ্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধের "ভল্টেয়ার" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

টলষ্টয়—তাঁহার পূর্ণ নাম : লিও টলষ্টয় (Leo Tolstoy) ; রুশীয় নাম : লেভ্ নিকোলেয়েভিচ্ টল্‌ষ্টয়্ (Lev Nikolayevich Tolstoi)। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত রুশ উপন্যাসিক ও দার্শনিক। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রুশিয়ার অন্তর্গত ইয়াস্নায়া পলিয়ানা (Yasnaya Polyana) নামক স্থানে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি তদানীন্তন অন্যান্য রুশদেশীয় অভিজাত সন্তানদের মত সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপে বিলাসী জীবন যাপন করেন। কিন্তু জীবনে পরিবর্তন আসায় সাহিত্য-সেবা, সমাজ-সংস্কার ও মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি "দি কসাক" (The Cassac) ; "যুদ্ধ ও শান্তি" (War and Peace) ; "আনা কেরেনিনা" (Anna Karenina) প্রভৃতি সাত-আটটি উপন্যাস ; কয়েকটি নাটক ; কয়েক খণ্ডে রচিত আত্মচরিত ও অন্যান্য পুস্তকাদি রচনা করেন। তাঁহার "যুদ্ধ ও শান্তি" নামক উপন্যাসটি অনেকের মতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গান্ধীজি কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবর্তিত অহিংস-নীতি (Non-violence) টলষ্টয়ই সর্বপ্রথম সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য প্রচার করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন।

সুরেন্দ্রনাথ—তাঁহার পূর্ণ নাম : সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি। তিনি ভারত-বিখ্যাত একজন উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারাজীবন পাক-ভারতের নিয়মতান্ত্রীক শাসন-সংস্কারের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে লড়াই করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক "বেঙ্গলী"র তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে দুই বঙ্গ একত্রিকরণের জন্য তিনি প্রবল আন্দোলন করেন। ঐ আন্দোলনই "বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন" নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরিত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

তিলক—তাঁহার পূর্ণ নাম : বাল গঙ্গাধর তিলক। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা, বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এবং গ্রন্থকার ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বরাজ আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং দেশে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃজনে তাঁহার দান যথেষ্ট। "মারহাট্টা" এবং "কেশরী" নামক দুইটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ—তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তেলিরবাগ নামক গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক নিবাস। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে নেতৃত্ব দানের জন্য ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিপুল আয়ের ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন। গান্ধীজির সহিত একমত হইতে না

পারিয়া বাংলার আইন-পরিষদ অধিকার করিবার জন্য ১৯২৩ সালে তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। ১৯২২ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরিত হন। ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র রূপে নির্বাচিত হন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দার্জিলিং-এ পরলোকগমন করেন।

লালা লাজপত রায়—তিনি বিখ্যাত ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জাগরাওন নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের অন্যতম জাতীয় নেতা হিসাবে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডবাসীদের নিকট ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করিয়া বেড়ান। তিনি আর্য-সমাজের নেতা ও লাহোরের এঙ্গলো-বেদিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরিত হন। তিনি কয়েকটি মূল্যবান রাজনৈতিক গ্রন্থেরও লেখক। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

মওলানা মুহম্মদ আলী—পুরুষ সিংহ মওলানা মুহম্মদ আলী স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য সর্বত্যাগী ভারতীয় মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। ইংরাজের শাসন-কর্তৃত্ব হইতে মুক্তি লাভের সর্বপ্রথম পাক-ভারতীয় সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় সময় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মওলানা মুহম্মদ আলী বর্তমান ভারতের উত্তর-প্রদেশের অন্তর্গত রামপুর নামক এক করদ মুসলমান রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আবদুল আলী খান রামপুরের নওয়াবের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মুহম্মদ আলী মুসলমান আমলের দূর্ধর্ষ যোদ্ধা—জাতি রোহিলা পাঠান বংশীয় লোক। অতি অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর জননী বি আম্মা তদানীন্তন ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবের জন্য ইংরাজী-শিক্ষা-বিরোধী মুসলিম সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের সর্বপ্রকার নিষেধ ও উপদেশ উপেক্ষা করিয়া মুহম্মদ আলী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শওকত আলীকে ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত রায়বেরেলী ইংরাজী বিদ্যালয় ও পরে আলীগড় কলেজে প্রেরণ করেন। পরবর্তী জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই শওকত আলী দেশ ও জাতির মুক্তি-আন্দোলনে মুহম্মদ আলীর চির-সাথী ছিলেন এবং মওলানা শওকত আলী নামে পরিচিত হন। উভয় ভ্রাতা 'Ali Brothers' বা "আলী-ভ্রাতৃদ্বয়" নামে জগৎ-প্রসিদ্ধ।

মুহম্মদ আলী আলীগড় কলেজ হইতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বি-এ পাশ করায় রামুপরের নওয়াব তাঁহাকে উচ্চতম শিক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণ করেন। তথায় আইন অধ্যয়ন ও আধুনিক ইতিহাসে অনার্য ডিগ্রী লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি

www.pathagar.com

রামপুর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল এই পদে কার্য করিবার পর বরদা রাজ্যের আইন উপদেষ্টার (Legal Adviser) কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় দেশবাসীর দূর্দশা সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং জাতির সেবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। অতঃপর চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া তিনি পাক-ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে "কমরেড" নামক একটি ইংরাজী পত্রিকা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শওকত আলীর সহযোগিতায় "হাম্‌দর্দ" নামক একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুহম্মদ আলীর মত ইংরাজী বক্তা ও সুলেখক তখন ভারতীয়দের মধ্যে একান্ত বিরল ছিল। এই দুই পত্রিকার সাহায্যে তিনি সারা পাক-ভারতে, বিশেষ করিয়া পাক-ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য এক নব জাগরণ ও প্রাণ-শিহরণ জাগ্রত করিয়া তোলেন। এই সময় ইউরোপের বল্কান শক্তিবর্গ অন্যান্য ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তিদের প্রকাশ্য ও গোপন সহায়তায় তুরস্ক-আক্রমণ করিলে তুর্কীদের সাহায্যোর্থে মওলানা মুহম্মদ আলী দিল্লীর ডাক্তার আন্‌সারীর নেতৃত্বাধীনে তুরস্কে এক মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করেন। যাহা হউক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব-সমরের সময় ইংরাজ গভর্ণমেন্ট আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্নিগর্ভ রচনা ও বক্তৃতায় আতঙ্কিত হইয়া "কমরেড" ও "হাম্‌দর্দ" পত্রিকাদ্বয়ের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন এবং আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এই মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং নির্ভীকভাবে নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন। ফলে এক বৎসর পরেই ১৯২১ সালে তাঁহারা আবার ইংরাজ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং দুই বৎসর পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর মওলানা মুহম্মদ আলী নিখিল-ভারত জাতীয় কংগ্রেসের (All-India National Congress) মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি পদে বরিত হন। কিন্তু ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মুসলিম-স্বার্থ বিরোধী "নেহেরু-রিপোর্ট" গৃহীত হওয়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করেন এবং কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্না, মহাকবি ইকবাল, পাঞ্জাবের বিখ্যাত নেতা মিয়া মুহম্মদ শফী প্রমুখ সুগঠিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় 'নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ'কে (All-India Muslim League) এক শক্তিশালী ও সুগঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৯৩০ সালে পাক-ভারতকে স্বাধীনতাদানের আলোচনার্থে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট পাক-ভারতীয় নেতাদিগকে ইংলন্ডে এক গোলটেবিল বৈঠকে (Round Table Conference) আমন্ত্রণ করেন। মওলানা মুহম্মদ আলীও সেই বৈঠকে আমন্ত্রীত হন। সেই সময় তিনি কঠিন রোগে অত্যন্ত অসুস্থ থাকা স্বত্বেও জাতির মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া তাহাতে যোগদান করেন। সেই বৈঠকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যদি আমাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে হয় তবে স্বাধীন ভারতেই ফিরিয়া যাইব, পরাধীন ভারতবর্ষে আর কখনও ফিরিব না। ইহার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই সর্বত্যাগী আত্মা-নিবেদিত স্বদেশ-প্রেমিকের এই মহাবাণী অক্ষরে-অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। ঐ বৈঠকের সময়েই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লন্ডনেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। অতঃপর প্যালেষ্টাইনের পূণ্যভূমি যেরুযালেমে বিশ্র-বিখ্যাত উমর-মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

বাংলার প্রথম স্বদেশী আন্দোলন ও বোমার কাহিনী—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ইংরাজ গভর্ণমেন্ট বাংলাদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পূর্ববাংলাকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং পূর্ববাংলা-আসাম লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকায় এই প্রদেশের

www.pathagar.com

রাজধানী স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশ লইয়া অপর একটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং কলিকাতায় স্থাপিত হয় এই প্রদেশের রাজধানী। বাঙ্গালী জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুর্বল করা হইয়াছে—এই যুক্তিতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধানতঃ বাংলার হিন্দুগণ প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং এই আন্দোলনের কার্যকরী কর্মপন্থা হিসাবে বিলাতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিষ গ্রহণের আন্দোলনও চলিতে থাকে। ইহাই বাংলার প্রথম স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ নেতাগণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তাঁহাদের এই আন্দোলনে পরিচালিত হইত অনেকটা আইনানুগ শাসনতান্ত্রীক পদ্ধতিতে। কিন্তু চরমপন্থী যুবক ও তরুণগণ এই পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাসীবাদ পন্থা অবলম্বন করেন এবং ইংরাজ ও উগ্র ইংরাজ সমর্থকদের বিরুদ্ধে বোমা-পিস্তল ব্যবহার আরম্ভ করেন এবং কতিপয় উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও দেশী রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন। ইহাই বাংলার বোমার কাহিনী নামে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে"র আদর্শই স্বদেশের মুক্তি-সাধন-ব্রতী এই সব তরুণদের প্রধান অবলম্বন ছিল।

"বন্দেমাতরম"—বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক উপন্যাস "আনন্দমঠের" স্বদেশ প্রেমমূলক এবং বর্তমানে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত বিখ্যাত সঙ্গীত। সঙ্গীতটি এই :—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্য শ্যামলাং
মাতরম্।

শুভ্র—জ্যোৎস্না—পুলকিত—যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত—দ্রুমদ লশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর বভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিক ঠকলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভূজৈর্ধৃত খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দূর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল—দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাং

নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্

বন্দেমাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূবিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্”

“চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তা হামারা”—ইহা মহাকবি ইকবালের উর্দুভাষায় রচিত বিখ্যাত “তারানায়ে মিল্লী” বা “জাতীয় সঙ্গীতে”র প্রথম চরণ। পূর্ণ সঙ্গীতটি এই :—

চীন্ ও আরব্ হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা—
মুসলিম হ্যায় হাম্, ওয়াতন্ সারা জাহাঁ হামারা।
তওহিদ্ কি আমানৎ সিনোঁ মেঁ হ্যায় হামারে
আসা নাহি মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা।
দুনিয়াকে বুৎকাদোঁ মেঁ পহেলা ওহ্ ঘর খুদাকা,
হাম্ উস্‌কে পাস্‌বাঁ হ্যাঁয়, ওহ্ পাস্‌বী হামারা।
তেগোঁকে সায়ে মেঁ হাম্ পাল্‌কার জওয়াঁ হুয়ে হ্যাঁয়,
খঞ্জর হিলাল কা হ্যায় কওমি নিশাঁ হামারা।
মগ্‌রিব্ কি ওয়াদিয়োঁমে গুঁজি আযাঁ হামারি,
থাম্‌তানাথা কেসি সে সাইলে রওয়াঁ হামারা।
বাতিল্‌সে ডর্‌নে ওয়ালে আয় আস্‌মাঁ নেহি হাম্,
সওবার্ কার্ চুকা হ্যায়, তু ইমতেহাঁ হামারা।
আয় গুলিস্‌তানে আন্দালুস্! ওহ্ দিন হ্যায় ইদায় তুজ্‌কো,
থা তেরি ডালিও মেঁ যব্ আশিয়াঁ হামারা।

www.pathagar.com

আয় মাউজে দজ্‌লা ! তুভি গাহ্‌ চান্‌তি হ্যায় হাম্‌কো,
আব্‌তক্‌ হ্যায় তেরা দরিয়া আফ্‌সানাখাঁ হামারা।
আয় আর্‌দে্‌ পাক্‌ ! তেরি হুর্‌মত্‌ পে কাট্‌মরে হাম্‌
হ্যায় খুন্‌ তেরি রগোঁমে আব্‌তক্‌ রওয়াঁ হামার।
সালারে কার্‌ওয়া হ্যায় মাঁরে হেজায্‌ আপ্‌না
ইস্‌ নাম্‌সে হ্যায় বাকী আরামে জাঁ হামারা।
ইক্‌বাল কা তারানা বাঙ্গে দারা হ্যায় গোইয়া,
হোতা হ্যায় জাদাহ্‌ পায়্‌মা ফের্‌ কার্‌ ওয়াঁ হামারা।

নিম্নে ইহার বাঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

চীন ও আরব আমার, হিন্দুস্তানও আমারই,
মুসলিম আমি, সারা জাহানই আমার স্বদেশ।
তওহিদের (আল্লাহ্‌র একত্ববাদের) আমানত আমার বক্ষে,
সহজ নয় আমার নাম-নিশান মিটাইয়া ফেলা।
দুনিয়ার ব্যুৎ-খানায় (মূর্তি-শালায়) সেই হইল প্রথম খুদার ঘর
যে-ঘরের আমরা রক্ষক, আবার যে হইল আমাদেরও রক্ষক।
তরবারির ছায়া তলে লালিত হইয়া জওয়ান হইয়াছি আমরা,
নূতন চাঁদের খঞ্জর হইল জাতীয় পতাকা আমাদের,
পশ্চিমের পথে-প্রান্তরে গুঞ্জিত হইয়াছে আমাদের আযান-ধ্বনি,
স্তব্ধ করিতে পারে নাই কেহই আমাদের দুর্বার গতি-ধারা।
মিথ্যার ভয়ে হে আকাশ, ভীত নহি আমরা,
শতবার (এ বিষয়ে) তুমি পরীক্ষা নিয়েছ আমাদের।
হে আন্দালুসের (স্পেনের) পুষ্প বন। সে দিন কি তোমার স্মরণে আছে—
যে দিন তোমার শাখায়-শাখায় ছিল আমাদের (আনন্দ) নীড়।
ওগো দজলার (টাইগ্রীসের) তরঙ্গ ! তুমিওতো আমাদের চেন,
আজো তোমার স্রোতোধারা গাহিয়া চলিয়াছে আমাদেরই কাহিনী।
হে পবিত্র ভূমি ! তোমার সম্ভ্রম রক্ষায় (বহুবার) কর্তিত-শির হইয়া প্রাণ দিয়াছি আমরা
তোমার শিরায়-শিরায় আজো আমাদের রক্ত-ধারা প্রবাহিত।
হেজায-নেতা [হযরত মুহম্মদ (দঃ)] আমাদের অভিযাত্রী-দলের সেনাপতি,
এই নামেই রহিয়াছে আমাদের প্রাণের আরাম।
ইকবালের সঙ্গীত যেন (উষ্ট্র-গল-লগ্ন) ঘণ্টার মধুর ধ্বনি,
তাহারই তালেতালে অভিযাত্রিদলের আবার চলিয়াছে নব পদ-বিক্ষেপ।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১. পাকিস্তানের দার্শনিক পটভূমি কি, উক্ত নামীয় প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২. বঙ্কিম ও ইকবালের সাহিত্যের আদর্শ কি এবং পাক–ভারতের জাতীয় মানসে ইহার প্রভাব কতদূর এবং তাহার পরিণতি কি, "পাকিস্তানের দার্শনিক পটভূমি" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে তাহা বর্ণনা কর।

৩. রাজনৈতিক ও অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনে সাহিত্যের ভূমিকা, আলোচনা প্রবন্ধের অনুসরণে ব্যাখ্যা কর।

৪. টীকা লিখ :—

শেক্‌ওয়া, দূর্গেশনন্দিনী, শাহনামা, রূশো, তুর্গেনিভ, টলষ্টয়, প্লেটো, তিলক, মওলানা মুহম্মদ আলী, চিত্তজঞ্জন দাশ, বন্দেমাতরম্‌, স্বদেশী আন্দোলন, বোমার কাহিনী।

কাব্য-পরিচিতি

টীকা ও প্রশ্নাবলী

হাম্‌দ্

(আল্লাহ্‌র স্তুতি)

এই কবিতাংশটি সৈয়দ আলাওল কর্তৃক কাব্যানুবাদিত "পদ্মাবতী" নামক পুঁথি-কাব্য হইতে উদ্ধৃত। মালিক মুহম্মদ জায়সী-রচিত হিন্দী "পদুমাবত" নামক কাব্যগ্রন্থটি আলাওল "পদ্মাবতী" নামে বাংলায় কাব্যানুবাদ করেন। জায়সীর উক্ত কাব্যগ্রন্থের রচনা-কাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ আর আলাওল কর্তৃক উক্ত পুস্তক বাংলায় কাব্যানুবাদের কাল হইল ১৬৪৫-৫২ খৃষ্টাব্দ। আলাওলের এই কাব্যগ্রন্থটি মৌলিক রচনা না হইলেও ইহার রচনা-সৌকর্য আড়ষ্টতাহীন নিপুণ অনুবাদের ফলে মৌলিক রচনা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। উদ্ধৃত কবিতাংশটি "পদ্মাবতী" কাব্যের প্রারম্ভিক আল্লাহ্-স্তুতি-মূলক সুদীর্ঘ কবিতার একাংশ মাত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণের রেওয়াজ বা রীতি ছিল এই যে, তাঁহাদের সকল কাব্য-রচনাই "হাম্‌দ্" বা আল্লাহ্-স্তুতি দ্বারা আরম্ভ করা হইত। আলোচ্য কবিতাটি আলাওল কর্তৃক কৃত জায়সীর মূল হিন্দী কাব্যের বাংলা কাব্যানুবাদের তেমনি একটি প্রারম্ভিক "হাম্‌দ্" বা আল্লাহ্-স্তুতি।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের একটি বিশিষ্ট উচ্চ স্থান আছে। আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষাবিদ ও নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এই কবির কাব্যের ভাষা অত্যন্ত পরিমার্জিত ও সংস্কৃত-বহুল। উদ্ধৃত কবিতার ভাষা তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

আলোচ্য কবিতায় কবি ইসলামী সূফীবাদ বা মরমীবাদ বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ববাদের ধারণানুযায়ী বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করিয়াছেন। "পদ্মাবতী" কাব্যের আদি কবি জায়সী নিজে একজন বিখ্যাত সূফী ছিলেন এবং "সূফী মতের ব্যাখ্যার জন্য আদিরসের আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য" হিসাবেই তিনি এই "পদ্মাবতী" বা "পদুমাবত্" রচনা করেন। অনুবাদক কবি আলাওলও সেই সূফী মতবাদেরই পথিক ছিলেন। কাজেই বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য সেই মতবাদ অনুসারেই এই কবিতায় বর্ণনা করা হইয়াছে। "তাসাউফ" বা সূফীমতবাদ অনুসারে "নূর", "নার", "বাদ", "আব" ও "খাক্" অর্থাৎ জ্যোঃতি, অগ্নি, বায়ু বা পবন, জল এবং মাটি বা ক্ষিতি একের পর-এক আগত এই পঞ্চ বস্তুর ক্রমবিকাশের ধারার ভিতর দিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর জলচর প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী এবং মানবাদি ক্রমে ক্রমে বিশ্ব-সংসারে সৃষ্ট ও আবির্ভূত হইয়াছে। কবিও আলোচ্য কবিতায় উল্লেখিত ক্রমবিকাশের ধারাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

www.pathagar.com

"করিল প্রথম আদি জ্যোঃতির প্রকাশ।
* * * *
সৃজিলেক আগুন, পবন, জল, ক্ষিতি
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করি নানা ভীতি।"

টীকা

বিছমিল্লা—প্রকৃত বাংলা বানান : বিস্‌মিল্লাহ্‌। আরবী বাক্য ; অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করিতেছি)। মুসলমানগণের প্রত্যেক কার্যের—বিশেষত: প্রত্যেক শুভ ও পূণ্য কার্যের প্রারম্ভেই এই বাক্য বলিতে হয়। কুরআন শরীফের প্রত্যেক "সুরা" বা অধ্যায়ের শীর্ষে এই বাক্য লিখিত আছে এবং সেই অধ্যায়গুলির প্রত্যেকটি পাঠের প্রারম্ভে এই বাক্য সর্বপ্রথম পাঠ করিতে হয়।

আদ্যমূল-শিব সেই শোভিত উত্তম—কুরআনের আদি হইল "সুরা ফাতেহা", অর্থাৎ এই "সুরা ফাতেহা" দিয়াই কুরআন আরম্ভ করা হইয়াছে। এই অর্থে "সুরা ফাতেহা" হইল কুরআনের আদি বা আদ্য "সুরা ফাতেহা"কে আবার "উম্মুল কিতাব" বা "উম্মুল কুরআন"ও বলা হয়। ইহার অর্থ হইল "আল্লাহ্‌র কিতাব বা কুরআনের জননী",—অর্থাৎ কুরআনের মূল শিক্ষার সারমর্ম এই "সুরা" বা অধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে। এই অর্থে "সুরা ফাতেহা"কে কুরআনের মূল বলা যাইতে পারে। সুতরাং "আদ্য-মূল" হইল কুরআনের "সুরা ফাতেহা"। আর "সুরা ফাতেহা"র শীর্ষে বা শিরে থাকে "বিস্‌মিল্লাহ্‌"। এই অবস্থানের জন্য "বিস্‌মিল্লাহ্‌" "সুরা ফাতেহা"র শির বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কাজেই "আদ্য-মূল-শির" হইল "বিস্‌মিল্লাহ্‌"। আলোচ্য চরণের পূর্বের চরণ এই :— "বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।" প্রাচীন মুসলমান কবিদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে উদ্ধৃত কবিতার কবিও তাঁহার কাব্য-রচনা-কার্য "বিস্‌মিল্লাহ্‌" বলিয়াই আরম্ভ করিয়াছেন। আলোচ্য "আদ্যমূল-শির সেই শোভিত সুন্দর" চরণটি উল্লেখিত পূর্ব চরণের "বিছমিল্লা" বাক্যের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আলোচ্য চরণের "সেই" শব্দ দ্বারা সে-কথাই পরিস্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব সামগ্রিকভাবে আলোচ্য চরণটির টীকা বা ভাষ্য হইল এই :— "আদ্যমূল-শির রূপ বিস্‌মিল্লাহ্‌ দ্বারা সুন্দর শোভিত প্রভুর নামেই প্রথম আরম্ভ করিলাম"। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং আলাওলের "পদ্মাবতী" কাব্যের সম্পাদক প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাও আলোচ্য চরণের ভাষ্য সম্পর্কে উপরোক্ত মত-ই পোষণ করেন।

কবিলাস—ডা: শহীদুল্লাহ্‌র মতে এই শব্দটি "কৈলাস" শব্দের অপভ্রংশ এবং এই শব্দ দ্বারা কবি বেহেস্ত্‌ বা স্বর্গ বুঝাইয়াছেন। জায়সীর মূল হিন্দী-কাব্যেও এই শব্দটি "কবিলাস" রূপেই লিখিত আছে। কাহারো কাহারো মতে এই শব্দটির পাঠান্তর আছে। ইহার পূর্ববর্তী শব্দ "সেই"-এর সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহারা ইহার এরূপ পাঠান্তর করিয়াছে :— "সেই কবিলাস"-এর স্থলে হইবে "সেইক বিলাস"—অর্থাৎ "তাহাই বিলাস"।

সপ্তমহী—মুসলমানের মধ্যে এরূপ একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে মহী বা পৃথিবী সপ্তস্তর বিশিষ্ট। প্রচলিত কথায় ইহাকে "সাত তবক জমি" বলা হয়। "সপ্তমহী" দ্বারা পৃথিবীর এই সপ্তস্তরকেই বুঝান হইয়াছে। "তবক" শব্দের অর্থ স্তর।

সপ্তব্রহ্মাণ্ড—মুসলমানদের মধ্যে ইহাও একটি প্রচলিত বিশ্বাস যে, আকাশও সপ্তস্তর বিশিষ্ট। প্রচলিত কথায় ইহাকে "সাত তবক আসমান" বলা হয়। এখানে "সপ্তব্রহ্মাণ্ড" দ্বারা আকাশের সপ্তস্তরকেই বুঝান হইয়াছে।

www.pathagar.com

চতুর্দ্দশ ভূবন—"চতুর্দ্দশে"র আধুনিক বানান "চতুর্দশ"। পৃথিবীর সপ্তস্তর এবং আকাশের সপ্তস্তর—এই চতুর্দশ স্তরকেই "চতুর্দশ ভূবন" বলা হইয়াছে। ইহাছাড়া হিন্দুশাস্ত্র মতেও (১) ভূলোক, (২) ভূবর্লোক, (৩) স্বর্লোক, (৪) মহর্লোক, (৫) জনলোক, (৬) তপোলোক, ও (৭) সত্যলোক—এই সপ্তস্বর্গ এবং (১) অতল, (২) বিতল, (৩) সুতল্ (৪) তল, (৫) তলাতল, (৬) রসাতল ও (৭) পাতাল—এই সপ্ত পাতাল মিলিয়া চতুর্দশ ভূবন।

হাম্‌দ্—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : প্রশংসা, স্তুতি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কিন্তু প্রচলিত অর্থ : একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রশংসা বা স্তুতি। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রশংসা-গীতি বা স্তুতিবাদকে "হাম্‌দ্" বলা হয় না।

প্রশ্নাবলী

১। "হাম্‌দ্" শীর্ষক কবিতার কবির বর্ণনা অনুসারে বিশ্ব-সৃষ্টির বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কাকে কৈল ঈশ্বর কাহাকে কৈল দাস।

(খ) আপন প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।

৩। টীকা লিখ :—

আদ্যমূল-শির, হাম্‌দ্, সপ্তব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দশভূবন, বিস্‌মিল্লাহ্।

কারবালার যুদ্ধ

কবি হায়াৎ মামুদ-রচিত "মহরম পর্ব" বা "জারি-জঙ্গনামা" নামক পুঁথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। বাংলার প্রাচীন মুসলমান কবিদের মধ্যে হায়াৎ মামুদই সাফল্যের সহিত সাধু অথচ সহজ প্রচলিত বাংলা কাব্য রচনা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী সৈয়দ আলাওল প্রমুখ কবিগণের ভাষা সংস্কৃত-বহুল বাংলা ইনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। ইহার ভাষা ভারতচন্দ্রের মত আলঙ্কার-বহুল না হইলেও সাবলী ও গণমুখী।

আলোচ্য কবিতায় কবি কারবালার মর্মান্তিক যুদ্ধের কাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ঐতিহাসিক ও যুদ্ধটি মেসোপোটোমিয়া বা ইরাকের ইউফ্রেটিস্ বা ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা ময়দানে তদ্দেশীয় রীতিতে অনুষ্ঠিত হইলেও তিনি ঐ যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিছক বাংলাদেশের যুদ্ধ-রীতি। "পাইকে পাইকে যুদ্ধে"—একমাত্র বাংলাদেশেই। কারণ পাইক বা লাঠিয়ালের মধ্যে যুদ্ধের রেওয়াজ একমাত্র বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য। কবি তাঁহার এই কাব্যের নাম দিয়াছেন "জারি-জঙ্গনামা" জারি বা যারী গান পল্লী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত এবং পল্লীর অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যই পল্লী-সঙ্গীত রচিত ও পরিবেশিত হয়। কাজেই বাংলার এই জনসাধারণ যাহাতে কারবালার নির্মম ও ভয়াবহ যুদ্ধের চিত্র যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন সেই জন্যই কবি বাংলার যুদ্ধ-রীতির পরিবেশের ভিতর দিয়া উল্লেখিত যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এ

www.pathagar.com

রীতি নূতন নহে। কৃত্তিবাস ও কাশীনাথ দাসের অনূদিত বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতেও বহু পরিমাণে এই "বাঙ্গালী-করণ" রীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে এই দুইটি মহাকাব্য বাঙ্গালী হিন্দু জাতির জাতীয় মহাকাব্যে পরিণতি করিয়াছে। কবি হায়াৎ মামুদ উত্তরবঙ্গের লোক। তাঁহার অনুসৃত উল্লেখিত রীতির ফলে বাংলা-সাহিত্যের বর্তমান অগ্রগতির দিনেও তাঁহার কাব্য উত্তরবঙ্গের জনসাধারণ কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণে সমাদিত পঠিত হইতেছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম-বিরোধী বংশগত রাজতন্ত্রের প্রথম অধিপতি স্বৈরাচারী ইয়াযিদ। তখন সেনাবাহিনী কর্তৃক ইসলাম ধর্ম-প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র ইমাম হুসাইন ও তাহার পরিবারের অধিকাংশ লোক ফোরাত-তীরবর্তী কারবালায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পিপাসার্ত হইয়া অন্যায় ও যুদ্ধে নিহত হন। "কারবালার যুদ্ধ" সেই নির্মম যুদ্ধেরই এক পর্যায়ের বর্ণনা।

টীকা

কারবালা—মেসোপোটোমিয়া বা ইরাকের ইউফ্রেটিস্ বা ফোরাত নদীর তীরবর্তী প্রান্তর। আরব-ইরান বিস্তৃত ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলাম-পরিপন্থী বংশগত রাজতন্ত্রের প্রথম অধিপতি দুশ্চরিত্র ও স্বৈরাচারী ইয়াযিদ রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াই ইসলাম-প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইনকে তাহার বশ্যতাস্বীকারে আহ্বান করে। অগণতান্ত্রীক ও অনু-ইসলামিক বংশগত রাজতন্ত্র সমর্থন করিতে ইমাম হুসাইন অস্বীকৃত হওয়ায় ইয়াযিদ ছলে-বলে-কৌশলে ইমাম হুসাইন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে কারবালা প্রান্তরে লইয়া আসে এবং তাহার সেনাবাহিনী দ্বারা তাঁহাদিগকে সেখানে অবরুদ্ধ করে। অবরোধ এত কঠোর হয় যে, আহার্য দ্রব্য দূরের কথা—ফোরাত নদীর তীরে থাকিয়াও এক ফোটা পানি হইতে পর্যন্ত হুসাইন-পরিবার বঞ্চিত হন। ফলে তাঁহারা অনাহারে ও দুঃসহ তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইয়াযিদ-বাহিনী অন্যায় যুদ্ধে ইমাম হুসাইন ও তাঁহার পরিবারবর্গের অধিকাংশকে কারবালার সেই প্রান্তরে নির্মমভাবে হত্যা করে। আরবী মহরম মাসে এই নিষ্ঠুর হত্যা কার্য অনুষ্ঠিত হয়। কারবালার সেই নির্মম স্মৃতি উদযাপন করিবার জন্যই প্রতি বৎসর মহরম মাসের ১১ই তারিখ মুসলমানগণ কর্তৃক মুহর্‌রম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। "কটকে কটকে বলে অস্ত্র হানাহানি"—এই চরণে উল্লেখিত ঘটনা কখন, কোথায় এবং কেন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা "কারবালার যুদ্ধ" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

পদধূলি আচ্ছাদিল রবির কিরণ।
দিবস হইল রাতি, না যায় চিনন॥

রূপ

এই কবিতা শাহ্ গরীবুল্লাহ-রচিত "মহব্বত নামা" বা "ছহি ইউছুপ জোলেখা" নামক পুঁথি হইতে উদ্ধৃত। শাহ্ গরীবুল্লাহ্ই বোধহয় সর্বপ্রথম জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আরবী-

www.pathagar.com

ফার্সী-মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্য বা পুঁথি রচনা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী মোহাম্মদ সগীর, বাহ্‌রাম খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল ও হায়াৎ মামুদ প্রমুখ বাংলা-কাব্য-রচয়িতা মুসলমান কবি ও পুঁথিকারগণ তাঁহাদের রচনায়—হয় সংস্কৃত-বহুল বাংলা, নতুবা আরবী-ফার্সী-শব্দ-বিবর্জিত সাধু বাংলা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তদানীন্তন প্রাক-ইংরাজী শিক্ষার আমলে সবেমাত্র রাজ্যহারা মুসলমানদের শিক্ষা-সভ্যতা দ্বারা সুদীর্ঘকাল যাবত প্রভাবান্বিত সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সমাজের অর্থাৎ সেই সময়-প্রচলিত আরবী-ফার্সী-শিক্ষায় শিক্ষিত সর্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের চলিত ভাষা যে আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত বাংলা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ সাতশত বৎসর ব্যাপী মুসলমান-রাজত্বে শিক্ষার বাহন ও রাষ্ট্র-ভাষা ফার্সী থাকায় তাহার ব্যাপক প্রভাব যে, জনসাধারণের সর্বস্তরেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা ধারণা করা কঠিন নহে। সংস্কৃত-বহুল বাংলায় রচিত সৈয়দ আলাওলের "সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল" নামক পুঁথি-কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত প্রচলিত বাংলায় কাব্যানুবাদ করিতে যাইয়া মুন্সী মালে মোহাম্মদ কৈফিয়ত স্বরূপ বলেন :—

"এই পুঁথির সায়ের ছিল আগু জমানার।
সমস্‌কৃত সাধু ভাষায় হৈল তৈয়ার॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কছেল্লা।
তে কারণে অধীন করে ছলিছ বাঙ্গলা॥

কোন কোন পুঁথিতে শেষ চরণের পাঠান্তর হইল এইরূপ :

"তে কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা।"

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে চলিত ভাষা ছিল আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত বাংলা। বাংলা-গদ্য-রচনা-রীতি ব্যাপারে সংস্কৃত-বহুল "বিদ্যাসাগরীয়" ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্যারিচাঁদ মিত্র কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত বাংলায় তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন এবং তদ্বারা যে তিনি বাংলা-গদ্য-সাহিত্য ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করিয়া গিয়াছেন—একথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। শাহ্‌ গরীবুল্লাহ্‌ ও তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের সংস্কৃত-বহুল ভাষা পরিত্যাগ করিয়া তৎকালীন প্রচলিত আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত বাংলায় কাব্য রচনা করিয়া বাংলা-কাব্য-সাহিত্যে তেমনই একটা বিপ্লব ও যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন—একথা বলা বোধহয় অসমীচীন হইবে না।

আলোচ্য কবিতায় কবি "ইউসুফ-জোলেখা" কাব্যের নায়ক ইউসুফের (আ:) রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ কর্তৃক রূপের ভাগ-বন্টন—এবং পৃথিবীর জন্য নির্দিষ্ট রূপের অংশ হইতে বৃহত্তর ভাগ হযরত ইউসুফকে (আ:) দান এবং বাকী অংশের জন্য পৃথিবীর সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর আকুল আকাঙ্ক্ষাময় প্রচেষ্টা প্রভৃতির এক কাল্পনিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কবির পক্ষে দোষণীয় নহে—কারণ কাব্য ইতিহাস নহে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ:) বাস্তবিকই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি পরম রূপবান ছিলেন—একথাও সত্য। যাহা হউক, কবি এই কবিতাংশে রূপের যে বর্ণনা দান করিয়াছেন কাব্য-বিচারে তাহা সফল হইয়াছে—একথা বলা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

টীকা

ছয় ভাগ রূপ—কবি কর্তৃক রূপের কাল্পনিক বিভাগ। এখানে "ছয় ভাগ" দ্বারা কবি একশত ভাগের ছয় ভাগ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইউছুফ—প্রকৃত বাংলা বানান : ইউসুফ। তিনি ইসরাঈল বংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ নবী। জন্মস্থান কেনান বা বর্তমান প্যালেষ্টাইন। তাঁহার পিতা হযরত ইয়াকুব আলাহেস্‌-সালামও একজন নবী ছিলেন। হয্‌রত ইয়াকুবের (আ:) সাত পুত্রের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ পুত্র। কাহারো মতে হয্‌রত ইয়াকুবের (আ:) দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত রূপমান ও গুণবান ছিলেন বলিয়া পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ফলে তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দেয়। তথা হইতে একদল পথিক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মিসর দেশে এক বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট দাসরূপে তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। সেখানে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রভূর স্ত্রী অলোকসামান্য রূপসী জোলেখা বা জুলায়খা তাঁহাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ ও বিপথ-গামী করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু অতুলনীয় সংযম ও সুদৃঢ় চরিত্র বলের অধিকারী হয্‌রত ইউসুফ (আ:) সকল প্রকার প্রলোভনের সম্মুখে অটল থাকেন। ফলে ব্যর্থমনোরথ জুলায়খার ষড়যন্ত্রে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারাগারে বিচারাধীন দুইজন রাজকর্মচারীর স্বপ্ন সম্পর্কে তিনি যে-স্বপ্ন-ফল বর্ণনা করেন অচিরেই তাহা সত্যে পরিণত হয়। রাজকর্মচারী দ্বয়ের মধ্যে মুক্তি-প্রাপ্ত-রাজকর্মচারীটি সে কথা মিসর-রাজকে জ্ঞাপন করেন। ইতিমধ্যে মিসর রাজ এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেন এবং কেহই সে স্বপ্নের তাৎপর্য বলিতে না পারায় কারাগার হইতে হয্‌রত ইউসুফ্‌কে (আ:) আনয়ন করিয়া সে-স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি যে-উত্তর দান করেন তাহা সত্যে পরিণত হয়। ফলে তিনি মিসরের প্রধানমন্ত্রী পদে বরিত হন। তিনি বহুদিন পর্যন্ত সর্বেসর্বারূপে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মিসরকে বহু আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং মিসরের বহুবিধ উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক ভাইদিগকে ক্ষমা করিয়া বহুপ্রকারে সাহায্য করেন এবং অবশেষে মিসর দেশে লইয়া আসেন। তৎসঙ্গে বৃদ্ধ পিতাকেও মিসরে আনয়ন করিয়া সেখানেই তাঁহাদিগকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই কেনানের বা প্যালেষ্টাইনের আদি অধিবাসী বহু ইস্‌রাঈল বংশীয় লোককে মিসরে স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে বসবাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কয়েক শত বৎসর পরে ইস্‌রাঈল বংশীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হয্‌রত মুসা (আ:) আবির্ভূত হইয়া তদানীন্তন অত্যাচারী মিসর-রাজ ফেরাউন বা "ফেরোঁয়া" উপাধিধারী রেমেসিস্‌-এর Pharaoh Remesis) হস্ত হইতে এই ইস্‌রাঈল-বংশীয়দের পরবর্তী-বংশধরদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া আসেন।

আল্লা-প্রকৃত বাংলা বানান : আল্লাহ্‌। "নাত" শীর্ষক কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য

জিবরিল—প্রকৃত বানান : জিব্‌রীল বা জিব্‌রাঈল। (বাইবেলের Angel Gabriel)। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূত। জিব্‌রীল-ফেরেশতা নবী ও রসূলগণের নিকট আল্লাহ্‌র "অহী" বা প্রত্যাদেশ বাণী বহণ করিয়া আনিতেন এবং তিনিই হয্‌রত মুহম্মদের (দ:) নিকট কুরআনের বাণী লইয়া আসেন এবং হয্‌রতকে কুরআন শিক্ষা দেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আলোচ্য কবিতায় দেখা যায় কবি বলিয়াছেন :—

"এতেক ভাবিয়া আল্লা জিব্‌রিল ডাকিয়া।
সবাকারে দিল তার খবর ভেজিয়া॥"

www.pathagar.com

এই কবিতাংশে "সবাকার" শব্দ দ্বারা কবি বিশ্বের সমস্ত চেতন-অচেতন পদার্থকে বুঝাইয়াছেন। কাজেই এই কবিতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ জিব্‌রীলকে দিয়া সকলের নিকট খবর পাঠাইয়া ছিলেন। ইহাও কবির কল্পনা মাত্র। কারণ জিব্‌রীল নবী ও রসূলগণ ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট আল্লাহ্‌র কোন খবর বা বাণী লইয়া প্রেরিত হন নাই।

পাতালে খবর পাইল যত ছিল নাগ—হিন্দু-পুরাণ মতে পাতালই নাগ বা সর্পদের বাসস্থান এবং তথাকার নাগ-রাজ বাসুকীর ফনার উপরই পৃথিবী অধিষ্ঠিত। "হাম্‌দ্" শীর্ষক কবিতার "চতুর্দশভুবন" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

খোশালিত—প্রকৃত বানান : খুশালিত। খুশ বা খোশ ফার্সী শব্দ ; অর্থ : আনন্দিত ; "হাল" আরবী শব্দ ; অর্থ : অবস্থা। "খোশ্-হাল্"-এর অর্থ : আনন্দিত অবস্থা। "খোশাল" এই খোশ-হালের অপভ্রংশ। ইহার সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণানুযায়ী প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ করা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। "রূপ" শীর্ষক কবিতার কবির বর্ণনা অনুসারে ইউছফ বা ইউসুফ আল্লাহ্-প্রেরিত রূপের কতভাগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। "রূপ" শীর্ষক কবিতার কবির বর্ণনা অনুসারে পৃথিবীতে রূপ বণ্টনের বিবরণ তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

মানসিংহের শিবিরে ঝড়বৃষ্টি

কবি ভারতচন্দ্র-রচিত "মানসিংহ" নামক কাব্য হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের শেষাংশের বা মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাকে অনায়াসে ছন্দ ও অনুপ্রাসের রাজা বলা যাইতে পারে। শব্দ বিন্যাস, ভাব প্রকাশ, সম-ধন্যাত্মকে শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ কিংবা বিভিন্ন অর্থ-বোধক একই শব্দের কৌশলময় বিন্যাস প্রভৃতি কোন বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কোনও মঙ্গল-কাব্য অর্থাৎ অন্নদা-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি দেব-দেবীগণের স্তুতিমূলক কাব্য-রচয়িতা কবি তাঁহার পূর্বে বা পরে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন নাই। বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও বাংলা কাব্যকলা তাঁহার হাতেই পুরাতন যুগের শেষাংশের বা মধ্যযুগের শেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁহার ভাষায় প্রচলিত বাক্য—বিশেষতঃ সেকালের বাংলা বুলি বা idiom—যথা "বিদ্যুৎ-চকমকী", "ভেকের মকমকী", "জলের তরতরী", "বজ্রের কড়মড়ী", "ঘুট-ঘুট-আন্ধার" প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়।

আলোচ্য কবিতাংশে বাংলাদেশের বর্ষার রূপ—বিশেষতঃ বর্ষাকালীন ঝড়-বৃষ্টির রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসিয়া বর্ষাকালীন ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁহার সৈন্যসামন্ত সহ দুর্ভোগে পতিত হন। এই কবিতাংশে তাহারি বর্ণনা ছবির মত সুস্পষ্ট করিয়া আঁকা হইয়াছে। এই কবিতাংশেও ভারতচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান এবং ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই বর্ণনাটি জীবন্তরূপ ধারণ করিয়াছে।

www.pathagar.com

টীকা

মানসিংহ—মুঘল সম্রাট আকবরের বিশিষ্ট সেনাপতি। ইনি জাতিতে রাজপুত হিন্দু। ইনি রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের মহারাজার পুত্র এবং সম্রাট আকবরের প্রধান মহিষী ও আকবরের পরবর্তী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা যোধাবাঈ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আকবরের "দরবারে নও রতন" বা নবরত্ন রাজসভার তিনি অন্যতম রত্ন।

ঊনপঞ্চাশ পবন—পবনের (কাল্পনিক) জন্ম স্থান। স্থানের উত্তপ্ততার পরিমাণ অনুসারে পবনের গতির পরিমাণ নির্ভর করে। পবনের জন্ম স্থানের সর্বাধিক উত্তাপের কাল্পনিক পরিমাণ হইল ঊনপঞ্চাশ। কাজেই ঊনপঞ্চাশ পবন হইল প্রবলতম বেগ বা গতিবিশিষ্ট পবন।

মজুন্দার—প্রকৃত শব্দ—মজমাদার। আরবী জমা বা সংগ্রহ করা (Collect)শব্দ হইতে উৎপন্ন। যে-ব্যক্তি সরকারী খাজনা ইত্যাদি জমা নিতেন, তাঁহাকেই মজ্‌মাদার বলা হইত। এই পদটি আধুনিক Collector পদের অনেকটা সমতুল্য ছিল। মজুন্দার বা মজুমদার এই মজ্‌মাদার শব্দের অপভ্রংশ। এখানে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহরের বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে বাংলাদেশে আগমন করার পর ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহার সেনাবাহিনীর রসদ-পত্র নষ্ট হইয়া গেলে এই ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সেনাবাহিনীকে এক সপ্তাহকাল খোরাকাদি দিয়া সাহায্য করেন।

প্রশ্নাবলী

১। "মানসিংহের শিবিরে ঝড় বৃষ্টি" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে বাংলাদেশের ঝড়-বৃষ্টির বর্ণনা কর।

২। "কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান"—এই ঘটনা কখন এবং কোথায় ঘটিল, আলোচ্য কবিতার অনুসরণে বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া নিম্ন কবিতাংশের ব্যাখ্যা কর :—

কাঙ্গাল হইল সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেঁচে টাকা করি সেই যায় ভেসে॥

বাঙ্গালার বৃত্তান্ত

এই কবিতাংশও ভারতচন্দ্রের "মানসিংহ" নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত। ভারতচন্দ্র সাধারণতঃ পরিমার্জিত বাংলায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই উদ্ধৃতাংশে দেখা যায়, তিনি বহু আরবী-ফার্সী শব্দও যথেষ্ট নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। কোন ভাষার সঙ্গে যদি অন্য ভাষার শব্দ পূর্ব হইতেই ওতপ্রোতভাবে একাত্ম হইয়া মিশিয়া না যায় তবে তাহাকে ঐ ভাষার সাহিত্যে অনাহুত, অহেতুক বা আকস্মিক ভাবে আমদানী করা সম্ভবপর নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার পূর্ব হইতেই আরবী-ফার্সী-শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। ইংরাজ আমলে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁহার পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যসেবিগণ বাংলা-সাহিত্য হইতে আরবী-ফার্সী শব্দের নির্বাসন

www.pathagar.com

দিয়া সংস্কৃত-বহুল ভাষা-রীতির প্রচলন করিলেন। কিন্তু তাহা যে বাংলা ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের সুস্পষ্টধারার অনুসারী নহে—ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃত কবিতাংশের ভাষা হইতে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সাহিত্য ও ভাষার বিকাশে যে জবরদস্তীর স্থান নাই—'বিদ্যাসাগরীয়" ভাষার বিরুদ্ধে "আলালী" ভাষার বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের সোনার কাঠি স্পর্শে কলিকাতা অঞ্চলে কথ্য-ভাষায় এই "বিদ্যাসাগরীয়" ভাষার রূপান্তর গ্রহণ, তাহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাহা হউক, "ভারতচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ সন্তান। তদোপরি তিনি ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি। কাজেই তিনি তাঁহার উদ্ধৃত কবিতাংশে আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত যে-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যে তদানীন্তন হিন্দু শিক্ষিত সমাজেরও প্রচলিত ভাষা ছিল তাহা মনে করা অন্যায় নহে। কারণ বাংলা-ভারতে সাত শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান রাজত্বের সময় রাষ্ট্র-ভাষা ফার্সী থাকায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজের ভাষা আরবী-ফার্সী-বহুল হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ রুমী-যামী-সাদী-হাফেয-রচিত বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ফার্সী-সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ প্রভাব সে যুগে বাংলার উপর অত্যন্ত প্রবল। সেজন্য রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনার খাতিরেও সে সময় আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ অপরিহার্য ছিল। উল্লেখিত "মান-সিংহ" কাব্যে ভারতচন্দ্র নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন : —

"না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা বাক্যরস লয়ে।"

অতএব "যাবনী-মিশাল" ভাষা অর্থাৎ আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত ভাষা যে তখন কাব্য-রস সৃজনের জন্য অপরিহার্য, তাহা স্বীকৃত সত্য।

আলোচ্য কবিতাংশে মুঘল-সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি কর্তৃক যশোহরের বা যশোরের বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয় সাধনের বিবরণ রহিয়াছে। আর রহিয়াছে ঐ সময় বাদল বা বর্ষার ঝড়-বৃষ্টির ফলে তাঁহার সেনাবাহিনীর দুর্দশা ও ঐ দুর্দিনে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্তৃক সাতদিন ধরিয়া সৈন্যবাহিনীর রসদ প্রদানের কাহিনী। সেই ভবানন্দ মজুমদারকে পুরস্কৃত করিবার জন্য মানসিংহ কর্তৃক বাদশাহের নিকট প্রার্থনার বিষয় ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় মানসিংহ নিজের জন্য কোন পুরস্কার প্রার্থনা না করিয়া উপকারী ভবানন্দ মজুমদারের জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করায় তদ্বারা মানসিংহের চরিত্রের মহত্ত্ব দেখানো হইয়াছে।

টীকা

জাঁহাপনা—ফার্সী শব্দ। "জাঁহা" বা "জাহান" অর্থ হইল জগত এবং "পনা" বা "পানা" শব্দের অর্থ হইল আশ্রয়। অতএব "জাঁহাপনা" বা "জাহাঁপানা"র শাব্দিক অর্থ হইল "জগতের আশ্রয়"। কিন্তু প্রচলিত অর্থ হইল—বাদ্শাহকে সম্বোধন করিবার সম্বোধন-বাক্য।

রামজীর কুদরতে—"কুদ্রত্" আরবী শব্দ—অর্থ হইল : শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য। কাজেই এই বাক্যাংশের অর্থ হইল রামজী বা রামের শক্তিতে বা ক্ষমতায়। হিন্দু মতে রামায়ণ বর্ণিত রামজী বা শ্রীরাম বা রামচন্দ্র ভগবানের অবতার বা মানব দেহধারী ভগবান। হিন্দু শাস্ত্র

www.pathagar.com

অনুসারে যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় তখনই পূণ্যবানদিগের উদ্ধার সাধন ও পাপীদিগের শাস্তি বিধানের জন্য স্বয়ং ভগবান অবতার রূপে অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এখানে "রামজীর কুদরতে"—এই বাক্যাংশের মর্মার্থ হইল, ভগবানের বা বিধাতার ক্ষমতায় বা কৃপায়। "জী" বা "জি" সম্মানার্থক শব্দ। "রাম" শব্দের সঙ্গে "জী" সংযোগ করিয়া "রাম" শব্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।

নিমক-হারাম—আরবী শব্দ। প্রচলিত অর্থ : অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, বিশ্বাস-ঘাতক। নিমক অর্থ : লবণ ; হারাম অর্থ : অবৈধ। মুসলমানেরা সাধারণতঃ আহারের প্রারম্ভে জিহ্বায় লবণ স্পর্শ করিয়া "বিস্‌মিল্লাহ্‌" অর্থাৎ আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি—এই কথা বলিয়া আহার আরম্ভ করেন। কাজেই নিমক গ্রহণের অর্থ হইল আহার গ্রহণ। আরব দেশের নিয়ম হইল এই যে, কেহ কাহারো গৃহে নিমক বা আহার গ্রহণ করিলে আহার-দাতা ও আহারকারী পরস্পরের মিত্র হইয়া যায় এবং কেহ কাহারো অনিষ্ট করে না। এরূপ বিশ্বস্ত মিত্রতার মধ্যেও যদি আহারকারী আহার-দাতার অনিষ্ট সাধন করে তবে তাহাকেই বলা হয় "নিমক-হারাম" বা বিশ্বাস-ঘাতক, অকৃতজ্ঞ। এখানে যশোহরের বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যকে বুঝাইয়াছে।

ভবানন্দ মজুন্দার—"মানসিংহের শিবিরে ঝড়-বৃষ্টি" কবিতার টীকা দেখ।

"ফরমান ফরমান তায়"—"ফরমান" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : বাদশাহী হুকুম, হুকুমনামা, রাজাদেশ। ফরমান (বা ফরমানো) ক্রিয়া হিসাবে অর্থ : আজ্ঞা করো, হুকুম করো। "ফরমান ফরমান তায়" এই বাক্যাংশের অর্থ : তাহাকে হুকুমনামা দিতে আজ্ঞা হোক।

প্রশ্নাবলী

১। "বাঙ্গালার বৃত্তান্ত" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে মানসিংহ-বর্ণিত বাংলার বিবরণ তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির টীকা লিখ :—

জাহাঁপনা, নিমক-হারাম।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক নিম্ন উদ্ধৃতি দুইটির ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম।

(খ) স্বদেশে রাজাই পার দোয়া করি ঘরে যাব
ফরমান ফরমান তায়।

না'ত

[হযরত মুহম্মদ (দ:) প্রশস্তি]

সৈয়দ হামজা-রচিত "ছহি জৈগুণের পুঁথি" হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে তদানীন্তন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত—বিশেষতঃ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বহুল পরিমাণে আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত বাংলায় যাঁহারা পুঁথি-সাহিত্য নামে পরিচিত যথার্থ গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সৈয়দ হাম্‌জা তাঁহাদের পূর্ববর্তীদের অন্যতম।

www.pathagar.com

প্রাচীন মুসলমান কবিদিগের রেওয়াজ বা রীতি ছিল যে, তাঁহার কোন পুস্তক রচনার প্রারম্ভে সর্বপ্রথম "হাম্‌দ্‌" বা আল্লাহ্‌র স্তুতি এবং তৎপর "নাত" বা হয্‌রত মুহম্মদের (দ:) প্রশস্তি গাহিয়া—তবে পুস্তকের বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেন। উদ্ধৃত কবিতাংশ তেমনি একটি না'ত বা হয্‌রত-মুহম্মদ-প্রশস্তি। এই প্রশস্তি-তে কবি হয্‌রত মুহম্মদের (দ:) যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন আত্ম-ভোলা পরহিত কামনায় মহান, অন্যদিকে তেমনি নিজ "উম্মত" বা অনুবর্তিগণের পরিত্রাণের ব্যাকুলতায় কোমল-মধুর।

টীকা

না'ত—আরবী শব্দ। শব্দার্থ : প্রশংসা বা প্রশস্তি। প্রচলিত অর্থ : একমাত্র হয্‌রত মুহম্মদের (দ:) প্রশংসা-গীতি বা প্রশস্তি। অন্য কাহারো প্রশস্তিকে "না'ত" বলা হয় না।

আল্লাহ্‌—আরবী শব্দ। শব্দার্থ : বিধাতা, বিশ্ব-স্রষ্টা। কিন্তু "আল্লাহ্‌" শব্দের বিশেষত্ব এই যে, এই শব্দটির দ্বিবচন ও বহুবচন নাই এবং ইহার লিঙ্গ-ভেদ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্মে ও সমস্ত ভাষায় যে-সকল শব্দ দ্বারা বিশ্ব-স্রষ্টাকে বুঝায় তাহাদের বহুবচন ও লিঙ্গ-ভেদ আছে। যেমন : God, Gods, Goddess, ভগবান ; ভগবতী, ঈশ্বর, ঈশ্বরী ইত্যাদি। ইসলামের পূর্ববর্তী পৌত্তলিক আরবেও "আল্লাহ্‌" শব্দটি কখনই দেব-দেবী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। চিরদিনই একমাত্র "নিরাকার বিশ্ব-স্রষ্টা" অর্থে "আল্লাহ্‌" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

নবী—আরবী শব্দ। মূল "নাবা" শব্দ হইতে উৎপত্তি। "নাবা" শব্দের অর্থ : মূল্যবান ঘোষণা বা ভবিষ্যৎ-বাণী। ইসলামী পরিভাষায় বা প্রচলিত অর্থে যিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আল্লাহ্‌র ঘোষণা বা বাণী মানব জাতির নিকট বহন করিয়া লইয়া আসেন শুধু তাঁহাকেই "নবী" বলা হয়। ইংরেজী Prophet শব্দ ইহার একার্থমূলক প্রতিশব্দ। ইহার ফার্সী প্রতিশব্দ হইল "পয়গম্বর"।

রসূল—আরবী শব্দ ; শাব্দিক অর্থ : প্রেরিত পুরুষ। প্রচলিত অর্থ : পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রকৃত ধর্ম প্রচারার্থ আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ। কিন্তু যে-সকল প্রেরিত মহাপুরুষ নূতন ধর্ম প্রবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব বা ধর্ম-গ্রন্থ সহ প্রেরিত হইয়াছেন, বিশেষরূপে তাঁহাদিগকেই "রসূল" বলা হয়। যেমন ইয়াহুদী ধর্ম-প্রবর্তক হয্‌রত মুসা আলায়হেস্‌ সালাম (সংক্ষেপে-আ:) একজন রসূল। তাঁহাকে "তৌরাত্‌" বা "Torah" নামক কিতাব দেওয়া হয়। তিনিই বাইবেলে Prophet Moses নামে পরিচিত। খৃষ্টান ধর্ম-প্রবর্তক হয্‌রত ঈসা (আ:)। তিনিও একজন "রসূল"। তাঁহাকে "ইঞ্জিল" বা "বাইবেল বা "Gospel" নামক কিতাব দেওয়া হয়। তিনি বাইবেলে Jesus Christ নামে অভিহিত। আর ইসলাম ধর্ম-প্রবর্তক হয্‌রত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে-ওয়া-সাল্লাম (দরুদ—সংক্ষেপে—দ:) হইলেন পৃথিবীর সর্বশেষ রসূল। তাঁহাকে দেওয়া হয় "ফুরকান" বা "কুরআন"। প্রত্যেক রসূলকেই "নবী" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে--যেমন, ঈশা নবী (আ:), মুসা নবী (আ:) ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক নবীকেই "রসূল" বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

পয়গম্বর—ফার্সী শব্দ : "পয়গাম" অর্থাৎ "সংবাদ" বা "বার্তা" শব্দ হইতে উদ্ধৃত। শাব্দিক অর্থ : সংবাদবাহী, বার্তাবাহী। আরবী "নবী" শব্দের ফার্সী প্রতিশব্দ। প্রচলিত অর্থ : আল্লাহ্‌র বার্তাবহনকারী নবী বা রসূল।

www.pathagar.com

কলেমা—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : ইসলামের মূল বিশ্বাস-বাক্য বা বিশ্বাস-বাণী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র "ওয়াহেদাৎ" বা একত্ব এবং হয্‌রত মুহম্মদের (দ:) "রেসালত্" বা রসূলত্ব অর্থাৎ তিনি যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, ইহাতে বিশ্বাস।

জেকের—আরবী শব্দ। প্রকৃত বানান "যেকের"। শাব্দিক অর্থ : স্মরণ। প্রচলিত অর্থ : আল্লাহ্‌'র নাম স্মরণ।

রোজ-হাসর—"রোজ্" ফার্সী শব্দ। প্রকৃত বানান : রোয্ ; শাব্দিক অর্থ : দিবস, দিন ; "হাসর" আরবী শব্দ, প্রকৃত বানান : হাশর ; শাব্দিক অর্থ : একত্রিত করণ বা একত্রিত হওন। প্রচলিত অর্থ : বর্তমান পৃথিবীর ধ্বংশের পর আল্লাহ্ কর্তৃক মানব জাতিকে পুনর্জীবিত করিয়া শেষ বিচারের জন্য একত্রিত করণ। "রোজ-হাসর" বা "রোয-হাশর" শব্দ দ্বয়ের অর্থ : শেষ বিচারের দিন।

কেয়ামত—আরবী শব্দ। অন্য উচ্চারণ : কিয়ামত। শাব্দিক অর্থ : উত্থান। প্রচলিত অর্থ : বর্তমান পৃথিবী ধ্বংশের পর শেষ বিচারের জন্য পুনর্জীবন লাভ করিয়া মানবদিগের উত্থান। "রোয্‌কেয়ামত" হইল "শেষ বিচারের দিন", "কেয়ামত" অর্থে "মহাপ্রলয়" বা এই পৃথিবী ধ্বংশের দিনও বুঝায়।

উম্মত—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : জাতি। প্রচলিত অর্থ : রসূল ও নবিগণের ধর্মপথের অনুবর্তী ব্যক্তি, সংঘ বা মানবদল। "উম্মতি" শব্দের অর্থ : "আমার উম্মত"।

এলাহি আলমিন—আরবী শব্দ। এলাহি শব্দের প্রকৃত বানান : ইলাহি। "ইলাহি" অর্থ : আমার আল্লাহ্। "আলমিন" শব্দ "আলামিন্" শব্দের অপভ্রংশ। "আলামিন" শব্দ "আলম" বা "বিশ্ব" শব্দের বহুবচন। "আলামিন" শব্দের অর্থ : বিশ্বসমূহ। "এলাহি আলমিন"-এর অর্থ : বিশ্বসমূহের (স্রষ্টা ও মালিক) আল্লাহ্।

জারি—ফার্সী শব্দ। প্রকৃত বানান : যারী। শব্দার্থ : ক্রন্দন। বাংলাদেশে প্রচলিত পল্লী-গীতি "জারি-গান"-এর "জারি" বা "যারী" শব্দ এই "ক্রন্দন" অর্থ হইতেই উদ্ভূত। কারবালায় ইয়াযিদের সেনাবাহিনী কর্তৃক হয্‌রত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র হয্‌রত ইমাম হুসাইন ও তাঁহার পরিবারের অধিকাংশের নির্মম হত্যার করুণ কাহিনী অবলম্বনে যে শোক-গীতি বা ক্রন্দন-গীতি রচিত ও গীত হয় তাহারি নাম "জারি-গান" বা "যারী গান"।

ইছা—প্রকৃত বাংলা বানান : ঈসা। ইনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসূল—হযরত ঈসা আলায়হেস-সালাম। ইনিই খৃষ্ট-ধর্ম-প্রবর্তক Jesus Christ বা যিসু খৃষ্ট। প্যালেষ্টাইনের "নাযারেথ" (Nazarcth) নামক এক ক্ষুদ্র শহরে ইয়াহুদী বা ইস্‌রাঈল বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসরাঈল বংশের ইনি শেষ নবী। ইহার জন্ম-ব্যাপার অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছায়ই ইনি মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হন। ইহার মাতা বিবি মরিয়ম (বাইবেলের Marry-মেরী) অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। বিবি মরিয়ম মাতৃগর্ভে থাকিতেই তাঁহার জনক-জননী তাঁহাকে আল্লাহ্‌র কাজে উৎসর্গ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখেন এবং তাঁহার জন্মের পর সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে যেরুযালেমের ইস্‌রাঈল বা ইয়াহুদী বংশীয়-বিখ্যাত নবী হয্‌রত সুলায়মান (আ:) কর্তৃক নির্মিত আল্লাহ্‌র উপাসনালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই একজন বিখ্যাত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হইয়া নিজেও একজন পরম ধর্মপরায়ণা নারী হিসাবে গড়িয়া উঠেন। এমনই মহিমাময়ী নারীর গর্ভে হয্‌রত ঈসা (আ:) জন্মগ্রহণ করেন। হয্‌রত ঈসা (আ:) যথা সময়ে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে "ইঞ্জিল" বা বাইবেল (Gospel) নামক ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্ববংশীয় প্রকৃত-ধর্ম-বিচ্যুত ইয়াহুদিগণের মধ্যে সত্য ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলে পথ-ভ্রান্ত ও ধর্মহীন ইয়াহুদিগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং নানা

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র করিয়া বিচারের নামে তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ডাদেশ প্রদান করে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ক্রুসে (Cross) বিদ্ধ করে। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, অতঃপর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে ক্রুস হইতে নামাইয়া কবর দেওয়া হয়। কিন্তু কবরে তিনি পুনর্জীবন লাভ করিয়া কবর হইতে উত্থিত হন এবং তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যদের সঙ্গে শেষ আহার গ্রহণ করেন। ইহার পর আল্লাহ্ স্বশরীরে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। তিনি প্রধানতঃ প্রেম ও ক্ষমার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

মুছা—প্রকৃত বাংলা বানান মুসা। ইনি ইয়াহুদী-ধর্ম-প্রবর্তক হয্‌রত মুসা আলায়হেস-সালাম (Prophet Moses)। মিসর দেশে ইস্‌রাঈল বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বনি-ইসরাঈল বংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ "রসূল" এবং আল্লাহর কিতাব "তৌরাত" (Torah) তাঁহারই নিকট অবতীর্ণ হয়। তদানীন্তন মিসরের "ফেরাউন" উপাধিধারী অত্যাচারী অধিপতি (Pharaoh Ramesis, II) নিজেকে খুদা বলিয়া দাবী করে এবং দেশের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায় বনি-ইস্‌রাঈলদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইয়া তাহাদিগকে প্রায় দাস-জাতিতে পরিণত করিয়া ফেলে—এমনকি তাহাদের নবজাত পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিতে থাকে। আল্লাহ্‌র লীলায় সেই ফেরাউনের প্রাসাদেই হয্‌রত মুসা (আ:) লালিত-পালিত হন। পরবর্তী জীবনে নবুয়ত্ প্রাপ্তির পর আল্লাহ্‌র আদেশে হয্‌রত মুসা (আ:) ফেরাউন সমীপে উপনীত হইয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে আসিবার জন্য এবং বনি-ইসরাঈলদিগকে মুক্তি দানের নিমিত্ত উপদেশ দেন। বহু চেষ্টার পরও ফেরাউন হয্‌রত মুসার (আ:) কোন কথায় কর্ণপাত না করায় বনি-ইস্‌রাঈলদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি মিসর দেশ ত্যাগ করেন। এ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য ফেরাউন সসৈন্যে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে থাকে। লোহিত সাগরের তীরে আসিয়া কোন দৈব কারণে সাময়িকভাবে পানী অপসারণের ফলে সাগরের তলদেশ দিয়া অপর-পার পর্যন্ত একটি শুষ্ক রাস্তা দেখিতে পাইয়া হয্‌রত মুসা (আ:) বনি-ইস্‌রাঈলদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই পথে সাগর পার হইয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফেরাউন সসৈন্যে সেই পথে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়া মাত্র সাগর জল আসিয়া সেই পথ বন্ধ করিয়া ফেলে এবং ফেরাউন সসৈন্যে জলে ডুবিয়া প্রাণ হারায়। হযরত মুসা (আ:) শুধু ধর্ম-প্রবর্তক ছিলেন না—ইয়াহুদীদের সমাজ ও রাষ্ট্র-বিধান তাঁহারই দান। তিনি ইয়াহুদী জাতির যথার্থ স্রষ্টা ও বিধান-দাতা—উভয়ই ছিলেন।

নূহ নবী—আদি মানব হয্‌রত আদমের (আ:) পরবর্তী এবং ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকদের পূর্ব পুরুষ হয্‌রত ইব্রাহীমের (আ:) পূর্ববর্তী যে-সকল নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন নূহ নবী (আ:)। তিনিই বাইবেল কথিত Prophet Noah. তাঁহার সময় প্রায় সকল লোকই আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপথে চলিতে থাকে। তিনি তাহাদিগকে ন্যায়, সত্য ও ধর্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অবিরাম প্রচার ও উপদেশ দ্বারা আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন। অতি নগণ্য সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলনা; এমনকি তাহারা তাঁহার উপর অকথ্য গালাগালি বর্ষণ এবং কঠোর শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত আরম্ভ করিল। ফলে এই পাপাচারীদিগকে ধ্বংস কবিরার জন্য আল্লাহ্ এক প্রলয়ঙ্কর তুফান ও মহাপ্লাবন (বাইবেল কথিত Deluge) আনয়ন করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ হয্‌রত নূহ আলায়হেস্ সালামকে পূর্বেই এই সম্পর্কে সংবাদ দিয়া একটি বৃহৎ জাহাজ (বাইবেল কথিত Noah's Ark) নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রত্যেক জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর এক-এক জোড়া এবং প্রত্যেক বৃক্ষ-লতার এক-একটি করিয়া বীজ সংরক্ষিত করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে জাহাজ নির্মাণ ও নির্দেশিত জিনিষ-পত্র তাহাতে সংরক্ষিত হইলে প্রলয়ংকর তুফান ও

www.pathagar.com

প্লাবন আরম্ভ হয় এবং হয্‌রত নূহ্ (আ:) নিজের এক বিপথ-গামী পুত্র ব্যতীত পরিবারের সমস্ত লোকজন ও স্বল্পসংখ্যক সত্যাশ্রয়ী অনুবর্তী লোক লইয়া জাহাজে আরোহণ করিয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পান। সেই মহাপ্লাবনে হয্‌রত নূহের (আ:) জাহাজে আশ্রয় প্রাপ্ত লোকজন, পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-লতা ব্যতীত পৃথিবীর আর সমস্ত কিছু প্রাণী ও বৃক্ষ-লতা ধ্বংস হইয়া যায়। বর্তমান পৃথিবীর মানবজাতি ও পশুপক্ষী হয্‌রত নূহের (আ:) জাহাজে রক্ষিত মানুষ ও পশু-পক্ষীর বংশধর এবং বর্তমান বৃক্ষ-লতাদি ঐ জাহাজে সংরক্ষিত বীজ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া কথিত।

শয়তান—আরবী শব্দ, শাব্দিক অর্থ : অবাধ্য, বিদ্রোহী, বিতাড়িত। ইহার অপর নাম ইব্‌লিস্। "ইব্‌লিস্"ও আরবী শব্দ। অর্থ : মুখ-পোড়া। তাহাকে আযাযীলও বলা হয়—বাইবেলে ইহাকে Satan বা Devil বা Evil Spirit বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শয়তান মানুষকে সত্য, ন্যায় ও ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করিবার সূক্ষ্ম দেহধারী অদৃশ্য প্ররোচক। ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যে "জিন্" ও "ইন্‌সান্" (মানুষ)—এই দুই শ্রেণীভূক্ত জীবের পাপ-পূণ্যের জন্য পরকালে বিচার হইবে। "জিন্"গণ অগ্নিদ্বারা সৃষ্ট ও সূক্ষ্ম দেহধারী এবং ইহারা মানব-সৃষ্টির বহুপূর্বে সৃষ্ট এবং সুদীর্ঘজীবী। জিন্‌গণ ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন সময়, যে-কোন আকৃতি ধারণ করিতে পারে। ইব্‌লিস্ বা শয়তান এই জিন্-বংশোদ্ভব। ইব্‌লিস্ সুদীর্ঘকাল আল্লাহ্‌র আরাধনা-উপাসনা দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রীতি লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ আদি মানব আদমকে (আ:) মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার জ্ঞান দান করেন এবং তাঁহাকে সিজ্‌দা বা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবার জন্য জিন্ এবং ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূতদিগকে আদেশ দান করেন। সকলেই সেই আদেশ প্রতিপালন করেন। একমাত্র ইব্‌লিস্ নিজে অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া মৃত্তিকা-নির্মিত আদম অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে। ফলে সে আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শয়তানে পরিণত হয় এবং আল্লার সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত হয়। তদবধি সে বনি-আদম বা আদম-সন্তান অর্থাৎ মানব-জাতির চির শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। মানব জাতি যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে অর্থাৎ মহাপ্রলয় বা কেয়ামত পর্যন্ত শয়তানও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং মানুষের অমঙ্গল চেষ্টায় নিরত থাকিবে। এই শয়তানেরই ছলনা ও প্ররোচনায় হযরত আদম (আ:) তাঁহার পত্নী বিবি হাওয়া (আ:) সহ বেহেস্ত্ হইতে বিচ্যুত হইয়া কষ্টসাধ্য জীবন যাপনের জন্য পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন

১। কেয়ামতে কে উম্মতের জন্য দাঁড়াইবেন? কোথায়? কেন?—পূর্ব-সংকেত উল্লেখপূর্বক এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ।

২। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) নবী নামে বান্ধ ভেলা রোজ হাশরের বেলা

(খ) কলেমার বরকতে দোজখের আজাবেতে
নবী নামে হৈয়া যাবে পার।

৩। নীচের বিষয়গুলির টীকা লিখ :—
নবী, কলেমা, উম্মত, নূহ নবী, শয়তান।

www.pathagar.com

মানুষ কে?

এই কবিতাংশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা-সাহিত্যের যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যযুগের শেষ কবি। তাই তাঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রীয় যুগের আভাষ আছে। আবার যে-কবিতা ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ আধুনিক যুগের কবিতা, তাঁহারও পূর্বাভাষ তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তা ও ব্যঙ্গ-কুশলতা। তাঁহার পূর্বকালের কবিদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অল্পাধিক অশ্লীলতা এবং শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা দোষও তাহার কবিতায় আছে। ইহা ছাড়া তিনি ভাল করিয়া লেখাপড়া করেন নাই বলিয়া তাঁহার আরও দুইটি দোষ দেখা যায়—মার্জিত রুচির অভাব ও উচ্চ লক্ষ্যের অভাব।

আলোচ্য কবিতাংশে তিনি প্রকৃত মানুষ কে—তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। চিত্ত-স্থৈর্য, পরার্থপরতা, সন্তোষ, সাম্য-ভাব, স্বদেশ-বাৎসল্য, বিনয়, মিষ্ট-ভাষণ, নির্ভীকতা, চিন্তাশীলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও নিরলসতা প্রভৃতি যে-সকল মহৎ গুণ প্রকৃত মানুষের অলঙ্কার বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই শিক্ষণীয়।

টীকা

বাণী—বাগ্দেবী ও বিদ্যা-দেবী সরস্বতী। "সর্বদা রসনা-রাজ্যে বাস করে বাণী"—এই চরণ দ্বারা সুবক্তৃতা বা বাগ্মিতা বুঝান হইয়াছে। কারণ রসনা বা জিহ্বায় বাণী বা বাগ্দেবীর অধিষ্ঠান দ্বারা জিহ্বার যে অন্যতম প্রধান কাজ বাক্য-উচ্চারণ করা—সেই বাক্য-উচ্চারণ কার্যের শ্রেষ্ঠতম পরিণতি বাগ্মিতা-ই বুঝায়।

প্রশ্ন

১। কবির অনুসরণে "মানুষ কে"? —প্রশ্নটির উত্তর লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক নিম্ন কবিতাংশের ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন॥

(খ) পর্বত সলিল হয় রসনার রসে।

(গ) স্মরণ স্মরণ মাত্র আজ্ঞাকারী যার।

৩। আলোচ্য কবিতার যে-স্তবক হইতে নীচের দুইটি চরণ উদ্ধৃত হইল তাহার অবশিষ্ট ছয়টি চরণ লিখিয়া স্তবকটি পূর্ণ কর : —

"অহঙ্কার মদে কভু নহে অভিমানী
সর্বদা রসনা-রাজ্যে বাস করে বাণী।"

www.pathagar.com

বীরবাহুর মৃত্যু

এই কবিতাংশ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-রচিত "মেঘনাদবধ কাব্য" হইতে উদ্ধৃত। মধুসূদন যুগান্তকারী সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি সামগ্রীক সাহিত্য-বিচারে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম স্রষ্টা ও প্রবর্তক ; আর শুধু কাব্য-সাহিত্য-বিচারে বাংলা কাব্য সাহিত্যের আধুনিক যুগের আদি ও সফল স্রষ্টা। শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়—মধুসূদন বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গীতি-কবিতা মহাকাব্য, প্রহসন এবং নাটকেরও আদি প্রবর্তক। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমবেতভাবে যে-পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন—মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের দ্বারা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সেই পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হইয়াছেন। পয়ার ও ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণার মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মুমূর্ষু হইয়া আসিয়া ছিল ; মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই মৃতপ্রায় দেহে যেন নব জীবন ও নব যৌবনের সঞ্চার করিল। শুধু কাব্য নয়—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে বাংলা-গদ্যও সতেজ ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। "মেঘনাদবধ কাব্য" মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ যুগে মহাকাব্যই ছিল কাব্য-রচনার আদর্শ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৃত্রসংহার" ও নবীন সেনের "রৈবতক" প্রভৃতি মহাকাব্য এ যুগেরই সৃষ্টি।

আলোচ্য কবিতাংশ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি নিদর্শন। এই কবিতাংশের ভাষার গঠন, বেগ, গতি, শব্দঝংকার ও শব্দপ্রয়োগ-রীতি বাংলা ভাষায় অভিনব এবং ভাষার গাম্ভীর্য ও ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে সফল ও সার্থক। এমন ঝংকার-ময় ও গাম্ভীর্য-ময় ভাষার সৃষ্টি ব্যাপারে মধুসূদন আজও অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আলোচ্য কবিতাংশে লঙ্কাধিপতি রাবণের রাজ-সভায়, তাঁহার পুত্র বীরবাহুর সঙ্গে অযোধ্যারাজ দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে বীরবাহুর নিধন কাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনকারী দূতের মুখে রাবণ-সমক্ষে বর্ণনা করা হইতেছে। এ বর্ণনায় যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বময় ভয়াবহতা এবং শোকাচ্ছন্ন রাজ-সভার বিষাদময় গাম্ভীর্য যে-ভাষায়, যে-শব্দ ঝংকারে ও যে-পরিবেশ-পটভূমিতে প্রদত্ত হইয়াছে, বাস্তবিকই তাহা অনবদ্য।

টীকা

ভগ্নদূত—যে দূত বা সংবাদ-বাহক পরাজয়ের সংবাদ আনয়ন করে।

বীরবাহু—লঙ্কার অধিপতি রাক্ষস-রাজ রাবণের পুত্র। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হইলে তাহাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র যখন লঙ্কা আক্রমণ করেন সেই রাম-রাবণের যুদ্ধে বীরবাহু রাক্ষস-সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন এবং রামের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হন।

দশাননাত্মজ—বীরবাহু। রাবণের দশ মাথা তথা দশ আনন বা মুখ ছিল। সেজন্য রাবণের অপর নাম দশানন। দশাননাত্মজ—অর্থ দশাননের আত্মজ বা পুত্র। এখানে দশানন বা রাবণের পুত্র বীরবাহু—রাবণের অন্য পুত্র নহে।

লঙ্কাপতি/রাক্ষসপতি—রাবণ—তিনি লঙ্কা রাজ্যের এবং তথাকার রাক্ষস জাতির অধিপতি ছিলেন।

রক্ষঃকুল নিধি—রাবণ। তিনি রক্ষঃকুল বা রাক্ষসকুলের নিধি বা অমূল্য ধন স্বরূপ ছিলেন। "রামায়ণ" রচনার সমসাময়িক কালে এবং তৎপূর্বকালেও "আর্যাবত" বা উত্তর-ভারত

www.pathagar.com

বিজয়ী আর্যগণ দক্ষিণ-ভারত ও তদসন্নিহিত দ্বীপ সিংহল বা লঙ্কার অধিবাসী অনার্যদিগকে "বানর", "রাক্ষস" প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। "রামায়ণে"র আদি কবি আর্য-ঋষি বাল্মীকিও দাক্ষিণাত্যের কিস্কিন্ধার অধিবাসীদিগকে "বানর" এবং লঙ্কার অধিবাসীদিগকে "রাক্ষস" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য লঙ্কার অধিপতি রাবণকে "রাক্ষস-পতি" বা "রক্ষঃকুলনিধি" প্রভৃতি নামে অভিহীত করা হইয়াছে।

মন্দোদরী--মনোহর—রাবণ ; রাক্ষস-রাজ রাবণের মহিষীর নাম মন্দোদরী। সেজন্য রাবণকে "মন্দোদরী মনোহর"—অর্থাৎ মন্দোদরীর মন হরণকারী বলা হয়।

রাঘব—রঘুবংশীয়—রামচন্দ্র। তিনি অযোধ্যার রঘু-বংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতা কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার প্রাক্কালে বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে তিনি চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে প্রেরিত হন এবং স্ত্রী সীতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ অশোক বনে অবস্থানের সময় তথা হইতে লঙ্কাধিপতি রাক্ষস-রাজ রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হন। রামচন্দ্র যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত ও সবংশে নিহত করিয়া সীতাকে লঙ্কা হইতে উদ্ধার করেন এবং বনবাসের চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া তথাকার রাজ-সিংহাসনে আসীন হন। রামায়ণ নামক মহাকাব্যের তিনিই প্রধান চরিত্র। হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বা মানব-দেহধারী-ভগবান বা ঈশ্বর মনে করেন। ("বাংলার বৃত্তান্ত" নামক কবিতার "রামজীর কুদরত" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।)

দশরথাত্মজ—রামচন্দ্র। রামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি দশরথের পুত্র। "দশরথাত্মজ" অর্থ দশরথের আত্মজ বা পুত্র। এখানে "দশরথাত্মজ" দ্বারা দশরথের লক্ষ্মণ প্রমুখে অন্য কোন পুত্রকে না বুঝাইয়া রামচন্দ্রকেই বুঝাইতেছে।

বাসব চাপ—ইন্দ্রের ধনু। স্বর্গপুরী ও স্বর্গের সুখ ও ধনৈশ্বর্যের অধিপতি বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের অন্য নাম বাসব। "বাসপ চাপ" দ্বারা রামধনুও বুঝায়।

ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন ভুবন।

"ক্ষত বক্ষঃস্থল মম,..রিপু প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা"—আমি সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছি. সুতরাং শত্রুর অস্ত্রাঘাতে বক্ষস্থল ক্ষত হইয়াছে ; পলায়ন করি নাই, সুতরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই।

হৈমলঙ্কা—স্বর্ণ-লঙ্কা অর্থাৎ লঙ্কা এত বিত্তশালী দেশ ছিল যে, তাহাকে স্বর্ণ-লঙ্কা বলা হইত।

শয়-শয্যা—প্রাচীনকালে যখন তরবারি ও তীর-ধনু দিয়াই যুদ্ধ হইত—তখন প্রকৃত বীরেরা সাধারণতঃ দুই একটি শর বা তীর দ্বারা আহত হইয়াই পড়িয়া যাইতেন না ; তাঁহারা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া এবং কোন আঘাতের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অজস্র শরাঘাতে তাঁহাদের দেহ জর্জরিত করিয়া তাঁহাদিগকে সংজ্ঞাহীন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যাইতেন এবং সেরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপতিত হইলেও তাঁহাদের দেহে অজস্র শর বিদ্ধ থাকায় দেহ ভূমি স্পর্শ না করিয়া শরের উপরই থাকিয়া যাইত অর্থাৎ তখন ভূমির পরিবর্তে শরই তাঁহাদের শয্যারূপে পরিণত হইত। এরূপ অবস্থাকেই শর-শয্যা বলা হয়। অতএব "শর-শয্যা"র ভাবার্থ হইল : যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভিকভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরণ।

প্রশ্ন

১। কবির অনুসরণে বীরবাহুর সহিত রাঘবের যুদ্ধের বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

www.pathagar.com

২। কবি লিখিয়াছেন :—

"ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি গগনে।"
কোথায় ধূলা উঠিল এবং কেন ?—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর লিখ।

৩। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যা লিখ : —

"ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির টীকা লিখ :—

শরশয্যা, রাঘম, মন্দোদরী-মনোহর, বাসব চাপ, দশরথাত্মজ, ত্রিভুবন, রক্ষঃকুলনিধি।

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নামক কবিতা-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। এই কবিতাটি "সনেট্" (Sonnet) বা চতুর্দশ-পদী কবিতা। পাশ্চাত্য কাব্যের অনুসরণে মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা-কাব্যে "সনেট্" প্রবর্তন করেন বলিয়া সকলের ধারণা। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্যাপদে"ও দুইটি চতুর্দশ-পদী কবিতা রহিয়াছে। যাহা হউক, "চতুর্দশ-পদী কবিতা"—এই নামটি তাঁহারই দেওয়া। বাংলা-কাব্যের যুগান্তকারী প্রতিভা মধুসূদন বাংলা-কাব্যে তাঁহার প্রবর্তিত "অমিত্রাক্ষর" ছন্দের ন্যায় তদ্দ্বারা পুনঃপ্রবর্তিত এই সনেট্ বা চতুর্দশ-পদী কবিতায়ও রচনার যে-কৌশল ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। পয়ার-ছন্দের চৌদ্দটি লাইনে বাংলা সনেট্ রচিত হয়। ইহার মিলের নিয়ম বড় কড়া, খাঁটি সনেটে দুইটি ভাগ থাকে—আট লাইন ও ছয় লাইন।

আলোচ্য কবিতাটি কবির জন্মভূমি যশোহর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামের পার্শ্বে দিয়া প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদকে স্মরণ করিয়া লেখা। কবি যৌবনে খৃষ্টান-ধর্ম অবলম্বন করার ফলে জীবনে আর স্বগ্রামে ফিরিয়া যান নাই। মাদ্রাজে এবং বিলাতে তাঁহার জীবনের বহুদিন অতিবাহিত হয়। বিলাতে থাকাকালীনই তিনি তাঁহার সনেট কবিতাগুলির অধিকাংশ রচনা করেন। সেই বিদেশে থাকিয়া এই আলোচ্য সনেট কবিতায় তাঁহার জন্মভূমির বক্ষ-প্রবাহিত শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি-বাহী কপোতাক্ষ নদ সম্পর্কে যে-মনের আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বড় করুণ-মধুর।

প্রশ্ন

১। "কপোতাক্ষ নদ" শীর্ষক কবিতাটির প্রথম আটটি চরণ মুখস্থ লিখ।

২। নিম্ন-উদ্ধৃত কবিতাংশের প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া যন্ত্র-ধ্বনি।

(খ) দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

(গ) প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি।

৩। "কপোতাক্ষ নদ" নামক কবিতায় কবি বলিয়াছেন :—
"—এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে"
লইছে সে তব নাম।"—এখানে কে কাহার নাম লইতেছে? এবং কি উপায়ে লইতেছে—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন দুইটির উত্তর দাও।

মধ্যাহ্ন

এই কবিতাটি বিহারীলাল চক্রবর্তী-রচিত "শরৎকাল" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বিহারীলাল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নব্য গীতি কবিতার প্রবর্তক। তাঁহার পূর্বে মহাকাব্য রচনাই বাংলা কাব্য-রচনার আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পর্কে বলিয়াছেন : "এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব গীতিকার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। মহাকাব্যের উচ্চ শিখর হইতে অবতরণ করিয়া গীতি কবিতায় স্বর্ণ সিংহদ্বার তিনিই বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহার কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য-পিপাসা।" রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় বিহারীলালের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গীতি-কবিতা রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের ভাব-শিষ্য বলা হয়।

আলোচ্য কবিতায় কবি মধ্যাহ্নের উদাস, শান্ত-স্তব্ধ প্রকৃতির রূপ সাফল্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। রৌদ্র-দগ্ধ, কপোত-কূজনীত, চিল-শকুনীর পক্ষ-বিধুনিত বাংলার নিঝুম মধ্যাহ্নের ছবি কবিতাটিতে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন

১। বিহারীলাল চক্রবর্তীর "মধ্যাহ্ন" শীর্ষক কবিতাটি মুখস্থ লিখ।
২। কবির অনুসরণে মধ্যাহ্নের রূপ বর্ণনা কর।
৩। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যা কর :—
"বিমল নীল নিথর শূন্য
শূন্য-শূন্য—অগম শূন্য।"

ধার্মিক ও পাপী

কবিতাটি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-রচিত "সদ্ভাব-শতক" হইতে উদ্ধৃত। ফার্সী ভাষায় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি ইরাণী বা পারস্য-দেশীয় কবিদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফেজ ও শেখ সা'দীর বহু কবিতা তিনি বাংলায় কাব্যানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা-পুস্তক "সদ্ভাব-শতকের" অধিকাংশ কবিতা-ই এই শ্রেণীর। তাঁহার কবিতার ছন্দ সরল এবং ভাষা সহজ ও পরিমার্জিত।

www.pathagar.com

আলোচ্য কবিতায় কবি ধার্মিক ও পাপীর চরিত্র ও মানস-লোকের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন

১। "ধার্মিক ও পাপী" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে ধার্মিক ও পাপীর চরিত্র ও মানসিকতা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যা কর :—

বিভূর পবিত্রাসন ধার্মিকের মন,
পাপীর মানস অসুরের নিকেতন।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

ধার্মিকের সুখ-আশা শাশ্বতী নিশ্চয়,
সুখ-আশা পাপীর ঐহিকে বদ্ধ রয়।

৪। সরল ভাষায় তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর :—

ধার্মিকের সরল মানস অবিরত,
তুঙ্গ-ধর্ম শৈল-শৃঙ্গ উঠিতে উদ্যত।

৫। "ধার্মিক ও পাপী" শীর্ষক কবিতাটির প্রথম দশটি চরণ মুখস্থ লিখ।

সমুদ্র

এই কবিতাটি নবীনচন্দ্র সেন-রচিত কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। নবীনচন্দ্র সেন বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের পরিবর্তন যুগ বা নূতন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার যুগের আদর্শ-অনুযায়ী তিনি মহাকাব্য রচনায়ই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত "রৈবর্তক", "প্রভাস", "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে-সকল খণ্ড-কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন সেগুলি তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তাঁহার কাব্য অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস দোষে অনেকটা দুর্বল, কিন্তু তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ছন্দ মধুর-গম্ভীর।

আলোচ্য কবিতায় কবি সমুদ্রের বর্ণনা দিয়াছেন। সমুদ্র-বারি-বিধৌত চট্টল বা চট্টগ্রামের তিনি অধিবাসী। আবাল্য সমুদ্র-দর্শনের ফলে সমুদ্রের যে ভাব-গম্ভীর রূপ তাঁহার কবি-মানসে শৈশব হইতেই সংগোপনে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহারই চিত্র এই কবিতায় তিনি ছন্দময়ী লীলায়িত ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন। বর্ণনাটি ভাব-গম্ভীর ও মধুর।

টীকা

"সমুদ্র-মন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি"—হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া মন্দর-পর্বতকে দণ্ড এবং পাতালবাসী নাগ বা সর্পদের রাজা বাসুকী-নাগকে রজ্জু করিয়া সাগর-জল মন্থন বা আলোড়ন করিয়া লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, অমৃত ও হলাহল উত্তোলন করেন। এই অমৃত পান করিলে মৃত্যু হয় না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা কর :—

সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধুসহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর :—

নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরল হৃদয়-সিন্ধু, তরঙ্গ অনন্তোচ্ছাস।

দিন ফুরায়ে যায়

এই কবিতাটি গোবিন্দচন্দ্র দাসের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত। কবি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অধিবাসী এবং তাঁহার সময়কার পূর্ব-বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। তাঁহার সমসাময়িক আধুনিক কবিগণের তুলনায় গোবিন্দদাস তেমন শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার রচনায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট এবং তাঁহার ভাষা ও কল্পনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিদ্যমান। তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব-বাংলার অখ্যাত ফুল, পাখী, গাছপালা, তরুলতা প্রভৃতির নাম তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। পিপি, কোড়া, কালেম, সরালী, ডাহুক প্রভৃতি পাখীর নাম ; আগড়াগাছ, বউনাগাছ, কাফিলাগাছ প্রভৃতি গাছের নাম ; "উদ্‌লা" (অনাবৃত), "ওশোরায়" (বারান্দায়), "কীল-কুনি" (মুষ্টি ও কনুইর দ্বারা আঘাত), "ঝিয়ারী", "নায়রী"—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এমন বহু গ্রাম্য শব্দ এই কবির কবিতায় এরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে পূর্ব-বাঙ্গলার পল্লীর একটা জীবন্ত ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

আলোচ্য কবিতায় কবি সারাজীবন মানব-সেবা অর্থাৎ অনাথ-আতুর, পাপী-তাপী, আর্ত-শোকাতুর, দীন-দুঃখী, লাঞ্ছিত-দলিতকে কতখানি সেবা-সাহায্য করা হইল, জীবন-সায়াহ্নে নিজকেই নিজে সে প্রশ্ন করিয়াছেন ; এ প্রশ্ন বড় করুণ এবং করুণ-ভাষায়ই কবি সে কথা এ কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন

১। "দিন ফুরায়ে যায়" শীর্ষক কবিতার প্রথম ছয় লাইন মুখস্থ লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক নিম্ন উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যা কর : —

(১) এক পা কেবল পারে আছে এক পা দিছি নায়।

(২) পিতার বদল পিতা হয়ে, মায়ের বদল মায়।

(৩) নিরাশ প্রাণে ব্যোমের দিকে ডোমের দিকে চায়।

(৪) যার রেণুতে দেহ গড়া, যার কোলে শেষ শয়ন করা
তার করিলাম কোন উপকার প্রাণের মমতায়?

এক বর্ষ

এই কবিতাটি কবি কায়কোবাদ-রচিত "অশ্রুমালা" কাব্য হইতে উদ্ধৃত। পুঁথি-সাহিত্যের কবিদের পরে মার্জিত বাংলায় যে-সকল মুসলমান কবি কাব্য-রচনায় অগ্রসর হইয়া সাফল্য অর্জন ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন, কবি কায়কোবাদ তাঁহাদের অগ্রণী। ভাবের সহজ উৎসার, ছন্দের মুক্ত গতি, এবং ভাষার একটি সরল ও বিশুদ্ধ রীতি তাঁহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাব্য রচনায় তিনি নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্রেরই অনুসারী এবং তাঁহাদের অনুসরণে "মহাশ্মশান" এবং "শিব-মন্দির" বা "মহরম-পর্ব" নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তিনি বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের তথা গোটা বাংলা-সাহিত্যের পরিবর্তন-যুগ বা মধ্যযুগ—যে-যুগে কাব্য-রচনা-ক্ষেত্রে মহাকাব্য রচনাই কবিদিগের আদর্শ ছিল, সেই যুগের শেষ সফল কবি। গীতি-কবিতায়ও তিনি যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার "অশ্রুমালা" কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আলোচ্য কবিতায় কবি মহাকালের চিরগতিমান স্রোতধারার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত, জল হইতে উত্থিত জলবুদ্বুদের আবার জলে মিশিয়া যাইবার মত, সময়-স্রোত হইতে উত্থিত হইয়া আবার মুহূর্তে সেই সময়-স্রোতই বিলীন হইয়া যাইতেছে—কত জীবন, কত রাজ্য, কত বৈভব সেই মহাকালের চিরস্রোতে ডুবিয়া-নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহারই চিরন্তন কাহিনী কবি এই কবিতায় ভাবময়ী ভাষার এবং সরল-মধুর ছন্দে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রশ্ন

১। "এক বর্ষ" শীর্ষক কবিতাটির মর্মার্থ তোমার নিজ ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক নিম্ন উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা কর :—

(ক) অই দেখ মহানদী গভীর গর্জনে
গ্রাসিতেছে কত চিত্র নয়ন-রঞ্জন,
মিশিয়া অনন্ত নীল আকাশের সনে
গর্জিছে বিপুল বেগে তরঙ্গ ভীষণ।

(খ) সম্মুখে অনন্ত, হায় অনন্ত পশ্চাতে,
অনন্তে অনন্তে মরি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।

৩। "এক বর্ষ" শীর্ষক কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক মুখস্থ লিখ।

আগ্রা নগরী

এই কবিতাটি কবি কায়কোবাদ-রচিত "মহাশশ্মান" নামক মহাকাব্য হইতে উদ্ধৃত। এই মহাকাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মুসলমান কবিদের মধ্যে যাঁহারা পরিমার্জিত বাংলায়, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, একমাত্র কবি কায়কোবাদই বোধহয় তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনায়ও বোধহয় তিনিই একমাত্র সফল মুসলমান কবি। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাষা মাইকেল

www.pathagar.com

মধুসূদন দত্তের মত ধ্বনি-গম্ভীর, ঝঙ্কার-বহুল ও রুদ্র-মধুর নহে—এ ভাষা সহজ-সরল, সাবলীল ও গাম্ভীর্যময়।

এই কবিতায় কবি গভীর নিশীথে বৃষ্টি-ধৌত, তারকা-খচিত আকাশের নীচে ম্লান চন্দ্রালোকে আগ্রার ও আগ্রার মুকুট-মণি তাজমহলের যে-অপূর্ব বেদনা-মাধুর্যময়ী রূপ দেখিয়েছেন, তাহাই ভাব-গভীর লীলায়িত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রশ্নমালা

১। কবি কায়কোবাদ লিখিয়াছেন : "ভূতলে নন্দন-শোভা, শান্তি-নিকেতন।" সেই "শান্তি-নিকেতন" কোথায় এবং কি ? প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাহার বর্ণনা লিখ।

২। নিম্ন উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা লিখ :—

শ্যামল জলদ পাশে ম্লান শশধর
অর্ধ নিমিলিত নেত্রে ঢুলু ঢুলু করি
প্রকৃতির স্কন্ধে শির রাখিয়া কাতরে
চেয়ে আছে বিশ্বপানে।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক নিম্ন-উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যা কর :—

প্রত্যেক হর্ম্যের সনে যে-স্মৃতি জড়িত
উঠিবেনা চিহ্ন তার শত যুগান্তরে
অনন্ত কালের মহা অনন্ত প্লাবনে।

৪। কবি কায়কোবাদের অনুসরণে আগ্রা নগরীর বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

গীতি-কবিতা

এই কবিতা অক্ষয়কুমার বড়াল-রচিত "প্রদীপ" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত গীতি-কবি অথচ রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার পার্শ্বে থাকিয়াও তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত নহেন। তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীর-কাব্য-শিষ্য। তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ভাষার মিতভ্যায়িতা ও বিশুদ্ধতা এবং কল্পনার গাঢ়তা।

আলোচ্য কবিতায় কবির বক্তব্য হইল এই :— ক্ষুদ্র জিনিষই যেমন সমস্ত বৃহৎ জিনিষের মূলীভূত উপাদান এবং প্রতি ক্ষুদ্র বস্তুই যেমন তদজাতীয় বৃহৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বরূপ ঠিক তেমনিভাবে গীতি-কবিতা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কাব্য-ক্ষেত্রে সুবৃহৎ কাব্য—মহাকাব্যের প্রাণ-শিহরণ ও ভাব-মাধুর্য্য ইহার মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্নাবলী

১। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর :—

ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির ঊষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের গাছে অনন্ত ভুবন।

www.pathagar.com

২। "গীতি-কবিতা" শীর্ষক কবিতাটিতে কবির কি বক্তব্য তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৩। নিম্ন উদ্ধৃতির মর্মার্থ লিখ :—

ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু চক্র ঘুরে ;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ।

বর্ষ শেষ

এই কবিতাটি বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কল্পনা" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং তাহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—এবং ভারতের মহাকবিদের একজন। গীতি-কবি হিসাবে তিনি সারা ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির শীর্ষস্থানীয়। শুধু কাব্যে নহে—নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কথিকা, শিশু-সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি—বাংলা-সাহিত্যের সর্বশাখায় যেখানে তিনি হাত দিয়াছেন সেখানেই সোনা ফলিয়াছে—সেখানেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সে শাখাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। এক কথায়, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। তাঁহার হাতে বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্য পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

আলোচ্য কবিতাটির ভাব, ভাষা, ছন্দ, শব্দ-ঝংকার ও সাবলীলতা অপূর্ব ও অনবদ্য। এ কবিতায় কবি চৈত্র শেষের এক বর্ষণ ও ঝঞ্ঝা-মুখর সায়াহ্নের যে-অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এক কথায় অনির্বচনীয়। বহিঃপ্রকৃতির চাঞ্চল্যের সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্প্রকৃতি এবং অন্তর্লোকেও যে আলোড়নের ও প্রাণ-শিহরণের সৃষ্টি হয়, কবি এ-কবিতায় তাহাকেও রূপায়িত করিয়াছেন। পুরাতন বৎসরের সমস্ত নিষ্ফল সঞ্চয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া শুধু দিনযাপন ও প্রাণ ধারণের গ্লানিকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার উদগ্র কামনায় বজ্রের আলোতে মহান মৃত্যুর মুখামুখি হইবার জন্য কবির যে-প্রজ্ঞা আকাঙ্ক্ষা, এ কবিতা তাহারই প্রকাশ। কবিতাটির ভাব, ভাষা ও ছন্দের গতিবেগ চৈত্র-সন্ধ্যার ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্যের মতই উদ্দাম ও রুদ্র-সুন্দর।

প্রশ্নাবলী

১। "বর্ষ শেষ" নামক কবিতার অনুসরণে চৈত্র-শেষের সন্ধ্যার বর্ণনা নিজ ভাষায় লিখ।

২। "বর্ষ শেষ" শীর্ষক কবিতায় ঝঞ্ঝাময় চৈত্র-সন্ধ্যায় বর্ণনা দিতে দিতে কবির মনে জীবন সম্পর্কে যে-ভাবের উদয় হইল তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৩। সরল ভাষায় তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর :—

(ক) হৃদয় নির্দয় ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।

(খ) ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল বৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।

www.pathagar.com

(গ) বিজয় গর্জন স্বনে অভ্র ভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গল নির্ঘোষ
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

৪। "বর্ষ শেষ" শীর্ষক কবিতার বর্ণনা অনুসারে "উদ্দাম পথিক" কাহারা? তোমার নিজ ভাষায় তাহাদের বর্ণনা লিখ।

৫। "বর্ষ শেষ" নামক কবিতা হইতে নিম্নোদ্ধৃত চরণ দুইটির মধ্যবর্তী চরণগুলি উদ্ধৃত চরণদ্বয়সহ মুখস্থ লিখ :—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
* * * *
বজ্রের আলোতে।

৬। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশগুলি প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধে লয়ে যাও
পস্ক কুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

(খ) শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাঙ্কিত কালি।

দুরন্ত-আশা

এই কবিতাটি বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের "মানসী" নামক কাব্য-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। আলোচ্য কবিতায় কবি আরাম-প্রিয়, সভ্য-ভব্য, শান্ত-শিষ্ট, পোষ-মানা ও ঘর-মুখো সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া একটা জীবন-চঞ্চল, মৃত্যু-ভয়-হীন ও দুরন্ত-দুঃসাহসী জীবনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি আরবের চির যাযাবর, চির-স্বাধীন, ও চির-দুর্দান্ত মরু-সন্তান বেদুঈনদের ছন্নছাড়া, সংগ্রাম-মুখর ও সঙ্কট-সংকুল জীবন-যাত্রা পদ্ধতির প্রতি সঙ্কোচহীন শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন এবং তেমনই একটা চির-মুক্ত, প্রাণ-উদ্বেল এবং মিথ্যা-ভদ্রতার ভণ্ডামী-হীন জীবন লাভের যাজ্ঞা যাঞ্চা করিয়াছেন। কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব ধারা যেমন বাঙ্গালীর প্রচলিত জীবন-যাত্রা-প্রণালীর বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব ও বিদ্রোহ, কবিতার ছন্দটিও বাংলা-কাব্য-সাহিত্যে তেমনি বিপ্লবাত্মক, বেগমান ও গতি-চঞ্চল।

টীকা

বেদুয়িন (বেদুঈন)—আরবের মরু-চারী যাযাবর অধিবাসী। মেষ ও অশ্ব-পালনই ইহাদের প্রধান জীবিকা। পূর্বে লুণ্ঠনই ইহাদের অন্যতম ব্যবসায় ছিল। ইহারা অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়

www.pathagar.com

ও দুর্দান্ত-প্রকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাদের একটি প্রধান ও বিশেষ গুণ হইল, অতিথি-পরায়ণতা। একবার কেহ তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলে তাহার আর কোন আশঙ্কা থাকে না এবং যে-কোন বিপদে সেই অতিথিকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

প্রশ্নাবলী

১। "দুরন্ত-আশা" শীর্ষক কবিতায় কবি বাঙ্গালী জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। "দুরন্ত-আশা" কবিতায় কবি আরব বেদুয়িন (বেদুঈন) জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব।

(খ) বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।

(গ) বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ।

(ঘ) আর্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বি থর থর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য লিখ :—

(ক) অন্ধকারে সূর্যালোকে সন্তরিয়া মৃত্যু-স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।

(খ) দাস্যসুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর।

৫। "দুরন্ত-আশা" নামক কবিতার তৃতীয় স্তবকটি মুখস্থ লিখ।

ন্যায় দণ্ড

এই কবিতাটি বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নৈবদ্য" নামক কাব্য-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কবিতাটি চতুর্দশ পদ বিশিষ্ট কিন্তু "সনেট" বা চতুর্দশ পদী কবিতা নহে। কারণ সনেটের মিলের নিয়ম অন্যরূপ এবং শুধু ঐপ্রকার বিশেষ মিল-সমন্বিত ও চতুর্দশ পদ-বিশিষ্ট কবিতাকেই সনেট বলা হয়।

এই কবিতায় কবি বিশ্ব-বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, বিধাতা প্রত্যেক মানুষের উপরই ন্যায় বিচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন ; কারণ প্রত্যেক মানুষকেই তিনি বিবেক সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কাহারো ভয়ে কিংবা ভ্রূকুটিতে যেন আমরা ন্যায় বিচারের পথ হইতে বিচ্যুত না হই এবং ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজন ও অবস্থা অনুসারে আমরা যেন কোমল কিংবা কঠোর হইতে পারি এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে অপ্রিয় ও নির্মম সত্যভাষণেও পশ্চাদপদ না হই। এই কবিতায় কবি একথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, অন্যায় করা যেমন দোষনীয়—অন্যায় সহ্যও তাহার চেয়ে কম দোষনীয় নয়—কারণ অন্যায়

www.pathagar.com

সহার ফলেই অন্যায়কারী বা অত্যাচারী অন্যায় ও অত্যাচার করিবার সাহস পায়। অন্যায় ও অত্যাচারের বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কা থাকিলে অন্যায়কারী ও অত্যাচারী অন্যায়-অত্যাচার করিবার সাহসই সঞ্চয় করিতে পারিত না। অতএব কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, অন্যায়-কারী ও অন্যায়-সহ্য-কারী উভয়ের উপরই যেন বিধাতার অভিশাপ সমানভাবে বর্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। "ন্যায় দণ্ড" নামক কবিতাটিতে কবির বক্তব্য তোমার নিজ ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। ব্যাখ্যা কর : —

(ক) তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসন ভার।

(খ) যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়গ সম
তোমার ইঙ্গিতে।

(গ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

৩। "ন্যায় দণ্ড" শীর্ষক কবিতাটি মুখস্থ লিখ।

জুতা-আবিষ্কার

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ-রচিত "কল্পনা" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইহা একটি হাস্য-রসাত্মক বিদ্রূপাত্মক কৌতুক-কবিতা। ইংরেজী-কাব্যে যাহাকে "সেটায়ার" (Satire) বলে, ইহা অনেকটা সেই জাতীয় কবিতা। আমাদের দেশে "হবুচন্দ্র রাজা" আর "গবুচন্দ্র মন্ত্রী"র নির্বুদ্ধিতা লইয়া বহু গল্প প্রচলিত আছে। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার নির্বুদ্ধিতা, একগুয়েমী বা খামখেয়ালীর ফলে অনুষ্ঠিত কোন ব্যাপক অন্যায় বা বুদ্ধিহীন কার্যের ইঙ্গিত দান বা উল্লেখের ব্যাপারে "হবু-গবু"র নাম দেশে অনেকটা প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একচ্ছত্র ক্ষমতাধিকারী প্রাচীন রাজা-বাদশাহ্‌দের আমলে রাষ্ট্র-পরিচালনা বা ব্যক্তিগত কার্যাদি ব্যাপারে তাঁহাদের খামখেয়ালী, অজ্ঞতা বা আলস্যের ফলে বহুবিধ অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা-মূলক কাণ্ডকারখানা যে না ঘটিয়াছে—তাহা নহে। কারণ, কোন দেশেরই প্রচলিত কাহিনী ও প্রবাদ-বাক্য অকারণে সৃষ্ট হয় না। তাহাদের পশ্চাতে কোন-না-কোন আকারে সত্যের বাস্তব অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। আধুনিক কালেও পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্রে নির্বুদ্ধিতামূলক এমন সব উদ্ভুদ ঘটনা যে না ঘটে তাহা হলফ্ করিয়া বলা যায় না। অতএব কোন-না-কোন রূপ ধারণ করিয়া "হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র" চিরজীবী হইয়া আছে এবং তাহাদিগকে লইয়া কৌতূক-কাব্য রচনার জন্য কোন কালে হাস্য-রসিক-কবিরও অভাব হয় নাই। তবে এরূপ কাব্য সাফল্যের সহিত রচনায় ভাবানুযায়ী শব্দ প্রয়োগের কৌশল রসিকতার মাত্রাজ্ঞান এবং ছন্দের চটুল গতিভঙ্গী সম্বন্ধে যথেষ্ট দক্ষতা থাকা দরকার। আলোচ্য কবিতা এমনই

www.pathagar.com

নিপুণ দক্ষতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য-সাধনা—বিশেষ করিয়া বাংলা-কাব্য-সাধনার সর্বক্ষেত্রে কিরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বি দিগ্বিজয়ী হইয়া আছে, এ কবিতাটি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

টীকা

হেরিল চোখে সর্ষে--মাথায় বা মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত লাগিলে স্নায়ুবিক কারণবশতঃ চোখের সম্মুখে সর্ষে ফুলের মত ফুলঝুরি দেখা দেয়। এই মূল-অর্থে, মস্তিষ্ক চিন্তায় অপারগ হইলে কিংবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলে সে অবস্থাকে "চোখে সর্ষে দেখা বা সর্ষে ফুল দেখা" বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। "জুতা-আবিষ্কার" নামক কবিতার কাহিনী তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। "জুতা-আবিষ্কার" শীর্ষক কবিতার তাৎপর্য ও নিহিতার্থ কি, তাহা বুঝাইয়া লিখ।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি
রাজ্যে এ মোর একি অনাসৃষ্টি।

(খ) ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।

(গ) কহিল রাজা, "করিতে ধূলা দূর
জগৎ হল ধূলায় ভরপুর।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য : —কথ্য ভাষায় "ধূলা" শব্দের বানানে হ্রস্ব-উ-কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ ভাষায় "ধূলি" শব্দে দীর্ঘ-উ-কার (ঊ-ূ) অবশ্যই হইবে। কিন্তু এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ "ধূলা" এবং "ধুলি"—উভয় শব্দেই হ্রস্ব-উ-কার ব্যবহার করিয়াছেন।

আলমগীর আওরঙ্গযেব্

এই কবিতাটি সৈয়দ এমদাদ আলী-রচিত "ডালি" নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যে-সকল মুসলমান কবি যথার্থ কাব্য-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সৈয়দ এমদাদ আলী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কাব্যের ভাষা পরিমার্জিত ও সাবলীল এবং ছন্দ নিখুত ও বেগবান।

আলোচ্য কবিতায় কবি মোগল-সম্রাট আওরঙ্গযেবের প্রকৃত চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। আওরঙ্গযেব মোগল-সাম্রাজ্যের পতন—তথা সমগ্র মুসলমান জাতির পতন রোধ করিবার জন্য সারা জীবন যে-দুঃসাধ্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন—জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, কবি এই কবিতায় সেই কঠোর সত্যগুলিই প্রাণের দরদ দিয়া দক্ষতার সহিত কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

www.pathagar.com

টীকা

শিবাজী—মুঘল-সাম্রাজ্যের পতন-যুগে তিনি ভারতে মারাঠা বা মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আওরঙ্গযেব একবার তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লী দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলে তিনি সেখান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

বিজাপুরী—মুঘল-সম্রাট আওরঙ্গযেবের আমলে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাজ্য বিজাপুরের আদিলশাহী বংশীয় অধিপতি।

আলমগীর জিন্দা পীর--আলমগীর শব্দের অর্থ হইল "জগজ্জয়ী" বা পৃথিবী-বিজয়ী। জাহাগীর বা জাহাঙ্গীর শব্দের যে অর্থ—আলমগীর শব্দের সেই একই অর্থ—অর্থাৎ "জগৎ-জয়ী"। আওরঙ্গযেব "আলমগীর" উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং ইসলামের প্রত্যেক আদেশ-নির্দেশ অত্যন্ত কঠোরতার সহিত প্রতিপালন করিতেন। সেজন্য মুসলমানগণ তাঁহাকে "দরবেশ কামেল" বা সিদ্ধপুরুষ মনে করিতেন। প্রচলিত ধারণা—সিদ্ধপুরুষগণ সাধারণতঃ চিরজীবী বা জিন্দা। "পীর" শব্দের শাব্দিক অর্থ—বৃদ্ধব্যক্তি, প্রচলিত অর্থ—গুরু। সেই জন্য আলমগীরকে "জিন্দা পীর" বলা হইত।

প্রশ্নাবলী

১। কবির বর্ণনা অনুসারে আওরঙ্গযেব আলমগীরের চরিত্র ও দুরদর্শিতা বর্ণনা কর।

২। এই কবিতায় আছে : —

"ইসলাম গৌরব তুমি রক্ষিতে যতনে
সুখত্যাগী হয়ে সদা করিলে সাধনা।"

ইসলামের গৌরব রক্ষার্থে আওরঙ্গযেব কি সাধনা করিয়াছিলেন তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মিশাইতে ধূলি সনে মোগলের বল,
পাতিয়াছে চারিদিকে কুটিল কৌশল।

(খ) তাপসের মত
কর্তব্য-কঠিন পথে চলি অবিরত
দেখায়েছ সকলেরে, রাজ ধর্ম লাগি
কিরূপে হইতে হয় সর্বসুখ-ত্যাগী।

৪। "আপনার সুখ-শান্তি দিয়া বিসর্জন"—এই চরণের পরবর্তী চরণ হইতে এই কবিতাটির শেষ অবধি মুখস্থ লিখ।

কবর-ই-নূরজাহান

এই কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত "অভ্র আবীর" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি এবং তাঁহার সাক্ষাৎ কাব্য-শিষ্য হইয়াও কাব্য

www.pathagar.com

রচনায় নিজের স্বকীয়তা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন (ক্লাসিক্যাল) কাব্য-রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাকে ছন্দের যাদুকর বলা হয়। ছন্দের নিছক কারিগরিতে তিনি রবীন্দ্র-যুগের সকল কবির অগ্রগণ্য। তিনি তাঁহার কবিতায় শব্দালংকার ও অর্থালংকারের অপূর্ব কারুকার্যময় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগে তিনিই বোধহয় সর্বপ্রথম পরিমার্জিত বাংলার সঙ্গে আরবী-ফার্সী শব্দ অত্যন্ত সাফল্যের সহিত যোজনা করিয়া বাংলা ভাষাকে এক অপূর্ব সুষমাময় রূপ দান করিয়াছেন। আলোচ্য কবিতাটি তাহার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই কবিতায় কবি মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীর বা জাহাগীরের প্রধানা মহিষী অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী ও অনন্য সাধারণ গুণ-সম্পন্ন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বৈচিত্রময় জীবন-কাহিনী হৃদয়-ঢালা দরদ ও সমবেদনা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবিতার আরবী-ফার্সী-মিশ্রিত ভাষায় ঐশ্বর্য ও বিলাস-বহুল মুঘল শাহানশাহী যেরূপ জীবন্ত রূপ লাভ করিয়াছে, ইহার ছন্দেও তেমনি লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে নৃত্য-মুখরতা ও ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্য—একই সঙ্গে। বাস্তবিক এই সফল কবিতাটি আধুনিক বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের এক নূতন দিক-দর্শনের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে।

টীকা

কবর-ই-নূরজাহান—নূরজাহানের কবর। ফার্সী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই শব্দ সংযোগ সম্পন্ন হইয়াছে।

নূরজাহান—"নূর" আরবী শব্দ—অর্থ : জ্যোঃতি ; "জাহান" ফার্সী শব্দ, অর্থ : জগৎ বা পৃথিবী। "নূরজাহান" অর্থ : জগজ্জ্যোঃতি বা জগতের আলো। নূরজাহান মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী ছিলেন। অপরূপ রূপ-লাবণ্য ও অপূর্ব মনীষার অধিকারিণী এই মুঘল সম্রাজ্ঞীর তুলনা ভারতের ইতিহাসে—এমনকি জগতের ইতিহাসেও বিরল। তাঁহার পৈত্রিক নাম মেহেরুন্নিসা। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিয়া প্রথম "নূর-মহল" বা "রাজ অন্তঃপুরের বা রাজপ্রাসাদের জ্যোঃতি"—এই নামে অভিহিত করেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর কর্তৃক তিনি "নূরজাহান" বা "জগজ্জ্যোঃতি"—এই মহাগৌরবান্বিত পদবীতে ভূষিত হন। এই নামেই তিনি ইতিহাসে ও বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত।

নূরজাহানের পিতা মির্যা গিয়াস ছিলেন পারস্য দেশের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় অথচ দরিদ্র ব্যক্তি। তিনি ভাগ্যান্বেষণে সপরিবারে ভারতবর্ষে আসিবার পথে কান্দাহারের নিকট এক মরুভূমিতে নূরজাহানের জন্ম হয়। দরিদ্র পিতামাতা প্রবাস-পথের কঠোর অভাব-অনটনের দরুণ এই নবজাত কন্যাকে মরুভূমির একস্থানে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর এক বণিক দয়াপরবশ হইয়া এই কন্যাটির ভারগ্রহণ করেন এবং গিয়াস-পরিবারকে ভারতে লইয়া আসেন।

মির্যা গিয়াস তদানিন্তন মুঘল-রাজধানী আগ্রায় আসিয়া বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই মেহেরুন্নিসা বা নূরজাহানের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। সম্রাট আকবরের পুত্র শাহজাদা সেলিম—যিনি পরে জাঁহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সম্রাট হন—মেহেরুন্নিসাকে দেখিয়া তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন। কিন্তু সম্রাট আকবর এক অখ্যাত দরিদ্র পরিবারের কন্যার সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট নিজ পুত্রের বিবাহ অসমীচীন মনে করিয়া মেহেরুন্নিসাকে শের আফগান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেন এবং শের আফগানকে সুদূর বাংলার বর্ধমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক সেখানে পাঠাইয়া দেন।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর শাহাজাদা সেলিম "জাহাঙ্গীর" বা জাঁহাগীর" অর্থাৎ "জগৎ–জেতা" এই নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সম্রাট হইয়াও তিনি মেহেরুন্নিসাকে ভুলিতে পারিলেন না। মেহেরুন্নিসাকে তালাক দিবার জন্য অর্থাৎ মেহেরুন্নিসার সঙ্গে বিবাহ–বিচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি শের আফগানকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শের আফগান সে অনুরোধ প্রত্যাখান করিলেন। অতঃপর জাঁহাঙ্গীর তাঁহার দুধ–ভাই অর্থাৎ তাঁহার ধাত্রী বা দুধ–মাতার পুত্র কুতুবুদ্দীনকে বাংলার সুবেদার বা গভর্ণর করিয়া পাঠাইলেন এবং কুতুবুদ্দীন বোধহয় জাহাঙ্গীরের পূর্বোক্ত অনুরোধ লইয়াই শের আফগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফলে ক্রুদ্ধ শের আফগান কুতুবুদ্দীনকে হত্যা করিয়া ফেলেন এবং নিজেও কুতুবুদ্দীনের লোকজনদের হাতে নিহত হন। অতঃপর মেহেরুন্নিসা আগ্রায় নীত হইয়া সরকারী বরাদ্দকৃত মাত্র চৌদ্দ আনা রোজ খোরাকীতে আগ্রা দুর্গে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। জাঁহাঙ্গীর বোধহয় দুধ–ভ্রাতা কুতুবুদ্দীনের হত্যার শোকে বহুদিন পর্যন্ত মেহেরুন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। অবশেষে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার অপরূপ রূপ–লাবণ্য ও বুদ্ধি–দীপ্ত বাক্–মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর অবিলম্বে তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার রূপে–গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে "নূর–মহল" এবং পরে "নূর–জাহান" নামে তাঁহাকে ভূষিত করেন। নূরজাহান তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও মনীষার–বলে রাজ্যশাসন ব্যাপারেও ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে জাহাঙ্গীরের সমকক্ষ হইয়া উঠেন এবং রাজকীয় মুদ্রায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের মূর্তিও অঙ্কিত হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর প্রায় বিশ বৎসর পর নূরজাহানের মৃত্যু হয় এবং লাহোরের সন্নিকটে জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত "মক্‌বেরা" বা প্রাসাদোপম সমাধি–মন্দিরের নিকটেই একটি সাধারণ সমাধি–ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত অনাড়ম্বর কবরে তিনি সমাহিত হন।

মরুভূমির গুলাব ফুল—নূরজাহান। তাঁহার পিতা সপরিবারে পারস্য দেশ হইতে ভারতে আসিবার পথে কান্দাহারের নিকট এক মরুভূমিতে নূরজাহানের জন্ম হয়। গুলাব যেমন ফুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান রূপে–গুণে নারী কুলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে মরুভূমির গুলাব বলা হইয়াছে।

ইরান দেশের শকুন্তলা—এই বাক্যাংশ দ্বারা নূরজাহানকে বুঝানো হইয়াছে। শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলম"–এর প্রধান নায়িকা। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার কন্যা। নবজাত অবস্থায় পিতামাতা কর্তৃক বনে পরিত্যক্ত হইলে একটি শকুন্ত বা শকুন পক্ষ দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে রক্ষা করে এবং সেই অবস্থা হইতে কণ্বমুনি কর্তৃক রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মুনির আশ্রমেই প্রতিপালিতা হন এবং অবশেষে রাজা দুষ্যন্তের মহিষী হন। নূরজাহানও জন্মলাভের পর পিতামাতা কর্তৃক অল্প সময়ের জন্য হইলেও মরুভূমিতে পরিত্যক্তা হন—এবং সর্পের ফণার আশ্রয়ে মরু–সূর্যের অসহ উত্তাপ হইতে রক্ষা পান। অতঃপর পরের অনুগ্রহে অর্থাৎ এক বণিকের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ে শৈশবে প্রতিপালিত হন। শৈশবের এই দুঃখ–কষ্টের পর শকুন্তলার ন্যায় নূরজাহানও রাজমহিষী হন। পারশ্য দেশের প্রাচীন ও বর্তমান নাম হইল ইরান। নূরজাহানের পিতা মির্জা গিয়াস ইরানের অধিবাসী ছিলেন। এই সব কারণে কবি নূরজাহানকে "ইরান দেশের শকুন্তলা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বোরকা—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : আবরণ। মুসলমান মহিলাগণ গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময় মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত লম্বমান একপ্রকার ঢিলা পোষাক বা আবরণ দ্বারা শরীর আবৃত করেন। তাহাকেই বোরকা বলা হয়। এখানে "বোরকা" অর্থ : আবরণ।

www.pathagar.com

জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীর—"জাহাঙ্গীর" বা "জাহাঁগীর" ফার্সী শব্দ। ইহার অর্থ হইল : জগৎ-জয়ী বা জগৎবিজেতা। সম্রাট আকবরের পুত্র শাহজাদা সেলিম "জাহাঙ্গীর" এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সাধারণতঃ এই নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। এই অর্থেই "জগৎজয়ী জাহাঙ্গীর"—এই কথা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে জাহাঙ্গীর কখনো জগৎ জয় করেন নাই কিংবা জগৎ-জয়ের অভিযানেও কখনও বাহির হন নাই।

সাপের ফণা আস্তানা—নূরজাহানের দরিদ্র পিতা মির্জা গিয়াস ইরান হইতে ভারতে আসিবার পথে মরুভূমিতে নূরজাহানের জন্ম হয়। নিঃস্ব পিতামাতা নবজাত কন্যাকে প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া মরুভূমিতেই তাহাকে ফেলিয়া আসেন। কিন্তু মায়ের ক্রন্দনে পিতা কিছুক্ষণ পর কন্যাকে ফিরাইয়া আনিতে যাইয়া দেখেন, একটি সাপ ফণা বিস্তার করিয়া শিশুটিকে মরুভূমির অসহ্য রৌদ্র-তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। পিতাকে দেখিয়া সাপ চলিয়া যায় এবং তিনি কন্যাকে লইয়া ফিরিয়া আসেন। এই ঘটনাকেই অবলম্বন করিয়া নূরজাহানকে বলা হইয়াছে যে তাঁহার আস্তানা বা আশ্রয়-স্থল বা আস্তা হইল সাপের ফণা।

মরুভূমির মেহেরবাণী। তুমি মেহেরউন্নিসা —"মেহেরবাণী" ফার্সী শব্দ। অর্থ : দিয়া বা অনুগ্রহ। এখানে কবি "মরুভূমির মেহেরবাণী" এই বাক্যাংশ দ্বারা মেহেরুন্নিসা বা নূরজাহানকে বুঝাইয়াছেন। কান্দাহারের নিকটবর্তী মরুভূমিতে নূরজাহানের জন্ম এবং সেখানে নবজাত অবস্থাই কিয়ৎকালের জন্য তিনি পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। অথচ সেখানে তাহার মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ ক্ষতি হইল না। সেইজন্য তাঁহাকে মরুভূমির মেহেরবানী বা মরুভূমির অনুগ্রহের দান বলা হয়।

"**মেহের-উন্নিসা**" বা "মেহেরুন্নিসা" অর্থ হইল : নারী কুলের করুণা স্বরূপা। "মেহের" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : দয়া, করুণা ; "নিসা"—আরবী শব্দ ; অর্থ : নারীকুল বা নারী জাতি।

পথের প্রসূন—পথের ফুল। ইরান হইতে ভারতে আসিবার পথে নূরজাহানের জন্ম হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে "পথের প্রসূন" বলা হইয়াছে।

পরীস্থানের জরীন গুল—পরী হইল পৌরাণিক কাহিনী বা উপকথা-বর্ণিত পক্ষ-বিশিষ্ট। অপরূপ সুন্দরী কাল্পনিক নারী। ফার্সী "পর" বা পক্ষ শব্দ হইতে "পরী" শব্দে উৎপন্ন—অর্থ : পক্ষ বিশিষ্টা। অনিন্দ্য সুন্দরী এই সব কাল্পনিক নারীর কাল্পনিক বাসস্থানকে পরীস্থান বলা হয় ; অর্থাৎ অপূর্ব সুন্দরী পরিবেষ্টিত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশিষ্ট স্থান। অন্য কথায়, কল্পনার সৌন্দর্য লোক।

"জরী" হইল সোনা বা রূপার সূক্ষ সুতা বা পাত। কাপড়ে কারুকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। "জরীণ"—জরী শব্দের বিশেষণ ; প্রচলিত অর্থ : সোনালী সুতার কারুকার্য বিশিষ্ট ; অর্থাৎ সোনালী কারুকার্যের মত দীপ্ত ও সুন্দর। "গুল" ফার্সী শব্দ—অর্থ : ফল। অতএব "পরীস্থানের জরীণগুল" বাক্যাংশের অর্থ হইল কল্পনার সৌন্দর্য-লোকের অপূর্ব সুন্দর ফুল। এখানে নূরজাহান।

নওরোয--ফার্সী শব্দ। অর্থ : নূতন দিন। প্রচলিত অর্থ : ইরানী নববর্ষের উৎসব। মুঘল সম্রাটদের আমলে রাজপ্রাসাদে এই উৎসব বিশেষ জাকজমকের সহিত প্রতিপালিত হইত। সেই উপলক্ষে রাজ-প্রাসাদে একটি মেলা বসিত এবং উচ্চ বংশীয়া হিন্দু-মুসলমান মহিলাগণ তাহাতে যোগদান করিয়া নিজেরাই সেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা হইতেন। এই মেলার নাম ছিল মিনা বাজার। সম্রাট এবং তাহার নিকট আত্মীয় পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ সেই মেলায় যোগদান করিতে পারিত না। সম্রাট আকবর মুঘল রাজবংশে এই নওরোজ উৎসব ও মেলার প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

শের আফগান—সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম স্বামী। শের আফগান অত্যন্ত বীর পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি শূন্য হস্তে ব্যাঘ্র হত্যা করিতে পারিতেন। ["নূরজাহান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।]

কুতুব—কুতুবুদ্দীন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুধ-মায়ের পুত্র। ["নূরজাহান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।]

জুইবুরুজ—বুরুজ আরবী শব্দ ; কিল্লা বা দূর্গের উপরে নির্মিত কক্ষকে "বুরুজ" বলা হয়। আগ্রার সুবিখ্যাত প্রাসাদ-দূর্গের তেমনি বুরুজ বা কক্ষ-সমন্বিত একটি অংশের নাম ছিল "জুঁইবুরুজ"।

মন না মতি—মতি অর্থ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষের মতি বা ইচ্ছা প্রায়ই ঠিক থাকেনা। তদ্রূপ মনও চঞ্চল এবং পরিবর্তনশীল। এখানে "মন না মতি" অর্থ : মানুষের মন এবং মতি বা ইচ্ছা অত্যন্ত চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল।

পর্দা—ফার্সী শব্দ। অর্থ : আবরণ। কুরআনে ব্যবহৃত ইহার আরবী প্রতিশব্দ "হিজাব"। প্রচলিত অর্থে মুসলমান নারিগণ কর্তৃক মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত মস্তক এবং গলদেশ হইতে দুই হাতের মণিবন্ধ এবং পদতলের উপরিভাগ পর্যন্ত আবৃত করিয়া রাখার নাম পর্দা। নারিগণ এইরূপ আবরণে প্রয়োজনমত যে কোন স্থানে এমনকি হাট-বাজার এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও যাইতে পারেন—ইহাই ইসলামের নির্দেশ। স্বয়ং হযরত মুহম্মদের (দ:) আমলে এবং পরবর্তী ইসলামের ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। পর্দার প্রধান উদ্দেশ্য হইল শোভন ও সুরুচি-সম্পন্ন পোষাক দ্বারা দেহ এরূপভাবে আবৃত করিয়া রাখা— যাহার ফলে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের প্রদর্শন দ্বারা অন্যের লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইতে পারে। বর্তমান প্রচলিত অর্থে "পর্দা" শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অবরোধ অর্থাৎ নারীদিগকে জানানা-মহলে বা মহিলা-মহলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা।

"শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে"—শামা ফার্সী শব্দ ; অর্থ : প্রদীপ।, শামা পোকা এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকা, আলোকে আকৃষ্ট হইয়া প্রদীপে- ঝাঁপাইয়া পড়ে ও প্রাণ দেয়। ফার্সীতে এই পোকাগুলিকে "পরওয়ানা" বা প্রদীপ-পতঙ্গ বলা হয়। ফার্সী কাব্য-সাহিত্যে এই "শামা ও পরওয়ানা" সর্ব-সমর্পিত খোদা-প্রেমের রূপক হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে বুলবুল এবং গুলাবও ঐশি-প্রেমের ক্ষেত্রে আশেক ও মাশুক বা প্রেমিক ও প্রেমিকার রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাব্যে বুলবুল বা বুলবুলি নামক মধুকণ্ঠি পাখীকে গুলাব-প্রেমিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। আলোচ্য চরণটিতে উপরোক্ত অর্থে শামা-পোকা এবং বুলবুলের কথা বলা হইয়াছে।

উল্লেখিত চরণটি তাহার পূর্বের চরণটিসহ নূরজাহানের স্বরচিত ফার্সী কবিতার অনুবাদ। মূল ফার্সী কবিতাটি এই : —

"বর মাযারে মা গরীবাঁ না চেরাগে না গুলে
না পরে পরওয়ানা সুয্‌দ না সাতায়ে বুলবলে।"

তিলোত্তমা—ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা কর্তৃক সৃষ্ট অপূর্ব সুন্দরী অপ্সরা বিশেষ। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অশুরদ্বয়ের বধার্থে সমুদয় রত্নের তিলতিল সৌন্দর্য লইয়া নির্মিত হওয়ায় তাহার নাম তিলোত্তমা হয়।

মীনা—অন্য বানান মিনা। ফার্সী শব্দ : অর্থ : ধাতু ইত্যাদির উপর কাচের তুল্য উজ্জ্বল কলাই ; Enamel : পাথরে খোদাই করিয়া তাহাতে নানা রং-এর পাথর দ্বারা বিভিন্ন রং-এর কারুকার্য।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। "কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতায় কবি, নূরজাহানের জীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার।

(খ) গরীব বাপের গরব-মণি, সাপের ফণা আস্তানা।

(গ) মরুভূমির মেহেরবাণী তুমি মেহের-উন্নিসা,
তোমায় ঘিরে তপ্তবালুর দহন চির দিন-নিশা।

(ঘ) পথের প্রসূন। তোমার রূপে দুনিয়তি আকৃষ্ট।

(ঙ) বর্ধমানের মাটি হল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য লিখ : —

(ক) বাদশার উপর বাদশা হবে, বাদশা হলেন তোমার বশ,
অফুরান সে স্ফূর্তি তোমার অগাধ তোমার মনের রস।

(খ) গরীব গোরে দীপ জ্বেলনা, ফুল দিওনা কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।

(গ) সেথায় তোমার ঘিরে ফল উঠছে ফুটে সর্বদাই
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই।

৪। টীকা লিখ : —

ইরান দেশের শকুন্তলা, পরীস্থানের জরীণ গুল, মরুভূমির মেহেরবানী, বোরকা, নওরোজ, জুঁই বুরুজ. মন না মতি, শের আফগান।

৫। "কবর-ই-নূর-জাহান" নামক কবিতার শেষ আট লাইন মুখস্থ লিখ।

স্বপ্ন

এই কবিতাটি শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য-বিশারদ রচিত। শেখ ফজলুল করিম রবীন্দ্র-যুগের একজন সর্বস্বীকৃত কবি। তাঁহার ভাষা পরিমার্জিত ও প্রাঞ্জল। যে-সকল মুসলমান সাহিত্যিক ও কবি পরিমার্জিত বাংলায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, শেখ ফজলুল করিম তাঁহাদের অগ্র-দলের একজন।

এই কবিতায় কবি মানব জীবনের গতি ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এই সংগ্রামসঙ্কুল মানব-জীবনে দুঃখ-দৈন্য ও নৈরাশ্য-ব্যর্থতা কত মানুষকে যে অকালেই মরণ-সাগরের অন্ধকারে তলাইয়া দেয়, সেই করুণ-কাহিনী-ই এ কবিতার বর্ণনীয় বিষয়।

প্রশ্নাবলী

১। দুঃখ বেদনাময় মানব-জীবনে শেষ প্রার্থনীয় বিষয় এবং শেষ আশা কি—কবির অনুসরণে সে কথা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

www.pathagar.com

২। ব্যাখ্যা লিখ : —

(ক) কারো তরী মাঝ পাথারে
কেউবা কেবল কিনার ছেড়েই
ডুবল, আশা মনেই গেল মরে।

(খ) নয়ন–গলা অশ্রুধারে
সৃষ্টি হল কত–সাগর।

নাদির শাহের জাগরণ

এই কবিতাটি মোহিতলাল মজুমদার–রচিত "স্বপন–পসারী" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। মোহিতলাল রবীন্দ্র–যুগের অন্যতম শক্তিশালী কবি। কিন্তু তাঁহার কাব্যে রবীন্দ্র–প্রভাব–বহির্ভূত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে দেদীপ্যমান। তিনি একজন ছন্দ–কৌশলী কবি এবং তাঁহার কাব্য সাধারণতঃ অত্যন্ত ভাব–গম্ভীর। আলোচ্য কবিতাটি তাঁহার একটি অপূর্ব কাব্য–সৃষ্টি। ছন্দের উদ্দাম গতি–বেগ, দুর্দম ভাবোচ্ছাসের উচ্ছল অবারিত প্রকাশ–ভঙ্গী, পরিবেশ অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগ—বিশেষ করিয়া আরবী–ফার্সী শব্দ প্রয়োগ এবং সেরূপ প্রয়োগের ফলে বাংলা কাব্য–কলায় একটা দুরন্ত বীর্যবান প্রাণ–প্রাচুর্যের সমাবেশ সৃজন—আলোচ্য কবিতার এই সকল সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বাংলা–কাব্যে বাস্তবিকই অভিনব। মোহিতলালের সমসাময়িক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই কাব্য রচনায় পরিমার্জিত ভাষার সঙ্গে আরবী–ফার্সী শব্দ সাফল্যের সহিত সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। কিন্তু মোহিতলালই এরূপ শব্দ–প্রয়োগ–কৌশল দ্বারা প্রেম–বিরহ–সর্বস্ব করুণ পদাবলী–বিগলিত বাংলা–কাব্যে বীর্যবন্ত ভাবের জীবন্ত রূপায়ণ যে সম্ভব, তাহা আলোচ্য কবিতা রচনা করিয়া প্রমাণ করেন।

এই কবিতা যাঁহার জীবন–নাট্যের একটি অঙ্ক লইয়া রচিত নাদির শাহ্ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সামান্য মেষ–পালক হইতে স্বীয় দুঃসাহস ও বীর্যবত্তার সাহায্যে পারস্য বা ইরানের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি যেমন সাহসী তেমনই দুর্দান্ত ও নির্মম ছিলেন। সেই নাদিরের উদ্দাম মনে নৃশংস যুদ্ধের অগণিত নরহত্যা ও উত্তপ্ত রক্ত–স্রোতের ভিতর দিয়া রাজ্য–জয়ের—বিশেষ করিয়া তদানীন্তন ইরানের প্রধান শত্রু আফগান এবং তুরাণী বা তুর্কীস্তান–বাসীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের যে–দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, আলোচ্য কবিতায় কবি তাহাই অতুলনীয় ছন্দ–ঝঙ্কারে ও বীর্যবান ভাষাবিন্যাসে একটি জীবন্ত চিত্ররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

টীকা

নাদির শাহ্—ইরান বা পারস্যের অধিপতি ছিলেন। বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে নাদির সামান্য মেষ পালক ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল নাদির কুলি খান। অষ্টাদশ শতকের নাম ছিল নাদির কুলি খান। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে আফগানেরা পারস্য আক্রমণ করে এবং পারস্য–সম্রাটকে সপরিবারে হত্যা করিয়া পারস্য অধিকার করিয়া নেয়। "তামাস্প" নামক শাহী বংশের একটি মাত্র ব্যক্তি উত্তর পারস্যের কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে পালাইয়া যাইতে সমর্থ হন। সেখানে নাদির ও তাহার মেষ–পালক দলের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন।

অতঃপর নাদির এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিয়া আফগানদিগকে আক্রমণ করেন এবং ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া তামাস্পকে পারস্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী নাদির ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্ তামাস্পকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেই নাদির শাহ্ নাম ধারণ পূর্বক পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

অতঃপর পারস্য-আক্রমণকারী আফগানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নাদির আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া নেন। ফলে বহু আফগান দিল্লীতে পালাইয়া আসিয়া তদানিন্তন মুঘল-সম্রাট মুহম্মদ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাদির সেই সব আফগানকে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া দিল্লীতে দূত পাঠাইলে পথিমধ্যেই সেই দূত নিহত হয়। ফলে নাদির ভারত আক্রমণ করিয়া মুঘল-সম্রাটকে বন্দী এবং দিল্লী অধিকার করিয়া লইলেন। নাদিরের দিল্লীতে অবস্থান কালে এক মিথ্যা গুজব প্রচারিত হয় যে, নাদিরের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া দিল্লী-বাসিগণ নাদিরের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যকে নিহত করিয়া ফেলে। তখন ক্রুদ্ধ নাদির দিল্লীর অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই লক্ষাধিক লোককে হত্যা করেন এবং কোহিনুর বা কোহ্-ই-নূর মণি, "তখতে তাউস" বা ময়ূর-সিংহাসন এবং বহু কোটী টাকার বিনিময়ে বন্দী মুঘল-সম্রাট মুহম্মদ শাহকেই দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দেশ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাঁহারই কয়েকজন দেহ-রক্ষী তাঁহাকে হত্যা করে।

আমু-শির-দরিয়া—আমু-দরিয়া ও শির-দরিয়া নাম তুর্কীস্তানের দুইটি নদী।

তুরানী—পারস্য বা ইরানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী তুর্কীস্তানের অধিবাসী।

ইরান—পারস্যের প্রাচীন ও বর্ত্তমান নাম।

খিবা—তুর্কীস্তানের একটি শহর ও প্রদেশের নাম।

সিস্তান—প্রাচীন ইরানের উত্তর-পূর্ব দিকস্থ একটি প্রদেশ। বর্তমান সময় সিস্তান প্রদেশ বিভক্ত হইয়া ইহার কিয়দংশ ইরানে এবং কিয়দংশ আফগানিস্তানে পড়িয়াছে।

মন্‌চেহের—প্রাচীন ইরানের একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট।

হেলমদ—প্রকৃত উচ্চারণ হেলমন্দ, আফগানিস্তানের একটি নদীর নাম। ইহা অম্লাস নদীর একটি শাখা।

রুস্তম—ইরানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাবীর। ফিরদৌসী-রচিত শাহ-নামা কাব্যে ইহার বীর্যবত্তা বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। তিনি না জানিয়া আপন বীর পুত্র সোহরাবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করেন। ইঁহার বীরত্ব কাহিনী ইরানে কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে।

ইস্পাহান—ইরানের প্রাচীন রাজধানী।

শিরাযী—আঙ্গুর হইতে তৈয়ারী এক প্রকার মদ্য। ইরানের এইটি প্রদেশ ও নগরের নাম শিরায। এখানে তৈয়ারী বিশিষ্ট মদ্যের নাম শিরাযী।

বান্দারা—ফার্সী শব্দ ; "বান্দা" বা 'দাস' শব্দের বহুবচন। 'বান্দারা' অর্থ : দাসগণ, কৃতদাসগণ।

শাহ্ জামশেদ—প্রাচীনতম ইরানের কায়ানী বংশীয় বিখ্যাত বাদশাহ। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও বিলাসী বাদশাহ ছিলেন। জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের জন্য ইরানের

www.pathagar.com

পরবর্তীকালীন অন্য বাদশাহ্ নওশেরোয়াঁর ন্যায় তাঁহার নামও প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

কাবুল—আফগানিস্তানের রাজধানী।

কান্দাহার—আফগানিস্তানের একটি শহরের নাম।

দিল্লী—ভারতে প্রাচীন ও বর্তমান রাজধানী।

হিরাট—আফগানিস্তানের একটি শহর ও বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র।

মেশেদ—ইরানের একটি প্রাচীন শহর ও তীর্থস্থান। মুসলমানদের অন্যতম সম্প্রদায় শিয়াদের বিখ্যাত দ্বাদশ ইমানের অন্যতম এবং হযরত ইমাম হুসাইনের বংশধর—ইমাম রেযার মসজিদ ও সমাধির জন্য এ স্থান বিখ্যাত।

গযনী—আফগানিস্তানের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর ও প্রাচীন রাজধানী। সুলতান মাহমুদের রাজধানী এখানেই ছিল এবং এখানেই ফিরদৌসীর বিশ্ব-বিখ্যাত মহাকাব্য "শাহনামা" রচিত হয়।

নিশাপুর—ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত একটি শহর। বিখ্যাত কবি ও জ্যোতির্বিদ উমর খৈয়ামের সমাধি এখানে অবস্থিত।

পেশাবার—পেশোয়ার। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রাক্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের রাজধানী এবং একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর।

কোহি-রহমত—প্রকৃত ....কোহ্-ই-রহমত। 'কোহ্' ফার্সী শব্দ ; অর্থ : পাহাড় ; 'রহ্‌মত' আরবী শব্দ : অর্থ : আশীষ, ইরানের একটি কোহ্ রাষ্ট্র পাহাড়ের নাম। ইহার সন্নিকটেই প্রাচীন ইরানের সম্রাট দারায়ুস (Darius) তাঁহার রাজধানী "পাসিপোলি" নির্মাণ করেন।

চেহেল মিনার—ফার্সী শব্দ। অর্থ : চল্লিশ মিনার বা চল্লিশ স্তম্ভ। সম্রাট দারায়ুসের পুত্র সম্রাট জান্‌জান্ বা জার্কসেস (Xerxes) রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চল্লিশ মিনারযুক্ত একটি দরবার-গৃহ নির্মাণ করেন। তাহাকেই "চেহেল মিনার" বলা হইত। রাজ-প্রাসাদ ও "চেহেল-মিনার" "কোহ-ই-রহমত" পাহাড়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জান্‌জান্—প্রাচীন ইরানের সম্রাট এবং সম্রাট দারায়ুসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে (Xerxes)"জার্কসেস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "চেহেল মিনার" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

ফেরেশ্‌তা—ফার্সী শব্দ। অর্থ : স্বর্গীয় দূত। কুরআনে ব্যবহৃত ইহার আরবী প্রতি শব্দ মলক। আল্লাহ্ ফেরেশতা বা মলক্ দিগকে নূর বা জ্যোঃতি হইতে তৈয়ার করিয়াছেন। ইহারা আল্লাহ্‌র নিকট থাকেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করেন। আল্লাহ্‌র সারা সৃষ্টির সর্বপ্রকার পরিচালনা কার্য প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইহাঁরা পূণ্যবান ও আল্লাহ্‌র চির অনুগত্য।

আখেরি-যামানা—আখের—ফার্সী শব্দ। অর্থ : শেষ। "যামানা"—আরবী শব্দ। অর্থ : মগ, কাল। "আখেরি জামানা" অর্থ হইল : শেষ যুগ ; কলি কাল।

খুদার বান্দা—ফার্সী শব্দ। "খুদা" শব্দ 'খুদ' অর্থাৎ "স্বয়ং" শব্দ হইতে উৎপন্ন। খুদা অর্থ : "স্বয়ম্ভু" অর্থাৎ আল্লাহ্। 'বান্দা' অর্থ : দাস। "খুদার বান্দা" অর্থ : আল্লাহ্‌র দাস বা তাঁহার সৃষ্ট-জীব।

শয়তান—এই পুস্তকের "নাত" শীর্ষক কবিতার "শয়তান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বুল্‌বুল—মধুকণ্ঠি গায়ক পাখী। ফার্সী কাব্য-সাহিত্যে বুল্‌বুল্‌কে গুলাব-প্রেমিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং প্রেমিকের এই রূপক হিসাবে ফার্সী-কাব্যে বুলবুলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বস্‌রার গুল—বস্‌রা ইরানের পশ্চিম-সংলগ্ন ইরাক বা মেসোপোটোমিয়ার একটি প্রদেশ ও বন্দরের নাম। বসরা গুলাব ফুলের জন্য বিখ্যাত। গুল—ফার্সী শব্দ—অর্থ : ফুল। এখানে 'বসরার গুল' হইল বসরার গুলাব ফুল।

পামির--তুর্কীস্তানের একটি সুউচ্চ মালভূমি। ইহাকে "পৃথিবীর ছাদ" (Roof of the world) বলা হয়। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে ইহাই আর্যজাতির আদি বাসস্থান।

পুবের শিকারী—এখানে অর্থ : নবোদিত সূর্য। শিকারীর মত পূর্ব দগিন্তে অকস্মাৎ আবির্ভূত নূতন সব।

নীল **বালুচরে**—এখানে অর্থ : নীল আকাশ। বালুকা-সৈকতের মত প্রসারিত নীলাকাশ।

তাতার—মধ্য এসিয়ার এক রণ-দূর্মদ জাতি।

গানের রাণী—ইরান হাফেয, রুমি উমর খৈয়াম, ফেরদৌসী প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত কবিগণের জন্মভূমি এবং তাঁহাদের রচিত গযল প্রভৃতি গানের জন্য প্রসিদ্ধ। এজন্য ইরানকে "গানের রাণী" বলা হইয়াছে।

"মুর্খ সে কবি গানেরি নেশায় বিকাইত বোখারায়"—এই চরণটি কবি হাফেজকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তাঁহার কবিতার বিখ্যাত দুইটি চরণ :

"আগার আঁ তুর্‌কে শিরাযী বদস্‌ত্‌ আরদ দিলে মা বা
বখাবে হিন্দুবশ্‌ বখ্‌ শম্‌ সমরকন্দ ও বোগাবাবা।"

নজরুল ইহার যে-কাব্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

"যদিই কান্তা শিরায সজনী ফেরৎ দেব মোর চোরাই দিল ফেব,
সমরকন্দ আর বোখারার দিই, বদল্‌ তাব লাল গালের তিলটের।"

গালের একটি তিলের পরিবর্তে সমরকন্দ ও বোখারাকে বিলাইয়া দেওয়ার জন্য কবির যে উচ্চ কল্পনা—আলোচ্য চরণে তাহাই উল্লেখিত হইয়াছে। সমরকন্দ ও বোখারা মধ্য-এশিয়ার সমৃদ্ধিশালী মুসলমান রাজ্য ছিল। বর্তমানে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

"গযনীর রাজা দিয়েছিল দাম? মনে নাই তার ব্যথা? তারি শোকে কবি তৈয়াগিল প্রাণ।" —এই কথা বিখ্যাত মহাকাব্য "শাহ্‌নামা"র রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি ফিরদৌসীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। দৌসী বা ফেরদৌসী গযনীর অধিশ্বর সুলতান মাহমুদের সভা-কবি ছিলেন। কাব্যের প্রতিটি শ্লেষের জন্য একটি করিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা দেওয়া হইবে—এই মর্মে সুলতান মাহমুদের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তার আদেশে ফিরদৌসী ক্রমান্বয়ে ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ৬০,০০০ শ্লোকে "শাহনামা" রচনা করেছেন কিন্তু এই গ্রন্থ রচনার শেষে সুলতান মাহমুদ ফিরদৌসীকে স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা চাহেন। ফলে বিক্ষুব্ধ কবি রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া এবং সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে একটি শ্লেষাত্মক কবিতা লিখিয়া রাখিয়া ইরানের অন্তর্গত নিজ জন্মভূমি তুস নগরে ফিরিয়া যান। জীবন-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর আশা-ভঙ্গ-জনিত বেদনায় মর্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্বদেশে চলিয়া যাওয়ার পরই অনুতপ্ত সুলতান মামুদ ৬০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রাই কবির জন্মভূমিতে পাঠাইয়া দেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সে বিপুল অর্থ লইয়া সুলতান মামুদের প্রেরিত লোকজন যখন কবির গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ঠিক সেই সময়েই কবির মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

"সাকি ও পেয়ালা, শ্লোক দুই চারি--জীবনের দাম এই? নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই। এই চরণ দুইটি বিশ্ব-বিখ্যাত কবি উমর খৈয়ামকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। উমর খৈয়াম তাঁর বিখ্যাত "রুবাইয়াৎ-ই-উমর খৈয়াম" নামক কাব্যগ্রন্থের একস্থানে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন সম্পর্কে যে-বলিয়াছেন, কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাহার নিম্নরূপ কাব্যানুবাদ করিয়াছেন :—

"সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গ পুব।"

কবি উমর খৈয়ামের এই মনোভাবই উদ্ধৃত চরণ দুইটির প্রথমটিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইরানে নাইশাপুর বা নিশাপুর নামক স্থানে উমর খৈয়ামের কবর অবস্থিত। আলোচ্য উদ্ধৃতির দ্বিতীয় চরণ একথারই ইঙ্গিত নিহিত।

প্রশ্নাবলী

১। "নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে নাদির শাহ-এর চরিত্র বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) পশু মেষ যেই পালন করেছে মানুষ-মেষের দল,
তারি দুর্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল।

(খ) আলোকের বিষ-বল্লম ছুড়ি রাত্রির কালো বুকে
পূবের শিকারী নীল বালুচরে দাঁড়াইল রাঙ্গামুখে।

(গ) শুধু মিটমিটে তারার লাগিয়া আকাশের সামিয়ানা?
ধুমকেতু আর উল্কার দলে পাতেনি সেথায় থানা?

(ঘ) ইরান গানের রাণী,
রক্ত-পাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পানি।

৩। তোমার নিজ ভাষায় তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর : —

(ক) মুখ সে কবি গানেরি নেশায় বিকাইত বোখারায়।

(খ) সাকী ও পেয়ালা, শ্লোক দুই চারি—জীবনের দাম এই?
নৈশপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই।

(গ) বাহ্‌বা কি বাহ্‌বারে।
আল্লাহ্‌র মত দিলওয়ার সেই—এ খেলা খেলিতে পারে।

৪। নিম্ন উদ্ধৃতিগুলির টীকা লিখ :—
মনুচেহের, হেল্‌মদ, শিরাযী, চেহেলমিনার, মেশেদ, জান্‌জান্‌, 'মুখ সে কবি গানেরি নেশায় বিকাইত বোখারায়'।
৫। "নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি মুখস্থ লিখ।

বাবুরের মহত্ত্ব

এই কবিতাটি কবি কালিদাস রায়-রচিত কবিতাসমষ্টি হইতে উদ্ধৃত। কালিদাস রায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শক্তিশালী কবি। তাঁহার কবিতার প্রধানতঃ দুইটি সুর আছে— একটি ছন্দে, ভাবে ও ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি-মূলক আর একটি সহজ সরল ভাষায় লিখিত বাংলার পল্লী-জীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সজীব বর্ণনাময়। মানুষের প্রকৃত মহত্ত্বও তাহার কবি-মানসকে অতি সহজেই গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং তেমনি একটি আত্ম-চিন্তাবিহীন ও পরার্থে-নিবেদিত অনায়াস মহত্ত্ব আলোচ্য কবিতার বর্ণনীয় বিষয়।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর যখন নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি মেথর-শিশুর প্রাণ রক্ষা করিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর এক রাজপুত যুবক এই অপূর্ব মহত্ত্ব দর্শনে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন এবং বাবুরের পদতলে পতিত হইয়া নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহান-হৃদয় বাবুর এই যুবকের অকপটতায় সন্তুষ্ট হইয়া শুধু তাহাকে ক্ষমাই করিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তাহারই হাতে নিজের জীবন সপিয়া দিয়া তাহাকে স্বীয় দেহ-রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। ঐতিহাসিক এই সত্যঘটনাটিকেই কবি ছন্দে গ্রথিত করিয়া এই কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা

বাবুর—ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সম্রাট। মধ্য-এশিয়ার প্রবল প্রতাবান্বিত অধিপতি ভারত আক্রমণকারী তৈমুরলঙ্গের তিনি অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। দুর্ধর্ষ চেঙ্গিজখাঁও মাতৃকুলের দিক দিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ। বাবুরের প্রকৃত নাম জহীরুদ্দীন মুহম্মদ। কিন্তু তিনি তাঁহার তুরানী বা তুর্কীস্থানীয় নাম "বাবুর" বা "সিংহ" নামেই সমধিক পরিচিত। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার তাঁহাকে সেই সিংহাসন হারাইতে হয়। তাঁহার জীবন উত্থান-পতনের এক বিচিত্র ইতিহাস। অতঃপর তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং কিছু কাল পরেই ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতের তদানীন্তন পাঠান-সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী দখল করিয়া দেন। ইহার অত্যল্পকালের মধ্যেই ভারতে তাঁহার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি অধিপতি হন। বাবুর রণ-পণ্ডিত যোদ্ধা, সাহসী ও কৌশলী সেনানায়ক এবং সুদক্ষ শাসন-কর্তা ছিলেন। তিনি তুর্কী ও ফার্সীভাষার সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত আত্মচরিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

পাঠান-বাদশা লোদী—ভারতের লোদী বংশীয় শেষ পাঠান-সম্রাট—সুলতান ইব্রাহীম লোদী। তিনি সুলতান সেকান্দর লোদীর পুত্র। প্রথম ভারত-বিজয়ী মুসলমান মুহম্মদ গৌরী হইতে ইব্রাহিম লোদী পর্যন্ত যে-সকল মুসলমান এদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন তাহারা সকলেই পাঠান ছিলেন।

পানিপথ—দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুর লোদী-বংশীয় শেষ সম্রাট ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারতে মুঘল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্রাট বাবুরের পৌত্র সম্রাট আকবর ও তাঁহার তদানীন্তন অভিভাবক বৈরাম খাঁ ভারতের শেষ ক্ষমতাশালী পাঠান-সম্রাট শের শাহের পরবর্ত্তী দুর্বল পাঠান-অধিপতি মুহম্মদ শাহ্ আদিলের হিন্দ-সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া ভারতে মুঘল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আফগানিস্তানের অধিপতি আহমদশাহ্ দুরবাণী মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত ও ধ্বংস করেন।

সংগ্রাম সিং—রাজপতনার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাণা সংগ্রাম সিংহ। তিনি ইতিহাসে "রাণা সঙ্গ" নামেও পরিচিত। তিনি বহু সংগ্রাম বা যুদ্ধ-জয়ী বিখ্যাত বীর ছিলেন। কথিত আছে, যুদ্ধে ইনি একটি চক্ষু, একটি হস্ত ও একটি পদ হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহের আশিটি স্থানের অস্ত্রের ক্ষত-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। বাবুর যখন পাঠান-সম্রাট ইব্রাহীম লোদীকে, আক্রমণ করেন তখন সংগ্রাম সিংহ এই মনে করিয়া ইব্রাহীম লোদীকে কোনরূপ সাহায্য করিলেন না যে, ভারতের পাঠান-রাজ-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেলে ভারত সংগ্রাম সিংহেরই করতলগত হইবে। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে, বসুর তাঁহার পূর্বপুরুষ তৈমুরলঙ্গের মতই দিল্লী অধিকার করিয়া লুণ্ঠিত ধন-রত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু বাবুর যখন দিল্লীতে স্থায়ীভাবে আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিলেন তখন সংগ্রাম সিংহের সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি বাবুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং খানয়ার প্রান্তরে বাবুরের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেন।

খানুয়ার প্রান্তর—দেশীয় রাজ্য ভরতপুরের অন্তর্গত এবং আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত খানুয়ার এই যুদ্ধক্ষেত্রে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুঘল-সম্রাট বাবুর ও মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাবুর সংগ্রাম সিংহকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। সংগ্রাম সিংহের সৈন্যবাহিনীতে আশি হাজার অশ্ব ও পাঁচ হাজার হস্তি থাকা সত্ত্বেও তৎ-তুলনায় অতি সামান্য-সংখ্যক সৈন্য লইয়া বাবুর এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন।

কৃতঘ্ন দৌলত—বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদী পাঞ্জাবের শাসন-কর্তা ছিলেন। তিনিই স্বীয় সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য গোপনে আহবান করেন। দৌলত খাঁ লোদী শুধু স্বীয় মনিব ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন নাই—পরবর্তী সময়ে তিনি বাবুরের সহিতও বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন।

চিতোর—রাজপুতনাস্থিত মেবার রাজ্যের রাজধানীর নাম। মুঘল-পাঠান যুগে রাজপুত জাতির স্বদেশ-প্রেম ও বীরত্বময় বহু কীর্তিকাহিনীর অনুষ্ঠান-স্থলরূপে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান।

রণবীর চৌহান—রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখা বা কুলের নাম চৌহান। মেবার-রাজ সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধে বাবুরের নিকট পরাজিত হইলে সেই পরাজয় ও তদ্‌জনিত অপমানের

www.pathagar.com

প্রতিশোধ লইবার জন্য সংগ্রাম সিংহের রাজধানী চিতোরের অধিবাসী যে-স্বদেশ-প্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য ছদ্মবেশে বাবুরের রাজধানীতে আগমন করেন, তাঁহারই নাম রণবীর চৌহান। (বাবুর সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্নাবলী

১। "বাবুরের মহত্ত্ব" শীর্ষক কবিতার গল্প ভাগ তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ : —

(ক) দেখিল বাবুর এ জয় তাঁহার ফাঁকি
ভারত যাদের তাঁদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি

(খ) মাটি দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর।

(গ) শোণিতে তাহার ক্ষারিত করিবে চিতোরের অপমান।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর : —

(ক) ভারত-ভূমির যোগ্য সেসব সেবা
তাহারে ছাড়িয়া এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?

(খ) বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে।

সন্ধ্যায়

এই কবিতাটি শেখ হবিবর রহমান-রচিত "বাঁশরী" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বাংলা-কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগে-যে-সকল মুসলমান কবি সর্বপ্রথম কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন, শেখ হবিবর রহমান তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কবিতার ভাষা সহজ ও পরিমার্জিত, ছন্দ সরল ও লীলায়িত এবং ভাব ইসলাম-অভিসারী ও পল্লীমুখী।

আলোচ্য কবিতায় কবি একটি শান্ত সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়াছেন। কোকিলের কুহুতান, পাখীদের সান্ধ্যকলরব, অস্তমিত সূর্যের শেষ রাঙ্গা আলো, আর মৃদু প্রবাহিত সমীরণের মধুর স্পর্শ—সমস্ত মিলিয়া বাংলার শান্ত সন্ধ্যার যে একটি অপূর্ব মাধুরীময় রূপ, কবি সহজ ভাষায় ও ছন্দে তাহাই এই কবিতায় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। এই কবিতার বর্ণনার অনুসরণে বাংলার সন্ধ্যার রূপ তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

মাঠের মাঝে একা আছি
চেয়ে চেয়ে গগন পানে,
অনন্তেরই কত কথা
আসছে যেন কানে কানে।

৩। এই কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ লিখ।

www.pathagar.com

জিন্দা পাকিস্তান

এই কবিতাটি কবি শাহাদৎ হোসেনের কাব্য-সংগ্রহ "রূপচ্ছন্দ্য" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। শাহাদৎ হোসেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার রবীন্দ্র-যুগোত্তর আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। তাঁহার ভাষা শব্দ-ঝঙ্কার ও অনুপ্রাসময় এবং ছন্দ গুরুগম্ভীর ও নৃত্য-মুখর। তিনি "ক্লাসিক্যাল" বা প্রাচীন রীতির অনুসারী কবি। যদিও তিনি নজরুল ইসলামের মত তাঁহার রচনায় প্রভূত আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেন নাই—তথাপি তিনি যে-সকল আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেগুলি ধ্বনি ও শব্দ-ঝঙ্কার এবং অর্থ ও ভাবের বিশিষ্টতা প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই স্বপ্নযুক্ত হইয়াছে।

আলোচ্য কবিতার কবি পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানাইয়া, পাকিস্তান উদ্ভবের ফলে বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ও মুসলিম অধ্যুসিত দেশগুলিতে নব জাগরণের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহাই অপূর্ব ছন্দে ও ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা

জিন্দা পাকিস্তান—"জিন্দা" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : জীবিত বা চিরজীবী। এখানে "চিরজীবী হোক"—এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরেজীতে "Long live" বাক্যটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, "জিন্দা" শব্দটি এখানে ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই "জিন্দা পাকিস্তান" অর্থ হইল পাকিস্তান চিরজীবী হোক। ইহা একটি জয়ধ্বনি বিশেষ। "পাকিস্তন জিন্দাবাদ" এবং আলোচ্য বাক্য—একই অর্থ-বোধক।

কুল্ মখলুক—আরবী শব্দ। "কুল্" শব্দের অর্থ : সকল, সমস্ত ; "মখলুক" শব্দের অর্থ : (বিশ্ব-স্রষ্টার) সৃষ্টি। "কুল্ মখলুক" হইল বিশ্ব-স্রষ্টার সকল সৃষ্টি, অথবা সকল জগৎ।

সিন্ধী—পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুদেশবাসী।

বেলুচী—পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত বেলুচীস্তানের অধিবাসী।

পাঠান—পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও আফগানিস্তানের স্থায়ী ও আদি মুসলমান অধিবাসী ইহাঁরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। মুসলমানদের মধ্যে পাঠানেরাই সর্বপ্রথম দিল্লী দখল করিয়া ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মুঘল সম্রাট বাবুর কর্তৃক পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত কয়েক শত বৎসরব্যাপী ভারতে ও বাংলায় রাজত্ব করেন।

হুর আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : স্বাধীন। ("ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতা "হুর"—শব্দের টীকার সঙ্গে তুলনীয়।) কিন্তু এখানে "হুর" হইল সিন্ধু দেশবাসী মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্প্রদায়। ইঁহারা সিন্ধুদেশের পীর পাগারো নামক একজন বিখ্যাত ও বিরাট প্রতিপত্তিশালী পীর বা মুসলমান ধর্মগুরুর শিষ্য। পীর পাগারো অত্যন্ত বৃটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং ভারত হইতে বৃটিশ-শাসন উচ্ছেদ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গোপনে তাঁহার শিষ্যদিগকে বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ ও বৃটিশ-আইন ভঙ্গের জন্য উৎসাহ ও শিক্ষাদান করিতেন ফলে "হুর" নামে পরিচিত পীর পাগারোর এই বিরাট শিষ্য-দল বৃটিশ-আইন ভঙ্গ করিতে করিতে লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার নৈতিক আইনই ভঙ্গ করিতে শুরু করিল। অবশেষে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট পীর পাগারোকে কৌশলে বন্দী করিয়া ফাঁসি দিলেন এবং বহু সংখ্যক হুরকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হুরগণ বহু পরিমাণে আইনানুগ হইয়াছেন এবং পীর পাগারোর বিলাতে-শিক্ষাপ্রাপ্ত পুত্র গদী-নসীন হইয়া তাঁহাদের বর্তমান পীর পদে বরিত হইয়াছেন।

মর্দান—পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি জেলা। এই প্রদেশের, সব স্থানের ন্যায় এখানকার অধিবাসীগণও পাঠান এবং এই "মর্দান" শব্দ দ্বারা এখানে পাঠানদিগকেই বুঝান হইয়াছে। কি একটু পূর্বেই "পাঠান" শব্দ ব্যবহার করিয়া পাঠানদিগকে উল্লেখ করা সত্ত্বেও সেই পাঠানদিগকে বুঝাইবার জন্য "মর্দান" শব্দ ব্যবহারের একমাত্র অর্থ হইল, পূর্ব চরণের সহিত ছন্দের মিল প্রদান।

আরবী দরিয়া—আরব সাগর। "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "আরবী দরিয়ার" টীকা দ্রষ্টব্য।

কাবা—মক্কা শরীফস্থিত আল্লাহ্‌র ঘর। আরবী ভাষায় ইহাকে "বায়তুল্লাহ" বা আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। বিশ্বে সমস্ত মুসলমান এই "কাবা"কে "কিবলা" করিয়া অর্থাৎ সম্মুখবর্ত্তী বস্তু হিসাবে রাখিয়া সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়া থাকেন। সাধারণ লোকের ধারণা মুসলমানগণ একমাত্র পশ্চিমদিকেই সিজদা বা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নামায্ আদায় করেন—যেন পশ্চিম দিকটাই মুসলমানদের সিজদার লক্ষ্য কিন্তু তাহা নহে। সিজ্‌দার একমাত্র লক্ষ্য হইল-মক্কার কাবা শরীফ। মক্কার পূর্বদিকস্থ দেশ স্থানসমূহ, যেমন ইরাক, ইরান, ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, মালয়, চীন, সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দেশবাসী মুসলমানগণ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া নামায্ পড়েন, কারণ মক্কার কাবাশরীফ তাঁহাদের দেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কিন্তু যে-সকল দেশ মক্কার পশ্চিম দিকে—যেমন মিসর, আলজেরিয়া, মরক্কো ইংলন্ড—এই সব দেশস্থিত মুসলমানেরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া নামায্ পড়েন ; কারণ মক্কাস্থিত কাবা শরীফ তাঁহাদের দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। ("উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "যেরুযালেম" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।)

হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) ও তৎপুত্র হযরত ইসমাঈল (আ:) কর্তৃক এক আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য কাবাগৃহ বা "বায়তুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঘর মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এক-আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য ইহা বিশ্বের সর্বপ্রথম উপাসনা ঘর। বিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্ম ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম। এই তিন ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা (আ:), হযরত ঈসা (আ:) এবং হযরত মুহম্মদ (দ:)—সকলেরই আদি পূর্বপুরুষ হযরত ইব্‌রাহীম। হযরত ইব্‌রাহীমের (আ:) প্রথম পুত্র হযরত ইসমাইলের (আ:) বংশধর হইলেন হযরত মুহম্মদ (দ:)। হযরত ইব্‌রাহীমের দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক্। তাঁহার আসল নাম ইসরাঈল। তাঁহার বংশীয় নবীদিগকে ইসরাঈল বংশীয় নবী বলা হয়। হযরত মুসা (আ:) এবং হযরত ঈসা (আ:) এই ইসরাঈল বংশীয় নবী। যাহা হউক, বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রবর্তকগণের একই আদি পূর্বপুরুষ কর্তৃক এক আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য কাবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্মে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব মুখিনতার ক্ষেত্রে কাবার একটি বিশিষ্ট স্থান ও ভূমিকা আছে।

মদীনা--আরব দেশের হেজায প্রদেশের একটি শহর--মক্কার উত্তরে অবস্থিত। মুসলমানদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। কারণ এখানে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়াসাল্লামের রওযা বা সমাধি অবস্থিত। হযরত মুহম্মদ (দ:) মক্কার কুরাইশগণ কর্তৃক অত্যাচারিত হইয়া এই নগরে আসিয়াই আশ্রয়গ্রহণ করেন এবং এখানে থাকিয়াই সাফল্যজনকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ইসলামী-রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানীও ছিল এই মদীনা। খোলাফায়ে রাশেদিন অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (দ:) পরবর্তী প্রথম চার খলীফার শাসনকাল পর্যন্ত মদীনা-ই-ইসলামী-রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। মদীনা আরবী শব্দ—শাব্দিক অর্থ শহর। হযরত মুহম্মদের (দ:) আগমনের পূর্বে এই

www.pathagar.com

শহরের নাম ছিল "ইয়াগ্রেব"। হযরতের আগমনের পর ইহার নাম হইল "মদীনাতুন্নবী" অর্থাৎ "নবীর শহর"। পরবর্তী সময় এই "মদিনাতুন্নবী" সংক্ষেপে শুধু মদীনা নামেই অভিহিত হইতে থাকে এবং জগতে এই নামেই পরিচিত হয়।

আনসার—আরবী শব্দ। অর্থ : সাহায্যকারী। প্রচলিত অর্থ : হযরত মুহম্মদ (দ:) মক্কায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইলে মক্কার কুরাইশগণ তাঁহার উপর এবং নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের উপর যখন অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল তখন মদীনার নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের আহ্বানে তিনি বহু মুসলমান সহ মদীনায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদীনার যে-সকল মুসলমান তখন হযরত মুহম্মদকে (দ:) এবং অন্যান্য মুসলমানদিগকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করেন তাঁহাদিগকেই "আনসার" বলা হয়। তদানীন্তন আনসারগণ আশ্রিত ধর্মীয় ভাইদিগকে সাহায্যদান ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে স্বীয় সহোদর ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিয়া নিজ-নিজ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির যথারীতি ভাগও তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন।

তুর্ক তোরণ—তোরণ অর্থ : সিংহদ্বার। এখানে তুরস্ক দেশ।

তুরান—মধ্য-এসিয়াস্থিত তুর্কীস্তানের প্রাচীন নাম।

তাতার—মধ্য-এসিয়ার এক রণদুর্মদ জাতির নাম তাতার। কিন্তু এখানে তাতারদের দেশ।

পিরামিড—প্রাচীন মিশরের ফেরোয়াঁ বা ফেরাউন (Pharaoh) বংশীয় রাজ্য ও রাজ-বংশীয়দের সুউচ্চ ও সুবিশাল সমাধি-মন্দির। এই পিরামিডগুলি খৃষ্টের জন্মেরও বহুশত বৎসর পূর্বে বিপুলাকার প্রস্তর খণ্ডের সমবায়ে এত সুবিশাল ও সুউচ্চ করিয়া কি ভাবে নির্মাণ করা হইল, তাহা আজও সারা বিশ্বের বিস্ময়।

দজলা-ফোরাত—মেসোপোটোমিয়া বা ইরাকের দুইটি নদীর নাম। দজলার অপর নাম টাইগ্রীস। ফোরাতের অপর নাম ইউফ্রেটিস।

আধ চাঁদ-আঁকা তারার কেতন—পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। কেতন অর্থ পতাকা। পাকিস্তানের পতাকায় অর্ধচন্দ্র ও তারকা অঙ্কিত থাকে।

প্রশ্নাবলী

১। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) পশ্চিমে পূবে আজি একাকার—
মহা সঙ্গমে শত স্রোতধার ;

(খ) উর্ধে নেহার নীলিম আবরে
রবি-তারকার চাঁদের আখরে
নীল চাঁদোয়ার নীল তুলিকায়
লিপি লেখে আসমান।

২। কবিতাটির প্রথম দশ লাইন মুখস্ত লিখ।

৩। টীকা লিখ : —

হুর, মর্দান, কাবা, আনসার, মদীনা, পিরামিড।

www.pathagar.com

ঈদ-উৎসব

এই কবিতাটি কবি গোলাম মোস্তফার "রক্তরাগ" নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত। রবীন্দ্র-যুগের যে-সকল মুসলমান কবির রচনা দ্বারা বাংলা-সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে কবি গোলাম মোস্তফা তাঁহাদের অন্যতম। ইহার রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট।

এই কবিতায় কবি ঈদ-উৎসবের আগমনে যে-আনন্দ-হর্ষ ও প্রেম-প্রীতি বিশ্ব-সমাজে, বিশেষ করিয়া মুসলমানের গৃহে-গৃহে ও বুকে-বুকে দেখা দেয়, তাহাই সুন্দর ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। ভা'য়ে ভা'য়ে মিলন হোক, সকল দীনতা ঘুচিয়া যাক, বিশ্বের সকলের মধ্যে ঐক্য-ভালবাসা নিবিড় হোক, ভিখারী-সুলতানে বিভেদ ঘুচিয়া যাক, শুভ যা তাহা জাগিয়া থাক, এবং যা অশুভ দূরে যাক—কবি আলোচ্য কবিতায় এ কামনাই প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা

ঈদ—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : যে জিনিষ বা উৎসব বারবার ঘুরিয়া আসে। প্রচলিত অর্থ : মুসলমানদের বৎসরের দুইটি উৎসব—"ঈদ্-উল্-ফতর" বা "ঈদ্-উল্-আযহা" বা 'ঈদ-উল-আযহা'। হিজরী সাল বা মুসলমানী সালের "রমাদান্" বা রম্যান মাসের অর্থাৎ রোযার শেষে পরবর্ত্তী "যিল্ কদ্" মাসের প্রথম তারিখে যে-উৎসব করা হয় তাহাকে "ঈদ্-উল্-ফিতর" বা "উপবাস ভঙ্গ বা আহার্য গ্রহণের ঈদ" বলা হয়। "ফিতর" শব্দের অর্থ : "আহার্য গ্রহণ"। "ঈদ্-উল্-আদ্‌হা" বা "ঈদ্-উল্-আযহা" অর্থ : "পূর্বাহ্নের ঈদ"। আদহা বা "আযহা" অর্থ : "পূর্বাহ্ন"। এই ঈদের সময় কোরবানী করিতে হয়। কোরবানী করিবার সময় হইল সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরের পূর্বে বা পূর্বাহ্নে। সেইজন্য এই ঈদকে "ঈদ্-উল্-আদ্‌হা" বা "পূর্বাহ্নের ঈদ" বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। এই কবিতায় কবি ঈদের যে-বর্ণনা দান করিয়াছেন তাহার অনুসরণে তোমার নিজের ভাষায় ঈদের বর্ণনা লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ : —

(ক) বিগত সন্ধ্যায় আকাশ-দরিয়ায় শ্যামলা পল্লীর পর যে,
শুভ্র রজতের তরণী বেয়ে বেয়ে ভিড়েছে ধরাধামে হর্ষে।

(খ) শুভ যা জেগে থাক্, অশুভ দূরে যাক্ খোদার শুভাশিষ স্পর্শে

ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম

এই কবিতাটি কাজি নজরুল ইসলামের "বিষের বাঁশী" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। নজরুল ইসলাম বাংলা-সাহিত্যের যুগ-স্রষ্টা কবি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিজয়ী সাহিত্য-প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকে বাংলা সাহিত্য-গগণ যখন উদ্ভাসিত, সেইদিনে নজরুলের আবির্ভাব। রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র-প্রভাব ডিঙ্গাইয়া সে সময় বাংলা-সাহিত্য রচিত হইতে পারে, সে-কথা কেহই তখন কল্পনাও করিতে পারিতনা। সাহিত্যের সর্বশাখায় ভাষা ও ভাব-ঐশ্বর্যে

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ তখন এমন একটা পরিণতি আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহাকে চরম বলিয়া মানিয়া লওয়া যেন দেশের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনের সর্বদিক লইয়া রচিত হইল তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত সাহিত্য। তিনি যৌবন ও জীবনবাদের বলিষ্ঠ দিক লইয়া সংগ্রাম সংঘাতের উদ্দাম সুরেও বহু কবিতা রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যের মূল সুর হইল ভারতী অধ্যাত্মবাদের শান্ত-সমাহিত ধ্যান-গম্ভীরতা। তাহার পরবর্তী কবিগণের মধ্যে বোধহয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার ব্যতীত—প্রায় সকল কবিই তাঁহার অক্ষম অনুকরণ করিতে যাইয়া বাংলা-কাব্য সাহিত্যকে একটা করুণ সুর ও অশ্রুবিগলিত ভাবুকতায় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন। এমনই দিনে নজরুল ইসলাম একটা ঝড়ের মাতনের মত আসিয়া হাযির হইলেন। তাঁহার সুর, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার শব্দ-সম্ভার ও রচনা-ভঙ্গী একটা বিপ্লব সৃষ্টি করিল। বাংলা-সাহিত্যের শান্ত আকাশে অকস্মাৎ গর্জিয়া উঠিল বজ্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি আর ঝড়ের হা-হা-রব। সৈনিক নজরুল—বিদ্রোহী নজরুল তাঁহার রণ-দামামা আর বিদ্রোহের ধ্বজা লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত যে-দুরন্ত শক্তি কুরআনের বজ্র-গম্ভীর ভাষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একদিন বিদ্যুৎ গতিতে অর্ধ পৃথিবী জয় করিয়া বসিয়াছিল, সেই দুরন্ত শক্তি,—সেই ইসলামী যোশ আরবী-ফার্সীর "রেজেয্" বা "রণসঙ্গীতের" নৃত্য-উদ্দাম ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া তিনি বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে আনিয়া হাযির করিলেন। তাঁহার "সাতিল আরব", "মহর্‌রম" "খেয়াপারের তরণী", "কামাল পাশা" "খালেদ", "আনোয়ার পাশা", "উমর ফারুক", "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম", "কোরবানী" প্রভৃতি কবিতা ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও গতিবেগে বাংলা-সাহিত্যে অভিনব। তাঁহার এই সকল ও অন্যান্য বহু কবিতায় তিনি আরবী-ফার্সী শব্দ-প্রয়োগের যে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন এবং তদ্বারা বাংলা-সাহিত্যের যে-অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহাকে অনায়াসে বাংলা-ভাষা-ক্ষেত্রে সাফল্যময় এক নব-বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করা যায়। বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের যে-ঐতিহ্যধারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, হিন্দু-পুরাণোল্লেখিত ভগীরথের মত নজরুল অসীম সাধনা দ্বারা সেই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাণোচ্ছল এক নবতর জীবন দান করিলেন। শুধু ইসলামের শক্তি-বাদ নহে—ইসলামী চিত্তের সৌন্দর্য-রস ধারা,—রুমী-যামী, হাফেয-খৈয়ামের অপূর্ব কাব্য ও সঙ্গীত সুধা—তিনি না'ত, গযল, কাসিদা, নযম্, কাওয়ালী প্রভৃতি ইসলামী গানের ভিতর দিয়া বাংলায় পরিবেশন করিয়া বাংলার চিত্তকে অভিভূত ও মুগ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ইসলামী সংস্কৃতি—চর্চায়ই সীমাবদ্ধ রহিল না। বাংলা-সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ তাঁহার সোনার কাঠিন স্পর্শে উচ্চকিত ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার "অগ্নিবীণার" আগুনের সুরে বাংলার কাব্যধারা নব প্রাণ-উন্মাদনায় নৃত্য-মুখর ও আবেগ-চঞ্চল হইয়া কুল প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিল। ভাবের ও ছন্দের সমস্ত অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিয়া, ভিতর ও বাহিরের সমস্ত শৃঙ্খলকে চূর্ণ করিয়া সত্যিকারের "সৈনিক কবি", সত্যিকারের "বিদ্রোহী কবি" "বিদ্রোহী" কবিতার আকাশ-ভেদী ধ্বজা লইয়া বাংলা-সাহিত্য-অঙ্গনে আবির্ভূত হইলেন। বাংলার কাব্য সাহিত্যে যৌবন-জল-তরঙ্গ দেখা দিল। বাংলার সাহিত্য-আসরে নূতন যুগ-স্রষ্টার আবির্ভাব হইল।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নজরুলও বাংলা-সাহিত্যের সর্ব শাখায় অর্থাৎ কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, শিশু-সাহিত্য, রস-রচনা ও সঙ্গীত-রচনা প্রভৃতি সব ব্যাপারে প্রভূত

www.pathagar.com

দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ব্যতীত এইরূপ সর্বতোমুখী সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী আর কেহই হইতে পারেন নাই।

কবি আলোচ্য কবিতায় ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদের (দ:) আবির্ভাব ও তিরোভাব ভক্তের হৃদয়, বীর্যবানের ভাষা আর সাগর-উর্মির ছন্দ লইয়া অপূর্ব দক্ষতায় বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এ-ভাষা, এ-ছন্দ, এ-ভাব ও প্রকাশভঙ্গী এক নূতন প্রাণ ও নূতন গতিবেগের সৃষ্টি করিয়াছে। হযরত মুহম্মদের (দ:) আবির্ভাবে আরব-ইরান, মিসর-সুদান, তুরান-তাতার—এক কথায় সারা মুসলিম জাহান আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—স্বর্গের হুর পরীরাও এ পুণ্য ও আনন্দের দিনে হাতে সুধা-ভাণ্ড লইয়া এ উৎসবে যোগদান করিতেছেন—এ কথাই এই কবিতার "আবির্ভাব" অংশে কবির কল্পনায় রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে। "তিরোভাব" অংশে রসুলুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে মানব-দানব, যমীন-আসমান,—এমনকি মৃত্যু-দূত আয্‌রাঈল পর্যন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার তিরোধানে তাঁহার পদ-স্পর্শ-সঞ্চিত মাটির পৃথিবী কাঁদিয়া লুটাইতেছে, অথচ তাঁহার আগমন-আশায় স্বর্গ লোক আনন্দ-মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে এই অনিন্দ্য সুন্দর কবি-কল্পনা অপূর্ব ছন্দে ও ভাষায় রূপায়িত ও মর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

টীকা

ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম—"ফাতেহা" আরবী শব্দ ; অর্থ : প্রারম্ভ, আরম্ভ। যে-সুরা বা অধ্যায় দিয়া কুরআন আরম্ভ করা হইয়াছে, প্রারম্ভিক "সুরা" বলিয়া তাহাকে "সুরা-ফাতেহা" বলা হয়। আল্লাহর নিকট মুসলমানদের প্রত্যেক প্রার্থনা, দোয়া এবং নামায এই "সুরা ফাতেহা" দিয়া আরম্ভ করিতে হয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পরলোকগত আত্মার মুক্তি বা মঙ্গলের জন্য যে-প্রার্থনা করা হয় তাহাও সুরা-ফাতেহা দিয়াই আরম্ভ করিতে হয় বলিয়া সে-প্রার্থনাকেও "ফাতেহা" বলা হয়।

"দোয়ায-দহম" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : দ্বাদশ। ইসলামী সাল বা হিজ্‌রী সালের রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ই তারিখ হযরত মুহম্মদ (দ:) পরলোকগমন করেন। সেজন্য প্রতি-বৎসর উক্ত তারিখে তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য যে-প্রার্থনা করা হয় এবং তদোপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই—অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (দ:) মৃত্যু-বার্ষিকীকেই "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" বলা হয়। কিন্তু ভুলক্রমে বৃটিশ-আমলে হযরতের জন্ম-মৃত্যু উভয় উৎসবকেই "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" নামে অভিহিত করা হইত এবং উভয় উৎসব উপলক্ষে এই নামেই আফিস-আদালত ছুটী দেওয়া হইত। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট কর্তৃক এ ভুলের সংশোধন করা হইয়াছে। হযরতের জন্ম উৎসব বা আবির্ভাব-উৎসবের প্রকৃত নাম হইল "মিলাদুন্নবী"। "মিলাদ" আরবী শব্দ ; অর্থ—জন্ম। "মিলাদুন্নবী"-র অর্থ—নবীর জন্ম অর্থাৎ নবীর জন্ম-উৎসব। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট হযরতের জন্ম-বার্ষিকীকে "মিলাদুন্নবী" নামেই অভিহিত করিয়াছেন এবং ঐ নামেই উক্ত তারিখে আফিস-আদালত ছুটী দেওয়া হয়।

আলোচ্য কবিতায় কবি হযরতের আবির্ভাব ও তিরোভাব অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু উভয় উৎসবকেই "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হযরতের তিরোভাব বা মৃত্যু-বার্ষিকীর প্রকৃত নাম "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" নিশ্চয়ই ; কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব বা জন্ম-বার্ষিকীর প্রকৃত নাম তাহা নহে—উপরে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা

www.pathagar.com

হইয়াছে। কবির পক্ষে এই ভ্রমের কারণ হইল—এই কবিতার রচনা-কাল বৃটিশ-আমল এবং বৃটিশ আমলে হযরতের জন্ম-মৃত্যু উভয় বার্ষিকীকেই ভুলক্রমে "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" বলা হইত, একথাও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রচলিত রীতির ফলেই কবি এই ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

হেরা—আরবের মক্কাশরীফের নিকটবর্তী "হেরা" নামক পাহাড়। এই গিরি-গুহায় হযরত মুহম্মদ (দ:) সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং এখানেই তাঁহার নিকট স্বর্গীয় দূত জিবরাঈলের মারফত "অহি" বা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ-বাণী সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

উর্‌জ্‌, ইয়ামন্‌, নজ্‌দ্‌, হেজায, তাহামা—আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাম্‌ন্‌, বর্তমানে দক্ষিণ আরবের একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। বর্তমান আরবের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অধিপতি সুলতান ইব্‌নে-সাউদ "নজদের" অধিবাসী এবং নজদের আদি অধিপতি। অতঃপর তিনি আরবের হেযাজ প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া আরবের বৃহত্তর অংশের অধিপতি হইয়াছেন। হেযাজ প্রদেশে মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ এবং জেদ্দা বন্দর অবস্থিত।

ইরাক—ইহার অপর নাম মেসোপোটোমিয়া। আরব-উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি স্বাধীন রাজ্য ; রাজধানী বাগ দাদু।

শাম—ইহার অপর নাম সিরিয়া। আরব-উপদ্বীপের উত্তরস্থ একটি স্বাধীন রাজ্য।

মেসের—ইহার অপর নাম মিসর বা ইজিপ্ট। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। অতি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। আরবের পশ্চিমে অবস্থিত।

ওমান—আরবের দক্ষিণ-পূর্ব দিকস্থ একটি ছোট রাজ্য।

তিহরাণ—ইরান বা পারস্যের বর্তমান রাজধানী। এখানে "ইরান দেশ" অর্থে ব্যবহৃত।

"সাল্লাল্লাহু আলায়াহি সাল্‌লাম"—প্রকৃত বাক্যটি হইল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্‌লাম। এখানে ছন্দ মিলাইবার জন্য "ওয়া" শব্দ বাদ দেওয়া হইয়াছে। আরবী ভাষায় রচিত বাক্য। এই বাক্যকে "দরূদ" বা "শান্তি-বাণী" বলা হয়। সংক্ষেপে এই বাক্যটি বাংলায় (দ:)—এইভাবে লিখিত হয়। সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ হযরত মুহম্মদের (দ:) নামের শেষে এই বাক্যটি উচ্চারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ধর্মীয় নির্দেশ। এই বাক্যের অর্থ হইল : "তাহার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হউক"। অন্যান্য [illegible] ও রসূলগণের নামের শেষে সম্মানার্থ "আলায়হিস্‌ সালাম" উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইহাও ধর্মীয় নির্দেশ। এই বাক্যের অর্থ হইল "তাঁহার উপর (আল্লাহ্‌র) শান্তি বর্ষিত হোক"।

হুর ("জিন্দা পাকিস্তান" শীর্ষক কবিতার বা "হুর" শব্দের টীকার সঙ্গে তুলনীয়) "হুর" আরবী শব্দ, অর্থ : "আয়ত লোচনা"। প্রচলিত অর্থ--স্বর্গ বা বেহেশতের সুন্দরী নারী।

পরী—ফার্সী শব্দ। ফার্সী "পর" বা "পক্ষ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। শাব্দিক অর্থ : পক্ষ বিশিষ্ট। প্রচলিত অর্থ : ইরানের পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখিত পক্ষ-বিশিষ্টা অপরূপ সুন্দরী নারী। ["কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতার "পরী-স্থানের জরীন গুল" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।]

যম যম—মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কূপ। ইহার পানি মুসলমানগণ অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন। হযরত মুহম্মদের (দ:) পূর্বপুরুষ হযরত ইব্‌রাহীম তাঁহার প্রথমা পত্নী-বিবি সারার পরামর্শে ও আল্লাহ্‌র আদেশে দ্বিতীয়া পত্নী বিবি হাযেরাকে তাঁহার দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পুত্র হযরত ইসমাঈল সহ তদানীন্তন আরবের এক পাহাড়-ময় মরু অঞ্চলে নির্বাসন দিয়া যান।

www.pathagar.com

এই নির্বাসিত মাতা-পুত্রের আহার্য ও পানীয় ফুরাইয়া গেলে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, শিশু হযরত ইসমাঈল মাটিতে পা ছুঁড়িতে থাকেন। এই সময় এই শিশুর পা মাটিতে যেখানে আঘাত করিতেছিল আল্লাহর করুণায় সেখানে পা-এর আঘাতে—(মতান্তরে স্বর্গীয় ফেরেশতা জিবরাঈলের ডানার আঘাতে) এক উৎসের সৃষ্টি হইয়া নির্মল পানি নির্গত হইতে থাকে। মা হাযেরা সেই উৎসের চারিপাশে প্রস্তরের বাঁধ দিয়া পানি আটকাইয়া রাখেন এবং তাহা হইতেই যম্‌যম্ কূপের উৎপত্তি হয় এবং জল-বিরল আরব দেশে এই কূপকেই কেন্দ্র করিয়া মক্কা নগরীর পত্তন হয়।

সিস্তান—"নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার "সিস্তান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য। বুস্তান--"বু" অর্থ : সুগন্ধ। বুস্তান—অর্থ : সুগন্ধের স্থান ; ফার্সী শব্দ ; অর্থ : ফুল-বাগান। "শিস্তান-বস্তান"-এর অর্থ : "শিস্তানের ফুল-বাগান"।

রুস্তাম—প্রকৃত বানান "রুস্তম"। এখানে ছন্দের মিলের জন্য "রুস্তাম" ব্যবহার করা হইয়াছে। "নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার "রুস্তম" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

কাহারবা—আরবী সঙ্গীতের একটি তালের নাম।

আরবী দরিয়া—আরব দেশের দক্ষিণে অবস্থিত এবং আফ্রিকার পূব উপকূল হইতে পশ্চিম পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত আরব-সাগর।

লোহিতের—আরবের পশ্চিম পার্শ্বস্থ লোহিত সাগরের।

সাহ্‌রা—আরবী শব্দ ; অর্থ : মরুভূমি। উত্তর আফ্রিকাস্থিত পৃথিবী বৃহত্তম মরুভূমির নামও "সাহারা"। এখানে এই সাহ্‌রা-মরুভূমিকেই বুঝানো হইয়াছে।

গোবী—মঙ্গোলিয়াস্থিত পৃথিবীর অন্যতম সুবৃহৎ মরুভূমি।

কুর্‌সী—আরবী শব্দ ; অর্থ : আসন। কিন্তু ইহা যখন আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোঃতি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয় "আল্লাহ্‌র আসন" বা "সিংহাসন"। "নূরে কুর্‌সীর" অর্থ : কুরসীর নূরে বা আল্লাহ্‌র সিংহাসনের জ্যোঃতিতে।

তুর—আরব দেশের উত্তরে অবস্থিত একটি পাহাড় : বর্তমান "টোরাস" পর্বতের অংশ। কথিত আছে, ইয়াহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা (আ:) এখানে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নূরের তাজাল্লী বা জ্যোঃতির ঝলকে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হইয়া যান।

দুরানা—প্রকৃত বানান : দুর্‌রানী। কবিতার মিলের জন্য "দুরানী" করা হইয়াছে। আফগানদের একটি গোত্রের নাম "দুররানী"। এখানে সমগ্র আফগান জাতি বা পাঠান জাতিকে বুঝানো হইয়াছে।

ইরাণী—ইরাণ বা পারস্যের অধিবাসী।

তুর্কী—তুরস্কের অধিবাসী।

বদুঈন—"দূরন্ত আশা" শীর্ষক কবিতার "বেদুঈন" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

সাবেঈন—তৌহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী—অথচ মুসলমান ধর্মাবলম্বী নহে—হযরত মুহম্মদের (দ:) সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী আরব দেশীয় এমন একটি বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়কে "সাবেঈন" বলা হইত। বর্তমানে ইহাদের অস্তিত্ব নাই।

তাবেঈন—হযরত মুহম্মদের (দ:) সহিত অন্ততঃ তিনদিন অবস্থান করিয়াছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, হযরতের এমন সাথীদিগকে "সাহাবা" বলা হয়। "সাহাবা" আরবী "সাহাবী" অর্থাৎ সাথী বা "বন্ধু" শব্দের বহুবচন। সাহাবাদের সাথীদিগকে "তাবেঈন" বলা হয়। "তাবেউন" বা "অধীনস্থ ব্যক্তি" এই আরবী শব্দের বহু

www.pathagar.com

বচন হইল "তাবেঈন"। ইহার শাব্দিক অর্থ : তাবেদারগণ, অধীনস্থ ব্যক্তিগণ বা আজ্ঞাবহগণ।

এখানে কবিতার চরণ কয়টি হইল এই :—

"সাবেঈন
তাবেঈন"
হ'য়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে 'দীন'।"

অর্থাৎ সাবেঈনগণ তাবেঈন হইয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিতেছে, "দীন" বা সত্যধর্ম ওই অবতীর্ণ হইতেছে।" এখানে "ওই ওই নাবে 'দীন' "—এই বাক্য দ্বারা হযরত মুহম্মদের (দ:) আবির্ভাব বা জন্ম এবং তৎকর্তৃক "দীন" বা সত্যধর্ম প্রচারের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, সাবেঈনগণ তাবেঈন হইয়া হযরতের জন্মের সময়ই উচ্চস্বরে এই ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। কিন্তু হযরতের জন্মের সময় কোন তাবেঈনের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। কারণ হযরতের সাহাবাগণের অর্থাৎ হযরতের সাথীগণের যাঁহারা সাথী হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই তাবেঈন বলিয়া অভিহিত করা হয়। কাজেই হযরতের জন্মের সময় সাবেঈনগণ তাবেঈন হইয়া হযরতের আবির্ভাবের খোশ খবর ঘোষণা করিতেছে—একথা বলা তথ্যের দিক দিয়া ভ্রান্তিজনক।

তবে যদি "তাবেঈন" শব্দ দ্বারা "আজ্ঞাবহগণ" বুঝানো হইয়া থাকে—তবে উল্লেখিত বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ : সাবেঈনগণ আজ্ঞাবহ হইয়া চিল্লাইলেন.......ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন থাকে : কাহার আজ্ঞাবহ হইয়া? সুতরাং এই অর্থেও তাবেঈন শব্দের উপরোক্ত প্রয়োগ অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনামূলক।

"দীন্"—আরবী শব্দ : অর্থ : ধর্ম, সত্যধর্ম বা ইসলাম ধর্ম। "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "খলীফা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

লাত-মানাত—ইসলাম-পূর্ববর্তী আরবের মূর্তি-পূজকগণের দুইটি দেব-দেবীর নাম।

ওয্যা-হোবল—প্রাক-ইসলামী যুগের মূর্তি-পূজক আরবগণের দুইটি প্রধান দেব-দেবীর মূর্তি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এইগুলি মূর্তিপূজক কুরাইশগণ কর্তৃক কাবা-গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মুহম্মদ (দ:) মক্কা বিজয় করিয়া এই মূর্তিগুলি অন্যান্য বহু মূর্তিসহ কাবা-গৃহ হইতে অপসারিত করেন।

ইব্‌লীস—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : মুখপোড়া : যে আল্লাহ্‌র রহমত বা করুণাধারা হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে যেরূপ ব্যক্তি বা প্রাণী। ["না'ত" শীর্ষক কবিতার "শয়তান" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

খারিজীন—আরবী শব্দ। "খারিজ" অর্থাৎ বাতিল বা বাহির হওয়া বা বাহির করিয়া দেওয়া ব্যক্তি। অন্য কথায় বহিষ্কৃত বা বিতাড়িত ব্যক্তি। বহুবচনে "খারেজীন", এখানে আল্লাহর করুণা হইতে বঞ্চিত বা বিতাড়িত ব্যক্তিবৃন্দ বা জাতি।

"নাত" শীর্ষক কবিতার "শয়তান" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

জেদ্দা—সৌদী-আরবের একটি বন্দর। ইহা মক্কা শরীফের পশ্চিম দিকে এবং লোহিত সাগরের পূর্বতীরে অবস্থিত।

কাবা—"জিন্দা পাকিস্তান" শীর্ষক কবিতায় "কাবা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

ওক্ত্—আরবী শব্দ, অর্থ : সময়। প্রকৃত বানান : ওয়াক্ত। ছন্দের মাত্রা রক্ষার জন্য "ওক্ত" ব্যবহার করা হইয়াছে। "হর ওক্ত্" অর্থ : সর্বদা।

www.pathagar.com

আবদুল্লা—শুদ্ধ বানান : আবদুল্লাহ্। এখানে ছন্দের মাত্রার খাতিরে "আবদুল্লা" ব্যবহার করা হইয়াছে। হযরত মুহম্মদের (দ:) পিতার নাম। হযরত মাতৃগর্ভে থাকিতেই" তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

আমিনা—হযরত মুহম্মদের (দ:) মাতার নাম।

মুতালিব—প্রকৃত উচ্চারণ : মুত্তালিব। ছন্দের মিলের জন্য "মুতালিব" করা হইয়াছে। হযরত মুহম্মদের (দ:) পিতামহের নাম। পূর্ণ নাম আবদুল মুত্তালিব। তিনি কুরাইশ বংশের প্রধান নেতা এবং কাবা-গৃহের প্রধান সেবাইত ছিলেন। তাঁহার সময় কাবা-গৃহে মূর্তি-পূজা হইত।

হামযাহ্—হযরত মুহম্মদের (দ:) পিতৃব্য। তিনি মহাবীর ছিলেন। অহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

"এয় **শামসুয্যোহা বদ্‌রুদদোযা কমরুয্ যমাঁ সালাম**"—"এয়"—ফার্সী শব্দ ; সম্বোধন বাচক শব্দ—যথা, হে, ওহে ইত্যাদি। শামসুযযোহা—আরবী শব্দ ; "শামস" : সূর্য "যোহা" : মধ্যাহ্ন, অর্থাৎ মধ্যাহ্নসূর্য। "বদরুদ্দোযা"—আরবী শব্দ : অর্থ : পূর্ণচন্দ্র ; "বদর" : চতুর্দ্দশীর চন্দ্র ; "দোযা" : পূর্ণ। "কমরুয্ যমী"—আরবী শব্দ। প্রকৃত আরবী উচ্চারণ : "কমরুযযমান" ; আরবী শব্দ হইলেও এরূপ বহু আরবী শব্দ ফার্সীতে ব্যবহার করা হয়। এখানে ফার্সী উচ্চারণে "যমান" শব্দের শেষ "ন"—অক্ষরের পরিবর্তে পূর্ববর্তী "ম" অক্ষরের উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হইয়াছে : ফলে শব্দটির উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে "যমাঁ" (কমরুয্-যমাঁ)। ফার্সী-ব্যাকরণ অনুসারে এরূপ উচ্চারণ শুদ্ধ। [বাংলার "চান্দ—চাঁদ", "ফান্দ—ফাঁদ" প্রভৃতি উচ্চারণের সঙ্গে তুলনীয়।] "কমর"—অর্থ : চন্দ্র, 'যমাঁ' বা "যমান" অর্থ : যুগ, সময়। সুতরাং " কমরুয যমী" অর্থ : যুগ-চন্দ্র, যুগ-শশী বা যুগ-শশাঙ্ক। "সালাম"—আরবী শব্দ ; অর্থ : শান্তি। অতএব আলোচ্য পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হইল : হে মধ্যাহ্ন-সূর্য, পূর্ণ-চন্দ্র এবং যুগ-শশাঙ্ক ; তোমার উপর (আল্লাহ্‌র) শান্তি বর্ষিত হোক।

তিরোভাব

পাঞ্জাব—ফার্সী "পাঞ্জ্" বা "পঞ্চ শব্দ" হইতে উদ্ধৃত। "পাঞ্চাহ" অর্থ পঞ্চ অঙ্গুলি-বিশিষ্ট হাতের মুঠি।

আযরাঈল—জীবের জীবন-সংহারকারী ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত।

মীলা তাজ—'তাজ'—আরবী শব্দ ; অর্থ : মুকুট। কথিত আছে যে, আযরাঈলের মাথার তাজ বা মুকুট নীল বর্ণ। কাজেই "নীল-তাজ" অর্থ : নীল মুকুটধারী আযরাঈল।

জিবরাঈল—"রূপ" শীর্ষক কবিতার "জিবরিল" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

মিকাঈল—একজন প্রধান ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত। পানি বর্ষণ এই ফেরেশ্‌তার কার্য।

মুল্লুক—প্রকৃত উচ্চারণ : মুল্‌ক্। কবিতার মিলের জন্য "মুল্লুক" ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী শব্দ। অর্থ : দেশ।

দ্বাদশীর চাঁদ সেই? সেই রবিযল আউওল? —"রবিযল আউওল"-এর প্রকৃত বানান : "রবিযল আউয়াল", কিন্তু পরবর্তী চরণের শেষ শব্দ "দোল"-এর সঙ্গে মিল দিবার জন্য

www.pathagar.com

"আউয়াল" শব্দকে "আউওল" বানান করা হইয়াছে। "রবিযল আউয়াল" হিজরী সাল বা মুসলমানী সালের তৃতীয় মাসের নাম। এই মাসের দ্বাদশ তারিখে হযরত মুহম্মদ (দ:) পরলোকগমন করেন। আলোচ্য বাক্যদ্বয়ে ইহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

ইস্‌রাফীল—একজন প্রধান ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত। প্রলয়ের দিনে তিনি শিঙ্গা ফুকিলে প্রলয় হইবে।

রসূল—"নাত" শীর্ষক কবিতার "রসল" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহম্মদকে (দ:) বুঝাইতেছে।

আযাযীল শয়তান—"নাত" শীর্ষক কবিতার "শয়তান" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

মদীনা—"জিন্দা পাকিস্তান" শীর্ষক কবিতার "মদীনা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

তাযি বোররাক—"তাযি" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : দ্রুতগামী অশ্ব। "বোর্‌রাক" আরবী শব্দ, শাব্দিক অর্থ : বৈদ্যুতিক। আরবী "বর্‌ক্" অর্থাৎ "বিদ্যুৎ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। প্রচলিত অর্থ হইল এই : হযরত মুহম্মদ (দ:) মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া গিয়া সেখানে যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন সে সময় হিজরী সালের সপ্তম মাসের অর্থাৎ রজব মাসের ২৭শে তারিখ রাত্রে আল্লাহ তাঁহাকে বেহেশ্‌ত-দোযখসহ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি পরিদর্শন করান। হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক আল্লাহর সৃষ্টি দর্শনার্থ এই ভ্রমণকে "মেরায" বলা হয়। 'মেরায' আরবী শব্দ ; অর্থ : উচ্চে আরোহণ করা। এই ভ্রমণের সময় হযরতের যে-বাহন ছিল তাহাকেই "বোররাক্" নামে অভিহিত করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস : "বোর রাকের দেহ অশ্বের মত এবং মুখমণ্ডল মানুষের মত ছিল এবং তাহার ডানা ছিল। এই জন্যই কবি ইহাকে "তাযি বোর্ রাক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"আরশ"—আরবী শব্দ : অর্থ : সিংহাসন। প্রচলিত অর্থ : আল্লাহ্‌র সিংহাসন। অন্য কাহারো সিংহাসনকে "আরশ" বলা হয় না। এই কবিতার "আবির্ভাব" অংশের "কুরসী" শব্দের সঙ্গে তুলনীয়।

জানাযা—আরবী শব্দ ; অর্থ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। গোর দিবার পূর্বে মৃতের আত্মার মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য শেষ প্রার্থনা বা নামাযকে জানাজা বলা হয়।

এখানে কবিতার চরণটি হইল এই : —

"বেটার জানাযা কাঁধে যেন—তাই বহে ঘন নাভি-শ্বাস।"

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জানাজা" শব্দের অর্থ হইল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা গোর দিবার পূর্বে মৃতের আত্মার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা বা নামায। কাজেই "জানাজা" কাঁধে উঠানো যায় না। এখানে কবি বোধ হয় আলোচ্য চরণের পূর্ববর্তী "মৃত্তিকা মাতা কেঁদে মাটি হল, বুকে চেপে মরা লাশ"—এই চরণে উল্লেখিত "মরা লাশ" অর্থে "জানাজা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপ-প্রয়োগ।

সুলেমান (আ:)—প্রকৃত উচ্চারণ সুলায়মান। কবিতার ছন্দের মাত্রার জন্য "সুলেমান" ব্যবহার করা হইয়াছে। তিনি ইস্‌রাঈল বংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ নবী ও প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতা হযরত দাউদ (আ:) (বাইবেলের—King David) নিজেও একজন নবী এবং প্রখ্যাতনামা বীর ছিলেন এবং নিজের বীর্যবত্তা, জ্ঞান-গরিমা ও ধার্মিকতার

www.pathagar.com

গুণে ইস্‌রাঈলদের তদানীন্তন অধিপতি–রাজা তালুতের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সক্ষম হন এবং তালুতের পরলোকগমনের পর তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। হযরত দাউদের (আ:) মৃত্যুর পর তৎপুত্র হযরত সুলায়মান (আ:) পিতৃ–সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তদানীন্তন ইয়াহুদী রাজ্য কেনান বা বর্তমান প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের অধিপতি হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আরবের "শেবা" বা "শাবা" প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়া এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন এবং সর্বত্র সত্য ধর্ম প্রচার করেন। "শেবাব রাণী" বিল্‌কিস্‌ও (Queen of Shĕba) তাঁহার নিকট সত্য–ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হন। বর্তমান প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত ইয়ারুশলম বা যেরুযালেম বা বায়তুল্‌–মুকাদ্দাস নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ধার্মিক বাদশাহ্‌ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি পশু–পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন এবং মানব ও জিন্‌ এবং পশু–পক্ষী সমস্তই তাঁহার অধীনস্থ ছিল এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত। ইহাদের সাহায্যেই তিনি বিভিন্ন দেশ জয় [illegible] বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন এবং বৃহৎ–বৃহৎ নগরী ও রাজ–প্রাসাদ এবং ধর্ম–মন্দিরাদি [illegible] সক্ষম হন বলিয়াও কিংবদন্তী আছে। বাইবেলে তিনি (King Solomon) বা রাজা "সলমন" নামে অভিহিত।

বেলাল—ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে যে–কয়জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মক্কার কুরাইশদের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করেন হযরত বেলাল (রা:) তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হাবশী ক্রীত–দাস ছিলেন। ইসলাম ধর্ম–গ্রহণ করায় তাঁহার উপর তাঁহার মনিবের অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উঠে যে, আরবের আগুনের মত উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে তাঁহার হাত–পা বাঁধিয়া এবং বুকে পাথর চাপা দিয়া তাঁহাকে তপ্ত বালুকার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইত এবং ইসলাম পরিত্যাগ করিবার জন্য কঠোর আদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু কোন অত্যাচারেই দমিত না হইয়া সত্যের জন্য তিনি প্রাণ–বিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার এই প্রকার কঠোর যন্ত্রণা দর্শনে হযরত মুহম্মদের (দ:) অন্যতম প্রধান শিষ্য ও সহচর এবং পরবর্তীকালে ইসলামের প্রথম–খলীফা দয়ার্দ্র হৃদয় হযরত আবুবকর (রা:) মুক্তি–মূল্য দিয়া হযরত বেলালকে (রা:) তাঁহার নিষ্ঠুর মনিবের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। অতঃপর কুরাইশদের অত্যাচারে মক্কার মুসলমানগণ মদীনায় চলিয়া গেলে তাঁহাদের সঙ্গে হযরত বেলাল (রা:) মদীনায় চলিয়া যান এবং তথায় মস্‌জিদেনববী অর্থাৎ "নবীর মসজিদে" হযরত মুহম্মদের (দ:) জীবন–কাল পর্যন্ত মুয়ায্‌যিন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের শাসনকালে তিনি পরলোকগমন করেন।

উসমান—হযরত উসমান রাদী আল্লাহু আনহু—[সংক্ষেপে (রা:)]—প্রথম ইসলামী–রাষ্ট্রের তৃতীয় গণতান্ত্রীক খলীফা। খলীফাথাকালীনই তিনি নিহত হন। তিনি ক্রমান্বয়ে হযরত মুহম্মদের (দ:) দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সেজন্য তাঁহাকে "যুন্নূরায়েন" অর্থাৎ দুই "নূর" বা জ্যোঃতির অধিকারী বলিয়াও অভিহিত করা হয়। তিনি অত্যন্ত বিত্তশালী ও দাতা ছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে "উসমান গনী" অর্থাৎ 'বিত্তশালী উসমান'–ও বলা হইত।

আলী হায়দর—হযরত আলী বা আলী হায়দর নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ৪র্থ খলীফা, এবং হযরত মুহম্মদের (দ:) প্রিয়তমা ও সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার, [সংক্ষেপে (রা:)] স্বামী। ইনি বিখ্যাত বীর এবং অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে "আলী হায়দর" বলা হয়। "হায়দর"—আরবী শব্দ, অর্থ : সিংহ। শুধু সাহসী যোদ্ধা এবং

www.pathagar.com

প্রখ্যাত বীরই নহেন—তিনি ছিলেন একজন বিরাট তত্ত্ব জ্ঞানী পুরুষ। কথিত আছে যে, হযরত মুহম্মদের (দ:) পর তিনিই ইসলামী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রধান ধারক ও বাহক এবং আদি-গুরু ছিলেন। খলীফা থাকাকালীন তিনি গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে শহীদ হন। তিনি ইসলামী-রাষ্ট্রের শেষ গণতান্ত্রীক খলীফা। তাঁহার পরে মুআবিয়া অনেকটা বাহুবলে খলীফার আসন দখল করেন এবং খলীফার আসন বংশগত রাজ-তন্ত্রে পরিণত করেন। হযরত আলী একজন উচ্চস্তরের কবি এবং বিখ্যাত ব্যাকরণ-বিদ ছিলেন। তিনিই প্রথম আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন।

রসুল-দুলালী—আল্লাহর রসুল হযরত মুহম্মদের (দ:) কন্যা। এখানে তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বিবি ফাতিমাকে (রা:) বুঝাইতেছে।

মা ফাতিমা—হযরত মুহম্মদের (দ:) প্রিয়তমা সর্বকনিষ্ঠা কন্যা এবং হযরত আলীর (রা:) স্ত্রী এবং হযরত ইমাম হাসান (রা:) ও হযরত ইমাম হুসাইনের (রা:) জননী। হযরত ইমাম হাসান-হুসাইনের জননীকে সমস্ত মুসলমানের জননীরূপে কল্পনা করিয়া সম্মানার্থ তাঁহাকে "মা" বলা হইয়াছে।

মুলফাকার—হযরত আলীর (রা:) তরবারির নাম।

হাসান—হযরত ইমাম হাসান (রা:)। হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র এবং হযরত আলী (রা:) ও বিবি ফাতিমার (রা:) জ্যেষ্ঠ পুত্র। হযরত আলীর (রা:) হত্যার পর ইমাম হাসানকে (রা:) বিষদানে হত্যা করা হয়।

হুসেন—প্রকৃত বানান : হুসাইন। এখানে কবিতার ছন্দের মাত্রা রক্ষার জন্য "হুসেন" ব্যবহার করা হইয়াছে। কবিতায় এরূপ ব্যবহার বিধেয়। তিনি হযরত মুহম্মদের (দ:) দৌহিত্র এবং হযরত আলী (রা:) ও বিবি ফাতিমার (রা:) দ্বিতীয় পুত্র। তিনিই কারবালায় ইসলামী-রাষ্ট্রের প্রথম বংশগত রাজ-তান্ত্রিক খলীফা অত্যাচারী ইয়াযিদের সেনাবাহিনী কর্তৃক সপরিবারে অবরুদ্ধ হন এবং পানি ও খাদ্যাভাবে অবসন্ন অবস্থায় অন্যায় ও নিষ্ঠুর যুদ্ধে ইয়াযিদ-বাহিনীর হস্তে পরিবারের প্রায় সমস্ত পুরুষসহ শহীদ হন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করিয়াই সারা মুসলিম জাহানে মহররমের শোক-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

নানাজান—"নানা" উর্দু শব্দ ; অর্থ : মাতামহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটি রাজপুতনায় প্রচলিত ভাষার অন্তর্ভুক্ত। মুঘল-সম্রাটগণ বহু রাজপুত-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ঐসব রাজপুত-বেগমের গর্ভজাত সন্তানগণ তাঁহাদের মাতার ভাষার অনুকরণে মাতামহকে "নানা" বলিয়াই অভিহিত করিতেন। ফলে "নানা" শব্দটি মাতামহ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে মুঘল-রাজবংশে প্রচলিত হইয়া যায় এবং মুঘল-সম্রাটদের অনুকরণে কালক্রমে সারা ভারতীয় মুসলমানগণই এই শব্দটি উল্লেখিত অর্থে গ্রহণ করে। "জান" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : প্রাণ। "নানাজান" অর্থ : "প্রাণসম প্রিয় মাতামহ।" ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্টতম আত্মীয়তা জ্ঞাপনার্থ "জান" শব্দের এইরূপ প্রয়োগ মুসলমান সমাজে প্রচলিত, যথা : "আম্মাজান", "আব্বাজান", "মামুজান" ইত্যাদি। আলোচ্য কবিতায় "নানাজান" দ্বারা হযরত হাসান (রা:) ও হযরত হুসাইনের (রা:) মাতামহ বা "নানা" হযরত মুহম্মদকে (দ:) বুঝাইতেছে।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার আবির্ভাব অংশের অনুসরণে হযরত মুহম্মদের (দ:) জন্ম উপলক্ষে স্বর্গে-মর্ত্তে যে-আনন্দ-ধারা উৎসারিত হয় তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। এই কবিতায় বলা হইয়াছে : "নাই তাজ

তাই লাজ ?—ওরে মুসলিম খর্জ্জুরশীর্ষে তোরা সাজ।"

এখানে কেন "তাজ" নাই এবং কেন অন্য কোন কিছুতে না সাজিয়া খর্জ্জুর-শীর্ষে সাজিতে বলা হইয়াছে,—তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। হযরত মুহম্মদের (দ:) তিরোভাবের ফলে স্বর্গ—মর্ত্যব্যাপী যে-মনোভাবের সৃষ্টি হইল সে সম্পর্কে "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "তিরোভাব" অংশে কবি যে বর্ণনা দান করিয়াছেন তাহার ভাবালম্বনে উক্ত ঘটনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৪। "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" নামক কবিতায় কবি লিখিয়াছেন : —

"চলে আনজাম
দোলে তান্‌জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।"

এই সব ঘটনা কখন এবং কেন হইতেছে, বর্ণনা কর।

৫। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে বে লাগে আগ্
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ।"

(খ) "দূরে আবদুল্লার রুহ্ কাঁদে ওরে আমিনারে গমি নাই—
দেখ সতী তব কোলে কোন চাঁদ, সব ভরপুর, কমি নাই।"

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "একি বিস্ময়। আযরাঈলেরও জলে ভর-ভর চোখ।
বে-দরদ দিল কাঁপে থর-থর যেন জর-জর-শোক।
জান্-মারা তার পাষাণ পাঞ্জাহ্ বিলকুল ঢিলা আজ
কব্‌জা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।"

(খ) "আজ জাহান্নামের বহ্নি-বারিধি নিভে গেছে ক্ষরি জল,
যত ফিরদৌসের নার্গিস-বালা ফেলে আঁসু-পরিমল।"

(গ) "আজ অমরার আলো আরো ঝলমল
সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল
নেমে এল অমারাশি।"

www.pathagar.com

টীকা লিখ :—

ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম, হেরা, উরুজ, শাম, ওমান, হুর, কাহারবা, তাবেঈন, দূরাণী, কুরসী, ওষষা, মানাত, হামযাহ, মিকাঈল, রোর্‌রাক, নীলাতাজ, সুলেমান, বেলাল, যুলফাকার।

৮। এই কবিতার আবির্ভাব অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক দুইটি এবং তিরোভাব অংশের প্রথম দশ লাইন মুখস্থ লিখ।

নৌজোয়ান

এই কবিতাটি কবি নজরুল ইসলামের "নূতন চাঁদ" নামক কাব্য-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। "নূতন চাঁদ" তাঁহার শেষ রচিত কবিতাসমূহের সংকলন। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁহার সর্বশেষ কবিতা পুস্তকের নাম "মরু-ভাস্কর"। "মরু-ভাস্কর" কবিতায়-রচিত হযরত মুহম্মদের (দ:) জীবনী। কিন্তু পুস্তকটি অসমাপ্ত এবং বহু পূর্বের লেখা। কাজেই "নূতন-চাঁদ" গ্রন্থটিই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এ-পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ। এই পুস্তকে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতা "নবযুগ" নামক দৈনিক পত্রিকায় ১৯৪২-৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। নজরুল ছিলেন তখন "নবযুগ" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। এই কবিতাগুলি রচনার অব্যবহিতকাল পরে "নবযুগের"র সম্পাদক থাকাকালীনই অকস্মাৎ তিনি "প্যারালাইসিস্‌" বা অবসাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই সেই রোগে তাঁহার মস্তিষ্কও আক্রান্ত হয়। ফলে তিনি উন্মাদ হইয়া যান এবং আজও সেই রোগের কবলে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া আছেন। যাহা হউক "নূতন চাঁদ"-এর কবিতাগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা—সেইজন্য এই কবিতাগুলিতে আবেগ ও বেগের চেয়ে চিন্তা ও ভাবের গভীরতা বেশী।

আলোচ্য কবিতায় কবি নবযৌবনের জয়গান গাহিয়াছেন। যে-যৌবন আদর্শবাদী—যে-যৌবন লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতির পরোয়া না করিয়া মহত্তর আদর্শ ও সুন্দরতর পৃথিবী সৃষ্টির জন্য পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গাইয়া, সিংহ-শার্দুলের সঙ্গে লড়াই করিয়া ক্লীব ভীরুর সাবধান-বাণী পদদলিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয় সেই মৃত্যু-ভয়হীন নও-জওয়ানীরই তিনি এখানে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।

টীকা

নৌজোয়ান—প্রকৃত বানান : নও জওয়ান। ছন্দের মাত্রার খাতিরে "নৌজোয়ান" ব্যবহার করা হইয়াছে। কাব্যে ইহা বিধেয়। অর্থ : নবযুবক।

সন্দেহের বিসর্গ-অনুস্বর—"অনুস্বর"-এর অন্য বানান : অনুস্বার। উভয় বানানই শুদ্ধ। সংস্কৃত-ভাষা অনুস্বার ও বিসর্গ-বহুল এবং সংস্কৃত-ভাষা প্রধানতঃ পণ্ডিতগণই বিশেষভাবে চর্চা ও আলোচনা করিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আর "পণ্ডিত" বলিতে "তর্কলঙ্কার", "তর্কপঞ্চানন" প্রভৃতি তর্ক-শাস্ত্রবিদ্‌দিগকেই সাধারণতঃ বুঝায়। কারণ ন্যায়-শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র লইয়া পণ্ডিতে-পণ্ডিতে যে-তর্ক যুদ্ধ হয় তাহার জয়-পরাজয়ের উপরই পাণ্ডিত্যের মান নির্ভর করে। কাজেই এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্য বলিতে তার্কিকতা বা শাস্ত্রীয় তর্ক-শক্তিকেই সাধারণভাবে বুঝায়। অতএব "সন্দেহের বিসর্গ-

www.pathagar.com

অনুস্বর” দ্বারা পদে-পদে শাস্ত্রীয় বাধা-নিষেধের ফলে উদ্ভূত প্রতি কাজে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ এবং অতি পাণ্ডিত্যের তার্কিকতা-প্রসূত সন্দেহকেই বুঝানো হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। “নৌজোয়ান” শীর্ষক কবিতায় কবি নবযৌবনের যে গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। “নৌজোয়ান”-শীর্ষক কবিতার “কাপুরুষ তার্কিক যারা”—এই লাইন হইতে নীচের আট লাইন কবিতা মুখস্থ লিখ।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) নাই ইহাদের অবিশ্বাস,
যা আনে জগতে সর্বনাশ,
প্রতি নিঃশ্বাসে এরা কহে—“মোরা অমর”।
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ-অনুস্বর।

(খ) এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান্
ইহাদের নাই দেহ ও মন—কেবল প্রাণ।

উমর ফারুক

এই কবিতাটি কবি নজরুল ইসলামের “জিঞ্জীর” নামক কাব্য-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ইসলামের যে মুক্তি-মহান প্রকৃত রূপ—তাহার সর্বত্যাগী আত্মোৎসর্গের যে-সুমহান নীতি, এবং ন্যায়-বিচার, সাম্য ও ঐক্যের যে-ব্যবহারিক আদর্শ এবং তাহার কোমলতা ও কঠোরতা নজরুল তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় রূপ দিয়াছেন, এ কবিতাটি তাহাদের অন্যতম। ইসলামের মহতী আদর্শ, তেজ ও জোশ এবং তাহার সর্বব্যাপী মানবিকতা বাঙ্গালী—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এমনি কবিতার ভিতর দিয়া নজরুল তাহা পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহাদের চিত্ত-লোকে নব প্রেরণা ও নব প্রাণনার সঞ্চার করিলেন। আত্ম-বিস্মৃত মোহমুগ্ধ জাতির ভিতর হইতে একটা প্রাণ-দীপ্ত নব মানব-গোষ্ঠির সৃষ্টির আয়োজন হইল, বাংলা-সাহিত্য একটা নূতন ভাষা ও ভাব-বন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া গেল, বাংলা ভাষার একটা নূতন অধ্যায়—একটা নূতন যুগ আরম্ভ হইল।

আলোচ্য কবিতায় কবি ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা হযরত উমর ফারুকের ত্যাগ-দীপ্ত ও আদর্শনিষ্ঠ মহান জীবন-কাহিনী ভক্ত ও দরদীর হৃদয়-ভরা শ্রদ্ধা ও দরদ নিয়া অপূর্ব ভাষা ও ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। ফারুক-চরিতে মানবতার যে-পরিপূর্ণ রূপ এবং রাষ্ট্র-নেতা ও রাষ্ট্র-শাসকের যে পরিপূর্ণ আদর্শ বাস্তব-ক্ষেত্রে সফল ও সার্থক হইয়াছে—পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা একান্ত বিরল। এই বিরল-লভ্য চরিত্রটিকেই কবি তাঁহার বিরল-লভ্য প্রতিভার সাহায্যে আলোচ্য কবিতায় রূপায়িত করিয়াছেন।

www.pathagar.com

টীকা

উমর ফারুক—ইনি নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী-রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গণ-তান্ত্রিক খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা:)। ইসলামী-রাষ্ট্রের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মুসলমান রাষ্ট্র-শাসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন উমর ফারুক (রা:) নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু মুসলমান দেশ-শাসক নহে—সারা পৃথিবীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ-নায়ক ও দেশ-শাসকদের তিনি অন্যতম—হযত বা তাঁহাদের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার আত্মত্যাগ ও তাঁহার নিতান্ত সাদা-সিধা ও নিরভিমান জীবন-যাত্রা-প্রণালী, তাঁহার ন্যায়-পরায়ণতা ও ঔদার্য, গভীর দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম রাজনীতি-জ্ঞান, তাঁহার সাম্য ও অভেদ নীতি, তাঁহার উদার ধর্মনিষ্ঠা ও বিশ্বপ্রেম এবং তাঁহার বীরত্ব ও অসীম সাহস ছিল প্রায় তুলনাহীন এবং একটি মাত্র চরিত্রে এই সমস্ত দুর্লভ গুণাবলীর একত্র সমাবেশ—মানব-জাতির ইতিহাসে একান্ত বিরল। তিনি "ফরুক" বলিয়াও অভিহিত হইতেন। "ফারুক" আরবী শব্দ—"ফরক" বা "পৃথক করণ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। জটিল ব্যাপারেও সত্য-মিথ্যা এবং ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম পার্থক্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহাকেই "ফারুক" বলা হয়। ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকেও কঠোরতম শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার শাসনকালেই আরবের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রবল প্রতাপান্বিত পারস্য-সাম্রাজ্য, উত্তর সীমান্তবর্তী অন্যতম প্রতাপান্বিত রোমক-সাম্রাজ্যের সিরিয়া-প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশ এবং প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র পশ্চিমের মিসর রাজ্য ইসলামী গণ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উমর (রা:) একাধারে দিগ্বিজয়ী রাষ্ট্র-নেতা, সুদক্ষ রাষ্ট্র-সংগঠন এবং উদার-হৃদয় ধর্ম-নায়ক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি মক্কার কুরাইশদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর এবং অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। ইসলাম-প্রচারের প্রাথমিক সময়ে তিনি ইসলাম ও হযরত মুহম্মদের (দ:) ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ান। ঐ সময় একদিন, তিনি হযরত মুহম্মদকে (দ:) হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে হযরতের গৃহের দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার আপন সহোদরা ভগ্নী ফাতিমা এবং ভগ্নীপতি সাঈদ ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রথমে ভগ্নী ও পরে ভগ্নীপতিকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান মানসে তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাঁহারা রুদ্ধদ্বারে সুললিত কণ্ঠে কি যেন পাঠ করিতেছেন। তিনি দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁহার ভগ্নী একটি লিখিত কাগজ লুকাইয়া ফেলিলেন। ঐ কাগজে, কুরআনের অগ্নি-গর্ভ ছন্দময় ভাষায় রচিত "সুরা তা-হা" লিখিত ছিল। উমর (রা:) তাঁহাদের ইসলাম-গ্রহণের সংবাদ সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলে উমরের (রা:) কথা জানিয়াও তাঁহারা সে-কথা অম্লান বদনে স্বীকার করিলেন। উত্তর শুনামাত্র ক্রোধান্ধ উমর (রা:) ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার আরম্ভ করিলেন। স্বামীকে রক্ষা করিতে যাইয়া ফাতিমাও ভ্রাতার হস্তে যথেষ্ট পরিমাণে প্রহৃত হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদের নব-লব্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতিমধ্যে প্রহারের ফলে ভগ্নীর দেহ হইতে রক্তপাত হইতে দেখিয়া উমরের (রা:) চৈতন্যোদয় হইল এবং তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এত অত্যাচারের পরেও ধর্মের প্রতি তাঁহাদের অটল বিশ্বাস—পক্ষান্তরে নিজের নির্দয় বর্বরতার কথা চিন্তা করিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল। তখন তিনি বিনীতভাবে ভগ্নীর নিকট কুরআনের "সুরা"—লিখিত উল্লেখিত কাগজখানা দেখিতে চাহিলেন এবং কাগজখানির কোনরূপ ক্ষতি করিবেননা বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অতঃপর ভগ্নীর নির্দেশে স্নানান্তে শুদ্ধ দেহ হইয়া তিনি কুরআনের উক্ত "সুরা"টি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পাষাণ-হৃদয় গলিত হইয়া অশ্রুসজল ধারায় বহিতে লাগিল এবং "সুরা"-পাঠ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গে তিনি কলেমা বা আল্লাহ্‌র একত্ব ও হযরত মুহম্মদের (দ:) রেসালত অর্থাৎ আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহম্মদ (দ:) যে আল্লাহ্‌র রসুল—এই উভয় সত্যের স্বীকৃতি-বাণী পাঠ করিয়া মুসলমান হইয় গেলেন। সেখান হইতেই পূর্বোক্ত তরবারি হস্তে তিনি সোজা হযরত মুহম্মদের (দ:) নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় হযরত কতিপয় শিষ্যসহ বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, ইসলাম ও হযরত মুহম্মদের (দ:) অন্যতম প্রধান শত্রু পরাক্রান্ত উমর মুক্ত তরবারি হস্তে এদিকে আসিতেছেন, দূর হইতেই ইহা লক্ষ্য করিয়া হযরত মুহম্মদের (দ:) উপস্থিত শিষ্যগণ সকলেই হযরতের জীবনাশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং সকলেই তরবারি হস্তে উমরকে (রা:) বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (দ:) সকলে নিরস্ত করিয়া একাকী শূন্যহস্তে অগ্রসর হইয়া গিয়া উমরের (রা:) অভ্যর্থনা করিলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখিলেন, দুর্দান্ত উমর (রা:) শান্ত বিনয়-নম্র শিশুর মত নত মস্তকে হযরতের হস্ত ধারণ করিয়া কলেমা উচ্চারণ করিতেছেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত উন্মুক্ত তরবারি হযরতেরই পদতলে স্থাপিত হইয়াছে। যে-তরবারি হযরত মুহম্মদকে (দ:) হত্যা করিবার জন্য হস্তে ধারণ করিয়া উমর (রা:) গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন আল্লাহ্‌র অপূর্বলীলায় কয়েক ঘণ্টার ভিতর সেই তরবারিই হযরত মুহম্মদ (দ:) ও ইসলামের সেবায় হযরত মুহম্মদেরই (দ:) পদতলে অর্পিত হইল। উমরের (রা:) ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম-প্রচারে নব-জীবন আসিল। এতদিন পর্যন্ত নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ কুরাইশদের অত্যাচারে প্রকাশ্যে কাবা গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু উমর (রা:) ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে কাবা-গৃহে যাইয়া এক আল্লাহর উপাসনা করিতে লাগিলেন। উমরের (রা:) ভয়ে কুরাইশগণ আর মুসলমানদিগকে বাধা দিতে সাহসী হইল না।

এই উমরই (রা:) ইসলামী-রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের ইতিহাসে আদর্শ রাষ্ট্র-পতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ইসলামী শাসন-রীতির মূল-সূত্রগুলি কুরআন ও সুন্নার অনুসরণে হযরত উমরই (রা:) সর্বপ্রথম কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। ইসলামী-রাষ্ট্রের রাজস্ব-রীতি, ভূমি-বণ্টন-নীতি, সেনা-বাহিনী সংগঠন ও রণ-নীতি, বাণিজ্য-নীতি, পররাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি রাষ্ট্র-শাসনের সর্বশাখায় প্রচলিত আইন-কানুনের অধিকাংশই হযরত উমর (রা:) কর্তৃক রচিত ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তিনি চতুর্দশ বৎসর খলীফাপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ফিরুয নামক পারস্যের এক অগ্নি-উপাসক গুপ্ত-ঘাতক কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার কন্যা বিবি হাফসা হযরত মুহম্মদের (দ:) অন্যতমা পত্নী ছিলেন।

এশার আযান—"এশা" আরবী শব্দ ; অর্থ : রাত্রির প্রথম ভাগ ; দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্বার্ধ। "আযান" আরবী শব্দ ; শাব্দিক অর্থ : উচ্চস্বরে আহ্বান। প্রচলিত অর্থ : নামাযের জন্য উচ্চস্বরে আহ্বান। "এশার আযান" অর্থ : সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহর রাত্রির মধ্যভাগে অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রায় এক প্রহর রাত্রে মুসলমানগণ যে "এশার নামায" আদায় করেন সেই নামাযে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান বা আযান। দিবা-রাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয্ বা অবশ্য কর্তব্য। এশার নামায হইল এই দৈনিক পঞ্চ পর্যায় নামাযের শেষ নামাজ।

আমীর-উল-মুমেনিন--"আমীর" আরবী শব্দ ; অর্থ : আদেশ-দাতা বা নেতা : "আমর্" বা "আদেশ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। "মুমেনিন"—আরবী শব্দ ; অর্থ : বিশ্বাসীগণ ; "মুমেন" বা "মুমিন" অর্থাৎ "বিশ্বাসী" শব্দের বহুবচন। "মুমেনিন" শব্দের প্রচলিত অর্থ হইল :

www.pathagar.com

ইসলামে বিশ্বাসীগণ অর্থাৎ মুসলমানগণ। এখানে "উল" আরবী ব্যাকরণের সংযোগ-সাধন-সূচক প্রত্যয় বিশেষ—যেমন বাংলায় "এর"। কাজেই "আমীর-উল-মুমেনিন"-এর শাব্দিক অর্থ : মুসলমানগণের নেতা। প্রচলিত অর্থ হইল : বিশ্ব-মুসলমানের নেতা ও শাসক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশাল মুসলিম-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয়-নেতা ও শাসককে "আমীর-উল-মুমেনিন" বলিয়া সম্বোধন করা হইত। তাঁহাদের পদবী বা উপাধি ছিল "খলীফা"। পরবর্তী যুগে মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইয়া যাওয়ার পর যে-মুসলমান অধিপতি বিরাট সাম্রাজ্য ও তৎসঙ্গে আরব দেশের অন্ততঃ হেজায্ প্রদেশের অর্থাৎ মক্কা-মদীনার আধিপত্য লাভ করিতেন তাঁহাকেও "আমীর-উল-মুমেনিন" বলিয়া অভিহিত করা হইত ; যেমন—তুরস্কের সুলতানগণ।

"তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি--জানেনা মুয়ায্যিন।"—ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মক্কার কুরাইশগণের অত্যাচারে হযরত মুহম্মদ (দ:) ও মক্কার অন্যান্য মুসলমানগণ মদীনায় চলিয়া যাওয়ার পর মদীনার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন মুসলমানগণ সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে যাহাতে নামায আদায় করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তথায় মসজিদ নির্মিত হইল এবং প্রত্যেক নামাযের সময় কি করিয়া সকলকে আহ্বান করা যায়, যে প্রশ্ন দেখা দিল। কেহ-কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, ঘণ্টা-ধ্বনি করিয়া মুসলমানদিগকে আহ্বান করা হোক—কেহবা অন্যরূপ প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বর্তমানে যে-ভাবে এবং যে-সব বাক্য উচ্চারণ করিয়া আযান দেওয়া হয়—সে প্রস্তাব আনয়ন করিলেন হযরত উমর (রা:)। হযরত মুহম্মদ (দ:) হযরত উমরের সেই প্রস্তাব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাই "আযান" রূপে প্রচার করিলেন। আজ পর্যন্ত জগতের সর্বত্র হযরত উমরের (রা:) প্রস্তাবিত সেই পদ্ধতি ও বাক্যাবলী সমন্বিত আযানই প্রতিদিন পাঁচবার আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। "মুয়াযযিন" আরবী শব্দ ; অর্থ : আযানদাতা। বর্তমান জগতের "মুয়ায্যিন"গণের অধিকাংশই জানেন না যে, তাঁহারা প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া যে-আযান দিতেছেন সে আযান হযরত উমর (রা:) কর্তৃকই উদ্ভাবিত ও প্রস্তাবিত এবং সে-হিসাবে এই আযানের সঙ্গে হযরত উমরের (রা:) স্মৃতি চির-বিজরিত। কবিতার আলোচ্য চরণে কবি এই কথাই বলিয়াছেন।

তকবির—আরবী শব্দ ; অর্থ : কাহারো মহিমা ঘোষণা করা। প্রচলিত অর্থ : "আল্লাহ আকবর" অর্থাৎ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান"—এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমা উচ্চস্বরে বিঘোষণ।

আখেরী নবী—"আখের" আরবী শব্দ ; অর্থ : শেষ। এই আরবী "আখের" শব্দের সঙ্গে ফার্সী ব্যাকরণের "ঈ" প্রত্যয় যোগ করিয়া ইহাকে বিশেষণ করা হইয়াছে। এখানে "আখেরী নবী"র অর্থ হইল "শেষ নবী"—অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (দ:) ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারে হযরত মুহম্মদ (দ:) হইলেন নবীগণের শেষ ব্যক্তি এবং তাঁহার পর জগতে আর অন্য কোন নবী আবির্ভূত হইবেন না। বিগত দেড় সহস্র বৎসরের ইতিহাস একথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। হযরত মুহম্মদের (দ:) পূর্বে সাধারণতঃ প্রতি পাঁচশত বৎসরে একজন করিয়া নবী আবির্ভূত হইতেন। কিন্তু হযরত মুহম্মদের (দ:) তিরোধানের পর গত দেড় সহস্র বৎসরের ভিতর অন্য কোন নবী আগমন করেন নাই। ["নবী" শব্দের ভাষ্যের জন্য এই পুস্তকের "না'ত" শীর্ষক কবিতার "নবী" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

"দিয়েছিলে ফেলি মুহম্মদের (দ:) চরণে যে-শমশের"—"শমশের"—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : তরবারি। প্রকৃত উচ্চারণ "শমশির"। ছন্দের মিলের জন্য "শমশের" ব্যবহার করা হইয়াছে। আলোচ্য চরণের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় : "মুহম্মদের (দ:) চরণে যে-তরবারি ফেলিয়া

www.pathagar.com

দিয়াছিলে—"। এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ ও ভাষ্যের জন্য এই কবিতার "উমর ফারুক" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

পয়গম্বর—এই পুস্তকের "না'ত" শীর্ষক কবিতার "পয়গম্বর" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

ধুলার তখ্‌ত্‌—"তখত" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : সিংহাসন। "ধূলার তখত" অর্থ ধুলার সিংহাসন বা মাটির সিংহাসন। হযরত উমর (রা:) ইরাণ বা পারস্যের পূর্ব সীমান্ত হইতে উত্তর আফ্রিকার মিসর পর্যন্ত বিশাল ইসলামী-রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-পতি বা খলীফা ছিলেন। এই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনা। এখানে খলীফার অভিষেক কিংবা অন্য কোন উৎসব কিংবা বৈদিক রাষ্ট্রের রাজ-দূত কিংবা কোন মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনা উপলক্ষে রাষ্ট্র-পতি খলীফার আসন গ্রহণের জন্য কোন রাজ-সিংহাসন তো ছিলই না—এমনকি প্রাত্যহিক রাষ্ট্র-পরিচালনা-কার্য-চালাইবার সময় খলীফার বসিবার জন্য একটি কাষ্ঠাসন পর্যন্ত ছিল না। তিনি মদীনার "মসজিদে নববী" বা নবীর মসজিদের ভিত্তির উপর খেজুর পাতার চাটাইয়ের আসনে বসিয়া কিংবা বৃক্ষের ছায়াতলে মাটির উপর বসিয়া এই বিশাল ইসলামী-রাষ্ট্রের শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেন। সেই জন্যই আলোচ্য কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে, হযরত উমর ফারুক ধুলার তখ্‌ত্‌ বা ধুলার সিংহাসনে বসিয়া অর্ধ পৃথিবী শাসন করিয়াছেন।

খেজুর পাতার প্রাসাদ—পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্বকালে ইহাই সাধারণ প্রচলিত নিয়ম যে, দেশের অধিপতি বা রাষ্ট্র-পতি দেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, বৃহৎ ও জাকজমকপূর্ণ "গৃহে" বাস করিবেন। সেরূপ গৃহকে প্রাসাদ বা রাজ-প্রাসাদ বলা হয়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিরাও এমনি জাকজমক ও বিলাসপূর্ণ প্রাসাদেই বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু হযরত উমর (রা:) বিশাল ইসলামী-রাষ্ট্রের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়াও অত্যন্ত নগণ্য ও সাধারণ গৃহে বাস করিতেন। যে গৃহের দেয়াল তৈয়ারী ছিল মাটি আর প্রস্তর কঙ্কর-সংমিশ্রণে, আর ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনী দিয়া তৈয়ারী। এই জন্যই তাঁহার বাসস্থানকে আলোচ্য কবিতায় "খেজুর পাতার প্রাসাদ" বলা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে—তাঁহার আদি-বাসস্থান ছিল মক্কা নগরীতে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে রিক্তহস্তে মদীনায় চলিয়া আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। মদীনায় আগমনের পর তিনি যে-সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা প্রণালী গ্রহণ করেন, পরবর্তী কালে বিশাল ইসলামী-রাষ্ট্রের খলীফাপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও সেই একান্ত অনাড়ম্বর জীবনই তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। খলীফারূপে শুধু নিজেই নহে—তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক প্রদেশের "ওয়ালী" বা গভর্ণর এবং সমস্ত শ্রেণীর রাজ-কর্মচারীদের উপর তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল যে, তাঁহারা (১) সাধারণ জনগণের গৃহ অপেক্ষা উচ্চতর বা শ্রেষ্ঠতর গৃহে বাস করিতে পারিবেন না ; (২) জনসাধারণ নিজেদের অভাব-অভিযোগ যাহাতে তাঁহাদিগকে অনায়াসে জানাইতে পারেন সেজন্য সর্বক্ষণ তাঁহাদের গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং দ্বারে কোনরূপ দারোয়ান রাখা চলিবেনা ; (৩) তাঁহারা কোনরূপ মণিমুক্তা বা জাকজমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করিতে পারিবেননা—এবং তাঁহাদের পোষাক সাধারণ জনগণের পোষাক অপেক্ষা শ্রেয়তর হইতে পারিবে না ; এবং (৪) "বায়তুল-মাল" বা সরকারী কোষাগার হইতে নিজেদের জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট অর্থ (Subsistence allowance) ব্যতীত রাষ্ট্রের বা সরকারী উচ্চপদের মর্যাদা রক্ষার নামে নিজেদের সুখ-সুবিধা ও আত্মগরিমা চরিতার্থতার জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করিতে পারিবেন না। এই আদেশ অমান্য করায় হযরত উমর (রা:) ইরানের গভর্ণর সাদকে পদচ্যুত করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "অমি শুনিতে পাইলাম, তুমি খসরুগণের (অর্থাৎ প্রাক-ইসলামী ইরানের সাআনীয় বংশের সম্রাটগণের) অনুকরণ করিয়া প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছ।

www.pathagar.com

......তোমার উদ্দেশ্য ইরানী সম্রাটগণের মত দ্বারবান রাখা। তাহাতে সাহায্য ও বিচার-প্রার্থী জনসাধারণের প্রভূত অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। তুমি এইভাবে রসুলুল্লাহর পথ পরিত্যাগ করিয়া খসরুগণের পথ অবলম্বন করিয়াছ। মনে রাখিবে, খসরুগণ রাজ-প্রাসাদ হইতে কবরে যাইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। আর রসুলুল্লাহ তাঁহার সামান্য কুটীর হইতে সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে আরোহণ করিয়াছেন। আমি মুহম্মদ-ইব্‌ন্‌-মুসলিমকে তোমার প্রাসাদ ধ্বংস করিবার জন্য আদেশ দিয়াছি। এ দুনিয়ায় গভর্ণররূপে তোমার জন্য দুইটি ঘরই যথেষ্ট—একটি বাস-গৃহ আর একটি কোষাগার।" শুধু ইহাই নহে, হযরত উমরের উল্লেখিত চার দফা আদেশের কয়েকটি অমান্য করার ফলে তিনি সিরিয়ার গভর্ণরকেও মদীনায় ডাকিয়া অনিলেন এবং তাঁহাকে দিয়া মদীনার মাঠে-মাঠে কেন্দ্রীয় বায়তুল-মালের অন্তর্ভুক্ত একপাল মেষ বেশ কিছু কাল পর্যন্ত চড়াইয়া লইলেন। এইরূপে গভর্ণর পদের অহমিকা ও অহংকার তাঁহার মন হইতে যখন সম্পূর্ণ দূর হইল তখন আবার তাঁহাকে তাঁহার পূর্বোক্ত পদে কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। উমর (রা:) এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি যখন সংবাদ পাইলেন যে, মিসর-বিজয়ী বীর এবং মিসরের গভর্ণর আমর্‌-ইব্‌ন্‌-আস্‌ যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়া বেশ বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন তখন তিনি আমর-ইব্‌ন্‌-আসের অর্ধেক সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। ইসলামী-রাষ্টের সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণকে ইসলামের ন্যায় ও সাম্য-নীতি হইতে বিচ্যুত না করিতে পারেন এবং জনসাধারণকে শোষণ ও অত্যাচার না করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যেই হযরত উমর (রা:) এই 'কঠোর-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইসলামের নীতিও ইহাই।

সাইমুম—আরবী শব্দ ; প্রকৃত উচ্চারণ সিমুম।। উত্তর আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এবং আরবের মরু-ভূমিতে এক প্রকার উত্তপ্ত প্রবল বালু সময়-সময় ঝড়ের মত বহিতে থাকে। ইহার কবলে পড়িয়া বহু প্রাণী প্রাণ হারায়। এই ঝঞ্ঝা বায়ুকে "সাইমুম" বলে।

যেরূযালেম—প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত একটি অতি প্রাচীন শহর। এখানে ইসরাইল বংশীয় বিখ্যাত নবী ও প্রবল প্রতাবান্বিত বাদশা হযরত সুলায়মানের (আ:) রাজধানী ছিল এবং তিনিই এখানকার বিখ্যাত ইয়াহুদী ধর্ম-মন্দির নির্মাণ করেন। এই শহরের আদি প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলের (আ:) বংশধর ইয়াহুদীদের জাতীয় ভাষা "হিব্রু" ভাষায় এই শহরকে বলা হয় "ইয়ারূশলম"। মুসলমানগণ এই শহরকে "বায়তুল-মুকাদ্দাস" বলেন। "বায়ত" আরবী শব্দ ; অর্থ : গৃহ, "মকাদ্দাস"-ও আরবী শব্দ ; অর্থ : পবিত্র। "বায়তুল-মুকাদ্দাস"-এর অর্থ হইল "পবিত্র-গৃহ" বা "পবিত্র-গৃহ সমন্বিত শহর। হযরত সুলায়মান (আ:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মন্দিরকে মুসলমানগণও পবিত্র বলিয়া মনে করেন এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা মহামতি হযরত উমরের (রা:) খেলাফতের আমলে প্যালেষ্টাইন ও যেরুযালেম মুসলমানদের অধিকারে আসার পর হইতে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ হযরত সুলেমান (আ:) প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মন্দির ও সমগ্র যেরূযালেম শহরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। যেরূযালেম মুসলমানদেরও অন্যতম তীর্থ-স্থান ও প্রথম কিব্‌লা। মুসলমানগণ যাহাকে সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া নামায আদায় করিয়া থাকেন সেই লক্ষ্যবতী স্থান বা গৃহকে "কিব্‌লা" বলা হয়। "কিবলা" আরবী শব্দ ; শাব্দিক অর্থ : "যাহা সম্মুখে আছে"। বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের "কিব্‌লা" হইল মক্কার "কাবা শরীফ"। কিন্তু ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় যখন নামায আদায়ের জন্য মুসলমানদের উপর প্রথম আদেশ হইল তখন মুসলমানদের "কিব্‌লা" ছিল এই যেরুযালেম বা বায়তুলমুকাদ্দিস। ইহার কিছুকাল পরেই আল্লাহ্‌র "অহি" বা প্রত্যাদেশ অনুসারে মক্কার "কাবা শরীফ-ই" মুসলমানদের স্থায়ী

www.pathagar.com

"কিব্‌লা" বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। কাজেই মুসলমানদের প্রথম "কিব্‌লা" হিসাবে যেরুযালেম তাঁহাদের নিকট একটি অতি পূণ্য-স্থান। যেরূযালেম খৃষ্টান ধর্মাবলম্বিগণেরও এইটি প্রধান তীর্থ-স্থান। যিশুখৃষ্ট বা হযরত ঈসা (আ:) নিজেও ইয়াহুদী-বংশোদভব এবং প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী। বিশেষতঃ হযরত ঈসার (আ:) জননী মেরী বা বিবি মরিয়ম তাঁহার জন্মের পরেই তাঁহার পিতামাতা কর্তৃক আল্লাহ্‌র সেবায় উৎসর্গিকৃত হইয়া হযরত সুলায়মান (আ:) কর্তৃক নির্মিত যেরূযালেমের উল্লেখিত ইয়াহুদী ধর্ম-মন্দিরে প্রেরিত হন এবং তাঁহার শৈশব ও কৈশোর এই মন্দিরেই অতিবাহিত হয়। এই সব নানা কারণে যেরূযালেম খৃষ্টানদিগেরও একটি তীর্থ-স্থান। কাজেই যেরুযালেম ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান—পৃথিবীর এই তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের তীর্থস্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন স্থান আর নাই।

কিল্লা—আরবী শব্দ ; অর্থ : দুর্গ। প্রকৃত বানান : কিলা। কিন্তু এদেশে এই শব্দটির প্রচলিত উচ্চারণ "কিল্লা"—বিশেষতঃ ছন্দের মাত্রার রক্ষার জন্য আলোচ্য কবিতায় "কিল্লা" ব্যবহারই বিধেয়।

সাহারা—আরবী শব্দ ; অর্থ : মরুভূমি। কিন্তু উত্তর আফ্রিকাস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমির নামও "সাহারা"। আলোচ্য কবিতায় "সাহারা" শব্দ দ্বারা উত্তর আফ্রিকার সেই সাহারা মরুভূমিকে বুঝায় নাই। এখানে "সাহারা" শব্দ তাঁহার শাব্দিক অর্থ—অর্থাৎ মরুভূমি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ["ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "সাহারা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

খবুয রুটি—"খবুয" ; আরবী শব্দ ; প্রকৃত উচ্চারণ : খুব্‌য্‌ ; অর্থ : রুটি। এখানে "খবুয রুটি" ব্যবহার করিয়া "রুটি" শব্দটিকেই দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে। খুব সম্ভব কবি এখানে আরব দেশীয় বিশিষ্ট ধরনের শুষ্ক রুটিকেই বুঝাইবার জন্য "খবুয" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

খলীফা—আরবী শব্দ ; অর্থ : "উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি।" "খল্‌ফ্‌" অর্থাৎ "যে পরে আসে"—এই শব্দ হইতে "খলীফা" শব্দ উৎপন্ন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও ইসলামী-রাষ্ট্রের স্রষ্টা মহানবী হযরত মুহম্মদের (দ:) তিরোধানের পর যিনি তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে সেই ধর্ম ও রাষ্ট্রের-নেতা নির্বাচিত হইতেন, তাঁহাকেই বলা হইত খলীফা। খলীফা রসুলুল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হইলেও জনসাধারণের সম্মতি ও সমর্থনে তাঁহাকে নির্বাচিত হইতে হইত। এদিক দিয়া তিনি জনসাধারণেরও প্রতিনিধি ছিলেন। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রপতি ও ইসলামের খলীফার মধ্যে মৌলিক প্রভেদ হইল এই যে, আধুনিক রাষ্ট্রপতি শুধু রাষ্ট্র-শাসন-সম্পর্কিত নেতা—মানুষের নৈতিক বা ধর্মীয় জীবন-যাপনের ব্যবস্থা-সাধন সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ কিছু দায়িত্ব নাই। কিন্তু ইসলামের খলীফা একাধারে মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন—উভয়েরই আদর্শ নেতা এবং উভয় জীবনের সুনিয়ন্ত্রণ, সু-ব্যবস্থা, সু-সমন্বয় ও মঙ্গল সাধনই তাঁহার প্রধান কর্তব্য। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র-পতি শুধু জনসাধারণের অধিকাংশের সমর্থনে নির্বাচিত হইতে পারিলেই হইল। কিন্তু ইসলামের খলীফাকে শুধু জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইলেই চলিবেনা, তাঁহাকে রসুলুল্লাহ্‌র আদর্শাভিসারী হইতে হইবে,—রসুলুল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ—অন্ততঃ উহাদের মূলগত তাৎপর্যের দিক দিয়া, পুরাপুরিভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। অপর কথায়, আল্লাহর কুরআন ও রসুলুল্লাহর "সুন্নাহ্‌" বা পথ অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্‌ হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক কৃত, কথিত, সমর্থিত বা উপদিষ্ট কার্যাবলীকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে এবং কুরআনের শিক্ষা, রাষ্ট্র ও ধর্মক্ষেত্রে, রসুলুল্লাহ্‌র জীবনে কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে—সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ

www.pathagar.com

খলীফা মূলে রসুলুল্লাহরই প্রতিনিধি। ইসলামের খলীফার উপর এই কঠোর দায়িত্ব অর্পণের কারণ হইল—ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি বা জীবন-দর্শন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে মানুষের ধর্মীয় ও সাংসারিক জীবন পৃথক নহে—একই জীবনের বিভিন্ন দিক মাত্র এবং এই প্রত্যেক দিকের উন্নতি অবনতিও পরস্পর নির্ভরশীল। বাংলায় যাহাকে "ধর্ম" এবং ইংরেজীতে Religion বলা হয়—কুরআনে সেই অর্থবোধক শব্দকে "দীন" বলা হইয়াছে। কিন্তু "দীন" শব্দ "ধর্ম" বা Religion শব্দের অর্থ অপেক্ষা ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। "ধর্ম" বা Religion শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ আত্মার উন্নতিমূলক পরমার্থিক কার্যাবলী বা স্রষ্টা সম্পর্কিত বা স্রষ্টার প্রীতি-সাধন সম্পর্কিত কার্যাবলী বুঝায়। কিন্তু "দীন" শব্দ দ্বারা মানুষের সাংসারিক ও স্রষ্টা-সম্পর্কিত সমস্ত কাজের সমষ্টিগত সুনিয়ন্ত্রিত নীতিকেই বুঝানো হয় অর্থাৎ মানুষের "ফিত্‌রৎ" বা প্রকৃতি ও স্বভাবগত সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার সুসমন্বয়, সুপরিচালন ও সুনিয়ন্ত্রণমূলক যে-পদ্ধতি তাহারই নাম "দীন"। কাজেই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে স্রষ্টার উপাসনা যেমন "দীন"—সৎজীবিকা অর্জনও তেমনই দীন—এমনকি আহার্য গ্রহণ, বিশ্রাম গ্রহণ এবং নিদ্রাও "দীনের"ই অন্তর্গত। সেইজন্যই ইসলামের খলীফার উপর মানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক—তাহার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, এই উভয় প্রকার মঙ্গল সাধনের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইত। খিলাফত বা খলীফার পদ বংশগত নহে—ব্যক্তিগত গুণাবলী বিচার করিয়া খলীফা নির্বাচন করা হইত। খুলাফায়ে রাশেদিন

অর্থাৎ সৎপথ-গামী বা সৎপথ প্রদর্শক খলীফাগণ, অপর কথায় প্রথম চার খলীফা অর্থাৎ হযরত আবুবকর (রা:), হযরত উমর ফারুক (রা:), হযরত উসমান (রা:) এবং হযরত আলীর (রা:) খিলাফৎ পর্যন্ত খলীফা সম্পর্কিত উপরোক্ত ইসলামী আদর্শগুলি অনুসৃত ও প্রতিপালিত হয়। পঞ্চম খলীফা মুআবিয়া প্রকৃতপক্ষে বাহুবলেই খলীফার পদ অধিকার করেন এবং খিলাফত্‌কে বংশগত রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। ইহার পর হইতে এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাজ্যচ্যুত তুরস্কের সুলতানগণ পর্যন্ত বহু মুসলমান সম্রাট-বংশ—বিশেষ করিয়া মক্কা মদীনা যাহাদের করতলগত থাকিত তাঁহারা নিজদিগকে খলীফা বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং মুসলমানগণ কর্তৃক খলীফা বলিয়া স্বীকৃতও হইয়াছেন। কিন্তু "খলীফা" শব্দের বাস্তব ও মৌলিক অর্থে—অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (দ:) প্রকৃত "প্রতিনিধি" অর্থে, এই সকল মুসলিম রাজন্যবর্গ "খলীফা" পদবীর যোগ্য কিনা তাহা সহজেই অনুমেয়।

রোয কিয়ামত—"না'ত" শীর্ষক কবিতার "কেয়ামত" শব্দে টীকা দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ্‌—"না'ত" শীর্ষক কবিতার "আল্লাহ্‌" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

ফেরেশ্‌তা—"নাদির শাহের জাগরণ" শীর্ষক কবিতার "ফেরেশতা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

খুদা—ফার্সী শব্দ। এদেশে প্রচলিত উচ্চারণ "খোদা"—এই উচ্চারণ ভগ। খদ্‌ অর্থ : স্বয়ং, "আ", অর্থ : আগত। কাজেই খুদ+আ=খুদা, অর্থ হইল : স্বয়ং+আগত অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ আল্লাহ্‌।

ফরমান—"বাঙ্গালার বৃত্তান্ত" শীর্ষক কবিতার "ফরমান" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

মহাবীর খালিদ—ইনিই ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর খালিদ-ইব্‌ন্‌-ওয়ালিদ (রা:)। শুধু মুসলমানদের মধ্যে নহে, মানব জাতির ইতিহাসে উল্লেখিত ও মানুষের পরিজ্ঞাত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীরদের তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম। ইসলামের উত্থান-যুগে বিশ্বের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য ছিল আরবের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব পার্শ্বস্থ ইরান-সাম্রাজ্য এবং

উত্তর ও উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল রোমক সাম্রাজ্য। শিক্ষা, সভ্যতা, ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তিতে জগতে তখন এই দুই সাম্রাজ্যের সমতুল্য কেহই ছিল না। আরবের বহু গোত্র এবং সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহ বহুবার এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া এই দুই সাম্রাজ্য কর্তৃক পদদলিত, লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হইতেছিল। সেই হতমান, অশিক্ষিত ও অর্ধসভ্য আরবগণই ইসলামের সঞ্জিবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রধানতঃ মহাবীর খালিদেরই (রা:) সেনাপৈত্যে অর্ধ যুগেরও কম সময়ের মধ্যে ঐ দুই সাম্রাজ্যকে শুধু পরাজিত ও পর্যুদস্ত নয়, করায়ত্ত করিয়া লন। অপূর্ব রণ–কৌশলী ও অসম সাহসী যোদ্ধা মহাবীর খালিদ (রা:) এই সব প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে অপূর্ণ রণ–সজ্জায়–সজ্জিত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপক্ষ পক্ষের সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত এবং প্রচুর রণ–সম্ভারে বলীয়ান দশ হইতে বিশগুণ বৃহৎ সেনা–বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনায়াসে জয়লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। যে–ইয়ারমুক–যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তে রোমকশক্তি বহু পরিমাণে বিধবস্ত হইয়া যায় সেই মহা–সংগ্রামে মুসলমান পক্ষের প্রধান সেনাপতি মহাবীর খালিদের (রা:) অধীনে মাত্র ত্রিশ সহস্রের মত সৈন্য ছিল আর রোমক–বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষের উপর। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুসলমান সৈন্য নিহত হইয়াছে তিন সহস্র আর রোমক সৈন্য নিহত হইয়াছে লক্ষাধিক। এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের এক দিনেই যুদ্ধ করিতে করিতে মহাবীর খালিদের (রা:) ক্রমান্বয়ে কয়েকটি তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। এই মহাবীর জীবনে কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন নাই। তাঁহার উপাধি ছিল "সায়ফুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তরবারি ; "সায়ফ্" আরবী শব্দ ; অর্থ : তরবারি।

খলীফা উমর (রা:) মুসলিম জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এবং মুসলিম–বাহিনীর এই দিগ্বিজয়ী সর্বপ্রধান সেনাপতি মহাবীর খালিদকে (রা:) সাধারণ আইন–ভঙ্গ ও অমিতব্যয়িতার জন্য প্রধান সেনাপতির পদ হইতে পদচ্যুত করিয়া তাঁহারই অধীনস্থ অন্য সেনাপতির অধীনে সাধারণ সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অবনমিত করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রধান সেনাপতি হিসাবে খালিদের (রা:) উপর তাঁহার অধীনস্থ সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন ব্যয়াদির হিসাব খলীফার নিকট দাখিল করিবার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু খালিদ (রা:) রণ–বিশারদ হইলেও হিসাব–বিশারদ ছিলেন না। কাজেই তিনি এরূপ হিসাবাদি পাঠাইতেন না। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকরের (রা:) আমলেও খালিদ (রা:) এরূপ হিসাবাদি পাঠান নাই। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা:) খালিদের (রা:) নিকট এরূপ হিসাব–পত্র চাহিয়া পাঠাইলেন এবং হিসাব দাখিল না করিলে তাঁহাকে সর্বপ্রধান সেনাপতি–পদ (Generalissimo) হইতে বিচ্যুত করা হইবে, তাহাও লিখিয়া জানাইলেন। খালিদ্ (রা:) উত্তরে জানাইলেন যে, প্রথম খলীফার আমলেও তিনি এরূপ হিসাব–পত্র প্রদান করেন নাই। কাজেই এখনও এরূপ হিসাব–পত্র দাখিল করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। ইয়ারমুকের মহাযুদ্ধের পর এক আরব–কবি খালিদের (রা:) প্রশস্তি–সূচক এক কবিতা রচনা করায় খালিদ (রা:) তাঁহাকে দশ সহস্র দিরহাম—(আরবীয় মুদ্রা-বিশেষ) "ইনাম" বা পারিতোষিক হিসাবে দান করেন। এই সংবাদ হযরত ওমরের (রা:) কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি খালিদের (রা:) সহকারী প্রধান সেনাপতি আবু উবায়দার (রা:) নিকট সরকারী ফরমানসহ এক দূত পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন যে, আবু উবায়দাকে (রা:) প্রধান সেনাপতি করা হইল এবং খালিদকে (রা:) প্রধান সেনাপতি পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া আবু উবায়দার (রা:) অধীনে একজন সাধারণ সেনাপতি পদে অবনমিত করা হইল। ঐ ফরমানে আরও জানাইয়া দেওয়া হইল যে, খালিদ (রা:) যদি নিজ অর্থ হইতে আত্ম–প্রশংসা–সূচক একটি কবিতার জন্য দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া থাকেন তবে তাহা চরম

www.pathagar.com

অমিতব্যয়িতা, আর যদি তিনি তাহা সরকারী তহবিল হইতে দান করিয়া থাকেন তবে তাহা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ও বিশ্বাস-ভঙ্গের দায় এবং কঠোর শাস্তি-যোগ্য। কাজেই উভয় কারণের যে-কোন কারণে তিনি মুসলিম সেনা-বাহিনীর প্রধান-নেতার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য নহেন। কারণ রাষ্ট্র বা সেনা-বাহিনী কিংবা ইসলামী সমাজ-জীবনের অন্য যে-কোন বিভাগের নেতাকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ স্থাপন দ্বারা তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে আদর্শানুগ, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করিতে হইবে। ইসলামে সহজ-সরল আড়ম্বর জীবন যাপনের যে আদর্শ রহিয়াছে এবং যে আদর্শ রসুলুল্লাহ্‌র জীবনে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত ও রূপায়িত হইয়াছে—উপরোক্ত প্রকারের অমিতব্যয়িতা তাহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই এরূপ অমিতব্যয়ী লোক তাঁহার অন্যবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম-মণ্ডলীর আদর্শ নেতা হওয়ার অযোগ্য—অন্যের অর্থ আত্মসাৎ ও বিশ্বাস-ভঙ্গকারীর তো নেতা হওয়ার কথাই উঠে না। হযরত উমরের (রা:) উল্লেখিত ফরমানে এই কথাগুলিরই মর্মার্থ জ্ঞাপন করা হইল।

অনুসন্ধানে দেখা গেল, খালিদ (রা:) তাঁহার নিজস্ব অর্থ হইতেই উক্ত দশ সহস্র "দিরহাম" দান করিয়াছেন। ইসলামের বিধান অনুসারে "গণীমৎ" বা যুদ্ধের বিজয়-লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে বায়তুল-মাল বা সরকারী তত্ত্বাবধানে-রক্ষিত সাধারণ ধনাগারে প্রেরিত হইত এবং বাকী চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধরত সৈন্য ও সেনাপতিদের মধ্যে সমভাবে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত। খালিদ (রা:) বহু যুদ্ধ-বিজয়ী মহাবীর। কাজেই তাঁহার প্রাপ্য "গণীমতের" অংশ হইতে তিনি যে-অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি যে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেন নাই তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল। যাহা হউক, খালিদ (রা:) ছিলেন সৈন্য-বাহিনীর অত্যন্ত প্রিয় সেনাপতি—তাহাদের চোখের মণি। শুধু সৈন্য-বাহিনী নহে—সমগ্র জাতি তাঁহার বীরত্বের গৌরবে নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত—তাঁহার প্রতি তাহাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। সেই খালিদকে (রা:) তাঁহার পদচ্যুতির কথা নিজে জ্ঞাপন করা আবু-উবায়দা সমীচীন মনে করিলেন না। কাজেই খলীফা-প্রেরিত দূতই এক প্রকাশ্য সভায় খালিদকে (রা:) খলীফার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন এবং সর্বসমক্ষে খালিদের (রা:) মস্তক হইতে সর্বপ্রধান সেনাপতির শিরস্ত্রাণ নামাইয়া লইলেন। খালিদ (রা:) খলীফার এই আদেশ অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে দ্বিধা করিলেন না। এইখানেই খালিদের প্রকৃত বীরত্ব ও যথার্থ মহত্ব প্রতিভাত হইল। তিনি যে নিঃস্বার্থভাবে জাতি ও ধর্মের সেবা করিয়া যাইতেছেন এবং আইনানুগ শাসনকে (Rule of Law) তিনি যে ব্যক্তিগত মর্যাদা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকেন—খলীফার আদেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মানিয়া লইয়া তাহা প্রমাণ করিলেন। নতুবা তাঁহার একটি মাত্র অঙ্গুলী-সংকেতে হয়ত সেনা-বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত—এমনকি সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে খলীফাকে পদচ্যুত করিয়া হয়ত বা তিনি নিজেই খলীফার আসন দখল করিতে পারিতেন। ইসলামের চতুর্থ ও শেষ গণতান্ত্রিক খলীফা হযরত আলীর আমলে অনেকটা প্রায় এমন ঘটনাই ঘটিয়া ছিল। সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুআবিয়া এবং মিশরের গভর্ণর আমর-ইব্‌ন্‌আস-সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া গণতান্ত্রিক খিলাফতের অবশান ঘটায় ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

যাহা হউক, খালিদ (রা:) এই পদচ্যুতি দ্বারা তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে মনে করিয়া স্বয়ং মদীনায় যাইয়া খলীফা হযরত উমরের (রা:) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং "গণীমতের" অংশ হিসাবে প্রাপ্ত তাঁহার অর্থের পরিমাণের কথা জানাইয়া তাহা হইতে বিশ

www.pathagar.com

সহস্র দিরহাম "বায়তুল-মালে" অর্থাৎ সাধারণ ধনাগারে জন-মঙ্গলার্থে জমা দিলেন। হযরত উমর (রা:) খালিদের (রা:) এই ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ্‌র নামে বলিতেছি, আমি বাস্তবিকই তোমাকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি।" অতঃপর উমর (রা:) সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণরদিগকে লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি খালিদের (রা:) প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কিংবা খালিদ (রা:) কোনরূপ বিশ্বাসভঙ্গের কার্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করেন নাই ; তবে দিন দিন জনসাধারণ খালিদের (রা:) প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং ইসলামের বিজয়-অভিযান খালিদের বাহুবলেই সাফল্য লাভ করিতেছে—ইহাই তাহারা ধারণা করিতেছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুই যে আল্লাহ্ দ্বারাই সম্পাদিত হয়—এই সত্য যাহাতে খালিদের (রা:) ভক্তেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি খালিদকে (রা:) পদচ্যুত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন।

এইখানেই হযরত উমরের (রা:) গভীর রাজ-নীতি-জ্ঞান, ইসলামের প্রকৃত মর্ম-বোধ-জ্ঞান এবং অদ্ভুত দূরদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম সর্বপ্রকার মানব-পূজা ও ব্যক্তি-পূজার বিরোধী—এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই হযরত উমর (রা:) মহাবীর খালিদকে (রা:) পদচ্যুত করিলেন। আলোচ্য কবিতায় কবিও এই কথাই বলিয়াছেন : —

"মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালিদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ্-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরের শাসিতে এতটুকু টলিলেনা।"

কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশের "সিপাহ্-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা"—এই চরণে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। "সিপাহ-সালার" অর্থাৎ সেনাপতি বা প্রধান সেনাপতি খালিদকে (রা:) মামুলি সেনা বা সাধারণ সৈনিকে অবনমিত করা হয় নাই—তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে নিম্নপদস্থ সেনা-পতির পদে নামাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। এই পদাবনতির অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই হযরত উমরের (রা:) খিলাফতের আমলেই মহাবীর খালিদ (রা:) পরলোকগমন করেন। তাঁহারই দ্বারা বিজিত সিরিয়ার এক ক্ষুদ্র শহর হাম্‌স্-এ তাহাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পর দেখা গেল, একটি অশ্ব, একটি তরবারি এবং সামান্য কিছু অর্থ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে তাহার কিছু নাই। এই সংবাদ-শ্রবণ মাত্র হযরত উমর (রা:) সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ ফেলিয়া রাখিয়া সিরিয়ার সেই সুদূর হাম্‌স্ শহরে ছুটিয়া গেলেন এবং পাষাণ-গলা অশ্রু-জলে মহাবীর খালিদের (রা:) শেষ আশ্রয়-স্থল ভিজাইয়া দিয়া তাঁহার হৃদয়-ভরা শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিলেন।

সিপাহ-সালার—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : সেনা-পতি বা সৈন্যাধ্যক্ষ। সিপাহ্ (সিপাহী) অর্থ : সেনা বা সৈন্য ; "সালার" অর্থ : অধ্যক্ষ।

বায়তুল-মাল—আরবী শব্দ ; অর্থ : ধনাগার। "বায়ত্" অর্থ : গৃহ বা আগার, "মাল" অর্থ : বিত্ত, ধন। প্রচলিত অর্থ : জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ব্যয়িত হইবার জন্য যাকাত, সদকা বা দান, গণীমাত্ বা যুদ্ধে বিজয়লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সরকারের রক্ষণাধীনে যে-ধনাগারে সঞ্চিত রাখা হইত তাহাকেই বলা হইত "বায়তুল-মাল"।

আবু-শাহমা—ইসলামী-রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা:) প্রিয় পুত্র। কিন্তু এই প্রিয় পুত্রও যখন ব্যাভিচারের অপরাধে অপরাধী হইলেন তখন খলীফা উমর (রা:) তাহাকেও কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী তিনি তাঁহাকে একশত "দোর্রা" বা বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। শাস্তি দানের সময় আবু শাহ্‌মা খলীফার

www.pathagar.com

পুত্র বলিয়া সরকারী জল্লাদ তাহাকে যথোপযুক্ত কঠোরতার সহিত বেত্রাঘাত করিতেছেনা বলিয়া খলীফা উমরের (রা:) সন্দেহ হইল। সুতরাং তিনি জল্লাদের হস্ত হইতে নিজ হস্তে দোর্রা গ্রহণ করিয়া পুত্রকে দোর্রাঘাত করিতে লাগিলেন। ৮০ দোর্রাঘাতের পর আবু-শাহ্‌মার মৃত্যু হইল। বাকী ২০ দোর্রা তাহার কবরের উপর মারা হইল। "ইনসাফ" বা ন্যায়-বিচার এবং আইন-অনুগ শাসনের (Rule of Law) মর্যাদা হযরত উমর (রা:) এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন—পুত্র-স্নেহ তাঁহাকে ইসলাম-নির্দেশিত কঠোর কর্তব্য-পথ হইতে কণামাত্রও বিচ্যুত করিতে পারিলনা। হযরত মুহম্মদের (দ:) পূর্ববর্তী নবীদের আমলে ব্যাভিচারের শাস্তি ছিল "রয্‌ম্" বা প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা মৃত্যুদণ্ড। "রয্‌ম" আরবী শব্দ। হযরত মুহম্মদ (রা:) কর্তৃক মদীনায় ইসলামী "সমাজ" ও ইসলামী-রাষ্ট্র স্থাপনের প্রথম দিকে ব্যাভিচারের জন্য একটি মাত্র লোককে "রয্‌ম্" করা হয়। ইহার পরই কুরআনের "অহি" বা-প্রত্যাদেশ-বাণী অবতীর্ণ হয় যে ব্যাভিচারীর শাস্তি হইবে একশত দোর্রা।

আলোচ্য কবিতায় আবু শাহ্‌মা প্রসঙ্গে, বলা হইয়াছে : —

"মদ্য পানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছে দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের, পরে।"

কিন্তু "মদ্যপানের অপরাধে" আবু-শাহ্ মাকে দোর্রা মারা হয় নাই—দোর্রা মারা হইয়াছিল ব্যাভিচারের অপরাধে এবং সেই দোর্রাঘাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই "মদ্য-পানের অপরাধে" আবু-শাহ্‌মাকে দোর্রা মারা হইয়াছে বলা তথ্যের দিক দিয়া ভুল।

খাস-দরবার--মুসলমান-শাসনের আমলে দরবার বা রাজ-সভা দুই প্রকার ছিল : আম-দরবার বা দরবার—ই-আম্ অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত দরবার ; আর খাস দর্‌বার্ বা দর্‌বার্-ই-খাস্ অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিশিষ্ট জরুরী কার্য্যাদির জন্য অনুষ্ঠিত দরবার। "আম্"—আরবী শব্দ ; অর্থ : জনসাধারণ, খাস-আরবী শব্দ ; অর্থ : বিশিষ্ট বা নিজস্ব। "দরবার" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : সভা।

খলীফাতুল মুসলেমিন—আরবী বাক্যাংশ। "মুসলেমিন" "মুসলিম" শব্দের বহুবচন ; অর্থ : মুসলমানগণ। "খলীফাতুল-মুসলেমিন" অর্থ : মুসলমানদের খলীফা।

চীরধারী সম্রাট--"চীর" অর্থ : ছেড়া কাপড় বা নেকড়া। হযরত উমর (রা:) অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবন-যাপন করিতেন—বস্তুতঃ তাহা দরিদ্রের জীবন-যাত্রার সমতুল্য ছিল। পরিধানের জন্য তাঁহার একপ্রস্তের বেশী কাপড় ছিল না। একটি মাত্র জামা অনেক সময় শত তালিযুক্ত অবস্থায় পরিধান করিতেন। [এই কবিতার "ধুলার তখত্" ও "খেজুর-পাতার প্রাসাদ" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।] আলোচ্য কবিতার শেষ স্তবকের পূর্ব স্তবকে কবি এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অথচ উমর (রা:) বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র রাষ্ট্র-পতি ছিলেন। যদিও তাঁহার উপাধি সম্রাট ছিল না—তথাপি তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাটদের চেয়ে কম প্রতাপশালী ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় না করিয়া নিজে জীর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া থাকিতেন। সেইজন্য তাহাকে "চীরধারী সম্রাট" বলা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "আবু-শাহ্‌মা" সম্পর্কিত প্রসঙ্গটি তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

www.pathagar.com

২। "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে হযরত উমরের (রা:) চরিত্র বর্ণনা কর।

৩। "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে হযরত উমরের (রা:) ব্যক্তিগত সাংসারিক অবস্থা ও জীবন যাপন প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে হযরত উমরের (রা:) যেরূযালেম গমন-প্রসঙ্গ এবং তাহার ফলাফল ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৫। খালিদ কে? তাঁহার সঙ্গে হযরত উমর কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন? এবং কেন?

৬। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) আমীর-উল-মুমেনিন।
তোমার স্মৃতি যে আযানের ধ্বনি জানেনা মুয়ায্‌যিন।

(খ) দিয়াছিলে কেলি মুহম্মদের চরণে যে শমশের—
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি,
আর একবার লোহিত সাগরে লালে লাল হয়ে মরি।

(গ) অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি,
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটীর, তুমি পড়নিক নুয়ে,
ঊর্ধ্বে যারা—পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে।

৭। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য লিখ :—

(ক) মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামিল শশী।

(খ) মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান।

(গ) ...আবু-শাহ্‌মার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিগো তোমারে সালাম করে।

৮। টীকা লিখ :—

ফারুক, সাইমুম, খলীফা, ধুলার তখ্‌ত, খেজুর পাতার প্রাসাদ, তকবির।

৯। "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার শেষ আট লাইন মুখস্থ লিখ।

কাণ্ডারী হুশিয়ার

এই কবিতাটি নজরুল ইসলামের "সর্বহারা" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে যে অল্প কয়টি উচ্চাঙ্গের কবিতা বাংলা-সাহিত্যে রচিত হইয়াছে, নজরুলের এ কবিতাটি নিঃসন্দেহে সেগুলির অন্যতম—হয়ত বা সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ইহা শুধু কবিতা নহে—সঙ্গীতও। রণ-সঙ্গীতের ভাষায় ও সুরে এ সঙ্গীত-কবিতা রচিত। অনুপ্রাসময় শব্দ সমষ্টির এমন উন্মাদনাময় ঝঙ্কার, আবেগময় ভাবানুভূতি ও উদ্দীপনার এমন লাভা প্রবাহ এবং জাতীয়-সংকট ও তদসম্পর্কিত আত্মসচেতনার এমন নির্ভীক ও সত্য প্রকাশ বাংলা ভাষার কাব্য-সাহিত্যে একান্ত বিরল।

www.pathagar.com

ইন্দো-পাক বা পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বযুগে এ সঙ্গীত-কবিতাটি রচিত। মুক্তি ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী জাতির উপর সেদিনের বৈদেশিক শাসন যে-প্রচণ্ড আঘাত এবং ততোধিক নির্মম অপমান ও লাঞ্ছনা হানিয়াছিল—তাহারি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। সেই দুর্দিনে, বিপদের সেই তিমির-ঘন ঝঞ্ঝা-রাত্রিতে উদ্দাম তরঙ্গ-ময় সংকট-সিন্ধুর বক্ষ চিরিয়া, জাতীয় জীবন-তরণী অটল সংকল্প ও সুদৃঢ় মনোবল লইয়া, সাবধান ও সতর্ক পরিচালনায় মুক্তির অমর বন্দরে নির্বিঘ্নে লইয়া যাইবার জন্য কবি এই কবিতায় সমগ্র জাতি—বিশেষ করিয়া সত্যিকার জাতীয় নেতা বা কাণ্ডারীদিগকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন।

টীকা

মাতৃমন্ত্রী—মাতৃভূমির মুক্তি ও মঙ্গল সাধনই যাঁহাদের জীবনের মূল-মন্ত্র—তাহারা ; অর্থাৎ জন্মভূমির মুক্তি-যোদ্ধাগণ বা মুজাহিদগণ।

সান্ত্রী—ইংরেজী Sentry অর্থাৎ প্রহরী বা ঘাটি রক্ষক শব্দের বাংলা-প্রয়োগ বা বাংলা ভাষায় ব্যবহার।

পলাশীর প্রান্তর—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর তীরবর্তী একটি স্থান। এখানে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন অধিপতি নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইবের হস্তে পরাজিত হন। এই যুদ্ধেই বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য ডুবিয়া যায় এবং ভারতে দুইশত বৎসর ব্যাপী ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

ক্লাইভ—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামক যে-ইংরাজ বণিকদল বাণিজ্য-ব্যাপদেশে পাক ভারতে আসিয়া ক্রমে-ক্রমে মাদ্রাজ ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য-কুঠি ও দুর্গাদি নির্মাণ করে, ক্লাইভ তাহাদের সেনাপতি হিসাবে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁহার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের সহায়তায় পরাজিত ও নিহত করিয়া পাক-ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত করেন। ক্লাইভের পূর্ব নাম রবার্ট ক্লাইভ। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণীর চাকরি লইয়া মাদ্রাজ আগমন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কলম ছাড়িয়া উক্ত কোম্পানীরই অধীনে সৈনিক-পদ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সেনাপতি পদে উন্নীত হন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা বিজয় ও বাংলায় ইংরাজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ তাহার স্বদেশ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলে স্বদেশবাসীগণ তাহাকে "লর্ড" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক খাজানার বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন এবং দুই বৎসর কাল এখানে থাকিয়া ঘুষ ও অত্যাচার দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন করিয়া ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিলাতে চলিয়া যান। কিন্তু এদেশে তাহার পূর্ব-অনুষ্ঠিত জালিয়াতি ও ঘুষ-গ্রহণের অভিযোগে বিলাতের পার্লিয়ামেন্টে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তিনি খালাস পাইলেও লোক নিন্দার হাত হইতে তিনি রক্ষা পাইলেননা। অবশেষে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর—পলাসী গঙ্গা নদীর তীরবর্তী স্থান। পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই ইংরাজেরা বাংলা তথা ভারতের বুকে সর্বপ্রথম ইংরাজ রাজত্ব স্থাপন করেন এবং এই বাংলাদেশ হইতেই তাঁহারা ক্রমে-ক্রমে সারা ভারতবর্ষ অধিকার করেন। কাজেই পলাসীর প্রান্তবাহী গঙ্গায়ই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে—এরূপ

www.pathagar.com

বলা অসমীচীন নহে। কবি আলোচ্য চরণে এই কথাই বলিয়াছেন। "ভারতের-দিবাকর" অর্থ : ভারতের স্বাধীনতা-দিবাকর বা স্বাধীনতা সূর্য।

ফাসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান—দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যে সকল স্বদেশ-প্রেমিক মুক্তি-যোদ্ধা বিদেশী শাসকদের কারাগারে ও ফাঁসীতে প্রাণ দিয়াছেন, আলোচ্য চরণে তাঁহাদের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। মুক্তি-যোদ্ধাদের এরূপভাবে প্রাণ দেওয়া প্রকৃতপক্ষে নব জীবনের উদ্বোধন মাত্র। কারণ এরূপ প্রাণদানের ফলে অবমৃত, প্রাণচাঞ্চল্যহীন, পরাধীন ও পদ-দলিত জাতির বুকে নব জীবনের সঞ্চার হয়। আলোচ্য চরণে কবি সে কথাই বলিয়াছেন।

জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ—এখানে কবি "জাতি" শব্দ দ্বারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বা সমগ্র ভারতীয় জাতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন এবং "জাত" শব্দ দ্বারা হিন্দু জাত বা মুসলমান জাত বা খৃষ্টান জাত ইত্যাদি অথবা হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতি ভেদমূলক বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, কিংবা বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষা ও প্রদেশ-ভিত্তিক বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা অথবা হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রমগত জাত-পাত্ বিভাগ অথবা প্রাদেশিকতাকে বুঝাইয়াছেন। কাজেই হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান বা বাংলা-বিহার-পাঞ্জাব নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ও দেশের ত্রাণ—না, সাম্প্রদায়িক, বর্ণাশ্রমমূলক বা প্রাদেশিকতার গণ্ডি-বদ্ধ মানব-সংঘের—অপর কথায়, খণ্ডিত দেশ ও জাতির ত্রাণ চাওয়া হইতেছে—আলোচ্য চরণাংশে কবি সে কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং প্রকৃত উদার-চিত্ত স্বদেশ প্রেমিক ও মুক্তি যোদ্ধাদের পরীক্ষার দিন সমাগত—সে ইঙ্গিতও দিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) তিমির রাত্রি, মাতৃ মন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।

(খ) বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খবর
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।

(গ) ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান।

২। এই কবিতায় কবি স্বাধীনতা-পথের যাত্রীদিগকে তাহাদের লক্ষ্য স্থলে পৌছিবার কি কি উপদেশ ও উৎসাহ দান করিয়াছেন তাহা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

৩। টীকা লিখ :—
মাতৃমন্ত্রী, পলাসীর প্রান্তর।

৪। এই কবিতার তৃতীয় ও পঞ্চম স্তবক মুখস্থ লিখ।

রাজপথ

এই কবিতাংশটি কবি আশরাফ আলী খান-রচিত "কঙ্কাল" নামক কাব্য-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কবি আশরাফ আলীর কাব্যের প্রধান সুর হইল ব্যথিত, আর্ত ও সর্বহারাদের প্রতি একটি গভীর মমতাবোধ। আলোচ্য কবিতায় সেই সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। "পথের ভিখারী"

www.pathagar.com

বা "পথের কাঙ্গাল" বলিতে আমরা "পথ"-কে যে-অর্থে বুঝি অর্থাৎ চরম দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার জন্য পথ ছাড়া দুনিয়াতে যাহার অন্য কোন আশ্রয়-স্থল নাই কিংবা পথে-পথে ভিক্ষা করা ছাড়া যাহার জীবিকা অর্জনের অন্য কোন পন্থা নাই—এমনই সর্বহারাদের আশ্রয়-দাতা যে-পথ—এবং পথের এই যে বিশিষ্ট রূপ, আলোচ্য কবিতায় সেই পথ এবং পথের সেই বিশিষ্ট রূপই কবির চোখে ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাকেই তিনি সুন্দর ছন্দে সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। রাজপথ পথেরই বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র। সকল রাজপথে—বিশেষতঃ নগর-নগরীর রাজপথগুলিতে গভীর রাত্রে লোক-চলাচল বন্ধ হইলে কত নিঃস্ব যে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। কিন্তু দরদী চিত্ত ছাড়া তাহাদের কথা কে ভাবে? আলোচ্য কবিতায় কবি তেমনই একজন নিঃস্ব-দরদী মানুষ এবং তাঁহার সেই দরদ-বোধ আলোচ্য কবিতার ছত্রে-ছত্রে রূপায়িত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১। "রাজপথ" নামক কবিতার কবির অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় রাজপথের বর্ণনা লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

"এই রাজপথে চলে কত লোক ; তাদের চরণ-ধ্বনি
কত নব নব বার্তা গাহিয়া কতভাবে যায় রণি।"

হে মানুষ

এই কবিতাটি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন-রচিত কবিতা সমষ্টি হইতে উদ্ধৃত। কবি মঈনুদ্দীন আধুনিক বাংলা কাব্য-রচয়িতা মুসলমান কবিগণের অগ্র-পথিক দলের অন্যতম। তিনি মুসলিম-রেনেসাঁ ও মানবতাবাদী কবি। তাঁহার ভাষা পরিমার্জিত ও ছন্দ সাবলীল। আলোচ্য কবিতায় তিনি মানবতার বন্দনা গাহিয়াছেন এবং সভ্যতার প্রথম উন্মেষকালে মানব-জীবনে যে সারল্য ও উদারতা, যে-অনাড়ম্বরতা ও প্রকৃতিমুখিনতা বিদ্যমান ছিল—এবং বর্তমান যান্ত্রীক সভ্যতা ও লোভের দ্বন্দ্বে যে-সহজ জীবন মানুষ হারাইতে বসিয়াছে, আবার মানব-জীবনে তাহা ফিরিয়া আসুক—এ কবিতায় কবির ইহাই নিবেদন।

টীকা

আদম-সন্তান—ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মমতে আদি মানব হইলেন হযরত আদম (আ:)। কাজেই "আদম" অনেক সময় "মানব" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অতএব "আদম-সন্তান" অর্থ : মানব-সন্তান বা মানব জাতি। "নতুন সফর" শীর্ষক কবিতার "বনি আদম" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। "হে মানুষ" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে মানবজাতির ক্রম-বিকাশের ধারা বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

আস্বাদ লভিতে আর নাহি পারে পৃথিবীর মহান আত্মার,
নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের অন্তরের গাঢ়তার—ক্ষুব্ধ বেদনার।

www.pathagar.com

মিলাদ শরীফ

এই কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীন-রচিত "সোজন বাদিয়ার ঘাট" নামক কাব্য-গ্রন্থ হইতে সংকলিত। কবি জসীমউদ্‌দীন আধুনিক বাংল-কাব্য-রচনা-ক্ষেত্রে অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগে ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালে জন্মগ্রহণ করিয়াও রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রবল চুম্বকার্ষণ অতিক্রম করিয়া যে-দুইটি যুগান্তকারী নূতন প্রতিভা বাংলার কাব্য-সাহিত্য-অঙ্গনে নূতন পথ ও নূতন মতের বন্যা-ধারা সৃজনে সক্ষম হইলেন তাহার একজন হইলেন নজরুল ইসলাম, আর একজন জসীমউদ্‌দীন। সত্যিকার বাংলাদেশ বলিতে যাহাকে বুঝায় এবং বাংলার অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জন যাহারা বাংলার সেই পল্লী ও পল্লীর বুকের দুলাল কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দউল্লাস, দুঃখ-বেদনা--এক কথায় যথার্থ পল্লী-জীবন ইংরাজ-আমলের নব-পর্যায়ের বাংলা-সাহিত্যে প্রায় অপাংক্তেয় হইয়া রহিল। কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের স্রষ্টা ও উদ্‌গাতা ছিলেন তাঁহাদের কেহই পল্লীর কৃষককুলোদ্ভব নহেন এবং পল্লীর স্থায়ী অধিবাসীও নহেন। ফলে পল্লী ও প্রকৃত পল্লী-দুলালদের সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের যোগসূত্র নিবিড় ছিল না এবং তাহারি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তাঁহাদের দ্বারা পল্লীর যথার্থ জীবন-আলেখ্য অঙ্কিত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। যেখানে সেরূপ কিছু চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কাজেই নবপর্যায়ের যে-বাংলা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল তাহা নাগরিক সাহিত্য—শুধু নাগরিক সাহিত্য নহে, তাহা মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্য—এবং শুধু মধ্যবিত্ত সমাজে সাহিত্যও নহে, উহা হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্য। কারণ এই নব পর্যায়ের কবি-সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সন্তান। তাঁহাদের রচিত এই সাহিত্য বাস্তবিকই অনিন্দ্যসুন্দর ও অনবদ্য—রবীন্দ্র-প্রতিভার অমর স্পর্শে বিশ্ব-সাহিত্যের জয়-টীকা ইহার ললাটে চির-ভাস্বর। কিন্তু তবু বলিতে হয়, ইহা অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণ সাহিত্য। কারণ সাহিত্য হইল জাতীয় মানসের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এ বাংলা-সাহিত্য জাতির একাংশের মানস-চিত্র মাত্র—শুধু একাংশ নয়, এক অতি ক্ষুদ্র অংশের চরিত্র-চিত্রণ মাত্র। এই অপূর্ণতাকেই পূর্ণতা দান করিলেন দুইজন যুগ-স্রষ্টা : নজরুল আর জসীম-উদ্‌দীন। বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেকেরও যাহারা বেশী, সেই মুসলমান সমাজের বা মুসলমান জাতির আশা ও ভাষা, তাহ্‌জীব ও তমদ্দুন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামের আদি প্রাণোচ্ছ্বাসের আবেগে, কুরআনের চিত্তোন্মাদিনী ভাষার অনুসরণে এবং সুপ্রযোজ্য আরবী-ফার্সী শব্দমালার ছন্দে ছন্দে গ্রথিত করিয়া নজরুল যে অপূর্ব সাহিত্য রচনা করিলেন তাহা বাংলা-ভাষাকে নবজীবন দান করিল, বাংলা-সাহিত্যকে নূতন প্রাণ-রসে সঞ্জীবিত করিল ; ইসলামী মনন ও মানসের দিক দিয়া বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে, নূতন অধ্যায়, নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। আর বাংলার জন-সংখ্যার শতকরা ১০ জন যাহারা, সেই পল্লী-দুলাল কৃষকদের—বিশেষ করিয়া পূর্ববাংলার কৃষকদের জীবন-আলেখ্য, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হাসি-কান্না তাঁহাদেরই ভাষায় এবং তাঁহাদেরই মানস-লোকের প্রতিচ্ছায়ায় তাঁহাদের সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-ধারার মত সহজ-সরল ছন্দ ও শব্দঝংকারে গ্রথিত করিলেন জসীমউদ্‌দীন। পল্লী-প্রকৃতির নিরাভরণ শ্যামলিরা ও নিরাভরণ রূপের যে-চোখ-জুড়ানো স্নিগ্ধতা আর মন জুড়ানো কান্ত-কোমলতা তাহাই রূপ ধরিয়া সজীব হইয়া উঠিল

www.pathagar.com

জসীম-উদ্‌দীনের এই সকল পল্লী-কবিতার ছত্রে-ছত্রে। বাংলা-সাহিত্যে সত্যিকার বাংলার মানসের সন্ধান পাইয়া সত্যিকার বাংলা-সাহিত্যে পরিণত হইল ; বাংলা-সাহিত্য নূতন প্রাণ-ধারায় স্নাত হইয়া সদ্য-স্নাতা পল্লী-বধুর মতই সহজ-সৌন্দর্যে অপরূপ হইয়া উঠিল। এই দিক দিয়া বাংলা-সাহিত্যে নূতন অধ্যায়—নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়াও তিনি পল্লীর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা প্রণালীরই পক্ষপাতী। পল্লী-সভ্যতা—পল্লী-সংস্কৃতি—পল্লীর জারী, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান তাঁহার নিকট নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অপেক্ষা শ্রেয় ও প্রেয়। পল্লীর সহিত তাঁহার জীবনের এই যে শোণিত ও উত্তরাধিকারগত নিবিড়-মধুর সম্পর্ক এবং পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীবাসীদের প্রতি তাঁহার এই যে গভীর মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ, এইখানেই পল্লী-কাব্য রচনায় তাঁহার যুগান্তকারী কাব্য-প্রতিভা ও কবিত্ব-শক্তির যথার্থ উৎস নিহিত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিজয়ী সর্বতোমুখী প্রতিভা কাব্য-সাহিত্যের যে-শাখায় অনধিগম্য হইয়া রহিল, সেখানে জসীম-উদ্‌দীনের অপূর্ব সাফল্যের কারণ হইল ইহাই।

কিন্তু বাংলা কাব্য-সাহিত্য-জগতে অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত প্রাচীন পল্লী-কবিদের দ্বারা রচিত অপূর্ব কবিত্বময় যে-সকল কাব্য "পল্লী-গীতিকা" নামে পরিচিত, জসীম উদ্‌দীন রচিত পল্লী-কাব্য হুবহু তাহাই নহে। পল্লী-গীতিকাগুলি প্রধানতঃ পালা-কাব্য বা জীবনী-কাব্য—পল্লীর গণ-আসরে পরিবেশিত হইবার জন্য কথক ও গায়কদের উপযোগী করিয়া রচিত। পল্লীর প্রাচীন সমাজ-চিত্র ; পল্লীবাসীদের তদানীন্তন সাজ-সজ্জা বহুঅধুনা অব্যবহার্য্য শব্দে ও ভাষায় রূপায়িত হইয়া এই পল্লী-গীতিকাগুলিতে কাব্য-রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু জসীম উদ্‌দীন রচিত কাব্যের অধিকাংশই ইংরেজী কাব্যে যাহাকে Lyric poem বলা হয় সেই জাতীয় গীতি-কবিতা। ইহা প্রাচীন বাংলা-কাব্যের রীতি নহে—ইহা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত বাংলার আধুনিক কাব্য-রীতি। জসীম-উদ্‌দীন এই আধুনিক কাব্যভঙ্গীতে পল্লীর জীবন ও সৌন্দর্য অনেকটা অধুনা-প্রচলিত পল্লী-ভাষায় অঙ্কন ও পরিবেশন করিয়াছেন ; অথচ ইহাতে পল্লী-প্রাণের ও পল্লী-প্রকৃতির প্রশান্ত রূপ ও রস-মাধুর্য কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং প্রাচীন পল্লী-গীতিকার ঐতিহ্য-ধারাও অব্যাহত রহিয়াছে। জসীম উদ্‌দীনের কৃতিত্ব এইখানেই।

আলোচ্য কবিতায় কবি পল্লী-গ্রামে মিলাদ শরীফ বা মৌলদ শরীফ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (রা:) জীবনী আলোচনা-অনুষ্ঠানের একটি নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা দান করিয়াছেন। ইসলামের যে মূলনীতি—মানুষে-মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, গ্রামের এই মিলাদ-মহফিল বা মিলাদ-সভায়ও তাঁহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখা যায়। মদন কলু এখানে সভার সর্বাগ্রে আসন গ্রহণ করেন ;—"কুলীর পোলা কলীমদ্দি" আর গ্রামের মোড়ল সাহেবের মধ্যে আজ এখানে কোন তফাৎ নাই। এমনই পরিবেশের মধ্যে বিশ্ব-নবী হযরত মুহম্মদের পুণ্যময় জীবন-কাহিনী—সত্যের প্রচারের জন্য তাঁহার অপরিসীম দুঃখ-লাঞ্ছনা-ভোগ এবং অবশেষে সত্যের জয়লাভের পর তাঁহার ক্ষমা-সুন্দর দয়া-দাক্ষিণ্য—এমনই সব ঘটনার ভক্তিকোমল বর্ণনা যখন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ভক্তের অন্তর হইতে উত্থিত হইতে থাকে এবং তাহারি আবেশে সরল-প্রাণ পল্লীর নর-নারী যখন বিহ্বল হইয়া পড়েন—তখনকার সেই অপূর্ব দৃশ্যের যে-অনন্ত মাধুর্য, তাহাই এই কবিতার চরণে চরণে কবির দরদী চিত্তের সোনার কাঠি-স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

www.pathagar.com

টীকা

মিলাদ শরীফ—আরবী শব্দ। "মিলাদ" অর্থ : জন্ম ; "শরীফ" অর্থ : পবিত্র, ভদ্র—সম্মান প্রদর্শনার্থ ব্যবহৃত হয়। যথা, মক্কা শরীফ, কাবা শরীফ, কুরআন শরীফ ইত্যাদি। "মিলাদ বা মৌলুদ শরীফ" বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থ হইল : হযরত মুহম্মদের (দ:) পবিত্র জন্ম ও জীবন-আলোচনা-অনুষ্ঠান বা উৎসব। অন্য কাহারো জীবন-আলোচনাকে "মিলাদ" বলা হয় না।

সুর্মাদানী—"সুর্মা" ফার্সী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : চূর্ণ বা ভস্ম। প্রচলিত অর্থ : এক প্রকার পাথর চূর্ণ, সাধারণতঃ কালো বর্ণ—মুসলমানেরা "শলাই" বা শলাকা বা কাঠির সাহায্যে চোখে ব্যবহার করেন। উৎসব ও পর্বাদি উপলক্ষেই "সুর্মা" সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "দানী" হিন্দী শব্দ ; অর্থ : আধার। অতএব "সুর্মা-দানী" অর্থ : সুর্মার আধার বা পাত্র—যেমন, ফুল-দানী, আতর-দানী ইত্যাদি।

নওশা—ফার্সী শব্দ ; প্রকৃত বানান : নওশাহ্। "নও" অর্থ : নবীন—যথা : নও জোওয়ান, নও-রোজ ইত্যাদি। "শাহ্" অর্থ : রাজা বা অধিপতি। অতএব "নওশা"র শাব্দিক অর্থ : "নবীন রাজা"। প্রচলিত অর্থ : বিবাহের বর।

জায়-নামায—ফার্সী শব্দ ; "জায়" অর্থ জায়গা বা আসন ; "জায়-নামায" অর্থ : নামাযের বা উপাসনার আসন।

রমযান—আরবী শব্দ ; প্রকৃত আরবী বানান : "রমাদান"—"রম্‌দ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। "রমদ" শব্দের অর্থ : অগ্নিতে পোড়াইয়া পরিশুদ্ধ করা। "রমাদান" ইসলামী বা হিজ্‌রী সালের ৯ম মাস। এই মাসে মুসলমানগণ রোযা বা উপবাস পালন করেন। উপবাসের ক্ষুধার অগ্নিতে দেহ-মনের সমস্ত পাপ পোড়াইয়া দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া এই মাসকে "রমাদান" বলা হয়। "রমাদানের" ফার্সী উচ্চারণ "রমযান"। আরবী "দাদ" বা "দোয়াদ" অক্ষর অর্থাৎ "দ" উচ্চারণ-মূলক অক্ষর ফার্সীতে "যাদ" বা "যোয়াদ" বলিয়া অর্থাৎ "য" উচ্চারণ-মূলক অক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "রমাদান" শব্দ "দাদ" বা "দোয়াদ" অক্ষর দিয়া বানান করিতে হয় বলিয়া ফার্সীতে ইহা "রমযান" হিসাবে উচ্চারিত হয়। পাক-ভারতে মুঘল পাঠান রাজত্বের আমলে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সী। ফলে এই দেশে বহু আরবী শব্দ ফার্সী উচ্চারণে উচ্চারিত হয় ; যথা—আলোচ্য "রমাদান"-কে "রমযান", 'গদব'-কে "গযব" ইত্যাদি উচ্চারণ করা হয়। "গদব" বা "গযব" অর্থ : ক্রোধ।

লোবান—আরবী শব্দ ; এক প্রকার ধূপ জাতীয় জিনিষ ; পোড়াইলে সুগন্ধ বাহির হয়। মুসলমানগণ সাধারণতঃ ধর্মীয় উৎসব ও পর্বাদিতে "লোবান" পোড়াইয়া থাকেন।

মলুদ—"মিলাদ" বা "মৌলুদ" শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ। ["মিলাদ শরীফের" টীকা দ্রষ্টব্য।]

দুম্বা—আরবদেশের মেষজাতীয় এক প্রকার পশু। ইহাদের লেজের সঙ্গে একটি বৃহৎ তৈলাক্ত মাংস-পিণ্ড সংযুক্ত থাকে।

দীনের নবী—"দীন" আরবী শব্দ ; শাব্দিক অর্থ : ধর্ম। প্রচলিত অর্থ : ইসলাম ধর্ম। ["দীন" শব্দের বিস্তৃত অর্থের জন্য "ওমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "খলীফা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।] "নবী" আরবী শব্দ ; অর্থ : মানব জাতির নিকট আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বা পয়গম্বর। [নবী শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য "না'ত" শীর্ষক কবিতার "নবী" ও "রসুল" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।] "দীনের নবী" অর্থ : ইসলামের নবী অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (দ:)।

হযরত—আরবী শব্দ। "হাযারা" অর্থাৎ "হাযির" বা "উপস্থিত হইল"—এই শব্দ হইতে "হযরত" শব্দের উৎপত্তি। কাজেই "হযরত" শব্দের শাব্দিক অর্থ : "উপস্থিতি"। ইংরাজীতে

www.pathagar.com

"His August Presence" বলিতে যাহা বুঝায়, আরবীতে "হযরত" শব্দ অনেকটা সেই অর্থ-বাহক। অপর কথায়, যাঁহার উপস্থিতি পুণ্য ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে এমন ব্যক্তিকেই "হযরত" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। বাংলায় ইহাকে "পুণ্য-শ্লোক" বা "মহামহিম" বা "মহামান্য" বলিলে অসমীচীন হইবে না।

মেষের রাখাল—হযরত মুহম্মদ (দ:) বাল্যে যখন তাঁহার ধাত্রী বেদুঈন মহিলা হালিমার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় কিছুদিন তিনি হালিমার মেষ চরাইয়াছেন। বেদুঈনগণ মরুর উন্মুক্ত বুকে বাস করেন বলিয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান এবং তাহাদের ভাষা অত্যন্ত মধুর এবং উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আরবের সম্ভ্রান্ত ঘরের যে সকল শিশু-সন্তান তাঁহাদের বাল্যে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্যলাভ এবং বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা করিয়া জ্ঞান লাভের জন্য বেদুঈন-ধাত্রীদের নিকট প্রেরিত হইতেন, তাঁহারা ধাত্রীগৃহে অবস্থানকালে বেদুঈন রাখাল-বালকদের সঙ্গে মেষ-উষ্ট্রাদি চরাইতে যাইতেন। ইহাছাড়া—আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম,—পৃথিবীর এই তিনটি প্রধান ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক রসুল ও নবীগণের সকলেই বাল্যে মেষের রাখাল ছিলেন।

মুন্‌শী—"মুন্‌শী" আরবী শব্দ ; "ইনশা" বা "রচনা" শব্দ হইতে উৎপন্ন ; অর্থ : রচনাকারী বা লিখক বা Scribe। প্রচলিত অর্থ : আরবী-ফার্সী-ভাষা ও ইসলামী ধর্ম-শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

মোল্লা—আরবী শব্দ। প্রকৃত উচ্চারণ : "মুল্লা" ; অর্থ : ইসলামী ধর্ম-শাস্ত্রে যথেষ্ট-অভিজ্ঞ ধর্ম-ভীরু ব্যক্তি। "মোল্লা" শব্দ বংশ-গত পদবী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোরেশ—আরবী শব্দ। প্রকৃত বানান : কুরাইশ। এদেশের প্রচলিত উচ্চারণ বলিয়া এবং কবিতার ছন্দের মিলের জন্য "কোরেশ" ব্যবহার করা হইয়াছে। "কোরাইশ" মক্কার এক অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ ; ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহারা সারা আরবের প্রধান তীর্থ মক্কার কাবা-গৃহের পুরোহিত ছিলেন এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও দায়িত্ব ইহাদের উপরই অর্পিত ছিল। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের ফলে কাবা-গৃহের পৌরোহিত এবং তদজনিত সারা আরবের উপর ইহাদের আধিপত্য ও বিপুল উপার্জনের পথ নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় ইহারা স্ব-বংশীয় হইয়াও হযরত মুহম্মদের (দ:) উপর সর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার করেন এবং ইসলাম-প্রচারে সর্বাধিক বাধা দেন। পরবর্তী সময় হযরত মুহম্মদ (দ:) কর্তৃক মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশ বংশের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরতের তিরোধানের পর যাঁহারা ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই বংশোদ্ভব। প্রথম চারি খলীফা এবং উমাইয়া ও আব্বাসিয়া খলীফাগণ সকলেই কুরাইশ বংশের লোক।

মুমিনেরা—আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ : বিশ্বাসীরা। "ইমান" বা "বিশ্বাস" শব্দ হইতে উৎপত্তি প্রচলিত অর্থ : ইসলামের "কলেমা" বা মূল-মন্ত্রে বিশ্বাসিগণ অর্থাৎ মুসলমানগণ। অন্য ধর্ম বিশ্বাসীদিগকে মুমিন বলা হয় না। এই কবিতার একটি চরণে বলা হইয়াছে :—

"মাথার পরে দুলছে বায়ে থোপায় থোপায় খোরমাগুলো।"

পক্ক খেজুর বিশিষ্ট পদ্ধতিতে শুষ্ক করা হইলে তখন তাহাকে "খোর্‌মা" বলা হয়। খেজুরকে "খোর্‌মা" বলা হয় না। কাজেই এখানে কবিতার অর্থের ও ভাবের দিক দিয়া কোন তারতম্য না হইলেও—"খেজুর" শব্দের পরিবর্তে "খোর্‌মা" শব্দ ব্যবহার শব্দের দিক দিয়া ভুল প্রয়োগ।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। "মিলাদ শরীফ" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে পল্লীর মিলাদ অনুষ্ঠানের বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) চারিদিকে লোক বসেছে "আসেন বসেন" মুখের কথা
তাযীম মাফিক লেওন-দেওন সাধ্য কীযে হয় অন্যথা।

(খ) আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে হয়না নত এই ধরণীর।

৩। টীকা লিখ :—

মিলাদ শরীফ, সুর্মাদানী, জায়-নামায, লোবান।

৪। "মিলাদ শরীফ" শীর্ষক কবিতার প্রথম ছয় লাইন মুখস্থ লিখ।

পল্লী-বর্ষা

এই কবিতাটি কবি জসীম উদ্দীন-রচিত "ধান-খেত্" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। নদী আর দেশ এই পূর্ব বাংলার অবিরাম বর্ষণ-মুখর কর্মহীন অলস দিবসে পল্লী-প্রকৃতি আর পল্লী-জীবনে একটা অলস-মন্থর গতি এবং তাহারি সঙ্গে সজল-স্নিগ্ধতার একটা মধুর শান্তি সর্বত্র লীন হইতে থাকে জসীম উদ্দীনের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভার স্পর্শে তাহাই আলোচ্য কবিতায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তেমনি দিনে পল্লী-মোড়লের গৃহাঙ্গনে জমিয়া উঠে গল্প আর গুজবের আসর—চলিতে থাকে ডাবা অবিরাম ধূম্র-সেবন এবং তাহারি ফাঁকে-ফাঁকে কোন পল্লী-শিল্পীর কর্ম-চঞ্চল কর-স্পর্শে বাঁজী উঠে বাঁশী আর কাঠ হয় ময়ূর-কণ্ঠ সারিন্দা। বাদল-দিনের পল্লী-জীবনের এমনই সব বাস্তব কাহিনী এই কবিতায় দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা

মোড়ল— মণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ। মণ্ডলীর নেতা হইল মণ্ডল। গ্রামের সর্দার বা নেতা।

দলিজা—ফার্সী "দহ্লিজ" বা বৈঠকখানা শব্দের অপভ্রংশ ; বৈঠকখানার প্রচলিত গ্রাম্য প্রতিশব্দ।

দোয়াড়ী—গ্রাম্য কথ্যভাষা। মাছ ধরিবার ছোট চাঁই বা বাঁশের বুনট-করা শলাকা নির্মিত গোল যন্ত্র বিশেষ।

আমীর সাধুর কাহিনী—"ভেলুয়া সুন্দরী" নামক পল্লী-গাঁথার নায়ক ও ভেলুয়ার স্বামীর নাম সাধু। এই সকল পল্লী-গাঁথার "সাধু" শব্দ "শ্রেষ্ঠ" বা "সওদাগর" শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়। মগেরা বা আরাকানবাসী বৌদ্ধ জল-দস্যুরা "ভেলুয়া সুন্দরী" কে ধরিয়া লইয়া যায়। ভেলুয়ার স্বামী আমীর সাধু বা আমীর সওদাগর তাহাকে খুঁজিবার জন্য নৌকাযোগে ভ্রমণ করেন। এখানে সেই "ভেলুয়া-সুন্দরী" বা আমীর সাধুর পালা-গানের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। মুঘল আমলের মধ্যভাগ হইতেই পূর্ববঙ্গে মগ ও পর্তুগীজ জল-দস্যুদের উপদ্রব ভীষণভাবে দেখা দেয়। মগেরা বঙ্গোপসাগরের পূর্বতটবর্তী আরাকানের বৌদ্ধ অধিবাসী। কাজেই পূর্ব বাংলার সাগর-তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে মগ-জলদস্যুদের আক্রমণ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা গ্রামকে-গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া নর-নারী নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সকলকে—বিশেষ করিয়া সুন্দরী নারীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং মুক্তিপণ পাইলে ছাড়িয়া দিত। নতুবা দাস-দাসী হিসাবে বিদেশে বিক্রয় করিয়া দিত।

সমুদ্র-কলি শিকা—এক প্রকার বিশেষ গ্রন্থিযুক্ত শিকা।

প্রশ্নাবলী

১। "পল্লীবর্ষা" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে বর্ষার রূপ তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "কাহার ঝিয়ারী কদম্ব-শাখে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায়।
বাদলের জলে নাহিয়া সে-মেয়ে হেসে কুটি-কুটি হয়,
সে হাসি তাহার অধর নিঙাড়ি লুটাইছে বনময়।"

(খ) "দিকে দিগন্তে যতদূর চাহি পাংশু মেঘের জাল
পায়ে জড়াইয়া পথে দাঁড়ায়েছে আজিকার মহাকাল।"

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য লিখ :—

(ক) "বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেঘ ডাকে,
এ সবের মাঝে রূপকথা যেন আর রূপ-কথা আঁকে।"

(খ) "কেউবা রঙীন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতার মায়াবী আখর টানি।"

৪। টীকা লিখ :—

দোয়াড়ী, আমীর সাধু, দলিজা।

দুর্বার পথিক

এই কবিতাটি বেনজীর আহ্‌মদ-রচিত কবিতা সমষ্টি হইতে সংকলিত। বেনজীর আহ্‌মদ ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লব-পন্থী লোক। সেইজন্য তাঁহার কবিতার প্রধান সুর হইল বিপ্লবাত্মক। প্রথম বিশ্ব-সমরের সমসাময়িক কাল হইতে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে মুসলিম বাংলার যে-সকল কবি ও সাহিত্যিক মুসলিম-রেনেসাঁ বা মুসলমানদের নব জাগরণ ও দেশ-মুক্তির স্বপ্ন লইয়া সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, বেনজীর আহ্‌মদ তাঁহাদের অন্যতম। ইংরাজ-আমলে বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যতদূর জানা যায়, কেবল মাত্র নজরুল ইসলাম এবং বেনজীর আহমদই দেশ-মুক্তির বৈপ্লবিক সংস্থায় প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। ফলে ইহাদের লেখার ভিতরে একটা উদগ্র মুক্তি-কামনা এবং উদ্দাম বিপ্লবের সুর অনুরণিত। নজরুল তাঁহার যুগান্তকারী প্রতিভা দ্বারা বিপ্লবের যে-বাণীকে পরিপূর্ণ রূপদান করিয়াছেন, বেনজীর তাঁহার স্বকীয় পন্থায় তাহারি প্রাণোন্মাদিনী গীতি-ছন্দ নিজস্ব ভঙ্গীতে গাহিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই উভয়ের সুরে একটা ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়—কেননা উভয়ের প্রেরণার উৎস-স্থল একই।

আলোচ্য কবিতায়ও কবির সেই বিপ্লবের সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। সীমাকে—অচলায়তনকে ভাঙ্গিয়া সীমাহীন অসীমের উধাও পথে দুর্লক্ষ্য যাত্রার যে-দুর্বার কামনা

www.pathagar.com

যৌবনের তপ্ত শোণিত-স্রোতে অহরহ টগ্‌বগ্‌ করিতে থাকে, তাহারি বন্দনা-গীতি এই কবিতার ছত্রে-ছত্রে অনুরণিত হইয়াছে। প্রাত্যহিক স্বার্থ-ঘেরা জীবন-যাপনের যে-ক্ষুদ্রতা, দিন-গত পাপ-ক্ষয়ের মত শুধু দিন যাপনের যে-নীচতা আমাদের জীবনকে পঙ্গু এবং অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ধ্বংস করিয়া নূতন জীবন ও নবসৃষ্টি সম্ভাবনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য এই কবিতায় কবি ঝড়ের চির দুরন্ত—চির দুর্বার গতিবেগ এবং বজ্রের প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-শক্তিকে আহবান করিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

১। "দুর্বার পথিক" শীর্ষক কবিতায় কবি বন্ধন-মুক্ত জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তোমার নিজ ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "মৃত-আলো ফ্যাকাশে দিনের
স্তপিত শবেরা যেথা ছেয়ে আছে কানায় কানায়
নভের সীমানা—ভাঙ্গি তারি মানা
*   *   *
আমারে উড়ায়ে নাও।"

(খ) প্রশান্তির সান্তনার মোহে
নির্বোধের আনন্দের মিথ্যা সমারোহে
করোনা করোনা মোরে লয়।

(গ) "দুরন্ত নির্ভয়ে
চিরন্তন অজানারে জানার বিজয়ে
মোর অভিযান
দুর্লক্ষ্য লক্ষ্যের পথে মৃত্যুরে বিস্মরি
মহাকাল গতি-চিহ্ন ধরি,
যেতে যেন পারে
সর্ব বিঘ্ন বাধারে উত্তরি।"

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) নিরঙ্কুশ কুশলের মিথ্যা মোহঘোর, দূর হোক সব।

(খ) মুক্ত হোক শৃঙ্খলিত বদ্ধ করপুট
সংগ্রামের রুধিব রঙ্গনে।

(গ) মুক্তি দাও, মুক্তি দাও ভঙ্গুর দেহের
ভয়াতঙ্ক হতে
ছিন্ন কর বন্ধন দেহের—
নিভয়ের চির তীর্থ-পথে।

(ঘ) কুব্জপিঠ জীবন যাত্রার
নিবীর্যের—নিস্তেজের

www.pathagar.com

পলে-পলে ক্ষণে-ক্ষণে
ভয়ে-ভয়ে মরে-যাওয়া মৃত্যুর মাত্রার
আজ হোক শেষ।
(৬) আমার ডানায়
পালকে পালকে আজ উঠুক বিকশি
বিদ্যুতের অসি।

জয়-যাত্রা

এই কবিতাটি কবি আবদুল কাদির রচিত কবিতাসমষ্টি হইতে উদ্ধৃত। আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে-কয়জন বাঙ্গালী মুসলমান কবি স্থায়ী আসন অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন কবি আবদুল কাদির তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ক্লাসিকপন্থী কবি। তাঁহার রচনায় বাক্-সংযম সুসংহতি ও মার্জিত রুচি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা, ভাবের প্রগাঢ়তা ও বর্ণনার পরিমিতিবোধ তাঁহার কাব্যকে কাব্য-রসিক সুধীজনের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি নব জীবন ও নব যৌবনের জয়-গান গাহিয়াছেন। নিখিল মানবকে লইয়া আজ বিশ্ব-মানবতার মেলা বসিয়াছে। মৈত্রি-বদ্ধ মানব জাতির জয়-যাত্রার দুরাগত পদ-ধ্বনি ঐ শুনা যায়। অকল্যাণ আর অজ্ঞানতার অন্ধকার ভেদ করিয়া নব জীবনের অরুণ-আলো আজ চিত্তের রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে নৃত্যরত। এমনি দিনে নব যৌবন তাঁহার মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া হৃদয়-গেহের বন্ধ দ্বার অর্গলমুক্ত করুক এবং বাহির বিশ্বের অবারিত আলো-বাতাসে নিত্য নব সৃজন-লীলার যে অশ্রান্ত মিছিল চলিয়াছে তাহারি জয়-যাত্রার সহযাত্রী হোক—এই উদাত্ত আহ্বানই আলোচ্য কবিতার প্রধান সুর।

প্রশ্নাবলী

১। "জয়-যাত্রা" শীর্ষক কবিতার প্রধান আবেদন কি, তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "তোমার উত্থান মাগি ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়।"

(খ) অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যু-জয়ী জীবন-উল্লাসে।

জীবন-প্রবাহ্

এই কবিতাটি কবি মহীউদ্দীন-রচিত কবিতা-সমষ্টি হইতে সংকলিত। কবি মহীউদ্দীন একজন গভীর চিন্তাশীল ও বিপ্লব-পন্থী কবি। জীবনের সমস্ত পঙ্গুতা, সমস্ত দৈন্য ও হীনতাকে লঙ্ঘন করিয়া মানুষ উন্নত মস্তকে জ্ঞানের পথে, সত্যের পথে এবং মহত্ব ও মর্যাদার পথে অগ্রসর হোক এবং এই পথের অন্তরায় সকল বাধা ও সকল অচলায়তনকে

www.pathagar.com

পদতলে পিষ্ট ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিক—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান সুর। আধুনিক যুগের বাঙ্গালী মুসলমান কবিদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবী পন্থায় বিশ্বাসী, কবি মহীউদ্দীন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ব্যক্তি জীবনে সর্বহারাদের মুক্তি-কামী কর্মী এবং তাঁহার চিন্তার জগতেও তাহাই রূপায়িত হইয়া কাব্যাকারে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার লেখায় একটি গভীর আত্মোপলব্ধির সুর অহরহ অনুরণিত হইতেছে। তিনি জীবনেরও ধ্যানী কবি। ধ্যান-মগ্ন তাপসের গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তিনি জীবনের মূল উৎসের সন্ধান করিয়াছেন। মানুষ, কেনইবা জন্মগ্রহণ করিলেন—এবং স্বল্পায়ু জীবনে কেনইবা তাঁহার এত স্নেহ-মমতার বন্ধন, সেই রহস্য সন্ধানেই কবি ধ্যান-স্তিমিত। আলোচ্য কবিতা এই জীবন-তত্ত্বেরই অন্তর্গূঢ় প্রকাশ।

টীকা

ইন্দ্রিয় পঞ্চ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। সাধারণতঃ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। জীবনের চলার পথে মানুষের যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং জীবন-রহস্য সম্পর্কে মানুষের যে শ্রান্তিহীন সন্ধান—তাহা "জীবন-প্রবাহ" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "দূরন্ত নদীর মতো জীবনের কুলে-কুলে বহু গুরুরণ।"

(খ) "স্বর্ণ-ধোয়া সন্ধ্যা নদী জলে ভাসা ছবি।"

(গ) "বাঁচা মনে হয় মায়া—মৃত্যু মনে হয় কিছু মৃত্যুর অধিক।"

(ঘ) "বাতাসের বাজ্না যেনো বিশ্বের সারঙ্গ।"

(ঙ) "সব দ্বন্দ্ব সব দুঃখ সংঘর্ষের পথে কোন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির
অলক্ষ্যে করিছে সৃষ্টি মুক্তি পৃথিবীর।"

৩। "জীবন-প্রবাহ" নামক কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক মুখস্থ লিখ।

পদ্মার চর

এই কবিতাটি কবি বন্দে আলী মিয়া-রচিত "ময়নামতীর চর" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বাংলার পল্লী-প্রসঙ্গ লইয়া কাব্য-রচনা করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি অর্জন এবং বাংলার সাহিত্য আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন, কবি বন্দে আলী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বৈশিষ্ট্য হইল—সকল প্রকার পল্লী-কবিতা রচনায় তিনি পল্লীর নিজস্ব ভাষা এবং পরিশুদ্ধ মার্জিত বাংলা—উভয়বিধ ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীই সমান সাফল্য ও মনশীয়ানার সহিত প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। আলোচ্য কবিতা ইহার একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সুললিত এবং ছন্দ আবেগময় ও নৃত্য-মুখর। এই কবিতায় কবি পদ্মার চরের যে একটি ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব তেমনি প্রাণ-রসে

www.pathagar.com

জীবন্ত। কবিতাটি পড়িতে-পড়িতে বিশাল-বক্ষা পদ্মার ওপারের উন্নত-গ্রীবা তাল ও শাল-বীথি-সমাকীর্ণ তাপস-নীরব স্তব্ধ গ্রাম, গাভীর পৃষ্ঠারূঢ় কিশোর রাখাল-বালকদের খাল-পারাপার এবং হাটের দিনে বিপুল ভীড়াক্রান্ত খেয়ার জন্য অপেক্ষমান, আজঙ্ঘা নদী-জল-মগ্ন হাটুরের দল—প্রত্যেকটি দৃশ্য যেন ছায়াচিত্রের ছবির মত মানস-আঁখির সম্মুখ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যায়। এইখানেই কবির রচনা সফল ও সার্থক।

প্রশ্নাবলী

১। "পদ্মার চর" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে পদ্মার চরের একটি বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "অন্ধকার শালবীথি করি নভভেদ
গ্রীবা তুলি দাঁড়ায়েছে কঠিন নিষেধ—
নীলাম্বরী শাড়ী প্রান্তে আকুঞ্চিত বন
পাড় যেন আঁকা—
স্তব্ধ মসি মাখা।"

(খ) "দুপুরের খর তপ্ত নিঝুম প্রহর
নাহি কারো সাড়া।
কুঞ্জ-ছায়ে অবিরাম কপোত দম্পতী
ঢালে ফল্গু-ধারা।
নাহি কারো সাড়া।"

৩। "পদ্মার চর" শীর্ষক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি মুখস্থ লিখ।

মানব-ধর্ম

এই কবিতাটি সুফী মোতাহার হোসেন-রচিত সনেট-জাতীয় কবিতাগুচ্ছ হইতে সংকলিত। বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র সুফী মোতাহার হোসেনই কাব্যের "সনেট" বা "চতুর্দশ পদী ছন্দ-রীতিকে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র বাহন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে প্রভূত সাফল্য ও সুনাম অর্জন করিয়াছেন। এই রচনা-রীতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যে প্রচলন করেন। অবশ্য বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ ধর্ম-সঙ্গীত "চর্য্যাপদে" ও এই ছন্দের সন্ধান মিলে। পয়ার-ছন্দের চৌদ্দটি লাইনে বাংলা সনেট রচিত হয়। খাঁটি সনেটে দুইটি ভাগ থাকে—আট লাইন ও ছয় লাইন। প্রথম আট লাইনের মিল-কখ খক, কখ খক—এইরূপ হওয়া উচিত। শেষের ছয় লাইনে মিল ইচ্ছামত হইতে পারে। তবে সকল সনেটে এই নিয়ম রক্ষিত হয় না। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটিতে খাঁটি সনেটের নিয়ম পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সুফী মোতাহার হোসেনের ভাষা সুমার্জিত ও আলঙ্কারিক, শব্দ-চয়ন ও শব্দ-বিন্যাস সুনির্বাচিত ও সুপ্রযুক্ত এবং রচনার গতি-ভঙ্গী সচ্ছল ও লীলায়িত। আলোচ্য কবিতায় কবি মানবতা ও বিশ্ব-জনীন মানব-ধর্মের জয় গান গাহিয়াছেন এবং জাতিতে-

www.pathagar.com

জাতিতে এবং ধর্মে-ধর্মে যে-বিরোধ ও বিদ্বেষ, তাহার আশু বিলয় কামনা করিয়াছেন। দেশ, কাল ও জাতির উর্ধ্বে যে এক ও অখণ্ড মানবতা, সেখানে সকল মানুষের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-উল্লাস একই সুরে ধ্বনিত হয় এবং জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র—সকলই যে সেই অখণ্ড মহা-মানবতার বিকাশ ও পরিপোষণের জন্যই সৃষ্ট ও প্রবর্তিত—এই চিরন্তন মহাসত্যই আলোচ্য কবিতার প্রধান আবেদন।

প্রশ্নাবলী

১। প্রকৃত মানব-ধর্ম কি তাহা "মানব-ধর্ম" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "জাতি-ধর্ম দেশ উর্ধ্বে, ঘৃণা উর্ধ্বে আছে যেই দেশ
সেথায় সকলে এক, সেথা মুক্ত সত্যের প্রকাশ।"

(খ) "মানব সবার উর্ধ্বে, নহে কিছু তাহার অধিক
মানুষ—মানুষরূপে পূর্ণতর স্বরূপ সত্যের।"

(গ) জ্ঞান-বিশ্বে নাহি ঠাঁই হানাহানি হিংসা-বিদ্বেষের
মানুষ জ্ঞানের সত্য, মানবতা প্রেমের প্রতীক।

ঝাণ্ডা-উড়াও

এই কবিতাটি কবি কাদের নওয়াজ-রচিত কবিতা সমষ্টি হইতে সংকলিত। আধুনিক বাংলা-কাব্য-রচয়িতা মুসলমান কবিদের মধ্যে কবি কাদের নওয়াজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পরিমার্জিত সাধু বাংলা এবং আরবী-ফার্সী-শব্দ-মিশ্রিত বাংলা—এই উভয়বিধ ধারাতেই কাব্য-রচনায় তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ও নিপুণ। তাঁহার ভাষার একটি সজীব ও লীলাময় গতি এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ও মুনশীয়ানা আছে। তিনি একজন সফল ছান্দসিক কবি—একথা বলা অত্যোক্তি নহে। আলোচ্য কবিতায়ও তিনি অপূর্ব ছন্দের খেলা ও ভাষার কারুকার্য দেখাইয়াছেন। ইহার শব্দ-ঝংকার অতি প্রাণস্পর্শী এবং গতি নৃত্যময়।

আলোচ্য কবিতায় কবি পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাহার প্রাচীন ইতিহাসের অজস্র গৌরবময় ঐতিহ্য, তাহার বীর সন্তান ও ত্যাগ-দীপ্ত সাধকদের কথা ও কাহিনী এবং সর্বোপরি তাহার স্বর্ণ-প্রসূ ভূমির শ্যামল উর্বরতার অধীর প্রাণোচ্ছ্বাস অপূর্ব ছন্দ-লীলায় গ্রথিত করিয়াছেন এবং এমনই পরিবেশ-সমন্বিত নব-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া তাহার অমর জীবন কামনা করিয়াছেন।

টীকা

ঝাণ্ডা—হিন্দী ও উর্দু শব্দ। অর্থ : নিশান, পতাকা।

শব্বুগুল—ফার্সী শব্দ ; "শব" অর্থ : রজনী, রাত্রি ; "গুল" অর্থ : ফুল। অতএব "শব্বুগুল" অর্থ : রাত্রি বা রজনীর ফুল—অর্থাৎ "রজনীগন্ধা" ফুল।

www.pathagar.com

তোষাপাট—সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট। এই পাট উচ্চভূমিতে জন্মায়। ইহার আঁশ সুদৃঢ় সুদীর্ঘ ও চাকচিক্যময়।

আনারকলি—ডালিম ফুলের কলি বা কোরক।

শহদ—ফার্সী ভাষা। অর্থ : মধু বা মধুর ন্যায় মিষ্ট।

টিটিভ (বা: টিটিভ)—টিটি বা টিটির নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জলচর পাখী।

মোমেনশাহ—মোমেনশাহী--মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে মোমেন শাহ্ নামক এক ব্যক্তি সুবৃহৎ "সরকার বাজুহা"র অন্তর্গত এক পরগণায় রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হন। সম্রাট আকবরের আমলে তাহার রাজ্য ১৫টি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই সুবাগুলিতে ছিল ১০৫টি সরকার এবং ১০৫টি সরকারের ছিল ২,৭৩৭টি মহাল বা পরগণা। সুবা বাংলার ছিল ২৪টি সরকার। তন্মধ্যে সরকার বাজুহা একটি। যাহা হউক, উত্তরকালে এই মোমেনশাহ্-এর নাম অনুসারেই "সরকার বাজুহার" উক্ত পরগণাটির নাম হয় "পরগণা মোমেনশাহী"। উক্ত পরগণাই বর্তমান মোমেনশাহী বা ময়মনসিংহ জেলা। কাহারো মতে পাঠান-আমলে এই অঞ্চল একটি ক্ষুদ্র অর্ধ স্বাধীন রাজবংশের অধীনে ছিল। উক্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ মোমেনের নাম অনুসারেই এই অঞ্চলের নাম মোমেনশাহী হয়।

"মহুয়া" "মলুয়া" এবং "চন্দ্রাবতী"—ভিন্ন ভিন্ন তিনটি "পালা-গান" বা পল্লী-গীতিকার নাম। এই পল্লী-গীতিকাগুলি অপূর্ব কাব্য-রসে ভরপুর। অজ্ঞাতনামা কবিদের দ্বারা এই পল্লী-গানগুলি রচিত। মোমেনশাহী জেলার পল্লী-অঞ্চলে এই গীতিকাগুলি বিশেষভাবে প্রচলিত এবং সেই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়া ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় এইগুলি "মৈমনসিংহ-গীতিকা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্ণফুলী—চট্টগ্রাম জেলার একটি নদী।

সীতাকুণ্ড—চট্টগ্রাম শহর হইতে ২১ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে ষ্টেশন এবং তাহারই অদূরে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর প্রবৃত্ত সীতাকুণ্ড অবস্থিত। এই স্থান সারা পাক-ভারতের হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে একটি ঝর্ণাজাত কুণ্ড আছে। প্রকৃতপক্ষে এইটিকেই "সীতাকুণ্ড" বলা হয়। কথিত আছে, বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র যখন এখানে আসেন তখন সীতাদেবীর স্নানের জন্য এই কুণ্ডের বা চৌবাচ্চার সৃষ্টি করা হয়। কুণ্ডের পার্শ্বস্থ মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্তি আছে।

বায়াযীদ—একজন বিখ্যাত "অলী" বা দরবেশ। তাঁহার পূর্ণ নাম : "বায়াযীদ বুস্তামী" বা বিস্তামী। চট্টগ্রাম শহরের প্রায় দশ মাইল উত্তরে এক পাহাড়ের বুকে বায়াযীদ-বিস্তামীর "দরগাহ্" অবস্থিত। দরগাহের সম্মুখে পুকুর এবং তাহাতে বৃহৎ আকারের বহু কচ্ছপের বাস। হযরত বায়াযীদ বিস্তামী উত্তর ইরাণের অন্তর্গত বিস্তাম বা বুস্তাম রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি অত্যন্ত শয্যাবিলাসী ছিলেন। তাঁহার শয্যা একজন নিপুণা-দাসী অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রতিদিন তৈয়ারী করিয়া দিত। একদিন ঐ দাসীর বাসনা হইল, বাদশাহের শয্যায় শুইয়া দেখে, তাহাতে কেমন আরাম পাওয়া যায়। যে শুইবা মাত্র বাদশাহ আসিয়া হাযির হইলেন এবং দাসীকে নিজ শয্যায় শায়িত দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অবিলম্বে রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, দাসীর উপর যখন বেত্রঘাত হইতেছিল সে তখন হাসিতেছিল এবং বেত্রদণ্ড শেষ হওয়া মাত্র সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ সংবাদ বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি দাসীকে ডাকাইয়া এরূপ অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে দাসী বলিল যে, সে কয়েক মুহূর্তমাত্র রাজ-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, তাহাতেই আল্লাহ্ তাহাকে এমন কঠোর সাজা দিলেন—আর বাদশাহ সারা জীবন সেই শয্যায় শুইয়া আসিতেছেন,

www.pathagar.com

আল্লাহ্ জানি তাঁহার জন্য কত সাজা জমা করিয়া রাখিয়াছেন। বেত্রাঘাতের সময় সে সাজা লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে—মনে করিয়া সেই আনন্দে হাসিতেছিল—এবং বেত্রদণ্ডের শেষে, বাদশাহের ভবিষ্যৎ সাজার কথা চিন্তা করিয়া সে ক্রন্দন করিতেছিল। উত্তর শুনিয়া বাদশাহের চৈতন্য হইল। তিনি অবিলম্বে রাজ-পদ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত বা আরাধনার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। সেই এবাদতের সময় তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়া অবশেষে চট্টগ্রামের উক্ত স্থানে আসিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হন। কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রামের উক্ত দরগাহ্ তাঁহার সমাধিস্থল নহে—তাঁহার সাধনা-স্থল। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানেই পরলোকগমন করেন।

শাহ্‌বদর—তিনি একজন বিখ্যাত "অলী" বা দরবেশ। চট্টগ্রাম শহরের বদর-পাতিতে শাহ্‌বদর বা বদর শাহের দরগাহ্ বা সমাধি বিদ্যমান। শাহ্ বদর চট্টগ্রামে কিভাবে এবং কখন আগমন করিয়াছিলেন তাহার সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে বিরাট অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার দোয়া বা আশীর্বাদে সমুদ্র ও নদী-পথ-সঞ্জাত বহু বিপদ হইতে বহু লোক উদ্ধার পাইয়াছেন সে সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এখনও নৌকা ও সাম্পানের মাঝিগণ নৌকা ছাড়িবার সময় "বদর, বদর" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া পথে যাত্রা করে।

রওযা—আরবী শব্দ ; শাব্দিক অর্থ : বাগান, প্রচলিত অর্থ : পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সমাধি বা কবর।

শেরে বাবর—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : সিংহ। "শের" অর্থ : ব্যাঘ্র—"বাবর" অর্থ : বাব্‌রী বা দীর্ঘ কেশ বা কেশর। "শেরে বাবর" অর্থ : দীর্ঘ কেশ বা কেশরযুক্ত ব্যাঘ্র—অর্থাৎ সিংহ।

বেঙুচ—অপর বানান "বেওচ"। বৈচি ফল ; কণ্টকিত, গোলাকার বীজ-বহুল বনজাত ফল বিশেষ—অপক্ক অবস্থায় অম্ল, পক্কাবস্থায় মধুর।

শাহ্‌জালাল—হযরত শাহজালাল একজন প্রসিদ্ধ "অলী" বা "দরবেশ"। শ্রীহট্টের শেষ স্বাধীন হিন্দু-রাজা গৌড়-গোবিন্দ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার ফলে দিল্লীর তুঘলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরুয শাহ্ নিজ ভাগিনের সিকান্দর শাহ্ গাযীকে একজন সৈন্যসহ শ্রীহট্ট অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া দিল্লীর দিকে ফিরিয়া আসিতে থাকেন। লোকের বিশ্বাস, গৌড়-গোবিন্দ যাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং এই যাদুবিদ্যার প্রভাবেই বাদশাহী সৈন্যের পরাজয় ঘটে। এই সংবাদ বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি বাগদাদ হইতে আগত নাসীর উদ্দীন নামক একজন দরবেশকে সিপাহ্-শালার বা সেনাপতি পদে বরিত করিয়া এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ শ্রীহট্টের দিকে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে হযরত শাহ্‌জালাল ইসলাম প্রচারার্থ আরবের ইয়ামন হইতে দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন এবং গৌড়-গোবিন্দের অত্যাচারের কথা শুনিয়া সেই অত্যাচারের প্রতিকারার্থ নিজ শিষ্য ৩৬০ জন আউলিয়াকে ("আউলিয়া" শব্দ "অলী" অর্থাৎ দরবেশ শব্দের বহুবচন) সঙ্গে লইয়া শ্রীহট্টের পথে যাত্রা করেন। এলাহাবাদে দিল্লীমুখী ও শ্রীহট্টমুখী উভয় বাদশাহী সেনাদলের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং বাদশাহের ভাগিনের সিকান্দর শাহ্ এবং নূতন সেনাপতি দরবেশ নাসীর উদ্দীন উভয়েই তাঁহার তপ প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর এই মিলিত বাহিনী হযরত শাহ্‌জালালের নির্দেশাধীনে যথাসময়ে শ্রীহট্টের রাজ্য-সীমানায় আসিয়া উপনীত হয়। গৌড়-গোবিন্দ এই সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মপুত্র, বরাক ও সুরমা নদীর সমস্ত নৌকা ও পারাপারের অন্যান্য সকল ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিলেন। কথিত আছে হযরত শাহ্ জালাল জায়নামায বা নামায-পড়ার আসন পানীতে ভাসাইয়া তাঁহার

www.pathagar.com

অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি-বলে তাহারি সহায়তায় সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে নদী পার করিয়া লইয়া যান। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের নিকটবর্তী চৌকি নামক স্থানে গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচালনাধীন সেনাবাহিনীর প্রথম যুদ্ধ হয়। গৌড়-গোবিন্দ পরাজিত হন। অতঃপর শাহ্‌জালাল শ্রীহট্ট বিজয় করিলে গৌড়-গোবিন্দ পলায়ন করেন। তখন শাহ্‌জালাল দিল্লীর সম্রাটের ভাগিনের সিকান্দর গাযীর উপর শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পণ করিয়া নিজের ৩৬০ জন শিষ্যসহ ইসলাম-প্রচার ও আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হন। শ্রীহট্ট শহরেই তিনি তাঁহার প্রচার ও সাধনা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেখানেই অবস্থান করিলেন। শ্রীহট্টে ত্রিশ বৎসর বাসের পর সেখানেই ৬২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার সাধনস্থানের নিকটই সমাহিত হন। শ্রীহট্টের হযরত শাহ্‌জালাল দরগাহ্‌ হিন্দু-মুসলমান সকলেরই একটি মান্য ও পুণ্য স্থান। হযরত শাহ্‌জালাল প্রধানতঃ নিজের ও নিজ শিষ্য ৩৬০ জন আউলিয়ার তপ বলেই শ্রীহট্ট জয় ও তথায় ইসলাম-প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীহট্ট "তিন শ ষাট আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া পরিচিত।

হযরত শাহ্‌জালাল হযরত মুহম্মদ (দ:) যে-বংশের লোক, সেই কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মস্থান দক্ষিণ আরবের ইয়ামন নামক স্থানে। শৈশবে মাতাপিতা হারাইয়া তিনি তাঁহার মাতুল সাধক সাইয়িদ আহমদ কবীরের নিকট অবস্থান করিয়া মাতুলের নিকট ধর্মসাধনায় দীক্ষালাভ করেন এবং সেই সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া মাতুলেরই আদেশে ইসলাম-প্রচারার্থ হিন্দুস্থানে বা পাক-ভারতে চলিয়া আসেন।

মহাস্থান গড়—উত্তরবঙ্গের বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থান গড়ের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। বহু প্রাচীন কালে পাক-ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ব-দ্বীপ অঞ্চলে "বাং" বা "ভাং" নামে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ বাস করিতেন। ইহাদেরই নাম অনুসারে "বাংলা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তখন আর এক শ্রেণীর মানুষ বাস করিতেন উত্তরবঙ্গের করতোয়া নদীর তীরভূমিতে। ইহারা "পুন্ড্র" নামে অভিহিত হইতেন। ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে "মহাস্থান গড়" প্রাচীন পুন্ড্র বা প্রৌণ্ডরাজ্যের রাজধানী "পুন্ড্রবর্ধন" বা "পুন্ড্র নগর" হইতে অভিন্ন। ঐতরেয় আরণ্যক, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দ-পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পুন্ড্রদেশ ও পৌন্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। প্রাচীন মানচিত্রে "মহাস্থান গড়ে"র নাম "মুস্তান গড়" রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের "মহাস্থান" নাম হওয়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্র অনুসারে চৌষট্টি প্রকার দোষ-বিবর্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া-করতোয়ার তীরবর্তী এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন এবং এই স্থানে তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার "মহাস্থান" নাম দেন। স্মরণাতীত কাল হইতে মহাস্থান হিন্দু তীর্থ রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এই স্থানে পুন্ড্ররাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা "পুন্ড্রনগর", "পুন্ড্রবর্ধন" বা "পৌন্ড্রবর্ধন" নামে পরিচিত হয়। পুন্ড্রবর্ধন অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুন্ড্রবর্ধনে আগমন করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাস্থান মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। প্রবাদ, শাহ্‌ সুলতান নামক একজন মুসলমান দরবেশ মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। কথিত আছে, শাহ্‌ সুলতান একটি বিরাট মৎসের উপর আরোহণ করিয়া করতোয়া নদী দিয়া যাতায়াত করিতেন ; তজ্জন্য লোকে তাঁহার উপাধি দিয়াছিল "মাহী-সওয়ার" অর্থাৎ "মৎস্যারোহী"। মহাস্থানের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে প্রাচীন দুর্গ এবং শাহ্‌ সুলতানের দরগাহ্‌-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

শেরপুর—বগুড়া হইতে দক্ষিণ দিকে দশ মাইল দূরে শেরপুর অবস্থিত। মুঘল-যুগে এইস্থানে একটি সীমান্তবর্তী দুর্গ ছিল এবং এই স্থানের নাম ছিল শেরপুর মুর্চা। আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। বাংলার ভূস্বামীগণের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া মুঘল-সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ কিছুকাল শেরপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন. উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। ইহা ছাড়া এখানে "খানরা মসজিদ" ও "বন্দেগী সদরজাহান" মসজিদ নামে দুইটি প্রাচীন মসজিদ ও তুরকান শাহ্-এর মাজার বা দরগাহ্ বর্তমান। শেষোক্ত মসজিদটি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নবাব মির্যা মুরাদ খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয়। শেরপুর শহরের বাহিরে "খেড়ুয়া মসজিদ" নামক মসজিদটির নির্মাণ কাল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ।

শের শাহ্—পাক-ভারতের শেষ প্রতাপশালী পাঠান-সম্রাট। তিনি বিহারের অন্তর্গত সাসারামের এক পাঠান জায়গীরদার হাসান সুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার বাল্য-নাম ফরিদ। যৌবনে বিহারের স্বাধীন সুলতান বহরম খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরী করিবার সময় একদিন একাকী ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া প্রভুর নিকট হইতে তিনি "শের খাঁ" উপাধি লাভ করেন। "শের" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : ব্যাঘ্র। তিনি স্বীয় অসীম বীরত্ব ও প্রতিভার বলে দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করেন এবং "শের শাহ" উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দূর্গ অধিকার কালে বারুদ স্তূপে আগুন লাগায় অগ্নি-দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অত্যন্ত সুশাসক ও ন্যায়-বিচারক ছিলেন। জয়-গৌরব অপেক্ষা শাসন-প্রতিভার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

তুরকান শা—প্রকৃত বানান : তুর্খান শাহ্। প্রবাদ, রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে তিনি ইসলাম-প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং উত্তর বঙ্গের বগুড়া হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত শেরপুরে অবস্থান করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তিনি একজন "অলী" বা দরবেশ ছিলেন। নানা কারণে শেষ পর্যন্ত বল্লাল সেনের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ বাধে এবং ঐ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। যুদ্ধের সময় শেরপুরের যে-স্থানে তাঁহার শির পতিত হয় সে-স্থানে পরবর্তীকালে "শির-মুকাম" বা "সের-মুবারক" বা "সির-মুবারক" নামে একটি দরগাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। "সির্" বা "সের" ফার্সী শব্দ ; অর্থ : মস্তক, শির। আর শেরপুরের যে-স্থানে শহীদ তুরখান শাহ্-এর ধড় বা মস্তকশূন্য দেহ পতিত হইয়াছিল সেখানে "ধড়-মুকাম" নামে আর একটি দরগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সাধারণতঃ তুরখান শাহ্র মাযার নামে পরিচিত। দরগাহ দুইটি এখনও শেরপুরে বর্তমান আছে।

শের-মুবারক—প্রকৃত উচ্চারণ "সির-মুবারক"। উপরের "তরকান শা" শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘোড়াঘাট—করতোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত এবং রংপুর জেলার সীমানার পার্শ্বে ও বগুড়া জেলার অনতিদূরে। কিংবদন্তী, এইস্থানে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল বলিয়া ইহার নাম ঘোড়াঘাট হয়। নসরত শাহ্ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাঁটাদুয়ারের রাজা নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের অধিপতি ছিলেন বলিয়া কথিত। এইস্থানে তাঁহার একটি অরণ্যবেষ্টিত সুরক্ষিত দূর্গ ছিল। নসরত শাহের সেনাপতি প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক গাযী ইসমাঈল নীলাম্বরকে পরাস্ত করিয়া এই দূর্গ অধিকার করেন এবং এই স্থানের "নসরতাবাদ" নাম দেন। গাযী ইসমাঈলের চেষ্টায় এখানে একটি শহর গড়িয়া উঠে। উত্তরকালে মুঘলেরা যখন আসাম ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হন তখন ঘোড়াঘাট মুঘল-সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রধান সেনা-নিবাস হইয়া উঠে। কালবশে করতোয়ার প্রবাহ কমিয়া গেলে স্থানটি অত্যন্ত

www.pathagar.com

অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং এই স্থানের ফৌজদারী রংপুরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ঘোড়াঘাটের প্রাচীন কীর্তির অধিকাংশই নদীর গর্ভসাৎ হইয়াছে। তবে মুঘল আমলের ফৌজদারের প্রাসাদ, একটি মসজিদ ও ঘোড়াঘাট-বিজয়ী গাযী ইসমাইলের দরগাহ এখনও বর্তমান।

ষাট-গুম্বজ মসজিদ—খলীফাতে আবাদ বা খলীফাতাবাদে বা বর্তমান খুলনা জেলার বাগেরহাটে এই মসজিদটি অবস্থিত। পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে এই মসজিদটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ বা নিম্ন বঙ্গের অর্ধ-স্বাধীন দরবেশ-অধিপতি খান জাহান আলী খান কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। খান জাহান আলী খান প্রথম এখানে একটি সুবৃহৎ দীঘি খনন করান। দীঘিটির নাম "ঘোড়া-দীঘি"। ইহা প্রায় এক হাজার হাত দীর্ঘ ও ছয় শত হাত প্রস্থ। খান জাহান ইট দিয়া ইহার সুন্দর ঘাটও বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে খনিত এই দীঘিটিতে এখনও বারমাস যথেষ্ট পানি থাকে এবং এখনও ইহার পানির মত স্বচ্ছ, সুপেয় ও মধুর পানি বঙ্গের অতি অল্প জলাশয়েই আছে। এই দীঘির নাম কেন "ঘোড়া-দীঘি" রাখা হইল তাহার সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। প্রবাদ, একটি ঘোড়া যতদূর দৌড়াইয়া গিয়াছিল তত দীর্ঘ করিয়া নাকি এই দীঘিটি খনিত হয় এবং সেইজন্যই ইহাকে "ঘোড়া-দীঘি" বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহা হউক, সুবিশাল দীঘি তীরেই "ষাট-গুম্বজ মসজিদ" নির্মিত হইয়াছে। ইহার বাহিরের মাপ প্রায় ১৬০ ফুট×১০ ফুট, ভিতরের মাপ ১৪৩ ফুট×৮৮ ১/২ ফুট, ভিত্তি ৮ ফুট, উচ্চতা ২১ ফুট। সমস্ত মসজিদে পূর্ব পশ্চিমে ৭টী করিয়া ১১ সারিতে মোট ৭৭টি গুম্বজ। পূর্ব দিকের সদর দরজার সোজাসুজি মধ্যবর্তী সারির ৭টি গুম্বজ অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার উত্তরের পাঁচ সারি এবং দক্ষিণে পাঁচ সারি অপেক্ষাকৃত ছোট। মসজিদটি ৬০টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। দরওয়াজা সংখ্যা ২৫টি। দরওয়াজাগুলি খোলা, পশ্চিম দিকে মাত্র ১টি দরওয়াজা। এ দেশের কোন মসজিদে পশ্চিম দিকে দরওয়াজা থাকে না। বোধ হয়, মসজিদের পশ্চিমে দীঘি বলিয়াই এই দরওয়াজা নির্মাণের প্রয়োজন হইয়াছিল। মসজিদের চারকোণে চারিটি মিনার। পূর্ব দিকের দুইটি মিনারের মধ্যে ঘুরানো সিঁড়ি আছে এবং এই দুইটি মিনার পশ্চিম দিকের মিনার দুইটি অপেক্ষা উচ্চ। ইহার একটির নাম "রওশন"-কোঠা বা আলোক-ঘর ; অন্যটির নাম আঁধার-কোঠা। মুয়ায্‌যিন এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আযান দিতেন। এই মসজিদে ৭৭টি গুম্বজ থাকা স্বত্বেও ইহাকে কেন "ষাট-গুম্বজ" বলা হয়—তাহার সঠিক কারণ জানা যায় নাই। মসজিদটি ষাটটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। বোধ হয় সেইজন্যই ইহাকে "ষাট-গুম্বজ" বলা হইয়া থাকে।

হযরত মুহম্মদের (দ:) আমলে ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী গণ-তান্ত্রীক চার খলীফার আমলে মদীনার "মসজিদে-নববী" বা "নবীর মস্‌জিদ" যেরূপভাবে ধর্মীয়-কাজ ও রাষ্ট্রীয়-কাজ—উভয় কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত, দরবেশ-রাজা খান জাহান আলী খানের জীবিতাবস্থায় ষাট-গুম্বজ মসজিদও অনুরূপ ভাবে ব্যবহার করা হইত। এখানে নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া ছাড়া ইহাই খান জাহান আলী খানের দরবার-গৃহ ছিল। এখানে প্রাতঃকালে ফজরের নামাযের পর দরবার বসিত, প্রজাবর্গের বিচারকার্য চলিত, রাজস্ব সংগ্রহ হইত এবং সমবেত প্রজাবৃন্দের অভাব-অভিযোগ শুনিয়া যথাসম্ভব তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইত।

খান জাহান—তাঁহার পূর্ণ নাম খান জাহান আলী খান। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাক-ভারতে পাঠান-শাসনের শেষ আমলে দক্ষিণ বা নিম্ন বঙ্গের অর্ধ-স্বাধীন রাজ-সন্ন্যাসী বা দরবেশ-রাজা ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বত্যাগী দরবেশ, উদার হৃদয়

www.pathagar.com

জনসেবক ও ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ তৈমুরলং-এর আক্রমণে যখন দিল্লীর বহু লক্ষ লোক নিহত এবং তুঘলক-বংশীয় পাঠান সম্রাটদের সমস্ত প্রভাব প্রায় বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন পাক-ভারত-বিস্তৃত পাঠান-সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এই দুর্দিনে খান জাহান আলী খান দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গে পদার্পণ করিয়া সুন্দরবন-সন্নিকটবর্তী এই অঞ্চল, সর্প ও ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিতে করিতে নূতন করিয়া আবাদ করিলেন এবং তথায় একটি সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিলেন। দিল্লীর পাঠান সম্রাটদের কোন প্রভাবই তখন বাংলাদেশে নাই। বাংলায় তখন স্বাধীন পাঠান সুলতানদের আমল। এমনই সময় নিজ প্রতিভা ও পূত চরিত্রের বলে নিম্ন বঙ্গে এই রাজ্যটি স্থাপন করা সত্ত্বেও খান জাহান আলী খান দিল্লীর পাঠান সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজ্যটি শাসন করিতে আরম্ভ করেন এবং রাজ্যটির নাম দেন "খলীফাতে-আবাদ" বা "খলীফাতাবাদ" অর্থাৎ খলীফা বা প্রতিনিধি দ্বারা আবাদকৃত ও প্রতিষ্ঠিত স্থান বা রাজ্য। তিনি বর্তমান বাগেরহাটের সংলগ্নস্থানে "ঘোড়া-দীঘি" নামক একটি বিরাট দীঘি খনন করাইয়া তাহারই তীরে "ষাট-গুম্বজ" নামক এক বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ইহার উত্তর দিকে গড় বেষ্টিত এক বাড়ী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তখন ঐ স্থানের নাম "বাগেরহাট" ছিল না। কি নাম ছিল তাহা জানা যায় নাই এবং পরবর্তীকালে কি করিয়া ঐ স্থানের নাম "বাগেরহাট" হয় তাহাও জানা যায় নাই। খান জাহান আলী খানই তখন উপরোল্লেখিত দিল্লী সম্রাটের প্রতিনিধি বা খলীফা হিসাবে ঐ স্থানকে "খলীফাতে-আবাদ" বা "খলীফাতাবাদ" নাম অভিহিত করেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্ম-কেন্দ্র বা রাজধানী স্থাপন করেন। এই একই কারণে যে রাজ্যের নামও "খলীফাতে-আবাদ" বা "খলীফাতাবাদ" রাখা হয়, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

খান জাহান আলীর বংশ পরিচয় এবং সঠিক জন্মকাল জানা যায় নাই। এই মাত্র জানা যায় যে, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন দিল্লীর তুঘলক-বংশীয় পাঠান-সম্রাট মাহমুদ তুঘলকের উজীর। রাজ্যের সকল লোকের তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র। সুদক্ষ কর্মচারী হিসাবে সম্রাটেরও তিনি মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহমুদের মত দুর্বল-চিত্ত সম্রাটের অধীনে কাজ করিয়া দেশ ও ধর্মের বিশেষ কোনরূপ উপকার করিতে পারিবেন না, তিনি শীঘ্রই একথা বুঝিতে পারিলেন এবং সম্রাটের নিকট বর্তমান ভারতের উত্তর-প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর অঞ্চলের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট এই প্রস্তাবে শুধু সম্মতিই দিলেন না, উজীরের কার্য হইতে অবসর লইয়া নূতন রাজ্যে যাইবার পূর্বে তাঁহাকে "মালিক-উস্‌শর্ক" অর্থাৎ "পূর্ব-অঞ্চলের অধিপতি"—এই উপাধি দান করিলেন। অতঃপর খান জাহান জৌনপুরে চলিয়া আসিয়া এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন—দিল্লীর সম্রাটের অধীনে সামন্ত রাজ্য। ইহা ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করিয়া ছারখার করেন ইহার চার বৎসর পরে—১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে। ইচ্ছা করিলেই খান জাহান স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন যেখানেই থাকুন না কেন, কি জৌনপুরে, কি অন্য কোথাও, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিল্লীর পদবী-সর্বস্ব সম্রাটদের আনুগত্য তিনি সম্মানের সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি মাত্র চার বৎসর জৌনপুর রাজ্যে রাজত্ব করেন এবং রাজ্যে সুশাসন, সমৃদ্ধি ও শান্তি-প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাদের হৃদয় জয় করেন। কিন্তু এই অনতিবৃহৎ রাজ্যের সংকীর্ণ বেষ্টনীর বাহিরে বৃহত্তর মানব সঙ্ঘের সেবা ও ইসলাম-প্রচারের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে। কারণ তিনি আসলে ছিলেন সর্ব-সমর্পিত-চিত্ত মানব-সেবক এবং

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র-পথে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তপঃসিদ্ধ "অলী" বা দরবেশ এবং সর্বত্যাগী চিরকুমার। ফলে, ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পোষ্য পুত্র মুবারক শাহ্-কে জৌনপুরের সিংহাসন অর্পণ করিয়া তিনি মানব-সেবা ও ধর্ম-প্রচারার্থে পূর্ব দেশের দিকে রওনা হয়। এই বৎসরই তৈমুর দিল্লী ধ্বংস করিয়া তুঘলক-বংশীয় পাঠান-সম্রাটদের শেষ শক্তি ও প্রভাব চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া যান। যাহা হউক, মুবারক শাহ পর বৎসর অর্থাৎ ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে নিজকে জৌনপুরের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এই বংশের চারিজন স্বাধীন অধিপতি জৌনপুরে রাজত্ব করেন। খান জাহান আলী খানকে মাহমুদ তুঘলক কর্তৃক প্রদত্ত "মালিক-উস্-শর্ক" উপাধি অনুসারে তাঁহার পোষ্য-পুত্র মুবারক শাহের এই বংশধরগণও "শর্কী" বংশীয় বলিয়া পরিচিত।

খান জাহান আলী খান জৌনপুর ত্যাগ করিয়া কোন্ পথে, কত দিনে বাংলায় আসিয়া পৌছেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। বাংলায় তাঁহার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ মিলে বর্তমান যশোহরের দশ মাইল দূরবর্তী "বারবাজার" নামক স্থানে। তিনি এখানে প্রায় দশ বৎসর অবস্থান করিয়া মানবসেবা ও ইসলাম প্রচার করেন। তথা হইতে তিনি বহু শিষ্যসহ ধীরে ধীরে ক্রমাগত পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও ধর্ম-প্রচার করিয়া প্রায় এক যুগ পরে খলীফা-তাবাদ বা বর্তমান বাগেরহাটে যাইয়া এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেইখানেই বাকী জীবন স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানেই ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন। "ষাট-গুম্বজ মসজিদ" হইতে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রণবিজয়পুর নামক স্থানের ঠাকুর-দীঘি নামক একটি বিরাট জলাশয়ের তীরে তাঁহার সমাধি বা দরগাহ্ অবস্থিত।

খান জাহান আলী খান ছিলেন মূলতঃ ধর্ম-প্রচারক। প্রধানতঃ তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের চেষ্টায়ই দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গে ইসলাম প্রচার সম্ভব হয়। তাঁহার চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াই বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই রাস্তা, জলাশয় ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছেন। পাঁচশত বৎসর পূর্বেকার এই সব রাস্তা, জলাশয় ও মসজিদ ইত্যাদি এখনও খুলনা ও যশোহর জেলার বহু স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মস্‌লিন—অতি মিহিন সুক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র। ঢাকায় তৈয়ারী হইত। এই বস্ত্র এত সুক্ষ্ম ছিল যে, পরিণত বয়স্ক লোকের পরিধানোপযুগী। একটি মস্‌লিন কাপড় একটি অঙ্গুরীয়ের ভিতর দিয়া অনায়াসে পরিচালনা করা যাইত। বর্তমানে এই শ্রেণীর কাপড় উপযুক্ত শিল্পী ও বিশেষ ধরনের কার্পাসের অভাবে আর তৈয়ারী হয় না। মুসলমান আমলে সাধারণতঃ বাদশাহ ও রাজরাজরাদের পরিবারেই এই কাপড় ব্যবহৃত হইত।

ময়নামতী—এক প্রকার সুন্দর কার্পাস বস্ত্র। ত্রিপুরা জেলার "ময়নামতি" নামক অঞ্চলে এই কাপড় তৈয়ারী হইত।

গুঞ্চায়ে দিল্—ফার্সী বাক্যাংশ। "গুঞ্চা" অর্থ : কলি, মুকুল ; "দিল" অর্থ : মন। কাজেই বাক্যাংশের অর্থ : মনের মুকুল বা চিত্ত-কলি।

মাফ্‌তা-আলুন—আরবী গানের ও কবিতার ছন্দ বিশেষ।

দিল্-আফরোয—ফার্সী। "দিল" অর্থ ঃ মন, চিত্ত ; "আফ্‌রোয" অর্থ : আনন্দ-দায়ী, আনন্দকর, পুলকিতকারী। অতএব "দিল-আফ্‌রোয" অর্থ : চিত্ত-আনন্দকর।

নওরোয—"কবর-ই-নূরজাহান" শীর্ষক কবিতার "নওরোয" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

হুর-পরী—"ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "হুর" ও "পরী" শব্দ দুইটির টীকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দরূদ—আরবী শব্দ ; অর্থ : শান্তিবাণী। হযরত মুহম্মদ-এর (দ:) নামোচ্চারণের পর প্রত্যেক মুসলমানকেই এই শান্তিবাণী পাঠ করিতে হয়। "ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লাম" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। "ঝাণ্ডা উড়াও" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কর্ণফুলীর কল্লোল গানে জাগে নব আশা অতুল গরব,
সীতাকুণ্ডের ঝর্ণা-ঝারীর আশীতে মুখ দেখিছে করভ।

(খ) শেরে-বাবরের সঙ্গে লড়েছি, বাঘের যুদ্ধে মোরা কি ডরি?
বেঙচের ক্ষেতে আঙুর ফলায়ে দেখায়েছি কি যে শক্তি ধরি।

৩। টীকা লিখ :—

ঝাণ্ডা, আনারকলি, মোমেনশাহী, মলুয়া, সীতাকুণ্ড, বায়যীদ, শাহ বদর, শেরে-বাবর, রওযা, মহাস্থানগড়, তুরকান শাহ্।

সাঁঝের মায়া

এই কবিতাটি বেগম সুফিয়া কামাল-রচিত "সাঁঝের মায়া" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। বেগম সুফিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার মহিলা-কবিদের মধ্যে একমাত্র রাধারাণী দেবী ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ অন্য কোন মহিলা-কবি আজ পর্যন্ত কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার রচনা-রীতি ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাঁহার ভাষা মাধুরীময় ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং ভাব স্বপ্নময় ও আদর্শমুখীন। নারী হৃদয়ের এবং মাতৃহৃদয়ের যে অপূর্ব সুষমা মানব জাতিকে ঘিরিয়া রাখিয়া তাঁহার চির-জগতে স্নেহ-প্রীতি, আশা-আনন্দের উৎস-ধারা চির-প্রবাহমান রাখিয়াছে এবং জীবনকে কান্তকমনীয় ও স্নিগ্ধ-মধুর প্রাণ-রসায়নে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে, কবি সুফিয়ার লেখায় তাহা দ্যুতি দেদীপ্যমান। তাঁহার কবিতায় একটি আত্মনিবেদিত করুণ-কোমল সুর পাঠকের মনকে কোন এক অজানা বেদনায় বিধুর করিয়া তোলে। আলোচ্য কবিতায়ও সেই সুরটি অনরণিত। এই কবিতায় এক একটি বসন্ত-সন্ধ্যার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজ জীবনোপলব্ধির সামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়াছেন। অস্তোন্মুখ সূর্য নিজের সমস্ত দীপ্তি বিলাইয়া দিয়া নিঃস্ব হইয়া সন্ধ্যাকাশকে বিচিত্র বর্ণের সমারোহে ভরিয়া তোলে বিধাতার বিধানে এমনিভাবে একের আত্মাহুতি অপরকে নবজীবনে অভিষিক্ত করে। তাই বিশ্ব-বিধাতার চরণে কবির প্রার্থনা, জীবনের সর্বকর্ম অবসানে যেদিন বিদায়-মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইবে সেইদিন সে বিলয়ের ক্ষণে—জীবন পুষ্প নিঃশেষে ঝরিয়া যাওয়ার মুহূর্তে—সে যেন নবতর ও মহত্তর জীবন এ নবতর ও সুন্দরতর পুষ্পবিকাশের প্রয়োজনেই বিদায় নেয়।

www.pathagar.com

প্রশ্নাবলী

১। "সাঁঝের মায়া" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে বসন্ত-সন্ধ্যার একটি বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর : —

(ক) সুন্দর দক্ষিণ হস্তে পশ্চিমের দিক-প্রান্ত ভালে,
দক্ষিণা দানিয়া গেল বিচিত্র রং-এর তুলি তার।

(খ) ..."তরুশিরে বিচিত্র বর্ণের আলিম্পন
করিয়াছে উন্মন অধীর
মৌনা, বাক্যহীনা, মূক বক্ষখানি স্তব্ধ বিটপির।"

(গ) "মুক্তিলভে বন্দী আত্মা সুন্দরের স্বপ্নে, আয়োজনে
নিঃশ্বাস নিঃশেষ হোক পুষ্প বিকাশের প্রয়োজনে।"

৩। এই কবিতার শেষ ছয় লাইন মুখস্থ লিখ।

মদীনা-পথিক

এই কবিতাটি কবি আজহারুল ইসলাম-রচিত কবিতাসমষ্টি হইতে উদ্ধৃত। কবি আজহারুল ইসলামের লেখায় ক্লাসিক্যাল-ধর্মী ভাষা ও রোমান্টিক কবি-কল্পনা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তবে ইনি মূলতঃ ইসলামের রেনেসাঁপন্থী কবি। প্রকৃত ইসলামের মধ্যে গোড়ামী ও অন্ধতা নাই। প্রকৃত মুসলমান উদার ও বিশ্ব-মানবতা-মুখী। কবি আজহারুল ইসলাম সেই উদার ও মহামানবতাময়ী ইসলামেরই বন্দনা-মুখর নবচারণ। তাঁহার ভাষা পরিমার্জিত ও সাবলীল এবং ছন্দ সংযত ও ধ্যান-গম্ভীর। আলোচ্য কবিতায় তাঁহার কাব্যের এই উভয় প্রসাদগুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান। ইসলামের মহানবী হযরত মুহম্মদ (দ:) মদীনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামের যে-ঐক্য ও মৈত্রিময় মহামানবতার বাণী বিশ্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই পন্থার অনুসারীদিগকেই কবি এই কবিতায় "মদীনা-পথিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বর্তমান ধর্মহীন জড়বাদী ও সংঘাত সংকুল বিশ্বে "মদীনা-পথিক" দিগকে মহানবীর সেই ঐক্য, মৈত্রি ও সত্যের বাণী প্রচার করিবার জন্য আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন। মানব জাতির আজিকার এই পথ-ভ্রষ্টতার জন্য কবি ভীত বা নিরাশ হন নাই। সত্যের প্রতি মানুষের যে অন্তর্নিহিত আগ্রহ ও নির্ভরতা, শত অনাচার ও শত ভুল-ভ্রান্তির পরেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চির সজীব ও চির সচেতন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকে, তাহার উপর কবির বিশ্বাস অটল ও অগাধ এবং সেই সুপ্ত সত্য-বোধকে একবার জাগ্রত করিতে পারিলে মানুষ আবার সত্যিকার ধর্ম ও মানবতার পথে ফিরিয়া আসবে—পৃথিবীতে আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা দিবে—ইহাই কবির সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং এই কবিতায় ইহাই কবির প্রধান বক্তব্য।

টীকা

মদীনা—"জিন্দা পাকিস্তান" শীর্ষক কবিতার "মদীনা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

মুক্তি-ঋক—"ঋক" অর্থ : পদ্যময় বেদ-মন্ত্র ; ঋগবেদ। এখানে "মুক্তি-ঋক" অর্থ : মুক্তির মন্ত্র।

www.pathagar.com

নফ্‌সে আম্মাবা—আরবী বাক্যাংশ। সুফী বা ইসলামী আধ্যাত্মিক-পন্থীদের পরিভাষায় "নফ্‌স্" বা জীবাত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে "নফ্‌সে আম্মাবা" "নফ্‌সে লাওয়ামা" এবং "নফ্‌সে মুৎমাইন্না"। "আম্মাবা" অর্থ : পাপ-প্রবণ ; "লাওয়ামা" অর্থ : পাপ-প্রবণ কিন্তু পাপের জন্য অনুতপ্ত ; "মুৎমাইন্না" অর্থ : নিষ্পাপ ও প্রসন্ন। কাজেই "নাফ্‌সে আম্মাবা" অর্থ : "পাপ-প্রবণ জীবাত্মা"।

কুফরী—আরবী শব্দ। আরবী "কুফর" শব্দের অর্থ : আল্লাহ্ ও আল্লাহর দানকে অস্বীকার করা। "সত্যকে অস্বীকার করা" এবং "মূর্খতা"কেও "কুফর" বলা হয়। প্রচলিত অর্থ : আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। এই আরবী 'কুফর' শব্দকে ফার্সী-ব্যাকরণ অনুসারে গুণবাচক বিশেষ্য বা Abstract Noun করিয়া "কুফরী" শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। ["বিদায়-হজ্জ" শীর্ষক প্রবন্ধের "কাফের" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্নাবলী

১। "মদীনা-পথিক" শীর্ষক কবিতায় কবি যে-পথ ও যে-আদর্শের কথা বলিয়াছেন, তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। তাৎপর্য লিখ :—

(ক) চেতনার আকাশেতে মেঘ যবে ফেলে যবনিকা
অচেতন প্রান্ত থেকে সুরু কর তব অভিনয়,
আঁধারের মঞ্চপরে জ্বেলে দাও আলোর দীপিকা,
বাসনার গ্রন্থি খোলো যাদুমন্ত্রে ত্যাজি সর্বভয়।

(খ) জীবন আশ্রম হবে বলে দাও প্রজ্ঞার আবাস
প্রেম দিয়ে সব কিছু ঢাকো।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মদীনার সঞ্জীবনী বিলাইতে ক্ষমতা তোমার
আছে বটে। অতএব বুনে চলো ধর্মের ফসল।

(খ) যে-মৃত্যুরে বরেছিলে একদা পরম বস্তুমানি
খুলে দাও তার দ্বার, ছুটে চলো আলোকের বাগে ;
মদীনা দিতেছে হাতছানি।

৪। টীকা লিখ :—

মদীনা-পথিক, নফ্‌সে-আম্মাবা, মুক্তি-ঋক

ফরমান

এই কবিতাটি কবি আহসান হাবীব-রচিত কবিতা সমষ্টি হইতে সংকলিত। আহসান হাবীব রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে একজন শক্তিশালী কবি। তাঁহার ভাষা সুসংযত ও সুসংহত এবং সর্বপ্রকার বাহুল্যদোষ বর্জিত—এবং সেই সঙ্গে মার্জিত, সুললিত ও সুপরিমিত। তাঁহার কবিতার আঙ্গিক আধুনিক রীতিসম্মত ও রচনা-ভঙ্গী তীক্ষ্ণ। তিনি যুগ-ধর্মী কবি।

আলোচ্য কবিতায় কবি মানব-সৃষ্টি ও মানব-সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে ইসলামের যে মৌলিক ধারণা ও শিক্ষা, তাহাই কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া

www.pathagar.com

তাহাকে বিবিধ জ্ঞান ও শক্তি-সুষমায় মণ্ডিত করিলেন এবং ফল-পুষ্প-ভারাবনত, সিন্ধু-শরিৎ-বিধৌত এই সুন্দর আনন্দময়-ধরণীতে প্রেরণ করিলেন, যেন মানুষের পরস্পরের প্রতি প্রেম আর প্রীতি, মায়া আর মমতা এবং দয়া আর দাক্ষিণ্য এই ধুলার পৃথিবীতে বেহেশ্‌ত সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু মানব-সৃষ্টির সেই মহান উদ্দেশ্য-বিচ্যুত মানুষ স্বার্থ আর লোভে অন্ধ হইয়া পরস্পরে হানাহানি করিয়া নির্দোষের রক্তে পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে এবং অসহায় ও দুর্বলের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া অন্নহীন ও আশ্রয়হীনকে পদ-দলিত করিয়া পৃথিবীর বুকে এক সাক্ষাৎ নরকের সৃষ্টি করিতেছে। এই কবিতায় কবি তাঁহার কল্পনার সাহায্যে আল্লাহ্‌র প্রমুখাৎ মানবজাতিকে তাহার জীবনের মহান উদ্দেশ্যের কথা এবং তাহার আদি সৃষ্টির সময় পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র এবাদত বা আরাধনা এবং শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তাহার যে-প্রতিশ্রুতি, সেকথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন এবং সমস্ত অন্যায় ও অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ মানবতার পথে ফিরিয়া আসিবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

টীকা

ফরমান—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : বাদশাহী হুকুম, হুকুমনামা বা রাজাজ্ঞা। সমস্ত রাজার রাজা যে-বিশ্বাধিপতি তাঁহার আদেশ ও নির্দেশকেও "ফরমান" বলা যাইতে পারে। ["বাঙ্গালার বিবরণ" শীর্ষক কবিতার "ফরমান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

নিয়ামত—আরবী শব্দ ; অর্থ : আশীর্বাদ, দান, আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ।

সুলতানত—আরবী শব্দ। প্রকৃত বানান : "সুল্‌তানাত"। "সুলতান" বা অধিপতি শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থ : আধিপত্য বা রাজত্ব।

জাহান্নাম—আরবী শব্দ ; অর্থ : নরক।

এতিম—আরবী শব্দ ; অর্থ : পিতৃমাতৃহীন (নাবালক)।

যাকাত—আরবী শব্দ ; শাব্দিক অর্থ : পবিত্র করণ। প্রচলিত অর্থ : বার্ষিক উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে দরিদ্রদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমানদের দেয় অর্থ। ইসলামের বিধান অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য হইল এই যে, সমস্ত সাংসারিক খরচ নির্বাহের পর বৎসরে ৫২।।০ উদ্বৃত্ত হইলে শতকরা ২।।০ টাকা হিসাবে "বায়তুল-মাল" বা সরকারের পরিচালনা ও সংরক্ষণাধীন সাধারণ ধনাগারে (Public Treasury-তে) দরিদ্রদের সাহায্যার্থে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত জমা দিতে হইবে।

"হাতের নিশান আছে, বক্ষে তার স্বাক্ষরের ছাপ
রাখনি অম্লান করি।"—এই চরণদ্বয়ের প্রথম চরণে উল্লেখিত "নিশান" শব্দ দ্বারা "ধর্মের নিশান" বা "ধর্মের ধ্বজা" বুঝানো হইয়াছে। এখানে "ইসলাম ধর্মের নিশান" বা "ইসলাম ধর্ম"। উক্ত চরণে উল্লেখিত "স্বাক্ষরের ছাপ" দ্বারা "কুরআনের স্বাক্ষর" অর্থাৎ "কুরআনের শিক্ষা"কে বুঝানো হইয়াছে। অতএব উদ্ধৃত চরণদ্বয়ের মর্মার্থ হইল : বর্তমান সময়ের মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক রূপকে আকড়াইয়া আছেন বটে—কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাকে অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষাকে সর্বপ্রকার স্বার্থ-কলুষের উর্ধ্বে রাখিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইতেছে না।

স্মারণে কি আছে সেই দিন, কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে বিনিময়ে তুমিও সেদিন?"—উদ্ধৃত কবিতাংশে উল্লেখিত "প্রতিজ্ঞা" শব্দ দ্বারা মানুষের স্বেচ্ছা-স্বীকৃত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনের যে-শিক্ষা, তাহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কুরআনের এই শিক্ষার মর্মার্থ

www.pathagar.com

হইল এই যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সারা সৃষ্ট পদার্থের—বিশেষ করিয়া মানবের, আদি সৃজনের সময় সকলেই স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সকল তথ্য অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবে এবং পৃথিবীতে অত্যাচার ও অনাচারমূলক বিদ্রোহ-বিপ্লব কিংবা কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করিবেনা। ইসলাম ধর্মে আগত আদি মুসলমানগণও হযরত মুহম্মদের (দ:) হস্ত ধারণ করিয়া আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনমাত্র তাঁহারা আল্লাহ্‌র পথে প্রাণদান করিবেন, আল্লাহ্ এবং মানুষের নিকট প্রদত্ত সর্বপ্রকার "ওয়াদা" বা প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পূর্ণ ভাবে প্রতিপালন করিবেন, ইত্যাদি। উদ্ধৃত কবিতাংশে উল্লেখিত "প্রতিজ্ঞা" শব্দ দ্বারা এই সকল প্রতিজ্ঞার কথাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশরাফ—আরবী শব্দ। "আশরাফ" শব্দ "শরীফ" অর্থাৎ "ভদ্র" শব্দের বহুবচন। প্রচলিত অর্থ : অভিজাত শ্রেণী।

আতরাফ—আরবী শব্দ ; অর্থ : "শরাফত" অর্থাৎ : "ভদ্রতা"র বহির্ভূত লোক ; অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণী বা ইতর শ্রেণীর লোক।

নিয়াত—আরবী শব্দ ; অর্থ : বহু লোকের সম্মিলনে গঠিত সমাজ বা জাতি। সাধারণ প্রচলিত অর্থ : মুসলমান জাতি।

হায়ওয়ানাত—আরবী শব্দ ; অর্থ : প্রাণী-জগৎ। "হায়ওয়ান" বা প্রাণী শব্দ হইতে উৎপন্ন। "হায়ওয়ান" শব্দে পশুও বুঝায় ; সেই অর্থে "পশুজগৎ" বা "পশুত্ব" ও বুঝায়।

ইবলিস্—এই পুস্তকের "না'ত" শীর্ষক কবিতার "শয়তান' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইবলিসের সাহংকার কি কথার জবাবের ভার"—এই চরণে উল্লেখিত "ইবলিসের সাহংকার কথা" কি, সে সম্পর্কে এই পুস্তকের "না'ত" শীর্ষক কবিতার শয়তান শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বান্দা—ফার্সী শব্দ ; অর্থ : দাস। এখানে, আল্লাহ্‌র দাস বা তাঁহার প্রিয় সেবক।

প্রশ্নাবলী

১। "ফরমান" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র কি ফরমান, তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) সংগ্রাম-দুস্তর পথে দিয়েছি এ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন।

(খ) ঋতুচক্রে ভ্রাম্যমান দিন তব বিচিত্র মধুর।

(গ) সম্পদে পাহাড় গড়ি এক কণা দাওনি যাকাত।

(ঘ) মানুষ হয়ে হায়ওয়ানাত করেছ বরণ।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "এই সূর্য পরিক্রমা এই স্নিগ্ধ চাঁদ-সেতারার
অনির্বাণ প্রেমে নিত্য প্রাণ-বহ্নি জ্বেলেছি তোমার।"

(খ) "দিয়েছি সহস্র নিয়ামত,
বিচিত্র জ্ঞানের পথে পৃথিবীর সেরা সুলতানাত—দিয়েছি।"

(গ) "সে প্রতিজ্ঞা মনে কর আজ
প্রেম-প্রীতি-মমতায় সে মহান মানব সমাজ—গড়েছ কি ?"

www.pathagar.com

(ঘ) "মানুষের পদপিষ্ট শতশত এতিম সন্তান
লুব্ধতার চক্রতলে পলে পলে দিয়ে যায় প্রাণ।"

(ঙ) "হাতের নিশান আছে, বক্ষে তার স্বাক্ষরের ছাপ
রাখোনি অম্লান করি।"

(চ) "মনে কর, মনে কর, প্রিয়তম হে বান্দা আমার
ইবলিসের সাহংকার কি কথার জবাবের ভার—তোমাকে দিয়েছি কবে।"

৪। টীকা লিখ :—

ফরমান, নিয়ামত, যাকাত, আশরাফ, মিল্লাত, আত্‌রাফ, ইবলিস।

৫। "ফরমান" শীর্ষক কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ লিখ।

নতুন সফর

এই কবিতাটি কবি ফর্‌রুখ আহমদ-রচিত কবিতা-সমষ্টি হইতে সংকলিত। বাংলার রবীন্দ্রোত্তর-যুগের কবিদের মধ্যে ফর্‌রুখ আহমদের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ইসলামী রেনেসাঁ-পন্থী কবি। নজরুল যে-ইসলামী ভাব-বন্যায় বাংলা-কাব্য-সাহিত্যকে পরিপ্লাবিত করেন, ফর্‌রুখ আহমদ সেই ভাবধারার অনুসারী হইলেও রচনা-শৈলী ও আঙ্গিকের দিক দিয়া ফর্‌রুখ আহমদের কবিতায় তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গী ও স্বকীয়তার স্বাক্ষর অত্যন্ত দেদীপ্যমান। তাঁহার ভাষা উদ্দাম বন্যা-স্রোতের মত বেগমান ও তীক্ষ্ণ, এবং ভাবাবেগ—ফেনিল ও আবর্ত-মুখর ; কিন্তু তাঁহার কাব্যের চরম ও পরম লক্ষ্য, মহাসাগরের ধ্যান-গম্ভীর স্তব্ধ অতলতার চির প্রশান্তি। তাঁহার লেখার এই যে দুইটি ধারা—চরম গতি ও পরম স্থিতি, ধ্বংসের বন্যা-স্রোত আর সৃষ্টির নিতল স্তব্ধতা—গভীর সাগরের স্তব্ধ তলদেশে শুক্তির বুকে মুক্তা সৃজনের নীরব ধ্যানপরায়ণতা—ইহাই তাঁহার কাব্যকে পূর্ণতা ও একটা সুসমঞ্জস সামগ্রিকতা দান করিয়াছে। এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের নবতর ভাষা-ভঙ্গীর মাধ্যমে আরবী-ফার্সী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলাম—এ সম্পর্কে প্রভূত পারদর্শিতা ও অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, একথা সত্য ; কিন্তু ফর্‌রুখ আহমদ এই ধারাকে বাংলা কাব্যের অত্যাধুনিক আঙ্গিকের সঙ্গে এমন বেমালুমভাবে খাপ খাওয়াইয়া দিয়াছেন যে, এই আরবী-ফার্সী শব্দনিচয় যে অন্য ভাষা হইতে আমদানী করিয়া এখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে—একথা মনেই হয় না। সুদক্ষ চিত্র-শিল্পী তাঁহার তুলির দুই-একটি টানে তাঁহার চিত্রের বুকে যেমন নূতন আবহাওয়া, নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করেন, ফর্‌রুখ আহমদও তেমনি সুপ্রযুক্ত ও সুনির্বাচিত কয়েকটি আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগে তাঁহার কাব্যের বুকে এক নতুন স্বপ্নময় পারিপার্শ্বিকতার সৃজন করেন।

আলোচ্য কবিতায় কবি ইসলামের নব জয়-যাত্রার উদ্বোধন-গান গাহিয়াছেন। তিনি আরব্য-উপন্যাসের অদ্ভুত-কর্মী। সিন্দাবাদকে মুসলমান জাতিরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে আবার নূতন দিগ্বিজয়ী সফরে বাহির হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতেছেন। নাতিদূর অতীতে যে-মুসলমানেরা ছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, শিক্ষা-সভ্যতা ও শক্তি-গৌরবে যাঁহারা ছিলেন সারা জগতের শিরোভূষণ—কালের চক্রে তাঁহাদেরই জীবনে আসিল অবসাদ। কয়েক

শতাব্দী ব্যাপিয়া তাঁহারা মোহ নিদ্রায় অঘোরে ঘুমাইয়া কাটাইলেন। ফলে, যে-জাতি ছিল জগতের সকলের অগ্রগণ্য, সেই জাতিই পড়িয়া রহিল সকলের পশ্চাতে। অতীতের সেই বিলাস-মোহ, সেই ক্লান্তি ও ব্যর্থতা আজ ভুলিয়া গিয়া অগ্রপথের সমস্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ ও বাধা-বিঘ্নকে পদ-দলিত করিয়া নব যাত্রায় বাহির হইবার জন্য কবি এ কবিতায় মুসলমানদিগকে বারম্বার তাগিদ দিতেছেন এবং স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, আত্মত্যাগ ও শাহাদতের পূত রক্ত-ধারায় স্নাত না হইতে পারিলে কোন জাতিরই নব জাগরণ ও নব উত্থান সম্ভবপর নয়। শাহাদৎ ও জিহাদ ইসলামের চিরন্তন ঐতিহ্য। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো নিকট যাঁহার শির নত হয় না, সেই যথার্থ মুসলমানের জন্য এই স্বার্থ-কলুষময় জগতে জিহাদ অর্থাৎ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শাহাদৎ অর্থাৎ সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে ও ধর্মের পথে আত্মাহুতি দান—নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। প্রকৃত মুসলমানের এই জিহাদ ও শাহাদতের পথে নূতন জীবন-সন্ধানে বাহির হইবার জন্য কবি আলোচ্য কবিতায় আজিকার মুসলমানদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন।

টীকা

সিন্দবাদ—"আলফা। লাইলাতাও ওয়া লাইলাহ্" অর্থাৎ "সহস্র ও এক রজনী" নামক বিশ্ব-বিখ্যাত আরবী গল্পগ্রন্থ—যাহাকে এদেশে "আলেফ লায়লা" বা "আরব্যোপন্যাস" (Arabian Nights) বলা হয়—তাঁহার একটি গল্পের নায়ক হইলেন সিন্দবাদ। তিনি একজন অদ্ভুতকর্মী ও দুঃসাহসী সওদাগর ছিলেন। তিনি তাঁহার বাণিজ্য-বহর লইয়া সাতবার সমুদ্র-যাত্রা করেন এবং বহু বিপদ-আপদের ভিতর দিয়া পৃথিবীর বহু অজানা দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং ঐসব দেশের পাহাড়-পর্বত, পশুপক্ষী ও অধিবাসীদের বিচিত্র জীবন-যাত্রা প্রণালী দর্শন করিয়া তিনি স্বয়ং প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন ও সেগুলি প্রচার করিয়া জগৎবাসীকে বহু জ্ঞান-গর্ভ তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা দেন। শঙ্কট-শঙ্কুল তাঁহার এই সকল সফরের ফলে প্রভূত বিত্তবান হইয়া পৃথিবীতে পুরুষাকারের জয় অবশ্যম্ভাবী, এ সত্যও তিনি প্রমাণ করেন।

শহীদী—আরবী শব্দ ; "শহীদ" শব্দকে বাংলা ব্যাকরণানুযায়ী বিশেষণ করিয়া "শহীদী" করা হইয়াছে। "শহীদ" শব্দের অর্থ : ধর্ম বা ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ-দানকারী (Martyr)। অন্য কোন কারণে মৃত বা নিহত ব্যক্তিকে "শহীদ" বলা হয় না। "শহীদ" শব্দের গুণ-বাচক বিশেষ্য হইল "শাহাদৎ"।

কাবা—এই পুস্তকের "জিন্দা পাকিস্তান" শীর্ষক কবিতার "কাবা" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

জিহাদ—আরবী শব্দ ; অর্থ : ধর্ম-যুদ্ধ, অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আল্লাহ্--এই পুস্তকের "না'ত" শীর্ষক কবিতার "আল্লাহ্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

আল্-আহাদ--আরবী শব্দ ; অর্থ : সেই এক (আল্লাহ্) ; সেই অদ্বিতীয় এক (আল্লাহ্) ; The One. "আল্"—অর্থ : সেই, The. "আহাদ" অর্থ : এক।

বনি আদম--ইসলাম, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী—পৃথিবীর এই প্রধান তিন ধর্ম অনুসারেই আদি মানব হইলেন আদম (Adam)। "বনি-আদম" অর্থ : আদম-সন্তান অর্থাৎ মানব জাতি। "হে মানুষ" শীর্ষক কবিতার "আদম-সন্তান" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

খিযির--অন্য উচ্চারণ : খিয্র ; শব্দার্থ : চির সবুজ। প্রচলিত অর্থে : একজন তপ:সিদ্ধ, মহাজ্ঞানী, চিরজীবী মহাপুরুষ। হযরত মুসা (আ:) আল্লাহ্র আদেশে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি জ্ঞান-গর্ভ শিক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে, আল্লাহ্‌র পথের সত্যকার পথিকদিগকে তাঁহাদের সঙ্কটের সময় তিনি সত্য-পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

প্রশ্নাবলী

১। "নতুন সফর" শীর্ষক কবিতার সারমর্ম তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী।

(খ) কে ছোটে হারানো গীতিকার পিছে মিথ্যাময়ী।

(গ) মুক্ত ভোরের প্রথম সূর্য চির আযাদ।

(ঘ) শহীদী রক্তে খুঁজে নিতে প্রাণ নাও শপথ।

(ঙ) জিহাদের মাঝে জানি শুধু আছে জিন্দেগানি।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "কারা বাধা দেয়? কূপ মণ্ডুক কে ভীরু প্রাণী?
চার দেয়ালের সীমানার ঘের মোরা না জানি।"

(খ) "আয়েশী রাতের বায়ুতে আত্মসমর্পণ
ভুলে যাও তুমি সে অপমৃত্যু—কাল মরণ।"

(গ) "জ্বালাও যয়ীফ মুর্দা দিলের আবর্জনা,
নিত্য-নূতন পুতুল পূজার এক লাঞ্ছনা।"

(ঘ) "জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি,
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দিগানি।"

(ঙ) "কাবা-কেন্দ্রিক জীবনের এই পরিক্রমা,
ক্লান্ত রাতের সংশয় মনে রেখোনা জমা।"

৪। টীকা লিখ :—

সিন্দবাদ, জিহাদ, বনি আদম, খিযির, শহীদী।

৫। "নতুন সফর" শীর্ষক কবিতাটির যে-স্তবকের প্রথম চরণ : "জিহাদের মাঝে জানি শুধু আছে যিন্দিগানি"—সেই স্তবকটি মুখস্থ লিখ।

হে অভিযাত্রিক

এই কবিতাটি কবি তালিম হোসেন-রচিত কবিতা-সমষ্টি হইতে সংকলিত। বাংলার আধুনিক মুসলিম কবিদের মধ্যে তালিম হোসেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার ভাষায় ও চিন্তা ধারায় একটা গাম্ভীর্য ও স্থিতধী আত্মসমাহিততার স্বাক্ষর লক্ষণীয়। কাব্য জগতে তিনি স্রোতের ফুল নহেন—আদর্শের বন্দরে তাহার নোঙ্গর যথেষ্ট মজবুত ও শক্ত। ইসলামী রেনেসাঁ-পন্থী কবিদের তিনি অন্যতম নকীব।

www.pathagar.com

এই কবিতায় কবি সত্যের সৈনিকের সত্য-পথাশ্রয়ী অভিযানের জয়-গান গাহিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য হইল : মানবতার লুণ্ঠিত অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য যে অভিযান, তাহার পশ্চাতে সত্যের অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে। মানবতা-বিরোধী মিথ্যা শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের সৈনিককে কোন ভয়ে, কোন বাধায় যেমন দমিত হওয়া চলিবেনা, তেমনি তাহার সংগ্রাম, মানবতার নামে পরিচালিত বলিয়া, তাহা অন্যায়-পথাশ্রয়ী বা আক্রমণধর্মী হওয়াও তাহার পক্ষে অবিধেয়। সত্যের সৈনিকের জয় অখণ্ড মানবতারই জয়। আলোচ্য কবিতায় ইহাই কবির বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে কবিতাটির এই ভাবধারা পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযমের নিকট হইতেই গৃহীত। পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় তাঁহার "Live and let live" অর্থাৎ "নিজে বাঁচো এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও"—বাণীরই কাব্যরূপ।

প্রশ্নাবলী

১। "হে অভিযাত্রিক" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে মিথ্যা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যের সৈনিকের সংগ্রাম কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহা তোমার নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "তোমার সম্মুখে আজ শোনিতাক্ত যুদ্ধের ময়দান।
তোমার পশ্চাতে আজো প্রেত-ছায়া—যিন্‌জীর যিন্দান।"

(খ) "অন্যায় যে করে নাই, ন্যায়-যুদ্ধে সে বিজয়ী বীর,
ভেঙ্গে পড়ে তার পথে অসত্যের পাষাণ প্রাচীর।"

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাৎপর্য লিখ :—

(ক) "দুর্যোগ-রাত্রির পারে শুধু তব জর্জরিত প্রাণ,
মুক্তির আলোকে চায় জীবনের সঠিক সন্ধান।"

(খ) "তোমার সংগ্রাম সে যে মানুষের মুক্তি-অভিযান,
তোমার বিজয় তার জীবনের পুণ্য অবদান।"

কায়েদে আযম

এই কবিতাটি সৈয়দ আলী আহ্‌সান-রচিত কবিতা সমষ্টি হইতে সংকলিত। বাংলার আধুনিক কাব্য-আসরে সৈয়দ আলী আহ্‌সান একটি স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ভাষা সুন্দর, ছন্দ সুগঠিত ও ত্রুটিহীন এবং চিন্তাধারা গভীর ও সুদূর-প্রসারী। তিনি ব্যক্তি জীবনে পণ্ডিত লোক এবং তাঁহার রচনায় পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির দীপ্তি প্রত্যক্ষ।

এই কবিতাটি কায়েদে আযমের তিরোধানে পাকিস্তানী জাতির মতে—বিশেষ করিয়া মুসলমানদের অন্তরে কায়েদে আযমের বিরাট ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব মনীষা এবং জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য তাঁহার অতন্দ্র সাধনার যথার্থ উপলব্ধি তাঁহার শূন্য আসনের পরিপ্রেক্ষিতে যে-পরিপূর্ণ স্বরূপ লইয়া দেখা দিল, প্রধানতঃ তাহারই কাব্য-রূপ।

www.pathagar.com

টীকা

সাফা-মারওয়া—মক্কার সংলগ্ন দুইটি পাশাপাশি পাহাড়। হযরত ইব্রাহীমের (আ:) দ্বিতীয়া পত্নী বিবি হাযেরা স্বীয় শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল (আ:) সহ বর্তমান মক্কা নগরী যে-স্থানে অবস্থিত, তদানীন্তন আরবের সেই পাহাড়-ময় মরু-অঞ্চলে স্বামী কর্তৃক নির্বাসিতা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদের আহার্য ও পানীয় ফুরাইয়া যায়। তখন ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পানির অন্বেষণে তিনি নিকটবর্তী সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটি করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে শিশু হযরত ইসমাঈল (আ:) যে-স্থানে শায়িত ছিলেন, সেখানে তাঁহার পদাঘাতে আল্লাহ্র করুণায় একটি উৎসের সৃষ্টি হয়। সেই উৎসই বর্তমানে মক্কার বিশ্ব-বিখ্যাত যম্ যম্ কূপ। বিবি হাযেরার সেই দুঃসহ দুঃখের দিনে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে তাঁহার ছুটাছুটির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এবং কিরূপ চরম দুঃখের ভিতর পরম ধৈর্য ও বিশ্বাসের সহিত আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিতে পারিলে, তবেই সেই পরম পরমা আল্লাহ্কে পাওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য আজও প্রতি বৎসর হজ্জ্-এর সময় তীর্থ যাত্রীদিগকে হজ্জ্-ক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ উক্ত সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার ছুটাছুটি করিতে হয়। ["ফাতেহা-ই-দোয়ায-দহম" শীর্ষক কবিতার "যম্যম্" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।]

যাজিরাতুর আরব—আরবী বাক্যাংশ। "যাজিরা" অর্থ : দ্বীপ। কাজেই "যাজিরাতুল আরব" অর্থ : আরব দ্বীপ। কিন্তু প্রচলিত অর্থ : আরব উপদ্বীপ। প্রকৃতপক্ষে উপদ্বীপকে আরবী ভাষায় "যাজিরা নোমা" বলা হয়।

কায়েদে আযম--আরবী শব্দ। "কায়েদ" অর্থ : নেতা ; "আযম" অর্থ : সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববৃহৎ। কাজেই "কায়েদে আযম" এর শাব্দিক অর্থ : "সর্বপ্রধান নেতা"। কিন্তু প্রচলিত অর্থ : পাক্-ভারতীয় মুসলমানদের—বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের সর্বপ্রধান নেতা মরহুম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। বর্তমান জগতের মহত্তম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র : ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান। সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল রাজনীতিবিদদের অন্যতম এবং একদিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও রক্তপাত ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই কিন্তু কায়েদে আযম কোনরূপ রক্তপাত না করিয়া শুধু অপূর্ব চরিত্র বল, অটল নিষ্ঠা ও কঠোর সততা এবং সর্বোপরি দুর্বার সংকল্প ও অবিচল আদর্শ-প্রাণতার সহায়তায় পাকিস্তানের মত একটি বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে সফলকাম হন। জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

রসূল—এই পুস্তকের "না'ত" শীর্ষক কবিতার "রসূল" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

খালিদ—এই পুস্তকের "উমর ফারুক" শীর্ষক কবিতার "মহাবীর খালিদ" সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

১। কায়েদে আযমের জীবনের প্রভাব পাক-ভারতীয় মুসলমানদের--বিশেষতঃ পাকিস্তানবাসীদের জীবনে কতখানি ব্যাপক ও কার্যকরী ছিল, তাহা "কায়েদে আযম" শীর্ষক কবিতার অনুসরণে তোমার নিজ ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "আমাদের দিগন্তের শেষ রশ্মিপাতে
নেমেছে রাত্রির চাঁদ—অন্ধকারে হয়নি মলিন।"

www.pathagar.com

(খ) "আমরা জেগেছি তোমার আভায় প্রতিদিন প্রতিরাত,
আমরা দেখেছি জীবনের আলো দীপ্য অকস্মাৎ,
আমরা দেখেছি সৌর–বলয় মাটিতে এনেছে দিন,
আমরা দেখেছি রাত্রির তারা আসমানে রঙ্গিন।"

(গ) "অনুর্বর প্রহরে আমার—প্রাণ দিলে সুর দিলে তুমি,
আমার মৃত্তিকালব্ধ ফসলের ভিত্তিভূমি তুমি।"

(ঘ) "তুমি সে সূর্যের দিন, তুমি তার আরম্ভের প্রভা,
সবুজের সমারোহে জীবনের দগ্ধ দিন যত
প্রাণের বহ্নির মোহে জেগে উঠে নতুন সঙ্গীতে—
অপূর্ণ জীবন আজ পরিপূর্ণ হল বন্ধু তোমার ইঙ্গিতে।"

(ঙ) "পেয়েছ প্রাণের নিবিড় অর্ঘ্য—দিয়ে গেলে পূর্ণতা,
তোমার জীবন মিথ্যা করেছে সমস্ত উপকথা।"

(চ) "সাফা–মারওয়ার দুর্গম রাতে পানির নহর জাগে,
ক্লান্ত প্রহরে আমাদের দিন কেঁপেছিল অনুরাগে।"

৩। টীকা লিখ :—

কায়েদে আযম, সাফা–মারওয়া, যাজিরাতুল আরব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রবন্ধ-মালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম ও কমিউনিজম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

"ইসলাম ও কমিউনিজম" কবি বেনজীর আহমদ বিরচিত একটি মৌলিক সারগর্ভ পুস্তিকা। এতে চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুগ বা জ্ঞানীদের জন্যে প্রচুর চিন্তার খোরাক আছে। এ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে কবি বে-নজীর আহমদ কমিউনিজমের পরিবর্তন এবং সংশোধন সম্পর্কে যেসব মন্তব্য ও ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তার সবগুলিই এ ত্রিশ বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 'ইসলাম ও কমিউনিজম' পুস্তিকাটি পড়ে মনে হয় কবি বে-নজীর আহমদ শুধু যে কবিই ছিলেন তা নয়, দার্শনিক তত্ত্বের সুষ্ঠু এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণে তিনি সমান দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন যদি তিনি দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পুস্তক রচনায় মনোযোগী হতেন।

কবি বে-নজীর আহমদ কমিউনিজমকে কুফর এবং কমিউনিষ্টদেরকে কাফের মনে করতেন এবং কেন তা মনে করতেন তিনি তার শরিয়ত সম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একাধিক ঈশ্বরের পূজাকে তিনি শিরক বা অংশীবাদিতা এবং দেবদেবীর পূজারীকে তিনি মুশরেক বলেছেন। কমিউনিজম তার মতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে শিরক অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক কারণ ইহা কুফর।

কবি বে-নজীর আহমদের মতে "কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনরূপ ধর্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক করা ইসলামী শরিয়ত বা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম" (এই পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠা)। কবি বেনজীর আহমদ এ বিষয়টি সম্বন্ধে মুসলিম যুবকদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন "প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ করিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান তরুণের ইসলামের এ কঠোর বিধান ও তাহার অন্তর্নিহিত কারণের প্রতি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত (পৃষ্ঠা ১৩)। এই পুস্তিকাটি পাঠে ইসলাম ও কমিউনিজমের সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠে।

কমিউনিজমের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক ছিলেন কার্ল হেনরী মার্কস নামক একজন জার্মান দার্শনিক। তিনি ছিলেন একজন নাস্তিক এবং ইহুদী। ইহুদিগণ আমাদের নবীর সময় হতে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমানদের দুশমনী করেছে, তাদের ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদের উপর হামলা চালিয়েছে। মুসলমান তরুণদের ঈমান আকিদার উপর সবচেয়ে বড় হামলা করেছে যে ইহুদী তার নাম কার্ল মার্কস। কার্ল হেনরী মার্কস মুসলিম সমাজে যে পরিমাণ কুফরীর বীজ ঢুকিয়েছেন এবং যত মুসলিম যুবককে বেঈমান এবং কাফেরে রূপান্তরিত করেছেন ইসলামের অন্য কোন দুশমন এতবেশী করতে পারেন নি। এদিক দিয়ে কার্ল মার্কস অবশ্যই সার্থক এবং সফলকাম।

ইসলামের দার্শনিক ভিত্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস আর কমিউনিজমের দার্শনিক ভিত্তি নাস্তিক্যবাদ। আগুন আর পানি, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে পার্থক্য এবং তফাত যতটুকু নাস্তিকতাবাদী আদর্শ কমিউনিজম এবং তৌহিদি আদর্শ ইসলামের মধ্যে পার্থক্য ততটুকু।

www.pathagar.com

ইসলাম একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সামাজিক জীবনবিধান। ইহা সামগ্রিক এবং সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন বা সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গতা অসম্পূর্ণ এবং আংশিক হতে পারে না। এমন অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখা যায়, যারা নামাজ নিয়মিত পড়েন, জামাতে যান, সারা রমযান মাস রোযা রাখেন, হজ্জ্ব করেন, কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা গণতন্ত্রী অর্থনৈতিক মতাদর্শে সমাজতন্ত্রী তারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেন এবং নিজেদেরকে ভাল মুসলিম বলেও দাবী করেন। তাদেরকে কি বলা যায়? তারা কি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক জীবনবিধান হিসাবে বিশ্বাস করেন? ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ খেলাফত, অর্থনৈতিক আদর্শ নবুবিয়াত বা প্রতিপালনবাদ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ আদর্শের নাম ইসলাম এবং এই আদর্শে বিশ্বাসীকে বলা হয় মুসলিম।

যিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতন্ত্রী, তিনি কি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহম্মদ (দ:) কে নিজেদের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য আদর্শ হিসাবে বিশ্বাস করেন? তাদের দৃষ্টি কি মদীনার মসজিদ-এ-নববীর দিকে বা বৃটিশ পার্লামেন্ট, হোয়াইট হাউজ না ক্যাপিটল হিলের দিকে? তাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব কি আবুবকর বা উমর বা আলী অথবা জেফারসন, লিংকন, ওয়াশিংটন, ম্যাকডোলাণ্ড, চার্চিল, নেহরু, হ্যারোল্ড উইলসন? যিনি সমাজতন্ত্রী তিনি কি তবু মতদর্শ খুঁজে পান পবিত্র কুরআন হাদিসে অথবা কার্ল মার্কস এর ডাস ক্যাপিটালে অথবা, লেনিন, মাও সেতুং-এর রচনায়?

যদি কেহ ভাবে যে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে কুরআন ঠিকই আছে, সকালবেলা ইহা তেলাওয়াত করব, বুকে লাগাব, চুমা দেব এবং আয়াত লিখে গলায় তাবিজ বাঁধব ; কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা যুগোপযুগী নয়, খেলাফতের চেয়ে গণতন্ত্র ভালো, তবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবনবিধান প্রদানের যোগ্যতা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র উপর তার ঈমান কতটুকু? যদি কেহ মনে করে মধ্যযুগের পশু-পালন স্তরের অর্থনীতি বা বড় জোর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনায় কুরআনের আর্থনীতিক বিধান পর্যাপ্ত ছিল কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংক ইনসিউরেন্স ইত্যাদি অপরিহার্য, অথবা মানবকল্যাণের জন্যে শুধু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান নয়, মুদি দোকান, পান-বিড়ির ষ্টল পর্যন্ত জাতীয়করণই আদর্শ বিধান তবে কুরআনে প্রদত্ত অর্থনৈতিক বিধানের উপর তার আস্থা কতটুকু রইল? যে সমস্ত মুসলিম সন্তান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিধানের জন্যে কুরআন হাদিস বাদ দিয়ে অন্য গ্রন্থের সন্ধান করে তারা কি ইসলামকে সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হিসাবে বিশ্বাস করে?

মানুষের জন্যে সর্বোত্তম জীবনবিধান দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস যার নাই, তিনি হলেন আংশিক ঈমানদার বা মুশরিক। যারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনদর্শানোর জন্যে কুরআন হাদিস ছেড়ে কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং, লক, হিউম, এরিষ্টটোল, প্লেটোর দিকে তাকায় তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক করেন। জ্ঞানবুদ্ধির জন্যে তাদের গ্রন্থ পড়া যায় কিন্তু আদর্শ হিসাবে গ্রহণের জন্যে নয়।

কারও পক্ষে আংশিক মুসলমান হওয়া সম্ভব কিন্তু আংশিক ঈমানদার হওয়া যায় না। আংশিক মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার কুরআন হাদিসে আল্লাহ্‌ রসুলে পূর্ণ ঈমান আছে কিন্তু কুসংসর্গ এবং অন্যান্য কারণে সুদ খায়, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কথা বলে, চুরি করে, ডাকাতি

www.pathagar.com

করে কিন্তু না ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এতে পূর্ণ আস্থাশীল। এরূপ ব্যক্তিকে বেঈমান বলা যায় না তাকে বলা যেতে পারে গুনাহ্গার মুসলমান। বিশ্বাসের মধ্যে তার কমতি নেই কিন্তু আমলের দিকে তার কমতি আছে। অবশ্য ঈমানের দিকে পূর্ণ হলে আমলও ঠিক হয়ে যায়।

এমন এক ব্যক্তির কথা ভাবুন যিনি নামাজ, রোযা, হজ্জ, কুরবানী রীতিমতই করেন কিন্তু মনে মনে ভাবেন নামাজ পাঁচ বেলা পড়া ততটুকু কি দরকার, সকাল সন্ধ্যায় ভালো করে বেশী সময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়লেই তো হয়, হজ্জ করতে গেলে বেহুদা সময় নষ্ট হয় এ টাকা অনেক ভালো কাজে খাটান যায়, কুরবানীতে অযথা পশুসমূহ নষ্ট হয়, শ্রমিকদের জন্যে রোযা ফরজ নয়, তবে বুঝতে হবে তার বিশ্বাসের মধ্যেই গণ্ডগোল আছে। কিন্তু আর এক ব্যক্তি এমন হতে পারে, যিনি নামাজ রোজার ধার ধারেন না, হজ্জে যাননি, কুরবানী করেন না, কিন্তু এগুলোর যথার্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন না তিনি গুনাহ্গার মুসলিম বা আংশিক মুসলিম কিন্তু বেঈমান নন। কিন্তু যারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দর্শন হিসাবে ইসলামকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে গ্রহণ করেন তাদের তো ঈমানের ক্ষেত্রে এবং গোড়াতেই গণ্ডগোল। তাই কবি বেনজীর আহমদ তার ইসলাম ও কমিউনিজম পুস্তিকার কমিউনিজমকে কুফর এবং "কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনরূপ ধর্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক করা ইসলামী শরিয়ত বা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম" বলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা অনেকের নিকট অপ্রিয় মনে হলেও ইসলামের নিজস্ব এবং মনগড়া ব্যাখ্যা না করলে তা আমাদেরকে মেনে নিতে হয়।

আ, জ, ম, শামসুল আলম

www.pathagar.com

ইসলাম ও কমিউনিজম

বিগত কয়েক বৎসর যাবত—বিশেষ করিয়া বর্তমান মহাযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদানের পর ভারতের একশ্রেণীর মুসলমান তরুণের মধ্যে কমিউনিজমের প্রতি একটা আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমান মহাসমরের পূর্ব হইতেই ভারতীয় কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারত সকার কর্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষাক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে নবাগত মুসলমান তরুণদের ভিতর কমিউনিজমের প্রচার তেমন ব্যাপকভাবে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ১৯৪১ সালে জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাশিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদানের ফলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উপর আরোপিত ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞাই যে শুধু প্রত্যাহৃত হইল তাহা নহে—কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ার স্বপক্ষে সারা ভারত জুড়িয়া বহুল প্রচারেরও সুযোগ এবং সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। ভারতের কমিউনিস্টকর্মীগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। দেখিতে দেখিতে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা-স্নাত অন্যান্য আধুনিক সংস্কৃতি-কেন্দ্রসমূহ অক্লান্ত-পরিশ্রমী কমিউনিস্ট প্রচারকদের অবিরাম প্রচেষ্টায় কমিউনিজম সম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। ফলে বহু সংখ্যক ভারতীয় তরুণ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করিল এবং আরও বহু সংখ্যক কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। এই উভয় শ্রেণীর তরুণদের মধ্যে অমুসলমানদের সংখ্যাই অসম্ভবরূপে বেশী—সমগ্র সংখ্যার শতকরা ৯৫ জনেরও বেশী তাহারাই। তথাপি এই সম্পর্কে মুসলমানদিগের পক্ষে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টভাবাপন্ন শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচ জনের কাছাকাছি হইলেও তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে, কারণ এই সংখ্যা হইল জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র শিক্ষিত কমিউনিস্ট তরুণদের মোট সংখ্যার আনুপাতিক হিসাব। শুধু মুসলমান শিক্ষিত তরুণদের মোট সংখ্যার হিসাবে যদি এই সংখ্যার অনুপাত বাহির করা যায় তবে তাহা দাঁড়াইবে শতকরা পাঁচের অনেক বেশী। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানদের পক্ষে ইহা উদ্বেগের কথা—সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ নিঃস্ব কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অত্যধিক। কমিউনিস্টদের কর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হইল এই কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী। এ ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টগণ নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই। ফলে এই শোষিত নিঃস্ব শ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই প্রভাবান্বিত লোকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য নহে। এই সকল বাস্তব তথ্য সম্মুখে রাখিয়া মুসলমানদিগকে আজ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, কমিউনিজমের প্রতি তাহাদের সত্যিকার মনোভাব ও ব্যবহার কি হওয়া উচিত।

এই সম্পর্কে ভাবিতে গেলে প্রথমেই এই প্রশ্ন জাগে, কমিউনিজম ইসলামের তথা মুসলমানের বন্ধু না শত্রু। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে অন্ততঃ

www.pathagar.com

কতকগুলি বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এক। ইসলাম চায় সমাজ-সাম্য—ও জাতি-সাম্য—ইসলামে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণ-শূদ্র বলিয়া কিছু নাই ; আরবী ও কাফ্রীর মধ্যে ইসলাম কোনো কৌলিন্যগত পার্থক্য স্বীকার করে না। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকতা ইসলামের নিকট পাইয়াছে বাস্তব ও কার্যকর স্বীকৃতি—চীনা মুসলমান আর মিসরী মুসলমান চিরদিনই ভাই-ভাই, দেশের ও জাতির ভৌগোলিক সীমারেখা সেই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে না। কমিউনিজমও চাহে আন্তর্জাতিকতা, দুনিয়ার শ্রমিক এক হও—তাহারই বাণী। ধন-সাম্যও ইসলামের কাম্য—যাকাৎ আদায়ের কঠোর বিধানের ভিতর দিয়া সে সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে চায়। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক প্রথম যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হন, বিশেষতঃ খলীফা কর্তৃক মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ ঘোষিত হয় তাহা হইল যাকাৎ প্রদান অস্বীকৃতির ফলে। ইহাতেই অনুমিত হয় যাকাৎ আদায় ইসলামের চক্ষে কত বড় অপরিহার্য কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে, যাকাৎ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্রেরই প্রাপ্য। ইহার উপর দরিদ্রের হক্ বা ইসলামী আইনগত দাবী ও অধিকার আছে, দরিদ্রদের প্রতি ইহা অনুগ্রহের দান নহে। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, রসূলুল্লাহ্ (স:)-এর আমলে ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর সময় যখন যাকাৎ পূর্ণভাবে আদায় হইত তখন মুসলিম রাষ্ট্রে মিসকীন বা দরিদ্র বলিয়া কিছু ছিল না বলিলেই চলে। কমিউনিজমও দেখিতেছি ধন-সাম্য চাহে এবং দারিদ্র্য বিদূরণের জন্য বদ্ধপরিকর। অবশ্য তাহার পন্থা ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

অবস্থা যদি ইহাই হয় তবে কমিউনিজমের সহিত ইসলামের কোন বিরোধ থাকিবার কথা নহে—বরঞ্চ কমিউনিজমকে সমর্থন করাই মুসলমানের উচিত। বস্তুতঃ এই বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতেই অনেক শিক্ষিত মুসলিম তরুণ কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেজন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। ইসলামের মূলনীতি ও প্রকৃত শিক্ষা কি—পরাধীনতার ফলে এবং তুলনা ও বিশ্লেষণমূলক চর্চার অভাবে আমরা প্রায় সকলেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার ফলেই ইসলামের যুক্তিবাদকে অবহেলা করিয়া আজ সাধারণতঃ আমরা অন্ধবিশ্বাসের গায়ের জোরকেই দিয়াছি প্রাধান্য। তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যুক্তিবাদী পশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের নব্য যুবকেরা ইসলামের প্রতি অবলম্বন করিয়াছে একটা নিস্পৃহ দূরত্বের ভাব। এমন সময় পাশ্চাত্য দেশ হইতে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি ও আদর্শবাদী কমিউনিজম আসিল এদেশে এক নূতন আশা লইয়া। তখন প্রথম বিশ্বসমরের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় আদর্শের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও ভূয়া ডেমোক্রেসীর মৃত কঙ্কালের উপর দাঁড়াইয়া জগৎ দিশাহারা, নব আদর্শ সন্ধানে ব্যাকুল। কমিউনিজম দিল সেই আদর্শের আপাতসন্ধান। তরুণেরা চিরদিন আদর্শবাদী। নূতন কমিউনিজমের আদর্শকে তাই তাহারা লইল লুফিয়া। যে-কারণে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রের পতনের পর ইউরোপের রেনেসাঁ-আলো-দীপ্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি আলীগড় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলিম ভারতের সর্বত্র হইল গৃহীত, সেই একই কারণে বিগত মহাসমরে ইউরোপের রাষ্ট্র-আদর্শের পতনের পর ভারতে ও জগতের অন্যত্র কমিউনিজমের আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে নিজের স্থান করিয়া লইবার সুযোগ পাইল। প্রাক-মহাসমরীয় ইউরোপীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্র-আদর্শের প্রয়োজনীয়তা যে এক সময়ে অত্যন্তই ছিল তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে প্রয়োজনীয়তা ছিল সাময়িক। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই সে প্রয়োজনীয়তা গিয়াছিল নিঃশেষ হইয়া। তথাপি তাহাকে অনাবশ্যক আঁকড়াইয়া

www.pathagar.com

ধরিয়া রাখার ফলে তাহাকে বিদূরণের জন্য প্রয়োজন হইল মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-আদর্শ চালিত জগতে কমিউনিজমের উদ্ভবেরও প্রয়োজন রহিয়াছে—একথা স্বীকার করিলে দোষ নাই। কিন্তু সে প্রয়োজনও সাময়িক এবং সীমাবদ্ধ। অনতিদূর ভবিষ্যতে আর এক প্রচণ্ড আঘাতের ভিতর দিয়া জগৎ যে ইহার "সাময়িকত্ব" বুঝিতে পারিবে তাহার চিহ্ন কিছু কিছু ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। ইউরোপের রেনেসাঁ-আন্দোলনের আদর্শ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শ—এই দুই আদর্শের মধ্যে বহু বিষয়ে বিভিন্নতা—এমন কি প্রবল বিরোধিতা থাকিলেও এক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অনেকটা ঐক্য রহিয়াছে। তাহা হইল উভয়ের জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী। রেনেসাঁ-আন্দোলন-উদ্ভুত ইউরোপের নব সভ্যতার বাহ্যিক আবরণে খৃস্টধর্মের ছাপ থাকিলেও অন্তরে অন্তরে ইহা ছিল মিল্-বেন্থামের নিরীশ্বরবাদ ও জড়বাদের পূর্ণ সমর্থক। কমিউনিজম তো নিরীশ্বরবাদ ও জড়বাদেরই সন্তান।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণের পর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রথম দেখা দিয়াছিল মত্ততা ও বিভ্রান্তি। কিন্তু মুরিস মুসলমানগণ কর্তৃক বাহিত স্পেনীয় ইসলামী সভ্যতার যে-প্রদীপ্ত মশাল হইতে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ইউরোপীয় নব সভ্যতার জন্ম, ভারতীয় মুসলমানগণ যখন ইউরোপীয় সভ্যতায় ভিতর দিয়াই সেই মূল ইসলামী সভ্যতার সন্ধান পাইল তখনই তাহারা সুস্থ ও স্বস্থ হইতে পারিল। আজ তাই দেখিতে পাই আলীগড় হায়দরাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রকৃত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারাই বিশ্বময় প্রচারিত হইতেছে। ঠিক তেমনিভাবে আজ যে সকল মুসলিম শিক্ষিত তরুণ কমিউনিজমের ভিতর জীবনাদর্শের সন্ধান খুঁজিতেছেন তাঁহারা যখন সঠিকভাবে জানিতে পারিবেন, বর্তমানে কমিউনিস্ট প্রচারিত জনকল্যাণমূলক অনেকগুলি নীতিই ইসলাম হইতে গৃহীত, তখন জনকল্যাণের সেই মূল উৎস-ধারার প্রতিই যে তাঁহারা ছুটিয়া যাইবেন সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ নাই। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়—কথাটি খাঁটি সত্য। ইসলামে প্রত্যাবৃত পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তদের মতো ইসলামে প্রত্যাবৃত কমিউনিজম-ভাবাপন্ন শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারাই হইবে ইসলামের শিক্ষা ও সাম্যের সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার।

দুই

ভারতীয় তরুণদের মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শের দ্রুত প্রসারণের একটি প্রধান কারণ হইল ভারতের পরাধীনতা ও ভারতের বুকে বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদের নিরন্তর শোষণ ও পেষণ। এই পরাধীনতা রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক—ত্রিবিধ আকারেই বিদ্যমান। ভারতীয় জনগণ পরাধীনতার এই ত্রয়ী পরিবেশের সমবেত আক্রমণে পর্যুদস্ত—মরণাহত। ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়া ক্ষতি ও দুঃখভোগের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জনগণ দেখিতে পাইয়াছে যে, ভারতীয় পরাধীনতার এই ত্রিবিধ স্বরূপ পরস্পর নির্ভরশীল এবং ইহাদের অস্তিত্ব শুধু বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের এ দেশে স্থিতির উপরই নির্ভর করে না, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত স্বদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক-বণিক শ্রেণী ও মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠির নিবিড় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের উপরও বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভারতের যে সকল গণ-আন্দোলন ও গণসমর্থিত স্বাধীনতা সংগ্রাম—সহিংস ও অহিংস উভয়রূপেই

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাসই এ কথার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিবে। শুধু তাহাই নহে। এই সকল গণ-আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে এতদিন পর্যন্ত বণিক শ্রেণী হইতে আগত তথাকথিত গণ-দাবীর যে সকল নেতা—ধনিক-বণিক শ্রেণী শিক্ষিত ও শ্রেণী সচেতন বলিয়া নেতৃত্ব এতদিন পর্যন্ত তাহাদের হস্তেই ছিল—জনগণকে পরিচালিত করিয়াছেন, এমন কি তাহাদিগকে কারাগার ও ফাঁসীকাষ্ঠে ঠেলিয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই, তাঁহারই যখন প্রকৃত গণদাবী উত্থাপিত হইয়াছে এবং প্রকৃত গণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দেওয়া হইয়াছে তখনই নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে গণআন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন কিংবা জনগণকে সংগ্রামের সঙ্কট মুহূর্তে পশ্চাতে ফেলিয়া...সূক্ষ্মবুদ্ধিশালীগণ কারাগারের অন্তরালে এবং স্থূলবুদ্ধিশালীগণ অন্য কোথাও সরিয়া পড়িয়াছেন। আদর্শবাদী তরুণগণ পুন: পুন: সংঘটিত এই সকল ঘটনামালা দর্শনে এতদিন পর্যন্ত পরিচালিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একদেশদর্শী আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়া ফেলে এবং উদার ও গণমঙ্গল-প্রয়াসী এক নব আদর্শের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। এই সময় আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান সেই আদর্শ লইয়াই রাশিয়া হইতে কমিউনিজম আসিয়া ভারতে দেখা দিল এবং বিশ্ববিধান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তরুণদের মন ও মস্তিষ্ক সহজেই অধিকার করিয়া বসিল। তাহার উপর আবার দেখা দিল মানবতার শত্রু ও জাতিকৌলিন্যের দাবীদার ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী দানবের নব বিশ্ব-গ্রাস অভিযান এবং সেই অভিযানের ফলে দেখিতে দেখিতে সারা ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া জুড়িয়া জ্বলিয়া উঠিল হত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলার এক অসহনীয় নরকাগ্নিশিখা। মানব সভ্যতার যুগ-যুগ-সঞ্চিত কত দুর্লভ ঐশ্বর্য, কত অমূল্য সম্পদ, কত মহান জ্ঞান-ভাণ্ডার যে সেই বহ্নি-শিখায় ভস্মীভূত হইয়া গেল তাহা নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য। সেই দুর্দিনে দানবীয় ফ্যাসিষ্ট শক্তির সম্মুখে যখন পুরাতন পাশ্চাত্য অভিসারী সাম্রাজ্যবাদী তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাসের ঘরের মতো লুটাইয়া পড়িতে লাগিল তখন একমাত্র কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েট রাশিয়াই তাহার নব আদর্শ অনুপ্রাণিত জনগণের সাহায্যে ফ্যাসিষ্ট দানবকে শুধু প্রতিরুদ্ধ নহে, সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইল। বিস্মিত জগৎ ভাবিতে বসিল, রাশিয়ার এই বিপুল শক্তির উৎস-ধারা কোথায় এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহার চোখে পড়িল রাশিয়ার কমিউনিজম। ভারতীয় তরুণগণও রাশিয়ার এই বীর্যবান প্রতিরোধশক্তি এবং ফ্যাসিষ্ট বর্বরদের আক্রমণ হইতে মানব সভ্যতা ও স্বদেশ রক্ষায় তাহার অপূর্ব আত্মত্যাগ দর্শনে কমিউনিজমকেই ইহার মূলীভূত কারণ মনে করিয়া কমিউনিজমের প্রতি হইয়া উঠিল একান্ত শ্রদ্ধাশীল ও আকৃষ্ট। কিন্তু একথা ভাবিয়া দেখিবার তাহাদের কাহারো সময় হইল না, ইউরোপের যুগোত্তীর্ণ অন্তক্ষয়িত পুরাতন গলিত আদর্শাভিসারী রাষ্ট্রসমূহকে পরাজিত করা যেরূপ যথার্থ বীর্যবত্তা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক নহে, ঠিক তেমনি একথাও সত্য যে পররাজ্যলোলুপ মানবতা-বিদ্বেষী, সত্যতা-বিধ্বংসী কোনো শক্তি-মদমত্ত জাতির বাহ্যিক শক্তি-প্রমত্ততা যত বেশীই থাকুক না কেন, স্বীয় আদর্শহীনতার জন্য অন্তরে অন্তরে সে থাকে তত বেশী দুর্বল এবং এই দুর্বলতাই হইয়া উঠে একদিন তাহার কাল। কথঞ্চিৎ পরিমাণে ন্যায় আদর্শ পন্থা এবং সমপরিমিত ও সম জনসংখ্যা বিশিষ্ট অন্য যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ পররাজ্যলোভী পরাক্রান্ত আক্রমণকারী জাতিকে পরাজিত করা মোটেই অসম্ভব নহে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে হইয়াছে তাহাই, জার্মানী ও ইটালীর আদর্শ-ভ্রষ্টতা এবং ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির যুগজীর্ণ পচা আদর্শ মুখিনতার

www.pathagar.com

দিনে একমাত্র রাশিয়াতেই কথঞ্চিৎ পরিমাণে জনকল্যাণকর জীবন্ত নব আদর্শ দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে রাশিয়ার জনগণের মধ্যে যে চারিত্রিক শক্তি ও মনোবলের সঞ্চার হয় ইউরোপের অন্যান্য জাতির ভিতর তাহা প্রায় নাই বলিলেই চলে। কাজেই আজ যাহা রাশিয়া তথা কমিউজমের শক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মূলে রাশিয়া বা কমিউনিজমের যথার্থ শক্তি-বিপুলতা আমরা যতখানি মনে করি ততখানি মোটেই নহে। তাহার মূলে রহিয়াছে আদর্শ-ভ্রষ্টতার জন্য জার্মানী ও ইটালীর এবং মৃত আদর্শ-মুখিনতার জন্য ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের নৈতিক দুর্বলতা। এই একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যটার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য না করার ফলেই কমিউনিজমের আপাত শক্তি-বিশালতা ও আপাত সফল-স্বার্থকতায় ভারতীয় তরুণগণ বিমুগ্ধ হইয়াছে। এই ভ্রম হইতে আজ মুক্তির একান্ত প্রয়োজন।

তিন

ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সর্বপ্রথম দেখা দরকার ইসলাম ও কমিউনিজম কোন্ মূল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান এবং তাহাদের দার্শনিক পটভূমি কি। 'ইসলাম' শব্দটি আরবী 'সালাম' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার দুইটি অর্থ—'আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ' এবং 'শান্তি'। আর ইসলামের মূল মন্ত্র হইল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অর্থাৎ "আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়"। এই মূলমন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে দুইটা জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়—একটি হইল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং আর একটি হইল আল্লাহ্‌র একত্ব। এই দুইটি মূল বিষয়ের স্বীকৃতির উপরই ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে। যাহারা এই দুইটি বিষয়কে স্বীকার করে না, তাহারা ইসলামকে স্বীকার করে না—অপর কথায় তাহারা মুসলমান নহে। ইসলামের অন্যান্য নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবস্থা ও পাত্রভেদে বিধি-শিথিলতার স্থান হয়ত বা আছে, কিন্তু ইসলামের এই মূলনীতি সম্বন্ধে অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের উপর বিশ্বাস ও আস্থা সম্পর্কে কোনরূপ শিথিলতা বা আপোষ-রফার বিন্দুমাত্র স্থান নাই। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কঠোরতম। এ মূলনীতি হইতে এক কেশ পরিমাণ স্খলন ইসলাম সহ্য করে না—করিতে পারে না এবং এই মূলনীতির যাহারা বিরোধী, ইসলামী পরিভাষায় তাহাদিগকেই সাধারণতঃ বলা হয় "কাফের"। প্রত্যেক মুসলমান এবং যাঁহারা "কাফের" শব্দের প্রয়োগার্থ অবগত আছেন তাঁহারা সকলেই জানেন "কুফরী" অর্থাৎ 'কাফেরত্ব' ইসলামের কত বড় সাংঘাতিক শত্রু এবং মুসলমানের দৃষ্টিতে ইহা কত বড় হীন ও জঘন্য পাপ। এ সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসলামের বিধান সম্পর্কে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন, মুসলমানদের নিকট অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রই 'কাফের'। এ ধারণা ভ্রান্ত। যাহারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া খোদা-দ্রোহিতার পরিচয় দান করে শুধু তাহাদেরই নাম হইল 'কাফের'। অন্যান্য অমুসলিম ধর্ম-বিশ্বাসী যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র একত্বকে খণ্ডিত করিয়া একাধিক বিধাতার উপাসনা করে ইসলামী-পরিভাষায় তাহাদিগকে অভিহিত করা হয় "মুশরিক" বলিয়া। 'শরিক' বা অংশীদার শব্দ হইতে 'মুশরিক' শব্দের উদ্ভব। ইহার অর্থ হইল 'অংশীদার স্বীকারকারী' অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র অংশীদাররূপে অন্য উপাস্যকে স্বীকার ও পূজা করে তাহারাই হইল 'মুশরিক'। 'কুফরীর ক্ষমা' বা কুফরীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ বন্ধন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এখানে দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে আস্থা ও আল্লাহ্‌র একত্বকে স্বীকার এই দুই মূল ভিত্তির উপর ইসলামের সমগ্র সৌধ দণ্ডায়মান। ইসলামের রাষ্ট্র-বিধান, সমাজ বিধান,

আর্থিক বিধান, নৈতিক বিধান—এক কথায় ইসলামপন্থী বা মুসলিমের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনধারার দৈনন্দিন ও জীবনব্যাপী কর্মনীতি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সেই মূলনীতিকে কেন্দ্র করিয়া। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া কিংবা আল্লাহ্‌র একত্বকে উপেক্ষা করিয়া ইসলামের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌র জন্যই মুসলমানের জন্ম ও জীবন, বিলয় ও মরণ এবং মরণের পরও আল্লাহ্‌র নিকটই মুসলমানের প্রত্যাবর্তন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া-ইন্না ইলাইহে রাজেউন—আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আগমন এবং আল্লাহ্‌র নিকটই প্রত্যাবর্তন—ইহাই ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ। মুসলমানের প্রতিদিনের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি পদক্ষেপ—তাঁহার রাজনৈতিক সাধনা, ধর্মীয় উপাসনা, অর্থনৈতিক প্রয়াস, তাঁহার সমাজ ও মানবতার সেবা—তাঁহার প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস সমস্তই আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত। মুসলমানের নিকট "আল্লাহ্‌র জন্য ও আল্লাহ্‌র তৃপ্তির জন্য" কিছু করার অর্থই হইল সমগ্র সৃষ্টির জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য করা—নিখিল জগতের তৃপ্তি ও মঙ্গল সাধনের জন্য করা। কারণ "লাহু মা ফিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ্" অর্থাৎ আকাশে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে—সমস্তই আল্লাহ্‌র এবং সমগ্র বিশ্ব-জগৎ তাঁহারই। এবং মানুষের প্রতিটি কার্য ও চিন্তা যদি আল্লাহ্‌র তৃপ্তি সাধনের জন্য তথা বিশ্ব জগতের তৃপ্তি ও মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহার ভিতর দিয়াই আসিবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের এবং সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি। ইসলামে "সিরাতুল মুস্তাকীম্" বা "সহজ সরল পথ নির্দেশ" ইহাই। দুই প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের ভিতর জগৎ আজ ধীরে ধীরে অনুধাবন করিতে পারিতেছে, একমাত্র পার্থিব সুখাভিসারী জড়বাদী সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শ দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন সম্ভব নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভোগ-মুখীন জড়বাদী আদর্শ পরিত্যক্ত না হইতেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্ব-মঙ্গলকামী আত্মত্যাগবুদ্ধ নৈতিক আদর্শ পুনরায় মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন পর্যন্ত মানব সমাজের স্থায়ী শান্তি ও নিরংকুশ মঙ্গল নাই। শত "লীগ অব নেশন্স্" বা সহস্র "কমিন্টার্ণ" দ্বারাও তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইসলামের যে বিশ্ব কল্যাণাভিসারী আদর্শ ও কর্মনীতি এবং বিশ্বস্রষ্টার প্রতি যে আত্মভোলা আত্মনিবেদনের সাধনা, তাহার মধ্যেই রহিয়াছে বিশ্বের স্থায়ী শান্তি এবং মঙ্গল—ইসলামের ইহাই দাবী। ইসলাম শব্দের যে ধাতুগত দুই অর্থ-আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ এবং শান্তি—তাহার অর্থই হইল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ দ্বারা অর্থাৎ তাঁহার বাণী ও নির্দেশ অনুসারে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই মানব-সমাজ লাভ করিবে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ। আল্লাহ্‌র বাণী ও নির্দেশাবলী হইল 'কুরআন'। কুরআন নির্দেশিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের যথার্থ মঙ্গল নিহিত আছে কিনা তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

চার

এখন দেখা যাক কমিউনিজম কি এবং তাহার মূল ভিত্তিভূমি কোথায়। কমিউনিজম শব্দটি "কমিউন" হইতে উদ্ভূত। ফরাসী দেশে মেয়রের অধীন কয়েকটি গ্রামসমন্বিত এক একটি ক্ষুদ্র বিভাগকে বলা হয় কমিউন। এতদ্ব্যতীত সে দেশে বড় বড় শহরের এক একটী অংশ বা মহল্লাকেও 'কমিউন' নামে অভিহিত করা হয়। এক একটী কমিউনকে এক একটী ইউনিট ধরিয়া সেখানে অনেকটা আমাদের দেশের পঞ্চায়েতের মত একটী পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক স্বনির্ভরশীল সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা হইতেই বোধ হয় কার্ল মার্কস প্রথম

www.pathagar.com

তদপ্রচারিত সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজম নামে আখ্যাত করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে প্যারী নগরীতে যে বিদ্রোহ হয়, তাহার ফলে আংশিক ও স্বল্প-স্থায়ী শাসন শক্তি প্যারী কমিউনের কর্তৃত্বাধীনে আসে। কমিউনিজমের ভাবধারা প্যারী কমিউনেই সর্বপ্রথম স্বল্পজীবী হইলেও কার্যকর রূপ লাভ করে। প্যারী কমিউনের কয়েক বৎসর পূর্বে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ সম্মিলিতভাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রচার করেন। পূর্ব প্রচলিত অন্যান্য সমাজতন্ত্র হইতে নিজ.প্রচারিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় মার্ক্সই সর্বপ্রথম 'কমিউনিজম' শব্দটি সমাজতান্ত্রিক অর্থে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ মার্ক্স নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক নীতিই 'কমিউনিজম' নামে অভিহিত। অন্যান্য সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের আর্থিক নীতি সম্পর্কে অনেকটা ঐক্য থাকিলেও তাহাদের দার্শনিক পটভূমি সম্পর্কে রহিয়াছে মৌলিক বিভেদ এবং পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। কাজেই কমিউনিজমের দার্শনিক পটভূমি কি তাহা সর্বপ্রথম বিচার করিয়া দেখা যাউক।

দার্শনিকভাবে কমিউনিজমের মূল ভিত্তি হইল দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ (Dialectical materialism) বা বিশ্বসৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে জড়বাদী ধারণা (materialistic conception of the universe)। Dialectical materialism বা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী বস্তুবাদ সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে dialectic বা দ্বন্দ্বসমন্বয়ী মতবাদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া দরকার। দার্শনিক হেগেল এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বের সমস্ত কিছুরই সৃষ্টি হইতেছে তিনটি স্বর বা অবস্থার ভিতর দিয়া। দার্শনিক পরিভাষায় এই তিনটি স্তর বা অবস্থাকে যথাক্রমে বলা হয় 'থিসিস' (Thesis) 'এ্যান্টিথিসিস্' (Antithesis) এবং 'সিন্থেসিস্' (Synthesis) ; বাংলায় ইহাদের প্রতিশব্দ হইল যথাক্রমে 'বাদ' 'প্রতিবাদ' এবং 'মীমাংসা' বা 'সমন্বয়'। এই মতবাদানুযায়ী সৃষ্টিধারার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি বস্তুর। সেই বস্তুর ভিতরই থাকে তাহার পরিবর্তনের বীজ নিহিত। এই অন্তর্নিহিত ধারার ফলে বস্তুটি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে হইতে একদিন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া অপর এক নূতন বস্তুতে পরিণত হয়। বস্তুটির প্রাথমিক অবস্থা, তাহার পর ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিবর্তনের শেষ স্তরে তাহার উপস্থিতি এবং সর্বশেষ অন্য এক নব বস্তুতে রূপান্তর গ্রহণ—এই যে তিনটি স্তর বা অবস্থা, তাহারই যথাক্রমে নাম হইল থিসিস্, এ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্থেসিস্। 'সিন্থেসিস' বা রূপান্তরিত নব অবস্থায় বস্তুটি আবার একটি 'থিসিস' বা আন্‌কোরা নূতন প্রাথমিক অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু 'থিসিসের' অন্তর্নিহিত পরিবর্তন স্রোতের ফলে আবার আসে 'এ্যান্টিথিসিস্' এবং তাহার পরে 'সিন্থেসিস্।' এমনি করিয়া নিত্যদিন নব নব রূপে বিশ্বসৃষ্টির চিরন্তন ধারা বহিয়া চলিয়াছে—হেগেলের 'ডায়লেক্‌টিক্' মতবাদের মোটামুটি ইহাই মূল তথ্য।

এখন দেখা যাক্ materialism অর্থাৎ জড়বাদ বা বস্তুবাদ কি। বিশ্বের সৃষ্টিধারা সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটা দার্শনিক মতবাদ রহিয়াছে। তাহাকে সাধারণ অধিগম্য ভাষায় 'আস্তিক্যবাদ' ও 'নাস্তিক্যবাদ' মোটামুটি এই নামে অভিহিত করা যায়। সকল দার্শনিকই মোটামুটি স্বীকার করেন যে, বিশ্বসৃষ্টির জন্য দুইটি জিনিষ প্রয়োজন—বস্তু এবং প্রজ্ঞা—'matter'এবং 'idea'। আস্তিক্যবাদী দার্শনিকেরা বলেন, বিশ্বের যে সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে idea বা প্রজ্ঞা। বিশ্ব-সৃজনী idea তাহাকে Absolute idea বা বিশ্বপ্রজ্ঞা বলিয়া তাঁহারা অভিহিত

www.pathagar.com

করেন। বিশ্ব-প্রজ্ঞারই অপর নাম বিশ্বস্রষ্টা বা আল্লাহ্ চিরন্তন, অনাদি ও স্বয়ম্ভূ। এই প্রজ্ঞা দ্বারা বা এই প্রজ্ঞা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে জড়বস্তুর বিভিন্ন পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ক্ষিতি–অপ–তেজ–মরুৎ–ব্যোম এবং বিশ্বের অপরাপর প্রাণলীলার হইয়াছে সৃজন। আর নাস্তিক্যবাদী বা জড়বাদী দার্শনিকেরা বলেন, বিশ্বের আদি জিনিষ হইল matter বা জড়বস্তু। এই matter–ই চিরন্তন ও স্বয়ম্ভূ। বিশ্বপ্রজ্ঞা বা Absolute idea বলিয়া কোন কিছুর সত্তা নাই। জড়বস্তুর ক্রিয়ার ফলে mind ও idea অর্থাৎ মন ও প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে idea বা প্রজ্ঞার Absolute idea বা বিশ্বপ্রজ্ঞা নয়—তাহাকে অনেকটা স্থানিক প্রজ্ঞা বলা যাইতে পারে। নিখিল–বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই জড়বস্তুর বিভিন্ন রূপান্তর ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন। বিশ্বপ্রজ্ঞা বা বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই পরকাল, স্বর্গ এবং নরক বলিয়াও কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। মানুষের জীবনের সুখ–দুঃখ, ব্যথা–আনন্দ, ভোগবিলাস যাহা সমস্তই এই পৃথিবীতে আরম্ভ এবং এই পৃথিবীতেই শেষ অর্থাৎ ইহকালেই মানবজীবনের সব কিছু সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পরে আর তাহার সুখ–দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। জড়বাদ বা বস্তুবাদের ইহাই [illegible] মোট তথ্য। জড়বস্তুকেই বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করায় এই দার্শনিক মতবাদকে বলা হয় জড়বাদ বা বস্তুবাদ।

পাঁচ

"ডায়েলেক্‌টিক' মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হেগেল ছিলেন আস্তিক্যবাদী দার্শনিক। তাঁহার মতে Absolute idea বা বিশ্বপ্রজ্ঞাই আদি ও চিরন্তন এবং তাহা হইতেই জড়বস্তুর সৃষ্টি এবং জড়বস্তুর অন্তর্নিহিত পরিবর্তন ধারার ফলে ডায়েলেক্‌টিক নীতি অনুযায়ী ঘটিতেছে সৃজন–লীলার বিভিন্ন বিকাশ ও রূপান্তর কার্ল মার্ক্স ও হেগেল শুধু এই ডায়েলেক্‌টিক মতবাদকেই গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহারা আস্তিক্যবাদকে করিলেন সম্পূর্ণ পরিহার। এবং শুধু পরিহার নয়, আস্তিক্যবাদের করিলেন সম্পূর্ণ বিরোধিতা। অপরপক্ষে তিনি জড়বাদের সঙ্গে হেগেলের ডায়েলেক্‌টিক মতবাদ মিলিত করিয়া Dialectical materialism বা দ্বন্দ্ব সমন্বয়ী জড়বাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া গঠিত হইল তদ–প্রচলিত কমিউনিজমের দার্শনিক বুনিয়াদ। কাজেই কমিউনিজমের দার্শনিক ভিত্তিভূমি হইল জড়বাদ, অপর কথায় নিরীশ্বরবাদিতা। এইখানেই ইসলামের সঙ্গে কমিউনিজমের মৌলিক বিভেদ। ইসলামের যে মূলনীতি হইল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও আল্লাহ্‌র একত্বকে বিশ্বাস ও স্বীকার করা—কমিউনিজম তাহাকেই করিয়াছে অবিশ্বাস ও অস্বীকার। ইসলামের বিধান অনুসারে যে–মতবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাহা শুধু অন্‌–ইসলামী নহে—তাহা কুফরী মতবাদ এবং কুফরীর সঙ্গে ইসলামের কোনরূপ আপোষ মীমাংসাই নাই। যাহারা এই কুফরী মতবাদ পোষণ করে ইসলামী পরিভাষায় তাহারা কাফের এবং কাফেরের ও সাচ্চা মুসলমানের কোনরূপ ধর্মীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কাজেই কমিউনিস্টদের সঙ্গেও মুসলমানদের কোনরূপ ধর্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামী শরিয়ত বা শাস্ত্রবিধান অনুসারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ করিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান তরুণের ইসলামের এই কঠোর বিধান ও তাহার অন্তর্নিহিত কারণের প্রতি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। নতুবা কুরআনের ভাষায় যাহাকে বলা হয় "অভিশপ্ত ও ভ্রষ্টদিগের পথ" সেই পথে পরিচালিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে যথেষ্ট।

www.pathagar.com

এখন দেখা যাক, কমিউনিজমের সামাজিক আর্থিক নীতির মূল ভিত্তি কি! এই নীতির মূল ভিত্তি হইল materialistic interpretation of history বা ইতিহাসের বস্তুবাদমূলক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা দ্বারা দেখানো হয় যে, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল কিছুরই উদ্ভব হইয়াছে জড়বস্তুর পরিবর্তনশীল অবস্থার ফলে এবং অর্থনৈতিক কারণে। অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা অনুসারে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ধর্মীয় প্রেরণার কোন স্থান নাই। এই ব্যাখ্যা আরও বলে যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলেই মানব-সমাজে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে সকল লোক উচ্চ স্তর বা শ্রেণীর অবস্থানের ফলে সকল প্রকার সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহারই নিম্নতর শ্রেণীর অবস্থিত শোষিত ও শাসিত জনসাধারণকে এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃজনে বারিত করিবার জন্য এবং নিজেদের সুখ-সুবিধা ও শোষণ-শাসন কায়েমী করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ধর্ম-প্রচারক ও ধর্ম-যাজক নামক এক শ্রেণীর লোক দ্বারা পরকালের প্রলোভনভরা ধর্ম নামে অভিহিত এক ভুয়া মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই ধর্মের নেশায় জনগণকে ভুলাইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে চির-দাসত্বে আবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। সুতরাং কমিউনিজম মনে করে যে, সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের তথা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইল (১) ধর্মের উচ্ছেদ, (২) বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ অর্থাৎ শ্রেণী-বৈষম্য দূর করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং (৩) বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া সমস্ত ভূমি ও মূলধন সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণতকরণ এবং পূর্ণ আর্থিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা সাধন। আর্থিক সাম্যের এই নীতি অনুসারে কোন কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কিংবা কৃষিফার্ম বা অন্য কোন জাতীয় শ্রম-কেন্দ্রের সর্বোচ্চ কর্মচারী হইতে সর্বনিম্ন মজুর পর্যন্ত সকলেই একই সমান বেতন ও পারিশ্রমিক পাইবে। এখানে আর একটি কথাও বলিয়া রাখা দরকার, অর্থনীতির পরিভাষায় প্রকৃতির অনায়াসলব্ধ সর্বপ্রকার দানকেই—যথা সূর্যকিরণ, বৃষ্টি ইত্যাদিকেও ভূমি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে কমিউনিজমের অভিমত হইল, রাষ্ট্র মানব সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক, কারণ ইহা মানবসমাজের স্বাধীন সত্তার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের যন্ত্র বিশেষ এবং বল প্রয়োগের এরূপ যন্ত্র মাত্রই অকল্যাণকর। কাজেই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কমিউনিজমের কাম্য। Anarchism নৈরাষ্ট্রবাদেরও অভিমত ইহাই। কিন্তু নৈরাষ্ট্রবাদের সঙ্গে কমিউনিজেম প্রভেদ হইল এই যে, নৈরাষ্ট্রবাদ মনে করে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ হইতেই সোজাসুজি নৈরাষ্ট্রমূলক সমাজে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু কমিউনিজম রাষ্ট্রকে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা হইতে সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থায় উপনীত হইবার মধ্যবর্তী পরিবর্তন-সময়ের জন্য অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় অকল্যাণজনক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে। কমিউনিজমের নির্দেশ হইল, কমিউনিস্ট বিপ্লববাদীগণ রাষ্ট্র-যন্ত্র অধিকার করিয়া রাষ্ট্রশক্তিকে এরূপভাবে কাজে লাগাইবে যে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া তথায় রাষ্ট্র-বিহীন একটি পূর্ণ কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কমিউনিস্ট নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল পন্থা প্রয়োজন বলিয়া পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে প্রকৃত মানব কল্যাণের পক্ষে সেগুলির উপযোগিতা কতখানি এবং মানব-জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগ সম্ভবপর কিনা একে একে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

www.pathagar.com

ছয়

প্রথম দেখা যাক, মানব-সমাজ হইতে ধর্মের উচ্ছেদসাধন সম্ভবপর কিনা এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

আস্তিক্যবাদ ও ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করিবার জন্য কমিউনিস্টগণ তাহাদের শাসিত সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রথম হইতেই চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই এবং এ প্রচেষ্টা ছিল যেমনি ব্যাপক তেমনি কঠোর। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ করিয়া ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট পরিচালিত গভর্নমেন্ট নিরীশ্বরবাদিতাকেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের নীতি বলিয়া সরকারী অনুজ্ঞা প্রচার করে এবং নৈতিক ও সামাজিক প্রচারের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মীয় মতবাদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া এক মাত্র নিরীশ্বরবাদীদিগকেই তাহাদের নীতি প্রচারের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যে কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট "ধর্ম বিরোধী প্রচার কার্য" পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রের সর্বত্র ইহার শাখা স্থাপনের নির্দেশ দেয়। অল্প দিনের মধ্যে বিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্র জুড়িয়া এই বিভাগের অগণ্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। নিরীশ্বরবাদিতাকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নীতি বলিয়া গ্রহণ এবং আস্তিক্যবাদ ও ধর্মীয় প্রচারকার্য নিষিদ্ধ ও সর্বপ্রকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়া পূর্বোল্লেখিত যে অনুজ্ঞা বা আইন প্রচারিত হয় তাহাতে এই আইন দেশের সর্বত্র ও সর্বস্তরে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রহিয়াছে—সরকারী অনুজ্ঞায় একথার স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইল। সোভিয়েট রাষ্ট্রে এই সকল প্রচেষ্টা হইতে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়—ধর্ম ও আস্তিক্যবাদের বিলোপ সাধন ও নিরীশ্বরবাদের প্রচারের জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্ট অপরিসীম চেষ্টা করিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তিগতভাবে কিংবা কোন বিশেষ দলের পক্ষ হইতে নাস্তিক্য প্রচার করা এক কথা, আর কোন গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে নাস্তিক্যবাদকেই গভর্নমেন্টের নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ও আস্তিক্যবাদের প্রচার কার্যের অধিকার কাড়িয়া লইয়া সমগ্র রাষ্ট্র জুড়িয়া নাস্তিক্য এবং ধর্মদ্রোহিতা প্রচার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। মানবজাতির ইতিহাসে নমরূদ, ফেরাউন ও শাদ্দাদ ছাড়া—খুব সম্ভব ভারতের কংসও সেই দলের ছিল—খোদাদ্রোহিতা ধর্মদ্রোহিতার মত বড় নজির কেহ সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছিল? ধর্ম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই, শুধু সেই সকল খোদাদ্রোহীরাই অভিশপ্ত জীবন পৃথিবীর ইতিহাসই কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। রাশিয়ার ধর্মনিগ্রহের আধুনিক ঘটনাস্রোতের দিকে তাকাইয়াও "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়"—এই চিরন্তন সত্যটিই পুনর্বার মনে পড়িতেছে। অমানুষিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়ার কমিউনিজম-পন্থী রাষ্ট্র-প্রভুগণ রুশরাষ্ট্র হইতে ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। ফ্যাসিস্ট দানবের প্রচণ্ড আঘাতে বিশালকায় রুশ-ভল্লুক যখন ককেশাসের গিরি-প্রান্তরে আর বল্গার তটভূমিতে লাঞ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, সে দুর্দিনে কমিউনিস্ট পরিচালিত সোভিয়েট গভর্নমেন্টকেও যুদ্ধ-জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার জন্য রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু নিন্দিত ও বহু-নিগৃহীত আস্তিকদের দ্বারস্থ হইতে হয় এবং এই ঘটনার ভিতরই নিরীশ্বরবাদী কমিউনিজমের মৃত্যু-বীজ নিহিত। ধর্ম ও আস্তিক্যবাদ ধ্বংসের অভিযানে রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসকদের পরাজয় যে এখানে আসিয়াই শেষ হইয়াছে তাহা নহে। বলশেভিক

www.pathagar.com

শাসন রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কোন ধর্মেরই ধর্ম-নেতা, ধর্মযাজক বা ধর্ম-প্রচারককে কিংবা ধর্ম সম্পর্কিত কোন লোককে রাশিয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। কালের চক্রে এবং ধর্ম ও আস্তিকতার অন্তর্নিহিত সত্যের অমোঘ শক্তির ফলে আজ রাশিয়াকে শুধু সেই নিষেধাজ্ঞাই প্রত্যাহার করিতে হয় নাই, অপর দেশের ধর্মনেতাদিগকেও রাশিয়ায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে। ১৯৪৩ সালের শেষ ভাগে এরূপভাবে আমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কের ৬৮ বৎসর বয়স্ক আর্কবিশপ ডাঃ সাইরিল্ ফস্টার গার্বেট তাঁহার দুইজন চ্যাপ্লেন—রেভারেণ্ড এফ, এইচ, হাউস্ এবং রেভারেণ্ড এইচ, এম, ওয়াডাম্‌স্ সহ মস্কো গিয়াছিলেন। রাশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তথায় বর্তমানে ধর্মের অবস্থা কি, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন যে, বর্তমানে গীর্জাসমূহের ভিতর উপাসনা করিবার অধিকার পূর্ণভাবেই দেওয়া হইয়াছে এবং একটি প্রধান গীর্জার উপাসনায় যোগদানের জন্য সমবেত জনসঙ্ঘের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেন, "উপাসনার জন্য সমবেত এত বড় জমায়েত আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। শুধু গীর্জার আওতার ভিতরই লোক ছিল দশ সহস্র এবং তথায় স্থানাভাবে আরও বহু সহস্র লোক নিকটস্থ স্কোয়ারে উপাসনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল।" মস্কো এবং অন্যান্য স্থানের গীর্জায় সমবেত এই বিশাল উপাসক-মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও সংখ্যায় সর্বাধিক ও সর্বপ্রধান হইল মধ্যবয়সী লোক এবং তরুণেরা। তিনি আরও বলেন যে, যদিও এখন পর্যন্ত রাশিয়ায় কতকগুলি নাস্তিক্যবাদ মতাবলম্বী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তথাপি বর্তমানে সেখানে ধর্মবিরোধী প্রচারকার্য সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লৌকিক ও বৈষয়িক কার্যে ব্যবহৃত উপাসনালয় এখন পর্যন্ত সেখানে যথেষ্ট থাকিলেও কিছু দিন যাবৎ পুনরায় ধর্ম-কার্যে ব্যবহৃত উপাসনালয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় খোদাদ্রোহিতা ও ধর্মবিরোধী প্রচারকার্যের সেই চরম দুর্দিনেও রাশিয়ার অগণিত লোক আল্লাহ্ ও ধর্মের প্রতি তাহাদের অটুট আস্থা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নাস্তিক কমিউনিস্ট শাসকদের সেই সময়কার খোদা ও ধর্মদ্রোহী আইন ও জবরদস্তির ফলে অনেকেই তখন তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস রাখিতে হইয়াছে সংগোপন। কিন্তু আজ দিনের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন রাশিয়ায় ধর্ম শুধু স্বীকৃত নয়—ধর্মের প্রচারকার্য চালাইবার জন্য ধর্মীয় পত্রিকা প্রকাশের অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে সেখানে। সম্প্রতি রাষ্ট্রের অনুমোদনে রাশিয়ার সর্বোচ্চ খ্রীস্টীয় ধর্মপরিষদের পক্ষ হইতে একটি ধর্মীয় মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির করা হইয়াছে। এই মাসিকটা বাহির হইতে না হইতেই ইহার প্রচার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে দশ সহস্র। খ্রীস্টীয় ধর্মের অন্যতম শাখা প্রাচ্য বা গ্রীক ধর্মসঙ্ঘ সমর্থিত খ্রীস্টধর্মই রাশিয়ায় প্রচারিত এবং এই ধর্মসঙ্ঘ ছিল সর্বদাই জার ও জার শাসনের সমর্থক ও পরিপোষক। ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসকদের সর্বাধিক আক্রোশ ছিল ইহারই উপর এবং ইহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টায় ত্রুটি তাহারা কখনো করে নাই। কিন্তু আজ স্ট্যালিনের মতো জবরদস্ত কমিউনিস্টকেও খোদা ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই 'প্রাচ্য ধর্মসঙ্ঘের' দাবী এবং অধিকারকে স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর রহিল না। এই অবস্থার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমানিস্তান প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে উদার ও যুক্তিবাদী ইসলাম ধর্মও যে আবার নবশক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে তাহা অনস্বীকার্য্য।

www.pathagar.com

এই সকল বাস্তব তথ্য হইতে আমরা দেখিতেছি, রাশিয়ার কমিউনিজমপন্থী নাস্তিক রাষ্ট্রশাসকদের ধর্ম উচ্ছেদ সম্পর্কিত সমস্ত প্রচেষ্টা ও জবরদস্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাশিয়ায় বাস্তব কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল যে, কমিউনিজমের দার্শনিক মূল ভিত্তি জড়বাদ, অপর কথায় নাস্তিকতা বা ধর্ম উচ্ছেদ সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-ভালবাসার মত আস্তিকতা ও ধর্ম বিশ্বাস মানুষের সহজাত। দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের প্রচণ্ড আঘাতে এবং ক্রমবর্ধমান বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে চিন্তা ও মননক্ষেত্রে অনেকখানি সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া রুশ রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট সর্বাধিনায়ক জেনারেলিসিমো স্ট্যালিনও এ সত্য স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে কান্টারবারির ডান্ রেভারেন্ড হিউলেট জন্সন্ এর সহিত স্ট্যালিনের যে আলাপ-আলোচনা হয় তাহাতে স্ট্যালিন বলেন এবং বিশেষ জোরের সহিতই বলেন "ধর্মকে বাধা দিয়া রাখা যায় না ; বিবেককেও স্তব্ধ করিয়া দেওয়া যায় না। ধর্ম হইল বিবেকের ব্যাপার আর বিবেক হইল স্বাধীন। কাজেই উপাসনা এবং ধর্মও স্বাধীন।" (১৮ই জুলাই ১৯৪৫-অমৃতবাজার পত্রিকা।) সত্য এমনি ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে এবং আজিকার বিরোধীর কণ্ঠধ্বনির ভিতর দিয়াই আগামীকাল সে মুখর উদাত্ত গুঞ্জনে মেঘমুক্ত সূর্যের মতো ভাস্বর হইয়া উঠে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই মানব-জীবনের সব শেষ হইয়া গেল—মানুষের জন্য আত্মার অমরতা বলিয়া কিছুই নাই—কমিউনিজমের এই মতবাদ মানবের চরম ও পরম কল্যাণের পক্ষে বিঘ্নকর। মৃত্যুর পরেই যদি সব শেষ হইয়া যায়, তবে প্রবঞ্চনা লুণ্ঠন বা অসত্য দ্বারা কিংবা অন্য যে কোন প্রকারে ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া এ জীবনে ভোগ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য—যুক্তি একথাই বলিবে। কিন্তু এই যুক্তি বা আদর্শ গ্রহণ করা অপেক্ষা মানব জীবনের অধিকতর অধঃপতন আর কিছুতেই হইতে পারে না। মানবজাতির ইতিহাসে মানুষকে এই অধঃপতনের পথে টানিয়া নিবার প্রচেষ্টা অনেকবারই হইয়াছে কিন্তু বারবারই হইয়াছে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বিংশ শতাব্দীতে এ সম্পর্কে কমিউনিজমের এই নব প্রচেষ্টাও অদূরভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বাধ্য—রাশিয়ার আধুনিক ঘটনাবলী সে কথারই দিতেছে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

এখন দেখা যাক, কমিউনিজমের অপর দুইটি প্রধান দাবী (১) বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া পূর্ণ আর্থিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা এবং (২) বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ অর্থাৎ শ্রেণীবৈষম্য দূর করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা—কমিউনিস্ট শাসিত রাশিয়ায় কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রকৃতির সঙ্গে রহিয়াছে তাহার কতখানি সঙ্গতি।

একথা সত্য, রাশিয়ায় সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার বড় বড় জমিদারী এবং বড় বড় কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। ইহার পর ক্রমশঃ কুলাক বা যে সকল কৃষক বহু বিস্তৃত চাষের জমির মালিক তাহাদের জমিন কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে তাহা যৌথ-কৃষিফার্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য কিংবা দরিদ্র কৃষকদিগের মধ্যে প্রয়োজনানুসারে বিতরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু গভর্নমেন্টের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছোটখাট ও মাঝারি ধরনের কৃষকদের জমিও গভর্নমেন্ট কাড়িয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। বহু স্থানে তাহাদিগকে শুধু এক একটি যৌথ কৃষিফার্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আধুনিক

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও কলকব্জার সাহায্যে কৃষিকার্য পরিচালনের জন্য বাধ্য করা হইয়াছে। কিন্তু জমির স্বামীত্ব বা সম্পত্তিগত অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয় নাই। ফলে বিশাল সোভিয়েট রাষ্ট্র জুড়িয়া অগণিত সম্পত্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যও ব্যক্তিগতভাবে রুশ জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ১৯৪৩ সালের প্রায় শেষভাগে এতদসম্পর্কে মেক্সিকো দেশীয় একজন সংবাদপত্র-সেবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষী ও সমাজতান্ত্রিক জর্জ বার্ণাড শ' বলেন, 'রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রে সরকারী নীতি হইল কমিউনিজম। এতদসত্ত্বেও বর্তমান রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের সংখ্যা জারের আমলে যাহা ছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী। এ বিষয়ে রাশিয়া হইতে প্রত্যাগত আমাদের পূর্বোল্লিখিত ইয়র্কের আর্কবিশপ ডাঃ সাইরিল্ ফস্টার গারবেট বলেন, "আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রাশিয়ায় জনসাধারণকে নিজস্ব সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হয়। ...যে কোন ব্যক্তি তাহার,স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া দিতে পারে কিংবা নিজের জন্য রাখিয়া দিতে পারে। এমন কি যৌথ কৃষিফার্মে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক নির্মিত গৃহও এরূপভাবে নিজের জন্য রাখা কিংবা বিক্রয় করা চলে।" দায়িত্বজ্ঞানশীল মনীষী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের এই সকল উক্তি ছাড়া রাশিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ আছে। বর্তমান রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময়ও বহুবার রুশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত সংবাদের মারফত জানিতে পারা গিয়াছে যে, রুশ গভর্নমেন্ট রাশিয়ার জনসাধারণের নিকট হইতে বহু কোটি রুবল বা রুশ-দেশীয় বহু লোক গভর্নমেন্টকে সহস্র সহস্র—এমনকি লক্ষাধিক টাকা পর্য্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ঋণ প্রদান করিয়াছে। রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব না থাকিলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তি গভর্নমেন্টকে এত অধিক পরিমাণে টাকা ঋণদান করিতে পারিত না। কমিউনিস্ট শাসিত রাশিয়ার এই সকল বাস্তব তথ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ধনতন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছেদ-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ এরূপ উচ্ছেদসাধন মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনের যে দাবী, তাহাকে করিয়াছে সম্পূর্ণ উপেক্ষা। প্রতি মানুষের ভিতর যে 'অহম্' রহিয়াছে তাহার অপতিরোধ্য দাবী হইল প্রত্যেকের নিজস্ব বলিয়া কিছু থাকা। এই দাবীকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়ত সম্ভব কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাজেই পরিণামে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। রাশিয়ায়ও তাহা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্পর্কে কমিউনিজমের যে অন্যতম মূল দাবী তাহা অস্বাভাবিক ও প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে অবাস্তব ও ব্যর্থ। এতদ্ব্যতীত কমিউনিস্ট-শাসিত রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদকে দূর করা হয় নাই—কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে মাত্র। ফলে দাঁড়াইয়াছে—ধনতন্ত্রবাদের আরও সাঙ্ঘাতিক পরিণতি—State Capitalism বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদ। ইহা ধনতন্ত্রবাদের বিনাশন নহে—পরিপোষণ মাত্র।

সাত

কমিউনিজমের অন্যতম মৌলিক নীতি—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ অর্থাৎ শ্রেণী-বৈষম্য দূর করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ায়ও কার্যক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। রাশিয়ার কৃষক-শ্রেণীর ভিতর ব্যক্তিগত সম্পত্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন আর্থিক স্তর বা শ্রেণী রহিয়াছে, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রমিক-শ্রেণীর ভিতরও যে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী রহিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ার "স্টাখানোভ" আন্দোলনই

www.pathagar.com

তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। স্টাখানোভ হইল কয়লা-খনির একজন শ্রমিকের নাম। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া খনির অন্যান্য মজুরদের অপেক্ষা বহু পরিমাণ অধিক কয়লা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলে গভর্নমেন্ট তাহার পদোন্নতি সাধন করিয়া তাহার পারিশ্রমিক বা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিল এবং যে সকল শ্রমিক নিজের বুদ্ধি ও শক্তিবলে নব নব উদ্ভাবনের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবে তাহাদিগকে "স্টাখানোভাইট" বা স্টাখানেভপন্থী—এই নামে অভিহিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির এক নূতন আন্দোলন সৃষ্টি করিল। খনি, যৌথ কৃষি-ফার্ম, রেলওয়ে, কল-কারখানা সর্বত্রই এই আন্দোলন পরিব্যাপ্ত করা হইল এবং সকল স্থানেই স্টাখানোভাইটদিগকে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত করা হইতে লাগিল। তাহার ফলে বর্তমানে সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়া জুড়িয়া প্রত্যেক শ্রম ও শিল্পকেন্দ্রে এক একটি বৃহৎ স্টাখানোভাইট দল অর্থাৎ শ্রমিকদের ভিতর একটি কর্মী সুদক্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কার্যদক্ষতায় রাশিয়ার বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশেরও উপকার হইয়াছে যথেষ্ট। সোভিয়েট রাশিয়ার এই সকল ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সেখানে জনগণের মধ্যে শ্রেণীলোপ করা তো সম্ভবপর হয়ই নাই, উপরন্তু আরও নূতন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে। কাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করিয়া পূর্ণ আর্থিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজ বৈষম্য উচ্ছেদ করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গঠন—কমিউনিজমের এই দুইটি মূলনীতি যে মানবজীবনের কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অকার্যকরী ও ব্যর্থ, কমিউনিস্ট-শাসিত রাশিয়ার বিভিন্ন পরীক্ষাও অবস্থার ভিতর দিয়া তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কমিউনিজমের একটি প্রধান দোষ এই যে, কমিউনিজম মানুষের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে স্বীকার করিতে চায় না। মানুষের স্বভাবের ভিতর যে চেতনাগুলি ষড়রিপু বলিয়া অভিহিত করা হয়, মানবের জীবনযাত্রার পথে সেগুলি নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের কারণ নহে। জীবনের পক্ষে সেগুলি অপরিহার্য। ইহাদিগকে সম্পূর্ণ পদদলিত করিয়া নহে, যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই জীবনটি হয় সফল ও সার্থক। ক্রোধ এবং লোভ এই দুইটি রিপুর কথাই ধরা যাক। অত্যাচারীর অত্যাচার দর্শনে ক্রোধের সঞ্চার না হইলে সে অত্যাচার দমন কখনো হইতে পারে না। মহান ও সুন্দর জীবন, সুন্দর আদর্শ এগুলির দিকে লোভ না থাকিলে মানুষ কখনো মহান ও সুন্দর হইতে পারিবে না। যাহাদের মধ্যে মদ-মাৎসর্য্য কিছুমাত্র নাই তাহারা চিরদিন হইয়া থাকিবে অপরের দাস—স্বাধীন মানুষ হইবার স্পৃহা তাহাদের মধ্যে কখনো জাগিতে পারে না। কাজেই রিপুগুলিকে চিরদিন পূর্ণভাবে দমন করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে এবং বলপ্রয়োগ বা অন্য প্রকার জবরদস্তি দ্বারা তাহাদিগকে যদি দমনও করা যায় তবে তাহা হইবে অস্বাভাবিক এবং মানবজীবনের পক্ষে সর্বনাশকর। নিজের বলিয়া কিছু থাকা এবং অপর অপেক্ষা বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর অস্তিত্ব মানুষের লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—এই রিপুগুলির অপ্রতিরোধ্য দাবীরই ফল। কাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী-চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভবপরও নহে এবং মানবজীবনের পক্ষে কল্যাণকরও নহে। কমিউনিজম নির্দেশিত সমাজ ও আর্থিক নীতির এইখানেই গোড়ায় গলদ। এই সম্পর্কে আরও ভাবিবার কথা আছে। মানুষের বুদ্ধি ও কর্মশক্তির মান অনুসারে যদি তাহার মূল্য নির্ণীত না হয় এবং মুড়িমুড়কীর একই মূল্য ধার্য হয় তাহা হইলে মানুষের শক্তির মান বহু নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতে বাধ্য। কারণ একজন সাধারণ ব্যক্তি তাঁহার সাধারণ ক্ষমতা অনুসারে

www.pathagar.com

যতখানি কাজ করিবে এবং তজ্জন্য যতখানি মূল্য পাইবে, বুদ্ধি ও শক্তিতে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাহার বিশেষ ক্ষমতাবলে যদি তদপেক্ষা বেশী কার্য করিয়াও একই মূল্য ও মর্যাদা পায় তবে সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজ করিবার তাহার যে শক্তি ও প্রেরণা—অবিলম্বেই তাহা লুপ্ত হইবে। কারণ আংশিক আত্মনিয়োগ করিয়াই সে সাধারণ ব্যক্তির সমান কাজ করিতে পারিবে বলিয়া কার্যে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবার তাহার ইচ্ছা থাকিবেনা, ফলে ব্যবহারের অভাবে মানবজাতির বহু মূল্যবান শক্তির বৃথা অপচয় এবং তজ্জনিত মানবজাতির ক্ষতি হইবে প্রভূত। কার্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ফলে এই সত্য উপলব্ধি জাগ্রত হওয়াতেই কমিউনিস্ট-শাসিত রাশিয়ায়ও কমিউনিজমের নীতি উপেক্ষা করিয়া স্টাখানোভ আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে।

কাজেই উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কমিউনিজমের যে তিনটি মূলনীতি (১) ধর্মের উচ্ছেদ, (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ এবং (৩) শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা—এই তিনটি নীতিই কমিউনিস্ট-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, এই নীতিগুলি মানব প্রকৃতির বিরোধী—কাজেই অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব।

এখন দেখা যাক, মানবজীবনের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে ইসলামের নীতি কি ?

আট

ইসলামের ধর্মীয় ভিত্তি হইল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"—আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই। এক মূলমন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম হইল "লা-ইলাহা"—'নাই কেহ উপাস্য প্রভূ' ; এবং দ্বিতীয় অংশ হইল 'ইল্লাল্লাহ্"—'আল্লাহ্ ব্যতীত'। এখানে দেখা যাইতেছে যে, ইসলামের মূলমন্ত্র সর্বপ্রথমই 'লা' বা 'না' অর্থাৎ অস্বীকৃতি বা বিদ্রোহ, ইহার মধ্যে রহিয়াছে গভীর তাৎপর্য নিহিত। ইহার মধ্যেই ইসলামের চিরন্তন বিপ্লবী শক্তির অমর বীজ লুক্কায়িত। কোন জিনিষকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন, গ্রহণের আধারকে সর্বপ্রকার জঞ্জাল ও অবান্তর জিনিষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। আল্লাহকেও পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্বপ্রথম দরকার চিত্ত ও মনকে সর্বপ্রকার মিথ্যা ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া স্বাধীন ও নির্মল করিয়া তোলা। সেই জন্যই সর্বপ্রথম বলিতে হয় "লা-ইলাহা" নাই কেহ উপাস্য। আর এই "না"-এর ভিতর দিয়াই মানুষকে করা হইয়াছে চির উন্নত শির—চির স্বাধীন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, সাগর-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, সর্প-সিংহ, গাভী-মহিষ, মানুষের প্রভু নয়—দেব দেবী, অসুর-রাক্ষস, গন্ধর্ব-কিন্নর, জিন-পরী, ফেরেশ্‌তা দেবদূত তাহারাও নয় মানুষের প্রভু—অবতার বা ভগবানের পুত্র, জন্ম-মৃত্যুর যিনি অধীন তেমন কেহও মানুষের প্রভু নয়—অতিমানব বা মহামানব, রাষ্ট্রনেতা বা ডিক্‌টেটার, স্ট্যালিন বা হিটলার মানুষের প্রভু কখনই নহে—রাষ্ট্র বা সমাজ সেও নয় মানুষের প্রভু—এমনকি বিজ্ঞান-কথিত প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রন, 'all-pervanding energy' বা বিশ্ব-সঞ্চারী শক্তিও মানুষের প্রভু নহে। মানুষ ইহাদের কাহারো নিকট শির নোয়াইবে না—কাহারো নিকট নতি স্বীকার করিবে না। সে পরিদৃশ্যমান জগতে চির মুক্ত, চির স্বাধীন, চির উন্নত-শির—সে সর্বশ্রেষ্ঠ—আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত—সৃষ্টির সেরা। "লা-ইলাহা'...এই বাণী মানবজাতিকে—মুসলমানকে চিত্ত ও মনের দিক দিয়া করিয়াছে সর্বপ্রকার জাগতিক দাসত্ব হইতে মুক্ত—ব্যক্তিত্বের দাসত্ব,

www.pathagar.com

কুসংস্কারের দাসত্ব, প্রাকৃতিক ভয়ভীতির দাসত্ব—সকল প্রকার দাসত্ব হইতে মুক্ত—স্বাধীন। ইসলামের এই 'লা-ইলাহা' বাণী মানব জাতিকে যে বিরাট মর্যাদা ও সম্মান দিয়াছে জগতের অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ আজ পর্যন্ত তাহা দেয় নাই—দিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষ মানুষই—আর কিছু নহে, একথা ভুলিলে চলিবে না। তাহার ভুল-ভ্রান্তি আছে, অহমিকা আছে, আছে তাহার পদস্খলন। কাজেই তাহার যদি স্রষ্টা বলিয়া কিছুই না থাকে, পরম ও চরম নিয়ন্তা বলিয়া না থাকে কেহ, আর না থাকে মৃত্যুর পরে কোন পরকালে, কিংবা না থাকে আত্মার অমরতা—তবে তাহার ইহ-সর্বস্ব জীবনে সে উঠিবে ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া এবং সেই ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য সে অন্যায়-অত্যাচার এবং হত্যা-লুণ্ঠন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি মানুষের সব কিছু শেষ হইয়া যায় এবং আর কিছুই না থাকে তবে এ জীবনে ন্যায়-অন্যায় যে-কোন উপায়ে যথাসম্ভব বেশী ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—না করাই চরম নির্বুদ্ধিতা। কাজেই বিশ্ব-স্রষ্টা ও পরকাল অস্বীকার করার অর্থই হইল পৃথিবীর বুকে অব্যাহত অনাচার নামাইয়া আনা, এখানে নরক সৃষ্টি করা। অবশ্য স্রষ্টা ও পরকালে অবিশ্বাসী একদল আদর্শবাদী লোক হয়ত জনকল্যাণাভিসারী জীবন যাপন করিতে পারেন কিন্তু তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সমগ্র মানব জাতিকে তাহাদের দ্বারা বিচার করা চলে না। কাজেই সমগ্রভাবে মানব জাতির মঙ্গলের জন্য একান্ত প্রয়োজন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বকে স্বীকার ; এবং আল্লাহ্‌কে স্বীকার করার মধ্যেই রহিয়াছে পরকাল ও আত্মার অমরতার স্বীকৃতি। সেই জন্যই দেখিতে পাই ইসলামের মূলমন্ত্রের প্রথম অংশ "লা-ইলাহা"র সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে "ইল্লাল্লাহ্"—"আল্লাহ্ ব্যতীত" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষের আর কেহ উপাস্য প্রভু এবং স্রষ্টা নাই। এই যে উপাস্য প্রভু ও স্রষ্টা আল্লাহ্—তিনি কেমন? তিনি কেমন? তিনি "আহাদ"—'এক ও একক' তিনি "ছামাদ"—সর্বনিরপেক্ষ অথচ সকলের অপেক্ষাস্থল প্রভু, তিনি "লাম্ ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ"—কাহারো জাত নহেন এবং কাহারো জন্মদাতাও নহেন, এবং "ওয়া-লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ"—তাঁহার সমতুল্যও কেহ নাই।

জন্ম ও মৃত্যুর তিনি অতীত, তিনি "আলা কুল্লে শাইয়িন্ কাদির"—তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি 'আলেমুল্ গায়ব"—সর্বজ্ঞ তিনি, তিনি নিরাকার—অথচ সর্বব্যাপী।

আল্লাহ্‌র এই বস্তু-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের (Abstract existense) ইসলামে এই যে স্বীকৃতি ইহার ফলে দৃশ্যমান জগতে মানুষের গৌরব ও মর্যাদাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। কারণ মানুষকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সমগ্র সৃষ্ট জগতে মানুষই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন কিছুর নিকট তাহার নত হইবার প্রয়োজন নাই। উপাস্য বা আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের এই যে ধারণা, তাহার ফলে এক দিকে সৃষ্ট জগতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে দেওয়া হইয়াছে গৌরব ও মহত্ত্ব, অপর দিকে তাহাকে করা হইয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত অহমিকার ফলে তাহার পতনের যে সম্ভাবনা ও আশঙ্কা তাহা হইতে রক্ষা। মানবের মঙ্গলের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নীতি আর কি হইতে পারে তাহা ধারণাতীত। আমাদের বিশ্বাস, নাস্তিকগণ একদিন ইসলামের এই সত্যকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কারণ একথা ঠিক বহু নাস্তিক মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান ও অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সাহায্য প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে না পারার ফলে নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। তাহারা বিশ্বসৃষ্টি-রহস্য

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করিতে matter বা জড়বস্তু পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, Absolute idea বা বিশ্ব-প্রজ্ঞা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই ; তাহারা সমস্ত কুসংস্কার কাটাইয়া "লা ইলাহা" পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—"ইল্লাল্লাহ্" পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের ক্রম পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ইসলামের আদর্শে পৌঁছিতে পারিবে—এ বিশ্বাস আমাদের অমূলক নহে। স্যার অলিভার লজ এবং জেমস্ জিন্স্ প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ সেই দিকেই অঙ্গুলী সংকেত করিতেছেন। এখন দেখা যাক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ইসলামের সমাধান কি।

ইসলাম মানুষে মানুষে কোন কৌলিন্যগত প্রভেদ স্বীকার করে না। ইসলামের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বলিয়া কিছু নাই। "প্রত্যেক মুসলমান পরস্পরের ভাই"—ইহাই ইসলামের শিক্ষা এবং এই শিক্ষা যে কার্যক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তাহা আমরা প্রাত্যহিক ও জুমআর নামাজে—ঈদ ও হজের ময়দানে অহরহ দেখিতেছি। প্রভু ও ভৃত্যকে সেখানে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সমান হইয়া দাঁড়াইতে হয়—বাদশা-ফকিরে সেখানে নাই কোন প্রভেদ। আর্থিক ও সম্পত্তিগত সাম্যও ইসলাম কামনা করে ; কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ ক্ষুণ্ণ না করিয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির দাবী যতটুকু পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে ইসলাম ততটুকু স্বীকার করিতে কার্পন্য করে না। কুরআনের নির্দেশ হইল "ওয়া-লিল্লাহে মাফিস সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদে—"আকাশে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান সমস্তই আল্লাহ্‌র" (আল-ইমরান, ১২৮ আয়াত)। ইসলামের অভিধানিক বা প্রচলিত অর্থে "সমস্তই আল্লাহ্‌র" বা "সমস্তই আল্লাহ্‌র সম্পত্তি"--এই কথার দ্বারা "সমস্তই সমষ্টিগতভাবে বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি"—ইহাই বুঝায়। কুরআনে আল্লাহকে বলা হইয়াছে "মালিকুল মুল্‌ক্"—রাজ্যের অধিপতি। "লাহুল্ মুল্‌ক্—রাজ্য তাঁহারই—ইহাও কুরআনেরই নির্দেশ। কাজেই ইসলামের বিধান অনুসারে দেশ বা দেশের ভূমির স্বামীত্ব বা মালিকানা স্বত্ব রাজা বা রাষ্ট্রপতির নহে—জনসাধারণের। হযরত বলিয়াছেন, সমস্ত ভূমিই আল্লাহ্‌র এবং সমস্ত প্রাণীও আল্লাহ্‌র। মৃত ভূমিকে যে (চাষ দ্বারা) জীবন্ত করিয়া তোলে জমির স্বত্ব তাহারই সর্বাধিক—(হাদীছ, আবু দাউদ)। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ই আরবের বাহিরেও অনেক রাজ্য মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ঐ সকল রাজ্যে যে ভূমিব্যবস্থা ছিল তাহা রদ করিয়া দিয়া মুসলমানগণ কর্তৃক সমস্ত ভূমি "মালিকুল মূলক" আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীনে জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। জনসাধারণ তখন সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিয়া সোজাসুজি "বায়তুল মাল" অর্থাৎ রাষ্ট্রের ধনাগারে খাজনা জমা দিত। সাধারণতঃ এই খাজনা বা করের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের একা-দশমাংশ। এই সম্পত্তির উপর খলিফার কোন অধিকার ছিল না। সম্পত্তি ও ভূমির উত্তরাধিকার সম্পর্কেও কুরআনে বলা হইয়াছে—"ওয়ালিল্লাহে মিরাছুতুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে"—"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইলেন—আল্লাহ"—(আল-ইম্‌রান ১৯৯ আয়েত)। "আসমাউল হুস্‌না" বা আল্লাহর নিরানব্বই নামের এই নাম হইল "আল-ওয়ারিছ"--উত্তরাধিকারী। কুরআনে আল্লাহকে বলা হইয়াছে "আন্তা খায়রুল ওয়ারিছীন"—"সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী হইলে তুমিই।" কুরআনের এই নীতি অনুসারে বিত্ত ও ভূমির উপর মানুষের অধিকার হইল জীবিতবস্থায় ভোগের অধিকার—চিরস্থায়ী স্বামীত্ব নহে। কাহারো মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন "খায়রুল ওয়ারেছীন" আল্লাহ :

www.pathagar.com

—মানুষ আল্লাহর সম্পত্তি ভোগ করিবে আল্লাহর প্রদত্ত Trust বা আমানত হিসাবে। এই সম্পত্তি অন্যান্য পথে নষ্ট করিবার অধিকার তাহার নাই—ইহাই কুরআনের অন্তর্নিহিত নির্দেশ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি রাখাও ইসলাম পূর্ণভাবে অনুমোদন করে না। মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, "বসবাসের জন্য একটি গৃহ, নগ্নতা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র এবং আহারের জন্য এক টুকরা রুটি ও কিছু পানীয় জল—ইহার বেশী কিছু পাইবার অধিকার মানব-সন্তানের নাই"—(হাদীছ, তির্‌মিযী)। হযরত যে-সকল উপদেশ দিতেন নিজেও অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিতেন। অনেক সময়ই দিনের বেলায় তাঁহার নিকট যাহা কিছু থাকিত সন্ধ্যায় তাহা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন এবং ফলে প্রায়ই রাত্রে সপরিবারে, তাঁহাকে উপবাসে থাকিতে হইত। হযরতের মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সমগ্র আরবের ধর্ম ও রাষ্ট্রনেতা। কিন্তু যে রাত্র-শেষে হযরত পরলোকগমন করেন সেই রাত্রে তাঁহার গৃহে প্রদীপ জ্বালাইবার তৈলটুকু পর্যন্ত ছিল না। মুমূর্ষু নবীর গৃহে সে রাত্রের জন্য প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার পত্নী বিবি আয়শাকে অন্যের নিকট হইতে কর্জ করিয়া তৈল আনিতে হইয়াছিল। পৃথিবী হইতে বিদায়ের দিন হযরত তাঁহার পশ্চাতে ব্যক্তিগত পার্থিব সম্পত্তি প্রায় কিছুই রাখিয়া যান নাই। কুরআন ও হযরতের এই মৌলিক শিক্ষা সত্ত্বেও মানুষ যদি বিত্ত সম্পত্তি অর্জনে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে তবে ইসলাম সে-পথে কতকগুলি বিধি-নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ অন্তরায় সৃজন করে না। কারণ ইসলাম জানে, নিজস্ব বলিয়া কিছু অর্জন অর্থাৎ বিত্ত ও সম্পত্তি অর্জন মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। কাজেই তাহাকে জোর করিয়া প্রতিহত করা চরম কল্যাণকর নহে। কিন্তু সেই বিত্ত ও সম্পত্তি অর্জন যাহাতে বৃহত্তর গণ-কল্যাণের পক্ষে এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ক্ষতিকর না হইয়া দাঁড়ায় সেজন্য ইসলাম কতকগুলি অপ্রতিলঙ্ঘ্য কঠোর বিধি-নিষেধের অধীনে তাহার অনুমতি দিয়াছে।

এই বিধানগুলির প্রথম হইল "যাকাৎ"। প্রত্যেক পূর্ণ-বয়স্ক, সুস্থ-মস্তিষ্ক মুসলমানকেই বৎসরান্তে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যদি তাহার 'নিসাব'-পরিমিত অর্থাৎ প্রায় ৫০ টাকা পরিমিত মূল্যের সম্পত্তি উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাকে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাৎ দিতেই হইবে![১] ইহা 'ফরয' অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপালনীয়। প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর যাকাৎ অনাদায়ের জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় বিধান হইল "ওশর্"। ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশকে বলা হয়, 'ওশর্'। ইহাও অবশ্য দেয়। এই যাকাৎ ও ওশরের উপর দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের, "হক" বা ইসলামী আইনগত অধিকার রহিয়াছে। তৃতীয় বিধান হইল "সাদ্‌কা" বা আল্লাহ্‌র পথে দান। "যাকাৎ" এবং "ওশর" পরিশোধের পরও যদি কাহারো অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ ও অর্থ থাকে তবে তাহা সঞ্চিত করিয়া না রাখিয়া 'সাদ্‌কা' বা আল্লাহ্‌র পথে দান করিবার জন্য অর্থাৎ জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ব্যয় করিবার নিমিত্ত কুরআনে বার বার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের সুরা আল্-বাকারায় ১৭৭ আয়াতে বলা হইয়াছে "তুমি মুখ পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিমদিকে ফিরাও, ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতা তাহার মধ্যে নাই। ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতা হইল তাঁহার (আল্লাহ্‌র) প্রতি ভালবাসার জন্য বিত্ত দান

১. বর্তমানে টাকার মূল্যের পরিবর্তন হওয়াতে এই হিসাবের পরিবর্তন হয়েছে।

www.pathagar.com

করা।" সাদ্‌কা বা দান সম্পর্কে কুরআনে এরূপ অসংখ্য আয়াত আছে। কিন্তু যাহারা এই সকল নির্দেশ অমান্য করিয়া ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত ও পুঞ্জিত করিয়া রাখে কুরআনে তাহাদিগকে কঠিনতম সাজার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। "সূরা হুমাযার" ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আয়াতে বলা হইয়াছে, "যে ধন সঞ্চয় করে এবং তাহা গণিয়া গণিয়া রাখে, সে মনে করে যে তাহার ধন তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে ; কখনই নহে—সে নিশ্চয় হুতামায় (আল্লাহ্‌র প্রজ্জলিত হুতাশনে) নিক্ষিপ্ত হইবে।" কুরআনে অন্যত্র বলা হইয়াছে, "যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ মানবকল্যাণে) ব্যয় করে না, তাহাদের নিকট কঠোর শাস্তির সংবাদ জ্ঞাপন কর।" কুরআনের এই সকল আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় Hoarding ও Capitalism ইসলামের কাম্য নহে—ইসলাম চায় জনগণের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ধন বন্টন। Hoarding ও Capitalism নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসলামের চতুর্থ বিধান হইল—'রিবা" বা সুদ গ্রহণের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা। প্রধানতঃ যে সকল un-carned income বা অনুপার্জিত আয় ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তি, সুদ তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তাই সুদ নিষিদ্ধ করিয়া ইসলাম Hoarding ও Capitalism-এর মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এ সম্পর্কে ইসলামের পঞ্চম বিধান হইল উত্তরাধিকার আইন। এই আইনের ফলে বিরাট ধনুকুবেরও তিন পুরুষের মধ্যে সাধারণ আর্থিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে বাধ্য।

ইসলামের অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে উপরে যে সকল আলোচনা হইল তাহা হইতে ধীরমস্তিষ্ক ও দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্রবাদ কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত উগ্র, অকার্যকরী ও অবাস্তব নীতি অপেক্ষা কতখানি উন্নত ও দূরদর্শিতাপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (দ:) ছিলেন নবী—মানব জাতির নৈতিক শিক্ষক। তিনি ছিলেন রহ্‌মতুল্‌লিল্ 'আলামীন—বিশ্ব ভূমণ্ডলের নিকট আল্লাহ্‌র করুণার দান। তিনি তাঁহার নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন উপরোধের দ্বারা। ডিক্টেটারদের মতো বলপ্রয়োগ দ্বারা নহে। কুরআনের নির্দেশ, 'লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন"—ধর্ম সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নাই—তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। আজ জগতে চল্লিশ কোটি[২] মুসলমানের অস্তিত্বই তাঁহার সেই নীতির সাফল্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বল প্রয়োগ এবং জবরদস্তির উপর আস্থাবান ও নির্ভরশীল কমিউনিজম কমিউনিস্ট শাসিত রুশিয়াই কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি। ভবিষ্যতে জগৎ আরও অনেক কিছু দেখিবে।

---

২ বর্তমান এই সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটির কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে।—সম্পাদক

www.pathagar.com

বিপ্লব-সাধনায় কামাল

অচল আয়তনের পাষাণ-ভারে জীবন-প্রবাহ যেখানে রুদ্ধশ্বাস, প্রলয়ের ধ্বংস-দোলায় বিপ্লব আসে সেখানেই। স্তিমিতপ্রাণ জরাজীর্ণের পাণ্ডুর ম্লানিমার ভিতর দিয়া আলোদীপ্ত নব প্রাণ-শিখার যে নিত্য অভিযান—বিপ্লব তো-তাহাই। জাতির প্রাণ-শক্তি যেখানে মুমূর্ষু, সৃজনী-ক্ষমতা যেখানে বিলুপ্ত, যুগ-গতির সঙ্গে চলার প্রেরণা যেখানে নিশ্চল, বিপ্লব আসে সেখানে জীবনের বাণী নিয়া, সৃষ্টির উল্লাস বহিয়া, অগ্র-গমনের রণ-সঙ্গীত গাহিয়া। প্রতি জাতির শিরায় শিরায়ই এই বিপ্লবের বাণী, এই সৃজনের স্পন্দন নিত্যপ্রবাহিত। কিন্তু জাতির সকলে তাহা অনুধাবন করিতে পারে না। যাহারা এই নবসৃষ্টিকে, এই সৃজন-আকুতিকে রূপ দেয়, তাহারা কোথায় যেন সকলের সঙ্গে ভিন্ন, প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় তাহারা যেন একাকী, প্রাত্যহিকতার প্রচলিত বিধানের সঙ্গে কোথায় যেন তাহাদের সম্মতি নাই—সকলের সঙ্গে থাকিয়াও তাহারা সকলের বাহিরে, সকলের ঊর্দ্ধে। তাহারা বিশিষ্ট। সত্যকে তাহারা সত্য বলিয়াই স্বীকার করে—তাহার পশ্চাতে কোন ধর্ম্মীয় বা সামাজিক বিধানের সমর্থন আছে বলিয়া নহে। অন্যায় তাহারা সহিতে পারে না, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাহারা করিবেই। জ্ঞান-সঞ্চারের প্রথম দিন হইতে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তাহাদের জীবনে এ-বৈশিষ্ট্য নিত্যপরিস্ফুট। নব্যতূর্কীর জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের জীবনেও এ-নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই।

নয় বৎসর বয়সে কামাল হইলেন পিতৃহীন। পিতা আলীরেজা ছিলেন দরিদ্র। মৃত্যুর সময় স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই কিছুই। মাতা জোবেদা অনন্যোপায় হইয়া স্বামীর আবাস-স্থল স্যালোনিকা পরিত্যাগ করিয়া শহরেরই নিটকবর্তী লাজাসান নামক গ্রামে তাহার এক ভাইয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এইখানে কামালকে আস্তাবল পরিষ্কার, পশুর-খাদ্যপ্রদান, মেষ চরানো প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইত। ইহার দুই বৎসর পর জোবেদা অনেক চেষ্টার পর তাহার এক ভগ্নীর অর্থসাহায্যে কামালকে আবার স্যালোনিকার এক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। দীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপী দুঃখ-কষ্টের পর কামালের জীবনে আবার সুখের বাতাস বহিল। কিন্তু এ-সুখ তাহার বেশীদিন সহিল না। ক্লাশের ছাত্রদের সঙ্গে একদিন তাহার ঝগড়া হয়। এ-ঝগড়াতে তাহার দোষ ছিল না। কিন্তু শিক্ষক তাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। কামাল ইহার প্রতিবাদ করায় শিক্ষক ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ প্রহার করেন। কামাল তখন একাদশ বৎসরের বালক মাত্র। পিতৃহীন। নিঃস্ব জননী ছাড়া পৃথিবীতে আপন বলিতে কেহ নাই। তবু কামাল শিক্ষকের এ-অন্যায় অত্যাচার নত মস্তকে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে তিনিও-শিক্ষককে প্রতি আঘাত করিলেন এবং সেই যে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, সেই স্কুলে আর কিছুতেই ফিরিয়া গেলেন না। এইখানে আমরা কামালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ দেখিতে পাই—বিপ্লবী কামালের অগ্নিময় জীবনের প্রথম স্ফূলিঙ্গ-স্ফূরণের সন্ধান পাই।

www.pathagar.com

মাতার ইচ্ছা ছিল কামাল হোজা বা ধর্ম্মযাযক হউক। কিন্তু কামালের এ-জীবন পছন্দ হইল না। স্যালোনিকার সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন পোষাক পরিধান করিয়া মার্চ্চ করিয়া চলিত, কামাল সকল ভুলিয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি হইবেন সৈনিক, তিনি হইবেন সেনাপতি—মানুষের নেতা, মানুষের পরিচালক। কিন্তু পুত্রের এ-আকাঙ্ক্ষা মাতার মনঃপূত হইল না। একটী মাত্র পুত্রকে সামরিক জীবনের বিপদ-সঙ্কুল পথে তিনি ঠেলিয়া দিতে পারেন না। কামাল আবার বিদ্রোহ করিলেন। মাতা কোনরূপ বাধাদানের সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই তিনি গোপনে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিলেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া গেলেন।

কামাল এইখানে জীবনের প্রকৃত আস্বাদ পাইলেন—এইখান হইতেই তাঁহার নবজীবন আরম্ভ হইল। শীঘ্রই তিনি ক্লাশে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। অঙ্কে ও সামরিক বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা এত অসাধারণ ছিল যে, দ্বিতীয় বর্ষ হইতে নিজ ক্লাশে অধ্যয়ন ব্যতীত উক্ত বিষয়ে নিম্নশ্রেণীতে তিনি অধ্যাপনাও করিতেন।

১৭ বৎসর বয়সে স্যালোনিকা সামরিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অতি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে মনাস্তিরের উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই সময় মনাস্তির যুদ্ধযাত্রী সেনাবাহিনীর মার্চ্চের তালে তালে ও কামানের গর্জ্জনে মুখরিত। গ্রীস ক্রীট্দ্বীপ দখল করিয়াছে। তুরস্ক যুদ্ধঘোষণা করিয়া সমরক্ষেত্রে দ্রুত সেনাপ্রেরণ করিতেছে।

সারাদেশ ব্যাপিয়া তখন নানারূপ গোলযোগ ও বিবাদ-বিসম্বাদের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে—যুদ্ধ আর যুদ্ধের গুজবে সমগ্র দেশ অনুরণিত। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত। ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিবর্গ এই আসন্ন মৃত্যু-যাত্রী মুসলিম সাম্রাজ্যের দেহ ঘেরিয়া বসিয়া আছে—প্রত্যেকেই তাহার একটা বিরাট অংশ ছিন্ন করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

শুধু বাহির হইতে নয়, অন্তবিপ্লবেও তখন এই সাম্রাজ্য ছিন্নবিছিন্ন। ষোড়শ শতাব্দিতে ওসমানীয় সম্রাটদের গৌরবের দিনে সুলতানকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, দেশের শাসন-প্রণালী তখনও তেমনি আছে। কিন্তু কালের পরিবর্তনে তখন তাহা যুগজীর্ণ—নিষ্ফল, কলুষ-কলঙ্কিত। সর্ব্বত্রই দারিদ্র্য ও অসন্তোষ। যুবকেরা শাসনসংস্কার চাহিতেছে।

ইউরোপে Red fox বা লোহিত শৃগাল নামে পরিচিত নিষ্ঠুর ও ধূর্ত সুলতান আবদুল হামিদ তখন তুরস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি নিজের প্রজা ও বৈদেশিক—সকলকেই সমান ভয় করিতেন। কোন নূতন চিন্তাধারাকেই তিনি দেশে বিস্তারলাভ করিতে দিতেন না। সকল প্রকার শাসন-সংস্কারেরই তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। সমগ্র সাম্রাজ্য তিনি গোয়েন্দা দ্বারা এমনইভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, যেখানেই তিনটি লোক একত্রে কথা বলিত, সেখানেই একটি গোয়েন্দা তাহাদের আলাপ আড়ি পাতিয়া শুনিয়া গুপ্ত পুলিশের নিকট রিপোর্ট করিত। কোনরূপ স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত নিরাপত দেশের কোথাও ছিল না। দেশ-প্রেমিক তূর্কীদের দ্বারা কারাগারসমূহ তখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশের আকাশ-বাতাস তখন বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বহ্নি বাস্পে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ মনাস্তিরের চতুষ্পার্শবর্ত্তী বল্কান প্রদেশে বিপ্লবাগ্নি যে-

কোন মুহূর্তে প্রজ্বলিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুলতানের বিরোধিতা সত্ত্বেও নবনব ভাবধারা জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল।

যুবক কামাল যৌবন-সুলভ উদগ্র আগ্রহ নিয়া এই নূতন চিন্তাধারায় দীক্ষা নিলেন। অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, কর্তৃত্ব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—তাহা সুলতানেরই হউক, কিংবা অন্য যাহারই হউক।

ছুটির সময় যখন তিনি স্যালোনিকায় থাকিতেন, তখন তথাকার কয়েকজন ফরাসী সন্ন্যাসীর নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষায়ই তিনি অধিক সময় ব্যয় করিতেন। এইখানে তিনি ফেতি নামক একজন মেসিডোনিয়ান যুবকের বন্ধুত্বলাভ করেন। ফেতি ভাল ফরাসী জানিতেন। দুই বন্ধু মিলিয়া ভল্টেয়ার, রুশো ও অন্যান্য ফরাসী লেখকদের লিখিত সকল প্রকার বিপ্লবাত্মক পুস্তক এবং হব্‌স্ ও জন্ ষ্টুয়ার্টমিলের রাজনৈতিক ও অর্থনীতিমূলক পুস্তকাদি অধীর আগ্রহে পাঠ করিতেন। এই সকল পুস্তক তখন তুরস্কে বাজেয়াফ্‌ত এবং ইহাদের সহিত ধরা পড়িলে কারাবাস সুনিশ্চিত। কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনাই দুই বন্ধুকে এই সকল পুস্তকপাঠে আরও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিত।

কামাল এই সময় তাহার এই নব-লব্ধ বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা নিয়া তাহার সহপাঠি ও সামরিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করিলেন : তুরস্ক-- তাহাদের তুরস্ককে বৈদেশিক কবল ও সুলতানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেই হইবে। মুক্তি ও স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করিতেন এবং তেজোদীপ্ত ভাষায় অগ্নিময়ী কবিতাও লিখিতেন।

স্যালোনিকা সামরিক বিদ্যালয়ের মত মনাস্তিরের উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায়ও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তিনি সাব-লেফ্‌টেনান্ট পদ প্রাপ্ত হন এবং কনষ্টান্টিনোপলের জেনারেল ষ্টাফ-কলেজ (সৈনাধ্যক্ষদের শিক্ষালয়) হারবিয়াতে উচ্চতম সামরিক শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হন।

এই সময় কামালের বয়স ২০ বৎসর। এই জেনারেল ষ্টাফ-কলেজ হইতেও কামাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন-পদে নিযুক্ত হন।

কনষ্টান্টিনোপলের জেনারেল ষ্টাফ-কলেজে অধ্যয়নকালেও কামাল তাহার বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, এখানকার ছাত্রদের সকলেই বিপ্লববাদী। প্রত্যেক তরুণ অফিসারই সুলতানের অত্যাচার ও তুরস্কের শাসন ব্যাপারে বৈদেশিকদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

কলেজের শিক্ষকগণ ও বহু উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারী ছাত্রদের এই বিপ্লবাত্মক মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে এই সব মতবাদ প্রচার করা কিংবা এই সম্পর্কে ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সাহস তাঁহাদের ছিল না।

কামাল এই কলেজে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সেখানে "ওতন্" বা "স্বদেশ" নামক একটি বিপ্লব-সমিতি ছিল। সমিতি গোপনে আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করিত এবং হাতে লেখা একটি পত্রিকা পরিচালনা করিত। পত্রিকাটির পাঠ শেষ হইলে একজনের নিকট হইতে আর

একজনের নিকট হাতে হাতে বিলি হইত। এই পত্রিকাতে তুরস্কের পুরাতন শাসন-প্রথা, সুলতানের অযোগ্য কর্ম্মচারীগণ ও তাঁহার অত্যাচার সম্বন্ধে প্রবল আক্রমণ থাকিত।

এই সমিতির সদস্যগণকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, সুলতানের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-তন্ত্র ভাঙিয়া তৎস্থলে নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন এবং জনসাধারণকে.......পুরোহিতদের হস্ত হইতে এবং নারীদিগকে বোরকা ও হেরেমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। তুরস্ককে সুলতান ও তাহার গুপ্তচরেরা গলা টিপিয়া ধরিয়াছে—নূতন ভাবধারা যদি তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত না করা যায়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত।

কামাল এই 'ওতন' দলে যোগদান করিলেন। তাহাদের পত্রিকার জন্য তিনি উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমিতির গুপ্ত আলোচনা সভাতে তিনি যে-সকল বক্তৃতা দিতেন তাহাতেও প্রচলিত শাসন ও সমাজবিধির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ থাকিত।

কলেজের অধ্যক্ষও এই সমিতির কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সকল সংবাদই জানিতেন, কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। সুলতানের গোয়েন্দারা এই সমিতির অস্তিত্বের কথা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সুলতানকে জানাইল। সুলতান চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি মিলিটারী ট্রেনিং-এর জেনারেল ইসমাইল হাক্কি পাশাকে যাহাতে 'ওতন' বন্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ বিলেন। ইসমাইল হাক্কি কলেজের অধ্যক্ষকে এই সমিতির জন্য যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। বাধ্য হইয়া কলেজ-অধ্যক্ষ সমিতির অধিবেশন যাহাতে আর কলেজ-অভ্যন্তরে না হয়, তাহার জন্য সাবধান হইলেন।

কিন্তু ছাত্রগণ কলেজের বাহিরে "ওতন" চালাইতে লাগিলেন। তখন "ওতন" আলোচনা-সমিতিরূপে না থাকিয়া কনষ্টান্টিনোপলের অন্যান্য শত শত গুপ্ত সমিতির মত আর একটি গুপ্ত সমিতির আকার ধারণ করিল।

কামালের পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবার পরে চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক সপ্তাহ সময় তিনি হাতে পাইলেন। এই সময় "ওতন"-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি এক জন-বিরল রাস্তায় একটি ঘর নিয়া সমিতি ও পত্রিকার গুপ্ত অফিস স্থাপন করিলেন। বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধবদের গৃহে অথবা গৃহের পিছনের কামরায় তিনি সমিতির গোপন সভার আয়োজন করিতেন।

কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সদস্যগণ অতি সাবধানে এই সকল সভায় যোগদান করিতেন।

এই সকল সভার গোপনতা ও বিপদাশঙ্কাই কামালকে উৎসাহ-উদ্দীপিত করিয়া তুলিত। এই সময়ই তিনি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগঠনের কায়দা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন-প্রণালী, নূতন সদস্যদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষার নিয়ম, সাঙ্কেতিকপত্র, বাক্য ও চিহ্ন বুঝিবার উপায় এবং বৈপ্লবিক প্রতিজ্ঞাগ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন।

সদস্যগণকে যাহাতে কাগজপত্রের সহিত ধরিতে পারে, সেজন্য পুলিশ সর্বক্ষণই তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকিত। ইহা বিশেষ কঠিন কাজও ছিল না—কারণ তাহারা এ-পথের অনেকটা নূতন পথিক বলিয়া অভিজ্ঞতা-জাত জ্ঞান অপেক্ষা উৎসাহই তাহাদের বেশী ছিল। একজন গোয়েন্দা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। উক্ত

www.pathagar.com

গোয়েন্দা নির্দ্ধারিত সময়ে একজন নূতন সদস্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য সমিতির সকল সদস্য একত্রিত হইলে পুলিশ অকস্মাৎ তাহাদের গৃহ অবরোধ করিয়া সকলকে গ্রেফতার করে। "ওতনে"র অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কামালও ইস্তাম্বুলের লোহিত কারাগারে (Red Prison) বন্দী হন। তাঁহার মোকদ্দমাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। পুলিশ তাঁহার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করে। তাঁহাকে অন্যান্যের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ করা হয়। ভবিষ্যত তাঁহার অন্ধকারময়। সুলতান যদি তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিক লোক বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে হয়ত তাঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় নিতে হইবে অথবা বহু বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ কিম্বা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। তাহার পূর্ব্বেও বহুলোক এই লোহিত কারাগার হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—জীবনে তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার মাতা ও ভগ্নী স্যালোনিকা হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইল না। তবে তাঁহারা তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাঠাইতে সমর্থ হইলেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া এক স্বল্প-পরিসর অপরিচ্ছন্ন কামরায় আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দিনের বেলায়ও সে-কামরা অন্ধকারময়। বহু উর্দ্ধে একটী সূত্র জানালা দিয়া অতি সামান্য আলো-বাতাস ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিত। দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার আত্মা যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ একদিন পূর্ব্বাহ্নে কিছু না জানাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে ইছমাইল হাক্কি পাশার অফিসে নিয়া যাওয়া হইল। কামাল দুইজন সামরিক পুলিশের মধ্যে সোজা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

পাশা তাঁহাকে অনেক প্রকার ভয় দেখাইয়া ও উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন : "মহামান্য সুলতান তোমাকে এবার ক্ষমা করিলেন। তুমি এখনও তরুণ ও নির্ব্বোধ। বোধ হয়, তুমি বাস্তবিক যতখানি খারাপ তাহার চেয়ে অনেকখানি বেশী মাথাগরম। যাহা হউক, তোমাকে দামাস্কাসে অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিয়োগ করা হইল। সেখান হইতে তোমার সম্বন্ধে কি রিপোর্ট পাই তাহার উপরই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সাবধান, তোমাকে দ্বিতীয়বার ক্ষমা করা হইবে না।"

ঐ রাত্রেই পুলিশ তাঁহাকে এক পাল-দেওয়া সিরিয়াগামী জাহাজে তুলিয়া দেয়। কোন বন্ধুবান্ধব, এমন কি মায়ের সঙ্গেও, তাঁহাকে দেখা করিতে দেওয়া হইল না।

দীর্ঘ আশিদিন জাহাজে ভ্রমণ করিয়া তিনি বয়রুতে অবতরণ করেন এবং তথা হইতে অশ্বারোহণে দামাস্কাসে তাঁহার নিদ্দিষ্ট বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে গিয়াই দেখিলেন যে ব্রুসদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তাঁহার বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দামাস্কাসের দক্ষিণে লেবানের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্রুসেরা বাস করে। ইহাদিগকে বিদূরিত করিয়া কামাল তাঁহার বাহিনীসহ দামাস্কাসে ফিরিয়া আসেন।

দামাস্কাসে আসিয়াই তিনি তথায় "ওতন" এর এক শাখা স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। নির্জ্জন কারাবাস কিংবা হাক্কি পাশার ভীতি প্রদর্শন কিছুই তাহার অফুরন্ত প্রাণশক্তির কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে নাই। ভীতও তিনি হন নাই। তিনি ছিলেন যথার্থ

www.pathagar.com

বিপ্লবী। যৌবন-সুলভ উদ্যম ও উদ্দীপনা তখনও তাহার ছিল। কিন্তু এবার তিনি হইলেন অত্যন্ত সাবধান। লোক-নির্ব্বাচনেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন। তিনি কবিতা ও সাহিত্য রচনা ছাড়িয়া দিলেন। তিনি স্থির করিলেন, সাহিত্য ও কাজ একসঙ্গে চলিতে পারে না। কারণ সাহিত্য কঠোর হৃদয়ের ইচ্ছা ও শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কাজেই সাহিত্যচর্চাকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি বিপ্লবের সবিস্তার কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও সংগঠন-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেখিলেন, বিপ্লবের জন্য জমি প্রস্তুত হইয়াই আছে। শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। কনষ্টান্টিনোপলের মত এখানেও তরুণ অফিসারগণ অসন্তুষ্ট এবং উর্দ্ধতন অফিসারগণ তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কামাল এইখানে তাঁহার বিপ্লবকার্য্যে সাহায্যের জন্য মুফিদ লুতফী নামক সামরিক বিদ্যালয়ের তাঁহার একজন পুরাণ সাথী পাইলেন। দ্রুত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল এবং দেখিতে দেখিতে সিরিয়ার সকল বাহিনীর মধ্যে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কিন্তু কামাল দেখিলেন, ইহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দামাস্কাস হইতে বিদ্রোহ আরম্ভ করা। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ স্থানীয় তুর্কী বাহিনীর অফিসারগণ যদিও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

বন্ধুগণ তাহাকে সংবাদ পাঠাইল যে, বর্ত্তমান বিপ্লবের কেন্দ্র হইল বল্‌কানে। সুতরাং তিনি যেন স্যালোনিকায় বদলী হইবার চেষ্টা করেন।

কামাল সঙ্কল্প করিলেন যে, বদলীর অনুমতি পান বা না-ই পান, তিনি স্যালোনিকা যাইবেনই। ঐ সময় সিরিয়ার সীমান্তবর্ত্তী জাফা বন্দরে আহমদ বে নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও 'ওতন' দলের লোক। তিনি কামালকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তদনুসারে কামাল কয়েক দিনের ছুটী নিয়া জাফায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি এক জাল পাসপোর্ট নিয়া এক ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন এবং সওদাগরের বেশধারণ করিয়া মিসরগামী এক হাজাজে আরোহণ করিয়া বসিলেন। তথা হইতে তিনি আসিলেন এথেন্সে এবং এথেন্স হইতে স্যালোনিকায়। প্রত্যেক স্থানেই তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই একই রকম অসংখ্য, একই রকম গুপ্ত সমিতি এবং সেই একই বিপ্লব আয়োজন।

স্যালোনিকায় তিনি তাঁহার মাতার গৃহে লুকাইয়া রহিলেন এবং কিছুকাল বিশেষ কোন কাজে হাত দিলেন না। তাঁহার ধারণাই সত্য হইয়াছে। স্যালোনিকাই বিপ্লবের কেন্দ্র। প্রধান প্রধান জুনিয়ার অফিসারগণ সকলেই আসিয়া সেখানে সম্মিলিত হইতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেখানে কোন বৃহৎ আয়োজন চলিতেছে। মা ও ভগ্নীর সাহায্যে তিনি ষ্টাফ-কলেজের তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় বদলীর জন্য দরখাস্ত করিলেন।

কিন্তু তিনি কিছু করিবার পূর্ব্বেই সুলতানের গোয়েন্দারা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল! তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য কন্‌ষ্টান্টিনোপল হইতে আদেশ আসিল। পুলিশ-বিভাগের অধ্যক্ষের সহকারী জমিল কনষ্টান্টিনোপলের 'ওতন' দলের সদস্য ছিলেন। তিনি কামালকে সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন যে, কামালের গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা দুইদিন পর্য্যন্ত কোনমতে আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে—ইহার বেশী নয়। ইতিমধ্যে যেন কামাল স্যালোনিকা হইতে সরিয়া পড়েন।

www.pathagar.com

সংবাদ পাওয়া মাত্র কামাল সীমান্ত পার হইয়া গ্রীসে চলিয়া গেলেন এবং তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া জাফার আসিলেন। কিন্তু তিনি জাফায় পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা জাফায় যাইয়া উপস্থিত হয়। এইবার তাহাকে ধরিতে পারিলে আর ক্ষমা নাই। জীবনে আর তাহাকে লোহিত কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে না।

যে-আহমদ বের সাহায্যে কামাল জাফা হইতে স্যালোনিকায় যাইবার বন্দোবস্ত করেন, সেই আহমদ বের হস্তেই কামালকে গ্রেফ্‌তার করিবার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি কামালের সঙ্গে জাহাজে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেখান হইতেই গোপনে অতি তাড়াতাড়ি দক্ষিণাভিমুখে গাজায় পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সীমান্তে তখন গোলমাল চলিতেছিল এবং দামাশকাসস্থিত বিপ্লবী সহকর্মী মূফিদ লুত্‌ফী তথাকার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।

আহমদ বে কন্‌ষ্টান্টিনোপলে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহাদের হয়ত ভুল হইয়াছে, কারণ কামাল সর্ব্বক্ষণই গাজাতে আছেন। তিনি কখনো সিরিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইতিমধ্যে মূফিদ্ লুত্‌ফিও জানাইলেন যে, কামাল সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গেই আছেন। এইরূপ 'ওতন' দলের দুই বন্ধুর সাহায্যে কামাল এইবারও বাঁচিয়া গেলেন।

ইহার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত কামাল চুপচাপ রহিলেন। তিনি জানিতেন, সুলতানের পুলিশ এবার তাঁহাকে ধরিতে পারিলে দিনের আলো আর তাঁহাকে দেখিতে হইবে না। তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। উর্দ্ধতন অফিসারেরা রিপোর্ট দিলেন যে কামাল যথার্থই একজন কর্ম্মদক্ষ অফিসার এবং অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। কন্‌ষ্টান্টিনোপলের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে, স্যালোনিকার গোয়েন্দাগণ ভুল করিয়াছিল এবং এই তরুণ অফিসারটী পূর্বের বদ্-খেয়াল পরিত্যাগ করিয়া শান্ত জীবনযাপন করিতেছেন।

কিন্তু কামালের ইচ্ছা স্যালোনিকায় যাইবার সময় পূর্ব্বের মতোই অটুট। তাহার জন্মস্থানে যখন বৃহৎ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে তখন সুদূর সিরিয়ার তিনি অকর্ম্মন্যভাবে বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন। সমর-বিভাগ হইতে নিম্নস্থ সকল বিভাগের 'ওতন'-সদস্যদিগকে তিনি জানেন। তিনি তাঁহাদের সকলের সাহায্যে স্যালোনিকায় বদলী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইল। তিনি অতিসত্বর বিপ্লবের কেন্দ্র-ভূমি স্যালোনিকায় রওনা হইলেন

এখানে আসিয়া কামাল ষ্টাফ-কলেজের পরিচিত বহু তরুণ অফিসারের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাদিগকে নিয়া তিনি এখানে 'ওতনে'র একটা শাখা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে তিনি জানিতে পারিলেন, এই তরুণ অফিসারগণ অন্য একটী বিপ্লবীদলের সদস্য। এই বিপ্লবীদলের নাম হইল 'ইউনিয়ান এণ্ড প্রগ্রেস পার্টি' অর্থাৎ "ঐক্য ও প্রগতি দল"। কামালের বাল্যপরিচিত মেসিডোনিয়ার ফেতিও এই দলের একজন সভ্য। কামালও অবশেষে এই দলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই দলের নেতা ছিলেন আনোয়ার, জামাল, জাবিদ, নিয়াজী এবং জালাত। এই দলই সুলতান আবদুল হামিদকে বন্দী করিয়া তুরস্কের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্ত্তন করেন।

www.pathagar.com

ইকবাল-কাব্যে স্বদেশপ্রেম

ইকবালের কাব্য-সাধনার ধারা উর্দ্দু ও ফারসী ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত। কিন্তু উর্দ্দুই ইকবালের মাতৃভাষা। সেইজন্য তাঁহার উর্দ্দু রচনাই সংখ্যায় বেশী এবং "আছ্রার-ই-খুদী" প্রমুখ কয়েকটী কাব্য ব্যতীত তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাই উর্দ্দুভাষায় রচিত। ভারতীয় ভাষাগুলির ভিতর বয়সের দিক দিয়া উর্দ্দুই সর্ব্বকনিষ্ঠ। কিন্তু এই কনিষ্ঠতম ভাষাকেই ইকবালের সকল লেখনী জগতের জ্ঞান-গরিষ্ঠ ভাষাসমূহের সমপর্য্যায়ে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। মোগলের গৌরব-রবি গোধূলির ম্লান আভার অস্তাচলের কৃষ্ণগর্ভে যখন ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল, মোগল-সভ্যতার সেই স্তিমিত আলোকে উর্দ্দু-সাহিত্যের জন্ম। রাজ-গৌরব-লুপ্ত ফারসী ভাষা ভারতে তখন প্রায় গতায়ু। সেই মুমূর্ষু ফারসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল উর্দ্দু। জন্ম হইল বটে, কিন্তু এই নবজাত শিশুটীও জননীরই মতো রোগ-গ্রস্ত ও দুর্ব্বল, নবজীবনের প্রাণ-শিহরণ তাহাতে নাই, জাগরণ-মুখর নও-প্রভাতের উদ্বেল আশা তাহাতে লীলায়িত হইয়া উঠিল না। উঠিল যাহা তাহা শুধু স্তিমিয়মান প্রাণ-প্রদীপের নির্ব্বানোন্মুখ কম্পিত কণ্ঠেই শোভা পায়—'মর্সিয়া ও গজল'—সুপ্তশ্রী পরাজিত জীবনের অশ্রুবিকৃত শোক-বিলাপ আর বীর্য্যহীন কাপুরুষতার কাম-বিহ্বল প্রেম-গীতিকা। ফারসী ভাষাভাষী শাহানশাহ্‌দের গৌরব-মধ্যাহ্নে দিগ্বিজয়ের জয়-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শাহ্‌নামা'র ন্যায় বীর্য্যবান যেসব অমর কাব্য ফারসী-ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অস্তায়মান গৌরবের বিবশ নীলিমায় যে-কাব্য রচিত হইল তাহা হইল তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীন—পৌরুষহীন, বিলাস-কলঙ্কে ক্লেদ-পঙ্কিল অথবা নিরাশ্রীয় ব্যথা-ক্রন্দনে অবসন্ন ক্ষীণ। ফারসী সাহিত্যের গৌরবের দিনে পার্থিব গৌরবময় বীর্য্যবান কাব্য-রচনা ব্যতীত পরমার্থমূলক আর এক অপরূপ কাব্য-সম্ভারেও সাহিত্যের মণিকোঠা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আজও সে-দান চির-উজ্জ্বল। পারস্যের সূফী বা মরমী কবিগণ রস-কাব্যের স্রষ্টা। হাফেজ ও রুমী, ওমর ও জামী বিশ্বের মর্ম্ম-দুয়ারে আজো নিত্যদিন হানা দিয়া ফিরে—পাপ-তাপ-ক্ষুব্ধ বেদনা-দগ্ধ মানুষকে আজো পরমার্থপ্রেমের অমৃত পরশে জুড়াইয়া দেয়। তাঁহারা শরাব ও সাকী, গোলাব ও বুলবুলের রূপকে প্রেম ও প্রিয়তমের যে সুমধুর বর্ণনা দিয়াছেন, সে-প্রেম ও প্রিয়তম পরমার্থময়। কিন্তু পরবর্তীকালীন পতন যুগে যে-সকল অক্ষম কবি তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়াছে তাহারা ক্ষীরকে ছাড়িয়া শুধু নীরকেই গ্রহণ করিয়াছে—আত্মাকে ত্যাগ করিয়া শুধু দেহকেই পূজা করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, পরমার্থপ্রেমের নির্ম্মলতা ও জীবন-প্রবাহকে ছাড়িয়া তাহারা পার্থিব কামনার দেহ-সর্ব্বস্বতার জয়গানেই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কালো কেশ, ক্ষীণ কটী, বঙ্কিম ভুরু অথবা রক্ত-অধরের বর্ণনায়ই তাহাদের সমস্ত কাব্যশক্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এবং এ-বর্ণনা একান্তই রক্তমাংসময় দেহের—বৈদেহী প্রিয়ার রূপ বর্ণনার সঙ্গে ইহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ফারসী সাহিত্যের এমনই দুর্দ্দিনে

www.pathagar.com

তাহারই গর্ভে হইল উর্দ্দুর জন্ম। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উর্দ্দু-সাহিত্য ফারসী সাহিত্যেরই অনুসরণ করিল। তাহারই ফলে তখন উর্দ্দুভাষায় যে সাহিত্যসৃষ্টি হইল, তাহা যেমনই দুর্ব্বল, তেমনই প্রাণঘাতী। প্রাচ্যের শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো তখন প্রায় নির্ব্বাপিত। প্রতীচির নবার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অরুণ-শিখা প্রাচীর দিকচক্রবালে তখনও ভাস্বর হইয়া উঠে নাই। পেন্‌শনভোগী এক পুতুল বাদশাহ্ আকবর ও শাহজাহানের তখ্‌তে তখন সমাসীন। ফতেহ্‌পুর ও পানিপথ-বিজয়ীর সেই বংশধর কুক্কুট-যুদ্ধ ও উড্ডীয়মান ঘুড়ি-যুদ্ধে জয়লাভ করাকেই জীবনের চরম পৌরুষ জ্ঞানে আহলাদিত। অপর দিকে অযোধ্যার বিলাস-কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে বিলাসী নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের রাজসভা বাইজী ও নর্ত্তকীদের মধু-কণ্ঠ ও নূপুর-নিক্কণে গুঞ্জরিত। তেমনি দিনে তেমনি রাজসভার ছায়াতলে যে-কাব্য রচিত হইল তাহাতে—প্রেম-শিরাজী নয়—কাশ্মীর ও কাবুলের আঙ্গুর-চোয়ানো শিরাজীময় ভর্-পেয়ালীর ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ছাড়া আর কি-ই বা আশা করা যাইতে পারে? ভারতীয় মুসলমান ও উর্দ্দু-সাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে যে দুইজন কবি কাব্য-রচনার গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া দিয়া এই পতনকে রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহাদের অমর কাব্যের আবেহায়াতে এই মুমূর্ষু জাতিকে সঞ্জীবিত করিবার সাধনায় মগ্ন হইলেন তাঁহাদের একজন 'গালিব', আর একজন 'হালি'। গালিবের কাব্য মিষ্টিক বা মরমীশ্রেণীর এবং দার্শনিক ভাবাপন্ন আর হালির কাব্য জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমমূলক। কিন্তু এই দুইজন যে-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ পরিণতিলাভ করিয়াছে ইক্‌বালের মধ্যে। ইকবাল এই দুইজনের সমষ্টিগত মানস-পুত্র। কিন্তু তিনি দুইজনকেই কাব্য-প্রতিভায় বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন। গালিব ও হালির সাহিত্য সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইকবাল-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের অমর সম্পদ। কয়েক শতাব্দীর ভিতর সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ইকবালের সমকক্ষ কবি আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইকবাল শুধু কবি নন—তিনি দার্শনিক। তাঁহার "আস্‌রার-ই-খুদী", "রমুজে-বেখুদী' প্রভৃতি কাব্যে তিনি সুউচ্চ কাব্য-প্রতিভার সহিত সু-উচ্চ দার্শনিক প্রতিভার যে সমন্বয় দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান জগতে তাহা একান্ত বিরল। তাঁহার আর একটা বৈশিষ্ট্য : দার্শনিক ও মিষ্টিক কবিতার ন্যায় তাঁহার স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম-মূলক কবিতাগুলিও অতি উচ্চস্তরের। উর্দ্দু-সাহিত্য, এমন কি ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যেও, এর তুলনা নাই। মুসলিম লীগের পূর্ব্বতন সভাপতিরূপে অথবা "পাকস্থানে"র পরিকল্পনাকারীরূপে যাঁহারা ইকবালকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলিয়া মনে করেন, তাঁরা যে কতটা ভ্রান্ত, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম-মূলক কবিতাগুলি পাঠ করিলেই তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিম্নে এরূপ মাত্র তিনটী কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইল। অনুবাদে যথাসম্ভব মূলকে অনুসরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। "হিন্দুস্থানী বাচ্চুকা কওমী গীত" শীর্ষক কবিতাটিতে ছন্দানুসরণেরও চেষ্টা হইয়াছে।

"হিন্দুস্তানী বাচ্চুকা কওমী গীত"

(ভারতীয় ছেলেদের জাতীয় সঙ্গীত)

চিশ্‌তী শাহা সত্য-বাণী শুনাইল ভাই যেইখানে,
যেই বাগিচা ভর্‌ল নানক একত্বেরই জয়-গানে,
তূর্কী-তাতার কর্‌ল যারে নিত্যকালের জন্ম-দেশ,

www.pathagar.com

হেজাজ ছাড়ি' আর্‌বী এলো যার লোভেতে এই বিদেশ—
সেই যে মোদের জন্মভূমি, সেই তো মোদের আপন দেশ।

গ্রীকদিগকে করল যাহা শৌর্য্যবলে বিস্মিত,
যাহার জ্ঞানের শঙ্খ-রবে নিখিল-ধরা নিন্দিত,
যাহার মাটি কর্‌ল খোদা শস্যভাবে স্বর্ণ-দেশ
যাহার হীরক কর্‌ল উজল তুর্কীশাহের লেবাস্‌-বেশ—
সেই তো মোদের জন্মভূমি, সেই তো মোদের জন্ম-দেশ।

'ফারেছ'-গগন হইতে হ'ল যেই 'সেতারা' বিচ্যুত,
গগন-ভরা তারার সভায় যেই হ'ল ফের জয়-পুত,
শুন্‌ল জগৎ একত্বেরই জয়-গীতিকা যেই দেশে,
আরব-নেতা যেখায় চেয়ে শান্তি-সুখে যান হেসে—
সেই তো মোদের জন্মভূমি, জন্ম মোদের সেই দেশে।

মানুষ যাহার 'মুসা'র মতো, পাহাড় যাহার 'সিনা'র ন্যায়,
'নূহে'র জাহাজ জগৎ ঘুরি' যেইখানে শেষ থামল হায় !
ভূমি যাহার উচ্চতাতে ছুঁইছে যেন আকাশ-দেশ,
যেই দেশেতে বাস করাতে স্বর্গ-সম সুখ অশেষ—
সেই যে মোদের জন্মভূমি, সেই তো মোদের জন্ম-দেশ।

"তারানায়ে হিন্দী"
(ভারত-সঙ্গীত)

বিশ্ব-জাহান সবার সেরা এই গো মোদের হিন্দুস্থান।
আমরা সবাই বুলবুলি এর, এই আমাদের ফুল-বাগান।
রই যদি ভাই দূর্‌-বিদেশে, মন রহে হায় এইখানে—
সত্যি থাকা সেইখানে তো, মন রয়ে যায় যেইখানে।
পাহাড় যাহার উচ্চতম আকাশ-লোকের হয় মিতা,
সেই আমাদের সান্ত্রী-সেনা-জয় কভু'তো হয়নি তা ;
বক্ষে ইহার খেলছে নিতি হাজার নহর-উর্ম্মিদল
যার নিশাসে স্বরগ-সেরা দেশ আমাদের হয় শ্যামল।
জাহ্নবী গোল পড়ছে মনে কাফ্‌লা মোদের কোন কবে
তোমার তীরে আসল, প্রথম দিগ্বিজয়ের উৎসবে ?
ধর্ম্ম ইহার শিখায়না তো ভায়ে ভায়ে হিংসা-রেশ
আমরা সবাই ভারতবাসী, ভারত মোদের জন্ম-দেশ।
গ্রীস গিয়াছে, মিসর গেছে, 'রুম'ও গেছে নিঃশেষি,

www.pathagar.com

মোদের অমর নাম-নিশানা আজও উজল বিশ্বেই।
কোন্ সে কারণ, কিসের লাগি' আজো মোরা হইনি লয়
হাজার শত দীর্ঘ বরষ কালের আঘাত করনু জয়।
এক্‌বাল ওগো ! কেউ ধরাতে তোমার আমার বন্ধু নুন—
বুঝ্‌লো না যে মর্ম্মব্যথা কোথায় মোদের রয় গোপন।

"নয়া শেবালা"
(নব-শিবালয়)

হে ব্রাহ্মণ। কহ কহ সত্য কহ আজি
মনে মনে তব ব্যথা যদি নাহি ওঠে বাজি'
ঐ যে মন্দিরে তব রাজে শত দেবতা-প্রতিমা,
তাদেরে আড়াল করি জাগেনি কি কাল-সিন্ধু-সীমা ?

বৈরিতার বিষবাষ্পে আজি হেরি জর্জ্জর নিজেরা,
দেবতা-প্রতিমা যত ভেদ-শিক্ষা দেয়নি কি তারা ?
ধর্ম্মবক্তা যত
তারাও ধর্ম্মের নামে আজ হেরি স্বার্থ-লোভে রত।
মুছি' আখি-নীর,
বন্ধু ওগো ! তাই আজি ছাড়িয়াছি মস্‌জিদ-মন্দির

* * * *

প্রস্তর প্রতিমা রচি' কহ তুমি আছে খোদা সেথা।
মোর জন্ম-ভূমি-লীনা প্রতিবাসি,—সে মোর দেবতা।
হে ব্রাহ্মণ ! এস আজ, তুলে দাও বিচ্ছেদের বাধা,
খণ্ডিতেরে কর এক, রহিও না ছিন্ন-ভগ্ন-আধা,
চিত্তের মন্দির-পুরী রহিয়াছে শূন্য বহুদিন
নব তব শিবালয় রচ সেথা বিদ্বেষবিহীন।
বিশ্বের তীর্থের মাঝে শ্রেয়তম হোক তাহা হোক,—
জাগুক শিখর তার অভ্রভেদী চির-উর্দ্ধ-লোক।
উষার উদয় সনে নিত্য আমি এই মন্ত্র গাহি—
ভক্তেরা যেথায় যত প্রীতি-সুধা তারি লাগি' চাহি।
প্রেমের পূজারী যারা, আছে শান্তি তাহাদেরই গানে—
নিখিলের মুক্তি রাজে প্রীতি-স্নিগ্ধ সেই কলতানে।

www.pathagar.com

নজরুলকে যেমন দেখিয়াছি ও জানিয়াছি

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে—যতটুকু স্মরণ হয়—১৯২৪ সনে কলিকাতায়। ঐ সময় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত "মুসলিম পাবলিশিং হাউস" নামক একটি পুস্তক প্রকাশনালয় বা লাইব্রেরী ছিল। নদীয়া শান্তিপুরের বিখ্যাত সাহিত্যিক জনাব মোজাম্মেল হকের তনয় জনাব আফজালুল হক ছিলেন এই লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক। আফজালুল হক সাহেব স্বয়ং সাহিত্যিক না হইলেও তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও প্রকৃত সাহিত্য-রসিক। তাঁহার এই লাইব্রেরীটি শুধু একটি প্রকাশনালয় ও তদসম্পর্কিত ব্যবসার কেন্দ্রেই ছিল না সে প্রতিষ্ঠানটি ছিল সাহিত্য আলোচনা ও সাহিত্য-চর্চার একটি জীবন্ত কেন্দ্র। এখান হইতেই তদানীন্তন মুসলিম বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা "মুসলিম ভারত" তাঁহার পিতা মোজাম্মেল হক সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। সেই যুগে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" 'মাসিক সওগাত'-এর এবং মাসিক-পত্র "মুসলিম ভারত" বাংলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার অঙ্গনে এক নবতর ভাব-ঐশ্বর্য ও চিন্তা-ধারার প্রাণ, শিহরণ জাগাইয়া তোলে। কলেজ স্কোয়ারস্থিত এই "মুসলিম ভারত" অফিসে ঐ সময় প্রায়ই বৈকাল হইতে সন্ধ্যারাত্রি পর্যন্ত একটি জমজমাট সাহিত্য-আসর জমিয়া উঠিত। তদানীন্তন কলিকাতাস্থিত অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী সেখানে সমবেত হইতেন। সেই কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যমণি ছিলেন নজরুল ইসলাম। আমিও তখন কলিকাতা থাকিতাম। বাঙ্গালী মুসলিম তরুণ ও যুবকদের নিয়া একটি বিপ্লববাদী দল গঠনের কাজে আমি সে সময় ব্যস্ত। কিন্তু কৈশোর হইতেই সাহিত্যের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-চর্চা চলিত। ইতিপূর্বেই "মোসলেম-ভারত" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের অগ্নিময় কবিতাগুলির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাঁহার মুক্তিমুখর—বিশেষ করিয়া ইসলামের যোশ্-উদ্বেল ও অতীত গৌরব-বাহী কবিতা-পুঞ্জ আমাদের সারা দেহমনে বিপ্লব-উত্তাল প্রাণ-শিহরণ জাগাইয়া তুলিত। কাজেই কলিকাতায় আসিয়া ১৯২৪ সালে যখন মুসলিম বিপ্লবীদল গঠনের আত্মনিয়োগ করিলাম তখন প্রথম কাজই হইল 'মোসলেম ভারত' অফিসের সন্ধান লইয়া নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। সেখানেই নজরুলের সঙ্গে দেখা হইল। আমি পূর্ব বাংলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এক সুদূর পল্লী-অঞ্চলের অজ্ঞাত অখ্যাত তরুণ। তথাপি নজরুল—কি জানি কেন—আমাকে স্নেহের সহিতই গ্রহণ করিলেন। "মুসলিম পাবলিশিং হাউসের" পরিচালক ও মুসলিম ভারতের অধিকর্তা আফজালুল হক সাহেবের নিকটও পাইলাম যথেষ্ট হৃদ্যতা ও সমাদর। ক্রমে ক্রমে স্নেহ ও হৃদ্যতা আমাদের পরস্পরের অন্তর্লোকে পরস্পরের স্থায়ী আসন রচনা করিয়া দিল। একদিন নজরুল ও আফজাল সাহেব উভয়েই—বিশেষ করিয়া নজরুল হইলেন আমাদের এই বিপ্লব দলের শুভানুধ্যায়ী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

নজরুল অত্যন্ত হাস্য-রসিক ও কৌতূক-প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি আফ্জালুল হক সাহেবকে ঠাট্টা করিয়া "উলঝুলুল্" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন একটি মজার ব্যাপার ঘটিল।

www.pathagar.com

এক ভদ্রলোক কি উপলক্ষে নজরুলের একটি ফটো তুলিতে আসিয়াছেন। ঐ স্থান মুসলিম পাবলিশিং হাউস'।' সময় বৈকাল। কেননা ঐ স্থানে এবং ঐ সময়েই নজরুলকে পাওয়ার সুযোগ ছিল সহজ ও সর্বাধিক। নতুবা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার তখন তিনি শুধু যুগস্রষ্টা কবিই নহেন—সেই সঙ্গে একজন সুরেলা সুকণ্ঠধারী এবং স্রষ্টা-গীতিকার ও দরদী গায়ক বটে। তাঁহার মধুক্ষরা গানের সুর মানুষকে বিহ্বল করিয়া ফেলিতেন। পরবর্তী সময় অবশ্য তাঁহার সে সুকণ্ঠের মাধুরী বহু পরিমাণে ম্লান হইয়া গিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার অসংখ্য ভক্তের মধ্যে কে বা কাহারা যে তাঁহাকে কখন বা কোথায় উধাও করিয়া লইয়া যাইতেন—তাহার সন্ধান পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। যাহা হউক, তাঁহার কৌতুক-প্রিয়তা সম্পর্কে এক ফটো তোলোর কাহিনী বলিতে ছিলাম, নজরুল ফটোর জন্য পোজ অর্থাৎ সঠিক ভঙ্গিমা নিয়া বসিয়াছেন এবং ফটোগ্রহণকারী ভদ্রলোক সেদিকে তাহার ক্যামেরা তাক্ করিয়াছেন। এমন সময় নজরুল হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কৃত্রিম রাগত স্বরে আফজাল সাহেবকে বলিলেন : "উল্‌ঝুলুল্‌ তুমি কেমন ভদ্রলোক। জানো না—ফটো তোলার জন্য ভাল সাজ-সজ্জাও প্রয়োজন? তার ব্যবস্থা না করেই তুমি ফটো তোলাচ্ছ"। এই বলিয়াই তিনি পাশে উপস্থিত আমাদের সকলের মুখের দিকেই একবার আড় নয়নে এক ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করিলেন। ফটোগ্রাফার এবং আমরা সকলেই হতভম্ব। ত্রুটিটা কোথায় ঠাহর করিতে পারিলাম না কেহই।। তারপরই আবার বলিলেন : "জানো না, সাজ-সজ্জার প্রধান উপকরণ হ'ল সেন্ট ও আতর। আর সেগুলি না মাখিয়েই তোমরা আমার ফটো তোলাচ্ছ। কেমন ভদ্রলোক তোমরা?" বলিয়াই হঠাৎ তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শুনিয়া আমরা উপস্থিত সকলে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং এটা নিতান্তই একটা কৌতুক একথা বুঝিতে পারিয়া সে হাসির সঙ্গে যোগ দিলাম। তাহার হাসি ছিল যেমন দরাজ তেমনি প্রাণ-খোলা। সেই হাসির উচ্চ কলধ্বনিতে মনে হইত যেন ঘরের সারাটা ছাঁদ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে নজরুলের বৈচিত্র্যময় সাহিত্যিক ও কর্ম-জীবনের পটভূমি সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা, তাঁহার জন্ম ও জীবনব্যাপী কঠোর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁহার যে বিরামহীন সংগ্রাম, তাহার কাহিনী এবং দেশের ও সমাজের বিশেষ করিয়া মুসলিম সমাজের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ—এমনকি সে সময়ের বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব তাঁহার জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করিয়াছে—সে সম্পর্কে কিছুটা অবহিত না থাকিলে তাঁহার অত্যাচার্য জীবন-নাট্যের ঘটনাবলী পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে।

প্রথম বিশ্ব-সমর তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্মানী ও তাহার তদানীন্তন মিত্র ও সহযোগী তুরস্ক পরাজিত হইয়া যায় এবং ইউরোপ ও এশিয়াস্থিত তুরস্কসহ সারা আরব উপদ্বীপব্যাপী তুর্কীর সাম্রাজ্য ইংরাজ-ফরাসী-রুশ-মার্কিন প্রভৃতি জাতি-সমন্বয়ে গঠিত মিত্র শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয়। সে সময় ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র হজ্ব-এর অনুষ্ঠান ভূমি মক্কা-মদিনা তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফা। কিন্তু এই মহা সমরে পরাজিত তুর্কী সুলতানের হস্ত হইতে মক্কা-মদিনা বিচ্যুত হইয়া যাওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের স্বাধীনতাও বিঘ্নিত হওয়ায় তিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের খলিফা-পদ

www.pathagar.com

হইতে অপসৃত হইলেন। কেননা, একমাত্র যথার্থ স্বাধীন ও স্বরাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রপতিই বিশেষ করিয়া মক্কা-মদিনাসহ আরবের হেজ্জাজ প্রদেশ যাহার শাসনাধীন—শুধু তিনিই বিশ্ব-মুসলমানের খলিফা পদে সমাসীন হইতে পারেন। ফলে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মিত্র শক্তিবর্গ তথা বৃটিশের সর্বপ্রকার শাসন ও অন্যবিধ প্রভাবমুক্ত আবহাওয়ায় তুর্কী সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার—অন্ততঃ মক্কা-মদিনাসহ আরবের একাংশে যথার্থ স্বাধীন একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে বিশেষ করিয়া তদানীন্তন বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল খিলাফৎ-আন্দোলন দেখা দিল। ভারতীয় খিলাফৎ আন্দোলন মওলানা আজাদ, মওলানা মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব ও পরিচালনাধীনে "তর্কে—মিল্লাত অর্থাৎ অসহযোকেই এই আন্দোলনের কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করিল ভারত। এই সময় ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের অবিসম্মাদিত নেতা গান্ধীজী দেখেন রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে Self Covernament বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সারা ভারতব্যাপী এক বিরাট ও ব্যাপক গণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে বিশেষ করিয়া তদানীন্তন বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল খিলাফৎ-আন্দোলন দেখা দিল। ভারতীয় খিলাফৎ আন্দোলন মওলানা আজাদ-মওলানা মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব ও পরিচালনাধীনে "তর্কে-মুয়াল্লাত" অর্থাৎ অসহযোগকেই এই আন্দোলনের কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করিল ভারত। এই সময় ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের অবিসম্মাদিত নেতা গান্ধীজী দেশের রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে Self Government বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সারা ভারতব্যাপী এক বিরাট ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন। তবে এই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি "Non violent" বা "নিরুপদ্রব" সর্তটি সংযোজিত করিয়া নেন। যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত এই বিপুল আন্দোলনের যৌবন-জল-তরঙ্গ আসিয়া হিমাচল সমগ্র ভারতকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। 'বয়কট' বা বৃটিশ-বিদ্যালয় ও বৃটিশ পণ্য বর্জনই এই আন্দোলনের কর্মপন্থা হিসাবে গৃহিত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ দেশের ছাত্র-সমাজ এবং জনগণকে এই কার্যক্রম সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করেন। লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও জনসাধারণ এই আহ্বানে আগ্রহের সহিত সাড়া দেয়। আমি তখন ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শিবপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমি এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া অভিভাবকদের অগোচরে ১৯২১ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতাস্থিত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থিত কংগ্রেস অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক গৃহিত হইলাম। দেখিলাম সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র সেখানে স্বেচ্ছা-সেবক হিসাবে দেশ সেবার জন্য সমবেত হইয়াছে। এই আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-ভূমি পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

তদানীন্তন ভারতের জাতীয় জীবনের এই যুগ-সন্ধি লগ্নে নজরুল দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রধানতঃ সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে এই মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রথম বিশ্ব সমর আরম্ভ হওয়ার পর ইতিপূর্বেই ১৯১৭ সনে তিনি সৈনিক হিসাবে ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়া আরবের অন্তর্গত ইরাকের রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৃটিশ সৈন্য-দলে কোন বাঙ্গালীকেই গ্রহণ করা হইত না। বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি এবং ভীরু এই অপবাদ দিয়া তাহাদিগকে সামরিক চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা হইত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল অন্যরূপ। সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শিকার এবং বাঙ্গালীরা বুদ্ধিজীবী মানুষ—বিশেষ করিয়া অনেকটা বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালীরা বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শাসন ব্যাপারে বেসামরিক বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ও নিম্ন রাজকার্যে নিয়োজিত থাকিয়া এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যার মাধ্যমে অনতিকাল মধ্যেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট—এমন কি সাধারণ বাঙ্গালীদের নিকটও ইংরাজ রাজের শাসন-শোষণ ও ত্রাসন নীতি এবং ইংরাজ জাতির পরম স্বার্থবাদী চারিত্রিক আলেখ্যের প্রকৃত স্বরূপ অবিদিত রহিল না। ইহারি প্রতিক্রিয়া হিসাবে বঙ্গ ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার একশত বৎসরের মধ্যে ১৮৫৭ সনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় সিপাহীদিগকে বিবিধ প্রকারে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ করা হয় বাংলাদেশেরই বহরমপুরে। পরবর্তী সময় তিতুমীরের বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন—এমন কি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং তদসংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকলাপ ইংরাজ রাজ বা জাতির প্রতি বাংলার যথার্থ মনোভাবেরই প্রতিফলন। যাহা হউক প্রথম বিশ্ব সমরে জার্মানদের নিকট ইংরাজের প্রাথমিক বিরাট বিপর্যয় ও বিপুল সৈন্য ক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ হইতেও বহু সংখ্যক বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। দেড় শতাধিক বৎসরব্যাপী ইংরাজের পরাধীনতার সর্বপ্রকার সামরিক প্রশিক্ষণ ও কার্যকলাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল জাতীয় পৌরুষের বিকাশ এবং জাতীয় মুক্তির সফল রূপায়ণের জন্য ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষা একান্তভাবে অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া বাঙ্গালীর ভীরুতা এবং সামরিক কার্য্যে অযোগ্যতা ও অক্ষমতার যে অপবাদ ইংরাজ সরকার এতদিন পর্যন্ত প্রচার করিয়া আসিয়াছে তাহা অপনোদনের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিতে লাগিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা ইংরাজ-অরি র্জামানী ও তাহার তদানীন্তন সামরিক সহযোগী তুরস্কের বিরুদ্ধাচরণ কোনটাই সেদিন বাঙ্গালী যুবকদিগকে ইংরাজের সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে নাই। ইহা শুধুই ছিল এক প্রকার Stategy বা সামরিক কৌশল। দেশের মুক্তির জন্য অদূর বা দূরাগত ভবিষ্যতে কোনরূপ সুযোগসুবিধা আসিলে কিংবা নিজেরা সৃষ্টি করিতে পারিলে সে কাজের সাফল্যের নিমিত্ত বাস্তব-ভিত্তিক সামরিক শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনই ছিল এ ব্যাপারে বাঙ্গালী যুবকদের উৎসাহ ও আগ্রহের মৌল কারণ। নজরুল এই মহান উদ্দেশ্য নিয়াই বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করেন।

১৯১৭ সালে নজরুল যখন বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়া সমর ক্ষেত্রে গমন করেন তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। সে সময় তিনি তাঁহার স্ব-জিলা বর্ধমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। বর্ধমান জিলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত তাহার স্বগ্রাম চুরুলিয়াস্থিত মক্তব হইতে ১৯০৯ সালে ১০ বৎসর বয়সে তিনি নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ৮ বৎসর বয়সেই তাহার পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার পরিবার নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে পতিত হয়। ফলে পরীক্ষা পাশের পরেই এক বৎসরকাল উক্ত বক্তবেই শিক্ষকতা করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের প্রয়াস পান।

www.pathagar.com

১১/১২ বৎসর বয়সেই তিনি স্থানীয় পল্লী-অঞ্চলে জন-প্রিয় 'লেটো নাচের' দলের জন্য সঙ্গীত ও নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইখানে এবং এই ভাবেই তাঁহার ভবিষ্যতের অনুপম কাব্য ও সঙ্গীত-প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটে।

অতঃপর তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়া বর্ধমান জিলারই মাথরুন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক দুরাবস্থার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। বিখ্যাত কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয় তখন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁহার প্রভাব এবং আদর্শও হয়তো কিশোর নজরুলকে কাব্য-সাধনায় প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

যাহা হউক, এই বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর চরম আর্থিক সঙ্কটে পতিত হইয়া নজরুল জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথমে রাণীগঞ্জের এক রেলওয়ে গার্ডের বাসায় পাচক হিসাবে কার্যে যোগদান করেন এবং তৎপর আসানসোলে এক রুটির কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে বাধ্য হন। শেষোক্ত স্থানে কার্নে-নিয়ত থাকার সময় আসানসোলের তদানীন্তন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ্‌ সাহেবের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে। নজরুলের স্ফুটোন্মুখ সঙ্গীত ও কাব্য প্রতিভা, উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য তাহার উদগ্র আগ্রহ এবং সর্বোপরি সম্ভ্রান্ত অথচ দরিদ্র পরিবারে তাহার জন্ম লাভের কথা পরিজ্ঞাত হইয়া দয়া-পরায়ণ রফিজউল্লাহ্‌ সাহেব নজরুলকে ময়মনসিংহ জিলাস্থিত তাহার স্বগ্রাম কাজিরশিমলায় লইয়া যান এবং ১৯১৪ সনে পার্শ্ববর্তী দরিরামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে ভর্মী করিয়া দেন।

এই স্কুলে এক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া বার্ষিক পরীক্ষার পর নজরুল রাণীগঞ্জে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে পূর্বোক্ত সিয়ারসোল রাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তী হন। এই স্কুলে ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই ১৯১৭ সনে বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়া তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলিয়া যান। নজরুল সিয়ারসোল স্কুলের যখন ছাত্র—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তখন উক্ত স্কুলে অধ্যয়ন-রত। উভয়েই তখন পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-চর্চায়ও গভীরভাবে নিমগ্ন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—ঐ সময় শৈলজানন্দ প্রধানতঃ কাব্য রচনায়ই নিমগ্ন থাকিতেন আর নজরুল ব্যস্ত থাকিতেন গল্প ও উপন্যাস রচনায়। ভাগ্যের পরিহাস উত্তরকালে শৈলজানন্দ হইলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক আর নজরুল হইলেন প্রধানতঃ যুগশ্রষ্টা কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা বিশেষতঃ বীর্যবান ও উদ্দীপনাময় কাব্য রচনায় এবং ততোধিক বিশেষভাবে ইসলামী ভাব-ধারাপুষ্ট কাব্য সৃজনে ভাষা, আঙ্গিক ও ছন্দ বৈচিত্রে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তবে গল্প উপন্যাস ও নাটক রচনায়ও তিনি কম কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ হইতে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের সর্বশাখায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীত সৃষ্টিতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া নজরুলের সমকক্ষ অন্য কাহারো সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। হয়তো বা বিশ্ব সাহিত্য ও বিশ্বসঙ্গীতের বিপুল পরিসরেও রবীন্দ্র নজরুলের ন্যায় একই সঙ্গে সমাবিষ্ট এমন সর্বব্যাপী সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিভা একান্ত বিরল। তবে এখানে একটি সত্য একান্তভাবে প্রণিধানযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল সকল সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সম-সাফল্যময় সঙ্গীত সৃষ্টির যে অপূর্ব ও অনবৈদ্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাহার নিরিখে ও তুলাদণ্ডে উভয়ে

www.pathagar.com

সম-গোত্রীয় হইলেও তাহাদের রচনার বিষয়বস্তু, চিন্তা-ধারা, দৃষ্টি-কোণ এবং ভাষা-ভঙ্গিতে রহিয়াছে ব্যাপক ব্যবধান ও পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্যশালী উচ্চ বংশের সন্তান। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরেই তাঁহার আজীবন সঞ্চরণ। যদিও তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মের আধুনিক প্রশাখা বর্ণাশ্রমহীন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত—তথাপী জীবনের বাস্তব পরিবেশে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে সমুন্নত উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ—হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল তাহার শিক্ষা, সাহিত্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত নৈকট্য ও সংযোগ। কেননা ভারতীয় হিন্দু জাতির মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলার হিন্দুদিগের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ হিন্দুগণই যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়েস্থবৃন্দই শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে চিরকালই সমুন্নত এবং তাহারাই হিন্দু ধর্ম ও সমাজের নেতা ও পরিচালক। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাহারাই অগ্রদূত। ইংরাজ শাসন আমলেও বাংলাদেশে এই বর্ণ হিন্দুগণই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জাতীয় জাগরণের নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং সে উদ্দেশ্যে নব সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বমোট সংখ্যার তুলনায় এই বর্ণ হিন্দুগণ হয়তো শতকরা পনর বিশ জনের অধিক নহেন এবং এই শিক্ষিত সমাজেরও যাহারা বাঙ্গালী হিন্দু সমষ্টির শতকরা একজনেরও অনধিক শুধু তাহারাই সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি মূর্তি-পূজা ও বর্ণাশ্রমবাদ অর্থাৎ জন্মগতভাবে জাতিভেদ নীতি-পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী ও জাতিভেদহীন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। বাকী শতকরা আশি-পঁচাশিজন হিন্দুই তপসিলী বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত বাংলাদেশে নমশূদ্র, পোঁদ, চণ্ডাল, হাড়ী, মুচি, মেথর, চামার আদিবাসী প্রভৃতি অসংখ্য শ্রেণীর হিন্দু এই তপসিলী শ্রেণীর অন্তর্গত। অথচ দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড—চাষী শ্রমিক ইহারাই। হিন্দু জাতির নিকট ইহারা চিরদিনই মানবতার অধিকার হইতে বঞ্চিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও হিন্দু-শাসন যুগে ইহাদের ভাগ্যে জোটে নাই। এমন কি ইংরাজ আমলে এবং বর্তমান যুগেও শিক্ষার আলো ইহারা অতি অল্পই লাভ করিয়াছে। ফলে সাহিত্য-চর্চা বা সাহিত্য-সৃষ্টি চিরদিনই ইহাদের আয়ত্বের বাহিরে রহিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিন্দুদের সঙ্গে এই তফসিলী শ্রেণীর সম্পর্ক ছিল জমিদার-প্রজা অথবা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। এমন কি বর্ণাশ্রমবাদ-মুক্ত ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথও হিন্দু জাতির এই সাধারণ নীতি ও আচরণের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী "বিশ্ব-কবি"রূপে বরিত ও নন্দিত হওয়া সত্বেও এবং হিন্দুত্বের চিরন্তনী গৌরব-গাঁথা এবং শিবাজী প্রমুখ হিন্দুবীরগণের স্তুতি-কাব্য রচনায় পুরোধা ও অগ্রসূরীর মর্যাদা অর্জন সত্বেও সমগ্র হিন্দু জাতির শতকরা আশি-পঁচাশি জন যাহারা সেই অস্পৃশ্য তপসিলীদের মানবতা অধিকারহীন অমর্যাদা, তাহাদের দুঃখ-দৈন্য, তাহাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথার্থ চিত্র তাঁহার সৃষ্ট বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রায় কোথাও তেমন ছায়াপাত করিতে পারে নাই । তাঁহার রচিত বিপুল গল্প-উপন্যাস-সম্ভারে এবং বিশাল ও বিচিত্র কাব্য-অঙ্গনে যে সকল নর-নারী তাহাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও স্বপ্ন-সাধ নিয়া বিচরণ করিতেছেন তাহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম অথবা অ-ব্রাহ্ম উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ভদ্র সমাজেরই সন্তান।

ইহা ছাড়া হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, সমন্বয়ে গঠিত বাংলা ভাষা ভাষী সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শতকরা পঞ্চান্নজন যাহারা সেই মুসলমানদের এবং তাহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির

www.pathagar.com

কথা বিশ্ব–কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় তাহার বিপুল সাহিত্য–সৃষ্টির সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ব্যাপীকালের মধ্যে স্মরণ, শ্রবণ কিংবা অবলোকন করিবার তেমন সময় বা সুযোগ হয়তো পান নাই, সেই জন্যই তাহারা তাঁহার রচিত বাংলা–সাহিত্য–অঙ্গন হইতে প্রায় নির্বাসিত অথচ এই বিশ্ব–কবির পিতা–পিতামহ মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম আধার ফার্সী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, এই বাঙ্গালী মুসলমানগণ—যখন বাঙ্গালার অধীশ্বর ছিলেন—তখন তাহাদেরী উদ্যোগে ও সহায়তায় খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ তাহারা বাঙ্গালার শাসন ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত—যাহাকে বাংলা–সাহিত্যের "মুসলিম যুগ" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—সেই সময়েই বাংলা ভাষা ও বাংলা–সাহিত্যের প্রকৃত নব–জন্মলাভ ঘটে। এবং তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্তাগণই এই নব–সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু–মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার ও বিকাশের জন্য ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে হিন্দু–মুসলমান কবিগণকে অনুপ্রেরণা ও আনুকূল্য সমভাবেই দান করিয়াছেন।

ইহার পূর্বে বাংলার বৌদ্ধ পাল–রাজাগণের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম–একাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় প্রথম উদ্ভব ঘটে এবং সেই বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের উৎসাহ ও সহযোগীতায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষার প্রথম পুস্তক 'চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়" বা "চর্যাপদ" রচিত হয়। এই চর্যাগুলি বৌদ্ধধর্মীয় গান বা দোহা। ইহার পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী—দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে আগত গোঁড়া হিন্দু–আচার নিষ্ঠ সেন রাজবংশ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশ অধিকার করিয়া বাংলা ভাষা ও বাংলা–সাহিত্য–চর্চা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। এই ঘটনার একশত বৎসরের মধ্যেই বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা আবার হস্তান্তরিত হইয়া মুসলমানদের করতলগত হয়। ভিন্ন ভাষা–ভাষি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণের পক্ষে এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবহাওয়া, ভাষা ও শিক্ষা–সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ এবং এদেশকেই স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রায় দুই শতাব্দী কাটিয়া গেল। ফলে খৃষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাংলার সিংহাসনে যখন স্বাধীন ইলিয়াস শাহী পাঠান সুলতানগণ আরূঢ় তখন হইতে তাঁহাদের সহানুভূতি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুনরায় নবজন্ম লাভ ঘটিল। "বড়ু চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাসের বাংলা অক্ষরে রচিত বাংলা–ভাষার সর্ব পুরাতন পুঁথি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" এই সময়েরই সৃষ্টি এবং এজন্য কবি তদানীন্তন মুসলিম সুলতানের নিকট হইতে পুরস্কার ও সমাদর লাভ করেন। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়", সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তি বিলাস সঠিক ভগবতাসৃত" ও 'বৈষ্ণব তোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়ে এবং বিজয় গুপ্তের "মনসা মঙ্গল" প্রভৃতি কাব্য এই যুগেই বিভিন্ন মুসলিম সুলতানের উৎসাহে ও আর্থিক আনুকূল্যে ও সহায়তায় রচিত ও প্রকাশিত হয়। মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায়ই কবীন্দ্র শ্রীকর নন্দী কর্তৃক হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারতের' অষ্টাদশ পর্বের কাব্যানুবাদ সম্পন্ন হয়। 'পদ্মাবতী' "সেকান্দর নামা" 'তোহফা' প্রভৃতি কাব্যের কবি–আলাওল ও অন্যান্য মুসলিম কবিগণ এই যুগেই আবির্ভূত হন। এই যুগের কাব্য রচনার ব্যাপারে মুসলমান সুলতান ও শাসকবৃন্দ হিন্দু– মুসলমান কবিগণের মধ্যে কিংবা তাহাদের রচিত কাব্যে হিন্দু–ধর্ম ও সংস্কৃতি অথবা ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে কোনরূপ পৃথক ও পার্থক্যমূলক মনোভাব পোষণ করিতেন না। হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে সকল কবিও তাহাদের সৃষ্ট সকল

www.pathagar.com

কাব্যকেই তাহারা সম দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সমভাবে সহায়তা ও উৎসাহ দান করিতেন। এ ব্যাপারে তাঁহারা কখনো ইসলামের উদারতা ও সমদর্শিতা হইতে বিচ্যুত হন নাই।

অপরপক্ষে পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হওয়ার পর বাংলার মুসলমান যখন বিজয়ী ইংরাজ শাসকদের শোষণে ও পেষণে দিশাহারা ও সর্বহারা তখন নব শাসক জাতি রাজ্য শাসনের কূট কৌশল অবলম্বন করিয়া মুসলমান জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং অহাদের সর্বপ্রকার গৌরবময় প্রভাব ও প্রতিচ্ছবি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা ফার্সীকে বিদূরিত করিয়া তদস্থলে ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল এবং মুসলমান সুলতান ও শাসকদের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বাংলা সাহিত্যের ধারা ও প্রকৃতি এবং আরবী-ফার্সী বহুল ভাষা-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া মুসলিম-বিদ্বেষ-মূলক চিন্তাধারা এবং সংস্কৃতবহুল ভাষা প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর হইল। এই ব্যাপারে তাহারা বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজ অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ হিন্দুগণের পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করিল। ... এবং তাহাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগ অর্থাৎ হিন্দু রেনেসাঁ যুগের প্রবর্তন করিল। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মুসলিম সভ্যতা ও মুসলিম সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অতলে ডুবাইয়া দিয়া কিংবা মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কের মশি-বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহাদিগকে হেয় ও অবজ্ঞেয় প্রতিপন্ন করা এবং এইরূপে তাহাদিগকে সভ্য সমাজের অপাংক্তেয় প্রমাণিত করিয়া তাহাদের চির ধ্বংসসাধন অন্ততঃ হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় তপসিলীদের ন্যায় দ্বিতীয় আর একটি তপসিলী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া চিরকালের জন্য তাহাদিগকে মানবেতর পর্যায়ে ঠেলিয়া দেওয়া। এই নব সাহিত্য-যুগের স্রষ্টাদের মধ্যে বঙ্কিম-নবীনসেন প্রমুখ দিক্‌পালগণ মুসলমানদিগকে "যবন" ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই এই সাহিত্য-যুগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং তদসম্ভূত চিন্তা ও গতিধারার সঙ্গে ঘনিষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। কিশোর বয়স হইতে তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। হিন্দুত্বের জাত্যাভিমান তাঁহার ছিল বটে—কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামী তাঁহার ছিল না। তদুপরি তিনি ছিলেন যথার্থ সুশিক্ষিত ও ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। কাজেই তিনি তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের কোথাও মুসলমান কিংবা অন্য কাহারো সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন নাই, করিতে পারেন নাই। তবে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের যাহারা শতকরা আশিজন সেই তপসিলী সম্প্রদায় এবং হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যাহারা শতকরা পঞ্চান্নজন সেই মুসলিম সম্প্রদায় তাহার রচিত বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রায় অনুল্লেখ্য। তপসিলী হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে বাংলার মোট জন-সংখ্যার প্রায় নব্বই জন। এই বিশাল জনসংখ্যা সম্পর্কে তিনি কটুবাক্য ব্যবহার করেন নাই বটে—কিন্তু অনুল্লেখের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর উপেক্ষাও প্রকারান্তরে এক প্রকার অচ্ছিল্যময় অবমাননা। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। কেননা, তপসিলী হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানেরাও বর্ণ হিন্দুদের নিকট অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয়। রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ-বর্জিত ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ক্ষেত্রে এই বর্ণ-হিন্দু মনোবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় 'বিশ্ব-কবি' ও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিরূপে অভিনন্দিত মহামনীষীর পক্ষে এ ব্যাপার বাস্তবিকই দুঃখজনক।

www.pathagar.com

এখন এ সম্পর্কে নজরুল-সাহিত্য লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। নজরুল-রচিত সাহিত্যের পরিধি রবীন্দ্র সাহিত্যের ন্যায় বিপুল না হইলেও অকিঞ্চিৎকর কিংবা নগণ্য নহে। রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন বিরাশি বৎসর বয়সে এবং মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়ত ছিলেন। "ভানুসিংহের পদাবলী" এই ছদ্ম শিরোনামায় মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইতেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। কাজেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের পরিসর হইল সত্তুর বৎসর। অপর দিকে নজরুল ১৯১৭ সালে ১৮ বৎসর বয়সে (৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনের মাধ্যমে) প্রথম বিশ্ব-সমরে যোগদানের পর হইতে কলকাতার "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" "মাসিক সওগাত" এবং "মাসিক মুসলীম ভারত" প্রভৃতি সাময়িকীতে প্রকাশিত হইতে থাকে। আর ১৯৪২ সালে এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের "দৈনিক নবযুগ" পত্রিকার প্রধান সম্পাদকরূপে কার্য পরিচালনার সময় এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাহার বাক ও চলৎশক্তি স্তব্ধ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিরও চির পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য বর্তমান ১৯৭৬ সনের ২৯শে আগষ্ট পর্যন্ত দৈহিকভাবে তিনি জীবিত ছিলেন—বিশ্ব সে অবস্থা ছিল অনেকটা জীবন্মৃত চৈতন্য ও অনুভূতিহীন। ফলে তাহার যথার্থ সাহিত্যিক জীবনের ব্যাপ্তি ছিল মাত্র পঁচিশ বৎসরের মতো। এই সময়সীমা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের এক তৃতীয়াংশের মাত্র কিঞ্চিৎ অধিক। আনুপাতিকভাবে এই স্বল্প সময়ে রচিত তাহার সাহিত্যিক অবদান পরিসর ও বৈচিত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে রবীন্দ্র সাহিত্য অত্যন্ত সাফল্য সহকারে এবং অপূর্বভাব ও ভাষা সৌকর্যে, প্রধানতঃ যে জনমণ্ডলীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও ধারণা এবং আচার ও আচরণকে—এক কথায় সমগ্র জীবন-আলেখ্যকে প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছে সেই বাঙ্গালী বর্ণ-হিন্দু সমাজের জন-সংখ্যা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীর মোট সংখ্যার শতকরা পাঁচজনের অধিক নহে। এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শ্রষ্টারূপে বাঙ্গালী জাতির মাত্র পাঁচজনের প্রতিনিধি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইহাই শেষ কথা নহে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি এবং বর্তমান শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্মান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মহাকবি। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণের অন্যতম দিক্‌পালরূপে সারা বিশ্বে তিনি নন্দিত ও স্বীকৃত। তবে কথা হইল—বিজেতা, বিদেশী ইংরাজ শাসকেরা তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বার্থেই বিজিত ও রাজ্য-হারা মুসলমানদের বিশেষতঃ তাহাদের প্রথম শিকার বাঙ্গালী মুসলমানগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ধ্বংস সাধনে তৎপর হইয়া উঠিবে এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের ধর্ম, কৃষ্টি, শিক্ষা, সভ্যতা এবং সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার কুৎসা প্রচারে মুখর হইয়া উঠিবে--ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সেই সঙ্গে-- প্রত্যেক জাতির মানসলোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাময় সঞ্জীবনী প্রেরণা ও প্রতিচ্ছবি যে সাহিত্য মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া জাতিকে চিরদিন উজ্জীবিত ও সক্রিয় রাখে সেই সাহিত্য অঙ্গনে তাহাদের বিকৃত ও মিথ্যাশ্রয়ী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া এবং অন্যের দ্বারা করাইয়া তাহাদিগকে হতাশাগ্রস্ত ও কর্মবিমুখ করিয়া রাখিবার জন্যও সেই বিজেতাগণ প্রবেষ্ট হইয়া উঠিবে—ইহাও তেমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর হইতে বাংলার মুসলমান শাসক সুলতানগণ বাংলা ভাষার নবজন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ করিয়া হিন্দু সভ্যতা-

www.pathagar.com

সংস্কৃতির উৎস-মূল হিন্দু ধর্ম গ্রন্থাদি রচনা ও প্রচারে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদিগকে যেভাবে উদার চিত্তে সহানুভূতি পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্য দান করিয়াছেন মুসলিম শাসনের পতনের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার সেই হিন্দু সমাজের কবি-সাহিত্যিকগণ নবশাসক ইংরাজদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া অত্যল্পকাল পূর্বের সহৃদয় আনুকূল্য ও সহায়তা-দাতা সেই মুসলমানদিগকেই যখন অবমাননাকর ভাষায় "যবন ম্লেচ্ছ" বলিয়া অভিহিত করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। কিম্বা বাঙ্গালী জাতির শতকরা পঞ্চান্নজনকে অর্থাৎ সেই বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বেমালুম ভুলিয়া যাইবার ভান করিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের কষাঘাতে লাঞ্ছিত মর্মাহত করিতেও কণামাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই। সারা বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে সহানুভূতি ও সাহায্য-দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য—এমন কি সাধারণ চক্ষু-লজ্জা প্রদর্শনের এমন চমৎকার নিদর্শন সত্য সত্যই একান্ত বিরল।

এই প্রসঙ্গে এখন নজরুল সাহিত্যের ধারা ও ধরন এবং সেই সাহিত্য সৃজনে তাঁহার [illegible]-লোকের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা তথ্যানুসন্ধান করা যাক। নজরুল-সাহিত্যের

পরিধি বাঙলার সর্বত্র ও সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। জাতি ও ধর্ম উচ্চ ও নীচ, ধনী ও নির্ধন, গুণী ও নির্গুণ, জ্ঞানী ও মূর্খ পাপী ও পুণ্যবান এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের নর-নারীর আলেখ্য-বৈচিত্রেই নজরুল সাহিত্য সমৃদ্ধ ও দীপ্যমান। শোষিত ও নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত ও অবমানিত মানবতার বেদনার বাণী এবং তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বহু গর্ভ আহ্বান নজরুল কাব্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাংলার জন-সংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বইজন যে-সমাজ ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—এবং যাহারা সমগ্র জাতির জীবিকা উৎপাদন ও অর্জন এবং অন্যবিধ জীবন-ধারণ-প্রক্রিয়ার প্রধান শিল্পীও অবলম্বন অথচ সর্বকালে ও দেশের সর্বপ্রান্তে শোষিত ও শাসিত লাঞ্ছিত ও পদ-দলিত-সেই বিপুল কৃষক-শ্রমিক জন-সংখ্যার দুঃসহ মূক বেদনার আর্ত হাহাকার এবং তাহার চির প্রশমন ও প্রতিকারের অগ্নিময় বাণী নজরুল-কাব্যের সর্বত্র বিধৃত। ইহা ছাড়া সর্ব প্রকার রাষ্ট্রীয়, দল-গত বা ব্যক্তি-সম্ভূত শোষণ ও ত্রাসন এবং অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহের বাণী ও আহ্বান যে অগ্নি-গিরি-গর্জিত জ্বালাময়ী ভাষা এবং রুধির-স্পন্দিত ছন্দ-দোলায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—শুধু বাংলা-সাহিত্যে নহে, সারা বিশ্ব-নহে—সারা বিশ্ব-সাহিত্যেও তাহার তুলনা দুর্লভ। তিনি একদিকে বিদ্রোহী কবিরূপে খোদার আসন আরশ ছেদিয়া তাহার শির উত্তোলনে দ্বিধাবোধ করেন নাই--অপর দিকে খোদা ও নবী-প্রেমে আপ্লুত হইয়া না'ত ও গজল সঙ্গীতের মাধ্যমে অশ্রুসজল নয়নে খোদার দরগায় লুটাইয়া পড়িয়াছেন। একদিকে তিনি ইসলামের স্বর্ণ যুগে বিশ্ববিজয়ী মুসলমানের অপূর্ব বিজয় কাহিনী খোলাফায়ে রাশেদার হযরত ওমর ও হযরত আলী হায়দারের শৌর্য ও মহানভবতা এবং খালেদ ও খাওলা প্রমুখ বীর ও বীরাঙ্গণাদের অভূতপূর্ব বীরত্ব ও বিজয় বার্তার রোমাঞ্চকর কাহিনী এমনকি আধুনিক কালে পাশ্চাত্যের বিশ্ব-গ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুর্কীবীর আনোয়ার কামালের অসম-সাহসী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বিজয় সাফল্যের নব জাগৃতিময় সুসংবাদ চিত্ত-উন্মাদিনী ভাষা এবং মার্চের তালে তালে স্পন্দিত রণ-সঙ্গীতের ছন্দ দোলায় বিধৃত করিয়া আত্মভোলা ও সম্বিৎহারা বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমানদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অপরদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সৃষ্ট কাব্য সাহিত্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, ভীম অর্জ্জুন ভীষ্ম দ্রোন প্রমুখ ধর্ম ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

পৌরানিক যুগের হিন্দু মহাপুরুষ ও মহারথীগণের গৌরব ও বীরত্ব কাহিনী সশ্রদ্ধচিত্তে বহুস্থানে উল্লেখ করিতে কখনো দ্বিধা কার্পণ্য করেন নাই। এমনকি আধুনিক যুগের বঙ্গ-ভারতীয় সর্বত্যাগী অন্যতম রাষ্ট্রীয় নেতা হিন্দু-ধর্মাবলম্বী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ত্যাগদীপ্ত মহান জীবনের উপর "চিত্তনামা" নামক একটি অপূর্ব কাব্য গাথা রচনা করিয়া সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালার হিন্দু-জাতি বিশেষ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত বর্ণ-হিন্দুদিগকে যাহারা চিরকালই হিন্দু-জাতির ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও হোতা সেই তাহাদিগকেও আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া নব-জীবন উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান জ্ঞাপনে পরান্মুখ হন নাই। এমনকি যাহারা হিন্দু জাতিরই অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সর্বনিম্ন মানবেতর স্তরে চির নির্বাসিত সেই সাঁওতাল, নাগা, কুকী, গারোর এবং মুচি মেথর শ্রেণীর আদিবাসী মানব মণ্ডলীর আহত ও আর্ত চিত্ত-বীণার অশ্রুসজল করুণ সুরও নজরুলের কাব্য-সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত ও অনুবর্ণিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কেও এ-সত্যের ব্যত্যয় ঘটে না। মানব-ইতিহাসের বহু-ভঙ্গিম ও বিচিত্র গতি-ধারার বাঁকে-বাঁকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পলিমাটি সঞ্চারিত হয় তাহারি বুকে উদ্‌গত হইয়া উঠে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের নবাঙ্কুর। নানা রূপ, রস ও গন্ধে বিভাসিত ও প্রস্ফুটিত হয় তাহার বিচিত্র রূপ-রেখা। ঋতু-পর্যায়ের মতোই রহিয়াছে তাহার গতি-পর্যায়। সূর্য-পরিক্রমার মতো তাহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে হয় তাহার পুরাতন কক্ষপথে—নবতর রূপায়ণ ও নবতর যাত্রাপথের ইঙ্গিত বহন করিয়া। ইতিহাস এবং হয়তোবা সৃষ্টিরও চিরন্তন গতিধারা ইহাই। ...বাঙলা-সাহিত্যের অঙ্গনে এক প্রচণ্ড ঝড়ের আবেগ এবং এক আকস্মিক উল্কাপাতের মতো নজরুলের যে-উদ্দাম প্রবেশ তাহাও ইতিহাসের এই চির-প্রবহমান স্রোতধারার এক নবতর দিক নির্দেশ মাত্র। পাক-ভারতের দুই প্রধান জাতি হিন্দু-মুসলমানের জীবন-ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে নজরুলের আবির্ভাব।

বিশ্ব-মুসলিম-জীবনে সে এক চরম সঙ্কটময় যুগ। প্রথম বিশ্ব-সমরের অব্যবহিত পরবর্তীকাল তখন। ইসলামের ঐক্য ও শক্তির প্রতীক যে খিলাফৎ—তাহারি ঝাণ্ডা-বর্দার তুর্কী সাম্রাজ্য সেদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—ধ্বংসস্তূপে পরিণত। আতঙ্ক আর আশঙ্কা, হতাশা আর হতোদ্যম, ক্ষোভ আর বিক্ষোভ সারা মুসলিম জাহানকে কেমন যেন দিশাহারা—অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া যে-মুসলিম মিল্লাত বা মুসলিম জাতি শান-শওকত ও শক্তি-মত্তায়, শিক্ষা-সভ্যতা ও জ্ঞান-গৌরবে সহস্র বৎসরের অধিক কাল সারা দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল—সেদিন জগতের কোথাও তাহাদের যথার্থ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে অভিহিত করিবার মতো একটি দেশও অবশিষ্ট ছিল না। মুসলিম অধ্যুষিত সমগ্র উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা নিকট-প্রাচ্য, মধ্য-প্রাচ্য এবং দূর-প্রাচ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশ—এক কথায় সারা মুসলিম জাহান—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তখন অ-মুসলিম বিদেশীদের পদতলে লুণ্ঠিত।

এই দুর্যোগের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পাক-ভারতের মুসলিম জন-সংঘও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারাদেশ জুড়িয়া জাগিয়া উঠিল খিলাফৎ আন্দোলন ও তর্কে মুয়াল্লাত অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন। সুচতুর ও সুশিক্ষিত ভারতীয় হিন্দুজাতি গান্ধীজীর নেতৃত্বে এ ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলাইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত আন্দোলন উদ্বেল বন্যার মতো সারাদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিপ্লব ব্যতীত হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে পরিচালিত এই শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন পাক-ভারতের বুকে আর কখনো দেখা দেয় নাই। সিপাহী-বিপ্লবে বাঙলার হিন্দুগণ অংশগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এ আন্দোলনে মুসলমানদের সঙ্গে

www.pathagar.com

বাঙলার হিন্দুগণও সম-পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। হিন্দু-মুসলমানের এই সর্বব্যাপী গণ-ঐক্য ও গণ-আন্দোলনে 'ডিভাইড্-এ্যাণ্ড-রুল্' নীতির উদ্‌গাতা ও প্রবক্তা সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকগণ রাজ্য হারানোর ভয়ে আতঙ্কিক হইয়া পড়িল এবং পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমানের এক নিরুপদ্রব ও নিরস্ত্র গণ-সমাবেশে বেপরোয়া মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করিয়া যে বর্বর ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া বসিল তাহারি রক্তস্রোতে খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিল পাক-ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের এক দুর্বার তরঙ্গ-দোলা।

নজরুল এই গণ-আন্দোলন ও গণ-বিপ্লবেরই মানস-সন্তান ও চারণ কবি। সেই জন্যই তাঁহার কাব্যে ও সংগীতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের তূর্য-নিনাদ, মুসলিম জাগরণের আজান-ধ্বনি, নির্যাতিত মানবতার মুক্তিতৃষ্ণা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সংঘ-আরাব এমন আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার সহিত বিধৃত এবং এমন উদার উদাত্ত সুরে অনুরণিত ও মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহারি পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যত অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ রচিত এবং নবতর সৃষ্টিপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল তদানীন্তন যে বাঙলা সাহিত্য—যাহা আধুনিক বাঙলা সাহিত্য নামে অভিহিত তাহার গতি ও প্রকৃতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি অহেতুক ভাবাবেগ বর্জন করিয়া এবং মুক্ত নিরপেক্ষ মন ও মানস নিয়া বিচার করা যায় তাহা হইলেই বাঙলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত কালজয়ী প্রতিভার আবির্ভাব সত্ত্বেও এবং তাঁহারি জীবদ্দশায় ও তাঁহারি যুগে নজরুল এবং সেই সঙ্গে জসীমউদ্দীনের আবির্ভাব কেন সম্ভব হইল এবং কেন তাহার প্রয়োজন হইল তাহার প্রকৃত তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক কারণ অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে

রসোত্তীর্ণ যথার্থ জাতীয় সাহিত্য হইবে মানবতা ও বিশ্বজনীনতার পটভূমিতে অঙ্কিত জাতির চিত্ত-লোকের সত্যনিষ্ঠ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সেখানে থাকিবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, কৃষ্টি-সভ্যতা বৈশিষ্ট্য-বৈষম্য—এমনকি তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতিরও একটা দরদ-ভরা নিপুণ চিত্ররেখা। কিন্তু তদানীন্তন বাঙলা সাহিত্যের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়—তবে সেখানে দেখা যাইবে,—প্রতিবেশী মুসলমানদের—বিশেষ করিয়া বাঙালী মুসলমানগণের আশা-ভাষা ও জাগরণ-জাগৃতির বাণী দূরে থাকুক, সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ এক বিরাট ঐতিহ্যবাহী জাতিরূপে পাক-ভারতের বুকে তাঁহাদের যে এক অক্ষয় ও ঐশ্বর্যময় অস্তিত্ব বিদ্যমান-- তাহারো কোন সম্মানজনক সাধারণ উল্লেখ সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। যদি বা এখানে-সেখানে মুসলিম-চরিত্রের কিছুটা সাক্ষাৎ মিলে—তাহাও নাটকে মহৎ চরিত্রগুলিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য। বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই যে বাস্তব অবস্থা ইহাতে বাঙালী মুসলমানদের পক্ষে উত্তেজিত বা ব্যথিত হইলে চলিবে না। কেননা বাঙলাদেশের তদানীন্তন—এমনকি তদপূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতিতেও ইহাই একান্তভাবে বাঙালীর মন ও মানসের স্বাভাবিক রূপ। একথা যে বহুলাংশে সত্য একটু পর্যালোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে--সেদিন যে কয়জন বাঙালী মুসলমান বাঙলা সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন সংখ্যার দিক দিয়া তাঁহারা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্য-সৃজনে তাঁহাদের ক্ষমতা বা অক্ষমতা কিংবা তাঁহাদের সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা উল্লেখ না করিয়াও একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনে, তাহার

www.pathagar.com

আঙ্গিক ও অলঙ্কার সমাবেশে এবং সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্যের নিজস্ব বিশিষ্ট ধারা সম্পর্কে তাঁহারাও সমসাময়িক অমুসলিম বাঙালী সাহিত্যিকগণের নীতি এবং পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেখানে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের বেদ-উপনিষদ, গীতা-সংহিতা, রামায়ণ-মহাভারত এবং পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি হইতে অজস্রভাবে আখ্যান-ভাগ ও বিষয়বস্তু, প্রবচন ও প্রতীক, উদাহরণ ও উপমা, অনুপ্রাস ও অলঙ্কার এবং শব্দাবলী ও ছন্দ-ঝঙ্কার প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান অসংকোচে গ্রহণ করিয়া এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় বীর ও মহাপুরুষগণের জীবনালেখ্য ও জীবনাদর্শ জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যকে করিয়াছেন হিন্দু জাতির অন্তর্লোকে চির প্রবহমান, প্রাণধারা ও চিন্তাধারার সঙ্গে সুসম্পৃক্ত ও সুসমঞ্জস এবং তাহারি মাধ্যমে করিয়াছেন জাতিকে অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত ও কর্মচঞ্চল—সেখানে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যে নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন—কোরান-হাদিস, উসুল-ফেকা, মস্‌নবী-শাহ্‌নামা প্রভৃতি হইতে প্রেরণা ও আদর্শ—নবী-রসুল ও অলী-দরবেশগণের জীবন-চরিত ও জীবনপঞ্জী হইতে ঐশী প্রেম, আত্মোৎসর্গ ও মানব-সেবার অজস্র প্রাণবন্ত উদাহরণ এবং মুসলিম ইতিহাসের শৌর্যময় ও বিজয়-মুখর বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাবলী হইতে প্রাণোন্মাদনা ও জাগরণবাণী। এবং সেই সঙ্গে এই নব-দিগন্তাভিসারী ভাবধারাসমূহ যাহাতে যথোচিত ও যথোপযুক্ত পরিবেশে ও পরিমণ্ডলে পরিবেশিত ও প্রকাশিত হইতে পারে সেজন্য তাঁহারা চয়ন ও প্রয়োগ করিয়াছেন—মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ও ধর্মাচরণে নিত্য-ব্যবহার্য আলফাজ বা বাক্যাবলী এবং ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুনবাহী যোশ-উত্তাল সুপ্রযুক্ত আরবী-ফারসী শব্দ নিচয়। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে ভাব ও ভাষাগত এই যে বিশিষ্ট পদ্ধতি ও প্রকাশ-ভঙ্গি তাহারি মাধ্যমে তাঁহারা মুসলমান জাতিকে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত করিবার জন্য রহিয়াছেন অবিরাম ও অনলস প্রচেষ্টায় সদা-সচেতন ও সদা-সতর্ক।

সৌর-বীর্যবত্তার উল্লেখে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ যেখানে নাম করিয়াছেন ভীম-অর্জুনের কিংবা রাণা প্রতাপ ও শিবাজীর, মুসলমানগণ সেখানে উল্লেখ করিয়াছেন শেরে খোদা হজরত আলী অথবা খালেদ-তারিকের নাম ; পরোপকার ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে এক পক্ষের আদর্শ হইলেন দধীচি, অন্য পক্ষের হাতেম তাই ; সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে একদিকে কার্তিক অন্যদিকে নবী ইউসুফ, পতি-প্রাণতা ও সতীত্বের ক্ষেত্রে একজনের আদর্শ সীতা-সাবিত্রী, অন্যেরা হইলেন বিবি রহিমা বা বিবি ফাতেমা, নৃশংসতার ক্ষেত্রে একদল নামোল্লেখ করেন কংসের, অন্য দল করেন সীমার-এজিদের, ভয়াল রণক্ষেত্র হিসাবে একের কাছে গ্রহণীয় নয়। কুরুক্ষেত্র অন্যের নিকট কারবালা। এমনকি ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রেও একজন হইলেন হরিদাস অন্য জন আবদুল্লাহ্‌, একজন রবীন্দ্রনাথ অপরজন শামসুল আলম, একজন অনুপম বা অতুল অন্যজন বে-নজীর, একজন জ্যোতির্ময়ী অন্যজন নূরজাহান। অথচ এই নামগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমার্থবোধক, বিভেদ শুধু ভাষায়। কিন্তু একের নাম অন্যের নিকট গ্রহণীয় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাঙলা সাহিত্যাকাশের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও দিকপাল। তাঁহাদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক হওয়া দূরের কথা উভয়ে তাঁহারা বিশ্বমানবতা ও বিশ্ব-মৈত্রীর চারণ-কবি। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখানে গাহিয়াছেন পূর্বোক্ত অ-বাঙালী শিখ-নেতা গুরু গোবিন্দ ও হিন্দু-বীর শিবাজীর বন্দনা-গান নজরুল সেখানে রচনা করিয়াছেন অ-বাঙালী এমনকি অ-ভারতীয় ওমর-খালেদ ও জগলুল-আনোয়ার প্রমুখের উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতি।

www.pathagar.com

অন্য কথায় বাঙালী–অ–বাঙালী এমনকি ভারতীয়–অভারতীয় যে–কোন মুসলমানের বা মুসলিম জন–গোষ্ঠীর বিজয়ে ও গৌরবে কিংবা তাহাদের পরাজয়ে ও দুর্দশায় বাঙালী মুসলমানগণ তথা যে–কোন মুসলমান সাধারণতঃ যে–ভাবে হইয়া থাকেন উল্লসিত ও আনন্দ–মুখর কিংবা মর্মাহত ও ব্যথাক্লিষ্ট বাঙালী–অ–বাঙালী নির্বিশেষে যে–কোন হিন্দু বা অন্য অমুসলমানের বিজয়ে বা পরাজয়ে কিংবা তাহার সমৃদ্ধি বা অবনতিতে তাহারা প্রায় তেমন কিছুই অনুভব করেন না। সেখানে তাহারা অনেকটা নির্বিকার বা নিশ্চুপ। ঠিক তেমনিভাবে বাঙালী বা অ–বাঙালী যে–কোন হিন্দুর বা হিন্দু–জন–সংঘের এমনকি ভারতজাত যে কোন ধর্মাবলম্বী অমুসলমানের—যথা শিখ বা বৌদ্ধদের—গৌরবে–অ–গৌরবেও বাঙালী তথা ভারতীয় হিন্দুগণ যেভাবে পুলকিত বা বিষাদিত হইয়া থাকেন বঙ্গ–ভারতের তথা বিশ্বের যে–কোন স্থানের যে–কোন মুসলমানের পতনোত্থান বা ভাল–মন্দের ব্যাপারে তাঁহাদের চিত্ত–লোকে সাধারণতঃ সে–ভাবোচ্ছ্বাসের উদ্রেক হয় না। সেখানে তাহারা বৈপরীত্যমূলক মনোভাব পোষণ না করিলেও তাহাদের পক্ষে নিরপেক্ষতা বা নিস্পৃহার ঊর্ধ্বে উত্থিত হওয়া প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এ–সম্পর্কে একটি সাধারণ উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। প্রাক্–বিভাগ আমলে কলিকাতার আই. এফ. এ. শিল্ড প্রভৃতি ফুটবল খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং–এর জয়–পরাজয়ে বাঙালী–অ–বাঙালী, শিক্ষিত–অশিক্ষিত, ধনী–নির্ধন, জ্ঞানী–মূর্খ এমনকি নারী–পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমানগণ যে–ভাবে হর্ষ–বেদনায় আবেগ–উদ্বেল হইয়া উঠিতেন এবং মোহন বাগানের জয়–পরাজয়ে সর্বস্তরের ও সর্বমতের হিন্দু–জনমণ্ডলীর চিত্তসাগর আনন্দ–বেদনার তরঙ্গ–দোলায় যে বিপুল পরিমাণে উচ্ছ্বাস–আকুল হইয়া উঠিত চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা বিশ্বাস করা সহজসাধ্য নহে। উভয় পক্ষের এই যে ভাবাবেগ তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না—তাহা ছিল একান্তভাবে স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিত। ক্রীড়া–ক্ষেত্রের ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া ইহাকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন—তাহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন—ঘটনার কেন্দ্র–বিন্দুটি নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ও স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় ভাবানুভূতির দিক–নির্ণয়ন সম্পর্কে ইহার মূল্য নগণ্য নহে বরঞ্চ বিরাট ও অপরিসীম।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে জীবন–আদর্শ ও জীবন–দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণের এই যে বৈষম্য ও পার্থক্য ইহা সাম্প্রদায়িকতা বা ক্ষুদ্রচিত্ততা নহে। চর্ম–গভীরত্বের মাপ–কাঠিতে ইহাকে পরিমাপ করিতে গেলে এই কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যাটির প্রতি অবিচার করা হইবে। কেননা ইহার মূল অনেক গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। এখন সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রাণী বা জীবমাত্রই পানাহার বা আহার–বিহারের প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ। কিন্তু মানুষের জন্য রহিয়াছে এই দৈহিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও আরো কিছু এবং তাহা হইল তাহার মনন ও চিন্তা–শক্তি এবং পরম সত্যাভিসারী আদর্শ–মুখিনতা। ইহাই তাহার যথার্থ মানবতা। এই মানবতা অর্জনের ক্ষেত্রে স্তর–ভেদ ও প্রকার–ভেদ রহিয়াছে এবং হয়তো বা চিরদিন থাকিবেও। কিন্তু তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অনন্য। এই মনন, চিন্তা এবং আদর্শবাদের বৈষম্য ও স্তর–ভেদের ফলেই উদ্ভব হইয়াছে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন আদর্শ–মূলক মতবাদের। ধর্ম ও মতবাদ আস্তিকতাবাদী, নাস্তিকতাবাদী এবং অজ্ঞাবাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদীও (agnostic) হইতে পারে। কোন মানুষই সমাজ ও দলবদ্ধভাবে কিংবা এককভাবে তাহার

www.pathagar.com

অনুসৃত ও নিজস্ব ধর্ম ও মতবাদ বা জীবন-পদ্ধতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হইয়া চিরদিন বা দীর্ঘদিন সুস্থ মন ও মস্তিষ্ক নিয়া বাঁচিতে পারেনা। কেননা সে শুধু জীব বা প্রাণীই নহে—সে মননশীল ও আদর্শাভিসারী মানুষও বটে এবং এই ধর্মীয় বিশ্বাস, মতবাদ বা আদর্শভিত্তিক জীবন-পদ্ধতিই তাহার মানবতার উৎস-মূল ও মূলভিত্তি। সেই জন্য মানুষ তাহার নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস বা অনুসৃত মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত। ধাতুগতভাবে "ধৃ" অর্থাৎ ধারণ করা বা পোষণ করা—এই অর্থবাহী মূল ধাতুর সঙ্গে "মন" প্রত্যয় সংযোগে ধর্ম শব্দের উদ্ভব। ইহার অর্থ হইল—যাহা কোন কিছুকে ধারণ করিয়া বা পোষণ করিয়া তাহার বিশিষ্ট অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করে—তাহাই তাহার ধর্ম। এই অর্থে নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজমকেও এক প্রকার ধর্ম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কেননা, নিরীশ্বরপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীর স্বেচ্ছা-নির্বাচিত ও বিশিষ্ট আদর্শ-ভিত্তিক যে জীবন-পদ্ধতি ও মতবাদ তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাহাই তাহার অনুসৃত বা আচরণীয় ধর্ম একথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না। পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্বযুগে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর সংবদ্ধতা তথা জাতীয়তা গঠনের মৌল অনুপ্রেরণার যদি সন্ধান নেওয়া যায় তবে দেখা যাইবে আদর্শ ও মতবাদ-ভিত্তিক অর্থাৎ ধর্ম-ভিত্তিক ঐক্যবোধ এবং অনুপ্রেরণা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ভূখণ্ড বা দেশ-ভিত্তিক ঐক্যবোধ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই—যেখানে বিশিষ্ট কোন আদর্শ বা মতবাদ-অনুসারী অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্ম-অনুসারী সংখ্যালঘু মানব-সংঘ অন্যতর আদর্শ বা ধর্মাশ্রয়ী সংখ্যাগুরু জনসংঘের কবল হইতে ধর্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে নির্বাসন বরণেও দ্বিধাবোধ করে নাই। আজও বিশ্বের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান, পার্সী-ইহুদী—এমনকি সমাজতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিষ্ট নির্বিশেষে সকলেই সীমান্ত-পরবর্তী ও ভৌগোলিক সীমা বহির্ভূত স্ব-আদর্শপন্থী বা স্বধর্মাবলম্বী বিদেশীর সহিত যে-নৈকট্য ও একত্ববোধ অনুভব করে—ভিন্ন আদর্শপন্থী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্ব-দেশীয়ের সহিত ততখানি ঐক্যবোধ ও আত্মীয়তা অনুভব করেনা। বরঞ্চ ধর্মীয় বা আদর্শগত এই মতদ্বৈধতা কোন-কোন ক্ষেত্রে দুর্বার আক্রোশ ও অসহ বৈরিতার মাধ্যমেই বীভৎস আকারে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিককালে পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে মধ্য-প্রাচ্যের আরব-ইহুদী সমস্যা এবং মধ্যযুগে ফ্রান্সে-সংঘটিত শত বর্ষব্যাপী ক্যাথলিক-প্রটেষ্টান্ট সমর এবং খৃষ্টান-মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ ক্রুসেড যুদ্ধ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবশ্য একই আদর্শপন্থী ও একই ধর্মাবলম্বী দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে এবং আভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বৈরিতা এবং সংঘাত ও সংগ্রাম যে না বাধে তাহা নহে। কিন্তু সে বিরোধ ও অনৈক্য অনেক সহজ সমাধানযোগ্য এবং তীব্রতা ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া ক্ষীণতর ও স্বল্পায়ু। অতএব দেখা যাইতেছে—ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর সমাজ গঠনের অর্থাৎ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বদেশ অপেক্ষা স্বধর্মের ভূমিকা অনেকখানি বেশী। অন্য কথায় স্বদেশ অপেক্ষা স্বধর্মই জাতীয়তার প্রধান বাহন।

এ-সম্পর্কে একথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে পাক-ভারতের দ্বিধা-বিভক্তির অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে প্রধান মূল যুক্তি—দ্বিজাতিতত্ত্ব তাহা কোন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী বা ভেল্কী খেলা নহে—তাহা বাস্তবতার সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমিতেই অত্যন্ত বাস্তবভাবে উদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

এখন বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিতেই ফিরিয়া আসা যাক। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্যাভিসারী আলোকে বিচার করিলে দেখা যাইবে—বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভবকাল তাহার মধ্যযুগের প্রথম ও প্রধান কবি চণ্ডিদাসের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত এবং আলাওল হইতে আরম্ভ করিয়া নজরুল-জসীম পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা দিকপালগণের সকলেই বাঙলার যথার্থ জাতীয় কবি ও সাহিত্যিক। তবে কথা হইল হিন্দু সাহিত্যসেবীগণ মুখ্যত হিন্দু-বাঙলার কবি-সাহিত্যিক এবং মুসলিম সাহিত্যসেবীগণ প্রধানতঃ মুসলিম বাঙলার কবি-সাহিত্যিক। প্রভেদ মাত্র এতখানি এবং অপ্রিয় হইলেও ইহাই প্রকৃত সত্য।

এই যে বাস্তব পরিস্থিতি তাহার অন্যবিধ বহু কারণ রহিয়াছে। গজনীর অধীশ্বর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক বারম্বার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং মুহম্মদ-বিন্-কসিম কর্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুহম্মদ ঘোরী কর্তৃক ভারত-বিজয় ও বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় এবং বঙ্গ-ভারতে প্রায় সাত শত বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসন-কালের উত্থান-পতন-মুখর ও বৈচিত্র্যময় যে সুদীর্ঘ ইতিহাস—সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবাঞ্ছিত চরিত্রাঙ্কন এবং অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম-বর্জনের মৌল কারণের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। সেই সঙ্গে সন্ধান পাওয়া যায় বহু শতাব্দীব্যাপী সহ-অবস্থান সত্ত্বেও পাক-ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের অন্তর্জয়ের যে বিস্ময়কর দীর্ঘ-সূত্রী বিমুখতা তাহার যথার্থ কারণ ও যুক্তি।

বর্ণাশ্রমী এবং অস্পৃশ্যতা ও জাতি-ভেদ-শৃঙ্খলিত হিন্দু জাতি হয়তবা প্রচারধর্মী ও সাম্যবাদী ইসলামের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এবং বহু পরিমাণে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পরস্পর-বিরোধী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আচার-পদ্ধতির জন্যও-আহার-বিহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি সামাজিক ক্ষেত্রে এবং নিত্য আচরণীয় ধর্মীয় বিধি-বিধান ও পর্ব-উৎসবাদির বিভিন্ন পরিমণ্ডলে মুসলমান জাতির সঙ্গে বহু শতবর্ষ ধরিয়া পাশাপাশি বসবাস সত্ত্বেও তাহাদের সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে একাত্মময় নিবিড় সংস্পর্শ ও গভীর ঐক্যবোধ সংস্থাপন করেন নাই কিংবা করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দু মনে ও মানসে অহিন্দুর প্রতি অস্পৃশ্যতা ও অশুচিতা সম্পর্কে যে একদেশদর্শী বদ্ধমূল সংস্কার ও ধারণা চির-বিদ্যমান—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও মিলনের ক্ষেত্রে হয়ত তাহাও চিরদিন বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া বিজিত জাতির মধ্যে বিজেতাদের প্রতি অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হইয়া থাকে। সেজন্যও হয়তো হিন্দু-মুসলমানের দৈহিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে আত্মিক দূরত্ব ও কৃষ্টিগত ব্যবধান চিরদিন অটুট ও অনড় হইয়া রহিল।

পরবর্তীকালে মুসলমানগণ যখন ইংরাজদের দ্বারা বিজিত হইয়া তাহাদেরই পূর্বতন বিজিত জাতি হিন্দুদের সঙ্গে সমপংক্তিতে ও সম-পর্যায়ে—এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নতর স্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তখন স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুদের কর্মকৃতি ও চিন্তাধারায় তাদের প্রাক্তন শাসন-জাতি মুসলমানদের প্রতি তাহাদের পূর্বসঞ্চিত বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ নবতর ঐতিহাসিক পরিবেশে যদি প্রকাশ্য ও গোপনে ঘৃণা, অবহেলা ও অবজ্ঞার প্রলেপে প্রলিপ্ত ও মসিকৃষ্ণ হইয়া উঠে—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বরঞ্চ না-হওয়াটাই বিস্ময়ের বিষয়। কেননা ইহাই মানবীয় রীতি ও প্রকৃতি।

www.pathagar.com

তাহার উপর রেনেসাঁ-দীপ্ত নব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম পথিকৃৎ ইংরাজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুজাতি—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুগণ—তদানীন্তন পতনোন্মুখ প্রাচ্যের যুগজীর্ণ ভাবধারা এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পশ্চাদানুবর্তিতার নাগপাশ হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত হইয়া নব জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তদানীন্তন বাঙালী হিন্দু সমাজের পুরোধাগণ ইংরাজদিগকে অন্তত সাময়িকভাবে হইলেও ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ হিন্দু চিন্তাবিদগণও এই মতের অনুসারী ও প্রবক্তা।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের পক্ষে সে সময়ে স্তিমিত-প্রায় মুসলিম-সভ্যতার ছত্র-ছায়া হইতে নিষ্ক্রমিত হইয়া নব-জাগ্রত পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো-ইঙ্গিত ও পথ-নির্দেশকে সাগ্রহে বরণ করিয়া নেওয়ার পথে স্বাধিকার ও স্বকীয়তা বর্জনের কোনরূপ আশঙ্কা কিংবা পশ্চাদাকর্ষণের তেমন কোন বাধা-বিঘ্ন ছিল না। অত্যন্ত স্থূলভাবে বলিতে গেলেও—সেটা ছিল তাহাদের পক্ষে প্রভু পরিবর্তন মাত্র—স্বাধীনতা ও নবতর আত্মসত্তা বিক্রয় নহে।

পক্ষান্তরে সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানদের পক্ষে নিতান্ত মানবীয় কারণেই এই নব পরিবর্তনকে অবনত মস্তকে এবং বিনা বাধায় ও বিনা দ্বন্দ্বে স্বীকার করিয়া নেওয়া সহজসাধ্য ছিল না এবং স্বাভাবিকও ছিল না। যে কারণে বিজিত হিন্দু জাতি বিজেতা মুসলমানদের সঙ্গে কয়েক শত বৎসর একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে যথার্থ সুহৃদ ও স্বজন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই সেই একই কারণে হৃতরাজ্য মুসলমানদের পক্ষে তাদের রাজ্য অপহারক ইংরাজদের প্রভাব-প্রভুত্ব, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি বিনা দ্বিধায় ও বিনা সংগ্রামে গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

অপরপক্ষে নব রাজ্য বিজেতা ইংরাজগণও জানিতেন যে, বিজিত জাতিকে চির-পদানত করিয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্রীয় বিজয়ই শেষ কথা নহে, সেজন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিজয়। তাই তাহারা এদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসীকে বিদূরিত করিয়া তাহার স্থলে প্রবর্তন করিলেন ইংরেজী ভাষা এবং সেদিন বাঙালী মুসলমানের তাহ্‌জীব ও তমদ্দুনবাহী আরবী -ফারসী-মিশ্রিত বাঙলা ভাষায় রচিত যে-বিরাট সাহিত্যসম্ভার ছিল তাহাকে সমূলে উৎখাত করিবার জন্য হিন্দু পণ্ডিতগণের সহায়তায় সৃষ্টি করিলেন সংস্কৃত-বহুল বাঙলা ভাষা এবং সেই ভাষায় রচিত নূতন সাহিত্য-ধারা। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত সেই সাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-সংস্কৃতি, হিন্দু-সভ্যতা ও হিন্দু-আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসাবে রূপায়িত হইতে বাধ্য। এবং সে সাহিত্য হিন্দু জাতির প্রাক্তন বিজেতা মুসলমানদের প্রতি তাহাদের পূর্ব-সঞ্চিত বৈরিতা ও বিক্ষোভ নিতান্ত স্বাভাবিক ও মানবিক কারণেই মাত্রা-ভেদে রূপায়িত না হইয়া পারে না। কেননা, সফল ও সার্থক সাহিত্য হইল অন্তরের যথার্থ অনুভূতি ও উপলব্ধির সৃষ্টিময় রূপায়ণ। আর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত যে বাঙলা সাহিত্য তাহার মধ্যে রসোত্তীর্ণ ও সফল সাহিত্য সৃষ্টি গুণ ও পরিমাণের দিক দিয়া নগণ্য নহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত সাহিত্য তো শুধু রসোত্তীর্ণ নহে—তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদবর্জিত এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী রবীন্দ্রনাথ এবং খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষ অনুপস্থিত একথা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে, তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে মুসলিম গৌরব ও মুসলিম উত্থানের—বিশেষ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম

www.pathagar.com

শিকার হিসাবে সর্বক্ষেত্রে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত এবং তাঁহাদেরই অতি নিকট প্রতিবেশী বাঙালী মুসলমানের—এমনকি বাঙলার জনসংখ্যার প্রায় নব্বই জন যাহারা—হিন্দু-মুসলমান সমবায়ে গঠিত সেই যে কৃষক-শ্রমিক সমাজ—তাহাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাষা ও বাণী এবং উত্থান ও অভ্যুদয়ের হাতছানি ও দিক-নির্দেশ সমভাবে অনুপস্থিত। অথচ যথার্থ জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে জাতির সমগ্র জন-সংঘের সার্থক মানস-চিত্র এবং আশা-ভাষার রূপায়ণ ও চিত্ররেখা উপস্থিত থাকিবে ইহাই সঙ্গত ও কাম্য। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ব-বিজয়ী বিরাট প্রতিভা এ-সম্পর্কে কখনো অজ্ঞ বা অসচেতন থাকিতে পারেন না। তিনি জানিতেন—যে সমাজে ও পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত, পালিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছেন তথাকার সুউচ্চ আসনে বসিয়া নিম্নের মৃত্তিকা-আশ্রয়ী কৃষক-শ্রমিকের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ আশা-আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে রূপায়িত করা—যত বড় প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকেরই হোক কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে—তাঁহারো পক্ষে নহে। কেননা, কোন মানব-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট স্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী স্পর্শে ও নিশ্ছিদ্র নৈকট্যে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত হইয়া তাহার সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত একান্ত আত্মীয়তায় একাত্ম না হইতে পারিলে সাহিত্যে তাহার সফল ও সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর নহে। তাই তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যে মানব-গোষ্ঠী তাহাদের আশা-ভাষা ও ছবি-ছন্দকে যাঁহারা সাহিত্য-অঙ্গনে যথার্থ রূপ-রেখায় অঙ্কিত করিবেন সেই কবি-সাহিত্যিকদের আগমনের পদ-ধ্বনি শুনিবার জন্য তিনি জাগ্রত-চিত্ত ও অধীর আগ্রহে কান পাতিয়া রহিয়াছেন। হয়তো বা তাহার সেই আগ্রহেরই ফলশ্রুতি—নজরুল আর জসীমউদ্দীন।

বাঙলা সাহিত্য-অঙ্গনে নজরুল-জসীমের আবির্ভাবের কারণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে আর একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যও গভীরভাবে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার অবকাশ রহিয়াছে। নানা বিরূপ ও বিরুদ্ধ পরিবেশের ফলে চিত্তের গহন গহ্বরে যে গভীর ও নিবিড় ব্যথা-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিসুপ্ত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে তাহারি সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যদি বহির্জগতের কোন সুর-সাধক নব সুরের সৃষ্টি করিতে পারেন তবে তিনিই পারেন সেই সুপ্ত আত্মাকে আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত করিয়া নব উন্মাদনা ও নব প্রাণ-চাঞ্চল্যে বিশ্ব-বুকে ছড়াইয়া দিতে। নির্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট বাঙালী মুসলমানের চিত্ত-গুহায় স্বাজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য-সততা এবং আত্ম-সত্তা ও আত্মোপলব্ধির যে নিত্য-নিসৃত জম্‌জম্‌-ধারা তাহার নৃত্য-চঞ্চল কল্লোলনীতি ভুলিয়া বেদনায় শিলীভূত ও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহারি আশা-ভাষা ও সুর-ভঙ্গিমায় সেদিন মুসলিম বাঙলা সাহিত্য-অঙ্গনে অনুরণন-মুখর নব বাঁশরী-দামামা বাজিয়া উঠিল। মুসলিম-বাঙলার সুপ্ত আত্মা সেদিন বারুদের মত বিস্ফোরিত হইয়া মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আধুনিক কালে বাঙলার বিশেষ করিয়া মুসলিম-বাঙলার ও কিষাণ-বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে যাদুমন্ত্রের মত নজরুল-জসীমের যে বিস্ময়কর সাফল্য তাহার কুঞ্জি-কাঠি এইখানেই লুক্কায়িত। সেদিন বাঙলার মুসলমান তাহার আজানের দামামা-ধ্বনিতে হইল জাগ্রত ও উত্থিত। বাঙলার কিষাণ তাহার মেঠো বাঁশীর সুরে হইল আনন্দ-বিহ্বল—মুক্তি-পাগল।

বাঙলার সাহিত্য-অঙ্গনে মন ও মানস এবং কায়া ও রূপের ক্ষেত্রে এই যে দ্বিধা-বিভক্তি ও দ্বৈতাচরণ এবং কোথাও-কোথাও দ্বিচারিতা—আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা অনেকটা বিসদৃশ মনে হইলেও ন্যায় ও বাস্তবতার তুলা-দণ্ডে তাহা যে কোন প্রকার দোষণীয় বা অস্বাভাবিক নহে সে-কথা পূর্বেই কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে স্বজাতি প্রেম ও সমাজ-সেবা মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আরও

www.pathagar.com

স্মর্তব্য—প্রতিভার বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হইলেও তাহা পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সহিত ছিন্নসূত্র নহে। বরঞ্চ পরিবেশ ও পরিমণ্ডলই বিশেষ করিয়া কোন জাতির জাগরণ ও নব উত্থানের প্রাক্কালে যে-আশা উদ্দীপনা ও প্রাণ-শক্তির স্ফুরণ ঘটে, তাহারি পরিবেশ ও পরিমণ্ডল ঐ জাতির মধ্যে জন্মদান করে নব-নব প্রতিভার এবং খুলিয়া দেয় ঐ প্রতিভা বিকাশের বহুমুখী রাজ-বর্ত। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সৃজন-প্রতিভার বিকাশ-উন্মুখ ও বিকাশ-মুখর যুগে তাঁহারা স্বজাতি ও স্বদেশের যে-বিশেষ পরিবেশও পরিমণ্ডলে লালিত ও বর্ধিত হইয়াছেন তাহার প্রভাব ও প্রেরণাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই এবং যতবড় প্রতিভাই হোক, কাহারো পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে এবং স্বাভাবিকও নহে। প্রধানতঃ এই জন্যই বাঙলার হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রধান জাতির দুই যুগান্তকারী প্রতিভা একই বাংলা ভাষার মাধ্যমে অনবদ্য ও অনুপম সাহিত্যসৃষ্টি করা সত্ত্বেও তাহাদের দৃষ্টিকোণ, ভাষা-ভঙ্গিমা, ঔদার্য ও অসাম্প্রদায়িকতার পরিধি এবং সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও নির্ধারণে রহিয়াছে ব্যাপক বিভিন্নতা ও দুস্তর ব্যবধান। ইহা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার মৌল গঠন উপাদান এবং উভয়ের অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তার বিশ্বমুখীনতা ও অনুভূতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ধারণা সম্পর্কে পরস্পর নিরপেক্ষ যে-ব্যবহারিক অভিজ্ঞান রহিয়াছে তাহার দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রভাব দুর্লংঘ্য ও অনতিক্রম্য। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ভাবানুভূতি ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা কবি রবীন্দ্রনাথ ও কবি নজরুলের মধ্যে যতখানি নহে হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম নজরুলের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক বেশী। হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত পাক-ভারতে এই দ্বি-স্রোতা জীবন-সত্ত্বা কখনো পাশাপাশি কখনো অগ্র-পশ্চাতে প্রবাহিত হইতে বাধ্য।

এই সত্যোপলব্ধির রশ্মি-আলোকে অনুধাবন করিলেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের পর অথচ তাঁহারি জীবদ্দশায় সাহিত্যক্ষেত্রে ভিন্ন মত ভিন্ন পথ বাহিয়া নজরুলের যে আবির্ভাব তাহা কোন আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা নহে।

বাঙালী জাতির উত্তরকাল হইতে তাহার ভাষা ও সাহিত্য ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-বিবর্তনের যে ঐতিহাসিক ধারা বাহিয়া নব দিগন্তাভিসারী নব-নব দিক-নির্দেশ-আশায় পুনরাবৃত্তির বাঁকে-বাঁকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—নজরুলের আবির্ভাব সেই আবর্ত-মুখর বঙ্কিম যাত্রাপথের নবতর পরিক্রমা মাত্র। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের অগ্রাভিসার-পথে এই শ্রেণীর পুনরাবৃত্তি-চঞ্চল নিত্য নব দিক-সন্ধানের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ও প্রত্যক্ষ নিদর্শন সর্বত্রই দেদীপ্যমান। তাহার ইতিহাসের গতি-ধারা একটু অনুসন্ধান করিলেই এই সত্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

বঙ্গ জাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে। মধ্য এশিয়া হইতে আগত ভারত-বিজয়ী আর্যদের পূর্বাভিসারী ক্রম-সম্প্রসারণের মুখে এই অনার্য যাযাবর বঙ্গ জাতি পূর্বদিকে পশ্চাদপসারণ করিতে করিতে এখন যে-স্থানকে পূর্ববঙ্গ বলা হয় তথায় আসিয়া বসবাস স্থাপন করে। তাহাদের নাম হইতেই পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম বঙ্গ। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় ও সুহ্ম নামে অভিহিত ছিল। উত্তরবঙ্গের নাম ছিল বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভূমি। গৌড় শব্দ দ্বারা বরেন্দ্রভূমিকে নির্দেশ করিলেও অনেক সময় পূর্ববঙ্গ ব্যতীত রাঢ় ও সুহ্ম ভূমির সহিত একত্রিতভাবে সমগ্র বঙ্গ দেশকে বুঝাইত। সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন আমলেই বঙ্গ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি সমন্বয়ে সমগ্র বাঙলা দেশকে বুঝাইবার জন্য ফারসী 'বাঙ্গালাহ' শব্দ প্রচলিত হয়। এই শব্দ হইতেই 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙলা' এবং ইংরাজী 'বেঙ্গল' শব্দের উদ্ভব।

www.pathagar.com

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হিন্দু গুপ্ত বংশীয়দের শাসনকালে বাঙলাদেশ ব্যাপকভাবে আর্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়। তদানীন্তন আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে তাহাদের কথ্যভাষা সংস্কৃতরূপ ছাড়িয়া তখন যেরূপ ধারণ করে তাহার নাম ছিল পূর্ব-প্রাকৃত। কিন্তু সে-সময়ও তাহাদের সাহিত্য ও রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। এ সময় বাঙলাদেশের যাহারা আদি ও প্রকৃত অধিবাসী তাহাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষা।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দিকে বাঙলাদেশ বাঙালী বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনাধীনে আসে। তাহার সঙ্গে আসিল প্রচারমুখী বৌদ্ধ-ধর্মের সম্প্রসারণ-প্রয়াস ও সমাজ-সাম্যের দুকূল-প্লাবী বন্যা-স্রোত। সেই স্রোতে হিন্দু-ধর্মের বর্ণাশ্রমপন্থী জাতিভেদমূলক বর্ণ-কৌলিণ্যের সঙ্গে ভাষাগত কৌলিণ্যও গেল ভাসিয়া। বাঙলার রক্তে ও ভাষায় ঘটিল সাংকর্ষ। আর্য ও অনার্যদের এই রক্ত ও ভাষার সংমিশ্রণে যে সাংকর্যের উদ্ভব হইল জাতি হিসাবে তাহারি নাম বাঙালী ও ভাষা হিসাবে বাঙলা। অতএব দেখা যাইতেছে পৃথিবীর বহু জাতি ও ভাষার মতো বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার আদি উদ্ভবের মূল প্রেরণা ও উৎস হইল সাংকর্য। বাঙলার জাতি ও ভাষা গঠনে সাংকর্যের ইহাই প্রথম আবির্ভাব।

আজ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শনরূপে যে পুস্তকটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিতদের মতে তাহার রচনাকাল এই বৌদ্ধ পাল রাজাগণের শাসন আমলে দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই পুস্তকটির নাম "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়" বা "চর্যাপদ"। তদানীন্তন বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারার্থে রাজানুকূল্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক গীতিময় কবিতারূপে এইগুলি বিরচিত হয় এবং সে সময় বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সহকারে এই সকল বৌদ্ধ দোহা বা ধর্ম-সংগীত দেশের সর্বত্র গীত হইত। এইগুলিই বাঙলা কীর্তন-গানের প্রাচীনতম রূপ।

চর্যাপদগুলি যদিও আদি বাঙলা ভাষায় রচিত তথাপি এই ভাষাকে তখন বাঙলা ভাষা বলিয়া অভিহিত করা হইত না। তখন তাহার নাম ছিল "সুন্ধা ভাষা"।

যাহা হউক, এই ভাষা-ভংগী ও সাহিত্য-ধারা আপন স্বকীয়তা ও স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভের পূর্বেই বাঙলার ইতিহাসের ধারায় দেখা দিল এক নব গতিআবর্তন।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী গোঁড়া-হিন্দু-আচার-নিষ্ঠ অ-বাঙালী সেন-রাজবংশ বাঙলাদেশ অধিকার করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের উৎখাত এবং হিন্দু-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এই শতাব্দীরই মধ্যভাগে এই বংশের বল্লাল সেন পাল রাজাগণের শাসনকালে বিধ্বস্ত হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মী বর্ণ-কৌলিণ্য পুনর্জীবিত করিবার জন্য কাণ্যকুব্জ হইতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে আনয়ন করিয়া সমাজে কৌলিণ্য প্রথার প্রচলন করেন এবং রাষ্ট্র-ভাষায় সংস্কৃত আমদানী করিয়া করেন ভাষাগত কৌলিণ্যের প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় আদেশ দ্বারা সন্ধ্যা ভাষা বা তদানীন্তন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করা হইল রহিত। শুধু তাহাই নহে। রাজাদেশ অনুসরণে হিন্দু শাস্ত্র-বেত্তাগণও দেব-ভাষা সংস্কৃত ব্যতীত মানব ভাষা অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় শাস্ত্রালোচনা করিলে এবং তাহা শ্রবণ করিলে তাহার জন্য রৌরব নামক নরকের ব্যবস্থা দান করিলেন :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

www.pathagar.com

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এখানেই বৌদ্ধ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যেই ইতিহাসের ক্রম-প্রবহমান ধারা আবার নূতন বাঁকে প্রবাহিত হইল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বাঙলার শাসন-ক্ষমতা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন তাহ্‌জীব ও তমদ্দুনবাহী মুসলমানদের করতলগত হইল। স্বাভাবিকভাবে তাঁহারা তাঁহাদের স্বকীয় ভাষা ফারসীকেও এদেশের রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলন করিলেন। এই নবাগতদের পক্ষে এদেশের বিভিন্ন অংশ জয় করিয়া ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবহাওয়া ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় লাভ এবং এদেশকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রায় দুই শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। ফলে সেন-রাজাদের শাসনকাল দ্বাদশ শতাব্দী হইতে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর কাল মধ্যে রচিত কোন বাঙলা পুঁথি-পুস্তকের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাজেই এই তিন শ্রেণী ব্যাপী সময়কে বাঙলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙলার ইলিয়াস-শাহী পাঠান সুলতানগণের বিশেষ করিয়া সুলতান হোসেন শাহের পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ নবজন্ম ও উদ্ভব সূচিত হয়। এ সময় হইতে রচিত পুঁথিগুলিই সর্বপ্রথম বাঙলা অক্ষরে লিখিত ও প্রকৃত বাঙলা ভাষায় রচিত হইয়া বাঙলা সাহিত্য নামে পরিচয় লাভ করে।

বৌদ্ধ-যুগের পর বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারার দ্বিতীয় অধ্যায় 'মুসলিম-যুগ' আরম্ভ হইল। এই যুগে রচিত সাহিত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) সংস্কৃত-ঘেঁসা পরিমার্জিত বাঙলায় রচিত প্রধানতঃ দেব-দেবীর স্তুতি-মূলক হিন্দুধর্মীয় কাব্য এবং (২) আরবী-ফারসী শব্দবহুল বাঙলায় রচিত মুসলিম ঐতিহ্য ও ধর্ম-মূলক পুঁথি-সাহিত্য। মুখ্যত উচ্চ-বর্ণের হিন্দু কবিগণই প্রথমোক্ত কাব্যগুলির রচয়িতা। তবে আলাওল প্রমুখ কয়েকজন শক্তিশালী মুসলমান কবিও এই একই ভাষা-ভঙ্গিতে সফল কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের বিষয়বস্তু হিন্দু কবি রচিত কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মুসলমান কবিগণই সর্বপ্রথম বাঙলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেম-প্রীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিয়া বাঙলা কাব্যকে মানব-জীবন এবং মানবীয় চিত্ত-বৃত্তি ও হাসি-কান্নার সহিত যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করেন। দ্বিতীয়োক্ত ভাষা ও কাব্যধারার স্রষ্টা প্রধানত মুসলমান কবিগণই। সাধারণতঃ এই ভাষাকে বলা হয় মুসলমানী বাঙলা এবং এই ভাষায় রচিত কাব্যকে বলা হয় 'পুঁথি-সাহিত্য'। তবে বিষয়বস্তুর দিক দিয়া না হইলেও ভাষার দিক দিয়া তদানীন্তন বহু হিন্দু-কবি—এমনকি ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় পর্যন্ত সাহিত্যরস সৃষ্টির তাগিদেই ঐ ভাষা-ভঙ্গির অনুসরণে বাধ্য হইয়াছেন। এ-সম্পর্কে তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন :

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ—গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।

www.pathagar.com

প্রচার-ধর্মী বৌদ্ধ শাসকদের মতো প্রচার-ধর্মী মুসলিম শাসকগণ এবং তাঁহাদের অধীনস্থ আমীর-ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণের মধ্যেও নিজেদের শাসনাধীনে অবস্থিত অমুসলিম জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের উদার ধর্মমত ও জীবন-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে, স্বধর্মে ও স্বদলে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহারা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে দান করিয়াছিলেন রাজকীয় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রভূত অর্থানুকূল্য—একথাও হয়তো বা বহু পরিমাণে সত্য। কিন্তু একমাত্র এই জন্যই একটি প্রায় অস্তিত্বহীন সাহিত্যের শুধু উদ্ভব সাধনই নহে সেই সাহিত্যের ভাষা-ভাষী অমুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় বিধি-বিধান ও ভাবধারা তাহাদের প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জনের অনধিগম্য সংস্কৃত ভাষার রুদ্ধ-দ্বার-কক্ষ হইতে উদ্ধার করিয়া সেই নব-সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে প্রচার করার জন্য যে নিষ্ঠা ও আগ্রহের প্রয়োজন তাহার সঞ্চার কখনই সম্ভব নহে। এই প্রচেষ্টা ও উদ্যমের পশ্চাতে যে উদার ইসলাম ধর্ম-নির্দেশিত অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসা ও জ্ঞান-বিস্তারের অত্যুগ্র আগ্রহ এবং চির-জাগ্রত ও অতৃপ্ত সাহিত্যানুরাগ—সক্রিয়ভাবে ও অতন্দ্র নিষ্ঠায় কার্যকরী ও সচেষ্ট ছিল—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিদ্যোৎসাহী ও উদারপ্রাণ মুসলমান শাসকগণের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃজন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এই যে, বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্য—উচ্চবর্ণের হিন্দু কবিগণ তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণে কোনরূপ কার্পণ্য করিলেন না। ঐ সময় এদেশে সাহিত্য বলিতে প্রধানত ধর্মীয় সাহিত্য বুঝাইত। গোঁড়া হিন্দু ধর্মের বিধান অনুসারে—বিশেষ করিয়া সেন রাজাদের রাজকীয় আদেশের ফলে—সে যুগে হিন্দুদের সমস্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান বিধৃত ছিল একমাত্র দেবভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায়। কাজেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রমুখ উচ্চবর্ণের যে সকল হিন্দু সংস্কৃত ও বাঙলা উভয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন শুধু তাহারাই এ কাজে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হইলেন। ফলে এই যুগে অনূদিত ও রচিত গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত-বহুল পরিমার্জিত বাঙলা ভাষায়ই রচিত। আলাওল প্রমুখ যে-কয়জন মুসলমান কবি এ সময় বাঙলা ভাষায় সফল ও সার্থক কাব্য রচনায় সক্ষম হন--তাঁহাদিগকেও এই পরিমার্জিত বাঙলা ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কেননা সে সময় অন্য ভাষাভাষী এবং তুলনামূলকভাবে নবাগত মুসলমানদের পক্ষে বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে অনুকরণ ও অনুসরণের যুগ—নূতন ভাষাভঙ্গী সৃষ্টির সময় নহে।

যাহা হউক ঠিক এই সময়ই শ্রীচৈতন্য দেব হিন্দু বাঙলার ধর্মীয় আসরে বিপুল আলোড়নের সহিত আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবের ফলে হিন্দু কবিগণের ধর্মমূলক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আসিল নূতন জোয়ার। কীর্তন গান ও মঙ্গল-কাব্যের স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়া। এই সময় বর্ণ কৌলিণ্যের পাষাণ চাপে পর্যুদস্ত বিরাট সংখ্যক হিন্দু-সন্তান সাম্যবাদী ইসলামের উদার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। চৈতন্যদেব তাহারি প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করিলেন কায়মনোবাক্যে। এ ব্যাপারে তাঁহার দুই প্রধান অস্ত্র হইল—তাহার অনুগামী ও শিষ্যদের মধ্যে বর্ণ-ভেদের বিলোপ সাধন এবং হিন্দু ঐতিহ্যবাহী ভাব ও ভাষার অনুরণনে রচিত ভক্তিবাদমূলক কীর্তন গান ও কাব্য-গাথার প্রচার ও প্রসার। ধান ও গানের দেশ এই নদী-মেখলা বাঙলার ভাবপ্রবণ মানুষগুলির হৃদয়ও তাহার নদীবক্ষোত্থিত তরঙ্গ দোলার মতো উচ্ছ্বাস তরঙ্গে নিত্য স্পন্দিত। সেখানে সুর ও সৌন্দর্যের হাতছানি প্রায়

www.pathagar.com

অপ্রতিরোধ্য। তাই শ্রীচৈতন্যের ভাবোত্তাল সুরের আহ্বান সেখানে ব্যর্থ হইল না। ইহার ফলে হিন্দু সন্তানদের ইসলাম গ্রহণের স্রোতই শুধু সাময়িকভাবে শ্লথ ও স্তিমিত হইল না; বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমানও শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদে হইলেন দীক্ষিত। বাঙলার ইতিহাসে ঘটিল এই সর্বপ্রথম যবন হরিদাসদের আবির্ভাব। সাহিত্যের ভাব এবং সেই ভাব ও ঐতিহ্যবাহী ভাষাভঙ্গী সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে কী অপরিসীম আবেগের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে কী অসম্ভব সম্ভব করা যায় চৈতন্য দেবের সমকালীন বৈষ্ণব-সাহিত্য ও কীর্তন গান এবং তাহারি ফলশ্রুতি হিসাবে যবন হরিদাসদের আবির্ভাব তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এই পরিণতিতে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম ও তমদ্দুন—এমনকি তাহাদের অস্তিত্বের নিরাপত্তা সম্পর্কে জাগ্রত সচেতন হইয়া উঠিলেন। আক্রমণমুখী এবং পরধর্ম ও পরমত অসহিষ্ণু হিন্দুজাতীয়তাবাদের আক্রমণে ভারতের বুক হইতে মুসলিম শাসনের পূর্বসূরী দেশজ বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধ ধর্মের আমূল উৎখাত ও বিলোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশাগত মুসলমানদের এই উদ্বেগ ও আশঙ্কা অমূলক মনে করিবার কারণ নাই। যাহা হউক, এই সময়োচিত সচেতনতার ফলে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম যুগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আবির্ভাব অনেকটা ত্বরান্বিত হইতে বাধ্য হইল। দেখিতে দেখিতে আরবী-ফারসী শব্দ-বহুল মুসলমানী ভাষা-ভঙ্গীতে ও ইসলামী ঐতিহ্যবাহী ভাব-সম্পদ সমৃদ্ধবান অসংখ্য কাব্য-সাহিত্য মুসলিম কবিগণের দ্বারা রচিত ও অনূদিত হইল, কীর্তন গানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দিল ইসলামী ভাবধারাবাহী জারিগান, মারফতী গান, মুর্শিদী গান প্রভৃতি।

তবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এই গতি পরিবর্তনের জন্য উপরোক্ত কারণ ব্যতীত অন্যবিধ স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক কারণও রহিয়াছে যথেষ্ট। সে সময় দেশে রাষ্ট্রভাষা ফারসী থাকায় এবং ফারসীই শিক্ষার প্রধান বাহন হওয়ায় পরবর্তী তিন শতাব্দী কাল মধ্যে অগণিত আরবী-ফারসী শব্দ স্বাভাবিকভাবেই বাঙলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করিল। ইহা ব্যতীত বিদেশাগত বিজেতা মুসলমানগণের বংশধরেরা যাঁহারা এদেশকে স্বদেশরূপে এবং এদেশের ভাষাকেই মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করিলেন তাঁহারা এবং বিপুল সংখ্যক নবদীক্ষিত তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠান, পর্ব-উৎসব, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহৃত অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ বাঙলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন। বিশেষতঃ রুমী, যামী, সাদী, হাফেজ রচিত বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ফারসী সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ প্রভাব সে যুগে বঙ্গ-ভারতের উপর অত্যন্ত প্রবল। সেজন্য সাহিত্যের রস-ধারা পানের জন্য তদানীন্তন সাহিত্যরসিক হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে ফারসী চর্চা ছিল অপরিহার্য। একই কারণে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনার নিমিত্তও সে সময় বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ-প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতেই ক্রমবিকাশের পথে বিবর্তনশীল বাঙলা ভাষা এক নবরূপ ধারণ করিল। এই ভাষাকেই 'মুসলমানী বাঙলা' নামে অভিহিত করা যায় একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নব রূপায়ণ প্রত্যেক জীবন্ত ভাষারই লক্ষণ এবং প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাই গণমুখী হইতে বাধ্য। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্রিত ভাষা নিজের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া নিয়াছে এবং হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাব-ভাবনার পাশাপাশি মুসলিম তাহ্‌জীব-তমদ্দুন এবং চিন্তাধারাও

www.pathagar.com

এই নব-বিবর্তিত ভাষায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু মুসলমান কবিগণই নহেন বহু হিন্দু কবি এমনকি বাঙলা-সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ও এ নবভাষা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একথাও উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার "মানসিংহ" কাব্য হইতে পূর্বোদ্ধৃত কবিতাংশে সেকথা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

কোন ভাষার সঙ্গে যদি অন্য ভাষার শব্দ ওতপ্রোতভাবে একান্ত হইয়া মিশিয়া না যায়, তবে তাহাতে ঐ ভাষার সফল ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অনাহুত অহেতুকভাবে আমদানী করা সম্ভব নয়। অতএব ভারতচন্দ্র-কথিত "যাবনী মিশাল" ভাষা অর্থাৎ আরবী-ফারসী মিশ্রিত ভাষা যে তখন ভাব-প্রকাশ, ভাষার সৌকর্য-বিধান এবং কাব্য-রস-সৃজনের জন্য অপরিহার্য—তাহা স্বীকৃত সত্য।

যে সাংকর্য বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষার উদ্ভবের অন্যতম মূল কারণ, সেই সাংকর্যই আবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

আবার দেখা দিল বাঙলার রাজনৈতিক পরিবর্তন। রাজদণ্ড হস্তগত করিয়াই ভিন্নদেশবাসী ও ভিন্ন ভাষাভাষী ইংরাজ রাজ্যহারা মুসলমানের শুধু ক্ষাত্র-শক্তি নহে তাহার প্রাণ-শক্তির মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাহার যে তাহ্‌জীব-তমদ্দুন এবং সেই তাহ্‌জীব-তমদ্দুনবাহী তাহার যে নব রূপায়িত ভাষা ও সাহিত্য তাহাকেও সে সমূলে উৎখাত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিল। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজেরা অবিলম্বে ফারসীকে বাঙলার রাষ্ট্রভাষার আসন হইতে বিচ্যুত করিল এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করিয়া সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু পণ্ডিতগণের সহায়তায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের শুদ্ধি সাধন করা হইল। হ্যাল্‌হেড, উইলিয়ামকেরী প্রমুখ ইংরাজ ধর্ম-যাজকগণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তদানীন্তন বাঙলা ভাষা হইতে আরবী-ফারসী শব্দ এবং ইসলামী ভাবধারা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সংস্কৃত-বহুল এবং হিন্দু-ভাবধারা-সমন্বিত এক নূতন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি করা হইল। "বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস" রচয়িতা ও বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার উক্ত ইতিহাসে বাঙলা ভাষা হইতে আরবী-ফারসী শব্দের উল্লিখিত নির্বাসন প্রচেষ্টাকে 'আরবী ফারসী নিসূদন যজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবিকই ইহা নিসূদন বা হত্যাযজ্ঞ।

বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম যুগের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত-বহুল পরিমার্জিত ভাষায় হিন্দু-ভাবধারাস্নাত যে সাহিত্যসম্ভার গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরাজ শাসনের প্রথম আমলেও শুধু মাত্রা ও আঙ্গিক ভেদে তাহারি পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে আবার সংযোজিত হইল এক নূতন অধ্যায়, আবির্ভূত হইল "হিন্দু-রেনেসাঁ যুগ"।

ইংরাজ শাসন আমলে এবং তাহাদেরি প্রত্যক্ষ সাহায্য ও নির্দেশক্রমে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যধারায় এই নব পরিবর্তন সূচিত হইলেও এই যুগকে সাহিত্যের "ইংরাজ যুগ" না বলিয়া "হিন্দু-রেনেসাঁ যুগ" বলিয়া অভিহিত করা হইল কেন, তাহার কারণ হইল কোন ইংরাজ কবি-সাহিত্যিক বাঙলা ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা এবং বাঙলাদেশকে নিজের স্বদেশ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঙলা ভাষার মাধমে কখনো কোন সাহিত্য বা কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। অথচ মুসলমানী ভাবধারা ও ভাষা-ভঙ্গী-বর্জিত নব-গঠিত এই সাহিত্য-ধারার মৌলিক

www.pathagar.com

কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রতিভা-স্পর্শ-সমৃদ্ধ ইহারই সুন্দরতর বিকাশের মাধ্যমে বঙ্কিম-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং ইহার ফলে এ সাহিত্য সমগ্র হিন্দুজাতি—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দু-জাতির—নব জাগরণ ও নব রেনেসাঁর প্রাণ-মন্ত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছে। কাজেই বাঙলা সাহিত্যের এই যুগ যথার্থই "হিন্দু রেনেসাঁ যুগ"।

ঈশ্বরচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সকল কবি-সাহিত্যিক এই সাহিত্য ধারার স্রষ্টা ও উদ্‌গাতা তাঁহারা সকলেই উচ্চ-শ্রেণীর বর্ণ-হিন্দুর সন্তান। তাহাদের নিকট মুসলমান এবং তপশিলী কৃষক-মজুর শ্রেণীর হিন্দুগণ অপাংক্তেয়। ইহাদের সঙ্গে বর্ণ-হিন্দু সন্তানদের অবাধ মেলা-মেশা এবং সম-অনুভূতিময় ঘনিষ্ঠতা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বিপদ হইল কোন বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকিলে সে সম্পর্কে সফল সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রচিত সাহিত্যে মুসলমান এবং তপশিলী হিন্দুদের ভাষা ও আশার অনুরণন স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত। অতএব এই সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

উচ্চ-নীচ বর্ণ নির্বিশেষে বাঙলা ভাষাভাষী সমগ্র জনসংঘের মানসলোকের কোন প্রতিচ্ছবি নাই বলিয়া ইহাকে ভাষাভিত্তিক সমগ্র বাঙালী জাতির সাহিত্যরূপে অভিহিত করা যায় না, একথা বলিলে বোধহয় মিথ্যা বলা হয় না। এমনকি সামগ্রিকভাবে বাঙালী হিন্দুদেরও জাতীয় সাহিত্য ইহা নহে। বরঞ্চ ইহাকে বলা যাইতে পারে—বাঙালী বর্ণ হিন্দু-সমাজের জাতীয় সাহিত্য।

বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম যুগের প্রথম পর্যায়ে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বর্ণ-বিভেদ বিরোধী বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে এবং সেই ধর্মীয় ভাব ও ভাষাবাহী সাহিত্য-সঙ্গীতের বন্যা-স্রোত যে-ভাবে তদানীন্তন বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে যবন হরিদাসদের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল ঠিক তেমনিভাবে বর্ণ-বিভেদহীন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারণায় এবং রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের মুসলিম আশা-ভাষা বর্জিত সাহিত্য-সঙ্গীতের বন্যাধারায় মুসলমান সমাজের আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত বেশ-কিছু সংখ্যক লোক কথঞ্চিত পরিমাণে ধর্মক্ষেত্রে না হইলেও কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক-ভাবে নব্য যবন হরিদাসে রূপান্তরিত হইল।

এই অবস্থায় প্রতিকারের জন্য রাজ্যহারা এবং রাষ্ট্রীয় কারণে অর্থ ও শিক্ষায় পশ্চাদপদ বাঙলার মুসলিম সমাজের সুধী ও চিন্তাবিদগণ জাগ্রত ও যথাসম্ভব কর্মতৎপর হইয়া উঠিলেন। মুসলিম বাঙলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন মুন্সী আবদুর রহীম, রিয়াজউদ্দীন মাশ্‌হাদী, মোজাম্মেল হক, শিরাজী, ইসলামাবাদী, কায়কোবাদ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম যুগের প্রথম পর্যায়ে আবির্ভূত আলাওল প্রমুখ কবিবৃন্দের ন্যায় এই নব-আবির্ভূত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও ভাব ও আদর্শের ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারা অনুসরণ করিলেও ভাষা-ভঙ্গীর ক্ষেত্রে নব-গঠিত সংস্কৃত বহুল পরিমার্জিত বাঙলার গণ্ডি ডিঙাইতে পারিলেন না। ফলে আশানুরূপ পর্যাপ্ত সুফল লাভ না হইলেও মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতা অনেকটা ফিরিয়া আসিল এবং অর্ধমৃত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণমুখর প্রাণ-শিহরণের নব স্পন্দন অনুভূত হইল। আরবী-ফারসী শব্দ সমৃদ্ধ ইসলামী যোশ-উত্তাল ভাষা-ভঙ্গীর অভাবে এই কবি-সাহিত্যিকদের রচনা-সম্ভার যথাযথভাবে ফলপ্রসূ না হইলেও ইহারাই বাঙলার সাহিত্য-অঙ্গনে "মুসলিম-রেনেসাঁ যুগ"-এর অগ্রদূত।

www.pathagar.com

ইংরাজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশের ধারা হইতে আরবী-ফারসী শব্দ এবং মুসলমানী ভাব ও চিন্তাধারা নিছক গায়ের জোরেই অপসারিত করা হইয়াছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যের গতিধারাকে চিরদিন গায়ের জোরে পদদলিত ও প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রমাণিত হইল। বিশ্ব-বিজয়ী রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নেই বাঙলা সাহিত্যে দেখা দিল এক নব দিক-নির্দেশ এবং ভাষা ও ভাববিপ্লব। নজরুলই হইলেন এই নব যাত্রাপথের দিশারী এবং বিপ্লবের উদ্‌গাতা ও অগ্রদূত।

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় হিন্দু কবিদের রচিত কাব্য-সাহিত্যের ভাষা, ভাব ও ছন্দ মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে যেরূপ নবতর রূপ ও রসমাধুর্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে মুসলমানী ভাষা ও ভাবসম্পদবাহী অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথি সাহিত্যের ধারাও নজরুল-প্রতিভার যাদুস্পর্শে এক নবতর সৌন্দর্য ও প্রাণবন্যায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তাহার 'খেয়াপারের তরণী', 'শাতিল আরব', 'মোহররম', 'কোরবানী', 'আনোয়ার' ও 'কামাল পাশা' প্রভৃতি কবিতায় অপূর্ব ছন্দ-বৈচিত্র্য শব্দ-ঝংকার ও ভাব-সম্পদ যে আবেগময় সৌন্দর্য-সম্ভারে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। শুধু ছন্দ ও শব্দ বৈচিত্র্যই নহে ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রাণ-স্পন্দন, শৌর্যবত্তা ও উদ্বেল উদ্দামতা নজরুল-কাব্যে যে দৃপ্ত ভঙ্গীমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বাঙলা সাহিত্যের অন্য কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস', 'ধূমকেতু', 'রণভেরী' প্রভৃতি কবিতায় সর্ববাধা-বিঘ্ন-দলিনী যৌবন-জল-তরঙ্গের যে উদ্বেল ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে বাঙলার সাহিত্য পরিমণ্ডলে তাহা তুলনাহীন।

বাঙলার পর্যুদস্ত ও অর্ধমৃত মুসলমানদিগকে জাগ্রত ও আত্মসচেতন করিয়া তুলিবার ব্যাপারে নজরুলের দান অপরিসীম। পাক-ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শিকার বাঙলার মুসলমান রাজ্য হারানোর পর বিশেষ করিয়া সিপাহী-বিপ্লবের পর, ইংরাজ শাসকদের হস্তে যেরূপভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত, দলিত ও শোষিত হয় তাহা যথার্থই মর্মন্তুদ। পতনের সেই অন্ধকার গহ্বর হইতে নজরুলই তাহাদিগকে টানিয়া তুলিলেন তাঁহার কবিতা ও গানের যাদু-মন্ত্রে। তিনি তাহাদিগকে শুনাইলেন রাত্রিশেষের উষার আজান, তাহাদের ভাঙা-কেল্লায় নিশান উড়াইবার দিলেন নির্দেশ এবং বিশ্বের দিকে দিকে 'দ্বীন ইসলামী লাল মশাল' যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন বে-খবর এই বাঙালী মুসলমানদিগকেও জাগিয়া উঠিয়া প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য জানাইলেন আহ্বান। তাঁহার সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। স্বাধীন পাকিস্তানই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উর্দুভাষাভাষী অঞ্চলে মুস্‌লিম জাগরণে হালী ও ইক্‌বালের যে সমবেত দান বাঙলার মুসলিম জাগরণে নজরুলের দান তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

নজরুল শুধু বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবিই নহেন। জীবনের সুন্দরতম প্রকাশ ও মহত্তম বিকাশ যে প্রেম তিনি তাহারও কবি। তিনি সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য'। তিনি ইরাণের বুলবুলির গান বাঙলা আম্রকাননে দিয়াছেন ছড়াইয়া। কোমল-কঠোরের এমন মিলিত প্রকাশ কাব্য-জগতে খুব কম কবির ভাগ্যেই দেখা যায়।

www.pathagar.com

নজরুল শুধু বাঙালী মুসলমানদের কবি হিসাবেই আবির্ভূত হন নাই—তিনি বাঙলা ভাষাভাষী সকলেরই কবি। তাঁহার কাব্যে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ সকলেরই আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষা ও বাণী হইয়াছে রূপায়িত। সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার 'সাম্যবাদী' প্রমুখ কাব্যে নারী-শ্রমিক-কৃষক-জেলে এমনকি বারাঙ্গনা পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষই পাইয়াছে তাঁহার দরদভরা চিত্তের স্নেহময় পরশ। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে স্বীকার করিতেই হয় নজরুলই বাঙলা ভাষা-ভাষী জনসংঘের জাতীয় কবি, অন্য কেহ নহে। এই নজরুলের আবির্ভাবই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে খুলিয়া দিল পুনরাবৃত্তির আবর্তন পথে নব দিগন্তের নবারুণ জ্বালা এক তোরণ দ্বার। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবার দেখা দিল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

নজরুলের আবির্ভাবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-মণ্ডলে বিকশিত হইয়া উঠিল শুধু মুসলিম-রেনেসাঁ যুগই নহে—"বিশ্ব-রেনেসাঁ যুগ, মানব-মুক্তি যুগ"।

www.pathagar.com

সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব

প্রাক–বিপ্লব আমলে আমাদের রাষ্ট্র জীবনে, সমাজ জীবনে, তামুদ্দুনিক জীবনে এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবনে—এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আত্মসর্বস্ব যে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়ে জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল, বর্তমান বিপ্লবী সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তার প্রকোপ বহুক্ষেত্রে বহু পরিমাণে প্রশমিত হলেও সে–দুর্নীতির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ঘটেছে—মনে হয় একথা বলার সময় এখনো আসেনি।

কিছুকাল যাবত আমাদের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সরকারী প্রচার বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি সংস্থা প্রভৃতি জাতীয় সংগঠন এবং জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মূল কেন্দ্রগুলির সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে দুর্নীতির যেসব প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ সমর্থিত অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছে এবং যেগুলি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনরূপ প্রতিবাদ বেরোয়নি—সেগুলি পাঠ করে পূর্বোক্ত আশঙ্কা ও অনুমান সঙ্গত নয়—এরূপ মনে করার কোন যুক্তি ভিত্তিক কারণ আছে বলে মনে হয়না। আমরা যারা সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় উন্নতি–অবনতির সঙ্গে যাদের জীবন ও ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য রূপে ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই আমরাও এরূপ পরিস্থিতিতে জাতির তথা আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

আমাদের দেশে প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে যে, ভূতগ্রস্ত রোগীর ভূতকে নাকি সর্ষে দিয়ে তাড়ানো যায়। কিন্তু সর্ষের ভিতরই যদি ভূত ঢোকে তবে সে রোগীর আরোগ্য–আশা সুদূর পরাহত। মনে হয়, আমাদের বর্তমান অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে কেন এ অবস্থার উদ্ভব হলো সে সম্পর্কে আরো একটু আলোচনা করে দেখা যাক।

দু'শ বৎসরের পরাধীনতায় নিপিষ্ঠ ও নির্যাতিত, সুশিক্ষিত ও বিত্তশালী প্রতিবেশীদের গায়ের–ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে অনেকটা মোহাবিষ্ট সর্বোপরি নাস্তিক্যবাদী এবং ফলে পরোক্ষভাবে নৈতিকতা বিরোধী বিশ্ব–গ্রাসী এক মতবাদের প্রচার–আবর্তে কিছুটা বিভ্রান্ত, আমাদের এ নব জাতি আজ যাত্রাপথের এক সঙ্গম স্থলে উপনীত। তার একদিকে জীবনের ইঙ্গিত আর একদিকে মৃত্যু–মরীচিকার হাতছানি। এমনি ক্ষণে যথার্থ মঞ্জেলে মকসেদ অনুধাবনে ও নির্ণয়ে বিভ্রম ঘটলে তার ধ্বংস অনিবার্য। তাই আজ এ নব জাতিকে প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ আদর্শানুসরণের মাধ্যমে তার ইসলামী ঐতিহ্য ও নৈতিকতার সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার, অন্য কথায় তাকে সুস্থ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সর্বাধিক। এজন্য আমাদের দূরদর্শী বর্তমান বিপ্লবী সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই।

আমাদের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোঃ আয়ুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন–দরদী ও জনপ্রিয় বর্তমান গভর্ণর লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল মোঃ আজম খান এবং অন্যান্য চিন্তাশীল সুধীবর্গ বারংবার জাতিকে তার নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। সরকারী

www.pathagar.com

প্রচার বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী ও পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ প্রভৃতি সরকারী, অর্ধ সরকারী, বে-সরকারী অথচ সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রচার সম্পর্কিত ও প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখিত নৈতিক আদর্শ ভিত্তিক প্রকৃত জাতীর শিক্ষার প্রাণ-কেন্দ্র ও প্রচার কেন্দ্র স্বরূপ—একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। সেগুলিতেই যদি নীতিহীনতা নির্লজ্জ .... আত্ম প্রকাশ করে তবে জাতির বাঁচার আশা আর কোথায়? মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও তদসংশ্লিষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে সরিয়ে দিতে পারলেই সে দুর্নীতির মূলোৎপাটন ও দমন অনেকটা সম্ভবপর। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি, তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। কেননা জাতির যারা ভবিষ্যৎ, যে তরুণ ও যুবকেরা তাদের গঠনোন্মুখ জীবন পথে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নীতিহীনতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে যদি একবার পদস্খলিত হয় তবে তাদের নৈতিক পুনরুদ্ধার অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ শ্রেণীর পথভ্রষ্ট যুবকেরাই জাতির সঙ্কটের দিনে জাতির ধ্বংসের অগ্রদূত রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এ সম্পর্কে আর একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদল কায়েমী স্বার্থবাদী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের মৌলিক অযোগ্যতা সত্ত্বেও দেশের সরল বিশ্বাসী জন সাধারণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে এবং নানা প্রকারে চোখে ধুলো দিয়ে এবং কখনোবা টাকা ও পদের জোরে সম্মোহিত করে যেমনভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠিত করে বসে ছিলেন এবং আমাদের বর্তমান বিপ্লবী সরকার তাদেরে সেখান থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত বহাল তবিয়তে দেশকে লুণ্ঠন করে চলে ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আর এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী আজ সরকারী অফিস, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উচ্চ আসন দখল করে বলে শুধু মাত্র তারই জোরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং পদ ও পদবীর সুযোগে একদিকে তথাকথিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনার নামে প্রভূত সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করছেন এবং অপরদিকে নিজেদের অক্ষমতা, অজ্ঞতা ও দুর্লোভ প্রসূত নীতি হীনতায় দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে দ্রুত ঠেলে দিচ্ছেন। এ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের হীন প্রচেষ্টাকে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো অবিলম্বে প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের আবির্ভাব সম্ভবপর হলো কি করে? এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলে কতকগুলি মৌলিক কারণ ও ঐতিহাসিক তথ্যের সম্মুখীন হতে হয়।

পলাশী পরবর্তী একশত বৎসরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তামুদ্দুনিক ও শিক্ষাগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের প্রায় সর্বস্তরে পর্যুদস্ত ও সর্বহারা বাঙ্গালী মুসলমান সিপাহী বিপ্লবোত্তর আত্ম জিজ্ঞাসার এবং যুগধর্মানুযায়ী আত্ম চেতনায় অনেকটা সজাগ হয়ে উঠল এবং রাষ্ট্র ভাষার আসন থেকে বিচ্যুত বিগত গৌরব ফার্সী তদসঙ্গে উর্দুর মোহ ত্যাগ করে স্বীয় মাতৃভাষার সেবার এবং তারই মাধ্যমে সাহিত্য সাধনার আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু ধ্বংসাবশিষ্ট যেসব মুসলিম রইস ও জমিদার শ্রেণী নির্বাপিত প্রায় প্রদীপের শেষ সল্তের মতো তখনো টিম্‌টিম্ করে জ্বলছিল সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ও প্রতাপ তখনো অক্ষুণ্ণ। নবাব বাদশাহদের অনুকরণে এবং বিশেষভাবে তামুদ্দুনিক কারণে বাঙ্গালী

www.pathagar.com

হওয়া সত্ত্বেও এসব রইস জমিদারদের ঘরোয়া জবান ছিল উর্দু এবং তামুদ্দুনিক জবাব ছিল ফার্সী। ফলে ফার্সী বয়েতের ফোড়ন দেওয়া উর্দু জবানে বাৎচিৎ করাটা তখন ছিল শরাফতের লক্ষণ। তবে মধ্য-বিত্ত থেকে হীন-বিত্ত পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের শতকরা ৯৯ জন যারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিত্য ব্যবহার্য অজস্র আরবী ফার্সী শব্দ সে-বাংলা ভাষার সঙ্গে ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তারই ফলে ভাব ও শব্দ সম্ভারে সে ভাষা হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিকতার দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী এবং ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুনের দিক দিয়ে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। এরূপ ভাষা বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গেও ছিল সুসমঞ্জস্য। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কারণে ইংরাজ শাসকেরা কলকাতার সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে ও সহযোগীতায় সংস্কৃত বহুল যে বাংলা ভাষা ও সে-ভাষায় যে-সাহিত্য সৃষ্টি করল তার সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংযোগ হয়ে গেল ছিন্ন ও ব্যহত। ফলে সাময়িকভাবে এ নব-সংগঠিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মুসলমানেরা হয়ে পড়লেন অনেকটা বীতরাগ ও বীতশ্রদ্ধ তার উপর ইংরাজ সৃষ্ট হঠাৎ-নবাবেরাও সেদিন খান্দানী নবাবদের অনুকরণে ও অনুসরণে এ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষ পাত্তা দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু জাতির যে অংশ যথার্থ চিন্তাশীল ও বিপ্লবপন্থী বাঙ্গালী মুসলমানদের সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তানায়কেরা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় আত্মাকে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে না পারলে জাতীয় জাগরণ অসম্ভব। এবং একথা বুঝতেও তাদের দেরী হলনা যে, যতদিন পর্যন্ত নিজেদের সমাজে আভির্ভূত এক বা একাধিক যুগ-জয়ী, প্রতিভার সৃষ্টিসৌকর্যের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্বীয় তাহ্‌জীব ও তমুদ্দুনের প্রতিচ্ছায়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর না হবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সমর্থিত ও রাষ্ট্র স্বীকৃত ভাষা-ভঙ্গিমা ও সাহিত্য-ধারা অনুসরণ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এমনি দিনে বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে এ নব-ভঙ্গিম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ও সশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল প্রাক্তন বনিয়াদী ও নব-সৃষ্ট—উভয় শ্রেণীর রইস-জমিদার ও উচ্চ পদস্থ অন্যান্য সরকারী ও বে-সরকারী লোকদের নিকট থেকে এ ভাষা ও সাহিত্যের স্বপক্ষে সমর্থন ও সম্মতি আদায় করা। তাই দেখা যায়, বাঙ্গালী মুসলমানদের নব পর্যায়ে বাংলা সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক যুগ থেকে প্রায় বিভাগ-পূর্বকাল পর্যন্ত আমাদের অনেক সাহিত্যিক সভা সম্মেলনে অনেক সমর অ-স্যাহিত্যিক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগকে সভাপতি-পদে নির্বাচিত ও বরিত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যকে তদানীন্তন মুসলমান সমাজে জন-প্রিয় ও জন-শ্রদ্ধাভাজন করে তোলার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় এ শ্রেণীর ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার হয়তো বা প্রয়োজন ছিল। আমাদের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর সমাজের পক্ষে সেদিন সামাজিক মান-মর্যাদা কিংবা সরকারী ক্ষমতার উচ্চ গদী-নশিন অ-সাহিত্যিক বৃন্দের কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি কিংবা একটুখানি মৌখিক সহানুভূতি আমাদের সাহিত্য-সাধনার অগ্রগতির ব্যাপারে সে নব-পর্যায়ে পথ-যাত্রার দিনে অল্প সাহায্য করে নি। বাঙ্গালী মুসলমানদের সেদিনকার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস একটু সজাগ দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান করলে এমন নজিরেরও হয়তো অভাব হবেনা যেখানে দেখা যাবে, কোনো দরিদ্র সাহিত্যিকের রচনা চিত্তশালী ও উচ্চপদস্থ অন্য কোন অ-সাহিত্যিক ব্যক্তির নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকার ঘটনা জানা সত্ত্বেও সেদিন বাংলার ক্ষুদ্র মুসলিম সাহিত্য সমাজে এ সম্পর্কে প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি হয়তো এযনি কোন

www.pathagar.com

ধারণার বশবর্তী হয়েই যে, অন্ততঃ দু-একজন উচ্চ পদস্থ মুসলমান বাঙলা সাহিত্য চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন—এ সংবাদটিও সাহিত্য-সাধনা নিরত মুসলমান সাধকদিগকে দিবে কিছুটা সামাজিক মর্যাদা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ফুটোন্মুখ তরুণ মুসলমান সাহিত্যিকদিগকে দিবে বাংলা সাহিত্য-সাধনায় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ। এরূপ ধারণা কিংবা এরূপ পদ্ধতির অনুসরণ ভ্রান্তিমূলক হতে পারে, কিন্তু সেদিনকার বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অবস্থার কথা চিন্তা করলে এ-কে অস্বাভাবিক বলে মনে হবেনা। কিন্তু আজ "তেহি দিবন গডা:"।—নেই আজ সে-দিন আর সে-যুগ। সামন্ততান্ত্রীক মনোভাব এবং পশ্চাৎ-দৃষ্টি-সর্বস্ব আত্মম্ভরিতা ও অতীতমুখীনতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করে আজাদী-উত্তর কালে গণ মনে কোনরূপ শ্রদ্ধা-উদ্রেক কিংবা অনুগত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা ও মর্যাদা রাখে—এরূপ ধারণা করার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয়না। কাজেই চাপরাশের জোরে সাহিত্য-চর্চার কিংবা সাহিত্যিকের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস এ যুগে শুধু অবান্তর নয়—রীতিমত সাফল্যের পরিপন্থী। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এ বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ জগতে বাস করেও যদি আমরা আধুনিক গণ-মানসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে না পারি—তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিপর্যয় ঘটা একটুও অসম্ভব নয়। মনে হয়, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে আমরা সে সাহিত্যিক বিপর্যয়ের দিকেই এগিয়ে চলছি। কেননা, আজো এখানে দেখা যায়—চাপরাশ-সর্বস্ব তথাকথিত সাহিত্যিকদেরই জয় জয়কারে এখানকার আকাশ-বাতাস—বিশেষ করে সরকারী আকাশ-বাতাস ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। এ শ্রেণীর সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই তাদের সুদীর্ঘ বা নীতিদীর্ঘ জীবনে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সম্পর্কিত রচনা এক ডজনও লিখেছেন কিনা সন্দেহ। অথচ তারাই আজ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-ক্ষেত্রে "বড়া ছাহেব"—প্রাণকর্তা ও ত্রান-কর্তা। কেননা, চাপরাশের জোর তাদের বিপুল। কেউবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উচ্চপদে সমাসীন--কেউবা সরকারী উচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এরা হয়তোবা এদের পদ ও পদবী-গত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন—যদিও সর্বক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য না-ও হতে পারে এবং পারেনা যে, তার নজিরও আছে। কিন্তু এরা সর্ব-বিদ্যা-বিশারদ কিনা-সে কথা জানার মতো প্রমাণ আজো পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ এ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞেরা যে, বিষয়ান্তরে বিশেষরূপে অজ্ঞ, তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। একাধিক বিষয়ে বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিভার অধিকারী ওমর খৈয়াম, গ্যাটে আর চার্চিলদের সংখ্যা সারা পৃথিবীতেই অত্যন্ত অল্প। এমন কি সাহিত্যের সর্বশাখায় সমান সিদ্ধ-হস্ত—এমন সাহিত্যিকের সংখ্যাও পৃথিবীতে বিরল। আমাদের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ সমবায়ে গঠিত বিপুল সংখ্যক সাহিত্যিকের ভিতর একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ব্যতীত আজ পর্যন্ত সাহিত্যের সর্ব শাখায় না হোক—অন্ততঃ বহু শাখায় যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন এমন তৃতীয় ব্যক্তির নাম আমাদের জানা নেই। অথচ আজ আমাদের পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ সর্ব প্রতিভা-বিশারদ সাহিত্যিকের নাগাল যেখানে সেখানে—বিশেষত উচ্চ পরিমণ্ডলে সর্বদাই পাওয়া যাওয়া অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার নয়। শুধু কি তাই? যিনি জীবনে একটিও কবিতা লেখেননি, তিনিই এখানে কাব্য-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ; যিনি নাটক লেখা দূরে থাকুক—কোন একটি ভাল নাটকের অভিনয়ও জীবনে দেখেছেন কিনা সন্দেহ, তিনি নাটকের প্রধান বোদ্ধা ; এবং যিনি সাহিত্যিক প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ মৃত অতীতের সাহিত্য-গবেষণায় পলিত-কেশ এবং আধুনিক মননশীল সাহিত্যের খোঁজ-খবর নেবার বিশেষ অবসর পর্যন্ত পাননি জীবনে,

কিংবা অতীতের সাহিত্যের মৃত-স্তূপের ভিতর জীবন কাটানোর ফলে আধুনিক সৃষ্টি-ধর্মী সাহিত্যের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন—তিনিই আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমজদার রূপে সম্মানিত ও স্বীকৃত। এমন শোচনীয় অথচ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সেখানেও সেই চাপরাশের মহিমা ও কেরামতি। একবার কোনোরূপে কোনো একটি বিষয়ের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে সে-সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের চারপাশ সংগ্রহ করে ফেলুন—দেখবেন রাতারাতি আপনি সর্ব-বিদ্যা বিশারদ বনে গেছেন। তখন আপনি ইংরাজী কিংবা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ হয়ে এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত রচনা সারা জীবনে দু-চারটে লিখে কিংবা না লিখেও সে-সাহিত্যের সর্ব সাখায় বিশেষজ্ঞ ও বোদ্ধা বলে স্বীকৃত হয়ে গেছেন। তাই মনে হয়—আজকের পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য যেনো বে-ওয়ারিশ মাল। 'লাঠি যার-মাটি তার'—এ নীতির রাজত্ব এখানে। গদীর গদা—সে গদা শূণ্যোদর লাউএর আবরনীতি তৈরি যাত্রা গানের ভীমের গদাই হোক—সেরূপ গদা অর্থাৎ তদ্রূপ বা তদশ্রেণীর স্ফীতোদর সামাজিক বা সরকারী যষ্ঠি বা লাঠির যিনিই অধিকারী তিনিই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক জমিদারীর অন্ততঃ আপাতঃ স্বত্ব ও মালিকী মোক্তারী দখল করে নিচ্ছেন ও নিতে পারেন মনের সুখে ও বনের রীতিতে। সারা জীবনের কৃচ্ছ-সাধনায় যে-বেচারারা এর সাধনা-ভিত্তিক উত্তরাধিকারের যোগ্যতা অর্জন করলো, শুধু গদী ও গদীর অভাবে এর প্রকৃত উত্তরাধিকারগত মর্যাদা ও সুখ-সৌভাগ্যের আসন থেকে প্রায় চির-নির্বাসিত তারাই।

কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থার উদ্ভব সম্ভবপর হলো কি করে—এ প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এর কারণ একাধিক। সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ-পোষকতাই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সহায় ও অবলম্বন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ নিদর্শন মেলে বৌদ্ধ আমলে, মুসলমান আমলে এবং ইংরাজ আমলেও আমাদের বর্তমান বিপ্লবী সরকারও চিরাচরিত এ মহান পন্থারই অনুসরণ করছেন। এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আমাদের অনেক দুঃস্থ সাহিত্যিক ও অনেক পরোলোকগত সাহিত্যিকের দুঃস্থ পরিবার প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে পেয়েছেন সাময়িক ও স্থায়ী সাহায্য এবং সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান "পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ" পেয়েছে পৃষ্ঠ-পোষকতা, উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা। এ জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট আয়ূব খান ও তাঁর বিপ্লবী সরকারকে জানাই শুকরিয়া ও অভিনন্দন। কিন্তু এ সরকারের যে-কয়জন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিজেরা সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক এবং প্রধানতঃ যাঁদের আপ্রাণ-প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "পাকিস্তান লেখক সংঘ" এবং সে সংস্থা পেয়েছে সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি—এক কথায় যাঁদের আন্তরিকতা ও সুপরামর্শে বর্তমান বিপ্লবী গোটা সরকারই হয়েছে অনেকটা সাহিত্য-মনা—আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত। পাকিস্তান লেখক-সংঘের সংগঠন উপলক্ষে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের খোঁজ করতে এসে স্বভাবতঃই এঁদেরকে উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালী অধ্যাপকদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখিত উচ্চাসীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা তাঁদের জীবনে হয়তো বা কচিৎ-কখনো দু-চারটি প্রবন্ধ বা কবিতা বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন এবং স্বভাবতঃই কখনো বাংলাদেশে যথার্থ কবি-সাহিত্যিক হিসাবেও পরিগণিত হবার

www.pathagar.com

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য অর্জন করতে পারেননি—তাঁরাই এ সুযোগে পারস্পরিক সহযোগিতায় পরস্পরকে দিগ্‌গজ সাহিত্যিক বলে "পাকিস্তান লেখক সংঘের" উদ্যোক্তা, পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিবর্গের নিকট জাহির করে বসলেন। এসব অবাঙ্গালী সাহিত্যিকবৃন্দ সাহিত্যিক হিসাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে হয়তোবা যেটুকু সংবাদ রাখতেন তাতে হয়তো তাঁরা জানতেন যে-নব-সংগঠিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা ও সাধক সেই বঙ্কিম-নবীন, ডি,এস, রায়—রমেশ দত্ত, মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ—এমনকি আধুনিক অচিন্ত্য-অন্নদাশঙ্কর পর্যন্ত সকলেই হয় উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী—নয়তো অভিজাত শ্রেণীর লোক। আর তাঁদের নিজেদের উর্দ্দু-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে, সে ভাষার যাঁরা সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আসন ও মর্যাদা উল্লেখিত বাংলা-সাহিত্য সাধকদের চেয়ে বহুগুণ উর্দ্ধে—অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে। 'আফতাব' বা দিল্লীর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম এবং 'জাফর' বা শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ প্রমুখ সম্রাটগণ, দাক্ষিণাত্যের কুতুব শাহী ও আদীল শাহী সাহিত্যসেবী অধিপতিবৃন্দ, লক্ষ্ণৌর নওয়াব আসফউদ্দৌলা 'আসফ' থেকে নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ্ 'আখতার' পর্যন্ত স্বাধীন নওয়াবেরা এবং হায়দারাবাদের নিজাম নিজামুল্ মুল্‌ক্ আসফজাঁ থেকে নিজাম স্যার ওসমান আলি খান 'ওসমান' এবং ভূপালের শাসন-কর্ত্রী নওয়াব জাহান বেগম "শিরিন" থেকে নওয়াব সুলতান জাহান বেগম পর্যন্ত করদ রাজন্যবর্গ এবং সে সঙ্গে রামপুরের নওয়াব ইউসুফ আলি খান থেকে নওয়াব হামিদ আলি খান পর্যন্ত করদ ভূপতিগণ—যাঁরা ছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত—তাঁরা উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্যকে শুধু অবাধ ও অকুণ্ঠ পৃষ্ঠ-পোষকতাই দান করেন নি...নিজ-নিজ সাধনায়ও সে ভাষা ও সাহিত্যকে তাঁরা করেছেন সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। এঁদের কথা ছেড়ে দিলেও দিল্লীর পাঠান সম্রাট বুলবনের সভাসদ আমীর খস্‌রু থেকে মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান খানান, উত্তর ভারতের নওয়াব সাদৎ আলি খান "রঙিন" থেকে দক্ষিণাত্যের শামস্ ওয়ালীউল্লাহ্ বা ওয়ালি, দিল্লি-লক্ষ্ণৌর মীর ও সৌদা থেকে মুর্শিদাবাদের ইন্‌সা প্রমুখ কবিবৃন্দ, মির্জা গালিব ও মির্জা দাগ্ থেকে আজাদ, হালী ও ইক্‌বাল প্রমুখ নব্য উর্দ্দুর অগ্রদূতেরা, এমন কি আধুনিক ফজলী-শাহাব প্রমুখ উর্দ্দু সাহিত্য-সাধক ও সাহিত্য-সেবীদের সকলেই হয় উচ্চ সরকারীপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি—নয়তো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক শ্রেণীর সম্মানিত লোক কিংবা সমাজের সুউচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত রইস ও আমীর-ওমরাহ্ পর্যায়ের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। নওয়াব-বাদশাহ শ্রেণীর লোকেরা এবং আমীর-ওমরাহবৃন্দ অতীতকাল থেকে উর্দ্দু সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করায় উর্দ্দু-সাহিত্য-সেবা সামাজিক মর্যাদারও, একটি প্রধান প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে পূর্ব থেকেই। কাজেই ইংরাজ আমলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও আধুনিক শৈলী ও টেক্‌নিক-সম্মত যে-নব সাহিত্য-ধারা উর্দ্দু ভাষায় প্রবর্তিত হল, সে-রীতি সম্মত সাহিত্য স্রষ্টাদেরও সামাজিক মর্যাদা কোনরূপ ক্ষুণ্ণ না হয়ে পূর্বের ন্যায়ই সগৌরবে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রইল। কিন্তু ইংরাজ-আমলের নব-সংগঠিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাগ্যে দেখা দিল তার বিপরীত অবস্থা ও পরিস্থিতি। তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ ও আলোচনা করা হয়েছে। একেতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বৌদ্ধ, মুসলমান কিংবা ইংরাজ—কোনো আমলেই রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ ছাড়া রাজ-রাজরাদের স্বকীয় সাহিত্য সাধনায় সমৃদ্ধি লাভের মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি কোনদিনই—তদোপরি ইংরাজ-আমলে শুদ্ধিকৃত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পূর্বোল্লেখিত নানা কারণে বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে সুনজরে দেখা সম্ভবপর হয়ে উঠলনা। ফলে বাংলার তদানীন্তন মুসলমান সমাজের নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা উর্দু ভাষার মতো সামাজিক মর্যাদার অন্যতম প্রধান প্রতীক হিসাবে গণ্য হতে পারলো না। কিন্তু রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বর্জন-নীতি ও নেতি-বাচক কার্যক্রম কখনো—অন্ততঃ সব সময় ফলপ্রসূ হয় না। নব-সংগঠিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার প্রতি সেদিনকার বীতরাগ অবহেলা এবং অমনোযোগিতাও বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবন-সংগ্রামে ও অগ্রগতির পথে তেমনি ভাবে কোনোরূপ ফলদায়ক না হয়ে—তার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে উঠল। পূর্বেই বলা হয়েছে—এ শোচনীয় ও সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে বাংলার মুসলমানদিগকে উদ্ধার করবার জন্য সেদিন যারা এগিয়ে এলেন, বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের সেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা-নায়কদের পক্ষে সেদিনকার গোটা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজকে তাঁদের এ দূরদর্শী ও দুঃসাহসী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবার মতো সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি এবং তদসঙ্গে আর্থিক সঙ্গতি ও সংস্থান প্রয়োজন অনুসারে তেমন কিছুই ছিলনা। সে জন্যই সেদিন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল—সমাজের ও সরকারের উচ্চপদস্থ ও বিত্তবান মুসলমানদিগকে বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলের ভিতর টেনে আনা। অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ সাহিত্য-সাধনা চেয়ে সাহিত্যিক চাপরাশের প্রয়োজনও সেদিন দেখা দিয়েছিল এ কারণেই। এসব কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমানদের নব-পর্যায়ের বাংলা সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে এই যে একটা অভিনব অবস্থা ও অদ্ভুত পরিস্থিতি—এর সঙ্গে 'পাকিস্তান লেখক সংঘের' পশ্চিম পাকিস্তানী প্রাগুক্ত সাহিত্যিক উদ্যোক্তাদের কোনরূপ পরিচয় ছিলনা। কাজেই তাঁদের পক্ষে উর্দু-সাহিত্যের নজির অনুযায়ী এবং হিন্দু-বাংলায় সাহিত্য-সাধনার প্রথানুসরণে—পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের খোঁজ-খবর সংগ্রহের জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যান্তর ছিলনা এবং এসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এ সম্পর্কে যেসব সংবাদ সরবরাহ করেছেন সরল মনে তাকেই অভ্রান্ত বলে গ্রহণ ছাড়াও তাঁদের অন্য উপায় ছিলনা। অতএব দোষ তাঁদের নয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য—এবং তদ সম্পর্কিত মুসলমান সাহিত্যিকদের যে-বিশেষ পরিস্থিতি, তার সঙ্গে তাঁদের এ অপরিচয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণে আমাদের উল্লেখিত সাহিত্যিকবৃন্দ একটুকুও কার্পণ্য করেননি। একথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাজ দেখা দিয়েছে সাহিত্যিক দুর্নীতি এবং তদোদ্ভূত অসাধুতার ব্যাপক প্রভাব ও প্রসার। পশ্চিমবঙ্গে রচিত সাহিত্যের আদর্শ, ভাব, ভঙ্গিমা—এমনকি হুবহু ভাষা পর্যন্ত আমাদের কোনো-কোনো উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ পদবীধারী তথাকথিত সাহিত্যিক নিজস্ব রচনা বলে নির্বিবাদে ও নির্বিচারে চালিয়ে দিচ্ছেন এবং প্রগতি-পন্থী ও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের নামে সেগুলি স্থানীয় বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করছেন। আমাদের বর্তমান বিপ্লবী সরকার আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বহু ক্ষেত্র থেকে আজ দুর্নীতি প্রায় উৎখাত ও নির্মূল করে এনেছেন। কাজেই জাতির নৈতিক জীবন ও আত্মোপলব্ধির ভিত্তি-ভূমি স্বরূপ যে-সাহিত্য—সে-সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকেও যে দুর্নীতি নিঃশেষে বিদূরিত করবার জন্য তাঁরা

www.pathagar.com

অনতিবিলম্বে এগিয়ে-আসবেন—এতে সন্দেহ করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আদর্শের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে যে-বিপ্লবী সরকার দুর্নীতিবাজ বলে অভিহিত জাঁদরেল রাজনীতিক এবং উচ্চ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদিগকেও রেহাই দেন নি-- সে একই কারণে উচ্চ পদস্থ সাহিত্যিক দুর্নীতিবাজদিগকেও এ সরকার রেহাই দিতে পারেন না এবং দেবেন না—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-অঙ্গন থেকে চাপরাশ-সর্বস্বতা ও চাপরাশ-মুখীনতা এবং এ দু-মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত সাহিত্যিক অসাধুতা অবিলম্বে দূর করতে না পারলে আজকের গঠনোন্মুখ জাতীয় জীবনের এ সন্ধিক্ষণে—জাতীয় সাহিত্য তথা জাতীয় আদর্শের অপমৃত্যু সুনিশ্চিত। এ সম্পর্কে আর একটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য । পৃথিবীতে বহুবার বহু জাতি এবং বহুলোক স্বাধীনতার জন্য, ধর্মের জন্য, আদর্শের জন্য—এমন কি স্বীয় স্বার্থের জন্য প্রাণ দিয়েছে এবং প্রাণ নিয়েছে—এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেশে এবং অনেক যুগেই ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর রেখে গেছে। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেয়ার ইতিহাস পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কুত্রাপি আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই একথা বোধহয়-নিঃসন্দেহেই বলা চলে—এরূপ আদর্শ-স্থাপনে পূর্ব পাকিস্তান সারা বিশ্ব একক ও অনন্য। সে জিন্দা-দীল মৃত্যু-বিজয়ী জাত আজো বেঁচে আছে এবং আজো তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পবিত্রতা, আদর্শ ও মর্যাদাহানিকর কিছু সহ্য করবে না।

এ ব্যাপারে আর একটি-প্রয়োজনীয় কথা পূর্বাহ্নেই বলে রাখতে চাই। বিপ্লব-পূর্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবা সরকারী আফিস, বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্কৃতি সংস্থার উচ্চপদে সমাসীন প্রতিটি ব্যক্তিই দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থবাদী ও সুযোগ সন্ধানী—একথা বলার উদ্দেশ্য মোটেও নেই আমাদের। এসব উচ্চপদে বহু জ্ঞানী-গুণী, ন্যায়নিষ্ঠ, যোগ্যতা-সম্পন্ন ও আদর্শবাদী লোক ছিলেন এবং আছেন। এবং এজন্যই আজকের বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও নৈতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়েও আমাদের এ নব-প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র পথের বহুবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তরক্কির পথে ক্রম বর্ধমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ শ্রেণীর লোকদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। আমরা শুধু তাদের সম্পর্কেই সরকার ও জনসাধারণের আশুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—যারা জাতিরই খেয়ে পরে সে-জাতিরই ধ্বংস সাধন কার্যে লিপ্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে একটি কথা উঠতে পারে। জাতির যারা চিন্তাবিদ, লেখক, অধ্যাপক এবং যাঁরা নানারূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরূপে পরিচিত ও অগ্রপথিকরূপে পরিগণিত—তাঁদের কার্যকলাপে, চিন্তাধারায় ও মত প্রকাশের ব্যাপারে সরকারী বা বেসরকারী কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ বাধানিষেধ আরোপিত হলে তা-কি একটি স্বাধীন গণতান্ত্রীক রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাক্যে ও চিন্তায় স্বাধীনতা থাকার যে-অপরিহার্যতা আজ স্বাধীন বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত,—সেই সর্ব-স্বীকৃত মূল নীতির অপহ্নব ঘটায় না? এর উত্তরে আমরা নিজেরা কিছু না বলে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। উদ্ধৃতিটি দেয়া হল "পাকিস্তান লেখক সংঘের" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, উক্ত সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এবং পাক-প্রেসিডেন্ট সাহেবের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী—জনাব কুদরত উল্লাহ্ শাহাবের "লেখক ও তার স্বাধীনতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ থেকে। বিগত ১৯৫৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত "পাকিস্তান লেখক সংঘের" যে-সংগঠন সম্মেলন করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়, সে-সম্মেলনের শেষ দিনে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আয়ুব খানের উপস্থিতিতে পাকিস্তান ও

www.pathagar.com

"পাকিস্তান লেখক সংঘের" লক্ষ্য, নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে যে-কয়টি মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হয় উক্ত প্রবন্ধটি-সেগুলির অন্যতম। উক্ত প্রবন্ধে জনাব শাহাব বলেন : "লেখক ও তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তাঁর কি কি দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট-ধারণা থাকা উত্তম। সেগুলি হল এই :

১. লেখক কোনক্রমেই আইনের ঊর্ধ্বে নন।
২ তিনি এক দেশে থাকবেন অথচ অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন—এ কিছুতেই হতে পারেনা।
৩. তিনি একমতবাদ প্রচার-করবেন অথচ অন্য মতবাদানুযায়ী জীবন যাপনের কবি-সুলভ স্বাধীনতা নেবেন—এ-ও চলতে পারেনা।"

ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং মত ও চিন্তার বল্‌গাহীন স্বাধীনতা সম্পর্ক যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হবার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমরা উপরে আলোচনা করেছি, তার উত্তরে আমরা জনাব শাহাবের উপরোক্ত কথাগুলির উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

www.pathagar.com

অক্রূর চন্দ্রের কাব্য-সাধনা

রবীন্দ্র-যুগের শেষ অর্ধাংশ (১৩২৫ হইতে ১৩৫০ পর্যন্ত) সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া বাংলা কাব্য চর্চ্চায় যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, স্বভাব কবি শ্রীঅক্রূর চন্দ্র ধর তাঁহাদের অন্যতম। সহজ, সরল, সুমিষ্ট ভাষায় নির্ভুল ও সতেজ ছন্দে এমন সুন্দর কবিতা তখনকার দিনে খুব বেশী সংখ্যক কবি লিখিতে পারেন নাই বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন অনেক পত্রিকা-সম্পাদক ও মনীষী ব্যক্তি এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কবিবর কায়কোবাদ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ ও প্রভাত কুমার হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবি জসীম উদ্দিন প্রভৃতির চিঠিপত্রেও আমরা এই কথাই জানিতে পারি।

তাঁহার রচনাশৈলী এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু লেখক, পাঠক এবং সমালোচক যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মূল্য কম নহে।

জনৈক অধ্যাপক ও লেখক তাঁহার "সঞ্চয়নী" নামক সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থের কবি পরিচিতি অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"অক্রূর চন্দ্র আধুনিক যুগে বৈষ্ণব কবিগণের ভাবধারারই উত্তরাধিকারী। তাঁহার কবিতার সাবলীল গতি পাঠকগণকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে কবি অক্রূর চন্দ্র মিষ্টভাষী ও সুরসিক।"

অক্রূর চন্দ্র বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিতেন, সকল শ্রেণীর পাঠকেরা সেগুলির প্রশংসাও করিতেন তখন হইতেই। তাঁহার বাল্য-রচনা একখানা ছোট বই পড়িয়া কবিবর কায়কোবাদ লিখিয়াছেন, "অনেক প্রবীণ কবির লেখনী-মুখেও এমন মধুর এবং প্রাঞ্জল কবিতা বাহির হয় না।" ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস সন্দেহে তরুণ কবিকে জয়দেবপুরে ডাকিয়া কাব্য চর্চায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহা মহোপাধ্যায়, প্রমথনাথ, ডা: দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণও সস্নেহে পত্রযোগে তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন।

গত ১০/১২ বৎসর যাবৎ অবশ্য "উদ্বোধন" প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ২/১ খানা কাগজ ভিন্ন অন্য কোনও সাময়িকপত্রে তিনি লেখা পাঠান না।

অনেক আধুনিক পাঠক এবং লেখক-মহলে তাঁহার পরিচয় সেই জন্যই কিছুটা অজ্ঞাত কিন্তু তাঁহার লেখনী এখনও অচল নহে। শ্রীশ্রী গীতা, চণ্ডি, উপনিষদ ও রামায়ণ প্রভৃতি ভাল ভাল সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ তিনি এই সময়ে করিয়াছেন। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের মত জীবনব্যাপী দারিদ্র্য, নানারূপ কায়িক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে কাব্য চর্চ্চার পথ হইতে মোটেই বিচ্যুৎ করিতে পারে নাই। এই পরিণত বয়সেও জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে শিক্ষকতার কাজ, এমন কি টুইশনিতেও ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কিন্তু কাব্যচর্চ্চায় তাহার আলস্য নাই।

www.pathagar.com

ঢাকা জেলার শিবপুর থানার অন্তর্গত শিবপুর শিমুলীয়া গ্রামে বাংলা ১৩০১ সালের ২৪শে আষাঢ় তারিখে কবি অক্রূর চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে। তারপর কালীগঞ্জ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ হাই স্কুল হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কালীগঞ্জ হইতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তারপর তিনি কলিকাতা যান। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার দরুণ সেদিকে তিনি আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। জীবিকা অর্জনের জন্য বাধ্য হইয়া সেখানেই কালীগঞ্জ হাইস্কুলে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সেখানে কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, পরিত্র গাঙ্গুলী, সত্যেন্দ্র দত্ত এবং কিছুদিন পর দেশে আসিয়া ঢাকার পরিমল ঘোষ, সাবিত্রী প্রসন্ন, নলিনী ভট্টশালী ও যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত তখন হইতে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। বিভিন্ন মাসিক কাগজে নিয়মিত লেখা দেওয়াও তাঁহার আরম্ভ হয় তখন হইতেই।

নানা ঘটনা বিপর্যয়ে ও পারিবারিক অসুবিধায় পড়িয়া কলিকাতা হইতে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। নিজ গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সেই ১৯২২ খ্রী: হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি অতিশয় কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করিতেছেন। পূর্ণোদ্যমে ২৫/৩০ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য চর্চ্চা চলিয়াছে তাঁহার পল্লী গ্রামের সেই কুটীর কুঞ্জে বসিয়াই। নাগরিক পরিবেশে থাকিলে মানুষের সব কিছুতে যে কৃত্রিম জটিলতা দেখা দেয় উহা তাঁহার মধ্যে আসিতে পারে নাই বোধ হয় এই জন্য। আর এই জন্যই হয়ত তিনি হইতে পারিয়াছেন একজন সত্যিকার কবি—স্বভাব কবি। কোনরূপ কষ্ট কল্পনা বা দুর্বোধ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার চেষ্টা এবং কোনও বৈদেশিক সাহিত্যের ছাপ তাঁহার কাব্যে নাই। রচনা ভঙ্গিটিও তাঁহার–সম্পূর্ণ নিজস্ব। রবীন্দ্র যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজকে রবীন্দ্র প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে তাঁহার মত অনেক কবিই পারেন নাই।

বাংলা ভাষার ছোট, বড়, মাঝারি প্রায় ২৫,৩০ খানা সাময়িক কাগজে প্রতি মাসে তখন তাঁহার লেখা বাহির হইত। মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবানী, উপাসনা, প্রাচী, প্রতিভা, মাতৃমন্দির, উদ্বোধন, আত্মশক্তি, বাংলার বানী, সোনার বাংলা, মালঞ্চ সৌরভ, শান্তি, দীপিকা, শিশুসাথী, খোকাখুকু, মৌচাক, পাপিয়া, সম্মিলনী, পল্লীশ্রী, বসুধারা, বিশ্ববানী, ঢাকা প্রকাশ, স্বায়ত্ত শাসন, ঋত্বিক প্রভৃতি বহু মাসিক পত্রিকা তাঁহার বিবিধ বিতবাখী আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিয়াছে। এই সাধনা ২/১ দিনের বা ২/১ বৎসরের নহে—প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া তিনি উহা সমানভাবে চালাইয়া গিয়াছেন।

সাবেক বঙ্গের একাধিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স-সম্মানে আহ্বান করিয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে অনেক প্রশংসা, মানপত্র, পদক, পুরস্কার এবং সামান্য রকম অর্থও দান করিয়াছেন ; কিন্তু পেটে যাঁহার প্রকাণ্ড ক্ষুধা এ-সকল দিয়া তাহার লাভ কি? কবির রচিত "মাষ্টার মঙ্গল" নামক পুস্তকখানার মধ্যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার কতগুলি সুন্দর বাস্তব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"ঈশাখাঁ", "সুখের সন্ধান" "সোনার পল্লী", "সওগাতে পাকিস্তান" প্রভৃতি কয়েকখানা নাটকেরও তিনি রচয়িতা। ঈশাখাঁ তখনকার ঢাকা লায়ন রঙ্গমঞ্চে বহুকাল যশের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। স্থানীয় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির অভিনয় দেখিবার জন্য এক এক দিন

www.pathagar.com

প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণেরও স্থান থাকিত না। তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলিও ছোট বড় বহু সৌখীন নাট্যদল বহুকাল অভিনয় করিয়া দর্শকদের চিত্তরঞ্জন করিয়াছে।

কবি অক্রূর চন্দ্রের লেখার একটি প্রধান বিশেষত্ব সর্ব্বত্র প্রসাদ গুণের সমাবেশ। উহাতে কোন রকমের কুহেলী বা হেঁয়ালী নাই। তাঁহার অনেক কবিতার ভিতর এমন একটা প্রচ্ছন্ন হাস্যরস বর্ত্তমান যে, তাহা পাঠ করিয়া সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার লিখিত রাশি রাশি কমিক ও সিরিও কমিক কবিতা এখনও নানা স্থানের স্কুল ও কলেজের ছেলে-মেয়েরা আবৃত্তি করিয়া নিজেরা আনন্দ পায় এবং শ্রোতাদিগকেও আনন্দিত করে।

কবির বর্ত্তমান বয়স ৬ এর কোঠায় পা দিয়াছে। মাথার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড অভাবের সংসার—ছেলের পড়া, মেয়ের বিবাহ প্রভৃতি অনেক ঝামেলা। প্রশংসায় মন খুশি হইলেও এই সকল সমস্যার সমাধান কিছুমাত্র হয় না। তাই কাব্য চর্চ্চার বেগ বাধ্য হইয়া এখন তাহাকে কিছুটা কমাইতে হইয়াছে। কিছুটা বলিলাম এই জন্য যে, ষোল আনা বেগ ও শক্তি এখনও কমে নাই। নানারকম "ফরমেসে কবিতা" গান, ছড়া হেঁয়ালী প্রভৃতি অনেক কিছু লিখিয়া দিয়া এখনও তাহাকে বন্ধু-বান্ধবের মন রক্ষা করিতে হয়। সেগুলি এখন, যে লেখায় তাহারই সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কবির নিজস্ব খাতাপত্রে সেগুলির আর কোনও হিসাবই থাকে না।

কবি অক্রূর চন্দ্রের রচিত কাব্য-পুস্তকের মধ্যে "আলোচনা", "ঝঙ্কার", "মণিমালঞ্চ", "হাসিমুখ", "সাঝের বাঁশী", "মাষ্টার মঙ্গল", "শ্রীশ্রী মায়ের পাঁচালী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীগীতার সংস্কৃত ছন্দানুযায়ী পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যানুবাদ "মোহন গীত" ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাব্যানুবাদ "মোহনচণ্ডী" অনুবাদ সাহিত্যের সংখ্যা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অক্রূর বাবুর যে সকল কবিতা এবং প্রবন্ধাবলী এ-পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৫০০ এর কম নহে। তাহা হইতে কিছু কিছু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া সহৃদয় প্রকাশকগণ আপনাদের কুক্ষিগত করিয়াছেন। আর বাকী প্রায় আড়াই শতাধিক কবিতা এখনও নানা শ্রেণীর মাসিক ও বার্ষিকের পৃষ্ঠায় এবং কবির পুরাতন ফাইলের মধ্যে পচিয়া গলিয়া উই, ইদুর ও আরসুলার দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছে।

অক্রূর বাবু চিরকাল শিক্ষকতা করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। কৃতি শিক্ষকরূপে দেশ, জাতি ও সমাজকে তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহার মূল্য কম নহে। যে জন্য দেশের ছাত্র ও অভিভাবক মহলে তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন। শিশু ও কিশোরদের জন্য তিনি এককালে অনেকগুলি স্কুল পাঠ্য-পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। A.B.T.A.-এর মুখপত্র "Teachers Journal" নামক বিখ্যাত মাসিকপত্রে তিনি মাতৃভাষা শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বে-নজীরের জীবনপঞ্জি

১৯০৩—জন্ম ২৯শে অক্টোবর-১৯০৩। পিতা : মওলবী ছজুদুর রহমান (তারা মিয়া) ; মাতা : মাহমুদা খাতুন (গাবুর মা) গ্রাম-ইলমদী, ঢাকা (বর্তমান নারায়গঞ্জ)।

১৯১২—শিক্ষা : ১৯১২ সালে ধানুয়া প্রাইমারী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি। কৃতিত্বের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ।

১৯১৩—ইলমদী থেকে তিন মাইল দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আড়াই হাজার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি। এটা হিন্দু প্রধান গ্রাম ছিল। এখানে ১৩ জন শিক্ষকের মধ্যে একমাত্র মওলবী সাহেব ছাড়া ১২ জনই ছিলেন হিন্দু শিক্ষক। হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম ছাত্রের সংখ্যাও অনেক কম। সম্পদশালী মুসলিমদের ছেলেরাই ছিল সেই সব মুসলিম ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯১৪—১৯১৪ সনে তিনি ধানুয়া চলে যান। ডবল প্রমোশন নিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে এক দুয়ারী নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। ক্লাস সিক্সি পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে পড়াশুনা করেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন আবু তাহের (শহীদ আমাদের পিতা)। এঁরা দু'জনে ফুটবল খেলায় পারদর্শী ছিলেন।

১৯১৮—ক্লাস সেভেনে তাঁরা শিবপুর হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হন। বেনজীর আহমদ শিবপুর হাইস্কুলে ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হন। আবু তাহের ছিলেন ভাইস ক্যাপ্টেন। ঐ স্কুলে বে-নজীর আহমদ 'পল্লীবাণী' নামে হাতে লেখা একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর সম্পাদক ছিলেন বে-নজীর আহমদ আর প্রকাশনায় ছিলেন মোহাম্মদ আবু তাহের।

এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শিবপুর স্কুলে একটি তরুণ সাহিত্য-চক্র গ'ড়ে ওঠে। যার নেতৃত্বে ছিলেন বে-নজীর আহমদ। সে-সময় তিনি স্বভাব কবির ক্ষমতায় উদ্দীপনাধর্মী কবিতা লিখতেন। শিবপুর স্কুলের সহকারী বাবু সুরেশচন্দ্র তাঁর সাবলীন ছন্দময় কবিতা পড়ে তাঁকে কলম না ছাড়ার অনুরোধ করেন। পল্লীবাণীর মূল কথা ছিল স্বাধীনতা বা আজাদী।

১৯২২ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ধানুয়া ছেড়ে চলে গেলে পল্লীবাণী'র সার্বিক দায়িত্ব পড়ে বে-নজীর আহমদের ছোট ভাই গোলাম রব্বানীর (রবু মিয়া) উপর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখা থাকায় সর্বশেষ নির্দেশে এর ফাইলপত্রসহ যাবতীয় কপি বাজেয়াপ্ত করতে বলা হয়। তখন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর ছিলেন 'ডালি'র কবি সৈয়দ এমদাদ আলী। এরপর 'পল্লীবাণী' আর প্রকাশিত হয় নি।

১৯২১—টেস্ট পরীক্ষায় বে-নজীর আহমদ উত্তীর্ণ হলেন। ইংরেজের অধীনে থেকে পরীক্ষা দেবেন না ঘোষণা করলেন। মামা বে-নজীর আহমদের কথা শুনলেন না। ১৪ টাকা (তদানীন্তনটাকার মূল্যে) ফি জমা দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিলেন। দু'টি লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করলেন।

১৯২৩—পরীক্ষা পাশের পর বেনজির আহমদ নিখোঁজ হ'য়ে যান। কলকাতা থেকে ধরে এনে তাঁকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আই. এস. সিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। জগন্নাথ কলেজে থাকা অবস্থাতেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের (বৃটিশের দেওয়া নাম সন্ত্রাসবাদ) প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে যুগান্তর পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু হিন্দু নেতারা শুধু তাঁকে ব্যবহার করত। কাজে-কর্মে খাটাত। বিশ্বাস করত না। যুগান্তর পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কোন সভায় মুসলমান সদস্যের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

১৯২১—সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে জেলে যান।

১৯২৫—যুগান্তর, অনুশীলন আর প্রবর্তক—এই তিন হিন্দু-সৃষ্ট গুপ্তদলে সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ ও হতাশ বেনজীর আহমদ-এর চিন্তাধারা ভিন্ন চিন্তায় রূপান্তরিত হ'ল। তিনি তাঁর নিজস্ব দল 'আযাদ পার্টি' গ'ড়ে তুললেন। এই দলে মওলানা আকরম খাঁর জামাতা মওলবী আবদুর রাজ্জাক (পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।) এবং কংগ্রেস নেতা সৈয়দ জামাল উদ্দীন হাশেমী প্রমুখ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। উল্লেখ্য কাজী নজরুল ইসলাম, দি-মুসলমান পত্রিকার সম্পাদক মওলবী মুজিবর রহমান, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতেন। প্রথম পর্যায়ে জনসামর্থনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের আগে দেশের গরীব জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল মূল নীতি।

পরবর্তীতে ১. ইংরেজের সেবাদান, ২. ইংরেজের দ্বারা পুরস্কৃত হ'য়ে ধনকুবের বলা এবং ৩. স্থানীয় শোষকদের কাছ থেকে ধন-দৌলত ছিনিয়ে বঞ্চিত সর্বহারাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করার কার্য পদ্ধতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৯২৭—১৯২৭ সনে (বাংলা ১৩৩৪-এর আষাঢ়ে 'আযাদ' পার্টির মুখপত্র হিসাবে 'নওরোজ' পত্রিকাটি প্রকাশ লাভ করে। এ পত্রিকার সম্পাদক আফজালুল হক হ'লেও এর মূল প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন বে-নজীর। আযাদ পার্টির কর্মীদের দ্বারা এর সব কাজ পরিচালিত হ'ত। নজরুল ইসলামের কবিতা "নওরোজ" ছিল এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। এর পাঁচ ছয়-সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বেনজীর আহমদ রাজনৈতিক কারণে নোয়াখালীতে মামলায় বন্দী হ'লে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়।

আযাদ পার্টির কার্যাবলীর নীতি অনুযায়ী বেনজীর আহমদকে দেশীয় দালালদের ও লেখকদের ধন ছিনিয়ে নিয়ে বেনজীর আহমদ রবীন হুডের মত কয়েকটি অপারেশন চালান।

এখানে সেই অপারেশনগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হ'ল।

১৯২৩—এ শিবপুর থানার মাধারচর গ্রামের জগবন্ধু সাহার বাড়ী আক্রমণ করা হয়। এই হিন্দু জমিদার গরীবদের সম্পদ লুট করে ধনকুবেরে পরিণত হন। একই সালে কালীগঞ্জ থানার একডালা গ্রামে রাত্রি আটটায় নগর বাঁশী সাহার বাড়ীতে অপারেশন চালান হয়। এটি 'একডালা অপারেশন' নামে খ্যাত। নগর বাঁশী সাহা লুকের ব্যবসায়ী ছিলেন। এই অপারেশনটি করা হ'য়েছিল ১৯৩৫-এ।

১৯৩৫—এ কলকাতার একটি হিন্দু জমিদার বাড়ীতে তিনি আর একটি অপারেশন করেন। এ-বছর তিনি কলকাতার এস.বি. সরকার জুয়েলারী সরকারের দোকানে অপারেশন চালান।

১৯২৭—এ বেনজীর নোয়াখালী অপারেশন চালান। এই অপারেশনে গিয়ে তাঁকে বিপদে পড়তে হ'য়েছিল। প্রত্যুৎপন্ন সতীত্বের কারণে তিনি বিপদ-মুক্ত হ'য়ে ফিরে আসেন। এরপরে তিনি যেসব অপারেশন করেন সেগুলোর নাম 'মামা বাড়ি অপরাশেন', 'মাতানী পাড়া অপারেশন', (১৯২৬) 'হাতিরদিয়া অপারেশন' (১৯২৪) ; 'কাপাসিয়া অপারেশন' (১৯২৪) ; 'কামার বাড়ি অপারেশন', 'প্লেন অপারেশন'। এই প্লেন অপারেশন ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু বেনজীরের দুর্দমনীয় সাহস এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল। একদল জেলে তাঁর জীবনরক্ষায় সাহায্য করে। এ-সম্পর্কে জামালউদ্দীন মোল্লা 'চেনা অচেনার বেনজীর ও অন্যান্য নামক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

বে-নজীর আহমদ (ওরফে বেনুমিয়া) কলকাতা পৌঁছার আগেই বাংলার লাটবাহাদুর রাজনীতিবিদদের রাজনীতিবিদদের রাজভবনে ডেকে এনে বলেছিলেন, এক লাখ টাকা চাই না, যে অসম্ভব প্লেন-ডাকাতি সম্ভব করেছে; আমি সেই বে-নজীর আহমদকে দেখতে চাই।

বাংলার গভর্ণর বেনজীর আহমদকে দেখতে গিয়ে তাঁকে বন্দী করবেন ভেবেছিলেন স্বাধীনতা-যুদ্ধের সমর্থক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু বাংলার গভর্ণর সেদিন নিজের হাতে বেনজীর আহমদের (বেণু মিয়া) গলায় ফুলের মালা দিয়ে আশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন—

"বে-নজীর-আহম্মদ ; তাঁর ভাষায় আর কোনদিন ডাকাতি করবেন না ; আশা করি।'

বলা বাহুল্য এটাই ছিল বে-নজীর আহমদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের মুজাহিদ জীবনের শেষ অপারেশন।

www.pathagar.com

দুঃসাহসী বেনজীরের গেরেফতার কাহিনী ও পলায়ন

১৯২৭—এ নোয়াখালী অপারেশনকালে বেনজীর আহমদের এক অপারেশন সঙ্গী ধরা পড়ে। সে পুলিশী নির্যাতনে অতিষ্ঠ হ'য়ে অপারেশন দলের নেতা ও সদস্যদের নাম বলে দেয়। উল্লেখ্য বেনজীরের অপারেশন-সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন— আবদুর রহমান, ২. আবদুর রাজ্জাক, ৩. খলিলুর রহমান, ৪. মতিউর রহমান, ৫. শফি মিঞা, ৬. কাজী, ৭. বুইরা, ৮. বেঙ্গুরী ও ৯. ফজলা প্রমুখ। কিন্তু এর পরেও বেনজীর আহমদকে ধরা সহজ ব্যাপার ছিল না। নিপীড়িত, সর্বহারা, অভাবগ্রস্ত ও দুঃখী দরিদ্র লোকদের তিনি এত সাহায্য করতেন যে সামান্য টাকার লোভে তাঁকে কেউ ধরিয়ে দিত না। কিন্তু তাঁর এক প্রতিবেশী আবদুল হাই মিঞা মাত্র দশ হাজার টাকার লোভে বেনজীর আহমদকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়।

জামালউদ্দীন মোল্লা তাঁর "চেনা-অচেনা বে-নজীর ও অন্যান্য গ্রন্থের 'পদ্মার-বুকে' পরিচ্ছেদে লিখেছেন—যে আড়াই হাজারে বেনজীর আহমদকে দুপুর সাড়ে বারোটায় গেরেফতার করা হয়। তারপর তাঁকে কলকাতার উদ্দেশ্যে স্টীমারে তোলা হয়। স্টীমার যখন পদ্মার বুকে সে সময় হাতকড়া পরা অবস্থায় তিনি পাহারাদার পুলিশের কাছে ল্যাট্রিনে যাওয়ার অনুমতি চান। তখন চতুর্দিকে রাতের আঁধার। সেখান থেকে মৃত্যুকে মুঠোয় চেপে পদ্মার অন্ধকার জলরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বহু কষ্টে সাঁতার কেটে তিনি রাস্তায় ওঠেন এবং এক কামারশালায় গিয়ে কামারদের দিয়ে হাতকড়া কাটিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত তিনি পুলিশের হাতে পুনরায় ধরা পড়েন এবং তাঁকে তিন বছর কারাগারে অন্তরীণ থাকতে হয়। নোয়াখালীর বারের বিখ্যাত উকিল শ্রী রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী, এম.এ. বিএল এ মামলায় বেনজীর আহমদ ওরফে বেনু মিয়াকে সমর্থন করেন। বেনজীর আহমদ বেকসুর খালাস পান। কারাগারে থাকতে বেনজীর আহমদ 'বন্দীর বাঁশী' লেখেন। আর এই গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেন রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর নামে। উৎসর্গপত্রে বেনজীর আহমদ লিখেছিলেন—'পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী এম.এ. বিএল ও তদীয় সহধর্মিণী এবং আমার মাতৃস্বরূপা শ্রী যুক্তা পদ্মজিনী দেবী-করকমলে!" উল্লেখ্য বেনজীর আহমদ এই গ্রন্থ উৎসর্গেও নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছেন।

সাংবাদিক বে-নজীর

১৯২৭—১৯২৭ সালে বেনজীর আহ্মদ আজাদ পার্টির মুখপত্র মাসিক "নওরোজ" প্রকাশ করেন।

১৯৩২—১৯৩২ সালে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভের পর সহকর্মী অনেক সন্ত্রাসবাদীদের মত নিয়মিত রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন। দৈনিক 'আজাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান।

১৯৩৬—১৯৩৬-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক "কৃষক" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার অন্যতম সাংবাদিক ছিলেন বেনজীর আহমদ।

১৯৪১—১৯৪১-এ শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত দৈনিক নবযুগের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন।

১৯৪৩—১৯৪৩ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ।

১৯৪৩—গুঁড় ও তালের ব্যবসায় অংশগ্রহণ। গুড়ের পারমিটদাতা মিনহাজউদ্দীন আহমদের নিকট থেকে পারমিট প্রাপ্তি এবং মারোয়াড়ী গুড় ও ডাল ব্যবসায়ীর নিকট ৫০ : ৫০ শেয়ারের চুক্তিতে ব্যবসা। উল্লেখ্য এই ব্যবসায় তিনি ১ লাখ ২৪ হাজার টাকা লাভ পান। (এটা বৃটিশ ভারতের চল্লিশের টাকার মানে।)

১৯৪৫—নিখিল ভারতে মুসলিম লীগের লাহোর কনফারেন্সে সর্বসম্মতভাবে ঢাকা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী প্রস্তাব গৃহীত হয়। বেনজীর আহ্মদ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলার হিসাবে লাহোর কনফারেন্সে

www.pathagar.com

যোগ দিয়েছিলেন। কনফারেন্স শেষে তিনি কলকাতা না নেমে সোজা ঢাকা চলে আসেন। বাসা নেন আগা মসিহ লেনের বিধান পল্লীতে। এখানে থাকতে তিনি মতিঝিল রাজারবাগ শাজাহানপুর এলাকায় ২৫/৩০ বিঘা জমি কেনেন। এই স্থানের ১১ বিঘা জমি বাদে বাকীটা পূর্ব-পাকিস্তান সরকার রেলস্টেশন ও রেলওয়ে কলোনীর প্রয়োজনে এ্যাকোয়ার করে।

১৯৬১—১৯৬১ সালে বেনজীর আহমদ পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্ব-পাকিস্তান শাখার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬২—১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৮৩—এর ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি রক্তচাপ রোগে আক্রান্ত হ'য়ে হলি ফ্যামিলী হাসপাতালের ২০৬ নম্বর কেবিনে ইন্তেকাল করেন।

গ্রন্থ-পরিচিতি

১. বন্দীর বাঁশী—প্রকাশক : বেনজীর আহ্‌মদ, ১৩/৪ বি কলিন লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তি স্থান : মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, এম্পায়ার বুক হাউস ; ১৫, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৩৯। মোহাম্মদী প্রেসের পক্ষ হইতে মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক ৯১ আপার সার্কুলার রোড হইতে মুদ্রিত।

২ বৈশাখী—প্রথম প্রকাশ : ১৩৫১ (১৯৪৫) পৌষ মাস (জানুয়ারী), ১০৬-এ সার্কুলার রোড, কলকাতা ; প্রকাশক : বেনজীর আহমদ ; মুদ্রাকর খায়রুল আনাম খাঁ ; মুদ্রক ঠিকানা : মোহাম্মদী প্রেস, ৮৬-এ সার্কুলার রোড, কলকাতা। ২য় প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৯ (এপ্রিল, ১৯৬২) ; প্রকাশক : মালেক মিনার, শাহজাহানপুর, ঢাকা-২, মুদ্রাকর : এম. চৌধুরী রিপাবলিক প্রেস, ২ কবিরাজ লেন, ঢাকা, ১। দ্বিতীয় সংস্করণে আজ ও কাল (নয়া সড়ক-১৩৫৫) ; নূতন বৈশাখ (মোহাম্মদী-১৩৫৭) ; বেগ দাও, বেগ দাও আমার কানায় (মিল্লাত-১৩৫৩) ; আজকে শুধু মেঘের স্তর (দিলরুবা ১৩৬১) ; আজকে আমার মন ভোলায় (খেলাঘর-১৩৬৩) ; হে যুগান্ত যাত্রা পথ (মাহে নও-১৩৫৭) ; আহ্বান (মাহে-নও-১৩৫৭)-এ সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতাটি ছাড়া বাকি ৬টি কবিতা পাকিস্তান পরবর্তী যুগে রচিত।

৩. জিন্দেগী (প্রকাশিত) : জীবিতকালে তিনি এটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। এতে মোট ৬৩টি কবিতা আছে। কবি বে-নজীর আহ্‌মদ

৪. হেমন্তিকা :-এটিও প্রকাশিত। জিন্দেগীর মত এর পাণ্ডুলিপি কবি-পুত্র মোহাম্মদ মালেক মীনারের কাছে পাওয়া গেছে। এতে ৮৮টি কবিতা আছে। মীনারের কাছে এটি মুদ্রিত ফর্মা হিসাবে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে প্রকাশিত। ২০০৬-অক্টোবর বে-নজীর ট্রাস্ট এটি প্রকাশ করে।

৫. বাংলা সাহিত্য—বিস্তৃত পরিচয় ভিতরে দেয়া হয়েছে। কবি-লিখিত এর গবেষণাধর্মী ভূমিকাটিও মুদ্রিত হ'য়েছে। ১৯৫৬-এর জানুয়ারীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্‌স্ট বুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্য তৈরী বাংলা সাহিত্য সংকলন।

৬. ইসলাম ও কমিউনিজম ১৩৯০ (ইং ১৯৮৪)। মৃত্যুর এক বছর পরে এটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : হিলফুল ফুযুল ফাউণ্ডেশন। প্রকাশকাল : মাঘ ১৩৯০ (ফেব্রুয়ারী-১৯৮৪)। মুদ্রক : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রেস লি:, প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ বশিরুল হাসান।

৭. প্রবন্ধ : পুস্তক হিসাবে অপ্রকাশিত। প্রথম-প্রবন্ধ 'ইসলাম ও কমিউনিজম' হিলফুল ফুযুল ফাউণ্ডেশন' থেকে ১৯৮৪-এর ফেব্রুয়ারীতে ক্ষুদ্র পুস্তিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত। 'বিপ্লব সাধনায় কামাল' ১৩৪৫এর পৌষের (১৯৩৯-জানুয়ারী) মাসিক মোহাম্মদীতে ; 'ইকবাল কাব্যে স্বদেশ প্রেম' ১৩৪৫-এর জ্যৈষ্ঠের (১৯৩৮-এর মে) মাসিক মোহাম্মদী'তে ; 'মধ্য এসিয়ায় নারী জাগরণ' ১৩৩৯ (১৯৩২)-এর 'রূপরেখা'তে ; 'নজরুলকে যেমন দেখিয়াছি ও জানিয়াছি' ১৩৮৩ (১৯৭৬)-এর বেতার

www.pathagar.com

বাংলাতে ; 'নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি' ১৩৭৬ বর্ষায় (১৯৬৯, জুন) 'নজরুল একাডেমী পত্রিকাতে ; 'সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব' 'বৈশাখ' ১৩৬৯ (১৯৬২-এপ্রিল) সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকাতে এবং 'অক্রূর চন্দ্রের কাব্য সাধনা' 'বৈশাখ ১৩৬৭ (এপ্রিল ১৯৬০)-এ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১৯০৩—এ জন্মগ্রহণকারী বেনজীর আহ্‌মদ ১৯৮৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বাঁশী'র কবিতা বিশের দশকে শুরু হয়। স্কুল জীবন থেকে কবিতা লেখা শুরু করলেও মনে হয় ১৯২৭-এ নোয়াখালী অপারেশন-এর পর তিনি কারাবন্দি হওয়ার সময় থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন। এখানে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হ'ল :—

১. বন্দীর বাঁশী (১৯৩২)

২ বৈশাখী (১৯৪৫)

৩. জিন্দেগী (২০০৬)

৪. হেমন্তিকা (২০০৬)

৫. বাংলা সাহিত্য (গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ) (১৯৫৬)

৬. ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৮৪)

পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা ও তার প্রকাশ তারিখ

১. পয়গাম-সাপ্তাহিক পয়াগাম : ২০শে শ্রাবণ , ১৩৫৯. ১৪ই আগস্ট, ১৯৫২
২ হে দিশারী-মাহে নও : আশ্বিন ১৩৫৯, সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
৩. ইয়াদগার-ই-ইক্‌বাল-সাপ্তাহিক আরাফাত : ২২শে এপ্রিল, ১৯৯৮, ৯ই বৈশাখ ১৩৭৫
৪. ইলবালকে-লেখক সংঘ পত্রিকা, ১৯৬১ সালের ইকবাল ডে'তে রেডিও পাকিস্তানে পঠিত
৫. সিরাজী স্মরণে-দরবার : সিরাজী স্মৃতি-সংখ্যা : সোমবার ২৯শে আষাঢ় ১৩৬৫, ১৪ই জুলাই ১৯৫৮
৬. মারহাবা লিয়াকত—মাহে নও : কার্তিক ১৩৫৯, অক্টোবর ১৯৫২
৭. যুগের নকীব—পৃথিবী : আশ্বিন ১৩৭৪, সেপ্ট-অক্টোবর ১৯৬৭
৮. শহীদ স্মরণ—পথের শেষে (শহীদ সংখ্যা) : অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, ডিসেম্বর ১৯৬৯
৯. আকরম খাঁ স্মরণে-আজাদ (আকরম খাঁ সংখ্যা) : ২রা ভাদ্র, ১৩৭৬, ১৮ই আগস্ট ১৯৬১
১০. নজরুলের প্রতি—মাহে, নও : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, মে ১৯৫২
১১. মুয়াজ্জিন কবি-মাসিক মোহাম্মদী : ১৩৬৯-১৯৬২
১২. বন্ধু আজ শুনো—মিন্নাত : শ্রাবণ ১৩৫৯ : ৩১শে আগস্ট ১৯৫২
১৩. সাচ্চা মোমেন বাচ্চারা জাগো—মাসিক মোহাম্মদী : আষাঢ় ১৩৬১, জুন ১৯৫৪
১৪. সে হলো তপ্ত শহীদী খুন-অপ্রকাশিত : ভাদ্র ১৩৭৭, অগাস্ট ১৯৭০
১৫. রক্তে আমার রং-ধরেছে-মাহে-নও : আশ্বিন ১৩৭২, অক্টোবর ১৯৬৫
১৬. জঙ্গী জোয়ান দল ?
১৭. ওরে জঙ্গী যোয়ান দল-দৈনিক আজাদ : ঈদ সংখ্যা, ঈদুল ফিতর, ২৬শে কার্তিক, ১৩৭২, নভেম্বর ১৯৬৫
১৮. আজকে চাহি জুল্‌ফিকার-মুসলিম ছাত্রলীগ কর্তৃক ১৯৬৯ সালের স্বাধীনতা উপলক্ষে প্রকাশিত সাময়িকী

www.pathagar.com

১৯. জুল্‌ফিকার-সাপ্তাহিক জুল্‌ফিকার : ২৪ শে ফাল্গুন ১৩৪৬, ৮ই মার্চ ১৯৪০
২০. বালাকোট স্মরণ- ?
২১. শের-এ-খোদা-মাহে-নও : অগ্রহায়ণ ১৩৫৮, নভেম্বর ১৯৫১
২২. আলফে মনি-পটুয়াটুলি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলফে মনি "স্মৃতি দিবস" উপলক্ষে রচিত-রচনাকাল ১৯৬৯
২৩. সিরজ স্মরণে—(?)
২৪. বন্দনা গাহ তার—আজাদ : ১৯শে আষাঢ় ১৩৪৬, জুলাই ১৯৩৯
২৫. সিরাজ স্মরণে-আজাদ : ১৮ই আষাঢ় ১৩৫০, জুলাই ১৯৪৩
২৬. শহীদ রাজ—দৈনিক আজাদ : ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৮, ৩রা জুলাই ১৯৪২
২৭. কায়েদে আজম-দৈনিক আজাদ : ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১
২৮. তোমার কদম-দৈনিক আজাদ : কায়েদে আজম স্মরণে : ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১
২৯. ঈদের হেলাল-সাপ্তাহিক মোহাম্মদী : ৩০শে আশ্বিন : ১৩৪৮, ১৭ই অক্টোবর ১৯৪১
৩০. নব ঈদ উৎসব-সাপ্তাহিক মোহাম্মদী : ঈদ সংখ্যা : ৮ই কার্তিক ১৩৪৭, নভেম্বর ১৯৪০
৩১. রোজায়-মোহাম্মদী : ১৩৪৪ (১৯৩৭)
৩২. এলো কি রমজান-সাপ্তাহিক মোহাম্মদী : ঈদ সংখ্যা—১৩৪৫ (১৯৩৮)
৩৩. লোহর করিয়া জেগেছে আবার-ঈদ উল-আজহা সংখ্যা : ২৩শে পৌষ ১৩৪৭ (জানুয়ারী ১৯৪১)
৩৪. কোরবানীর ঈদ : আজাদ ১০ই অগ্রহায়ণ : (নভেম্বর ১৯৪৪)
৩৫. এলো ত্যাগের ঈদ-রঙধনু : ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, মে ১৯৬০
৩৬. জিন্দা ঈদ-সাপ্তাহিক মোহাম্মদী : ঈদ্‌-উল্‌-আজহা সংখ্যা : ৫ই মাঘ ১৩৪৬ (ফেব্রুয়ারী ১৯৪০)
৩৭. ঈদ-উল-আজহা-মাসিক মোহাম্মদী : ফাল্গুন ১৩৪৩ (মার্চ, ১৯৩৭)
৩৮. খুনেরা ঈদ—(?)
৩৯. হামদ (?)
৪০. মহানবীর আবির্ভাব-সাপ্তাহিক আরাফাত : ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, মে ১৯৬৯
৪১. না'ত (হাজারো সালাম লহ নবী মোহাম্মদ-১) প্রখ্যাত কাওয়াল মরহুম কাল্লু-কাওয়াল কর্তৃক বিংশ শতাব্দীর ৫ম দশকে গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত
৪২. না'ত (মন রে তুমি নিত্য জপ ইয়া মোহাম্মদ সাল্লেল্লাহ্‌-২) পঞ্চাশের দশকে কাল্লু কাওয়াল কর্তৃক হিজ মাস্টার্স গ্রামোফোন রেকর্ডে-গীত।
৪৩. নাত-৩ (আমার মন-মদীনার পথ-জুড়ি)-সাপ্তাহিক মদিনা : ঈদ সংখ্যা ১৩৪৭ (১৯৪০)
৪৪. মহরম-১ (?)
৪৫. কারবালা নবতর-২ : সংবাদ : ২১শে আশ্বিন ১৩৫৮ : ১৮ই অক্টোবর ১৯৫১
৪৬. সত্য পথের শক্ত ভিত-সাপ্তাহিক নয়া যামানা : প্রতিরক্ষা দিবস সংখ্যা, ১৯শে ভাদ্র ১৩৭৬, ৫ই সেপ্টেম্বর : ১৯৬৯
৪৭. জঈফ জাহান-আজাদ : আজাদী সংখ্যা : ২৯ শে শ্রাবণ-১৩৬১, জুলাই ১৯৫৪
৪৮. মীনার-মীনার : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬৫-৬৬, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৫৮
৪৯. ভাটার দিনে-দৈনিক সংবাদ (নববর্ষ সংখ্যা) : ১লা বৈশাখ ১৩৬২, ১৫ই এপ্রিল ১৯৫৫
৫০. আল্লাহ্‌ তুমি দাও নাজাত-মীনার : বাং ১৩৬৬-পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, জানুয়ারী-জুন ১৯৫৯
৫১. খুনেলা আঁসু-দৈনিক আজাদ (ঈদ সংখ্যা) : ১৩৬৯ (১৯৬৯)
৫২. তোমরা ও আমরা-অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান : ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১, ৩১শে মে ১৯৫৪
৫৩. তোমায় জিজ্ঞাসি-চাষী (আজাদী সংখ্যা) : শ্রাবণ ১৩৫৯, ১৫ই আগষ্ট ১৯৫২
৫৪. জাহান্নাম-মাহে-নও : আষাঢ় ১৩৫৭, জুন ১৯৫০
৫৫. নও তারানা-মাহে-নও : পৌষ ১৩৫৭, ডিসেম্বর ১৯৫০
৫৬. বাতেনী, এলেম-মাসিক 'দিলরুবা'—আজাদী সংখ্যা : আষাঢ়-শ্রাবণ-১৩৬০, জুলাই-আগস্ট ১৯৫৩
৫৭. উষায়-ইমরোজ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৮
৫৮. মানস-মরাল-মাহে-নও, ভাদ্র-১৩৬৩

www.pathagar.com

৫৯. চিরপথ–কাফেলা, আজাদী সংখ্যা ১৩৬১
৬০. হে কাফেলা চলো–কাফেলা, ঈদ–সংখ্যা ১৩৬১
৬১. পথিক–মাহে–নও, চৈত্র ১৩৬৭
৬২. নূতন দিনে–আজাদ, কার্তিক ১৩৫৫
৬৩. জিজ্ঞাসা–আলাপনী, ফাল্গুন–চৈত্র ১৩৬৭
৬৪. হে নব যাত্রী দল–সাপ্তাহিক খাদেম : ঈদ–সংখ্যা ১৩৫৪
৬৫. যাত্রী–আজাদ–আজাদী সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৮
৬৬. মুখর মানস–মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬৮
৬৭. সুবর্ণ মৃগের মায়া–সত্য বার্তা (চট্টগ্রাম) ঈদ–সংখ্যা ১৩৪৮
৬৮. খুদী–মাহে–নও, ভাদ্র ১৩৬২
৬৯. কাফেলা–কাফেলা : ঈদ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৬
৭০. মাটি আর মহাকাশ (?) চৈত্র ১৩৬৩
৭১. মুসাফির–কাফেলা : ভাদ্র ১৩৫৯
৭২. এবার বাঁধব ঘর–মাসিক মোহাম্মদী : ১৩৫৮
৭৩. তাপ–দগ্ধ বসুন্ধরা : মাহে নও : শ্রাবণ ১৩৬৪
৭৪. নূতন চাঁদের কিশ্‌তি–আজাদ : ঈদ সংখ্যা ১৩৫২
৭৫. অন্তরালে–পাকিস্তানী খবর : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫
৭৬. নয়া তারানা–আল্ ফালাক : ১৩৬৭
৭৭. আশঙ্কিত–দৈনিক আজাদ : বিপ্লব সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৮
৭৮. হে শান্ত শীতলক্ষ্যা, দৈনিক সংবাদ : অগ্রহায়ণ ১৩৬০
৭৯. উদয়াস্ত yuberculosis Anual : পূর্বপাকিস্তান যক্ষ্মা–বার্ষিকী ১৩৬৬
৮০. নয়া সয়লাব পাকিস্তানী খবর : ৭ই আষাঢ় ১৩৬৪
৮১. দিগাঙ্গনের দিগ্বলয়ে–মাসিক মোহাম্মদী : ফাল্গুন ১৩৪৮
৮২. ধরণীয় কামনা কিষাণ–দৈনিক কৃষক : কার্তিক (ঈদ সংখ্যা) ১৩৪৮
৮৩. কে দিলো সে ডাক–মাসিক মোহাম্মদী : আশ্বিন ১৩৪৮
৮৪. কামনা–মাসিক মোহাম্মদী : ভাদ্র ১৩৫৭ (আগস্ট ১৯৫০)
৮৫. কালের পাতা–পাকিস্তানী খবর : পাকিস্তানী দিবস সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৬ (১৯৬০)
৮৬. অনির্বাণ শিখা,–এলান, মার্চ, দ্বিতীয় পক্ষ ১৩৭১ (১৯৬৪)
৮৭. নয়া জিন্দেগী–মাহে নও, ভাদ্র ১৩৬৬
৮৮. বিবর্তন–মাসিক বিবর্তন : ভাদ্র ১৩৬৭
৮৯. যোগাযোগ–ঈদ–সংখ্যা–যোগাযোগ ২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৬
৯০. ভাষার দিনে–দৈনিক সংবাদ : ১লা বৈশাখ ১৩৬২ (১৫.৪.৫৫)
৯১. নব দিগন্ত Read in Radio. Pakistan on 23. 3. 62 Pakistan Day.
৯২. মুক্তি–ভেলা দৈনিক সংবাদ given to সংবাদ 16.3.61 (for ঈদ–সংখ্যা, রমজান ঈদ)
৯৩. ঘুম–পাড়ানী ছড়া–given to Daily Azad for পাকিস্তান–দিবস 23-3-62.
৯৪. ঢেউ–মাসিক মোহাম্মদী : চৈত্র–১৩৬৬, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৯৫. স্বপ্নলোক–Read in Radio Pakistan, Dacca on 15.7.69. পূর্ব নাম ষোড়শ
৯৬. আমার বাংলা–আমার দেশ : ১৩৭০
৯৭. ভোরের আজান–জাগরণ–মাসিকপত্র বনগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৬১
৯৮. পথের পুঁজি–মাসিক মোহাম্মদী : আশ্বিন ১৩৪৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com